প্রকাশ : ৬ই শ্রাবণ, ১৩৬৬

প্রকাশিকা :
কল্পনা মুখোপাধ্যায়
'সাধনা মন্দির',
২৯।১১, নারায়ণ রায় রোড ;
কলিকাতা-৮

মুদ্রাকর :
হরিহর প্রেস,
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ :
শ্রীগৌরাঙ্গনাথ পণ্ডিত

বাঁধাই :
শ্রীনাথ বুক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্
৮, পাটোয়ার বাগান লেন,
কলিকাতা-৯

দূর মন্দিরে সিন্ধুকিনারে
পথে চলিয়াছ তুমি।
আমি তরু মোর ছায়া দিয়ে তারে
মৃত্তিকা তার চুমি।

হে তীর্থগামী, তব সাধনার
অংশ কিছু-বা রহিল আমার,
পথপাশে আমি তব যাত্রার
রহিব সাক্ষীরূপে।
তোমার পূজায় মোর কিছু যায়
ফুলের গন্ধধূপে॥

—রবীন্দ্রনাথ

সূচী

বিস্তারিত বিষয়-নির্দেশ

মুখবন্ধ

"সেই শেষ না-জানার
নিত্য নিরুত্তরখানি মর্মমাঝে রয়েছে আমার।"

[ভাগ্যবাজ, নবজাতক]

মুখবন্ধ

"শুধু কি কবিতা লেখার একজন কর্তা কবিকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার লেখনী চালনা করিয়াছেন? তাহা নহে। সেই সঙ্গে ইহাও দেখিয়াছি যে, জীবনটা যে গঠিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার সমস্ত সুখদুঃখ,—তাহার সমস্ত যোগবিয়োগের বিচ্ছিন্নতাকে কে একজন একটি অখণ্ড তাৎপর্যের মধ্যে গাঁথিয়া তুলিতেছেন।"

"কবির সমস্ত কাব্যের ভিতর দিয়া বিশ্ব কোন্ বাণীরূপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে, তাহাই বুঝিবার যোগ্য। কবিকে উপলক্ষ্য করিয়া বীণাপাণি বাণী, বিশ্বজগতের প্রকাশশক্তি, আপনাকে কোন্ আকারে ব্যক্ত করিয়াছে, তাহাই দেখিবার বিষয়।"

—রবীন্দ্রনাথ

১

বিগত দ্বাদশ বৎসরকাল রবীন্দ্রশাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়া ক্রমশঃ এই ধারণা আমার মধ্যে বদ্ধমূল হইয়াছে যে, কাব্যরসের আনন্দোপলব্ধির প্রয়োজনে রবীন্দ্রকাব্য খণ্ড-খণ্ডভাবে গ্রহণ করা চলিতে পারে বটে, কিন্তু সর্বজগদ্‌গত অখণ্ড জীবনোপলব্ধির প্রয়োজনে রবীন্দ্রকাব্যের সমগ্রতার রূপৈশ্বর্য ও তত্ত্বসৌন্দর্যে মনোনিবেশ করিতেই হয়। রবীন্দ্রপ্রতিভা এবং জীবনের মধ্য দিয়া বীণাপাণি যে তত্ত্বসত্যটি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য আহরণে যত্নবান হইলে রসবোধেরও যে আনুকূল্য করা হইবে না, তাহা নহে। বোধের বিস্তৃতি ঘটিলে যখন সমগ্রতার অখণ্ড তাৎপর্যটি গ্রহণ করা সম্ভব হয়, তখন খণ্ড-সৃষ্টির মধ্যেও অখণ্ড সেই তাৎপর্যের আভাস দেখিয়া কাব্যরসের আনন্দাস্বাদনের সঙ্গে সঙ্গেই অখণ্ড জীবন-বোধের অনন্ত আনন্দও উপলব্ধ হইতে থাকে। সীমার মধ্যে অসীমের ঐশ্বর্য-দর্শনের শক্তি জন্মিলে সীমার মহিমাই যে বর্ধিত হয়, তাহা নহে,—দ্রষ্টার বোধের বিস্তৃতি ঘটার ফলে জীবন তাহার নূতনতর জ্যোতি ও আনন্দের সন্ধান পায়।

'মনোদর্শনে' রবীন্দ্রকাব্যের অখণ্ড তাৎপর্য ও ঐক্য-তত্ত্বটি আমি ধীরভাবে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে অখণ্ড যে তত্ত্ব আপনাতে আপনি উদ্বোধিত হইয়াছিল,—অহং হইতে বিশ্বে, বিচিত্র হইতে একে অগ্রগতির যে ভাবতত্ত্ব তাঁহাকে অহরহঃ

আন্দোলিত করিয়াছিল, 'মনোদর্শনে' তাহাই তাঁহার কাব্যাবলী ও দর্শনরচনাবলীর পর্যালোচনার প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের মন, তাহার স্তর ও স্বরূপ, গতি ও পরিণতি বেদান্তের আলোকেই দর্শন করিয়াছি। দেখিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের মন বেদান্তকল্পিত 'মন' ও 'বিজ্ঞানের' মধ্যবর্তী 'বৈদিক মন'। সংসারের খণ্ডক্ষুদ্র বৈষয়িকতার বন্ধনে এই মন বন্দী নহে, আবার অবাঙ্‌মনসগোচর তত্ত্ববিজ্ঞানের নির্বিকল্প মুক্তিতেও এই মন বিশ্বাসী নহে।

"ঘরেও নহে, পারেও নহে
যে 'মন' আছে মাঝখানে"

সেই মনের দর্শনই রবীন্দ্রনাথের মনোদর্শন।

সাধারণভাবে 'মনোদর্শনের' এইরূপ একটি অর্থ করা যাইতে পারে। কিন্তু 'মনোদর্শনের' 'মন' শব্দটি বিশেষ অর্থেই আমি ব্যবহার করিয়াছি। এই আমার স্থির বিশ্বাস যে, বেদান্তদৃষ্টিতে রবীন্দ্রমানস দর্শন করিলে রবীন্দ্রনাথকে বুঝা খুবই সহজ হয়। বেদান্ত জগজীবন ও যোগজীবনের যে স্তরগুলি ভাগ করিয়া দেখাইয়াছেন—সেই স্তরগুলির স্বরূপ জানিয়া রবীন্দ্রনাথের 'মনটি'কে বিচার করিতে নামিলে তাঁহাকে আর দুর্বোধ্য বা জীবননিরপেক্ষ ভাববাদী কিংবা অবাস্তব কল্পজীবনের অযথা স্বপ্নাশ্রয়ী বলিয়া মনেই হয় না; বরং তখন তাঁহার বাণীকে বাস্তবজীবনে প্রতিভাত করার প্রেরণাই অনুভূত হইতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের 'মন' ও 'মনোভাব' বুঝাইতে গিয়া 'প্রেমধর্ম' নামক অধ্যায়ে যাহা লিখিয়াছি—এইস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:

'ইন্দ্রিয়বোধ হইতে প্রেমবোধে নিত্য অগ্রগতির ভাবই রবীন্দ্রনাথের 'মনোভাব'। বেদান্তে 'মন' হইতেছে তৃতীয় লোকের ভাব—তাহা অন্নময় লোকের তামসক্ষুধার ভাব নহে, প্রাণময় লোকের রাজস-চাপল্যের ভাবও নহে, তাহা মনোময় লোকের প্রেমপন্থাভিমুখী সাত্ত্বিক ভাব। এই 'ভাব' ধূলিলিপ্ত সাংসারিকতার মলিনাবাসনা হইতে ক্রমশঃ ঊর্ধ্বপথে উঠিতে চাহিয়াছে বটে, কিন্তু জীবননিরপেক্ষ নির্বিশেষ 'চতুর্থ' ভাবের অনেক নিম্নস্তরেই ইহার অবস্থিতি। 'মনোভাব' হইতেছে মধ্যপথের, অর্থাৎ দুইদিক রাখিয়া সমন্বয়ের ভাব; ইহার একদিকে ইন্দ্রিয়বোধের বাস্তব ভাব, অপরদিকে অতীন্দ্রিয় বিজ্ঞানতত্ত্বের সমাধিভাব। 'মন' বলিতে আমি তাই মধ্যগভাবকেই বুঝিয়া থাকি। 'মনোভাব' বলিতে যে ভাব সংসারে রহিয়াও সংসারের ঊর্ধ্বলোকে—এবং ব্রহ্মাভিমুখী হইয়াও সংসারলোকে, সেই ভাবই আমি বুঝাইতে চাই। বেদান্ত অনুসরণে এই ভাবদর্শনকে আপনি 'মনোদর্শন' নামে অভিহিত করিতে পারেন।'

২

মনের তত্ত্বকে শাস্ত্রকারগণ সাতটি ভাগে ভাগ করিয়া দিয়াছেন। 'বেদে' এবং বেদ হইতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবে, মনের এই স্তরবিভাগের কথা স্পষ্টাক্ষরে অভিব্যক্ত হইয়াছে। 'ব্রহ্ম' নামক অধ্যায়ে পরমহংসদেবের কথাগুলি নজির হিসাবে আমি উদ্ধৃত করিয়াছি।

"মনের সচরাচর বাস কোথায়? প্রথম তিনভূমিতে। লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি—সেই তিনভূমি। তখন মনের আসক্তি কেবল সংসারে, কামিনীকাঞ্চনে। হৃদয়ে যখন মনের বাস হয়, তখন ঈশ্বরীয় জ্যোতিদর্শন হয়, সে ব্যক্তি জ্যোতি দর্শন ক'রে বলে এ কি; এ কি! তার পর কণ্ঠ—সেখানে যখন মনের বাস হয়, তখন কেবল ঈশ্বরীয় কথা কইতে ও শুনতে ইচ্ছা হয়। কপালে ভ্রূমধ্যে মন গেলে তখন সচ্চিদানন্দরূপ দর্শন হয়, সেই রূপের সঙ্গে আলিঙ্গন, স্পর্শন করতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু পারে না। লণ্ঠনের মধ্যে আলো দর্শন হয়, কিন্তু স্পর্শ হয় না, ছুঁই ছুঁই বোধ হয় কিন্তু ছোঁয়া যায় না। সপ্তম ভূমিতে মন যখন যায়, তখন অহং আর থাকে না, সমাধি হয়। (কথামৃত, ১ম ভাগ; পৃ. ৭৩)

সেণ্ট আগাস্টাইন-এর সাধনাতেও মনের এই সাতটি স্তরের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

"St. Augustine arranges the ascent of the soul in seven stages. But the higher steps are, as usual, purgation, illumination, union. This last which he calls "the vision and contemplation of truth" —is not a step but the goal of the Journey." (*Christian Mysticism* by William Ralph Inge. p. 130)

পাতঞ্জলদর্শনে মনের মোটামুটি পাঁচটি স্তরের কথা বলা হইয়াছে: ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ (পাতঞ্জলদর্শন, ১৷১)। মনের নিম্নতম তলদেশে অবস্থিত আছে 'ক্ষিপ্ত' স্তর, তাহার একটু ঊর্ধ্ব প্রদেশে 'মূঢ়'; বিক্ষিপ্ত স্তরে আছে সাধারণ মানবমনসমাজ; একাগ্র নামক স্তরটি আছে সাধকমনের অন্তর্লোকে, 'নিরুদ্ধ' নামক স্তরটিই মানবমনের সর্বোচ্চ ভূমি।

রবীন্দ্রনাথ মনের নিম্নতল হইতে ক্রমশঃ উচ্চতম স্তরে উন্নীত হইতে চাহিয়াছেন; কিন্তু মনটিকে একেবারে উত্তীর্ণ হইয়া অর্থাৎ মনের বিনাশ সাধন করিয়া কখনও সর্বোচ্চ

ভূমিতে অর্থাৎ বেদান্তের 'চতুর্থতত্ত্বে' যাইতে চাহেন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি কিংবা আগাস্টাইন-এর 'The goal of the Journey' অথবা পাতঞ্জলদর্শনের নিরুদ্ধভূমি তাঁহার লক্ষ্য নহে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে দার্শনিকটি ছিলেন, তিনি মনোজীবনের মধ্যবর্তী তত্ত্বসত্যকেই চলমান জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ইহার ঊর্ধ্বে যে তত্ত্বসত্য, ধারণাতীত সেই অবাঙ্‌মনসগোচর চতুর্থতত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের নহে,—কবির তো নহেই, দার্শনিকেরও নহে।

এই সহজ কথাটি এতদিন আমরা বুঝিয়াও বুঝিতে চাহি নাই। রবীন্দ্রনাথ একের কথা বলিয়াছেন, ব্রহ্মের কোন সরিক মানেন না বলিয়া অদ্বৈততত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই কারণেই বিচিত্রোপাসক কবি রবীন্দ্রনাথ হইতে অদ্বৈতসাধক দার্শনিক রবীন্দ্রনাথকে অনেকে পৃথক্ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ বলিয়া ধারণা করিয়াছেন। রবীন্দ্রকল্পিত ব্রহ্ম যদি 'beyond conception' অর্থাৎ ধারণাতীত নির্বিশেষ ব্রহ্ম হন, তা' হইলেই বলিতে পারা যায় যে, কবি যখন থাকেন ধী ও ধারণার রাজ্যে, দার্শনিক তখন ধারণাবহির্ভূত তত্ত্বসত্যে বিশ্বাস রাখেন বলিয়াই কবি হইতে ভিন্ন দার্শনিকের একটি 'স্বতন্ত্র' ব্যক্তিত্ব আছে। কিন্তু রবীন্দ্রব্রহ্ম কি সত্যসত্যই beyond conception? রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ব্রহ্মসাধনায় নির্বিকল্প সমাধিতত্ত্বের কোন কথা কি কোন স্থলে বলিয়াছেন?

ব্রহ্মোপাসনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বুঝি বা অবাঙ্‌মনসগোচর তত্ত্বসত্য সমর্থন করেন—এইরূপ একটি ধারণা ভাসা-ভাসা-ভাবে আজিও অনেক পণ্ডিতের মধ্যে রহিয়াছে। কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ অহং-এর বিচিত্র চিত্র আঁকিয়াছেন,—নিত্যগতির চাঞ্চল্যে মাতিয়াছেন, প্রকৃতির নানারূপে ভুলিয়াছেন, মানবের নানা মহিমার নানা স্তোত্র রচনা করিয়াছেন; কিন্তু যখনই অনুমান করা হয় যে, দার্শনিক হিসাবে তিনি জীবন-নিরপেক্ষ তুরীয় তত্ত্বের যোগাশ্রয়ী, তখনই এ-ধারণা জন্মিতেই পারে যে, তাঁহার কবি ও দার্শনিকের মধ্যে কোনও মিল নাই।

সাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশী মহোদয় রবীন্দ্রনাথের দুই ব্যক্তিত্ব কল্পনা করিয়া কবিকে দক্ষিণে ও দার্শনিককে উত্তরে বসাইয়াছেন ('রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ', ১ম সং, ভূমিকা)। তাঁহার বক্তব্য এই, দার্শনিক উচ্চতর বৈরাগ্যজীবনের কথা বলেন, কিন্তু কবি গাহেন মায়াময়ী পৃথিবীর স্নেহ ভালবাসার বিচিত্র গীতি। প্রমথবাবু রবীন্দ্রনাথের পৃথ্বিপ্রকৃতির স্নেহাচ্ছন্ন কবি স্বভাবটিকেই একান্ত করিয়া দেখিয়াছেন বলিয়া 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য' প্রভৃতি ভাগবতভাবান্বিত গীতিকাব্যগুলিকে রবীন্দ্রনাথের স্বভাববিরোধী কাব্য বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। আবার অন্যদিকে ডক্টর রাধাকৃষ্ণন কবিকে একজন মিস্টিক্ দার্শনিক রূপে ধারণা করিয়াছেন বলিয়া কবির সুখদুঃখ-আশানৈরাশ্যের লোকায়ত গীতিকাব্যাবলীর কথা উত্থাপনই করেন নাই,—পরন্তু 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য' প্রভৃতি কাব্যগুলির মধ্যেই দার্শনিকভাবাপন্ন ব্রহ্মোপাসক কবিকে সন্ধান করিয়াছেন। ড. রাধাকৃষ্ণনের ধারণা,

রবীন্দ্রনাথের প্রেম যৌনমনোবিরোধী মিস্টিক্ প্রেম ; সাধারণে তাহা সহজে বুঝে না (*The Philosophy of Rabindranath*, p. 54) ; প্রমথবাবুর ধারণা, সাধারণ স্নেহাবেগের মায়াচঞ্চল মানবিক প্রেমই কবিগুরুর প্রেম, ভাগবত প্রেম যেন তাঁহার স্বভাবধর্মই নহে। রবীন্দ্রনাথের মনের স্বরূপ তথা প্রেমের স্বরূপ সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি না করিলে মুনিদেরও যে বিভ্রান্তি ঘটিতে পারে, সে-কথা প্রমথবাবুর মত বিজ্ঞ সমালোচকের উপর্যুক্ত মন্তব্য এবং রাধাকৃষ্ণনের মত বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিকের রবীন্দ্রপ্রেমদর্শনের একদেশদর্শী তত্ত্বব্যাখ্যা পাঠ করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইয়া যায়।

৩

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মধ্যেই তাঁহার তত্ত্বদর্শনটুকু নিহিত আছে। কিন্তু এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা কাব্যে কোন তত্ত্বই স্বীকার করেন না। কবি বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কোন তত্ত্বই স্বীকার করেন নাই। 'গীতাঞ্জলির' গানগুলিকে ড. টমসনের ন্যায় তিনি গ্রহণ অবশ্য করিয়াছেন, কিন্তু তত্ত্বানন্দ তাহার কারণ নহে ; প্রমথনাথের ন্যায় গীতাঞ্জলির গানগুলিকে তত্ত্বগর্ভ মনে না করিয়া রসোত্তীর্ণ আনন্দগীতি বলিয়াই তিনি ধারণা করিয়াছেন ('সমসাময়িক কবির চোখে রবীন্দ্রনাথ', পৃ. ২২)। কবিশেখর কালিদাস রায় রবীন্দ্রপাঠে 'রসানন্দ'-ই আসল বলিয়া 'বোধানন্দের' প্রয়োজনীয়তাকে বিশেষ কোন মূল্য বা মর্যাদা দিতে চাহেন নাই (তদেব, পৃ. ৬৪)। ড. সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত রবীন্দ্রনাথের কোন কোন কাব্যের তত্ত্বমানস যোগ্যতার সহিতই বিশ্লেষণ করিয়াছেন ('রবিদীপিতা' দ্রষ্টব্য)। কিন্তু সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যের ঐক্যতত্ত্ব লইয়া অথবা রবীন্দ্রনাথের কবিবাণী ও দর্শনবাণীর অখণ্ড তাৎপর্য লইয়া চিন্তা করিবার সুযোগ বা অবসর গ্রহণ করেন নাই। ড. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ('রবীন্দ্রনাথ') এবং শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ('রবীন্দ্র-সাহিত্য-পরিক্রমা') রবীন্দ্ররচনাবলীর সুদীর্ঘ সমালোচনা লিখিয়াছেন, কিন্তু তত্ত্ববিষয়ে সম্যক্‌ভাবে সচেতন না হইলে কাব্যব্যাখ্যাতে কিরূপ বিভ্রান্তি ঘটে সে বিষয়ে তাঁহাদেরই একাধিক রচনা সাক্ষ্য প্রদান করিবে ('পলাতকা' আলোচনা দ্রষ্টব্য)। ড. নীহাররঞ্জন রায় ('রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা') রবীন্দ্রনাথকে কবি বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু কবির কাব্যদর্শনের তত্ত্ব-ব্যাখ্যার উপযোগিতা সম্বন্ধে কোথাও কোনরূপ মন্তব্য না করিলেও কোন কোন ক্ষেত্রে স্পষ্টতঃ তত্ত্বব্যাখ্যা করিতেই প্রয়াস পাইয়াছেন। কবি মোহিতলাল রবীন্দ্রকাব্যে তত্ত্ব যে একেবারেই দর্শন করেন নাই তাহা নহে, তবে 'তাঁহার মধ্যে যে কোন ঐক্যতত্ত্ব নাই' সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়াছেন। (পূর্বাশা, রবীন্দ্রস্মৃতিসংখ্যা, আশ্বিন ১৩৪৮)

৪

রবীন্দ্রনাথকে দার্শনিক বলিয়া যাঁহারা মানিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ড. রাধাকৃষ্ণনের মত কবির চপল প্রেমের অর্থাৎ অহংমত্ত প্রণয়গীতিগুলির কোনরূপ ব্যাখ্যা না করিয়া শুদ্ধমাত্র ঈশ্বরীয় গীতিগুলি লইয়াই নাড়াচাড়া করিয়াছেন। [ইন্দুপ্রকাশের 'কবি রবীন্দ্রনাথের ঋষিত্ব', শিবকৃষ্ণের 'রবীন্দ্রসাধনা', সুখসম্পৎ ভাণ্ডারীর 'রবীন্দ্রদর্শন' (হিন্দী) এবং Sybil Baumer-এর '*Tagore's Mysticism*' দ্রষ্টব্য]। দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহাকে 'বৈদান্তিক' বলিয়াছেন (***Tagore Birthday Number***, p. 31), Evelyn Underhill তাঁহাকে 'মিস্‌মিক্' বলিয়াছেন (***The Nation***, London, Nov. 16,1912), Bergson তাঁহাকে 'ইন্‌ট্যুইসনিস্ট্' বলিয়াছেন (***Modern Review***, Jan. 1921)।

আবার কবি হিসাবে তাঁহাকে যাঁহারা মান্য করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার অশান্ত প্রেমের বৈচিত্র্যপ্রিয়তার আনন্দচাপল্যে 'হিউম্যানিজম্' লক্ষ্য করিয়াছেন। ভাগবতধর্মিতার ধ্যানগুলি তাঁহার কবিজীবন হইতে তাই একপাশে সরাইয়া রাখিতে হইয়াছে; বলিতে হইয়াছে তিনি 'রিয়ালিস্ট' (কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়), বলিতে হইয়াছে তিনি 'রোমান্টিক' (ড. সুবোধচন্দ্র), বলিতে হইয়াছে তাঁহার প্রেমে যেন 'প্যাসান' নাই (কবি বুদ্ধদেব), বলিতে হইয়াছে ভাগবত ধর্ম তাঁহার স্বধর্ম নহে (সাহিত্যিক প্রমথনাথ), বলিতে হইয়াছে শ্রেয়োধর্ম রবীন্দ্রনাথে তেমন নাই (দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ)।

সকলের কথাতেই কিছু-না-কিছু সত্য যে আছে এ-কথা আমি অবশ্যই অস্বীকার করি না। কিন্তু এ-কথা মানিতেই হইবে যে, আংশিক সত্যের আলোয় পূর্ণসত্যের আভাসমাত্র মেলে, পূর্ণস্বরূপের অখণ্ড তাৎপর্য মেলে না। অখণ্ড তাৎপর্য যেখানে গ্রহণ করি না, সেখানে মনোমত অংশগুলি গ্রহণ করিয়া অন্যান্য বিষয় বা বস্তুগুলি পরিহার করিতেই চাই। রবীন্দ্রশাস্ত্রবিচারে এতদিন আমরা নিজেদের অধিকার ও ইচ্ছামত কোন কোন অংশ লইয়া বিস্তর মাতামাতি করিয়াছি। সেই কারণে আমাদের আলোচনায় একদেশদর্শিতা প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের মনোলোকের সন্ধান করিলে এবং কোন্ স্তরে অধিষ্ঠিত রহিয়া তাঁহার কবি ও দার্শনিক সত্তা জীবনবেদ রচনা করিয়াছেন জানিতে পারিলে অহং হইতে আত্মা পর্যন্ত প্রসারিত প্রেমের দর্শন হয়। তখন অহং বাদ যায় না—আত্মাও উপেক্ষিত হয় না; উপরন্তু অহং-এ আত্মা এবং আত্মায় অহং-এর আভাস দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, দার্শনিকের মতি কিসে এবং কবীন্দ্রের গতি কোথায় ও কতদূর পর্যন্ত।

আমাদের প্রশ্ন এই :

১. রবীন্দ্রনাথের কাব্যে আদৌ কোন তত্ত্ব আছে কিনা; থাকিলে তাহার স্বরূপ কি? কবি কি ভারতীয় বা ইউরোপীয় দর্শনশাখার বিশেষ কোন তত্ত্ব স্বীকার করেন?

২. রবীন্দ্রনাথে যদি কোন তত্ত্ব থাকেই, তবে সেই তত্ত্ব জানিলে কাব্যপাঠের কি সাহায্য হয়? কাব্যপাঠে তত্ত্বালোচনার কি একান্তই প্রয়োজন আছে?

৩. তত্ত্বালোচনার প্রসঙ্গে কবির মনের স্বরূপটি জানিলে, দার্শনিককেও কি জানা সহজ হয়?

৪. তিনি কবি ও দার্শনিক, না কবি-দার্শনিক? যদি কবি-দার্শনিক হন, তবে কবি ও দার্শনিকের অভিন্নত্ব তো প্রমাণ করিতে হয়?

৫. অভিন্নত্ব প্রমাণে লাভটা কি হইবে? ইহার দ্বারা তাঁহার দার্শনিকের যথার্থ স্বরূপ জানা কি সম্ভব হইবে? তাহাতে কি তাঁহার দর্শন সম্বন্ধে অহেতুক ভুলধারণাগুলির নিরসন হইবে? যদি তা হয়ই তাহাতেই বা কী লাভ?

৬. দার্শনিক রূপের লাবণ্যোপরি অরূপের আলো ফেলিয়াছেন, কবি অরূপের মহিমায় রূপের বাসনা মেলিয়াছেন—রূপ ও অরূপ দুই-ই পৃথিবীর জীবনে মনোগত সত্যসুন্দরের আনন্দপ্রেম বিকীরণ করিয়াছে—ইহা জানার মধ্যে ও মানার মধ্যে জীবনদর্শনের আনন্দবোধ কি বিস্তৃত হয়? কাব্যপাঠের পক্ষে, বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথের কাব্যালোচনার পক্ষে, ইহার সহায়তা কি সত্যই মূল্যবান?

৭. দার্শনিক হিসাবে তিনি কি বৈদান্তিক? আর বৈদান্তিক হইলেই বা কোন্ স্তরের বৈদান্তিক? তিনি যদি 'বেদোপনিষদ্' মানেন, তবে তাঁহার ব্রহ্ম রূপ-বিহীন নহেন; কিন্তু 'বিজ্ঞানোপনিষদ্' যদি মানেন, তবে তাঁহার ব্রহ্ম রূপহীন নির্বিশেষ 'চতুর্থ' তত্ত্ব। তিনি কি চতুর্থ তত্ত্ব সমর্থন করেন?

৮. তাঁহার ব্রহ্মের স্বরূপ কি? যদি তাঁহার ব্রহ্ম হন প্রেমব্রহ্ম, তবে তাঁহার এই প্রেমেরই বা স্বরূপ কি?

৯. তিনি কি আনন্দের কথা বলেন? তাঁহার 'আনন্দ' কি শ্রুতিপ্রোক্ত পঞ্চম 'আনন্দ'? পঞ্চমতত্ত্ব অবশ্যই নির্বিকল্প সমাধি-তত্ত্ব। এই তত্ত্বে দুঃখ-দ্বন্দ্ব,

সুখ-নৈরাশ্যের কোন কথাই উঠে না। রবীন্দ্র-আনন্দ কি সেই আনন্দ? যদি তাই হয়, তবে তাঁহার মধ্যে দুঃখ, দ্বন্দ্ব, মোহ, সংশয় প্রভৃতি বিচিত্র মনোভাবের প্রাধান্য কেন? তাঁহার আনন্দ তা' হইলে কিরূপ আনন্দ? তাঁহার আনন্দ কি প্রেম? এই প্রেমের ধর্ম কি?

১০. প্রকৃতিকে তাঁহার দার্শনিক কি মায়া বলিয়া ত্যাগ করিয়াছেন? যদি 'মায়া', 'ছলনা', 'কুহক'ই বলিয়া থাকেন তবে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে এবং কী হিসাবে বলিয়াছেন? ব্রহ্ম তথা প্রেমের সহিত তাঁহার প্রকৃতির কী সম্বন্ধ?

১১. 'মানব' তাঁহার মতে কিরূপ মানব? প্রেম ও প্রকৃতির সহিত তাঁহার মানবের কেমনতর সম্বন্ধ? তাঁহার 'মানব' কি শুদ্ধমাত্র 'জীবমানব' অথবা কেবলমাত্র 'শিবমানব'? রবীন্দ্রমানব কি কেবলমাত্র কল্পবাদী-ই? বস্তুবাদ তাঁহার মধ্যে কতটুকু? রবীন্দ্রবাস্তববাদের যথার্থ মর্মকথা কি?

১২. রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতার স্বরূপ কি? তাঁহার আধ্যাত্মিকতা কর্মাশ্রয়ী, না, নৈষ্কর্ম্যের অভিযাত্রী? তাঁহার দর্শনে যে-অধ্যাত্মবাদের ইঙ্গিত মেলে, কাব্যে তাহাই কি ক্রমশঃ উন্মেষিত হইয়াছে?

১৩. জীবনের চলমান অভিজ্ঞতা হইতেই কি তাঁহার তত্ত্ববিশ্বাসের জন্ম? একই তত্ত্ব ক্রমশঃ বিকাশলাভ করিয়া তাঁহার জীবনকে কি গঠিত করিয়াছে? সেই একতত্ত্ব কি প্রেম?

১৪. প্রেম-ই যদি তাঁহার জীবন, দর্শন, ধর্ম ও কাব্যের ঐক্যতত্ত্ব হয়, তবে মধ্যে মধ্যে তিনি যে বৈরাগ্যের কথা বলেন তাহারই বা তাৎপর্য কি?

১৫. যদি ঐক্যতত্ত্বই তাঁহার মধ্যে আছে বলিয়া ধারণা হয়, তবে অহং ও আত্মা, গতি ও স্থিতি, রূপ ও অরূপ, ভোগ ও যোগ, বন্ধন ও মুক্তি, জীবন ও মৃত্যু, শ্রেয় ও প্রেয়, বস্তু ও কল্পনা প্রভৃতি পরস্পরবিরোধী তত্ত্বগুলি তাঁহার রচনাবলীতে পাশাপাশি ভিড় করিয়া আছে কোন্ প্রয়োজনে? কী ইহার দার্শনিক তাৎপর্য?

১৬. কবি বলিয়াছেন, জীবনের সব শেষ প্রশ্নের 'মেলে না উত্তর'; দার্শনিক কি সর্বশেষ প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন?

এই সমস্ত প্রশ্নের সদুত্তর মিলিলেই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বহু ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হইবে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দর্শন ও কাব্যতত্ত্ব দিনের আলোর ন্যায় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। 'মনোদর্শনে' এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছি। বলা বাহুল্য, সম্পূর্ণভাবে ইহা মৌলিক রচনা।

পাঠক জানেন, রবীন্দ্রনাথ বারংবার বলিতেন যে, তিনি তাত্ত্বিক নহেন ('আত্ম-পরিচয়', পৃ. ৯, ৮০)। বৈদান্তিকদের নির্বিশেষ তত্ত্বজিজ্ঞাসা বা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা রবীন্দ্রনাথের নহে, এই হিসাবে তিনি তাত্ত্বিক ছিলেন না, বলা যায়। কিন্তু জীবনে শোক, দুঃখ, সংশয়, নৈরাশ্য, আশা, আসক্তি প্রভৃতি অহং-এর অসংখ্য অতিকৃতির মধ্য দিয়াই অগ্রসর হইতে হইতে সহজ অভিজ্ঞতার দ্বারা সর্বানুভূ একটি অখণ্ড তত্ত্বের বিশ্বাসে তিনি যে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করা যুক্তিসংগত নহে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও ইহা অস্বীকার করেন নাই। (আত্মপরিচয়, পৃ. ২, ৬, ৭, ২৭, ৪৩)

প্রেম হইতেছে এই তত্ত্ব। প্রেম-ই বৃহত্তম আদর্শ। প্রেম ব্রহ্ম। প্রেম-ই ভূমা। প্রেম ছাড়া কবি অন্য কিছু দেখেন নাই, শোনেন নাই, জানেন নাই। রবীন্দ্রদর্শনেও রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রেমজিজ্ঞাসা-ই প্রধান কথা। প্রেম ও প্রেমজিজ্ঞাসা-ই রবীন্দ্ররচনাবলীর ঐক্যতত্ত্বের আশ্রয়। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যের অন্তরেই এই প্রেমবোধের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করিয়াছি। কবি স্বয়ং এ-কথা স্বীকার করিয়াছেন :

"খণ্ড কবিতাগুলিতে আমার সমগ্র কাব্যগ্রন্থের তাৎপর্য সম্পূর্ণ হয় নাই—সেই তাৎপর্যটি কী, তাহাও আমি পূর্বে জানিতাম না। এইরূপে পরিণাম না জানিয়া আমি একটির সহিত একটি কবিতা যোজনা করিয়া আসিয়াছি—তাহাদের প্রত্যেকের যে ক্ষুদ্র অর্থ কল্পনা করিয়াছিলাম, আজ সমগ্রের সাহায্যে নিশ্চয় বুঝিয়াছি, সে অর্থ অতিক্রম করিয়া একটি অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য তাহাদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছিল।" (আত্মপরিচয়, পৃ. ২)

এই "অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য" হইতেছে প্রেম। প্রেম-ই রূপে রূপে, শোকে দুঃখে, আশায় নৈরাশ্যে; ঘাতে প্রতিঘাতে, ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে, রবীন্দ্রকাব্যে বিকশিত হইয়া পরিশেষে একটি সমগ্রতার অখণ্ড মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। রবীন্দ্র-দর্শনের মর্মতত্ত্ব অর্থাৎ, এই প্রেমতত্ত্বের, তথা চলমান জীবনতত্ত্বের ক্রমবিকাশের বিচিত্র চিত্রকথা তাঁহার কাব্যে কি রূপায়িত হইতে দেখা যায় নাই ?

কাব্যপাঠের প্রয়োজনেই প্রেমতত্ত্ব জানিতে হইবে। ভারতীয় বা ইউরোপীয় দর্শনশাখার কোন তত্ত্বকথা নহে, কবির নিজস্ব এই প্রেমতত্ত্বের রূপ ও স্বরূপ জানিতে হইবে; অন্যথা তাঁহার কাব্যাবলীর রসোপলব্ধি অসম্ভব। রসের বিচারে এই তত্ত্ববোধ একান্তভাবেই প্রাসঙ্গিক।

'রবীন্দ্রনাথের মনোদর্শন' কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যের রসবিচার নহে। ঐতিহাসিক তথ্য-সংগ্রহের তালিকাও যে নহে, সে কথা বলাই বাহুল্য। ঐতিহাসিক ঘটনার কোন্ কোন্

পরিবেশে কোন্ কোন্ কাব্য তাঁহার রচিত হইয়াছিল;—বঙ্গবিভাগের সময় কোন্‌গুলি লেখা, যুদ্ধের সময় কোন্‌গুলির প্রকাশ; যুদ্ধের পরে কোন্ রচনাসমূহের আবির্ভাব—এ সমস্ত আলোচনার দায় বা দায়িত্ব আমি গ্রহণ করি নাই। যে জীবনতত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া রবীন্দ্রনাথের অমর কাব্যরাজির অতুলনীয় তাজমহল নির্মিত হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও দর্শনবাণীর সাহায্যে সেই জীবনতত্ত্বের আলোচনাই 'মনোদর্শনে' আমি করিয়াছি। আলোচনার ক্ষেত্রে, প্রয়োজনানুসারে কোথাও বিশ্লেষণপন্থা, কোথাও বা সংশ্লেষণপন্থা আমি অনুসরণ করিয়াছি।

বলাই বাহুল্য, বিশেষ কোন দর্শনের তর্কশাস্ত্রানুমোদিত তত্ত্বকথা 'মনোদর্শনে' খুঁজিতে গেলে পাঠককে নিরাশ হইতে হইবে। বলিয়া রাখা ভালো যে, মনোদর্শন বিশেষ একটি স্বতন্ত্র 'দর্শন' নহে—আবার একেবারে যে নহে, তাহা-ও বলিতে পারি না। ইহা কাব্যালোচনাও অবশ্য নহে, অথচ নহে বলিলে পাঠকদের মধ্যেই কেহ কেহ আপত্তিও বোধহয় তুলিতে পারেন। বস্তুতঃ ইহা দর্শনালোচনা, কি কাব্যালোচনা—স্পষ্টভাবে বলা কঠিন। এই আলোচনার রীতি ও পদ্ধতি পূর্বে কোথাও দেখি নাই বলিলে লেখক অবশ্যই লজ্জিত হইবেন না। রবীন্দ্রনাথ যেমন শুদ্ধমাত্র দার্শনিক নহেন, শুদ্ধমাত্র কবিও নহেন, পরন্তু 'কবি-দার্শনিক'—'মনোদর্শন'ও তেমনি কবির কাব্য-দর্শনের নবতর ভাষ্যরূপে গৃহীত হইতে পারে কিনা পণ্ডিতগণ বিচার করিবেন।

৭

রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও দর্শন সম্বন্ধে দেশে ও বিদেশে অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মনের তথা প্রেমের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া ইতঃপূর্বে কোন ভাষাতেই কোন গ্রন্থই রচিত হয় নাই। কবিগুরুর মনোদর্শনে যদি কেহ মুহূর্তের জন্যও মনোনিবেশ করিতেন, কবির মনোজগতের ক্রমবিকাশের বিচিত্র লীলানিচয়ের মধ্যে অখণ্ড 'একটি রূপমহিমার বিভূতি' তবে অবশ্যই দেখিতে পাইতেন। কবির কাব্যগুলির 'খণ্ড খণ্ড ভাবে আলোচনা' ও পর্যালোচনা অনেকেই করিয়াছেন;—যে-খণ্ডে যাঁহার মন, সেই খণ্ডেই কবিকে পূর্ণভাবে পাইয়াছেন বলিয়া ধারণা করিয়াছেন। কবির কাব্য-লীলাবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া বীণাপাণি বাণী যে অখণ্ড মানস-সত্যের আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারই তত্ত্বালোকে কবির সৃষ্টিসমূহ দর্শন করার দৃষ্টি এখনও 'লাভ' করি নাই বলিয়া আমাদের মধ্যে অনেকেই কবির বচনে পরস্পর-বিরোধী বহু ভাব এতকাল লক্ষ্য করিয়াছি। কবির কাব্যনিচয়ের সমগ্রতার ভাবব্যঞ্জনায় দার্শনিকের

যে-সর্বগত প্রেমমানস বিরাজ করিতেছে, সমগ্রতার রূপানন্দে অখণ্ড তাৎপর্যের যে-কল্যাণ-মহিমা প্রকাশিত রহিয়াছে, বিশিষ্ট একটি দর্শনবিশ্বাসের আনন্দময় যে-মহাধ্যান ধ্রুবতারার ন্যায় ধীর জ্যোতি বিকীরণ করিতেছে, এবং সর্বোপরি ঐক্যতত্ত্বের রসময় একটি বিশেষ মাহাত্ম্যের জীবনকান্ত যে-মহাবাণী অবারিত ছন্দোগতির লীলাচাপল্যের মধ্যেও অচপল স্তব্ধতায় প্রচ্ছন্ন হইয়া বিরাজ করিতেছে—তাহা আজ পর্যন্ত কেহই, দেশে বা বিদেশে, একবারও লক্ষ্য করিবার অবসর পান নাই।

কবিগুরু স্বয়ং একাধিকবার এই অখণ্ড তাৎপর্যের প্রতি তাঁহার সমালোচকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কাব্যাবলীর মধ্যে অখণ্ড সেই তাৎপর্য আছে কি না—তাহা লইয়া একবার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে মন্দ হয় না। তাঁহার বালক-বয়সের কবিতা হইতে শুরু করিয়া শেষ লেখা পর্যন্ত সমস্ত কবিতার অন্তরেই এই অখণ্ড তাৎপর্যের মাহাত্ম্য-সন্ধান শ্রমসাধ্য ব্যাপার হইলেও আনন্দ-বিরোধী শুষ্ক তত্ত্বব্যাপার মাত্র নহে।

দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ অখণ্ডের কথা, ঐক্যতত্ত্বের কথা, সামঞ্জস্যের কথা বহুবার বহু রচনায় ব্যক্ত করিয়াছেন। কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যাবলীর মধ্যেও যদি সেই একই বাণী ব্যাখ্যাত হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবে তাঁহার কাব্যাবলীর সমগ্রতার তাৎপর্যটি যেমন ধরা পড়ে, তাঁহার কবি ও দার্শনিকের তথাকথিত ভিন্নমুখী ব্যক্তিত্বের ঐক্যগত অখণ্ড-স্বরূপটিও তেমনি লক্ষ্যগোচর হয়। তখন দার্শনিককে বুঝিবার জন্য কবিকে আহ্বান করিতে পারি, কবিকে বুঝিবার জন্য 'দার্শনিকে'র তত্ত্বব্যাখ্যাও গ্রহণ করিতে পারি।

রবীন্দ্রনাথ আজ নয় বৎসর হইল ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তথাপি কবির জীবদ্দশায় তো নহেই, তাঁহার তিরোধানের পর এই নয় বৎসরের মধ্যেও তাঁহাকে সম্যক্‌ভাবে বুঝিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার কাব্য ও দর্শন সম্বন্ধে সমন্বয়ধর্মী কোন গভীর আলোচনা হইল না। জাতির পক্ষে ইহা খুব গৌরবের বা প্রশংসার কথা নহে। গতানুগতিক প্রাচীন সমালোচনার ধারা অনুসরণ করিয়া খণ্ড খণ্ড ভাবে কাব্য পড়ার আনন্দবোধ ও রসবোধকে আমি উপেক্ষা করি না, কিন্তু অখণ্ডকে না-দেখার ফলে যদি খণ্ড-দর্শনেও বিভ্রান্তি ঘটে, তবে তাহা রসিকতার বা মনস্বিতার পরিচায়ক হইবে না। আজ পর্যন্ত আমরা রচনায়, বক্তৃতায়, আলাপ-আলোচনায় কবির সৃষ্টি-নিচয়ের বৈচিত্র্য সম্পর্কে নানা উক্তি করিতেছি—পরস্পরবিরোধী বহু অভিমতের প্রয়োগে অপরোক্ষভাবে নানাপ্রকারে তাঁহাকে ভুল বুঝিতেছি; সেইজন্য তাঁহার দার্শনিক ঐক্যতত্ত্বের বিষয়ে আমাদের ধারণা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া গিয়াছে।

'বৈচিত্র্যের কবি রবীন্দ্রনাথ'—এই কারণে তাঁহার বহু কথা পরস্পরবিরোধী বহু দোষে দুষ্ট, এইরূপ ধারণা বিদগ্ধমণ্ডলেও আছে বলিয়া আমি জানি। তিনি বৈরাগ্যসাধনে

মুক্তি চাহেন না, আবার বহুক্ষেত্রে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের কথা বলেন; শ্রেয়ের কথা তাঁহার অনেক রচনায় পাওয়া যায়, অথচ প্রেয়ের পুলকে বহু কাব্য তাঁহার প্রোজ্জল; তিনি ব্রহ্মের অদ্বৈততত্ত্ব অবশ্যই স্বীকার করেন, কিন্তু দ্বৈতভাবও তাঁহার রচনায় প্রবলশক্তিতে প্রকাশ পায়; তিনি জীবনের আনন্দে অহরহ চঞ্চল, কিন্তু মৃত্যুর জয়গানেও রহেন স্বরোন্মাদ; প্রকৃতির আননে তিনি দেখিয়া থাকেন প্রেমের পুলকচ্ছবি, আবার 'ছলনাময়ী' বলিয়া 'মিথ্যা ও কুহক' বলিয়া গানও রচনা করেন অশান্ত আবেগে; বন্ধনের জয়গানে তিনি আনন্দোন্মাদ বলিলেও চলে, কিন্তু তাঁহারই লেখনী রচনা করিয়াছে অবারিত মুক্তির মর্মময়ী কল্পকথা। সমালোচকমহলে অনেককে তাই বলিতে শুনিয়াছি যে, বৈচিত্র্যই তাঁহার কাব্যকথার প্রাণস্পন্দন; এবং দর্শনের নামে তিনি যাহা যাহা রচিয়াছেন, তাহার মধ্যে 'লজিক্' নাই।

৮

বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত কোন দর্শনশাখার অনুসারক বা অনুকারক নহেন। 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে তিনি যে সমস্ত তত্ত্বকথা ও ধর্মকথার আলোচনা করিয়াছেন, সে-সমস্তের মধ্যে তাঁহার জীবনবাণী ও দর্শনবিশ্বাস অবশ্যই স্পষ্ট হইয়াছে, তথাপি 'শান্তিনিকেতনে'র তত্ত্বালোচনায় কিছু শেখা-কথা, পড়া-কথা বা শোনা কথার প্রভাব থাকিতে পারে বলিয়া কবি সন্দেহ করিয়াছেন। কবির এ-সন্দেহ একান্তভাবেই অমূলক ও ভিত্তিহীন; কেননা 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে এমন কথা তিনি কুত্রাপি বলেন নাই, যাহা তাঁহার জীবনগত সহজতত্ত্বের বিরোধী বলিয়া মনে হইতে পারে। তবে এ-স্থলে এ-কথা উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, লেখক স্পষ্টতঃই এই কথা বলিতে চাহেন, "পড়া-কথা বা শোনা-কথা নহে, পরন্তু জীবন হইতে অভিজ্ঞতালব্ধ তত্ত্বকথাই কবির ধর্ম ও দর্শনের প্রাণবস্তু।" এই কারণে তাঁহার স্বভাব হইতে সমুৎসারিত সহজ সাহিত্য-রচনার বৈচিত্র্য হইতেই তাঁহার দর্শনবাণী ও ধর্মবাণী উদ্ধারের তিনি পক্ষপাতী।

জীবনের সর্ববিধ সুখদুঃখ, আশানৈরাশ্য, দ্বন্দ্ব-শান্তি প্রভৃতি বিচিত্র বিরোধের মূলে একের আনন্দ ও মঙ্গলস্পর্শই কবি অহরহঃ অনুভব করিয়াছেন। কবি বলিয়াছেন :

"এই যে দ্বন্দ্ব—মৃত্যু এবং জীবন, শক্তি এবং প্রেম, স্বার্থ এবং কল্যাণ; এই যে বিপরীতের বিরোধ, মানুষের ধর্মবোধই যার সত্যকার সমাধান দেখতে পায়, —যে-সমাধান পরম শান্তি, পরম মঙ্গল, পরম এক, এর সম্বন্ধে বার বার আমি বলেছি। 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থ থেকে তার কিছু কিছু উদ্ধার করে দেখানো যেতে পারত। কিন্তু যেখানে আমি

স্পষ্টত ধর্মব্যাখ্যা করেছি, সেখানে আমি নিজের অন্তরতম কথা না বলতেও পারি—সেখানে বাইরের শোনা-কথা নিয়ে ব্যবহার করা অসম্ভব নয়। সাহিত্যরচনায় লেখকের প্রকৃতি নিজের অগোচরে নিজের পরিচয় দেয়—সেটা তাই অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ।”

(আত্মপরিচয়, পৃ. ৭০)

শোনা-কথা বা পড়া-কথার কিছু-না-কিছু প্রভাব জীবনে কোন-না-কোন উপায়ে থাকিবেই থাকিবে; কবি এই সত্যের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতেছেন মনে করিলে তাঁহার প্রতি অবিচারই করা হইবে। তাঁহার বক্তব্য এই যে, তাঁহার অন্তরতম কথা ও বিশ্বাস এবং সর্বোপরি তাঁহার সত্যকার প্রকৃতি তাঁহার স্বভাবজ সাহিত্যরচনাতেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে প্রকাশ পাইয়াছে। আপন স্বভাবের টানে তিনি যে-সমস্ত কাব্যকথা রচনা করিয়াছেন, সেই সমস্ত কাব্যকথার প্রাণস্পন্দন হইতেই তাঁহার জীবনদর্শন তাই আহরণ করা সমীচীন ও সঙ্গত। তবে যখন দেখিতে পাই যে, ‘শান্তিনিকেতনের’ তত্ত্ববাণীর সহিত তাঁহার সহজ কাব্যদর্শনের কোন বিরোধিতাই নাই, তখন ‘শান্তিনিকেতন’ শুধু নহে; পরন্তু তজ্জাতীয় অন্যান্য ধর্মদর্শনমূলক গ্রন্থাবলীকেও তাঁহার কাব্যদর্শনের ভাষ্যরূপে গ্রহণ করাকে অসঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারি না।

রবীন্দ্রনাথের দর্শন সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, রবীন্দ্রদর্শন হইল মনোদর্শন;—মনের বিবিধ বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া মনোগত সেই পরম একের রূপ দর্শন। এই একের নাম প্রেম, অথবা আনন্দ, অথবা ব্রহ্ম, কি না ব্রহ্মেশ্বর। এই একের জন্য নিত্য-গতিই মনোগত জীবনের পক্ষে পরম সত্য; এই কারণে রবীন্দ্রদর্শনে শান্তি অপেক্ষা গতিরই দেখিবেন প্রাধান্য।

বলাই বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের সাধনা মনের মধ্যেই সাধনা অর্থাৎ সবিশেষ সাধনা—মন ছাড়িয়া নির্বিশেষ সাধনা রবীন্দ্রনাথের নহে। মনের যে-সাতটি স্তরের কথা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, সেই সাতটি স্তরের প্রথমভাগের তিনটি স্তর রবীন্দ্রনাথ অতিক্রম করিতে চাহিয়াছেন. দ্বিতীয়ভাগের তিনটি স্তরে গতায়াত করিয়াছেন, কিন্তু সপ্তমস্তরে অর্থাৎ মন ছাড়িয়া নির্বিকল্প তুরীয় আনন্দে কখনই উত্তীর্ণ হইতে চাহেন নাই।

মনের মধ্যেই তাঁহার লীলা, তাঁহার ধর্ম, তাঁহার ব্রহ্মতত্ত্ব, তাঁহার প্রেমসাধনা, তাঁহার বিশ্বজীবনের আনন্দোপলব্ধি। মন আছে, তাই ‘অহং’ একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়াও হয় নাই; অহং আছে তাই কিছু না কিছু দ্বন্দ্বও আছে; উচ্চতম মনের সাধনা আছে, তাই অহংকে অতিক্রম করিবার উদ্যমও আছে; মনের নিম্নতলগত বৃত্তিগুলির বন্ধনত্যাগে বাসনা আছে, তাই রবীন্দ্রদর্শনে গতি আছে, বৈরাগ্য আছে।

কথাগুলি রবীন্দ্রকাব্যের গবেষকগণ ধীরচিত্তে একবার ভাবিয়া দেখিবেন। একটু তলাইয়া ভাবিলেই বুঝিবেন যে, মনোজীবনের দার্শনিক বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ ‘অহং’-কে যেমন অগ্রাহ্য করেন নাই, ‘অহং’-এ লিপ্ত হইয়া, আসক্ত হইয়া অহরহঃ পড়িয়া

থাকাকেও তেমনই ধর্ম মনে করেন নাই। চলাই তাঁহার দর্শনের বাণী। কোথা হইতে কোথায় চলা? অহং হইতে, অর্থাৎ মনের নিম্নগত স্তরগুলির সংকীর্ণ বন্ধন হইতে বিশ্বে, অর্থাৎ মনের ঊর্ধ্বগত স্তরগুলির ব্যাপকতর মুক্তির উদার ক্ষেত্রে, নিত্য-চলা। এই নিত্য-চলার আনন্দ-চিত্র 'কবিকাহিনী' হইতে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত নানান্ কাব্যে ক্রমশঃ কতই না স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়াছে!

৯

মনোজীবনে 'অহং' মায়া বা অসত্য বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না: মনোদর্শনে অহং-এর তাই একটি বিশেষ স্থান, বিশেষ মর্যাদা আছে।

রবীন্দ্রনাথ বলেন—অহং সত্য। আত্মপ্রেম সত্য।

"অহংকার না হোলে বিচ্ছেদ হয় না, বিচ্ছেদ না হোলে মিলন হয় না—মিলন না হোলে প্রেম অচরিতার্থ।" (শান্তিনিকেতন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৮)

"প্রেমের শতদল অহংকারের বৃন্ত আশ্রয় ক'রে আত্ম হ'তে গৃহে, গৃহ হ'তে সমাজে, সমাজ হ'তে দেশে, দেশ হ'তে মানবে, মানব হ'তে বিশ্বাত্মায় ও বিশ্বাত্মা হ'তে পরমাত্মায় একটি একটি ক'রে পাপড়ি খুলে দিয়ে বিকাশের লীলা সমাধান করছে।" (তদেব, পৃ. ১১৬)

তাৎপর্য এই: অহং-এর স্থূল অংশটুকু পড়িয়া থাকে, মরিয়া থাকে ('সোনার তরী' প্রথম কবিতা স্মরণীয়) কিন্তু সূক্ষ্ম অংশটির বৃন্ত-আশ্রয়েই প্রেমের শতদল ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া উঠে।

অহং হইতে ক্রমশঃ প্রেমের যখন বিকাশ হয়, তখন সেই প্রেমের আলোকে প্রকৃতি মায়া নহে, জগৎ মিথ্যা নহে, মানব কেবল আটপৌরে দৈনন্দিন জীবনের জীবমাত্র নহে। অহং-এর স্থূল অংশের প্রভাবে যখন প্রকৃতিকে দেখি, তখন জড়দৃষ্টির আচ্ছন্নতা থাকে চোখে; প্রকৃতিতে তখন বিরোধ, নানা অমঙ্গল, নানা দুঃখ, নানা মৃত্যুর অবারিত আক্রমণ। অহং-এর সূক্ষ্ম অংশের প্রভাবে যখন জগৎ ভোগ করিতে যাই—তখন কিছুকেই মিথ্যা বলি না বটে; কিন্তু কোন বিশেষেই 'আসক্ত' থাকা সম্ভব হয় না। আসক্ত হইয়া, অন্ধ হইয়া "মৃত্যুর গুপ্ত প্রেমে" পড়িয়া থাকার নাম 'স্থূল অহং'। এটা 'ছোট আমি' এটা 'self', এটা 'জীবমানবের' মনোবৃত্তি।···কিছুই মিথ্যা নহে, তবে কিছুতেই বন্দী থাকিতে পারি না, এই মনোভাব 'সূক্ষ্ম অহং'-এর। এটা-ই চলে 'বড়ো আমি'র পথে, soul-এর পথে, সর্বজগদ্গত প্রেমের পথে।

সূক্ষ্ম অহং-এরই আছে 'গতি'। এই গতি এক ছাড়িয়া আরে গতি, এইজন্য ইহার অপর নাম 'বৈরাগ্য'। বৈরাগ্য—রবীন্দ্রনাথের মতে 'বৃহতে অনুরাগ'। বৃহৎ কি?

ব্রহ্ম। মনকে সত্যের জ্ঞানালোকে, শিবের কর্মকর্তব্যে, আনন্দের সুরে সৌন্দর্যে পূর্ণ করেন যে ব্রহ্ম, সেই মানসব্রহ্ম। কী তাঁহার স্বরূপ? প্রেম। প্রেমকে পাইবার জন্য—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় প্রেম "হইবার" জন্য অহং-এর বৃহতে অনুরাগ। সে তুচ্ছ ছাড়িয়া উচ্চে, 'self' অতিক্রম করিয়া 'soul'-এ, 'অল্প' ছাড়িয়া 'ভূমা'য় অহরহঃ অগ্রসর হইতেছে।

এই অগ্রসর হওয়ার মনোবৃত্তির নাম 'সাধনার স্বভাব' (মানুষের ধর্ম, পৃ. ৩০)। এই স্বভাবে আছে শ্রেয়োবোধ (তদেব, পৃ. ৩১)। সহজ স্বভাবের মধ্য দিয়া, প্রেয় বাসনার মধ্য দিয়া, সাধনার স্বভাবে, শ্রেয়োবোধে মানুষের জীবন কখনও জ্ঞাতসারে, কখনও অজ্ঞাতসারে অগ্রসর হইতেছে।

জীবনের পথ চলিতে চলিতেই মানুষেব সাধনা। এই সাধনা কৃচ্ছ সাধনা নহে, সহজ ভাবে জীবনসাধনা। এই সাধনায় সন্ন্যাসী বৈদান্তিকদের বৈরাগ্যের কোন স্থান নাই। সন্ন্যাস-বৈরাগ্যসাধনে রবীন্দ্রনাথ মুক্তি চাহেন না। রবীন্দ্রনাথ যে-বৈরাগ্যের কথা বলেন, তাহা অনেক ক্ষেত্রে প্রেমেরই প্রতিশব্দ। বিষয়টি গ্রন্থমধ্যে আমি স্পষ্ট করিয়াই বুঝাইয়াছি। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের মধ্যে আছে বৈরাগ্য,—এইজন্য জগৎ বা প্রকৃতিকে মায়া না বলিয়াও 'অল্পে' মন দিতে তিনি পারেন নাই। তাঁহার বৈরাগ্যের মধ্যে আছে প্রেম,—এইজন্য ত্যাগ করিবার সত্যে বিশ্বাসী হইয়াও বৈদান্তিক নির্বিশেষত্বে আত্মসমর্পণ করিয়া বিশ্বত্যাগ করেন নাই। আসল কথা, মনের মধ্যেই তাঁহার লীলা বলিয়া অহং-এর প্রভাব তাঁহার মধ্য হইতে একেবারে লোপ পায় না, জগতের পথে, প্রকৃতির রূপে তিনি ফিরিয়া আসেন। গান করেন। প্রেম দেখেন। আবার উচ্চধামে মন যায় বলিয়া অহং ত্যাগ না হইলেও ত্যাগ করিবার উদ্যম তাঁহাকে আন্দোলিত করে, উচ্চজীবনের মহান্ স্বপ্ন তাঁহাকে ঘেরিয়া বসে। তত্ত্ব করেন। বৈরাগ্য দেখেন। রবীন্দ্রকল্পিত প্রেম ও বৈরাগ্যের বিষয়টি উপলব্ধ হইলেই বুঝা যায়, অহং সীমাবদ্ধ হইয়াও কেন আত্মা, প্রকৃতি সীমাময়ী হইয়াও কেন অসীমা, মানুষ জীববিশেষ হইয়াও কেন শিবমানব, মৃত্যু প্রাণাপহারী হইয়াও কেন 'শ্যামসুন্দর', জগৎ নানাত্বের রূপে রঙে প্রকাশিত রহিয়াও কেন অদ্বিতীয় এক ধ্রুবের আলোকে সমুজ্জ্বল!

এইভাবে রবীন্দ্রনাথের কবি ও দার্শনিককে যদি বিচার করা যায়, বুঝা যাইবে তাঁহার কবি ও দার্শনিক পরস্পর বিরোধী কথা কোথাও বলেন নাই। জীবনের পথে চলিতে চলিতে কবি যাহা জানিয়াছেন ও গাহিয়াছেন--দার্শনিক তাহাই একত্র করিয়া, ঝাড়িয়া বাছিয়া মনোগত বাস্তবসত্যের দর্শনরূপে প্রতিষ্ঠা দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে অর্থাৎ 'রবীন্দ্রনাথের কাব্যমানসে' এই বিষয়টি আমি প্রচুর তথ্য ও যুক্তির সাহায্যে স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের সূচনায় আছে অহং-এর প্রাবল্য। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, অহং ক্ষুদ্র বাসনার ও কাম-কামনার বন্ধনে কিছুতেই স্থির হইয়া

থাকিতে পারিতেছে না। **'কবিকাহিনী' হইতে 'মানসী'** পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের প্রেমবোধ অহং-এর বাসনায় চঞ্চল, কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হইল এই যে, অহং কেবলি বন্ধন কাটাইয়া উচ্চজীবনে উত্তীর্ণ হইবার জন্য সংগ্রাম করিতেছে। **'সোনার তরী' হইতে 'নৈবেদ্য'** পর্যন্ত অহং পাড়ি দিতেছে—মলিনা বাসনা হইতে শুদ্ধাবাসনায় ক্রমশই অগ্রসর হইতেছে। **'উৎসর্গ' হইতে 'বলাকা'** পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের প্রেমবোধ অন্তর-বাহির অত্যুজ্জ্বল আলোকে দীপ্যমান করিয়াছে। **'পলাতকা' হইতে 'পরিশেষ'** পর্যন্ত আত্মপ্রতিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ কখনও অতীত জীবনে, কখনও বর্তমান জীবনে, কখনও ভবিষ্যের জ্যোতির্ময় জীবনে অর্থাৎ, সর্বজগদ্‌গত আনন্দময় মনোজীবনে গতায়াত করিতেছেন। 'পরিশেষ'-ই রবীন্দ্রজীবন-কাব্যের 'উপসংহার' বলিয়া ধারণা করিয়াছি। ইহার পর **'পুনশ্চ' হইতে 'শেষলেখা'** পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যে সমস্ত কাব্য রচনা করিয়াছেন, সেগুলিকে আমি রবীন্দ্রজীবনকাব্যের পরিশিষ্টাংশরূপে দেখিয়াছি। এই অংশে রবীন্দ্রমনোজীবন আরো স্পষ্ট, আরো উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। দর্শনের বিচারে পরিশিষ্টাংশের মূল্য ও মর্যাদা অপরিসীম। শুরু হইতে পরিশেষ পর্যন্ত মনোজীবনেব ও জীবনবিশ্বাসের যে-বাণীচিত্র তিনি অঙ্কন করিয়াছেন, সেই জীবনই ভিন্নতর রূপ, রীতি ও ভঙ্গীতে পরিশিষ্টাংশের রচনাবলীতে প্রকাশিত হইয়াছে। ..রবীন্দ্রকাব্যজীবনকে পাঁচভাগে ভাগ করা হইল বটে; কিন্তু সকল ভাগের মধ্যেই আছে সেই সর্বজগদ্‌গত প্রেমের ক্রমবিকাশের চিত্ররূপ। এইটি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে—রবীন্দ্রকাব্যের অখণ্ড তাৎপর্য বা ঐক্যতত্ত্বের মূল কোথায়।

১০

'রবীন্দ্রনাথেব মনোদর্শন' দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডের নাম 'মনোদর্শন,' দ্বিতীয় খণ্ডের নাম 'কাব্যমানস'। 'মনোদর্শনে' রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন দর্শনরচনাবলীর আলোচনার দ্বারা তাঁহার মন ও দর্শনের স্বরূপ নির্ণয় করা হইয়াছে, 'কাব্যমানসে' তাঁহার কাব্যাবলীর ব্যাখ্যান ও বিশ্লেষণ দ্বারা তাঁহার মন ও জীবনদর্শনের ক্রমবিকাশের ধারাটি ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বিষয়গুলির আলোচনার সুবিধার জন্য 'মনোদর্শন' নামক খণ্ডটিকে আমি ছয়টি অধ্যায়ে ভাগ করিয়া লইয়াছি। অধ্যায়গুলির নাম— ১। তত্ত্বসন্ধানে, ২। মন, ৩। ব্রহ্ম, ৪। প্রেমধর্ম, ৫। প্রকৃতি, ৬। মানব। এই কয়েকটি অধ্যায়েই রবীন্দ্রনাথের দর্শন-বিশ্বাসের মর্ম যথাসাধ্য স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অধ্যায়গুলি পড়িতে পড়িতে পাঠকের মনে নানাপ্রকার তর্ক উঠিতেই পারে—বিরুদ্ধ মনোভাব জাগিতেই পারে।

কিন্তু একটু ধৈর্য ধরিয়া 'মনোদর্শন' হইতে 'কাব্যমানসে' তিনি যখন প্রবেশ করিবেন, এবং কাব্যালোচনাপ্রসঙ্গে সুযোগ ও সুবিধা মত যে-যে তত্ত্বের আমি ব্যাখ্যা করিয়াছি, অভিনিবেশসহকারে সেইগুলি যখন পাঠ করিবেন, আমার বিশ্বাস, সকলপ্রকার তর্ক ও সন্দেহের তখন অবসান ঘটিবে।

'মনোদর্শনের' অধ্যায়গুলির সারসংক্ষেপ প্রদান করিতেছি :

তত্ত্বসন্ধানে

কবি বিচিত্রের উপাসক, কিন্তু দার্শনিক একের। রবীন্দ্রনাথে এক-ও আছেন, বিচিত্র-ও আছেন। রবীন্দ্রনাথকে সম্যক্‌ভাবে বুঝিতে হইলে একের সত্যকে এবং বিচিত্রের আনন্দকে জানিতে হইবে, আস্বাদন করিতে হইবে। ইহার জন্য বোধবিস্তৃতির প্রয়োজন। কাব্য-পাঠে রস-ই আসল বটে, কিন্তু বোধ যাঁহার নাই, কাব্যপাঠ তাঁহার পক্ষে অসার্থক। এই বোধের উন্মেষের জন্য তত্ত্বালোচনার প্রয়োজন। রবীন্দ্রতত্ত্বের স্বরূপ তাই জানিতে হইবে। ইহা জানিলে রসোপলব্ধিরই সহায়তা হইবে।

মন

কবিমনের গতি ও পরিণতি, স্তর ও স্বরূপ নির্ণয়ে এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। 'মন' শব্দটি বৈদান্তিকদের 'মন' অর্থে ব্যবহার করিলে রবীন্দ্রনাথের মনটি বুঝা সহজ। 'অন্ন' নহে, 'প্রাণ-ও—নহে, আবার 'বিজ্ঞান'-ও নহে, নির্বিশেষ 'আনন্দ' তো নহেই—পরন্তু মধ্যগ এই 'মন'-সাধনায় রবীন্দ্রনাথের মন ব্যাপৃত। মনের নিম্নতলগত কাম-কামনায় তাঁহার মন নাই—মনের ঊর্ধ্বদেশগত সীমারেখা ত্যাগেও তাঁহার মন নাই। তিনি সংসারী নহেন, কিন্তু যে-সংসার নিত্য সরে, সেই সংসারের তিনি দ্রষ্টা, তিনি কবি। আবার সন্ন্যাসী তিনি নহেন, কিন্তু যে-সন্ন্যাস মুক্তির অভিপ্রায়ে মন-বিনাশের তত্ত্ব শিখায়, সেই সন্ন্যাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া মনে থাকিয়াই মনোমুক্তির (মনোবিকাশের?) তত্ত্বানুসন্ধান করেন, তিনি দার্শনিক। কবিদার্শনিকের মনসাধনায় তাই চাঞ্চল্যের শেষ নাই, গতির শেষ নাই, দ্বন্দ্বের ও সংগ্রামের অবধি নাই।

'মন' নামক অধ্যায়ে এই বিষয়টিই কবির গদ্য ও পদ্য রচনা হইতে বুঝানোর চেষ্টা হইয়াছে।

ব্রহ্ম

রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্ম রূপব্রহ্ম, প্রেমব্রহ্ম, মানসব্রহ্ম। রবীন্দ্রনাথকে বৈদান্তিক বলিতে আমি আপত্তি করি নাই—তবে তিনি কোন্ স্তরের বৈদান্তিক, তাহা বিচার না করিলে তাঁহার

ব্রহ্ম সম্পর্কে ধারণা অসম্পূর্ণই থাকিয়া যায়। এইজন্ম বেদান্তকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া রবীন্দ্রনাথকে কোন্ ভাগে স্থাপন করা সমীচীন তাহা লইয়া এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিয়াছি। বেদান্তের দুই ভাগ: 'বেদোপনিষদ্' ও 'বিজ্ঞানোপনিষদ্'। উপনিষদের যে যে অংশে রূপব্রহ্মের কথা আছে, তাহা বেদোপনিষদ্ এবং যে যে অংশে নির্বিশেষ ব্রহ্মের তত্ত্ব-ব্যাখ্যা আছে, তাহা বিজ্ঞানোপনিষদ্। রবীন্দ্রনাথ পূর্বোক্ত বেদোপনিষদেরই উপাসক—এই হিসাবে তাঁহাকে 'বৈদান্তিক' না বলিয়া 'বৈদিক' বলিলে, এবং তাঁহার ব্রহ্মকে 'বেদব্রহ্ম' বলিলে যথার্থ কথাই বলা হয় বলিয়া আমার বিশ্বাস। এই প্রসঙ্গে বেদমানসের তত্ত্বটি স্পষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে বেদ হইতে কিছু কিছু মন্ত্র ও স্তোত্র উদ্ধৃত করিয়া বেদব্রহ্মের স্বরূপ বুঝাইয়াছি। পাঠক দেখিবেন, রবীন্দ্র-মানস বেদমানসেরই তুলনীয় এবং তাঁহার ব্রহ্ম বেদব্রহ্মের মতই রূপে রূপে বহুরূপে বিকশিত, সর্বকে লইয়া একরূপেও আবার অধিষ্ঠিত। এই বেদব্রহ্ম বা মানসব্রহ্মের উপাসক বলিয়া অর্থাৎ, মনের অতীত বিজ্ঞানব্রহ্মে তাঁহার গতি নাই বলিয়া যোগিদার্শনিক না হইয়া রবীন্দ্রনাথ কবিদার্শনিক। এই বিষয়টি স্পষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে মেটারলিঙ্ক, গ্যেটে এবং শ্রীঅরবিন্দের কোন কোন উক্তি লইয়া এই অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি।

প্রেমধর্ম

কবিদার্শনিকের প্রেমব্রহ্ম ও প্রেমের ধর্ম ও স্বরূপ সম্বন্ধে এই অধ্যায়ে একটু বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রেম যে মনের অতীত তত্ত্ব নহে, তাহা বিশেষ ভাবেই বুঝাইয়াছি। প্রসঙ্গক্রমে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের নির্বিশেষ ব্রহ্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া রবীন্দ্রব্রহ্মকে স্পষ্টতর করিয়াছি। বৈদান্তিক 'চতুর্থ'তত্ত্ব, বৈষ্ণবদের 'প্রেমতত্ত্ব', মধ্যযুগীয় সাধুসন্তদের প্রেমদর্শন, বঙ্গীয় বাউলদের প্রেমবিশ্বাস, গ্রীসীয় মিস্টিকবর্গের প্রেমসম্বন্ধীয় ধারণা, ইংরেজী কবিদের প্রেমমানস—বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিয়া রবীন্দ্রপ্রেমের স্বরূপ নির্ণয়ের যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ 'ভূমা' বলিতে কী বুঝেন, ছান্দোগ্যোপনিষদ্ অনুসারে তাহা এই অধ্যায়ে স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এই অধ্যায়েই রবীন্দ্রনাথের 'মনোদর্শনের' একটি সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য প্রদান করিয়া দার্শনিক ও কবিমানসের অভিন্নতার ইঙ্গিত দিয়াছি।

প্রকৃতি

রবীন্দ্রপ্রকৃতির স্বরূপ জানিতে হইলে রবীন্দ্রনাথের প্রেমদর্শনের তত্ত্বই সম্যক্‌ভাবে জানিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের মতে প্রেমাশ্রিত প্রকৃতিই সত্য, প্রেমবিহীন প্রকৃতি মিথ্যা। প্রেমের দৃষ্টিতে কবি প্রকৃতিকে যতদিন দেখেন নাই, ততদিন প্রকৃতির রূপে

তিনি নৈরাশ্য ও বেদনা এবং নানা দ্বন্দ্ব অনুভব করিয়াছেন। প্রেমের দৃষ্টিতে প্রকৃতিকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির রূপে প্রকাশ পাইয়াছে অরূপের অপরূপতা। মনোবিকাশের এই ভাবটি 'প্রকৃতিতে' ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অহং হইতে আত্মায় অভিযাত্রার বাণীচিত্র প্রকৃতির রূপে ক্রমশঃ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়াছে। এই অধ্যায়ে রবীন্দ্রকল্পিত প্রকৃতিকে বুঝাইবার জন্য কালিদাস, ভবভূতি, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী, কীটস্, বিহারীলাল প্রভৃতি দেশী-বিদেশী কয়েকজন কবির প্রকৃতিতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছি। তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা রবীন্দ্র-প্রকৃতিবোধের স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকতা বিচার করিয়াছি। প্রকৃতি সম্বন্ধে দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের মতামতগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে বৈদেশিক মনীষিবর্গের প্রকৃতিসম্বন্ধীয় মতবাদেরও উল্লেখ করা হইয়াছে।

মানব

রবীন্দ্রকল্পিত 'মানব' কেমনতর, কী তাহার স্বরূপ, 'খণ্ড ক্ষুদ্র দোষত্রুটি বহুল' সংসারে কেন সে অবতরণ করে না, আবার সংসারকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াও কেন 'নিত্য সরিয়া চলার' তত্ত্বে সে বিশ্বাসী—এ-সকল কথার আলোচনা এই অধ্যায়ে করা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের শ্রেয়োবাদ ও বৈরাগ্যবাদ ব্যাখ্যা করিয়া দেখানো হইয়াছে—এই শ্রেয় বা বৈরাগ্যতত্ত্ব ধারণাতীত কোন সন্ন্যাসতত্ত্ব নহে,—তাহা মানবমনকে পূর্ণভাবে বিকশিত করার আনন্দতত্ত্ব। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথা ও কল্পনা 'বৃহত্তর বাস্তববাদের' ইঙ্গিত দেয় কি না—অথবা তাহা 'পলাতকমনোবৃত্তির' বা 'মিস্টিক' মনোবৃত্তির পরিচয় বহন করে কি না, বিচার করা হইয়াছে।

১১

'সুচনা' হইতে 'মানব' পর্যন্ত এই ছয়টি অধ্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা আছে বটে, কিন্তু মূল লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে 'মনের' তথা 'প্রেমের' ক্রমবিকাশের তত্ত্ববাণীই নানাভাবে আমি ব্যাখ্যা করিয়াছি। ছয়টি অধ্যায়েই মূলতঃ একটি তত্ত্ব অর্থাৎ মনোবিকাশের আনন্দতত্ত্বই ব্যাখ্যাত ও বিশ্লেষিত হইয়াছে। এই আনন্দতত্ত্ব অর্থাৎ প্রেমতত্ত্ব-ই রবীন্দ্রমানসের প্রধানতম জিজ্ঞাসা। দ্বিতীয় খণ্ডে এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি।

দ্বিতীয় খণ্ড অর্থাৎ, 'কাব্যমানস' একটি অধ্যায়েই সম্পূর্ণ। অধ্যায়টি সুদীর্ঘ। 'মনোদর্শনে' ছয়টি অধ্যায় লিখিতে যত পৃষ্ঠা লাগিয়াছে, কাব্যমানসের একটি অধ্যায়ে ততোধিক পৃষ্ঠা লইতে হইয়াছে।

'মনোদর্শন', বলিয়া রাখা ভালো, 'কাব্যমানসের'ই ভূমিকাস্বরূপ। 'মনোদর্শনে' কবির যে দর্শন-বিশ্বাস প্রকাশ পাইয়াছে, 'কাব্যমানসে' সেই বিশ্বাসই ক্রমশঃ বিকশিত হইয়াছে কিনা দেখাইয়াছি। বুঝাইয়াছি—রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বদর্শন কাব্যবিরোধী ও জীবনবিরোধী তো নহেই—বরং তাহা কাব্যমানস হইতে, তথা বাস্তবজীবনবোধ হইতে, সহজ আনন্দেই সমুদ্ভূত হইয়াছে।

কাব্যালোচনার প্রসঙ্গে কবির জীবনতত্ত্ববিশ্বাসের বহুবিধ বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছি। আপাতদৃষ্টিতে যে সমস্ত তত্ত্ব পরস্পরবিরোধী বলিয়া মনে হয়, সে সকল তত্ত্ব-বিষয়ের মধ্যেও যে ঐক্যতত্ত্ব আছে, তাহা বুঝানোর চেষ্টা হইয়াছে। রবীন্দ্রমনের ক্রম-বিকাশের আলোচনায় দুঃখবাদ, আনন্দবাদ, ভোগবাদ, মায়াবাদ, আদর্শ ও বৃহত্তর বাস্তব-বাদ প্রভৃতি বহুবিধ 'বাদের' বাদানুবাদে আমাকে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। বহুস্থলে প্রচলিত মত ত্যাগ করিয়া আমাকে নূতন কথা, নূতন মত প্রচার করিতে হইয়াছে। রবীন্দ্রকল্পিত মৃত্যুতত্ত্ব ও গতিতত্ত্ব লইয়া নানাস্থানে নানাভাবে নানাকথা আমি বলিয়াছি। পড়িতে পড়িতে মনে হইবে বুঝি-বা একই কথা বহুবার আমি বলিতেছি। বৃহৎ এই গ্রন্থে পুনরুক্তি ঘটা মোটেই অসম্ভব নহে। সকলপ্রকার বৈচিত্র্য ও বিরোধের মূলে একই দর্শনের তত্ত্ব বিশ্লেষণে ঘুরিয়া ফিরিয়া 'এক' কথা—সেই প্রেমের কথা, আসিতেই পারে। এই 'এক'-কথাকে যদি কেহ পুনরুক্তিদোষে দুষ্ট বলিয়া মনে করেন, তবে সেই দোষের প্রভাবেই রবীন্দ্রমানসের অখণ্ড তাৎপর্যটি দিনের আলোর ন্যায় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

'কাব্যমানসে' 'বলাকা' আলোচনাপ্রসঙ্গে 'মৃত্যু' সম্পর্কিত কথাগুলির প্রতি পাঠক-মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। রবীন্দ্রদর্শনে মৃত্যুতত্ত্ব না বুঝিলেই নয়। মৃত্যু যে প্রেমেরই একপ্রকার শক্তি—এই অধ্যায়ে তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে, আবার মৃত্যুই যে রবীন্দ্র 'গতি'-তত্ত্বের প্রাণবস্তু, এবং রবীন্দ্রগতি যে হেরাক্লিটাসের বা হেগেলের অথবা বের্গসঁ-র 'গতি' নহে পরন্তু শংকর-প্রোক্ত 'দেবযান গতির' আভাস আছে তাঁহার গতিতত্ত্বে —উপসংহারে তাহা স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে।

দুঃখ, বৈরাগ্য, মৃত্যু, গতি—প্রভৃতি যত বিচিত্র তত্ত্বেরই অবতারণা করি না কেন, সবার মূলে আছে প্রেম। প্রেম-ই বিচিত্রের মধ্যে এক, অহং-এর অন্তরে বিশ্ব। এইজন্য রবীন্দ্রকল্পিত প্রেমের স্বরূপদর্শনে সততই আমি সচেষ্ট থাকিয়াছি। আমার সুদৃঢ় ও সুচিন্তিত অভিমত, এই 'প্রেম' জানিলেই সকল সন্দেহের অবসান ঘটিবে। রবীন্দ্রনাথের প্রেমতত্ত্ব সম্যক্‌ভাবে জানা হয় নাই বলিয়াই রবীন্দ্রসম্পর্কে এতদিন আমরা বিস্তর ভুল ধারণা পোষণ করিয়াছি। 'প্রেমতত্ত্ব' সম্বন্ধে উদাসীন থাকার ফলেই কবি মোহিতলাল রবীন্দ্রনাথে

কোন ঐক্যতত্ত্ব দেখেন নাই; এই তত্ত্ব সম্পর্কে নিতান্ত গতানুগতিক ধারণার বশবর্তী হইয়াছেন বলিয়াই ড. রাধাকৃষ্ণন রবীন্দ্রনাথে শুদ্ধমাত্র ভাগবতধর্মিতা লক্ষ্য করিয়াছেন; এই তত্ত্বের অখণ্ড তাৎপর্য গ্রহণ করিতে চাহেন নাই বলিয়াই সাহিত্যিক প্রমথনাথ কবি ও দার্শনিকের মধ্যে পরস্পরবিরোধিতা অনুমান করিয়াছেন; এই তত্ত্ব বিষয়ে কথঞ্চিৎ উদাসীন আছেন বলিয়াই কবিশেখর, সিনক্লেয়ার, আনডারহিল প্রভৃতি চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কবিকে মিস্টিক বলিয়া ধারণা করিয়াছেন; এই তত্ত্ব সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন নহেন বলিয়া ড. সুবোধচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের কোন কোন রচনায় কর্মবিহীন অধ্যাত্মবাদ ও নৈরাশ্যবাদ লক্ষ্য করিয়াছেন।

(গীতিমাল্য ও পলাতকা আলোচনা দ্রঃ)

আসল কথা প্রেম। রবীন্দ্রকল্পিত প্রেমের স্বরূপ না জানিলে রবীন্দ্রপাঠ বৃথা। ইহাকে বিশুদ্ধ তত্ত্ব কথা বলিয়া উড়াইয়া দিবেন না। কবি বুদ্ধদেব প্রমুখ সমালোচকবৃন্দ রবীন্দ্র-প্রেমের অখণ্ড তাৎপর্য সম্বন্ধে যখন অবহিত হইবেন, তখন অন্য সব কবির কাব্যে না হউক, রবীন্দ্রকাব্যে তত্ত্ব আদর করিয়াই স্বীকার করিবেন।

'কাব্যমানসে' রবীন্দ্রনাথের কাব্যাবলী ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রেমতত্ত্ব সম্বন্ধেই বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে। সকল কার্যের মধ্যেই প্রেমের বিচিত্র গতি ও রূপ এবং সর্বোপরি ক্রমবিকাশের আনন্দটি ধরিবার প্রয়াস করিয়াছি। পাঠক লক্ষ্য করিবেন—'মনোদর্শনে' প্রতিপাদ্য প্রেম, কাব্যমানসে প্রতিপাদ্য প্রেম। 'মনোদর্শনে' যাহা 'মনের', 'ব্রহ্মের,' 'প্রকৃতির' ও 'মানবের' আলোচনা প্রসঙ্গে ইঙ্গিতে বুঝাইয়াছি, 'কাব্যমানসে' বিভিন্ন কাব্যের বিচিত্র বাণী তুলিয়া ও ব্যাখ্যা করিয়া তাহাই বিস্তার করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

আলোচ্য গ্রন্থে, বলাই বোধহয় বাহুল্য যে, কবির 'দর্শনমানসের' ও কাব্যদর্শনের স্বরূপ-সন্ধানই আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু দর্শন ও কাব্যাবলীতে যে সত্যটি প্রকাশিত হইয়াছে, কবির গল্পসাহিত্য ও উপন্যাসেও যে তাহাই অপেক্ষাকৃত বস্তুগতরূপে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বুঝাইয়া দিলে পাঠকসমীপে বোধ হয় রবীন্দ্ররচনাবলীর অখণ্ড তাৎপর্যটি সুস্পষ্টভাবেই উপস্থাপিত করা হয়। এই উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রেমতত্ত্বের দিক দিয়া কবির গল্প ও উপন্যাসসমূহের বিচার করিয়াছি। উপযুক্ত তথ্য যুক্তি ও ব্যাখ্যান দ্বারা সর্বত্রই আমি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, কবিগুরুর দর্শন, কাব্য ও নাট্য এবং গল্প ও উপন্যাস অখণ্ড এক জীবনতত্ত্বের বিচিত্র ও বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। কবির প্রেম, নাট্যকারের প্রেম, গাল্পিকের প্রেম, ঔপন্যাসিকের প্রেম, সর্বজীবনগত সেই দার্শনিক প্রেমজীবনেরই বিচিত্র বিভূতি। বিচিত্রের মধ্যে এক অর্থাৎ প্রেম-ই, রবীন্দ্রপ্রতিভার মূল প্রেরণা। এই একের স্বরূপটি সুস্পষ্টভাবে জানিবার ও জানাইবার অভিপ্রায়েই মনোদর্শনের অবতারণা।

রবীন্দ্রনাথ কবিই বটেন, কিন্তু তাঁহার মর্মমূলে একজন বিশ্বদ্রষ্টা দার্শনিকও আছেন, যিনি নানাত্বের মধ্যে একের অন্বেষণ করেন। এই একের দিকে টানটি আছে বলিয়া কিছুতে তিনি খুশী হন না—তিনি চলেন; মনের মধ্যেই এই একের অন্বেষণ বলিয়া অন্বেষণও তাঁহার শেষ হয় না—তিনি চলেন। রবীন্দ্রনাথের দর্শন পর্যালোচনাকালে গবেষকদের এই কথাটি মনে রাখিতেই হইবে যে, তাঁহার 'এক' মনোবিরোধী এক নহে। দার্শনিক রবীন্দ্রনাথকে মনের 'নিরুদ্ধ' ভূমির অতীতে তুলিতে গেলে অর্থাৎ "যেখানে তিনি থামেন নাই সেখানে তিনি থামিয়াছেন" (আত্মপরিচয়, পৃ. ৪১,) বলিয়া ধারণা করিলে, তাঁহাকে "অপদস্থ-ই" করা হয়।

মনোদর্শনের আলোকে রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠ করিবার প্রস্তাব তাই বিনীতভাবে আমি উত্থাপন করিতেছি।

১২

ভূমিকা দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে—কিন্তু বৃহৎ এই গ্রন্থের সকল কথা স্পষ্ট করিয়া পূর্বাহ্নেই বলিতে হইলে ভূমিকা কথঞ্চিৎ দীর্ঘই হইবে—এইরূপ বিবেচনা করিয়া সহৃদয় পাঠক ভূমিকার দৈর্ঘ্যাপরাধ অবশ্যই মার্জনা করিবেন। আমার প্রতিপাদ্য ও বক্তব্য বিষয়গুলির সমর্থনে যে-সমস্ত মনীষীর বাণী এই গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাঁহাদের নাম কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিয়া ভূমিকা শেষ করিতেছি। স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্তী, পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন, ড. মহেন্দ্রনাথ সরকার, অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. সুশীলকুমার মৈত্র, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীঅরবিন্দ, পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ, স্বর্গীয় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু মনীষীর বাণী হইতে আমি প্রভূত প্রেরণা লাভ করিয়াছি। বলাই বাহুল্য, অনেক বিখ্যাত লেখকের প্রচলিত অভিমতের বিরুদ্ধে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে বিস্তর কথা বলিতে হইয়াছে। কবিবর মোহিতলাল, সাহিত্যিক প্রমথনাথ, দার্শনিক রাধাকৃষ্ণন, সমালোচক উপেন্দ্রনাথ, ড. সুবোধচন্দ্র প্রভৃতি বহু বিখ্যাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমাকে লেখনী ধারণ করিতে হইয়াছে। তবে এ-কথা আমি অবশ্যই স্বীকার করিব যে, যাঁহাদের কথা আমি সমর্থন করিতে পারি নাই, অপরোক্ষভাবে তাঁহারাই আমাকে নানাকথা বলাইয়াছেন। মতের মিল হয় নাই বলিয়া তাঁহারা কিছুই নহেন—পরন্তু আমি-ই সত্য এবং সারকথা বলিতেছি, এমনতর নিন্দনীয় দম্ভী স্বভাবের লজ্জা হইতে সততই আমি দূরে থাকিয়াছি। বৃথা গর্জন যেমন লজ্জাকর, ঠিক কথা বলিবার শক্তি আছে মনে করিয়া আত্মম্ভরিতার অবারিত সিংহনাদও তেমনি লজ্জাকর। যাঁহাদের

সহিত আমার মতের মিল হয় নাই, তাঁহারা এক হিসাবে আমার শিক্ষক, কেননা তাঁহাদের রচনা হইতেই আমার মধ্যে তত্ত্বজিজ্ঞাসা জাগিয়াছে। এই অবস্থায় কোন অসংযত কথা বা নিন্দাবাদ এই গ্রন্থে অবশ্যই থাকিতে পারে না। উপরন্তু যে মহৎ বিষয় লইয়া আমি ব্যাপৃত আছি, তাহাতে সত্যানুসন্ধান ছাড়া ব্যক্তিগত কোন আত্মম্ভরিতার স্থান নাই বলিয়াই আমি জানি। এবিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' সমালোচনাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন বা উপদেশ দিয়াছেন, প্রতিমুহূর্তেই আমি তাহা স্মরণ করিয়াছি। বস্তুতঃ "যে আদর্শ হৃদয়ে স্থির রাখিয়া" এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছি "সেই আদর্শের দ্বারাই সমস্ত ভাষা ও ভাব অনুরণিত হইয়া উঠিলে তবেই সে আদর্শের মর্য্যাদা রক্ষা হয়। তুচ্ছ বিরোধ এবং অনুদার সমালোচনার অবতারণাপূর্বক চাঞ্চল্য প্রকাশ" করিলে "সেই চাঞ্চল্য······ আদর্শের নিত্য নির্বিকারতা দূর করিয়া ফেলে।" (আধুনিক সাহিত্য, পৃ. ৮০)

কবিগুরুর এই উপদেশ বর্ণে বর্ণে পালন সর্বশ্রেণীর লেখকবর্গেরই কর্তব্য বলিয়া আমি মনে করি।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

"সাধনামন্দির"
২৯।১১, নারায়ণ রায় রোড
বড়িষা ; কলিকাতা-৮
২৯শে মাঘ, ১৩৫৬।

প্রথম খণ্ড

মনোদর্শন

প্রেম : ঐক্যতত্ত্ব

"Facts occupy endless time and space ; but the truth comprehending them all has no dimension ; it is One. Whenever our heart touches the One, in the small or in the big, it finds the touch of the Infinite."

Creative Unity, p. 4

"সত্যের প্রথম উপক্রম সাজসজ্জার বহিরঙ্গে
বর্ণ বৈচিত্র্যে,
তারই আকর্ষণ অসংস্কৃত চিত্তকে করে অভিভূত
একদা উন্মুক্ত হয় সেই বহিরাচ্ছাদন,
তখনই প্রবুদ্ধ মনের কাছে
তার পূর্ণ বিকাশ।"

[চিত্রাঙ্গদা নাট্যের ভূমিকা, *
রচনাবলী, ২৫শ খণ্ড দ্রষ্টব্য।]

প্রথম অধ্যায়

তত্ত্বসন্ধানে

'তরবোঽপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।
স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি॥'

"তরুলতাও জীবনধারণ করে, পশুপক্ষীও জীবনধারণ করে; কিন্তু সে-ই প্রকৃতপক্ষে জীবিত, যে মনের দ্বারা জীবিত থাকে।···মনের জীবন মননক্রিয়া এবং সেই জীবনেই মনুষ্যত্ব।···মনের যে জীবন, শাস্ত্রে যাহাকে মনন বলিতেছে, তাহা মনকে এক করিয়া, তাহাকে তাহার সমস্ত তুচ্ছতা, সমস্ত অসম্বদ্ধতা হইতে উদ্ধার করিয়া খাড়া করিয়া গড়িয়া তোলে; সেই মনন দ্বারা ঐক্যপ্রাপ্ত মন বিচ্ছিন্নভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে না, সে মন বাহ্যপ্রবাহের মুখে জড়পুঞ্জের মতো ভাসিয়া যায় না।"

[রবীন্দ্ররচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড
পৃ. ৫০২—০৩]

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

তত্ত্বসন্ধানে

বেশ বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি, মন দেয়া-নেয়ার কথা কবিই কহিয়া থাকেন, এবং মন-দেখার কথা কহিয়া থাকেন দার্শনিক। মনকে ফুলের মত ছড়াইয়া, কুড়াইয়া, হেলা দিয়া বা আদর দিয়া, মাতাইয়া বা নিজে মাতিয়া জীবন-পথে চলে কবির মন; আবার ফুলগুলির ধূলা ঝাড়িয়া, ধুইয়া, মুছিয়া, গুছাইয়া, গাঁথিয়া, নিরাসক্ত একপ্রকার অখণ্ড মহিমার আনন্দ অনুভব করে দার্শনিক মন। মানুষের মনোজীবনে এই দ্বৈত অবশ্যই সত্য, কেননা অদ্বৈত ব্যক্তিত্বের মহৎ একটি তাৎপর্য এই দ্বৈতের মধ্যেই আবার নিহিত আছে।

কবির মন
ও
দার্শনিকের মন

মনের মধ্যে বিরাজ করে বিচিত্র মন, বিচিত্র মনের মধ্যে একমনার আনন্দ প্রশান্তি। খণ্ড, ক্ষুদ্র, বিচিত্র বিষয়ে মনের আসক্তি; আবার এ-কথাও সত্য, সমস্ত খণ্ডতা ও সমস্ত বৈচিত্র্যকে ঐক্যদান করিয়া অখণ্ড এক পূর্ণানন্দ আস্বাদনেও মনের অনুরক্তি।

প্রত্যক্ষগোচর সৃষ্টি লইয়া আমরা বিচার করি, আমাদের জৈবচৈতন্যের উপর প্রত্যক্ষানুভূতির যতটুকু প্রতিফলন ঘটে, ততটুকুর অধিকার ও অহংকার লইয়াই আমরা আছি বলিয়া প্রমাণ করি। কিন্তু যোগ-জীবনে শুধু নয়, মনোজীবনেও 'অপরোক্ষানুভূতি' বলিয়া একটি পদার্থ আছে, যাহা প্রমাণের অগোচর বটে, কিন্তু অন্তরীক্ষ হইতে তাহা আপনার কাজ আপনিই করিয়া যায়। সৃষ্টির অজস্রতার মূলে ইহা প্রাণচেতনার অমৃত সিঞ্চন করে, বহুবিধ সৃষ্টির একত্র সমাহারের মুখে অখণ্ড মহিমার একটি লাবণ্যও মাখাইয়া রাখে। ইহার অস্তিত্বে অবিশ্বাস আনিতে পারি, কিন্তু ইহা ছিল, আছে এবং থাকিবে। বোধ যাহার নাই, এ-সম্বন্ধে তাহাকে বুঝাইয়া বলা সুসাধ্য নহে, কিন্তু এই বোধ বস্তু-অবচ্ছিন্ন কোন তত্ত্বমাত্র নহে বলিয়া ঘোরতর অবিশ্বাসীও একদা ইহার চেতনায় শান্ত হইবে, স্তব্ধ হইবে। বৃক্ষের ফুল ও ফল লইয়া বালকবালিকার দল বসন্ত-উৎসবে যখন কাননে-কাননে গান গাহিয়া ফেরে, বৃক্ষের অন্তরাত্মা অধিদেবতা তখন ক্ষিতিঅপ্‌তেজমরুৎ হইতে রূপরসবর্ণগন্ধের প্রাণসাধনা লইয়াই শুধু স্তব্ধ রহে না, উদার অনন্ত ব্যোমপথ হইতে কখন কি ভাবে, কী বিচিত্র জ্যোতিপ্রবাহ, কে যেন তাহার মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিবে—তাহারই একটি আত্মহারা প্রতীক্ষায় ধ্যানগম্ভীর সে স্তব্ধ হইয়া রহে। অসীম আকাশপথের উড্ডীয়মান মুক্ত কোন বিহঙ্গমা হয়তো কোন দিন তাহার শিরশ্চূড়ায় উপবেশন করিয়া আকাশবাণীর কোন দুরধিগম্য একের ইঙ্গিত সঙ্গীতে সঙ্গীতে দান করিয়া যায়, তন্দ্রা অঙ্গে শিহরিত সেই

বৃক্ষদেবতা নীলাভ সূর্যের রশ্মি-প্রসন্নতায় তখন দৃষ্টি দান করিয়া শ্যামশান্ত সহস্র কুসুমে নূতন করিয়া আবার রোমাঞ্চিত হইতে থাকে।

প্রত্যক্ষাবেগের বৈচিত্র্য লইয়াই কবিশিল্পীর কারবার, কিন্তু কবির মধ্যে যিনি কবি, প্রত্যক্ষ হইতে অপ্রত্যক্ষে, বহু হইতে একের সান্ত্বনায়, রূপ হইতে অরূপের ঔদার্যে, জানা হইতে অজানার অতলে অবতরণ তাঁহাকে করিতেই হয়। ইহা তাঁহার চেষ্টাকৃত যত্নসাধ্য ব্যাপার নহে, ইহা তাঁহার স্বভাব। এই স্বভাবের মহিমা যাঁহারা কল্পনাতেও আনিতে পারেন না, তাঁহারাই ইহাকে তত্ত্ব বলিয়া শিহরিয়া উঠেন। সাধারণ জীবনে ইহাকে শ্রেয় বলিয়া দূরগত মনে হইতে পারে, কিন্তু অনেকের জীবনে ইহা 'প্রেয়'-র মতই সহজ এবং স্বাভাবিক। বস্তু-নিরপেক্ষ কোন তত্ত্ব ইহা নহে, আব যদি তত্ত্বই ইহাকে বলিতে হয়, ইহা এমন তত্ত্ব, যাহা শিল্পবস্তুর সহিত, দেহের সঙ্গে আত্মাব ন্যায়, ওতঃপ্রোতভাবে মিশিয়া আছে।

প্রত্যক্ষের আবেগ ও অপ্রত্যক্ষের অনুসন্ধান

রবীন্দ্রনাথ এই তত্ত্বকে জানেন। 'উৎসর্গের' একটি খণ্ড কবিতার মধ্যে এই তত্ত্বের কথা ইঙ্গিতে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে সীমা ও অসীম, রূপ ও অরূপ, বস্তু ও ভাব, রস ও তত্ত্ব—ইহাদেব মধ্যে বাস্তবিক কোন বিরোধিতা নাই। আত্মস্ফূর্তি ও বিস্তৃতির জন্য ইহারা পরস্পর আলিঙ্গিত হইতেছে। এক অপরের বিহনে অসম্পূর্ণ শুধু নহে, অসার্থকও বটে।

ধূপ আপনাবে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
　　গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
　　ছন্দ ফিবিয়া ছুটে যেতে চায় সুবে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝাবে অঙ্গ,
　　রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝাবে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
　　সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।[১]

আমাদের শাস্ত্র বলে, লীলা হইতে নিত্য, নিত্য হইতে লীলা, এই হইল তত্ত্বদর্শন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যদর্শনে দেখি, খণ্ড ক্ষুদ্র সৃষ্টি ইঙ্গিত দিতেছে স্রষ্টার, আবার স্রষ্টা আত্মপ্রকাশ করিতেছে সৃষ্টির বিচিত্র ও বিভিন্ন খণ্ডমহিমায়। রবীন্দ্রনাথ নিজেব জীবনদর্শন পর্যালোচনা করিয়াও বলিতেছেন—'বিচিত্রের নর্মবাঁশি'-তে নানা সুব নানাভাবে তিনি বাজাইয়াছেন সত্য, কিন্তু সমস্ত সুবের অন্তরালে কে যেন এক সুরকার বিশ্বসুরের প্রাণ হইয়া বসিয়া আছেন।

শাস্ত্রীয় দর্শন ও রবীন্দ্রকাব্যদর্শন

১ সঞ্চয়িতা, পৃ. ৩৮০

"যেখানে বীণা শুধু বীণা, সে বস্তু মাত্র, কিন্তু যেখানে বীণায় সংগীত ওঠে, সেখানে বীণার পিছনে আমাদের ওস্তাদজী আছেন। সেই ওস্তাদজীর আনন্দই গানের ভিতর দিয়ে আমাদের আনন্দ দেয়। সৃষ্টির বীণা তো ওস্তাদজী বাজিয়ে চলেছেন। কিন্তু আমাদের চিত্তবীণায়ও যদি সুর না বাজে তাহ'লে আমাদের হৃদয়বীণার ওস্তাদজীকে চিনবো কী করে—তাঁর আনন্দরূপ দেখব কী করে? আমাদের জীবনের মধ্যে যখন সংগীত বাজে তখন নিজেকে ভুলে যাই। আমাদের জীবনযন্ত্রের ওস্তাদজীকেই দেখতে পাই।"[১]

অন্যত্র—

"জীবনটা যে গঠিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার সমস্ত সুখদুঃখ তাহার সমস্ত যোগ-বিয়োগের বিচ্ছিন্নতাকে কে একজন একটি অখণ্ড তাৎপর্যের মধ্যে গাঁথিয়া তুলিতেছেন। সকল সময়ে আমি তাঁহার আনুকূল্য করিতেছি কি না জানি না, কিন্তু আমার সমস্ত বাধাবিপত্তিকেও আমার সমস্ত ভাঙাচোরাকেও তিনি নিয়তই গাঁথিয়া জুড়িয়া দাঁড় করাইতেছেন। কেবল তাই নয়—আমার স্বার্থ, আমার প্রবৃত্তি—আমার জীবনকে যে অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতেছে, তিনি বারে বারে সে সীমা ছিন্ন করিয়া দিতেছেন; তিনি সুগভীর বেদনার দ্বারা, বিচ্ছেদের দ্বারা, বিপুলের সহিত বিরাটের সহিত যুক্ত করিয়া দিতেছেন।"[২]

"এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি 'জীবনদেবতা' নাম দিয়াছি। তিনি যে কেবল আমার এই ইহজীবনের সমস্ত খণ্ডতাকে ঐক্যদান করিয়া বিশ্বের সহিত তাহার সামঞ্জস্য স্থাপন করিতেছেন আমি তাহা মনে করি না। আমি জানি, অনাদি কাল হইতে বিচিত্র বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন; সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্বধারার বৃহৎ স্মৃতি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে।"[৩]

এই যে 'কবি', এই যে 'ওস্তাদজী', এই যে 'জীবনদেবতা'—কবির অন্তরে ইনিই দার্শনিক। সমস্ত সুখদুঃখ, সমস্ত যোগবিয়োগের বিচ্ছিন্নতা ও সমস্ত খণ্ডতাকে ঐক্যদান করিয়া পূর্ণ একটি জীবনের প্রতিষ্ঠা দেখাই ইহার কার্য। বৈচিত্র্যধর্মী কবির মর্মদেশে ঐক্যধর্মী এই দার্শনিকটিকে দেখিয়া রসতত্ত্বের একটি নিবিড় সত্য আমি উপলব্ধি করিয়াছি। বুঝিয়াছি—তাত্ত্বিক পুরুষটি

বৈচিত্র্যধর্মী কবি ও ঐক্যধর্মী দার্শনিক

১ রবীন্দ্রসংগীত, শান্তিদেব ঘোষ, ৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত ছাত্রদের প্রতি কবির উপদেশ।
২ চিত্রা, নূতন সং, পৃ. ১৪৮—৪৯
৩ আত্মপরিচয়, পৃ. ৭—৮

যথার্থ রসিক বলিয়াই কোন রূপকেই অস্বীকার করেন নাই, আবার কোন রূপকেই একান্ত বলিয়া—তাহাতেই আসক্ত হইয়া—'রূপকানা'র[১] মত বিশ্বরূপ ভুলিতে বসেন নাই। ইঁহাকে দেখিলেই বুঝা যায়, রূপবিশেষে আসক্ত হওয়া রসিকের কাজ নহে। খণ্ডবিশেষে, ভাববিশেষে, স্বপ্ন বা চিন্তাবিশেষে যিনি আসক্ত, সৃষ্টি তাঁহার সংকীর্ণ, বোধ তাঁহার সীমাবদ্ধ। রসজ্ঞকে তাই অনাসক্ত ঐক্যতত্ত্বের জ্যোতির্ময় দৃষ্টির আলোকে জগৎ দর্শন করিতে হয়। বলিতে হয়, বসুন্ধরা, বিচিত্র তোমার রূপচিত্রে বিচিত্র আনন্দ আমি অনুভব করি, কিন্তু মধুমত্ত মধুকরের মত কোথাও কোন রূপে বা চিত্রে বুঁদ হইয়া বিশ্ব ভোলা আমার স্বভাব নহে। এই নদী, এই সাগর, এই ভূধর-অরণ্য-প্রান্তর, এই বৃক্ষ, এই তৃণ, এই লতা, লতা-গুল্ম, ওই আকাশ, আকাশের চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্র সমস্ত, সমস্ত আমি প্রাণ ভরিয়া ভালবাসি; এত ভালবাসি যে, সমস্ত রূপ ও রসানন্দ একত্র করিয়া একান্তে আত্মস্থ করিলে যেন তৃপ্তি পাই। কিন্তু তাহাতেই কি সত্যকারের তৃপ্তি? কোথায় সে প্রাণকেন্দ্র যেখান হইতে অবারিত এই রূপস্রোত অহরহঃ প্রবাহিত হইতেছে? রূপ দেখিয়া, রঙ দেখিয়া, রূপে রূপে অগাধ রঙের লীলা দেখিয়া ইচ্ছা হয় আমি সেইখানে যাই—

যেথা হতে অহরহ
অঙ্কুরিছে মুকুলিছে মুঞ্জরিছে প্রাণ
শতেক সহস্র রূপে, গুঞ্জরিছে গান
শতলক্ষ সুরে, উচ্ছ্বাসি' উঠিছে নৃত্য
অসংখ্য ভঙ্গীতে, প্রবাহি' যেতেছে চিত্ত
ভাবস্রোতে, ছিদ্রে ছিদ্রে বাজিতেছে বেণু[২]—

'মূলের' এই বোধ, এই বোধানন্দ যাঁহার মধ্যে বিভাসিত হইয়াছে, রূপমুগ্ধ হইয়াও রূপবিশেষে তিনি আসক্ত নহেন, পরন্তু 'রূপে রূপে প্রতিরূপে' রূপাতীত মহিমার রসানন্দও আস্বাদন করেন। 'বীণার পিছনে যে ওস্তাদজী' আছেন, তাঁহাকে জানিলেই বুঝিতে পারি খণ্ডবোধ বা মনের বন্ধন থাকিলে রসানন্দ পূর্ণতা পায় না। চিত্তে যখন বন্ধন থাকে, তখন বন্দী বোধ যাহাকে চায়, তাহাকেই শুধু চায়, তাহাকেই কেবল সত্য ও সুন্দর বলিয়া মনে করে। তত্ত্ব সম্পর্কেও এ-কথা প্রযোজ্য। বিশেষ কোন তত্ত্বের বন্ধন যাহার আছে, তত্ত্বাশ্রিত সত্য ছাড়া আর কিছুতেই তাহার মন ভরে না। বিশেষ কোন দর্শনতত্ত্বের যে তাত্ত্বিক 'বিশেষত্বের' বেড়াজালেই সে বন্দী, একপদ অগ্রসর হইবার উপায় তাহার নাই। রবীন্দ্রনাথ

দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য

১ মানুষের ধর্ম, পৃ. ৫৩

২ বসুন্ধরা, সোনার তরী

বিশেষ কোন তত্ত্বের তাত্ত্বিক নহেন, অথচ সর্বতত্ত্বের নির্মল মহিমাটুকু তাঁহার মানসলোকে সুর্যসুন্দরের শুভ্রতা বিস্তার করিয়াছে। কোন তত্ত্বে তাঁহার আসক্তি নাই কিন্তু সহজভাবে পূর্ণতত্ত্বের মনোময় বোধানন্দ তাঁহাকে অলৌকিক এক ধ্যানসাধনায় উদ্দীপ্ত করিয়াছে।

কবিগুরুর বোধানন্দী এই দার্শনিকটিকে—সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার তত্ত্বমানসের স্বরূপ ও প্রকৃতিকে জানিতে পারিলে রসোপলব্ধির পথই প্রশস্ত হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। তত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের পূর্ব সংস্কার দূরে রাখিয়া রবীন্দ্রতত্ত্বমানসে অবগাহন করিলে, ভয় নাই, কাব্যের কোন ক্ষতি হইবে না, বরং কবিতা-পাঠকের রসবোধ বিস্তৃত হইবে, মনের বন্ধনগুলি একে একে খুলিয়া যাইবে। রবীন্দ্রতত্ত্ব-দর্শন বোধ-বিস্তৃতির বিজ্ঞান মাত্র, রসের মতই তাহা বোধবিষয়।

বোধ-বিস্তৃতির বিজ্ঞান

কিন্তু না, তর্ক উঠিতেছে। কবিশেখর বলিতেছেন 'রসানন্দ অপেক্ষা বোধানন্দ কাব্যের পক্ষে কখনই বড় কথা নয়'।[১] বিনয় সহকারে কবিশেখরের উক্তির সত্যতা ও তাৎপর্য স্বীকার করিয়াও আমি জিজ্ঞাসা করি—নির্বোধ বা বোধবিহীন চিত্তে রসসম্ভোগ কি সম্ভব? রসানন্দে কাহার অধিকার জন্মে? বোধই যাহার নাই রসোপলব্ধি তাহার কেমন করিয়া হইতে পারে? শিশুবোধে কি 'মানসী' বা 'মহুয়া'-র রসোপলব্ধি সম্ভব? বালক-বোধের স্থূলত্বে যে বন্দী, 'চিত্রা' বা 'খেয়া'-র রূপমন্দিরে সে যাইবে কেমন করিয়া? রাগবিশেষে বা রূপবিশেষে যাহারা আসক্ত, 'গীতিমাল্য' বা 'গীতাঞ্জলির' গভীর বাণী কি তাহারা গ্রহণ করিবে? জ্যোতির্ময় দিব্যজীবনবোধে যাহার অধিকার নাই কিংবা যৌবনাবেগের ছন্দচঞ্চল প্রাণচ্ছটায় যাহার প্রাণ জাগে না, 'নৈবেদ্য' বা 'বলাকা' কি তাহার নিকট রসোত্তীর্ণ কাব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে? পদ্য ছন্দের বন্ধনমাহাত্ম্যেই যাহারা কবিতার কিঙ্কিণিনিক্কণ আস্বাদন করিতে অভ্যস্ত ও উদ্যত, 'পুনশ্চ' বা 'শ্যামলী'র কাব্যোৎকর্ষের অভিনবত্ব তাহারা কি করিয়া অনুভব করিবে?

বোধের বন্ধন রসানন্দের অন্তরায়। রসানন্দ বোধানন্দের অপেক্ষা রাখে—স্থিরচিত্তে এ-কথা আজ মানিয়া লইতেই হইবে। রসানন্দের আবেগে আমরা কাব্য পাঠ করি, এ-কথা সত্য, কিন্তু আমাদেরি অজ্ঞাতসারে বোধানন্দ থাকিয়া যায় বলিয়া রসোপলব্ধি সম্ভব হয়।

বোধানন্দ ও রসানন্দ

জীবনের যে যে অংশে যে বিষয়ে আমাদের বোধ নাই, সেই বিষয়ের স্বপ্নাবেগটিকে কবি যদি কোন কাব্যে মূর্তি দান করেন, আমাদের তাহা রসানন্দ উন্মেষে সহায়তা করে না। জীবন বোধের বহু বৈচিত্র্য আছে, তাহার বিচিত্র প্রকৃতির নিম্ন হইতে উচ্চ মার্গ পর্যন্ত বহু রূপ, বহু স্তর আছে। স্তরে স্তরে ধাপে ধাপে বিভিন্ন সোপানাবলী পার হইয়া জীবনের পূর্ণতায় উপনীত হইবার ধারাকে তত্ত্ব বলিতে হয় বলুন, না বলিতে হয় না বলুন, কিন্তু রবীন্দ্রজীবনে ইহা সহজ সুন্দর প্রত্যক্ষানুভূতির ন্যায় সত্য এবং সুস্পষ্ট।

১ কালিদাস রায় লিখিত "রবীন্দ্রকাব্য বিচারের ভূমিকা", সমসাময়িক কবির চোখে রবীন্দ্রনাথ, পৃ. ৬৪

অহং-বোধ হইতে রবীন্দ্রনাথ আত্মবোধের উচ্চ সীমায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার শিল্পসৃষ্টির মূলে উচ্চতম এই জীবনবোধ-ই লীলা করিয়াছে। এই জীবনবোধকে বাদ দিয়া রসানন্দের যাঁহারা পক্ষপাতী, রবীন্দ্রকাব্য হইতে তাঁহারা নিজেদের মনগড়া, মনে-ধরা একটা বিষয় বা ব্যাপার কল্পনা করিয়া হয়তো আনন্দ পাইবেন, কিন্তু 'মানসী'-স্তরে যাহাদের বোধ নিহিত, সেই সমস্ত বালকমনাদের যদি কেহ 'সোনার তরী'-তে তত্ত্ব আছে বলিয়া অথবা 'নৈবেদ্য'-তে কাব্য নাই বলিয়া দূরে সরিয়া পড়ে, স্পষ্টই অনুভব করিব 'তরী'-র মহিমোপলব্ধির জন্য অথবা 'নৈবেদ্য'র রসোপলব্ধির জন্য যে-বোধের প্রয়োজন, বালকদের তাহা নাই। 'হে অতনু, বীরের তনুতে লহ তনু'—একদা আবৃত্তি করিতেছিলাম। আমার ষষ্ঠবর্ষীয়া কন্যা সহসা আমার মুখে হাত চাপা দিয়া আমাকে থামাইয়া দিয়াছিল। 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর'—আবৃত্তি করিলে শিশুস্বরবোধের বিচিত্র আনন্দে নিশ্চয়ই সে করতালি দিয়া নৃত্য করিত।

বলিতেছি, বোধানন্দ অপরোক্ষানুভূতির মত রসজ্ঞের অজ্ঞাতসারেই রসানন্দের প্রাণসঞ্চার করে। এই বোধানন্দের অধিদেবতাটির নাম দার্শনিক। ইহার মনোদর্শন রসসম্ভোগের অন্তরায় নহে।

একটি অপরটির অন্তরায় নহে

যে কোনো রসোত্তীর্ণ মহৎ কাব্যকে বিচার ও বিশ্লেষণ করিলেই এই কথার সত্যতা উপলব্ধ হইবে। বলিতেছেন, রস-ই কাব্যের আত্মা, কাব্যের আসল। অস্বীকার করি না। কিন্তু আরো বলুন, রস কাব্যের কোন্ স্থলে আছে? শব্দে আছে? বাক্যে আছে? বাক্যসমষ্টিতে আছে? বাক্যার্থে আছে? ছন্দে আছে? ছন্দ-ঝঙ্কারে আছে? অথবা সমগ্রকে মিলাইয়া, অর্থাৎ শব্দ, বাক্য, বাক্যার্থ, ছন্দ, ছন্দ-ঝঙ্কার প্রভৃতির অখণ্ড সমাবেশে আছে? সমগ্রতার সুরে বা ভাবে আচম্বিতে আবির্ভূত চকিত কোনো চিন্তাবেগের অনির্বচনীয় প্রসন্নতায় আছে—যা বাক্য বা ছন্দাদিতে মেলে না? কাব্যের যা' ধ্বনি, যা' ব্যঞ্জনা, যা' রস, তা' পদে নাই, পদার্থে নাই, বাচ্যে নাই, বাচ্যার্থে নাই—তবে আছে কোথায়? কাব্যের আত্মা বা রসকে আস্বাদন করি কাহার দ্বারা বা কিসের দ্বারা? হৃদয়ের ভাবে যা' সুপ্ত, অনুভাব-বিভাবাদির দ্বারা যা জাগ্রৎ না হইলেই নয়—তাহার দ্বারা। তা' হইলে ভাব অথবা ভাবেরও অন্তর্নিহিত কোনো অনির্বচনীয় সত্তা আছে, যা' না থাকিলে অনুভাব বিভাবাদির কথা অর্থহীন। কাব্যে যে রস আছে, এটা বুঝি—হৃদয়ে ভাব আছে বলিয়াই। ভাববিহীন চিত্তে রস নিস্তরঙ্গ, সুতরাং কাব্য নিষ্ফল।

বোধানন্দের সন্ধানে

নূতন কথা আমি বলিতেছি না, আমি বলিতেছি কাব্যের রসোত্তীর্ণতা মানবচিত্তের বোধ বা ভাবের অধীন। এই ভাব, আলংকারিকগণ বলিতেছেন, নয় প্রকার,—কেহ কেহ বলিতেছেন, দশ প্রকার; কেহ কেহ আবার: তেত্রিশ প্রকার। আবার কোনো কোনো পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে মৌখিক আলোচনার সময় শুনিয়াছি—ভাব নাকি তিনশো তেষট্টি

প্রকার। যত প্রকারেরই হউক, মনীষী আলংকারিকগণই তাহা লইয়া বিচার করিবেন, বর্তমানে আমার তাহা বিচার্য নহে। আমি কেবল বলিতে চাহিতেছি—এই সকল ভাব পাওয়া গেল কোথা হইতে?

জন লক্ ইহার উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছেন: বলিয়াছেন—ও-গুলি জাগতিক নানান্ অভিজ্ঞতা হইতে পাওয়া গিয়াছে। দার্শনিক মহোদয়ের অনুমান এই, আমরা যখন জন্মগ্রহণ করি, তখন আমাদের চিন্তা থাকে ঠিক যেন একখানি সাদা কাগজের মতো, কিছুই তাহাতে থাকে না লেখা। তাহার পর যত দিন যায়, বাহিরের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পৃথিবীর রূপরসবর্ণগন্ধের নানান্ অভিজ্ঞতা একটু একটু করিয়া রেখা টানিতে থাকে চিত্তরূপ সেই সাদা কাগজখানির উপর। ক্রমশঃ অনেক রেখা, অনেক শেখা, অনেক দেখার অভিজ্ঞতা বা বোধের আনন্দ চিত্তমধ্যে সঞ্চিত হইয়া যায়: ফলে আমরা বিচিত্র ভাবৈশ্বর্যের অধিকারী হইয়া উঠি।

দার্শনিক জন লক

দার্শনিক লাইবনিৎস্ বলিতেছেন: ভাব বাহিরের বিষয় নহে, ভাব ভিতরের সম্পদ। হৃদয়ে যত প্রকার ভাব আছে, সমস্ত লইয়াই আমরা জন্মগ্রহণ করি—বহিঃপ্রকৃতির আলো-বাতাসের স্পর্শে অর্থাৎ বাহিরের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সহবাসে সেগুলি পূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত হয়, এইমাত্র।

লাইবনিৎস্

বলা বাহুল্য, আংশিকভাবে এই দুটি অভিমতই সত্য। আমাদের জ্ঞান, আমাদের অভিজ্ঞতা কতক পরিমাণে বাহির হইতে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ হইতে আসে—এ-কথা যেমন সত্য, আবার যাহা আসে তাহা যে সুষুপ্তভাবে আমাদের স্বভাবে, আমাদের প্রকৃতিতে জন্মগত অধিকার হিসাবেই বিদ্যমান আছে, তাহাও তেমনি সত্য। অন্তর না থাকিলে বহিঃ কাহাতে প্রবেশ করিয়া নবজন্ম লাভ করিবে? আবার বাহির না থাকিলে অন্তর কাহার আলোক-দর্পণে কখনও আপনার ছায়া, কখনও-বা আপনার লীলা দেখিয়া আত্মোপলব্ধির পথে অগ্রসর হইবে? বার্ক্‌লে বলিবেন, বাহির বলিয়া যাহাকে মনে করিতেছেন, তাহাও অন্তর। এফ্. এইচ্. ব্র্যাড্‌লে বলিবেন, বাহির বলিয়া যাহাকে জানি—তাহা চরম সত্যকে জানাইতে অক্ষম, অতএব ওগুলির বিশেষ কোনো মর্যাদা নাই। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক (যেমন, জেনোফেনিস্) ও হিন্দু দার্শনিকের (যেমন, আচার্য শংকর) বহু ভাষ্যেও দেখি—বহিঃ-প্রকৃতি পায় নাই প্রাধান্য। মনীষী ক্যাণ্ট কিন্তু অন্তরের এতটা বড়াই প্রথমে দিয়াছিলেন ভাঙিয়া। তিনি প্রশ্নই করিয়া বসিলেন—অন্তরের যে জ্ঞান-ধারণের শক্তি আছে সেইটাই আগে প্রমাণিত হউক। অবশ্য শেষে তিনি অন্তরের ধারণাশক্তির সপক্ষে প্রায় সায় দিলেন।, মহামতি হেগেল অত্যন্ত স্পষ্টভাবে অন্তঃ ও বহিঃ-র সমন্বয় ঘটাইলেন; দেখাইলেন—অন্তঃ ও বহিঃ, বহিঃ ও অন্তঃ—এতদুভয়ের সম্মিলিত শক্তি-মাহাত্ম্যেই জীবন ও প্রকৃতি গঠিত হইয়া উঠিয়াছে।

বার্ক্‌লে ও ব্র্যাড্‌লে

জেনোফেনিস্, শঙ্কর, ক্যাণ্ট, হেগেল

পৃথিবীর জন্মের পর বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের লীলা যুগে যুগে কতভাবেই না সংঘটিত হইতেছে। প্রাণ হইতে বহিঃ, বহিঃ হইতে প্রাণ বিশ্বনৃত্যের ছন্দতরঙ্গে লীলায়িত রহিয়া কত ভাবের, কত স্বপ্নের, কত সংগ্রামের দিতেছে জন্ম। মানুষের জীবন ও বোধ এতদুভয়ের বিচিত্র লীলার প্রভাবে বিচিত্র রূপ ধারণ করিতেছে যুগে যুগে। আজ মানুষের বুদ্ধি, মানুষের বোধ, তাহার বিচার, তাহার কথা, তাহার কল্পনা, তাহার আলোচ্য বিষয় বহুধা বিভক্ত, বহুধা বিচিত্র, বহু রূপায়িত, বহুভাবান্বিত।

কথাটা সহজ করি। মানুষ যখন তুষার যুগে (Ice Age)[১] বাস করিত, তখন তাহার জীবন, অভিজ্ঞতা ও বাস্তব পৃথিবী সম্পর্কে যে ধারণা ছিল, 'প্রস্তর যুগে' (Stone Age) তা অবশ্যই পরিবর্তিত হইল। 'ম্যাগ্‌ডালিনিয়ন' তুষার যুগের কর্দম-পিচ্ছিল তুষারাবৃত ধরণীপথ প্রস্তরযুগে যখন শুষ্ক ও শ্যামলরূপে দিল দেখা, হিমশীতল প্রকৃতির বুকে যৌবনোত্তাপের কিঞ্চিৎ সূর্য-শিহরণ জাগিলে মানুষও যখন জীবনোত্তাপের বহ্নি করিল অনুভব, তুষারযুগের তুলনায় মানুষ অনেকটা তখন সহজ হইল। মৃত্যুশীতল প্রকৃতির হাত হইতে রক্ষা পাইয়া সে তখন বন্য হিংস্র জন্তুর হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য অস্ত্র নির্মাণ করিতে বসিল। আবার এ-সময়ে তাহার যে অভিজ্ঞতা, জীবন সম্পর্কে যে ধারণা হইয়াছিল, পরবর্তী লৌহযুগে (Iron Age) তাহার পরিবর্তন ঘটিল অবশ্যই। লৌহযুগে তাহার চিন্তন, তাহার পরিবেশ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা এবং সর্বোপরি জীবনবোধে যে রূপ ও রঙ ছিল, শতাব্দীর অগ্রগতির সঙ্গে তা' সমস্ত যে থাকিল, তাহাও নহে।

মানব-চৈতন্যের সংগ্রাম ও গতি

জীবনযুদ্ধে, জয়লাভ করিবার জন্য মানুষ সংগ্রাম করিল অহরহ, বিচিত্র ঘটনার ঘূর্ণাবর্তে ঘূর্ণিত-বিঘূর্ণিত হইল শতাব্দী ধরিয়া, জাতিগত ভাবে কোনোপ্রকারে আত্মরক্ষা করিয়া প্রকৃতি ও চারিপাশের বিরোধী শক্তির সহিত আবার জুড়িল সংগ্রাম—এই যে মানুষের বীরত্বমণ্ডিত মহিমময় ইতিহাস, ইহা তাহার জীবন ও মানসবোধে কত রূপ, কত রঙ, কত ভাব, কত কল্পনার ইন্দ্রজাল দিয়াছে মিশাইয়া। মানুষ অগ্রসর হইতেছে, কি

---

১ পৃথিবীর প্রাচীন যুগগুলির বিভাগ ও নামকরণ লইয়া বিস্তর মতভেদ আছে। কোনো কোনো ঐতিহাসিক পণ্ডিত, যেমন Lord Avebury, পৃথিবীর প্রাচীন যুগটিকে প্রস্তরযুগ নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই প্রাচীন প্রস্তরযুগ আবার দুইভাগে বিভক্ত, প্রাচীন ও নবীন। আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে অতি-প্রাচীন প্রস্তরযুগও ছিল। কেহ কেহ সেই যুগকে Eolithic Age নামে অভিহিত করিয়াছেন। অবশ্য এই যুগ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে বিস্তর মতভেদ আছে। কেহ কেহ কল্পনা করিতেছেন, মানুষের আবির্ভাব হয় Pleistocene Age-এ, কাহারও মতে Eocene Age-এ, সম্প্রতি কোনো কোনো পণ্ডিত বলিতেছেন Ice Age-এ। Prof. Mac-Bridge তাঁহার 'Evolution' নামক গ্রন্থে Ice Age-কে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া এই যুগের পঞ্চম স্তর, Magdalenian Age-এ মানুষ ছিল বলিতেছেন। **The New Universal Encyclopaedia**-তে Ice-Age এর উল্লেখে বলা হইয়াছে: "There are indications that man was contemporary with the latter part of the Ice Period."

পশ্চাৎপদ হইতেছে, এ প্রশ্ন এখন তুলিব না, কিন্তু নিত্য নবযুগের আবির্ভাবে মানুষের কল্পনা হইতেছে বিচিত্র, রুচি হইতেছে বিভিন্ন, গতি হইতেছে বিভক্ত, বুদ্ধি হইতেছে জটিল—এ কথায় কেহই বোধকরি তর্ক করিবেন না। যুগের পর যুগ যাইতেছে, ঐতিহাসিকগণ যুগরহস্য বিশ্লেষ করিয়া দেখিতেছেন—কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানুষের বোধ বিস্তৃত হইতেছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বোধের তীব্রতা হ্রাসও পাইতেছে। মানুষ যখন বন্য পশুদের পরাজিত করিয়া বিজয়ীর আসন অধিকার করিল, গ্রাম, নগর পত্তন করিয়া সমাজবদ্ধ জীবন যাপনের সুযোগ পাইল—বহিঃপ্রকৃতির সহিত সংগ্রামবোধের তীব্রতা অবশ্যই তাহার মধ্যে হ্রাস পাইল, কিন্তু সংগ্রাম শুরু হইয়া গেল অন্তঃপ্রকৃতির। বাহির সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘরের সুখের মধ্যে আসিয়া মানুষ ক্রমশঃ দেখিল, সুখ কোথায়? নাল্পে সুখমস্তি। অন্তঃপ্রকৃতির দ্বন্দ্ব হইল শুরু। এমন কথা, এমন ধ্যান, এমন ভাব সে হৃদয়ে ধারণ করিতে বসিল, এমন বিষয়কে সে জীবনের চেয়েও প্রিয়তর ও সত্যতর বলিয়া মনে করিল, যাহা পূর্ব পূর্ব যুগে সে কল্পনাতেও কখনও আনে নাই। প্রকৃতির পানে তাকাইয়া কখনও ভয়ে, কখনও বিস্ময়ে, কখনও ভক্তিভরে সে পূজা শুরু করিল জড়-প্রকৃতির; পূজা করিতে করিতে, গান গাহিতে গাহিতে চিত্তান্ধকার যেন অনেকটা কাটিয়া গেল, সে বুঝিল, জড়প্রকৃতির পরতে পরতে কে যেন একজন লুকাইয়া আছে। কে সেই দেবতা, কী তাঁহার নাম, কোথায় তাঁহার অবস্থিতি—চিন্তা জাগিল তাহার। ক্রমশঃ ব্রহ্মনাম উদিত হইল তাহার অন্তরে;—আকাশে, সাগরে, নদীতে, পর্বতে, অরণ্যে, জনাবাসে সে ব্রহ্ম দেখিল, মহাতেজের আভাস দেখিল; সকল দেবতার পিতারূপে, সৃষ্টির নিয়ন্তৃরূপে, অগ্নিরূপে যে ব্রহ্ম পৃথিবী ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহাকে তুষ্ট করিবার জন্য সে স্তোত্র রচিল অসংখ্য।

ঋগ্বেদের প্রার্থনা

ঋগ্বেদের ঋষির মারফৎ সে কহিল:

স নঃ পিতেব সূনবেঽগ্নে সূপায়নো ভব।
সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে॥ ১

হে অগ্নে স ত্বং নোঽস্মদর্থং সূপায়নঃ শোভনপ্রাপ্তিযুক্তো ভব। তথা নোঽস্মাকং স্বস্তয়ে বিনাশরাহিত্যার্থং সচস্ব সমবেতো ভব। তত্রোভয়ত্র দৃষ্টান্তঃ। যথা সূনবে পুত্রার্থং পিতা সুপ্রাপঃ প্রায়েণ সমবেতো ভবতি তদ্বৎ॥

শুধু যে ভারতবর্ষে এই ব্রহ্মকল্পনা বিশেষ প্রচার লাভ করিল, তাহা নহে; ঐতিহাসিকগণ দেখাইলেন, "অধিকাংশ বর্বর জাতির ভিতরে একটা বিশ্বব্যাপিনী অনির্বচনীয়া মহাশক্তির

---

১ ঋগ্বেদ সংহিতা, ১।১।৯—ডা. মতিলাল দাস ইহার বাংলা অনুবাদ করিয়াছেন:
হও হে প্রিয় পিতার মতন অনায়াসে দর্শনীয়;
স্বস্তিকাম মোদের পাশে রহ হে তুমি বরণীয়। [ঋগ্বেদ, পৃ. ৩৮]

জিজ্ঞাসা ও ধারণা, এ দুই-ই রহিয়াছে। পলিনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জে অধিকাংশ বর্বর জাতি 'মন' এই শব্দের দ্বারায় ঐ প্রকার মহাশক্তি বুঝিয়া থাকে; প্রাচীন সুমের জাতির 'জী', মেক্সিকোর জুনিদিগের 'আহাই', উত্তর আমেরিকার আদিমবাসীদের 'ওরেন্দ' 'ওয়াকন্দ' প্রভৃতি শব্দ প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রহ্ম পর্যায় ভুক্ত।"[১] এই সমস্ত নামরূপের ধ্যানধারণা মানসিক ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে বহুলভাবে পরিবর্তিত হইল, এবং হইতে থাকিল, তাহা বলাই বাহুল্য। ভারতীয় মনোদর্শনের ইতিহাসের ধারা যত পর্যালোচনা করি, ততই এই পরিবর্তনের প্রাণময় চাঞ্চল্য দেখিয়া বিস্মিত হই। বেদের ব্রহ্মে কী সহজ, সরল, মনোময় রূপৌজ্জ্বল্য; কিন্তু এই সহজ সরল রূপ ক্রমশঃ চলিয়া গেল রূপাতীতে; যুক্তিকঠিন ন্যায়শিলার প্রচণ্ড প্রাকার ভেদ করিয়াও আর তাঁহার দর্শন মিলিল না। বিজ্ঞানবেদ্[২] কহিল, তিনি রূপে নাই, মনে নাই, বাক্যে নাই। তিনি পরমতত্ত্ব। তিনি অবাঙ্মনসোগোচর। সহজবেদের কাব্যময় মধুর ব্রহ্মতত্ত্ব, বিজ্ঞানবেদের জটিল তত্ত্বব্যাখ্যা, ষড়দর্শনের ব্রহ্ম ও জগৎ সম্পর্কিত সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম বিচিত্র তত্ত্ববিশ্লেষণ, বৌদ্ধদের নির্বাণতত্ত্ব এবং জৈনদের স্বতঃসিদ্ধ বস্তুসত্তার নিত্য পরিণম্যমানতার রহস্যতত্ত্ব দিনে দিনে শুধু যে মানুষের জিজ্ঞাসা, তাহার চিন্তামানস ও তত্ত্বানুশীলনবৃত্তিকে মুখর, প্রখর, বেগবান করিয়াই তুলিল তাহা নহে, অন্তঃপ্রকৃতির বিচিত্র ও পরস্পরবিরোধী বহু ভাবানুভাবের দ্বন্দ্বে তাহাদের মধ্যে আনিয়া দিল সংশয়, আনিয়া দিল সংশয় ছিন্ন করিবার বিবিধ যুক্তিঅস্ত্র। ভাবের এই নানা দ্বন্দ্বে, তত্ত্বের এই নানাত্বের সংঘর্ষে ও সংগ্রামে মনীষা হইল শানিত, বোধ হইল কুশাগ্রতীক্ষ্ণ।

ভারতীয় মনোদর্শনে বোধের বিকাশ

মানুষজাতির এই বোধবিকাশের এবং নিত্য রূপান্তরধর্মের বিচিত্র ইতিহাস রবীন্দ্রনাথের 'জন্মদিনে' নামক কাব্যগ্রন্থের ৫ নং কবিতায় সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে:

> অসম্পূর্ণ অস্তিত্বের মোহাবিষ্ট প্রদোষের ছায়া
> আচ্ছন্ন করিয়াছিল পশুলোক দীর্ঘ যুগ ধরি।

তাহার পর মানুষের হইল জন্ম। মানুষ করিল সংগ্রাম, মানুষ চাহিল বাঁচিতে, মানুষ করিল চিন্তা, দেখিল স্বপ্ন, রচিল গ্রন্থ—

> নূতন নূতন দীপ একে একে উঠিতেছে জ্বলে
> নূতন নূতন অর্থ লভিতেছে বাণী।

এই যে 'বাণী'র 'নূতন নূতন অর্থ'—ইহাই মানুষেব বোধবিস্তারের অমর কাহিনী ব্যঞ্জিত করিতেছে। বাণীর যে অর্থ কাল আমাকে আনন্দ দিয়াছে, বোধ বিস্তৃত হওয়ার

১ শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়-এর 'ইতিহাস ও অভিব্যক্তি', পৃ. ৫ পাদটীকা।

২ শাংকর বেদান্তও বেদ, তবে যুক্তিকঠিন ন্যায়ভাষ্যে পরুষকঠোর বিজ্ঞানবেদ। গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে বেদব্রহ্ম ও বিজ্ঞানব্রহ্ম আলোচনায় ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

পর তাহার রূপ যদি পরিবর্তিত হয়, যদি নূতন অর্থের চেতনা অনুভব করি পুরাতন সেই বাণীর আত্মায়, তবে তাহা বিশুষ্ক কোন তত্ত্ব বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া সমীচীন হইবে না। কাল অহং-বন্দী 'অসম্পূর্ণ অস্তিত্বের মোহাবিষ্ট প্রদোষের ছায়া'য় বসিয়া প্রকৃতিকে ভোগবিলাসের একটা জড়ক্ষেত্র যদি ভাবিয়া থাকি, তবে অহং-এর জড়ীয় রসবিচারে হয়তো তাহা অস্বাভাবিক বলিয়া গণ্য হইবে না, কিন্তু আজ যদি বোধের ক্রমবিকাশের ফলে অহংমুক্ত আনন্দময় নূতন মন লইয়া প্রকৃতির অন্তরে কোনো 'অরূপরতনের' ঐশ্বর্যলীলা করি দর্শন, তবে তাহা শুষ্কতত্ত্বমাত্র মনে করিব না—পরন্তু বলিব, বোধোদ্বোধনের আশীর্বাদে প্রকৃতির রূপ হইতে নবতর রসরূপ আস্বাদনের যোগ্যতা আমার হইয়াছে। মানুষের মনের ইতিহাস তো ইহারি সাক্ষ্য দেয়। রবীন্দ্রনাথের মনোবিকাশের গতি ও পরিণতি তো ইহারি তত্ত্বকথা প্রকাশ করে।[১]

বলিতেছি, জ্ঞানের আলোচনায় ও বোধের অনুশীলনে ও বিকাশসাধনে মানুষের গোপনজীবনের বহু রুদ্ধদ্বার খুলিয়া যায়; ভাবের, চিন্তনার, কল্পনার ও দর্শনের রূপ বিচিত্র বর্ণ ও রঙের সমাবেশে দেখা দিতে থাকে অভিনব ঔজ্জ্বল্যে। তখন ইন্দ্রিয়জগতের স্থূলকথা, ভোগবাসনার কথা, ঘরোয়া জীবনের কথা শ্রবণ করিয়াই যে কেবল রসাবেগ জাগে তাহা নহে, অতীন্দ্রিয় জগতের সূক্ষ্ম বর্ণবৈচিত্র্যও তখন সমভাবে আনন্দ দেয়, যদিও, বলাই বাহুল্য, অসম্পূর্ণ অস্তিত্বের মোহাবিষ্ট প্রদোষের ছায়ায় আবরিত থাকার কালে ইহার 'দীপ'-জ্যোতির রশ্মিরেখা কখনই প্রবেশপথ পাইতে পারে না।

বৈজ্ঞানিক যুগের চেতনা

আজ বৈজ্ঞানিক যুগের আবির্ভাবে নূতন অনেক বাণী, অনেক তত্ত্ব আমাদের জানা হইয়াছে। জীবনবোধ ও ভাবের রূপ বর্ধিত হইয়াছে—কল্পনা বিস্তার-লাভ করিয়াছে বিচিত্র বর্ণসম্পাতে। বিজ্ঞানের বিজ্ঞতার আড়ম্বরে বস্তুপৃথিবীকে যতই আমরা আয়ত্ত করিতেছি, ততই সমাগত বস্তু-জগতের ক্ষুদ্রতা সম্পর্কে এবং অনাগত ভাবজগতের বিশালতা সম্পর্কে আমরা সচেতন হইয়া উঠিতেছি। বৈজ্ঞানিক ডরেনীয়া বলিতেছেন, বস্তুপৃথিবী সম্বন্ধে আমরা জানিয়াছি অনেক, এত জানিযাছি যে প্রাচীন বস্তুবাদে আব যেন বিশ্বাস থাকিতেছে না। রাসেলের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে, ব্যাবহারিক জীবনের যাবতীয় ব্যবহার্য পদার্থ, যথা খাট, বিছানা, চেয়ার, টেবিল, ক্রমশঃই যেন অবাস্তব বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। এডিংটনের বিজ্ঞানচিন্তনা ইন্দ্রিয়-জগৎ হইতে অতীন্দ্রিয় জগতের দিকে যাইতেছে ছুটিয়া। আবার জীন্‌স্‌-এর জ্যোতির্বিজ্ঞান আসিয়া আমাদের মর্মমধ্যে যে বিশাল জগতের স্বপ্ন জাগাইয়া দিতেছে

১ 'প্রেম' নামক অধ্যায়ে কবির মনোবিকাশের গতি ও পরিণতির কথা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই অধ্যায়েই 'কবিকাহিনী' হইতে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত সমস্ত কাব্যগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত আলোচনা করিয়া দেখানো হইয়াছে যে, বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়াই কবি অভিনব একটি অখণ্ড তাৎপর্যের, একটি ঐক্যতত্ত্বের, প্রতিষ্ঠা দিযাছেন।

তাহাতে সংকীর্ণ এই জগতটির সীমার মধ্যে মন যেন আর থাকিতে চাহিতেছে না; কল্পনায় সে কেবলি চাহিতেছে উর্ধ্বলোকে হইতে উত্তীর্ণ। এদিকে পদার্থবিজ্ঞান এক প্রকার নূতন থিয়োরী বাহির করিয়া সাবধান করিতেছে মানুষকে: খবরদার, প্রকৃতির নিয়মে সকল সময় করিয়ো না বিশ্বাস। ভাবিতেছ—যাহা হয়, তাহারি একটি কারণ থাকিবে—'no cause no effect'—কারণেন বিনা কার্যং ন কদাচন বিদ্যতে? কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানে Quantum Theory—এ-বিশ্বাসের মূলে করিতেছে কুঠারাঘাত; কহিতেছে, কারণ যে কার্যের জন্ম দিবেই দিবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা তাহার নাই। সত্য নাকি? তবে তো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থজগতে কিছুই নিশ্চয় করিয়া যায় না বলা। বুদ্ধি আবার ঘুলাইয়া যায়, কল্পনা ব্যথিত হইয়া দিশাহারা অনিশ্চয়তার অতলে করে অবগাহন। কিন্তু না, আমরা স্থির হইব, শক্ত হইব। ব্যথিত হইবার কারণ নাই, পদার্থবিজ্ঞান খণ্ডক্ষুদ্র আয়ন-প্রোটন-ইলেকট্রনগুলির নিত্য অস্থিরতার কথা যত পারে আড়ম্বরের সহিত বর্ণনা করুক, আমরা এই ভাবিয়া নিশ্চয়ই নিশ্চিন্ত রহিব যে, কাল-অবচ্ছিন্ন দেশপৃথিবী (Space) 'ছবি'র মতই চিরস্থির রহিয়াছে। আয়নগুলি ক্ষুদ্র, প্রোটন-ইলেকট্রনগুলি ক্ষুদ্র, তাই তাহাদের এত অস্থিরতা। দেশ আমাদের বিরাট, ধ্রুবতার গাম্ভীর্য আছে তাহার চরিত্রে! কিন্তু হায়, আমাদের এই নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের আরামটুকুও গম্ভীরাত্মা বৈজ্ঞানিকের সহ্য হইল না। আইনস্টাইন কহিলেন, কাল (Time) হইতে দেশ (Space) বিচ্ছিন্ন নহে; কালপ্রবাহের তরঙ্গ-চাঞ্চল্যে দেশ-ও কালের আত্মায় চির-চপল! ত্রিধর্মাযুক্তা স্থিরা বসুন্ধরার (Three dimensional stable world) অন্তরে কালের কী নব ধর্মবোধ (Fourth dimension-of space) প্রবেশ করাইলেন বৈজ্ঞানিক? তথাকথিত স্থির এই দেশজগৎ অস্থির কালজগতের সহিত অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে যোগযুক্ত থাকিয়া পাইল পাখা, উড়িল চঞ্চল 'বলাকা'র মত। তাই বুঝি আমরাও অস্থির, শুধু জানিতাম না আমরা অস্থির, জানিতাম না আমাদের দেশজগত অস্থির, জানিতাম না—'পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ।' জানিতাম না—

বস্তুবাদ ও আধুনিক বিজ্ঞান

চলেছে জোয়ার ভাঁটা আলোকে আঁধারে
আকাশ-পাথারে,
পথের দুধারে
চলেছে ফুলের দল নীরব চরণে
বরনে বরনে,
সহস্র ধারায় ছোটে দুরন্ত জীবন-নির্ঝরিণী
মরণের বাজায়ে কিঙ্কিণী। [ছবি, বলাকা]

বিজ্ঞানজগতের নানা তথ্যাবিষ্কার এই ভাবে মানুষের কল্পনাকে করিয়াছে আন্দোলিত; কাল যা চিন্তা করিয়াছি, আজ তাহার বিপরীত চিন্তায় বুদ্ধি চাহিতেছে নূতন জগৎ। ফলে আমাদের বোধ হইতেছে বিস্তৃততর, ভাষা লইতেছে নূতন রূপ, শব্দের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে নূতন জগতের নবরূপের ব্যঞ্জনা!

শতাব্দীসঞ্চিত সহস্র বুদ্ধি ও কল্পনার সাহায্যে যত রূপের রঙমহল আমরা রচনা করিয়াছি, মনে হয়—দার্শনিকগণ সেই সমস্ত বিচিত্র রূপনিচয়কে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া লইয়াই খুশী রহিবেন। ধারণা করি: রূপের দুই রূপ, এক ইন্দ্রিয়রূপ, অপর অতীন্দ্রিয়রূপ। ইন্দ্রিয়রূপে এই জগৎ, জগৎব্যাপার, মানুষের সমাজরাষ্ট্র, মানুষের মন, মনের ধারণা, মনের স্থায়িত্ব, তাহার স্থায়িভাবনিচয়। অতীন্দ্রিয়রূপে অনাবিষ্কৃত বিশ্বজগৎ, স্বপ্নসম্পৃক্ত জগৎব্যাপার, ধ্যানাতীত রূপানন্দ, রূপবহির্ভূত রসপ্রশান্তি, রসবহির্ভূত নির্বেদ সমাধি।

রূপের দুই শ্রেণী: ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয়

আজ এই দুই রূপই আমাদের অন্তরে প্রেরণা তুলে; জীবনে আজ এই দুই রূপই বহু শতাব্দীর সাধনায় ও অভিজ্ঞতায় সত্যরূপে বন্দিত এবং অভিনন্দিত। দুই রূপ সম্বন্ধেই আমাদের চিত্তে বহুতর সংস্কার জন্মাইয়াছে। এই সংস্কারকে নানাভাবে সংস্কৃত করিয়া অধিকারানুসারে নব নব রূপ সৃষ্টি করাই তো সংস্কৃতি।

এই সংস্কৃতির আত্মা হইতেছে 'ভাব', যা লকের ভাষায়, আমাদের মধ্যে আগত হইয়াছে, অথবা লাইবনিৎসের ভাষায়, হইয়াছে মুঞ্জরিত। এই সংস্কৃতি তো আর কিছু নয়, এ তো আমাদেরই চিত্ত-গতি ও পরিণতির দর্শনেতিহাস। ইতিহাসের কল্যাণে আজ আমরা সংস্কৃত, আদিমযুগের তুলনায় সংস্কৃত, আমাদের বচনে তাই অনেক ভাব, বুদ্ধিতে অনেক জটিলতা, হৃদয়ে অনেক ধ্বনি, কর্মে অনেক ইঙ্গিত, ধর্মে বিবিধ বৈচিত্র্য। আমারই ভাব-সংস্কারের মধ্যে আজ আর আমিই শুধু নাই, তাহার ভিতর রহিয়াছে শতাব্দীসঞ্চিত বিদ্যা, বুদ্ধি, ধ্যান, ধারণা, শতাব্দীসঞ্চিত ব্যক্তিত্বধারাবলীর নামরূপ-পুলকপ্রবাহ। যতই তর্ক করুন, পূর্বে যা' ছিলেন, আজ-ও তাই আছেন, গতি বা প্রগতি কিছু নাই—এই বলিয়া সভ্যতার গতিবেগকে দার্শনিক স্থিরবুদ্ধির সংহত শক্তিবলে যতই ব্যাহত করিতে চেষ্টা করুন, আমি ইহা নিশ্চিত ভাবে জানিয়াছি, মন বাড়িতেছে, তাহার বোধ বাড়িতেছে, মানুষ অগ্রসর হইতেছে, এইজন্য তাহার রসাবেগ বা রসানুভূতির ক্ষেত্রও বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। আজ সেই আদিম মন লইয়া সোনার তরীর 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' সম্পাদন করা সম্ভব নহে, বলাকার 'পুলকিত নিশ্চলের বেগের আবেগ' অনুভব করা সম্ভব নহে। আজ তাই মনের সেই আদিম ক্ষেত্র হইতে উচ্চতর মানসক্ষেত্রের উন্মুক্ত ঔজ্জ্বল্যে উত্তীর্ণ হইতেই হইবে—নীতির জন্য নহে, ধর্মের জন্য নহে, রসোপলব্ধির আনন্দ-প্রয়োজনেই।

রূপের সংস্কৃতি ও চিত্তের গতি

বৃহৎ জীবন ও বৃহৎ জীবনবোধকে আয়ত্ত করিতে হইলে প্রস্তুতির [১] দ্বারা বৃহৎ হইতেই হয়। ব্রহ্মবাদীরা যেমন বলেন, সান্ত মনের দ্বারা অনন্ত ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা অসম্ভব,—আমি তেমনি বলি, সংকীর্ণ বোধের দ্বারা বৃহৎ বোধকে উপলব্ধি করাও অসম্ভব। বৃহৎবোধকে আয়ত্তে আনিলে রসোপলব্ধিরই যে যোগ্যতা জন্মে, বোধ যতক্ষণ বিস্তৃত না হইতেছে, ততক্ষণ এ-কথায় বিশ্বাস না জাগিতে পারে; ততক্ষণ এই বোধ-জাগরণের ব্যাপারটাকে তত্ত্বব্যাপার, দর্শনতত্ত্ব প্রভৃতি উদ্বেগজনক বাক্যপ্রয়োগে রসিক বলিয়া নিজেদের মহলে আত্মপ্রসাদ অনুভবও করিতে পারি। তাহার পর যদি কোনোদিন আকস্মিক বিদ্যুৎপ্রবাহের ন্যায় অতর্কিত কোনো শুভমুহূর্তে বোধজীবনের জাগরণ ঘটিয়া যায়, তখনি বুঝিতে পারি রসাস্বাদনের প্রাণজীবনে ইহার মূল্য কত, মর্যাদা কত।

যতই তর্ক করি না কেন, রসবিচারে চিত্তপ্রস্তুতির প্রয়োজন আছে-ই আছে। চিত্ত প্রস্তুত হয় তত্ত্বানুধাবনের দ্বারা। তত্ত্বানুধাবন আবার কী? চিত্ত-গতি ও চিত্ত-পরিণতির সর্বোচ্চ সত্য ও সৌন্দর্যের মর্মোদ্‌ঘাটন। মানুষ এতকাল ধরিয়া 'সর্ব'-কে সর্বোচ্চ-কে যে ভাবে, যে রূপে কল্পনা করিয়াছে, তাহা জানিয়া লইয়া, মানিয়া লইয়া, তাহাতেই যখন চিত্তকে সম্পৃক্ত করি, চিত্তের ধারণশক্তি তখন অনেক বাড়িয়া যায়। তখন বিশেষ কোনো ক্ষেত্র বা স্তরের রূপ নহে, পরন্তু জীবনের নিম্নস্তর হইতে সর্বোচ্চ স্তরের সকলপ্রকার রূপ, সকলপ্রকার রস ও ঔজ্জ্বল্য আস্বাদনে সে সামর্থ্য লাভ করে। তাই বলিতেছি, রসের প্রয়োজনেই তত্ত্বানুধাবন। কিন্তু কোন্ তত্ত্বের অনুধাবন? রূপতত্ত্বের, রসতত্ত্বের। বস্তুনিরপেক্ষ, রসনিরপেক্ষ তত্ত্বের রূপ নাই, তাহা বাক্যাতীত, ভাষাতীত, ব্যঞ্জনাতীত। তাহার কথা কাব্যদর্শনে আনিব কেন? যদিই বা আনি, তাহা মানিব কেন? কাব্যাস্বাদকে ব্রহ্মাস্বাদের সহোদর বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু কাব্যদর্শনের তত্ত্ব ও ব্রহ্মদর্শনের তত্ত্ব এক নহে। বাসনানন্দসম্পৃক্ত যে তত্ত্বের কথা জানিলে শিল্পবোধ-ই বিস্তৃত হইবে, চিত্ত স্ফূর্তি পাইবে, সেই তত্ত্বের, সেই রূপাধার, রসাধার, আনন্দতত্ত্বের কথাই কাব্যবিচারে প্রাসঙ্গিক। সেই তত্ত্ব কী? কবির মনোদর্শন সেই তত্ত্ব।

রসবিচারে চিত্তপ্রস্তুতি ও তত্ত্বানুধাবন

মনোদর্শনের তত্ত্বব্যাখ্যা কবির কাব্যসাহায্যেই আমরা করিয়া যাইব। দেখিয়া যাইব, মর্মবোধের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কবির রসজীবন কেমন বিস্তৃত হইতেছে, কেমন করিয়া বোধবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে রস, এবং রসানুভূতির সঙ্গে সঙ্গে নবতর জীবনবোধ, জাগরিত হইয়া কবিকে অসংখ্য বৈচিত্র্যের পথে টানিতেছে—আবার বৈচিত্র্যের অন্তঃস্থলে বিচিত্র পুষ্পপত্রশোভিতমাল্য-মধ্যস্থ একখানি সূক্ষ্ম সূত্রের ন্যায় অনির্বচনীয় একটি অখণ্ড তাৎপর্যের আনন্দ জাগাইতেছে।

১ 'প্রেম' অধ্যায়ে 'গীতাঞ্জলি' ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 'প্রস্তুতির দর্শন' সম্বন্ধীয় আলোচনা দ্রষ্টব্য।

কাব্যে রস-ই আসল—এ মতবাদের বিরুদ্ধে কিছুই আমাদের বলিবার নাই। আমরা কবিশেখরের উক্তিটি অবশ্যই সমর্থন করি; মনীষী অতুলচন্দ্রের 'কাব্যজিজ্ঞাসা'র রসতত্ত্বালোকে অভিস্নাত-ই আমরা হইয়াছি। রসের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ নহে, তত্ত্বের ও তত্ত্ববোধের সপক্ষেই আমাদের আনন্দবাদ। আমার বিশ্বাস এই, 'সমস্ত শ্রেষ্ঠকাব্যের ভিতরে এমন একটা কিছু থাকে যাতে আমাদের জ্ঞান তৃপ্ত হয়—যাতে আমাদের মননবৃত্তিকেও উদ্বোধিত করিয়া তোলে'। [বিকারশঙ্কা, শান্তিনিকেতন, ১ম খণ্ড] এই "এমন একটা কিছুর" নাম তত্ত্ব, বোধানন্দের তত্ত্ব, বোধতত্ত্ব। ইহা না থাকিলে 'হয় রসের ক্ষীণতা, ক্ষণিকতা, নয় রসের বিকার ঘটে।'

রসাস্বাদনে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা

তত্ত্বের সপক্ষে কিছু লিখিতে হইতেছে, কিন্তু প্রাচীনকাল হইলে এ সমস্ত কথা না লিখিলেও চলিত। প্রাচীনকালে তত্ত্ব বলিলে পণ্ডিতগণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকেই বুঝিতেন, তত্ত্ব তাঁহাদের প্রাণের আরাম ছিল। শুধু দার্শনিক অর্থেই যে তত্ত্ব শব্দের ব্যবহার প্রচলন ছিল, তাহা নহে, সাহিত্যিক অর্থে এমন কি ব্যাবহারিক অর্থেও তত্ত্ব শব্দের প্রয়োগ দেখিয়াছি। অমরসিংহ 'তত্ত্ব' শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'তত্ত্বং স্বরূপম্' [নামলিঙ্গানুশাসনং দ্রষ্টব্যম্]। ধরণিদাস ব্রাহ্মণ 'তত্ত্ব' অর্থে 'চেতঃ' কি না মন বা আত্মা বুঝিয়াছেন [অনেকার্থসমুচ্চয়ঃ দ্রষ্টব্যঃ]। আবার পুরুষোত্তমদেব 'বস্তু'-কেই তত্ত্ব বলিয়া করিয়াছেন নির্দেশ [ত্রিকাণ্ডশেষঃ দ্রষ্টব্যঃ]। বস্তুতঃ তত্ত্ব শব্দটি এমনি গভীরার্থবোধক যে, ইহার দ্বারা বিশ্বের সমস্ত বস্তু বা ভাবকেই বুঝানো যাইতে পারে। প্রাচীন দার্শনিকগণ এই তত্ত্ব শব্দটি বহুলভাবে ব্যবহার করিয়াছেন, ফলে ইহা ন্যায়শাস্ত্রী দার্শনিকদেরই একচেটিয়া সম্পদ হইয়া গিয়াছে, আধুনিক রসের বিচারে তত্ত্বের যেন কোনোই স্থান নাই—ইহা অস্পৃশ্য, ইহা ব্রাত্য, রসমন্দিরে ইহার প্রবেশ নিষেধ।

রবীন্দ্রনাথ তত্ত্ব 'বলিতেন' না, কিন্তু তত্ত্ব 'করিতেন'; তত্ত্ব যে তাঁহার ছিল, এ-বিষয়ে তিনি অনেক সময় সচেতন ছিলেন না, কিন্তু তত্ত্ব-ই ছিল তাঁহার হৃদয়।[১] তাঁহার কাব্য বা নাট্য অথবা কাব্য-নাট্যের ব্যাখ্যাগুলি পাঠ করিলেই বুঝা যায়, তত্ত্বহৃদয়ের পক্ষেই এমন রসসৃষ্টি বা রসব্যাখ্যা সম্ভব। রবীন্দ্রসাহিত্যে বা দর্শনে রস ও তত্ত্ব পরস্পরবিরোধী শব্দ নহে।

রবীন্দ্রবাণীতে রস ও তত্ত্ব

অলংকারশাস্ত্রে যে কয়টি স্থায়িভাবের কথা উল্লেখিত আছে, সেগুলি আমার ধারণায়, এক এক প্রকারের তত্ত্ব—কেননা আবেগ বা ভাব হিসাবে তাহারা বিচিত্র ও বিভিন্ন হইলেও পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া অখণ্ড একটি সর্বজনীন পূর্ণ জীবনেরি সেগুলি দ্যোতনা করে।. ভাববিশেষকে আংশিকভাবে যাঁহারা চাহেন বা আস্বাদন করেন; বিশেষভাবজাত

---

১ 'যে জ্ঞান তথ্য নয়, তত্ত্ব,......সেই জ্ঞানেই আমাদের আনন্দ'—রবীন্দ্রের এই উক্তিটি বিচার করুন। [শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড]

বিশেষ রসকে তত্ত্ব হয়তো তাঁহারা বলিবেন না, কিন্তু ভাব যেখানে পূর্ণজীবনের ক্রমবিকাশের পথে সহায়ক, গভীর অন্তর্লীন মহান জীবনের প্রাণচেতনারূপে বিদ্যমান, সেখানে তাহা তত্ত্ব নামে অভিহিত নিশ্চয়ই হইতে পারে। রসকে যখন আমি তত্ত্ব বলি, তখন রসের অন্তর্নিহিত মূল ভাবটির অন্তরে অখণ্ড জীবনের আভাস দেখি। 'বাল্মীকি প্রতিভায়' বন্দিনী বালিকার ক্রন্দন শ্রবণে দস্যু-হৃদয়ের মধ্যে আকস্মিক যে কারুণ্যের প্রবাহ বহিল, তাহা শুধু রস নহে, তাহা তত্ত্ব-ও। তত্ত্ব এইজন্য, ইহাই তাহার মহত্তর জীবনের দিল ইঙ্গিত। আপন আত্মার করুণতত্ত্ব অর্থাৎ স্বরূপটিকে কেন্দ্র করিয়া দস্যু হইয়া গেল বাণী কমলার বরপুত্র।

তত্ত্ব—রসেরই অপর নাম ?

কাব্যের তত্ত্ব মহত্তর জীবনের ইঙ্গিত দেয়, জীবনকে গভীরতর আনন্দরসে অভিষিক্ত করিয়া লয় গোপনে। এ তত্ত্বানুধাবনের ফলশ্রুতি এই যে, যে-জীবনে আছি তাহা ভোগ করিতে করিতেই মহত্তর জীবনে উত্তীর্ণ হইয়া যাই। সীমার রস তো পাই-ই, উপরন্তু অসীমের আনন্দ রসও প্রাণের মধ্যে আসে বহিয়া।

তত্ত্বকে তাই রসের পরিপন্থী ভাবিয়া অথবা তাত্ত্বিককে কবির অনাত্মীয় ভাবিয়া তত্ত্ব বা তাত্ত্বিক হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইব না। রবীন্দ্রতত্ত্বটি বুঝিয়া লইবার জন্য চিত্তপ্রস্তুতির সূচনা করিয়া লইব। চিত্ত প্রস্তুত হইলেই রসজ্ঞ হওয়া সম্ভব। চিত্ত যেখানে প্রস্তুত নহে, সেখানে তাহা শিশুর মত নির্বোধ, কিংবা যোগীর মত নির্বিকার; রস সেখানে নিরুদ্বেল। ইন্দ্রিয়রূপেই যেখানে আনন্দ পাই, অতীন্দ্রিয় কোনো রূপমহিমা অনন্ত রূপের দ্যোতক হইলেও সেখানে অর্থহীন। জীবনের যে-যে অংশে যে বিষয়ে আমাদের বোধ নাই, সেই বিষয়ের স্বপ্নাবেগটিকে কবি যদি কোন কাব্যে মূর্তিদান করেন, আমাদের তাহা রসানন্দ উন্মেষে সহায়তা করে না। জীবনবোধের বহু বৈচিত্র্য আছে, তাহার বিচিত্র প্রকৃতির নিম্ন হইতে উচ্চ মার্গ পর্যন্ত বহু রূপ, বহু স্তর আছে। স্তরে স্তরে, ধাপে ধাপে বিভিন্ন সোপানাবলী পার হইয়া জীবনের পূর্ণতায় উপনীত হইবার ধারাকে তত্ত্ব বলিতে হয় বলুন, না বলিতে হয় না বলুন, কিন্তু রবীন্দ্রজীবনে ইহা সহজ, সুন্দর, প্রত্যক্ষানুভূতির ন্যায় সত্য এবং সুস্পষ্ট।

চিত্তপ্রস্তুতি ও রসজ্ঞতা

অহং-বোধ হইতে রবীন্দ্রনাথ আত্মবোধের উচ্চসীমায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার কবিকাহিনী হইতে শেষলেখা পর্যন্ত কাব্যগুলি গবেষণার ধৈর্য লইয়া যিনিই পাঠ করিবেন, তিনিই দেখিবেন—তাঁহার শিল্পসৃষ্টির মূলে উচ্চতম এই জীবনবোধই লীলা করিয়াছে। বলা বাহুল্য, এই জীবনবোধের আত্মশক্তি হইতেছে প্রেম। এক অদ্বিতীয় সর্বজগদ্গত প্রেম-ই তাঁহার কাব্যমানসের বৈচিত্র্যমূলে অহরহ রসসঞ্চার করিয়াছে। এই প্রেমাশ্রিত জীবনবোধের অন্তর্নিহিত ঐক্যতত্ত্বটি বাদ দিয়া খণ্ড খণ্ড গীতিকাব্যের রসাস্বাদনেই যাঁহারা আনন্দ অনুভব করেন. তাঁহাদের পাপে রবীন্দ্রমহাভারত যে অশুদ্ধ হইয়া যায়, তাহা বলি

না, কিন্তু বিচিত্র খণ্ড-শোভার রূপৌজ্জ্বল্যে বিভ্রান্ত হইয়া যাঁহারা রূপের অন্তরস্থিত অরূপ ঐক্যতত্ত্বটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া থাকেন, তাঁহারা শুধু দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের উপরই অবিচার করেন না. কবি রবীন্দ্রনাথের উপরও অবিচার করিয়া থাকেন। কবি বলিয়াছেন, 'কোন্ গীতিকাব্যরচয়িতার কোন্ কবিতা ভাল, কোন্‌টা মাঝারি, তাহাই খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখানো সমালোচকের কাজ নহে। তাঁহার সমস্ত কাব্যের ভিতর দিয়া বিশ্ব কোন্ বাণীরূপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে, তাহাই বুঝিবার যোগ্য। কবিকে উপলক্ষ্য করিয়া বীণাপাণি বাণী, বিশ্বজগতের প্রকাশশক্তি, আপনাকে কোন্ আকারে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাই দেখিবার বিষয়।' [বঙ্গভাষার লেখক, পৃ. ৯৮৩]

রবীন্দ্রকাব্য পাঠে তত্ত্ববোধের প্রয়োজনীয়তা

বস্তুতঃ কবির কাব্যনিচয়ের মধ্য দিয়া বিশ্ববাণী কোন্ বাণীরূপে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে তাহা জানিতে চাহি না বলিয়াই একদিকে যেমন কবির সৃষ্টিবৈচিত্র্যের অভ্যন্তরস্থ ঐক্যতত্ত্বটি চোখে পড়ে নাই, অপর দিকে তেমনি কবির কবি সেই অন্বয়ধর্মী দার্শনিকটিকে কাব্যমন্দিরে আহ্বান করিয়া পাদ্যঅর্ঘ্য দিবার দায়িত্বও গ্রহণ করি নাই। 'মনের জীবন মননক্রিয়া এবং সেই জীবনেই মনুষ্যত্ব', কবি বলিয়াছেন। কিন্তু কাব্যপাঠে, বিশেষতঃ রবীন্দ্রকাব্যপাঠে, সেই মনুষ্যত্ব জাগরণের আনন্দ ঘটে, জীবনবোধ বিস্তৃত হয়—এই মোটা কথাটা মানিয়া লইতে বহু বিলম্বই আমরা করিয়াছি। বোধ বিস্তৃত না হইলে বিচিত্রের মধ্যে একের সর্বজগদ্‌গত রূপসৌন্দর্য দেখাই যে শুধু অসম্ভব, তাহা নহে; খণ্ড-সৌন্দর্যের গভীর তাৎপর্য আস্বাদনের আনন্দ অনুভবও অসম্ভব।

তত্ত্ববোধ ও অধিকার-ভেদ

'পরিশেষ' কাব্যের 'নূতন শ্রোতা' কবিতাটি স্মরণ করুন।

কবি কাব্যপাঠ করিতেছেন, রসজ্ঞ অমিয়নাথ আনন্দবিহ্বল হইতেছেন কাব্যানন্দে। এমন সময় কবিমন্দিরে প্রবেশ করিল চঞ্চল্ বালক নন্দগোপাল। অমিয়নাথ যে কাব্যে পাইলেন আনন্দরস, নন্দগোপাল তাহাতেই বুঝিবা লক্ষ্য করিল নীরস তত্ত্বকথার জটিলতা। কবির কাব্য তাই আকর্ষণ করিল না তাহাকে। 'ইষ্টিশানের' আনন্দ মেলায় সে গেল চলিয়া। কিন্তু 'বছর বিশেক চলে গেলে' এই নন্দগোপালই স্বেচ্ছায় আসিল কবি মন্দিরে। কাব্য শুনিল উদ্বেলিত যৌবন বেদনায়। 'দাদামশায় সাবাস', কহিল উচ্ছ্বসিত আনন্দে।

বলিতেছি, বোধানন্দ অপরোক্ষানুভূতির মত রসজ্ঞের অজ্ঞাতসারেই রসানন্দের প্রাণ-সঞ্চার করে। এই বোধানন্দের অধিদেবতাটির নাম দার্শনিক। ইহার মনোদর্শন রস-সম্ভোগের অন্তরায় নহে। ইনি বলেন :

'মনের যে জীবন, শাস্ত্রে যাহাকে মনন বলিতেছে, তাহা মনকে এক করিয়া তাহাকে তাহার সমস্ত তুচ্ছতা, সমস্ত অসম্বদ্ধতা হইতে উদ্ধার করিয়া, খাড়া করিয়া, গড়িয়া তোলে।

সেই মননদ্বারা ঐক্যপ্রাপ্ত মন বিচ্ছিন্নভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে না, সে মন বাহ্যপ্রবাহের মুখে জড়পুঞ্জের মতো মতো ভাসিয়া যায় না।' [বিদ্যাসাগরচরিত, চারিত্রপূজা]

মননদ্বারা এই ঐক্যপ্রাপ্ত অর্থাৎ অখণ্ড আনন্দগত প্রেমাশ্রিত মনটির স্বরূপ আমরা জানিতে চাহি। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এতদিন আমরা বৈচিত্র্যপ্রবণতাই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। কিন্তু অখিল বৈচিত্র্যের অন্তরে সর্বজগদ্‌গত যে অদ্বৈত আনন্দপ্রেম কবি স্বভাবের সহজসাধনার মধ্য দিয়াই উপলব্ধি করিয়াছেন, সেই আনন্দপ্রেম-ই যে বিশ্ববৈচিত্র্যের মূল উৎস, উপযুক্ত তথ্যের দ্বারা এবং কবিবাণীর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের তত্ত্বব্যাখ্যার দ্বারা, আমাদের তাহা প্রমাণ করিতে হইবে। ইহা প্রমাণিত হইলে কবির কাব্যগত বৈচিত্র্যের রহস্যই যে উদ্‌ঘাটিত হইবে তাহা নহে, কাব্যমধ্যস্থ ঐক্যতত্ত্বটিও আবিষ্কৃত হইয়া পড়িবে। সেই ঐক্যতত্ত্বের অখণ্ড আলোকে একদিকে যেমন দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের মনোমহিমার আনন্দধ্যান মনশ্চক্ষুতে দৃশ্যমান হইবে, অপরদিকে তেমনি কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যনিচয়ের সৌন্দর্যও নূতনতর রূপে ও রঙে উদ্‌ভাসিত হইয়া জীবনে ও জীবনের ধ্যানে অভিনব প্রেরণার ইন্দ্রজাল বিস্তার করিবে।

রূপগত বৈচিত্র্য ও সর্বজগদ্‌গত ঐক্যতত্ত্ব

দ্বিতীয় অধ্যায়

মন

"বিশ্বজগতের মধ্যে যে অপ্রমেয় ধ্রুব রহিয়াছেন, তিনি বাহ্যত একভাবে কোথাও প্রতিভাত নহেন—মন-ই নানার মধ্যে সেই এককে দেখে, সেই এককে প্রার্থনা করে, সেই এককে আশ্রয় করিয়া আপনাকে চরিতার্থ করে। নানার মধ্যে সেই এককে না পাইলে মনের সুখ-শান্তিমঙ্গল নাই, তাহার উদ্‌ভ্রান্ত ভ্রমণের অবসান নাই। ··· ··· মন আপনার স্বাভাবিক ধর্ম বশতই কখনো জানিয়া, কখনো না জানিয়া, কখনো চক্রপথে কখনো সরলপথে সকল জ্ঞানের মধ্যে—সকল ভাবের মধ্যে অহরহ সেই পরম ঐক্যের পরম আনন্দকে সন্ধান করিয়া ফেরে।"

[রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩৬৮]

দ্বিতীয় অধ্যায়

মন

রবীন্দ্রনাথের মনটি কেমনতর, কী তাহার স্বরূপ এবং কতদূর উচ্চস্তরে তাহার অবস্থিতি, ধীরভাবে আমাদের তাহা জানিতে হইবে। যে-মনের জ্যোতি হইতে প্রভাসিত হইয়াছে অপরূপ ভাবময় কাব্য এবং অভিনব কাব্যময় দর্শন,—যে-মনের আনন্দঘন দিব্য জ্যোতি বিশ্বজীবনকে করিয়াছে সূর্যকল্প সুন্দর এবং চন্দ্রোপম চমৎকার, সেই পুণ্য মনের গতি নির্ণয় ও স্বরূপদর্শন আত্মদর্শন ও বিশ্বদর্শনের ন্যায় মাহাত্ম্যপূর্ণ বলিয়াই আমি মনে করি।

একাধিক কারণে রবীন্দ্রনাথের মনোদর্শন-কে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের বিষয় বলিয়া আমার ধারণা হইয়াছে। মনোজগতের যে উত্তুঙ্গ শিখরে আরোহণ করিয়া কবিগুরু তাঁহার অমর কাব্যরাজি রচনা করিয়াছেন, তাহার উচ্চতা ও বিশালতা সম্পর্কে যথার্থ ধ্যান ও ধারণা না থাকিলে তাঁহার কাব্যাবলীর মর্মকথা উপলব্ধি করা দুঃসাধ্য তো বটেই, অনেক ক্ষেত্রে অসাধ্যও হইতে পারে। এক একটি শব্দের মধ্যে মনোগভীরের কত অপূর্ব মণি-মরকত আত্মগোপন করিয়া বসিয়া থাকে, ইঙ্গিতময় বহু প্রতীকধর্মী শব্দ-ব্যঞ্জনার সাহায্যে কবিগুরু তাহা প্রকাশ করিতে প্রয়াস করিয়াছেন,—কিন্তু যে-মন হইতে এই শব্দ, এই সুর, এই ঝংকার, এই ব্যঞ্জনা, সূর্য হইতে সপ্তরশ্মির ইন্দ্রজালের ন্যায় বহির্গত হইয়াছে, তাহার সঠিক চরিত্র যদি জানা না থাকে তবে তো মূলে ভুল হইবারই সম্ভাবনা সমধিক।

রবীন্দ্রমানসের স্বরূপ সন্ধানে

মূলে আমরা অনেক ভুলই করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ যাহা দিয়াছেন তাহার তত্ত্ব বা চরিত্র যথার্থভাবে উপলব্ধি না করিয়া, নিজে হইতে আমরা যাহা বুঝি, অথবা যুগসমস্যা-প্রভাবে যাহা চাহি, রবীন্দ্ররচনায় তাহাই খুঁজিতে গিয়াছি। আমরা বলিয়াছি, খণ্ডক্ষুদ্র দোষত্রুটিবহুল সংসারজীবনের কথা তাঁহার কাব্যে নাই; কেহ বলিয়াছি, প্রেমের কবি তাঁহাকে বলা হয়, কিন্তু যৌবনোদ্দীপ্ত যথার্থ প্রেম তাঁহার কাব্যে মেলে না; কেহ বলিয়াছি, অভিজাতদের কবি—কল্পনার 'আইভরি টাওয়ারে' বসিয়া তিনি অর্থহীন স্বপ্নবিলাসের গানই কেবল গাহিয়াছেন; কেহ-বা বলিয়াছি, তিনি দুর্বোধ্য কবি, তিনি 'মিস্টিক'; কেহ-বা বলিয়াছি, তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী, তিনি 'বেদান্তিস্ট্'; কেহ-বা আবার: তিনি তো ভীরু, পলায়ন করিয়াছেন সমস্যাসঙ্কুল এই দুঃখময় মরু-জীবন হইতে, তিনি 'এসকেপিস্ট্'।

নানা মুনির এইরূপ নানামত সাধারণ চিত্তকে বিভ্রান্তই করিয়া তুলে। রবীন্দ্রনাথকে আমরা ভালোবাসি, প্রাণের প্রিয়জন বলিয়া শ্রদ্ধা করি, তাই তাঁহার মহিমা সম্যক্‌রূপে জানিতে না পারিয়াও ছুটিয়া যাই তাঁহার কল্পরাজ্যে—যে যেমনভাবে পারি তাঁহাকে বুঝিতে ও খুঁজিতে চেষ্টা করি। আমাদের বোঝা ও খোঁজার মধ্যে আংশিকভাবে তিনি যে উঁকি দেন না, তাহা নহে, তবে সম্পূর্ণভাবে তাঁহাকে জানিবার এষণা আমাদের অহরহ আন্দোলিত করে। আমার বিশ্বাস, তাঁহার জীবনতত্ত্ব ও কবিতার দর্শন যদি ধীরভাবে বিশ্লেষণ করিতে পারি, তাহা হইলে তাঁহার সম্পর্কে সমস্ত জটিলতার ও বাদানুবাদের অবসান ঘটিবে; তখন ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিব, সংসারকে ও জীবনকে প্রাণভরে ভালোবাসিয়াও খণ্ডক্ষুদ্র তুচ্ছ গৃহস্থজীবনে কেন তিনি দৃষ্টি দেন নাই; বুঝিতে পারিব, প্রেমের পূর্ণ প্রীতির বসন্ত-সুরে অহরহ বিভোর রহিয়াও জৈবপ্রেমের উত্তপ্ত কামনায় কেন তাঁহার কবি অবতরণ করেন নাই; বুঝিতে পারিব, জীবনের সর্ববিধ দুঃখ সহ্য করিয়াও কোন্ গুণে এবং কোন্ সাধনায় তিনি প্রশান্ত, তিনি অচপল, তিনি শিবসুন্দর; বুঝিতে পারিব, ব্রহ্মকে স্বদেশ বা পৃথিবী হইতে প্রিয়তর ও মহত্তর মনে করিয়াও মানব-ব্রহ্মেরই কেন তিনি উপাসক রহিয়া গেলেন। আত্মগত সংস্কার ও অধিকার-প্রভাবে নিজে হইতে আমরা যাহা বুঝি বা চাহি, তাহার বন্ধনে না থাকিয়া, কবি আমাদের যাহা চাওয়াইয়াছেন তাহার রসগভীরে ও মর্মগভীরে আমাদের প্রবেশ করিতে হইবে। তাহা যদি করি, কবির জীবনতত্ত্বের অত্যুজ্জ্বল মহিমার জ্যোতিতে নূতন করিয়া নিজেকে দেখিতে পাইব; দেখিতে পাইব নূতন জগৎ, দেখিতে পাইব নূতন জীবনের জয়যাত্রা।

নানা মুনির নানা মত

রবীন্দ্রনাথের মনোদর্শনের জন্য আমাদের চিত্তকে তাই প্রস্তুত করিতে হইবে। ইতঃপূর্বে রবীন্দ্র-সম্পর্কে যে ধারণা, যে সংস্কার অথবা যে অভিমত আমরা পোষণ করিয়া আছি, তাহা সাময়িকভাবে অন্ততঃ একপাশে সরাইয়া রাখিয়া সংস্কারমুক্তের ন্যায় শান্তভাবে একবার বিবেচনা করিব যে, কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ যে কল্পলোকের চিত্র আঁকিয়াছেন, দার্শনিক হিসাবে তিনি যে মহত্তর জীবনের তত্ত্বকথার উল্লেখ ও পর্যালোচনা করিয়াছেন, ব্রহ্ম, জগৎ, প্রকৃতি ও প্রেম সম্পর্কে যে মতবাদ তিনি পত্রে, পত্রিকায়, প্রবন্ধে ও বিচিত্র রচনায় প্রচার করিয়া গেছেন, তাহা কোন্ মনের প্রকাশ? তাহা কি এই অণুময় বস্তুতান্ত্রিক জগতের প্রাণচঞ্চল মন? অথবা তাহা কি ভারতীয় সাধকগুরুবর্গ-কথিত সচ্চিদানন্দ-মগ্ন বাসনাবিহীন বুদ্ধমন? দেবর্ষি নারদ সমাধিলাভের পর শুদ্ধাভক্তিপরিপূরিত যে মনের আনন্দে গীতিঝংকারে সংসার পূর্ণ করিতেন, অথবা ব্রহ্মর্ষি শুকদেব ঈশ্বরকে লাভ করিবার পর জ্ঞানভক্তির জ্যোতি বিকীরণের জন্য যে মনখানি লইয়া অন্ধকার জগতে কৃপাবিহ্বল হইয়া প্রত্যাগত হইয়াছিলেন, কিংবা রাজর্ষি জনক সহস্র বৎসর হেঁটমুণ্ডে

মনোদর্শনের জিজ্ঞাসা

তপস্যা করিবার পর ঈশ্বরপ্রসাদে বাসনাবিহীন যে মনের অধিকারী হইয়া সংসার-কর্মিদের শিক্ষাপ্রদানার্থ কর্ম করিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কবিগুরুর মন কি সেই 'উদাসীনো গতব্যথঃ' 'তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী' তুরীয়ভাবানন্দী জিতেন্দ্রিয় মন ?

কবিগুরুর দার্শনিক রচনাবলীর মধ্যে অত্যুজ্জ্বল আস্তিক্য ও অখণ্ডবোধের যে জ্যোতি নিত্য বিচ্ছুরিত হইয়াছে, তাহারি আলোকে তাঁহার ঋষিকল্প দেবমনের আমরা পরিচয় পাইয়াছি। কিন্তু সংশয় জাগে এইজন্য যে, এই ঋষিকল্প নির্মল মন-ই আবার কেন, অথবা কেমন করিয়া সাধারণ জৈবজীবনের বহুবিধ দুঃখ, দ্বন্দ্ব ও সংশয়-দোলায় দুলিয়াছে ? দার্শনিক হিসাবে তিনি অহং-কে ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন, বৈরাগ্যদীপ্ত উদার প্রেমের মহিমা বিশ্লেষণ করিয়াছেন কবি হিসাবে সেই তিনি-ই আবার অহং-এর বিচিত্র বাসনা, অনন্ত দুঃখ এবং অমৃত-আনন্দবোধের চাঞ্চল্যে আন্দোলিত হইয়াছেন। তবে কি তাঁহার মনের কোন স্থিরতা নাই—তাহা চঞ্চল, তাহা অস্থির, তাহা খেয়ালখুশির একটা বিচিত্র বিলাস ? তবে কি এই কথাই স্বীকার করিব, উচ্চতর জীবনের যে আদর্শতত্ত্ব তিনি প্রচার করেন,—ত্যাগের, প্রেমের, সমন্বয়ের যে-তত্ত্বকথা তিনি বলেন, তাহা শুধু কথার কথা মাত্র ? কিংবা এই কথাই কি মানিতে হইবে, কবি হিসাবে তিনি যাহা-যাহা গাহিয়াছেন, তাহার মূল্য কেবল বৈচিত্র্যের জন্য, তাহার মধ্যে কোন ঐক্যতত্ত্ব নাই ? আজ যাহা তিনি বলেন, কাল তাহার ঠিক বিপরীত কথা বলিতে তাঁহার বাধে না ? এই কথাই কি সত্য, তাঁহার দার্শনিক মন ব্রহ্মমুখী অনেক উচ্চাচিন্তা করিয়াছে বটে, কিন্তু কবি হিসাবে তিনি নিতান্তই মানবমুখী, সাধারণ মানুষের মতই আবেগে আবেশে চপল, চঞ্চল ? তাঁহার দার্শনিক ও কবির মধ্যে তাহা হইলে আস্‌মান্-জমিন্ ফারাক রহিয়াছে ? তাঁহার দার্শনিকটি আছেন উত্তরপথের সাধনায়, আর কবিটি আছেন দক্ষিণের মন্ত্র-গুঞ্জরণে ? সর্বজগদ্‌গত প্রেমের কল্পপ্রভাবে নিখিলবিশ্বকে যিনি মিলাইবার স্বপ্ন দেখিয়াছেন, তাঁহারি নিজের মধ্যে কোনো মিল নাই, সামঞ্জস্য নাই ?

রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো সমালোচক তাহার দার্শনিক ও কবির মধ্যে কোনোরূপ মিল বা একাত্মতা দেখিতে না পাইয়া বলিয়াছেন, তিনি কবিদার্শনিক নহেন, দার্শনিক-কবি-ও নহেন, তিনি একদিকে কবি ও অপরদিকে দার্শনিক। সমালোচক মহোদয়ের ধারণা এই যে, কবিগুরুর কাব্যে ও দর্শনে কিছুমাত্র মিল নাই। 'গীতাঞ্জলি' ও 'গীতিমাল্যের' রচনাগুলি কবির দর্শনরচনার অনুভাবে রচিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সেগুলি নাকি রাবীন্দ্রিক রচনার বৈশিষ্ট্য বহন করে না ; সেগুলি কবির কাব্যাবলীর শাখা নহে, 'উপশাখা' মাত্র [রবীন্দ্রকাব্য-প্রবাহ, প্রমথনাথ বিশী]। ভাগবতধর্মিতা কবি রবীন্দ্রনাথের আত্মবৈশিষ্ট্য নহে, মাত্র মানবমুখিতা-ই বুঝি তাঁহার বৈশিষ্ট্য। সুতরাং তাঁহার দর্শনরচনাবলী ভাগবতসঙ্গীতগুলির মতই উপশাখা বলিয়া দূরে সরাইয়া দিতে হয়। অনেকে তাই দিয়াওছেন। তাঁহার

রবীন্দ্রনাথ : দার্শনিক ও কবি

দার্শনিকটির চিত্ত ও চরিত্র লইয়া তাই তেমন কোনো গভীর আলোচনা আজ পর্যন্ত হইয়া উঠে নাই।

কথাটা খারাপ শুনাইলেও সম্ভবতঃ ইহা সত্য কথা যে, 'তত্ত্ব' বলিতে আজকাল আধুনিক সমালোচকদের অন্তরে কেমন যেন শঙ্কা জাগে, শিহরণ লাগে। তাত্ত্বিকতা আজকালকার রসিক সমালোচকগণ সহ্য করিতেই পারেন না। [সমসাময়িক কবির চোখে রবীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব বসুর রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা দ্রষ্টব্য]। প্রাচীনপন্থী দার্শনিকদের জগৎ-নিরপেক্ষ রসহীন তত্ত্বকথা দূর হইতে অস্ফুটভাবে শ্রবণ করিয়া জগৎরসপিপাসু প্রাণ-চঞ্চলের দল দর্শন বা তত্ত্বকথা উত্থাপিত হইলেই জীবন-বহির্ভূত কোন নির্বেগ অবস্থার কথা বোধ হয় ভাবিয়া বসেন। রবীন্দ্রনাথের দর্শন বা তত্ত্ববাণী প্রাচীনপন্থীদের কোনো ধারা অনুসরণ করে নাই—একথা আজ বুঝাইতে হইবে। সাহস দিয়া বলিতে হইবে, তিনি কপিল নহেন, কণাদ নহেন, শঙ্কর নহেন, রামানুজ নহেন, চৈতন্য নহেন বা রামকৃষ্ণ নহেন, তিনি তাঁহারি উপমা, তিনি রবীন্দ্রনাথ। তাঁহার দর্শনতত্ত্ব কাব্যের মতই মনোময় এবং মানবিক। এই কারণে ধীরভাবে অন্বেষণ করিলেই দেখা যাইবে, তাঁহার কাব্যের মধ্যে তাঁহার নিজস্ব দর্শনটুকু আছেই আছে,—তা' 'কবিকাহিনী' হইতে 'মানসী'-তে আছে, 'সোনার তরী' হইতে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত সমস্ত কবিতাতেই আছে। 'গীতাঞ্জলি' জাতীয় পূজাসম্পর্কিত কবিতাবলীতেই শুধু যে অলোক-লোকমহিমার ভাবব্যঞ্জনা আছে, তাহা নহে, বালক বয়সের যে সকল অপরিণত রচনাকে কবি প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ বলিয়া গিয়াছেন, সেইগুলির মধ্যেও সেই ব্যঞ্জনা, সেই ভাব, সেই দ্যুতি, সেই চিত্তমহিমা কোথাও স্পষ্টভাবে কোথাও অস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত হানিয়া গিয়াছে।

কিন্তু গণ্ডগোল চুকে নাই তাঁহার তাত্ত্বিক মনটিকে লইয়া। তিনি নিজে বলিয়াছেন, তিনি তাত্ত্বিক নহেন, শাস্ত্রজ্ঞানী নহেন [আত্মপরিচয়]; তথাপি তাঁহার রচনায় অখণ্ড আস্তিক্যবোধের দর্শন গুঞ্জরিত হইয়াছে, আত্মা ও অনাত্মার পার্থক্য-বিজ্ঞানের মনোময় তত্ত্ব প্রভাসিত হইয়াছে সূর্যের ন্যায়, সর্বানুভু প্রেমের দ্বন্দ্বাতীত প্রশান্তির মাহাত্ম্য বিকীরিত হইয়াছে অবারিত আনন্দে। এই অখণ্ড, এই আত্মতত্ত্ব, এই প্রেমপ্রশান্তি যদি তাঁহার কবিতার ভাবজগৎকে মহত্তর রূপের ও স্বপ্নের মহিমায় উজ্জ্বল করিয়া থাকে—তবে কেন না স্বীকার করিব তাঁহার দার্শনিক মন ও কবিমন অভিন্ন এক অদ্বিতীয় প্রেমেরই প্রতিচ্ছবি? কেন না দেখিতে যাইব তাঁহার দর্শনে কাব্য, কাব্যে দর্শন?

মনের ভূমিতে উভয়েই অভিন্ন

আধুনিক অনেক সমালোচককে বলিতে শুনিতেছি, তাঁহার কবিতায় কোনো দর্শন নাই। দর্শন কি? তাহা কি তর্কযুক্তির সমষ্টি? তাহা কি প্রতিপক্ষকে বুদ্ধিবলে ও বিদ্যাবলে পরাজিত করিবার তত্ত্ববিদ্যা? তাহা কি বৃহত্তর জীবনের মহিমোদ্দীপ্ত আকুল কল্পনা নহে? ব্রহ্মকে বিশ্বগত করিয়া, কল্যাণকে কর্মগত করিয়া, সুন্দরকে মর্মগত করিয়া,

প্রেমকে আহ্বান করিবার আনন্দপ্রার্থনা কি দর্শন নহে? নিস্তরঙ্গ সমাধি-অবস্থার নির্বেগ বিজ্ঞানানন্দ-ই কেবল দর্শন? রবীন্দ্রদর্শনের স্বরূপ যাঁহারা বুঝিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই বলিবেন, তাত্ত্বিক যোগিদের ন্যায় সুখহীন, দুঃখহীন, সর্ববিধ বোধবিহীন আনন্দবিজ্ঞানে কোনো দিন তিনি যাইতে চাহেন নাই। তাঁহার ব্রহ্ম, তাঁহার আনন্দ, তাঁহার আত্মা, তাঁহার অখণ্ড, একান্তভাবেই মনোজগতের বোধ-সীমায় আধৃত। মানুষের মন সহজসাধনায় ব্রহ্মানন্দ ও অখণ্ডাত্মার যতটুকু মহিমা ধারণ করিতে পারে, ততটুকুর আলোকেই তাঁহার দার্শনিক মন উজ্জ্বল রহিতে চাহিয়াছে, তাহার বেশি 'তাঁহার অধিকারে নাই' [মানুষের ধর্ম] বলিয়া বিনীতভাবে তিনি নিস্তরঙ্গ অতীন্দ্রিয় হইতে তরঙ্গচঞ্চল ইন্দ্রিয়ে নামিয়াছেন—ইন্দ্রিয় দ্বারাই আবার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সর্বোচ্চ সত্যে, সর্বোচ্চ শিবে, সর্বোচ্চ সুন্দরে ও সর্বোচ্চ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া মনোগত একপ্রকার অতীন্দ্রিয়তার বিজ্ঞান দর্শন করিয়াছেন। এই দার্শনিকের ধ্যানমহিমাই কবিগুরুর কবি ও কবিতার আত্মা এবং প্রাণবস্তু।

রবীন্দ্রকাব্যে দার্শনিকতার স্বরূপ

দার্শনিকের ধ্যান কবিতার বিষয়বস্তু হইতে পারে না, অথবা কবিতা দর্শনতত্ত্বের পরিপন্থী—এমনতর একটি ধারণা প্রাচীনযুগ হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বহু সমালোচককেই পাইয়া আছে। এ-কথা অবশ্য সত্য, প্রাচীন ও আধুনিক অনেক দার্শনিক বিচারক 'কাব্য শাস্ত্রকে হনন করে'—এমনতর মতবাদ ঘরে বাহিরে বহুভাবে প্রচার করিয়াছেন। কাব্য আত্মার অধঃপতন—এমন চিন্তাও অনেকের মাথায় উদিত হইয়াছে। বেদান্তদর্শনের শাঙ্করবৃন্দ তো কাব্যিক রসানুভূতিকে জীবনসাধনার অন্তরায়-ই ভাবিয়া গেছেন। বোধ করি এই সমস্ত গম্ভীরাত্মা কঠোর দার্শনিকদের মতবাদ প্রভাবে আধুনিক রসপিপাসু সমালোচকবৃন্দ দর্শন সম্পর্কে বিরূপ বা উদাসীন থাকাই যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়াছেন। বস্তুতঃ দার্শনিক যদি কাব্যরসের প্রতিকূলাচরণ করেন, তবে তো তিনি কখনই কবিপদবাচ্য হইতে পারেন না। আমি স্বীকার করি, যে দার্শনিক জগৎকে মিথ্যা বা মায়া কহেন, মানুষকে উপেক্ষা করিয়া, সমাজ সংসারকে উপেক্ষা করিয়া 'ভাগ্যবান' হইবার জন্য 'কৌপীন' পরিয়া পর্বতকন্দরে আত্মগোপন করিতে যান, কবি হইতে তিনি অনেক দূরে-ই বটেন। আমি জানি, বিজ্ঞানানন্দী বহু ব্রহ্মবাদী দার্শনিক ভারতে ও গ্রীসে ছিলেন বা আছেন, যাঁহারা প্রবৃত্তিরসের আস্বাদনকে দেবযানপথের কণ্টকস্বরূপ ভাবিয়া খুশী হন। ইঁহাদের বিচারে কাব্য অনেকক্ষেত্রে ব্রহ্মদর্শনের অনুকূল নহে, উচ্চতম দর্শনধ্যানে যিনি প্রবুদ্ধ, কাব্যের রসজগৎ হইতে অনেক উচ্চমার্গে তাঁহাদের অবস্থিতি। মনীষী প্লেটো কাব্যকে জীবনদর্শন হইতে তাই হয়তো বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন। কাব্য মানসলীলার বিচিত্র অভিব্যক্তি, কিন্তু মানসাবেগের অতীতে যে সমস্ত দার্শনিক আনন্দদর্শনের সাধনা করেন, মানসসমুদ্রোত্থিত কবিতা-লক্ষ্মী বা উর্বশীর প্রতি তাঁহারা যে কোনোদিন কৃপাকটাক্ষ করিবেন না, ইহা কাহারো অবিদিত নহে। কিন্তু প্রশ্ন এই, রবীন্দ্রনাথ কি

কোনোদিন এই সকল নির্বেগ দার্শনিকদের সমসারে বসিতে চাহিয়াছেন? ভারতীয় প্রাচীন সাধকবর্গের অধ্যাত্মতত্ত্বের বহু কথা তিনি আলোচনা করিয়াছেন, —আত্মা লইয়া, ভূমা লইয়া, অহং-এর অসারত্ব লইয়া, মঙ্গলামঙ্গল লইয়া, শ্রী, হ্রী, ধী লইয়া, সত্যশিবসুন্দর লইয়া প্রভৃত চিন্তা তিনি করিয়াছেন, কিন্তু এ-কথা কি আমরা ভাবিয়া দেখিয়াছি যে, অধ্যাত্মতত্ত্বের সমস্ত মহিমা, তত্ত্বজাত সমস্ত ধ্যান ও প্রশান্তি, কবির মতই তিনি মানসবোধ দ্বারা আয়ত্ত করিতে চাহিয়াছেন, যোগীর মত মানসাবেগের অতীতে অনায়ত্ত-কে ধরিতে চাহেন নাই? তাঁহার ব্রহ্ম, আত্মা বা ভূমা 'বস্তু-অবচ্ছিন্ন একটা তত্ত্বমাত্র নন। যাকে বলি আমার আমি, সে যেমন অন্তরতমভাবে আমার বোধ-বিষয়, তিনি-ও তেমনি। যখন তাঁর প্রতি ভক্তি জেগে ওঠে, যখন তাঁতে আনন্দ পাই, তখন আমার এই আমি-বোধই বৃহৎ হয়, গভীর হয়, প্রসারিত হয় আপন সীমাতীত সত্যে।' [মানুষের ধর্ম, পৃ. ৪৩]

কবিতা কি দর্শনের পরিপন্থী?

'বৈজ্ঞানিক বলেন, দেবতাকে প্রিয় বললে দেবতার প্রতি মানবিকতা আরোপ করা হয়। আমি বলি মানবত্ব আরোপ করা নয়, মানবত্ব উপলব্ধি করা। মানুষ আপন মানবিকতার-ই মাহাত্ম্যবোধ অবলম্বন করে আপন দেবতায় এসে পৌঁছেচে। মানুষের মন আপন দেবতায় আপন মানবত্বের প্রতিবাদ করতে পারে না।' [মানুষের ধর্ম, পৃ. ৪৩]

বস্তু-অবচ্ছিন্ন কোনো তত্ত্বকেই দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করিতে চাহেন নাই—বরং বস্তুকে তিনি ভাবের দ্যোতক বলিয়া বস্তু জগৎ বা সীমার জগৎকে যথোচিত মহিমা দান করিয়াছেন। যাহা আছে, তাহাকে মিথ্যা কহেন নাই; তবে তাঁহার কথা এই যে, যাহা আছে, তাহা যদি বৃহতের স্বপ্ন, 'সুদূরের ইশারা' না দান করে, তবে তাহা মিথ্যা। আমি জড়বস্তুপিণ্ড হিসাবে অবশ্যই মিথ্যা, কিন্তু আমি হইতে যে-আত্মপ্রকাশ, আমি হইতে প্রকাশিত হয় 'মানবিকতার' যে 'মাহাত্ম্য', আমি-র ক্ষেত্র হইতে ফলিত হয় যে 'সোনার ধান'—মহাকালের 'সোনার তরী'-তে তাহার স্থান হয়, মৃত্যুর তীর হইতে অমৃতের তীরে যাওয়া তাহার সম্ভব হয়, কিন্তু জড়পিণ্ড আমিটার তাহা হয় না, তরীর একপাশে এতটুকু 'ঠাঁই'-ই হয় না অভাগার। আমি-টা তাই মরিয়া যায়, কিন্তু আমি-র আত্মদেবের ক্ষয় নাই, ভয় নাই, মার নাই। এই অক্ষয়, অভয়, অমর আত্মা কুসুমের মত ক্রমশঃ জীবনে জীবনে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। এই যে আত্মা বিকশিত হইয়া উঠিতেছে, তাহারি অর্থাৎ তাহার মাহাত্ম্যবোধ-ই রবীন্দ্র-রচনায় নানাভাবে, নানাভঙ্গিতে, নানাসুরে ও নানাছন্দে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের এই 'মাহাত্ম্যবোধ'-ই ব্রহ্মবোধ। তাঁহার ব্রহ্ম 'বস্তু-অবচ্ছিন্ন কোনো তত্ত্বমাত্র নন।' এই বোধ পর্যন্ত তিনি অগ্রসর হইয়াছেন, আর নহে। অবশ্য বস্তুতান্ত্রিক জড়বুদ্ধির নিকট ইহাও উপলব্ধির বিষয় নহে। জড়বুদ্ধিসমাচ্ছন্ন অন্ধ পৃথিবী—

আপনার মনোমাঝে আপনি সে হারায়েছে দিশা
বিকারের মরীচিকাজালে। [সমুদ্রের প্রতি, সোনার তরী]

কিন্তু একদা নিশ্চয়ই আসিবে, রবীন্দ্রকাব্য ও দর্শনের বাণী এই, যখন জড়পৃথিবীর মানবমণ্ডলী তামসিক এই 'দিশাহারা' মনের বন্ধন ছিন্ন করিয়া উচ্চতম সাত্ত্বিকতার দিব্যভূমে উন্নীত হইবে। মানব হইবে 'পরমমানব'। মানুষের মন আপন দেবতায় আপন মানবত্বের পূর্ণ প্রকাশ পাইবে দেখিতে।

তর্ক তারে পরিহাসে, মর্ম তারে সত্য বলে জানে,
সহস্র ব্যাঘাতমাঝে তবুও সে সন্দেহ না মানে,
জননী যেমন জানে জঠরের গোপন শিশুরে,
প্রাণে যবে স্নেহ জাগে, স্তনে যবে দুগ্ধ উঠে পুরে।
[সমুদ্রের প্রতি, সোনার তরী]

জড়পৃথিবীর আজও যাহা অনুভবগত হয় নাই, রবীন্দ্রদর্শনে তাহারি স্বপ্নাবির্ভাবের তত্ত্ববাণী দিব্যভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই তত্ত্ববাণীকে মনের অতীতের ব্যাপার মনে করিয়াই কবি হইতে তাঁহার দার্শনিকটিকে এবং কবিতা হইতে দর্শনবিষয়কে বিচ্ছিন্ন ও পৃথক আমরা ভাবিয়াছি। তাঁহার দর্শনচিন্তার সূক্ষ্ম অথচ মনোময় মৌলিকতাটুকু ধীরভাবে ধারণ করি নাই বলিয়াই দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বহুতর ভুল ধারণা আমরা পোষণ করিয়া আছি। ফলে হইয়াছে এই, কবিকে যাঁহারা জানিতে চান, দার্শনিককে জানার কোনো প্রয়োজনীয়তা তাঁহারা অনুভব করেন না; আবার দার্শনিককে যাঁহারা বিচার করিতে চলেন, কবির বেদনাবিহ্বল সুখদুঃখসমাচ্ছন্ন দ্বন্দ্বসঙ্কুল কবিতামানসের দিকটা একেবারে তাঁহারা বিস্মৃত হইয়া রহেন।

রবীন্দ্রবাণীতে উভয়ের সমন্বয়

কেহ কেহ তাঁহার ভাগবতসঙ্গীত ও উচ্চধ্যানধর্মী কবিতাংশের আলোচনাপ্রসঙ্গে কবির দুই-চারিটি উচ্চ ব্রহ্মধর্মী উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দর্শনমানসের এমনি স্তরে তাঁহাকে বসাইতে চান, যে-স্তরে কবিগুরু বা তাঁহার দার্শনিক কোনোদিন যাইতে চাহেন নাই। আমি তো মনে করি, রবীন্দ্রনাথের দর্শন জগৎ-দর্শন, জগতের মধ্য দিয়া ব্রহ্মদর্শন; রবীন্দ্রনাথের দর্শন আত্মদর্শন, মনের মধ্য দিয়া আত্মদর্শন। জগদাতীতের বিচিত্র লীলা জগতের অণুতে পরমাণুতে নিত্য লীলায়িত হইতেছে,—জীবনাতীতের অনন্ত লীলা জীবনে জীবনে, প্রাণ হইতে প্রাণে, গান হইতে গানে, সুর হইতে সুরে, নিত্য তরঙ্গায়িত হইতেছে—এই তত্ত্বরসটুকু মন ভরিয়া তিনি পান করিয়াছেন, বুদ্ধি দিয়া তাহাকে যুক্তি-সিদ্ধ করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার দর্শনে যাহা পাই, কাব্যে তাহাই পাই। তাঁহার

রবীন্দ্রমানসের স্তর নির্ণয়

কাব্যের ভাষ্য তাঁহার দর্শনচিন্তাগুলি,[১] তাঁহার দর্শনের মনোরম ব্যাখ্যা তাঁহার অমর কাব্যাবলী।

এই কথার সত্যতা প্রমাণ করিতে হইলে রবীন্দ্রনাথের মনোদর্শন প্রয়োজন। দার্শনিক হিসাবে তাঁহার মন কী চাহিয়াছে, কী পাইয়াছে, সং ও চিৎ-সাধনার কোন্ স্তরে উন্নীত হইয়া মন তাঁহার জগৎ ও জীবন দর্শন করিয়াছে, সংস্কারশূন্য স্থৈর্য লইয়া আমাদের তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। একাধিক প্রখ্যাতনামা দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের মানস-স্তর বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহার মনটিকে বৈদান্তিক মন আখ্যা দিয়াছেন। প্রসিদ্ধ থিয়োসফিস্ট দার্শনিক স্বর্গত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহোদয় কবিগুরুর দর্শন বিচার করিয়া একটি প্রবন্ধে বলিয়াছিলেন, তিনি বৈদান্তিক।

এ প্রসঙ্গে শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

'Rabindranath, as far as I know, has never made a detailed study of the controversial aspects of the Vedanta, as we find them expounded by the famous commentators or in such jaw-breaking Vedantic treatises as 'Adwaita Siddhi'; but that he is steeped through and through in the spirit of the Vedanta, none will dispute who has made even a cursory study of his works'. [*Rabindranath as Vedantist*, Tagore Birth Day Number, p.32]

বেদান্ত রচনাবলী ও রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক রচনাবলীর মধ্যে ভাবগত ঐক্য ও সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া মনীষী রাধাকৃষ্ণনও বলিয়াছেন:

এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণন

'In the characterisations of God in the Vedanta writings and Rabindranath's works we find an identity of thought'. [*Philosophy of Rabindranath*, p. 45]

বেদসাহিত্যের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষৎ এই চারি অংশের সর্বশেষ অংশকে অর্থাৎ উপনিষদকে বেদান্ত বলা হয়। রবীন্দ্রনাথ এই বেদান্তোপনিষদের বহু অংশ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, উপনিষদের বহু বাণী তাঁহার চিত্তকে শুধু প্রভাবিত নয়, নিয়ন্ত্রিতও করিয়াছে, এই হিসাবে তাঁহাকে বৈদান্তিক অথবা তাঁহার রচনাকে বেদান্তধর্মী রচনা বলায় হয়তো কাহারো আপত্তি উঠিবে না। কিন্তু উপনিষদে তো বহু তত্ত্বের কথা আছে। তুরীয় অবস্থার অথবা অবাঙ্মনসোগোচর অবস্থার বহু তত্ত্ব উপনিষদে মেলে, আবার জগতের ও জীবনের রূপবৈচিত্র্যের বহুধাবিভক্ত লীলাপ্রসঙ্গের মনোময় আনন্দকথা-ও মেলে। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের কোন্ দিকটার পোষকতা করিয়াছেন? যদি দেখা যায়, মায়াবাদী

---

১ Marjorie Sykes-ও তাঁর **Rabindranath** নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, কবির দর্শনরচনাগুলি "describe in prose the same experiences and beliefs as are recorded in his poetry"—[p. 73]

বৈদান্তিকদের মত 'নেতি নেতি' করিয়া তিনি ব্রহ্মদর্শনে অগ্রসর হন নাই, অথবা বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদীদের মত প্রথমে 'নেতি নেতি' এবং পরে 'ইতি ইতি' করিয়া নিষ্কাম নির্বিকার দৃষ্টিতে জীবজগৎময় ব্রহ্মকে লক্ষ্য করেন নাই, পরন্তু নিতান্ত সহজ সাধনায় আমি-র নানা সংশয় ও বেদনা, দ্বন্দ্ব ও হতাশাকে স্বাভাবিকভাবেই অতিক্রম করিয়া সংশয় হইতে বিশ্বাসে, বিশ্বাস হইতে সহজযুক্তিতে, সহজযুক্তি হইতে স্বাভাবিক ভক্তি ও প্রেমে উন্নীত হইয়া মানসিক প্রশান্তিভরে ব্রহ্মবিভূতি অবলোকন করিয়াছেন, যোগনিবৃত্তির নিস্তরঙ্গ সমাধি অবস্থায় নহে, প্রেম-প্রবৃত্তির তরঙ্গনন্দিত জীবনাশ্রমেই যে-ব্রহ্ম অহরহ মানবকে অসৎ হইতে সতে, অন্ধকার হইতে আলোকে, মৃত্যু হইতে অমৃতে আকর্ষণ করিতেছেন, সেই ব্রহ্মকেই, সেই মর্মমোহন ধর্মসুন্দর মানসব্রহ্মকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দার্শনিক জীবনের সর্বোত্তম উপাস্য মনে করিয়াছেন, তবে তাঁহাকে রূপধর্মী ও রসধর্মী বৈদান্তিক, অথবা বেদ-দার্শনিক, কিংবা আরো স্পষ্ট ভাষায়, 'মনোদার্শনিক' বলিয়া অভিহিত করিব এবং মনে মনে জানিব যে, মনোদার্শনিক হওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে বলিয়াই কবিত্বমহিমার রসবিহারী স্বপ্নসুন্দর জীবনেশ্বরকে প্রেমে ও প্রতিভায় পুলকিত করিতে তিনি পারিয়াছেন। তত্ত্বদর্শনে তিনি 'দেবতাকে প্রিয়' করিয়াছেন, মনোগত করিয়াছেন মনের মানুষের মত; কাব্য-মাহাত্ম্যে তিনি 'প্রিয়কে দেবতা' করিয়াছেন, প্রেমে অনন্তোপম করিয়াছেন মনের মানুষটিকে। 'আর পাব কোথা'? মন দিয়া যত দূর, যত উর্ধ্বে, দিগন্তপ্রসারী দৃষ্টি লইয়া যত—যত উচ্চে চাওয়া যায়, তিনি চাহিয়াছেন, চাহিয়া চাহিয়া আহ্বান করিয়াছেন দেবতাকে, সত্যশিবসুন্দরের দেবতাকে; তাঁহার দর্শনধ্যানে নির্বিশেষ হইতে, অরূপ হইতে, রূপবিশেষে, 'রূপে রূপে প্রতিরূপে,' মনোগত 'বহি'র্জগতের রূপেও অবতরণ করিয়াছেন পরমদেবতা—মনের দর্পণে দেখা গিয়াছে তাঁহার রূপচ্ছবি। সেই রূপের রূপালি মোহনীয়তায় জগৎ হইয়াছে জ্যোতিসুন্দর। 'প্রাণে প্রেমে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে' নৃত্য করিয়াছে জ্যোতির সপ্তরশ্মি। 'আর পাব কোথা'? মন দিয়া যতদূর চিন্তা করা যায়, যত উচ্চ স্বপ্ন দেখা যায়, যত সুদূরের ইশারা পাওয়া যায়, দিগন্তপ্রসারী দৃষ্টি লইয়া যত উচ্চ মহিমা দর্শন করা যায় তিনি করিয়াছেন, করিয়া করিয়া মানব-কে তিনি টানিয়াছেন সেই উচ্চতম মহিমার দিব্যধামে।

রবীন্দ্রনাথের মানসব্রহ্ম

আর পাব কোথা
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা। [বৈষ্ণব কবিতা, সোনার তরী]

সহজ চিত্তসাধনায় দেবতাকে জগতের সর্বত্র নিরীক্ষণ করিয়া এবং মানুষের মধ্যে দেবতার সর্ববিভূতি অবলোকন করিয়া রবীন্দ্রনাথ দিব্যানুভূতি লাভ করিয়াছেন। সাধনতত্ত্বে ইহা ছাড়া আর যাহা আছে রবীন্দ্রজীবনে ও দর্শনে তাহা সত্য নহে। কবিগুরুর দার্শনিক চিত্তের এই স্বরূপনির্ণয়ে যত্নবান হইলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে, কবি হইতে তাঁহার দার্শনিক

পৃথক নহেন। বুঝা যাইবে, তাঁহার দর্শন ও কবিতা, তত্ত্ব ও রস একাঙ্গ ও একাত্ম রহিয়া পরম একটি সমন্বয়ের সৌন্দর্য বিকাশ করিয়াছে। তত্ত্ব-নিরপেক্ষ কাব্যালোচনায় ভ্রান্ত রসিকতা প্রকাশ করিতে গিয়া অথবা কাব্যনিরপেক্ষ তত্ত্বালোচনায় অযথা পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে গিয়া আর যাহা করিয়াছি তাহা করিয়াছি, কিন্তু কবিকে বা তাঁহার বক্তব্য বিষয়কে যথার্থ মহিমা দান করি নাই। রবীন্দ্রনাথ সাধারণ কবি নহেন। তাঁহার 'ধ্যানের ধন'গুলির মূল্য নিরূপণ করিতে হইলে ধ্যানের স্বরূপতত্ত্বের অগাধ অতলে অবগাহন করিতেই হইবে। তাঁহার কাব্যমণির দিব্যোজ্জ্বল্য যদি দর্শন করিতে চাহি তবে তাঁহার মনোগভীরে ডুবুরির ধৈর্য ও সাহস লইয়া প্রবেশ না করিয়া উপায় নাই। ভাসা-ভাসা ভাবে যাঁহারা রবীন্দ্রকাব্য পাঠ করিয়া যান, আধুনিক জৈবজীবনসর্বস্ব রসরুচির সংস্কারে প্রভাবিত হইয়া যাঁহারা রবীন্দ্রকাব্য বিচার করেন, রবীন্দ্রমনোদর্শনের কোনো ঠিকানা না রাখিয়াই যাঁহারা রবীন্দ্রকাব্য সম্পর্কে অসংলগ্ন নানা অভিমত প্রকাশ করিতে থাকেন, তাঁহাদের সহিত তর্কসমরে প্রবৃত্ত হইবার যোগ্যতা বা বাসনা আমার নাই। আমি শুধু কবির মনোদর্শন বিশ্লেষণপ্রসঙ্গে এই সত্যটুকুই মাঝে মাঝে বিচার করিয়া দেখিব, দর্শনতত্ত্বে তিনি যে সত্যের অবতারণা করিয়াছেন, কাব্যকাহিনীতে তাহাই রসমাধুর্যে সুন্দর হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে কিনা। যদি দেখি প্রকাশ পাইয়াছে, আমার কার্য শেষ হইবে। তখন আধুনিক যুগসংস্কারে প্রভাবিত হইয়া রবীন্দ্রনাথে 'এই নাই, তাই নাই' বলিয়া অযথা অভিযোগ তুলিব না। ধীরভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব, অন্নের জন্য প্রাণের তামসিক বিদ্রোহিতা নহে, প্রাণের চাপল্যোদ্দেজনায় মনের রাজসিক আস্ফালনও নহে, বিজ্ঞান-স্পর্শমণির আভাসদীপ্ত সাত্ত্বিক মানসসত্তার গতিচাঞ্চল্যই রবীন্দ্রকাব্যের আত্মা।

রবীন্দ্রভাবনায় তত্ত্ব ও রস একাঙ্গ

আমি চঞ্চল হে,
আমি সুদূরের পিয়াসী। [উৎসর্গ-৮]

কবিগুরুর কাব্যসাধনার অন্তরালে থাকিয়া দেবযান-গতিচাঞ্চল্যের যে বোধ-জীবন অহরহ তাঁহার মধ্যে লীলা করিয়াছে, তাহার একটি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত 'উৎসর্গ' হইতে উদ্ধৃত ঐ শব্দকয়টিতে পাওয়া যায় বলিয়া আমার ধারণা। আমি চঞ্চল, থামিয়া থাকা আমার স্বভাব নহে, মনোবিহীন কোনো তত্ত্ববিশেষে আত্মবিলুপ্তি ঘটাইয়া ধারণাতীত কোনো ভাবমার্গে নিশ্চুপ হওয়া আমার সাধনা নহে। 'চঞ্চল' এই শব্দটির সুরেই তো আমার মনোবিহারের ছন্দ নন্দিত হইতেছে। মনোভূমির উদার প্রান্তরে বিহার করিতে করিতে 'সত্যেরে ধ্রুবতারা' করিয়া

দেবযান-গতির চেতনা

'মহাবিশ্বজীবনের পথে' আমি চলিয়াছি। যাহা চাহিয়াছি তাহা, স্বীকার করি, এখনও পাই নাই, কিন্তু যাহা পাইয়া আছি, তাহারি মধ্যে না-পাওয়ার ব্যঞ্জনাকে আস্বাদন করিয়া না-পাওয়ার টানেই আবার মাতিয়াছি। তাইতো আমার থামিলে চলে না, চলিতে হয়। দূরে, আরো দূরে, কত দূরে আমি জানি না—আমাকে চলিতে হয়, —দূরে, আরো দূরে, আরো আরো সুদূরে—ওই যে ওই অন্ধকার দেশে, চেতনা যেখানে প্রবেশ করি-করি করিয়াও করিতেছে না, এতটুকু একটি দীপের মত জ্বলিয়া জ্বলিয়া, কখনও নিভিয়া আবার জ্বলিয়া, কত না ইঙ্গিতে আমাকে আহ্বান করিতেছে—মনে হয়, সেইখানের সামীপ্য ও সাযুজ্য লাভ করিলেই জীবন পূর্ণ হইবে, তাই 'পিয়াস' আমার চঞ্চল হয়, 'সুদূরের পিয়াসী' আমি চলিতে থাকি।

মায়াবাদী বৈদান্তিকরা বলিবেন, মানসলোকের যত উর্ধ্ব স্বর্গেই কবি উন্নীত হউন না কেন, মনোলোকের মধ্যেই তিনি আছেন বলিয়া 'সুদূরের পিয়াস' তাঁহাকে অদ্বৈত তুরীয় মার্গে ধারণাতীতের বিজ্ঞানবোধে টানিয়া লইতে পারে না। 'বিপুল সুদূরের' দূরাগত বহ্নিচ্ছটায় মনটি তাঁহার সূর্যকল্প সুন্দর ও উজ্জ্বল হইয়া উঠে বটে, কিন্তু বাসনার একেবারে বিনাশ না হওয়ায়, পৃথিবীর উপর টানটি তাঁহার থাকিয়া যায়। 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে' বলিয়া মন হইতে মনে, মনের বিচিত্র ভূমিতে তিনি বিহার করিতে থাকেন, মনের উচ্চতম ভূমিতে উঠিয়া মনের অতীত কোনো সুদূর জ্যোতিকে ধরি-ধরি করিয়া ধরিয়াই যেন ফেলিয়াছেন—এমন ভাবও তাঁহাকে কখনও কখনও আন্দোলিত করিয়া যায়—

গন্ধবিহীন বায়ুস্তরে,
শব্দবিহীন শূন্য'পরে,
ছায়াবিহীন জ্যোতির মাঝে,
সঙ্গিবিহীন নির্মমতায়

[নীড় ও আকাশ, খেয়া]

—'অবাধ সুখ' অনুভব করিতে থাকেন, 'বাঁধনহারা আনন্দ-অমৃত' পান করেন মনের পুলকে, কখনও বা তাঁহার মনে হয় :

আজ নয়ন মেলিয়া একি হেরিলাম
বাধা নাই, কোনো বাধা নাই—
আমি বাঁধা নাই।
ওগো যে-আঁধার ছিল শয়ন ঘেরিয়া
আধা নাই, তার আধা নাই—
আমি বাঁধা নাই। [মুক্তিপাশ, খেয়া]

কিন্তু বলাই বাহুল্য, মনোভূমির মধ্যেই এই লীলাবিহার বলিয়া এ-হেন অবস্থা তাঁহার বেশিক্ষণ থাকিতে পারে না ; নির্বেগ ভাবমার্গের 'স্বর্গ হইতে বিদায়' লইয়া 'নীড়ে'-র বন্ধনে তিনি নামিতে থাকেন—

মনোভূমিতেই কবির লীলাবিহার

তবু নীড়েই ফিরে আসি,
এমনি কাঁদি এমনি হাসি,
তবু-ও এই ভালোবাসি
আলোছায়ার বিচিত্র গান।

[নীড় ও আকাশ, খেয়া]

ধ্যানপ্রশান্ত নির্বেগ বিজ্ঞানের জ্যোতিস্পর্শে নির্মলায়িত স্থৈর্যমন লইয়া তিনি নীড়ে নামেন, উচ্চভূমির বোধানন্দ আস্বাদিত হইয়াছে বলিয়া নিম্নভূমির স্বার্থাদি মানস-বন্ধন তাঁহার ছিন্ন হইয়া যায়, সংস্কারবিহীন উন্মুক্ত মন দিয়া তিনি জগৎ দর্শন করিতে থাকেন। 'সবার মাঝারে' তিনি যান ; 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে মুক্তির স্বাদ' লাভ করেন। বিশ্বের প্রতিজনাকেই তাঁহার পরমাত্মীয় বলিয়া মনে হয়। গাহেন :

কাউকে চেনে পরশ আমার,
কাউকে চেনে ঘ্রাণ,
কাউকে চেনে বুকের রক্ত,
কাউকে চেনে প্রাণ।
ফিরিয়ে দিতে পারি না যে
হায় রে—
ডেকে বলি, 'আমার ঘরে
যার খুশি সেই আয় রে, তোরা
যার খুশি সেই আয় রে। [অবারিত, খেয়া]

বিশ্বকে এইভাবে এই আবেগবিহ্বল ভাষায় আহ্বান করেন। কিন্তু উচ্চভূমির বোধদর্শনে উদ্দীপ্ত তাঁহার মন—রূপ দেখিতে দেখিতে দেখিয়া বসেন অরূপ রূপেশ্বরকে,— 'সবার মাঝারে' দেখিয়া বসেন চিরজনমের রাজারে।

আজ গিয়েছি সবার মাঝারে, সেথায়
দেখেছি একেলা আলোকে—দেখেছি
আমার হৃদয়-রাজারে।
আমি দু-একটি কথা কয়েছি তা' সনে
সে নীরব সভা-মাঝারে—দেখেছি
চির জনমের রাজারে।

আজ ত্রিভুবন জোড়া কাহার বক্ষে
দেহ-মন মোর ফুরালো—যেন রে
নিঃশেষে আজি ফুরালো—

আজ যেখানে যা হেরি সকলেরি মাঝে
জুড়ালো জীবন জুড়ালো—আমার
আদি ও অন্ত জুড়ালো। [মিলন, খেয়া]

একজন সাহিত্যের অধ্যাপক যে বলিয়াছেন, "শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের রসসৃষ্টির পশ্চাতে 'mighty sense of experience' থাকে", তাহা যথার্থই সত্য। এই অভিজ্ঞতাকে বিশোধন করিয়া তিনি সমগ্র জীবনের আলেখ্য তাঁহার কাব্যে চিত্রিত করেন। সমগ্রতার চিত্র যাহার কাব্যে নাই, তাহার সৌন্দর্য-সৃষ্টিও অসার্থক, ব্যাহত, অপরিপুষ্ট ও বিকলাঙ্গ। অবশ্য সমগ্রকে দেখিতে হইলে সাহিত্যিকের দৃষ্টির প্রসার ও আত্মস্থতা থাকা বাঞ্ছনীয়।......'শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক যখন আত্মনিরপেক্ষ হইতে পারেন, তখনই তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্যে জীবন ও জগতের সমগ্র রূপ প্রতিফলিত হইতে থাকে।' [সাহিত্য সন্দর্শন, শ্রীশচন্দ্র দাস, পৃ. ১৪-১৫]

শিল্পসাধনায় জীবনের সমগ্রতার চিত্র

কিন্তু 'আত্মনিরপেক্ষ হওয়া' কাহার পক্ষে সম্ভব? পূর্বেই বলিয়াছি, মনের কোনো একটি বিশেষ বিষয়, ব্যাপার বা ভাবে একান্তভাবে যাহারা আসক্ত—আত্মনিরপেক্ষ হইয়া অর্থাৎ ব্যক্তিগত ও খণ্ডগত সমস্ত সংস্কার বিস্মৃত হইয়া 'সবার মাঝারে' প্রবেশ করা অথবা সমগ্রতার অন্তর্নিহিত অসীম সৌন্দর্যরসের গভীরে অবগাহন করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। মনের নিম্নভূমি হইতে সর্বোচ্চভূমি পর্যন্ত বিহার করিয়া বিশ্ববিধ বিচিত্র জীবনরূপের ঐক্যতত্ত্ব যিনি দর্শন করিয়াছেন, Croce-র ভাষায় 'from troublous emotion to the serenity of contemplation' যিনি গতায়াত করিয়াছেন, বেদান্তের ভাষায় 'মন' ও 'বিজ্ঞান'-এর মধ্যবর্তী রূপ ও অরূপ, বেগ ও নির্বেগের সন্ধি-জগতের স্বপ্ন-কল্পনায় যাঁহার অধিবাস, সমগ্রতার সৌন্দর্য তাঁহারি শিল্পে ও শিল্পদর্শনে প্রভাসিত হইতে পারে।

রাত্রি এসে যেথায় মেশে দিনের পারাবারে
তোমায় আমায় দেখা হল সেই মোহানার ধারে। [গীতিমাল্য-১]

রাত্রি যেখানে অলক্তোচরণে দিনের তটসীমাকে স্পর্শ করিয়া যায়, উষার অস্পষ্ট আলোর মত অপ্রকাশের নিষ্কম্প জ্যোতি যেখানে প্রকাশলোকের ঈষৎ চেতনায় স্পর্শ করে, অজানা ও অধরার দিব্য রহস্য যেখানে অব্যক্ত আনন্দের বসন্ত জাগায় জানার বা ধরার

ধরাধামে, সেই সংসার ও সংসারাতীতের, 'মন' ও 'বিজ্ঞানের' মোহানার ধারে দাঁড়াইয়া রবীন্দ্রনাথ পূজা দিয়াছেন জীবনদেবতার। তাঁহার পূজার মন্ত্রগুলি কখনও 'মানসী'র কামনাবিহ্বল দ্বন্দ্বাবেগের ছন্দোঝংকারে কম্পিত, কখনও 'তরীর' অভিযাত্রার সচলতায় স্থিরাস্থির, কখনও 'চিত্রা'র রূপবিহ্বলতার প্রশান্তিতে ধ্যানমগ্ন, কখনও 'খেয়া'র পাওয়া-না-পাওয়ার সংশয়চাপল্যে দ্বৈতসত্যের ছন্দস্পন্দনে আমন্থর, কখনও 'বলাকা'র জীবনজয়ী চলমানতার যৌবনধন্য স্বপ্নকল্পনায় গতিশীল, আবার কখনও বা 'নৈবেদ্য'-'গীতালি'র ভাগবত প্রশান্তির মার্মিক রুদ্ধাভিমানে সাত্ত্বিক সুন্দর। 'সেই মোহানার ধারে' তাঁহার মন্ত্রগুলি কখনও জগতের কথা কহে, কখনও কহে ধারণাতীত কোনো জগদিশারার কথা।

রবীন্দ্রমানস-ভূমিতে ইহার বিচিত্র পরিচয়

সেইখানেতে সাদায় কালোয়
মিলে গেছে আঁধার আলোয়,
সেইখানেতে ঢেউ উঠেছে এপারে ঐপারে॥ [গীতিমাল্য-১]

এপার-ও আছে, ঐপার-ও আছে,—কিন্তু কোনো একটি বিশেষ পারের বন্ধনে তিনি নহেন বন্দী। আবার এ-কথাও সত্য, কোনো একটি বিশেষ 'পার' তাঁহার নাই বলিয়া গতাগতির তাঁহার অন্ত নাই। ঐপারের দিকে মুখ ফিরাইতে গিয়া এ-পারের কথা তিনি ভাবিয়া বসেন,—এপারের দিকে চোখ মেলিতে গিয়া ঐপারের স্বপ্নে বিভোর হন। রবীন্দ্রনাথের মনের সূক্ষ্মতর এই ভাবদ্বন্দ্ব একদিকে যেমন তাঁহাকে বৈচিত্র্যের কবি করিয়াছে, অপর দিকে তেমনি সমস্ত বৈচিত্র্যের অন্তরালে পূর্ণ ঐক্যতত্ত্বের একজন সত্যসন্ধানী দার্শনিক করিয়াও তুলিয়াছে।

নিত্যগতিপ্রবণ এবং নিত্য বৈচিত্র্যপ্রিয় এই চঞ্চলের লীলা-সহচর মনটিকে অনেক সময় তিনি নিজেই যেন বুঝিয়া উঠেন না :

ওরে আমার কর্মহারা, ওরে আমার সৃষ্টিছাড়া,
ওরে আমার মনরে, আমার মন······
তুমি যাদের চিনি বলে টানছ বুকে নিচ্ছ কোলে
আমি তাদের চিনতে নাহি পারি। [উৎসর্গ-৩৫]

ইহার পরেই কিন্তু ঐক্যসন্ধানী তাঁহার দার্শনিক মনটি বৈচিত্র্যের সমস্ত খেলা ছাড়িয়া খেলাগুলি দেখিবার জন্য সচেতন হইয়া থাকেন :

ওরে মন আয় তুই সাজ ফেলে আয়
মিছে কী করিস্ নাট-বেদীতে ?
বুঝিতে চাহিস্ যদি বাহিরেতে আয়
খেলা ছেড়ে আয় খেলা দেখিতে।

ওই দেখ নাটশালা
পরিয়াছে দীপমালা
সকল রহস্য তুই চাস যদি ভেদিতে
নিজে না ফিরিস্ নাট-বেদীতে ॥ [উৎসর্গ-৪০]

সত্যসন্ধী এই জীবনদ্রষ্টা দার্শনিকটিকে সঠিকভাবে চিনিতে না পারিলে বহুক্ষেত্রে তাঁহার শিল্পসৃষ্টিগুলিকে পরস্পরবিরোধী খেয়াল-খুশির রংতামাসা বলিয়া মনে করিব, কিংবা নিজের ধারণা ও বোধানুসারে 'এইটি ভালো, ঐটি মন্দ, এইটিতে শিল্প আছে, ঐটিতে তত্ত্ব আছে,' এইরূপ হাস্যকর অভিমত প্রকাশ করিয়া ভবিষ্যদ্বংশীয়দের কাছে অরসিক নামে অভিহিত হইবার পথ প্রশস্ত করিয়া যাইব। আসলকথা এই, রবীন্দ্রনাথে পরস্পরবিরোধিতা কিছু নাই, তাঁহার অন্তরস্থিত কবি ও দার্শনিকটির অভিন্নত্ব অনুভব করিতে শিখিলেই সমস্ত বিরোধিতার মধ্যে সামঞ্জস্য, সকল বৈচিত্র্যের মূলে রসঘন একপ্রকার ঐক্যতত্ত্ব দেখিতে পাইব। তখন এ-কথা অস্বীকার করিতে ইচ্ছা যাইবে না যে, তাঁহার খণ্ডকবিতা খণ্ডদৃষ্টিতে যেমন 'আপনাতে আপনি পর্যাপ্ত', ঐক্যদৃষ্টিতেও তেমনি, সে একটি সোপান পরম্পরার অঙ্গ'। কবি স্বয়ং বলিয়াছেন :

খণ্ডদৃষ্টিতে বিরোধাভাস

'খণ্ডকবিতাগুলিতে আমার সমগ্র কাব্যগ্রন্থের তাৎপর্য সম্পূর্ণ হয় নাই—সেই তাৎপর্য কী, তাহাও আমি পূর্বে জানিতাম না। এইরূপে পরিণাম না জানিয়া আমি একটির সহিত একটি কবিতা যোজনা করিয়া আসিয়াছি—তাহাদের প্রত্যেকের যে ক্ষুদ্র অর্থ কল্পনা করিয়াছিলাম, আজ সমগ্রের সাহায্যে নিশ্চয় বুঝিয়াছি, সে অর্থ অতিক্রম করিয়া একটি অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য তাহাদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিতেছিল।' [আত্মপরিচয়]

খণ্ডদৃষ্টিতে এই জগৎসৃষ্টিকে বিচার করিতে গিয়া ইউরোপীয় দার্শনিকদের অনেকে যেমন জগতে নানা বিরোধ, নানা দ্বন্দ্ব এবং পরস্পরবিরোধী নানা অসংলগ্ন ঘটনা আছে বলিয়া ভাবিয়াছেন, রবীন্দ্রকবিতাগুলিকে খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখিয়া অনেকেরি তেমনি এই ভাবনা হইতে পারে যে। ভাবানুভাবের বৈচিত্র্যই রবীন্দ্রকাব্যের প্রাণ, তাহার মধ্যে ঐক্যতত্ত্ব বা অবিচ্ছিন্ন কোনো তাৎপর্য কোথাও নাই। সংস্কৃতযুগ হইতে আজ পর্যন্ত সাধারণ কবিদের খণ্ডকাব্যগুলির বিচারপ্রসঙ্গে পণ্ডিতেরা যাহা বলিয়াছেন, রবীন্দ্রকাব্য সম্পর্কে তাহাই—অর্থাৎ পুরাতন সেই বিচারবোধ, সেই আলঙ্কারিক সংস্কার, রীতি ও পদ্ধতির কথা উত্থাপন করিয়াছেন। বিচারবোধের মত রসবোধেরও ভিন্ন ভিন্ন স্তর ও প্রকৃতি আছে—বিনয়ের সহিত এই কথা মানিয়া লইলেই বুঝিব, খণ্ডদৃষ্টিতে যে-রস আস্বাদন করি, সৃষ্টির সমগ্ররূপে লীলায়িত হইলে সেই রস-ই নবতর কোন আনন্দমূর্তির নবীন সৌন্দর্যে প্রভাসিত হইয়া জীবন ও মনকে বিচিত্র এক অনুপম বোধে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়। খণ্ডসৃষ্টি হইতে যে আনন্দরস ক্ষরিত হইতেছে, তাহা পান করিয়াই যদি তৃষ্ণা মেটে, সৃষ্টির

সমগ্রতার একটি অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য হইতে রসগ্রহণে আমি উদাসীনও রহিতে পারি, কিন্তু অকস্মাৎ যখন কোনো অনির্দেশ ইঙ্গিতে 'হঠাৎ আলোর ঝলকানির' মত সৃষ্টির সমগ্রতার রূপটি চোখের সামনে আশ্চর্য এক অদ্বিতীয় মহিমার আনন্দে বিভাসিত হইয়া যায়, তখনই বুঝিতে পারি, চিরাচরিত আলঙ্কারিক রীতিপদ্ধতি অথবা অধুনাতন ইউরোপীয় মনন-সংস্কার আর যাঁহার পক্ষে খাটে খাটুক, রবীন্দ্রশিল্প সম্বন্ধে খাটে না। রবীন্দ্র-শিল্পসৃষ্টি সম্পর্কে নূতন জীবনবিচার, নূতন দর্শনধ্যান ও অলঙ্কারতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। বুঝিতে হইবে, খণ্ডে যাহা আছে, অখণ্ডে তাহাই নূতন সুরে নূতন মর্যাদায় পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে। খণ্ডকবিতায় তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার রসবিচার করিয়াই ক্ষান্ত থাকিলে চলিবে না, সমগ্র সৃষ্টির রস ও তত্ত্ব-প্রবাহ হইতে তাহা যে বিচ্ছিন্ন নহে, তাহা জানিতে হইবে, জানার তত্ত্বও আবিষ্কার করিতে হইবে।

ইহা করিয়া লাভ? কবিতা যে খণ্ডক্ষুদ্র বেগ-প্রবৃত্তিরই শুধু প্রকাশ নহে, তাহা যে বৃহৎ জীবন হইতেও বিচ্ছিন্ন নহে, তাহার উপলব্ধি ও রসোদ্বেজনার আনন্দ কি পরম লাভ নহে? যদি বুঝিতে পারি জীবনে যা করিতেছি, যাহা হইতেছে, তাহা সব-ই এক সমগ্রতার সৌন্দর্যে সুন্দর হইয়া উঠিতেছে, তা' হইলে জীবন কি সহস্র দলের ন্যায় অবারিত আনন্দে ও আশ্বাসে পুলকিত হইতে চাহে না? রবীন্দ্রকাব্যের সমগ্রতার রূপে দেখি দোষত্রুটি, মান-অভিমান, ক্ষয়ক্ষতি প্রভৃতি অহং-এর সহস্র 'অতিকৃতি'র রূপবৈচিত্র্য কী এক অনির্বচনীয় আনন্দে আত্মার মহিমার মন্দিরে প্রবেশলাভ করিয়া সর্বজগৎরূপে এক হইয়া গেছে, সাধারণ জৈব জীবনের বেগগুলি কী আশ্চর্য গৌরবে চেতনার স্বচ্ছন্দ সৌন্দর্যে লীলায়িত হইয়া আশ্বাস দিয়াছে জীবসাধারণকে, বলিয়াছে, সামান্য আবেগও মিথ্যা নহে, যদি সেই আবেগ ক্রমশঃ আমাকে উচ্চতম জীবনের 'নাটবেদী'তে দেয় পৌঁছাইয়া; খণ্ড-ও মিথ্যা নহে, যদি খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডের ঈষৎ রশ্মিরেখা বিকীরিত হইয়া নবতর কোনো তাৎপর্যের স্বপ্নে আমাকে দোলাইতে পারে।

'কাব্য পড়ে যেমন বোঝ কবি তেমন নয় গো'—এই পংক্তিটির ব্যাখ্যা নানাপণ্ডিতে নানাভাবে করিয়াছেন। কবিকে খণ্ডকবিতার মধ্যে দেখিয়া বিচার করিবেন না, কেননা তিনি আছেন সমগ্র বৈচিত্র্যের একটি ঐক্য-সুন্দর মানসতত্ত্বের মধ্যে— এই কথাটিই কি কবি উক্ত পংক্তির মধ্যে ইঙ্গিত করিতেছেন? কবি কি আছেন খণ্ডকবিতার ছন্দোবন্ধনে? তাঁহার মুহূর্তগত মানসবেগের সাময়িক প্রতিকৃতিই কি খণ্ডকবিতায় মেলে না? কবির সমগ্র জীবনতত্ত্ব ও দর্শন কি কোনো একটি বিশেষ রচনায় খোঁজা সমীচীন? অবশ্য এ-কথা আমি মানি যে, খণ্ড যেমন অখণ্ডের দ্যোতনা করে, কবিগুরুর খণ্ড-রচনাতেও রাবীন্দ্রিক বিশেষত্বগুলি থাকে—থাকে সেই রবিপ্রতিভার রঙিন রশ্মিচ্ছটা, থাকে সেই বিপুলত্বের, সেই বিরাটত্বের আভাস, সেই বিশিষ্ট রচনারীতির অননুকরণীয় ভঙ্গিমা, সেই আলঙ্কারিক সংহত ভাষার আনন্দ

রবীন্দ্র-কাব্য-বিচারে অখণ্ডতার চেতনা

ইন্দ্রজাল। কিন্তু তাই বলিয়া কোনো একটি খণ্ডরচনায় অথবা বিশেষভাবের কতকগুলি রচনার সমাহারে কবির মন ও দর্শনকে যদি খুঁজিতে যাই, তবে একদেশদর্শিতার তমিস্রান্ধকারে কবির পূর্ণরূপটি কি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিব না? রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ভাগবতসঙ্গীত ও উচ্চতম ধ্যানধর্মী রচনাগুলির মধ্যেই আছেন, এইরূপ অনুমান করিয়া লইয়া সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন যদি কবির কাব্যদর্শন রচনা করিতে সুরু করেন, তবে সেই রচনায় কি সেই বিপুল, সেই বিরাট, সেই সমগ্র রবীন্দ্রনাথটিকে পাওয়া যাইবে? অথবা ভাগবতসঙ্গীতগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নাই—এইরূপ অনুমান করিয়া যদি কোন প্রবীণ সমালোচক কবিকে তাঁহার মানবপ্রেম ও প্রকৃতিপ্রেমবিষয়ক রচনাগুলির মধ্যেই 'পাইয়াছি' বলিয়া বক্তৃতা সুরু করেন, ভাগবত উচ্চধ্যানধর্ম রবীন্দ্রশিল্পের ও প্রতিভার অনুপযোগী বিষয় বলিয়া বর্ণনা করিতেও সংকোচবোধ না করেন, তবে কি তিনি সত্য বলিতেছেন বলিয়া মনে হইবে? রবীন্দ্রনাথ কোন্ কবিতায় বা কাব্যে আছেন? মানসীতে? তবে খেয়া কাহার লেখা? রবীন্দ্রনাথ কি ক্ষণিকায় আছেন? তবে গীতাঞ্জলি কোন্ কবি রচনা করিয়াছেন? তবে কি পূরবীতে আছেন? কিন্তু পুনশ্চ দেখিয়া কি সে-বিশ্বাসে সংশয় জাগে না? তাই কবি বলিতেছেন: 'কাব্য পড়ে যেমন বোঝ, কবি তেমন নয় গো।' কবিকে, কবিমানস ও কবিদর্শনকে যথার্থভাবে বুঝিতে হইলে খণ্ডকাব্যের ক্ষুদ্র অর্থ হইতে সমগ্রতার বৃহৎ তাৎপর্যের ভূমিকায় অবতরণ করিতে হইবে। কাব্য হইতে যদি জীবনকে জানিতে চাহি তবে বিশেষ কোন ভাববিশেষের কাব্যভাবে মনকে বন্দী করিলে চলিবে না, বিচিত্রভাবের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে মনকে মুক্তি না দিলে রসজ্ঞ হওয়া সম্ভব নহে। রসজ্ঞ যে নহে সে জীবনকে জানিতে পারে বলিয়া আমি মনে করি না। জীবনকে যে জানিতে পারে, বিশেষ কোনো মানসবেগই যে কেবল 'সাহিত্যের সামগ্রী', তাহা সে মনে করে না। যে-কাব্যের তাজমহলদর্শনে সৌন্দর্যমুগ্ধ আমরা 'কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল' বলিয়া আত্মহারা হইতেছি, সেই তাজমহলের রূপাসক্তি হইতে তাহার মহান স্রষ্টা 'ভারমুক্ত' হইয়া কোথায় যে কোন্ ধ্যানের মুক্ত স্বর্গে বিচিত্র এক নূতন শিল্পরচনায় সমাধিস্থ আছেন, তাহা কি জানি?

খণ্ডকাব্য ও সমগ্রসাধনা

রবীন্দ্রমানসের এই প্রকৃতি এবং তাহার দর্শনতত্ত্ব সুধীর ধ্যানের দ্বারা যদি ধরিয়া লইতে পারি তবেই মনের তুচ্ছতম আবেগগুলি বিশোধিত হয়, তবেই উচ্চতম জীবনের পটভূমিকায় আত্মদর্শন ঘটে। বলা বাহুল্য, এই আত্মদর্শন বেদান্তী সমাধিস্থের বস্তুনিরপেক্ষ আত্মদর্শন নহে, ইহা ভাবঘন রসজীবনের উদার মধুর মর্মদর্শন। এই দর্শনে মনের বন্ধন ছিন্ন হয়, ফলে সর্বত্র মন চলিতে চায়, 'চাইতে চায়', কিছুকেই বাদ দেয় না, 'গ্রন্থি' স্বীকার করে, কিন্তু 'গ্রন্থি'টি' বন্ধনহীন' বলিয়া কোথাও বুঁদ হইয়া, মাতাল হইয়া পড়িয়া থাকে না।

নিম্নলিখিত কয়েকটি বাহ্যতঃ পরস্পরবিরোধী পংক্তি পাঠ করিলেই রসের দিক দিয়া রবীন্দ্রমন ও দর্শন উপলব্ধি করা সহজ হইবে :

আমি যে বন্দী হতে সন্ধি করি
সবার কাছে।

সঙ্গে সঙ্গে পড়ুন :

কেবলই এড়িয়ে চলার ছন্দে তাহার
রক্ত নাচে॥ [বিচিত্র-৬০, গীতবিতান]

*

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে [কড়ি ও কোমল]

এর সঙ্গে পড়ুন :

প্রবাসীর বেশে কেন ফিরি হায়
চির-জনমের ভিটাতে॥ [উৎসর্গ-১৪]

*

মন-দেয়া-নেয়া অনেক করেছি,
মরেছি হাজার মরণে—
নূপুরের মতো বেজেছি চরণে
চরণে।
আঘাত করিয়া ফিরেছি দুয়ারে দুয়ারে,
সাধিয়া মরেছি ইঁহারে তাঁহারে উঁহারে,
অশ্রু গাঁথিয়া রচিয়াছি কত মালিকা
রাঙিয়াছি তাহা হৃদয়-শোণিত
বরনে।

এর সঙ্গে পড়ুন :

সবলে কারেও ধরিনে বাসনা-মুঠিতে
দিয়েছি সবারে আপন বৃন্তে ফুটিতে—
যখন ছেড়েছি উচ্চে উঠার দুরাশা
হাতের নাগালে পেয়েছি সবারে [ক্ষণিকা]
নিচুতে॥

আমি নইলে মিথ্যা হত সন্ধ্যাতারা ওঠা–
মিথ্যা হত কাননে ফুল-ফোটা। [পলাতকা]

এর সঙ্গে আবার :

প্রভু, তোমার বীণা যেমনি বাজে
আঁধার-মাঝে
অমনি ফোটে তারা

যেন সেই বীণাটি গভীর তানে
আমার প্রাণে
বাজে তেমনি ধারা ॥' [গীতিমাল্য-৫১]

রবীন্দ্রনাথের মানস-গতির স্বরূপ ও প্রকৃতি বুঝাইবার উদ্দেশ্যে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত যে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত হইল, সেগুলি হইতেই এ-কথা স্পষ্ট হইবে যে, বিশেষ কোনো বিষয়ে, ভাবে বা আবেগে কবি বন্দী নহেন বলিয়াই বিভিন্ন বিশেষের বিচিত্র ধ্যান ও আবেগের 'লীলা সহচর' হওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে। অপর পক্ষে সাধন-মার্গের কোনো বিশেষ রীতি অনুসরণ করিয়া চিত্তবৃত্তি-নিরোধের প্রচেষ্টা তিনি করেন নাই বলিয়া তাঁহার ভাগবত ধ্যান ও ধর্ম মন হইতে তাঁহাকে অবাঙ্‌মনসোগোচর নির্বিকল্প কোনো মহিমায় উত্তীর্ণ করিতে পারে নাই। ফল হইয়াছে এই, তাঁহার ধর্মধ্যান নৈষ্কর্ম্যের পথে না গিয়া কর্মজ্ঞানে রূপান্তরিত হইয়াছে, তাঁহার ব্রহ্মবোধ অবতীর্ণ হইয়াছে মানববোধের মাহাত্ম্যে। তাঁহার সহজসাধনায় জৈববাসনা তুচ্ছতা অতিক্রম করিয়া কেমন-এক স্বর্গসুন্দর চেতনায় নবরূপ ধারণ করে, অপরপক্ষে তাঁহার ব্রহ্ম জগৎ-নিরপেক্ষ নির্বিশেষত্ব ত্যাগ করিয়া পরম এক মহান ব্যক্তিত্বে রূপ পরিগ্রহ করে। তাঁহার কবিতার বিচিত্র সৃষ্টি এবং দর্শনের তাত্ত্বিক দৃষ্টি এক জীবনের সঙ্গমস্থলে মিলিত হইয়া বস্তুকে স্বপ্নোপম করে, স্বপ্নকে জীবনগত বস্তুসত্যে ঘনীভূত করিয়া আনে। এই কারণে আমার মনে হইয়াছে, তাঁহার দর্শন না জানিলে, কবিতার লোকোত্তর স্বপ্নবাসনার রসোপলব্ধি সম্ভব নহে, তাঁহার কবিতা না মানিলে দর্শনের লোকায়ত ব্রহ্মজ্ঞানের মহিমোপলব্ধি সম্ভব নহে। বিস্তৃত তাঁহার মনের মার্গ বাহিয়া কাব্য ও দর্শনের অশ্বিনীকুমারদ্বয় পাশাপাশি চলিয়াছে দেবযান পথে, বহু বাধা, বহু দুঃখ, বহু সংশয় ভেদ করিয়া উন্নীত হইয়াছে মনোভূমির উচ্চমার্গে,—মনের সীমারেখা যেখানে শেষ হয়-হয়, সেখান হইতে আবার ব্যাকুল টানে ফিরিতে চহিয়াছে পৃথিবীর মন্দিরে। মন আছে, তাই গতাগতি। তাই খেলা, খেলায় মাতিয়া যাওয়া, কখনও বা আবার খেলা ছাড়িয়া খেলা দেখিতে বসা,

এই বিরোধের তাৎপর্য

রবীন্দ্রমানস-মার্গে কাব্য ও দর্শনের সম্মেলন

বসিতে বসিতে ধ্যানমগ্ন হওয়া, উধাও হইয়া যাওয়া 'মনের মনে', 'মাধুরী' হেরিতে হেরিতে সংসারই যেন ভুলিয়া যাওয়া—

আমারে তুমি অশেষ করেছ এমনি লীলা তব
ফুরায়ে গেলে আবার ভরেছ জীবন নব নব।
কত-যে গিরি কত-যে নদীতীরে
বেড়ালে বহি ছোটো এ বাঁশিটিরে,
কত-যে তান বাজালে ফিরে ফিরে
কাহারে তাহা কব॥ [গীতিমাল্য-২৩]

তৃতীয় অধ্যায়

ব্রহ্ম

"স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ? স্বে মহিম্নি।' নিজের মহিমায়। মানুষেরও আনন্দ মহিমায়।"

"এই তিনি, বস্তু-অবচ্ছিন্ন একটা তত্ত্বমাত্র নন। যাকে বলি আমার আমি সে যেমন অন্তরতমভাবে আমার একান্ত বোধবিষয়, তিনি-ও তেমনি। যখন তাঁর প্রতি ভক্তি জেগে ওঠে, যখন তাঁতে আনন্দ পাই, তখন আমার এই আমি-বোধই বৃহৎ হয়, 'গভীর হয়', প্রসারিত হয় আপন সীমাতীত সত্যে।"

"বৈজ্ঞানিক বলেন, দেবতাকে প্রিয় বললে দেবতার প্রতি মানবিকতা আরোপ করা হয়। আমি বলি, মানবত্ব আরোপ করা নয়, মানবত্ব উপলব্ধি করা। মানুষ আপন মানবিকতারই মাহাত্ম্যবোধ অবলম্বন করে আপন দেবতায় এসে পৌঁছেচে। মানুষের মন আপন দেবতায় আপন মানবত্বের প্রতিবাদ করতে পারে না।"

[মানুষের ধর্ম, পৃ. ২৩, ৪৩, ৪৫]

তৃতীয় অধ্যায়

ব্রহ্ম

গতিধর্মী রবীন্দ্রনাথ স্থিতিরও স্বপ্ন দেখিয়াছেন; এইজন্য কেহ কেহ তাঁহার মধ্যে পরস্পরবিরোধিতা লক্ষ্য করিয়াছেন। কেহ-বা তাঁহাকে বৈচিত্র্যের কবি বলিয়া সকল তর্কের অবসান ঘটাইয়াছেন; আবার কেহ-বা তাঁহার মধ্যে দুইটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব কল্পনা করিয়া সকল সমস্যার সমাধান করিতে চাহিয়াছেন। কোনো কোনো সমালোচকের অভিমত এই যে, যেখানে রবীন্দ্রনাথ গতিধর্মী, সেইখানে তিনি কবি, এবং কবিধর্মই তাঁহার প্রতিভার স্বরূপ। যে স্থলে তিনি স্থিতির উপাসক সেখানে তিনি দার্শনিক; কিন্তু দার্শনিকতার প্রভাবে তিনি যা কিছু লিখিয়াছেন বা ভাবিয়াছেন, তাহা তাঁহার কবিকর্মের ও কবিধর্মের অনুকূল নহে [রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ, ভূমিকা; প্রমথনাথ বিশী]। এইজন্য কেহ কেহ ধারণা করিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথের কবি হইতে দার্শনিককে পৃথক করিয়া দেখিতে পারিলেই রবীন্দ্রসাধনা সহজবোধ্য হইতে পারে।

গতিধর্ম ও স্থিতিধর্ম

কবি হইতে দার্শনিককে যাঁহারা পৃথক করিতে চাহেন, দার্শনিক অর্থে সম্ভবতঃ তাঁহারা বেগবিহীন বিশুদ্ধ তাত্ত্বিককেই শুধু বুঝিয়া থাকেন। এ-কথা অবশ্য কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, ভারতবর্ষে এমন অনেক নৈয়ায়িক ও তাত্ত্বিকের জন্ম হইয়াছে, সাধারণ মানুষের বিচারে যাঁহারা জীবন-বহির্ভূত জ্ঞানতত্ত্বের সাধক ছাড়া আর কেহ নহেন। আমি আছি কি নাই, আত্মা কী এবং কোন্ স্থলে তাহার অমরত্ব? প্রকৃতি কী এবং পুরুষই বা কে? পুরুষ এক না বহু? ব্রহ্ম আছেন কি নাই? যদি থাকেন, কী তাঁহার স্বরূপ? জগতের সহিত কী তাঁহার সম্বন্ধ? জগৎ কি মায়া? যদি মায়া হয়, তবে আমরা কী?—প্রভৃতি রসবিহীন তর্কবিচারের কচকচির মধ্যে রসপিপাসু মানুষের মন মুহূর্তকাল তিষ্ঠিতে পারে না; 'দার্শনিক' এই শব্দ শুনিবা মাত্র তর্কচঞ্চু নীরসবাক্ কোনো বিরসবদনকে তাই বুঝি মনে পড়িয়া যায়। যে জীবন বা যে জগৎকে আমরা ভোগ করিতেছি, রূপে-রসে-বর্ণে-গন্ধে যে জগৎ আমাদের স্বপ্নবিভোর ও বাসনাচঞ্চল করিয়া রাখিয়াছে, প্রাণের পরতে পরতে যাহার প্রেম মোহ ও মমতার বন্ধন, যাহাকে ত্যাগ করিবার কথা উঠিলেই অনমুভূত এক অসহ্য বেদনায় সর্বতন্ত্রী টন্ টন্ করিয়া উঠে,—সেই মধুময়, সুধাময়, বাসনাময় আনন্দধামকে অনিত্য

কবি ও দার্শনিক

বলিয়া তর্কের দ্বারা, যুক্তির দ্বারা যাঁহারা বুঝাইতে আসেন, মন তাঁহাদের অদর্শন কামনা করিয়া মনোমোহন কবিকে মনোবিহীন দর্শন হইতে পৃথক তো করিবেই।

এ-কথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই, ভারতবর্ষে অনেক তত্ত্ব-দার্শনিক ছিলেন ও আছেন, যাঁহারা ব্রহ্মই একমাত্র সত্যবস্তু, 'তদন্যদখিলমনিত্যম্' বলিয়া ভূমানন্দ অনুভব করিয়াছেন। গৌতমবুদ্ধ জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন, শঙ্করের বেদান্ত ভাষ্যে জগতকে মায়া বলা হইয়াছে। পাতঞ্জলগণ চিত্তবৃত্তিনিরোধ করিয়া পরমাত্মদর্শনের যে তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার মধ্যেও প্রাণময়ী প্রকৃতির প্রতি কোনো করুণা বর্ষিত হয় নাই। বিজ্ঞানভিক্ষু শঙ্করের ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শঙ্করদর্শনকে যদিও 'প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধদর্শনম্' বলিয়া অপরোক্ষভাবে দীনা ধরণীর প্রতি কিঞ্চিৎ কৃপা করিতে গেছেন, কিন্তু তাঁহার তত্ত্বদর্শনকে যদি কেহ জগৎনিরপেক্ষ তত্ত্ববিদ্যার নীরস বৈজ্ঞানিকতা নাম দেয়, সাধারণে সম্ভবতঃ ক্ষুণ্ণ হইবে না। রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে জগৎকে স্বীকার করা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাত্ত্বিককে 'বিচারের সময় জীব ও জগৎকে অনাত্মা ও অবস্তু' বলিতেই হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতের দৃষ্টিতে দার্শনিক

বেদান্তের মায়াবাদ মানুষের স্বপ্নমোহ ভাঙিয়া দেয়, জীব-জীবনের কান্ত বাসনা-সন্মোহকে ছিন্নভিন্ন করিয়া মনকে তুলিয়া লয় মনোবিহীন বিজ্ঞানানন্দে। তখন 'সচ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্' এই অনুভব হয়। গতিবিহীন, গুণবিহীন নিষ্কামতার অখণ্ড জ্যোতির স্বর্গে জীব তখন চৈতন্যে চৈতন্য ছাড়া আর কিছু নহে। ব্রহ্মকে জানিয়া জীব তখন ব্রহ্মই হইয়া যায়। "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি"। [মুণ্ডঃ ৩।২।৯]

এই যে তত্ত্ব, এই তত্ত্বের জ্ঞান হইলেই, শঙ্কর বলিয়াছেন, মুক্তি আসিবে। অর্থাৎ, ব্রহ্মানন্দই সত্য আর কোনো আনন্দ সত্য নহে, এই বোধ যখন সাধকের জ্ঞানে আবির্ভূত হইবে, তখন আর কিছুতেই সে আসক্ত হইবে না, জগতের কোনো রূপবৈচিত্র্যেই তাহার সাড়া মিলিবে না, নিষ্কম্প প্রদীপের মত সে তখন নিষ্ক্রিয় নির্জ্ঞানের ধারণাতীত কোনো মহিমার তটে সমাধি লাভ করিবে।

'সমাধি দুই প্রকার, সবিকল্প ও নির্বিকল্প। যে সমাধিতে জ্ঞাতা, জ্ঞান কি না চিত্তবৃত্তি, ও জ্ঞেয় কি না অদ্বিতীয় বস্তু এই তিনের ভান হয় তাহার নাম সবিকল্প সমাধি।···নির্বিকল্প সমাধিতে জ্ঞাতা ও জ্ঞানের ভান না হইয়া কেবল অদ্বিতীয় বস্তুর ভান বা স্ফূর্তি হয়। নির্বিকল্প সমাধিতে চিত্তবৃত্তি থাকে বটে, কিন্তু ঐ চিত্তবৃত্তি অদ্বিতীয় বস্তুর আকার ধারণ করে বলিয়া যেন অদ্বিতীয় বস্তুর সহিত এক হইয়া যায়। এইজন্য পৃথকভাবে চিত্তবৃত্তির ভান হয় না। [শ্রীচন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার : বসুমল্লিক ফেলোসিপের বক্তৃতা, ৪র্থ বর্ষ ৭ম বক্তৃতা, পৃ. ১৮০]

এই নির্বিকল্প সমাধি যাঁহাদের হইয়াছে, অথবা এই সমাধিবিজ্ঞানে যাঁহারা বিশ্বাসী,

তাঁহাদের ব্রহ্ম বা ব্রহ্মবোধ হইতে রবীন্দ্র-অনুভূত ব্রহ্ম যে পৃথক, তাহা বোধ হয় না বলিলেও চলে। রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম মানেন, ব্রহ্মের নিকট প্রিয়তম স্বদেশও তাঁহার তুচ্ছ মনে হয়। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য—একথাও তিনি একাধিক প্রবন্ধে বলিয়াছেন। ব্রহ্মের সরিক তিনি মানিতে সম্মত নহেন, এমন উক্তিও তাঁহার রচনা হইতে উদ্ধৃত করা যায়। কিন্তু এই সমস্ত কারণেই কি তাঁহার দার্শনিকটিকে কবি হইতে পৃথক করিতে হইয়াছে? আমার বিশ্বাস, রবীন্দ্র-ব্রহ্ম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকার জন্যই আমরা তাঁহার ব্রহ্মবাদী দার্শনিকটিকে গতিবাদী কবি হইতে পৃথক ভাবিয়াছি। রবীন্দ্র-ব্রহ্মের স্বরূপ সন্ধানে যত্নবান হইলে রবীন্দ্র-সাধনার স্তর ও জাতি নির্ণয়ে কোনো মতানৈক্য থাকে না বলিয়াই আমার ধারণা। এইজন্য বর্তমান অধ্যায়ে ব্রহ্ম সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু লিখিত হইতেছে।

তাঁহাদের ব্রহ্মবোধ ও রবীন্দ্রচেতনায় ব্রহ্ম

বেদান্ত প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ প্রভাবিত বটেন, কিন্তু বৈদান্তিকদের গতানুগতিক ব্যাখ্যাকার অথবা অন্ধ অনুসারক তিনি নহেন[১]। সাহস করিয়াই বলা যায় যে, সংস্কার-বিহীন চিত্তে তিনি, তাঁহার অজ্ঞাতসারেই, নূতন একটি অদ্বয়দর্শনের প্রতিষ্ঠা দিয়াছেন। অদ্বয়ব্রহ্মবাদে তিনি বিশ্বাসী—এ-কথা সত্য, কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে, তাঁহার অদ্বয়ধর্মের উৎস 'মন',—বৈদান্তিকদের 'বিজ্ঞান' অথবা 'তটস্থানন্দ' নহে। ব্রহ্মকে তিনি অনুভব করিয়াছেন কিন্তু চিত্তবৃত্তির বাহিরে ধারণাতীত কোনো ব্রহ্মের তিনি খোঁজ রাখেন না। "নৈব বাচা, ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা" [কঠ : ৬।১২,] এ-কথা তিনি জানেন, এই জাতীয় বহুতর বচনও তিনি তাঁহার দর্শন-প্রবন্ধাবলীতে উদ্ধৃত করেন, কিন্তু যুক্তির দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করেন এই যে, বাক্যের দ্বারা, মনের দ্বারা, চক্ষুর দ্বারা তাঁহাকে যে পাওয়া যায় না, এ-বোধও তো মনের। মনের অতীতে যদি কোনো বোধ থাকে, তবে মন দিয়াই তো তাহাকে অনুভব করিতে হইবে।

'শাস্ত্রে যা' লেখে তা' সত্য কি মিথ্যা বলতে পারি নে—কিন্তু সে সমস্ত সত্য অনেক সময় আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী, বস্তুতঃ আমার পক্ষে তার অস্তিত্ব নেই বললেই হয়। আমার সমস্ত জীবন দিয়ে যে জিনিসটাকে সম্পূর্ণ আকারে গড়ে তুলতে পারবো, সেই আমার চরম সত্য'। [পুরাতন চিঠি : আত্মপরিচয়, পৃ. ১১]—বলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। বৈদান্তিকগণ এই সব উক্তির বিরুদ্ধে বিস্তর আপত্তি তুলিবেন আমি জানি; কিন্তু এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না যে, রবীন্দ্রনাথের এই সমস্ত উক্তির সাহায্যেই আমরা তাঁহার দার্শনিকটির স্বরূপ সম্পর্কে স্পষ্ট একটি ধারণা করিতে পারি।

১ দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথও স্বীকার করেন যে, রবীন্দ্রদর্শন **"are-statement of any traditional philosophy"** নহে। **Tagore Birthday Number—p. 221**

বেদান্ত বলেন, ব্রহ্ম সর্বত্র, সর্ব জীবনেই অধিষ্ঠিত আছেন। অন্নময় জীবনে যাঁহারা বস্তুগত জগৎভোগে লালায়িত, প্রাণময় জীবনে যাঁহারা জগৎজয়ে নিত্যসংগ্রামী, মনোময় জীবনে যাঁহারা ভোগে ও যোগপ্রশান্তির আনন্দে ধ্যানধীর, বিজ্ঞানময় জীবনে যাঁহারা সদসৎবিচারের অতীত হইয়া যোগশান্ত তুরীয়ানন্দী, আনন্দময় জীবনে যাঁহারা ব্রহ্মবোধে স্বয়ং ব্রহ্ম—তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব অধিকার অনুসারে ব্রহ্মাশীর্বাদে উদ্দীপ্ত হইয়া থাকেন। বেদান্তানুসারে জীবনকে যে পাঁচভাগে বিভক্ত করা হইল, সেই পাঁচভাগের শেষোক্ত দুইভাগ জগদতীত বোধাতীত সমাধি-বিজ্ঞানের অনুকূল। পূর্বেই বলিয়াছি রবীন্দ্রদর্শনে এই দুইভাগের বিশেষ কোনো মর্যাদা নাই। অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় জীবনেই তিনি লীলা করিতে চাহিয়াছেন—মনোজীবনের উত্তুঙ্গ শৈলশিখরে আরোহণ করিয়াছেন—এত উচ্চে উঠিয়াছেন যেখান হইতে মধ্যে মধ্যে বিজ্ঞান-জীবনের রশ্মিরেখাও বুঝি দেখা যায়।

বেদান্ত-ব্রহ্ম

বিজ্ঞানের অনুবর্তী এই মনোজীবনকে শাস্ত্রে সাতটি স্বতন্ত্র ভূমিতে বিভক্ত করা হইয়াছে: 'বেদে আছে যে সপ্তম ভূমিতে মন গেলে সমাধি হয়, সমাধি হলেই তবে অহং চলে যেতে পারে। মনের সচরাচর বাস কোথায়? প্রথম তিন ভূমিতে। লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি সেই তিন ভূমি, তখন মনের আসক্তি কেবল সংসারে, কামিনীকাঞ্চনে। হৃদয়ে যখন মনের বাস হয়, তখন ঈশ্বরীয় জ্যোতিঃ দর্শন হয়, সে ব্যক্তি জ্যোতি দর্শন করে' বলে, 'একি! একি'! তারপর কণ্ঠ—সেখানে যখন মনের বাস হয়, তখন কেবল ঈশ্বরীয় কথা কইতে ও শুনতে ইচ্ছা হয়। কপালে ভ্রূমধ্যে মন গেলে তখন সচ্চিদানন্দ রূপ দর্শন হয়, সেই রূপের সঙ্গে আলিঙ্গন, স্পর্শন করতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু পারে না। লণ্ঠনের ভিতর আলো দর্শন হয় কিন্তু স্পার্শন হয় না, ছুঁই-ছুঁই বোধ হয় কিন্তু ছোঁয়া যায় না। সপ্তম ভূমিতে মন যখন যায় তখন অহং আর থাকে না, সমাধি হয়'। [কথামৃত: ১ম ভাগ ২য় সং, পৃ. ৭৩]

সপ্তভূমি

বেদের ঋষিদের অনেকেই এই সাতটি ভূমির কথা বলিয়াছেন। [কেহ আবার আট, কেহ নয়, কেহ দশ, এমনকি বারোটির কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। Life Divine, foot-note, p.333.] পাতঞ্জলদর্শনে মনের মোটামুটি পাঁচটি স্তরের কথা বলা হইয়াছে: ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একান্ত ও নিরুদ্ধ। মনের নিম্নতম তলদেশে অবস্থিত আছে 'ক্ষিপ্ত' স্তর, তাহার একটু ঊর্ধ্ব প্রদেশে 'মূঢ়', 'বিক্ষিপ্ত' স্তরে আছে সাধারণ মানবমনসমাজ, 'একাগ্র' নামক স্তরটি আছে সাধকমনের অন্তর্লোকে, 'নিরুদ্ধ' নামক স্তরটিই মানবমনের সর্বোচ্চভূমি। এই 'নিরুদ্ধ' স্তরই যে বেদপ্রোক্ত সেই সপ্তমস্তর, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেণ্ট আগাস্টাইনের সাধনাতেও মনের এই সপ্তভূমির সন্ধান মিলিয়াছে:

> St. Augustine arranges the ascent of the soul in seven stages. But the higher steps are, as usual, purgation, illumination

> and union. This last, which he calls 'the vision and contemplation of truth' is 'not a step but the goal of the journey'. [*Christian Mysticism* by William Ralph Inge. p. 130.]

শ্রীঅরবিন্দের সাধনায় এই 'goal' এর কথা পাইয়াছি। *The Life Divine*এ 'The sevenfold Chord of Being'-এর কথা উল্লেখিত হইয়াছে। তাঁহার কবিতাতেও 'Sevenfold Noon'-এর কথা পাইয়াছি। [*Flame-Wind*, Collected Poems]

চরমকে পাইতে হইলে এই সপ্তমভূমিতে, ঐ নিরুদ্ধ স্তরে, উপনীত হইতেই হয়। তখন সমাধি হয়। সমাধি হইলে পরমহংসদেব বলিতেন 'মনের নাশ হয়'। তখন 'কি বোধ হয় মুখে বলা যায় না।' [কথামৃত ১ম, পৃ. ৭৩] পূর্বেই বলিয়াছি রবীন্দ্রনাথ মনোভূমির এই স্তরে উঠিয়া 'বৈরাগ্য সাধনে' মুক্তিলাভ করিতে চাহেন না। তাঁহার মনের স্থিতি, বৈদিক ভাষায়, 'হৃদয়ে' 'কণ্ঠে' এবং কখনও কখনও 'কপালে'। কপালে মন গেলে 'রূপসাগরে ডুব' দিয়া 'অরূপরতন' পাওয়ার বাসনা জাগে, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় 'ছুঁই-ছুঁই বোধ হয়'—'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না' বলিয়া বেদনা জাগে, অনুরাগে হৃদয় ব্যাকুল অভিমান অনুভব করে। এই বেদনা ও অভিমান কবিগুরুর ভাগবত সঙ্গীতগুলির মধ্যেও মধুরানন্দে ঝঙ্কৃত হইয়াছে। মনের ষষ্ঠ ভূমি পার হইলে তাঁহার কবি মূক হইতে পারিত, তাত্ত্বিক দার্শনিকের সমাধি হয়তো সম্ভব হইয়া যাইত। কবিদার্শনিকের পক্ষে এই সমাধি বাঞ্ছনীয় নয়, তবে যোগী-দার্শনিকদের পক্ষে বাঞ্ছনীয় বটে। যোগীন্দ্র শ্রীঅরবিন্দ বলেন : "মনের প্রকৃতিই হইতেছে একটা দিকে, একটা খণ্ড প্রকরণে আবদ্ধ থাকা—মন জানিতে পারে কেবল অংশবিশেষকে, স্বরূপ দূরে থাকুক, রূপের সে যতটুকু জানে তাও অতি অল্প, অতিমাত্র বাহিরেরই। তাই সেই জানার কাছে আসল মূল সত্তাটি চিরদিন প্রতিমুহূর্তেই নব নব বর্ণসম্পাতে ফুটিয়া উঠিতেছে, তাই 'যুগ যুগ ভরি রূপ নেহারিনু নয়ন না তিরপিত ভেল'। সে যে নিগূঢ়ের অসীমের বস্তু—তাই সে মনের কাছে অচেনা, অজানা। কিন্তু এই অজানাকে জানি বিশেষরূপে, জানি সেই জানার মধ্য দিয়া যে জানা চোখের দেখার উপর নির্ভর করে না, যে জানা মানসপ্রত্যয় নয়—যে জানা হইতেছে জ্ঞান, দিব্যদৃষ্টি, অপরোক্ষানুভূতি। এই যে তুরীয় চেতনা, সেখানে যদি জাগিতে পারি তবে সেখানে ধরিতে পাই বস্তুর আত্মায় অনন্তের সবখানিই। কারণ সেখানে সান্ত দিয়া অনন্তকে ধরিতে যাই না, অনন্ত দিয়াই অনন্তকে আলিঙ্গন করি"। [দেবজন্ম, জানা ও অজানা। শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত]

মনের নাশ

এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ

যোগজীবনের এই আনন্দ রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো গানে বা কবিতায় যে ফুটিয়া বাহির হয় নাই তাহা বলিতে পারি না। ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়, যোগজীবন অপেক্ষা

Entbehren Sollst du! Sollst entbehren—Thou shalt, thou must refrain.' 'ফাউষ্টের' মূলতত্ত্ব ও নীতিব্যঞ্জনা ইহাই। বস্তুতঃ মানুষজীবনে ত্যাগ করিবার প্রেরণা আছে বলিয়াই বৃহতে রতি আছে। গ্যেটের জীবনদর্শনে এই বৃহতে রতির বেদনা আছে, চেতনা আছে প্রাপ্তির প্রত্যাশা আছে, কিন্তু পূর্ণ প্রসন্নতা নাই।

The noon in storm, the eve in rest
So sped my life's brief day.
What then? [*Wanderer's Night-songs,* An Anthology of World Poetry, p. 781.]

কিংবা

The birds are asleep in the trees :
Wait ; soon like these
Thou too shalt rest. [*A Voice,* Ibid, p. 775.]

উপরিলিখিত গীতিকবিতার অংশবিশেষ অনুধাবন করিলেই গ্যেটে-মানসের স্বরূপ সুস্পষ্ট হয়। গ্যেটে প্রাকৃতজীবনে শিখিয়াছিলেন বিস্তর, পার্থিব বিদ্যা প্রায় সমস্তই আয়ত্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃতির অধীশ্বরত্ব তো পান নাই! প্রকৃতিকে জয় করিয়াই তো প্রকৃতির অধীশ্বরত্ব সম্ভব? প্রকৃতি জয়ের চেতনা গ্যেটের মধ্যে কখন-কখন দেখা দিলেও প্রকৃতির উপরে মনোজীবনের ঊর্ধ্বলোকে তিনি কদাপি যাইতে পারেন নাই। প্রাকৃতজীবনে এইজন্য তাঁহাকে অহরহঃ পড়িতে হইয়াছে, উঠিতে হইয়াছে, আবার পড়িতে হইয়াছে। 'Shadowy Shapes' নামক গীতিকবিতায় এই ওঠা-পড়ার স্বপ্নযন্ত্রণা চমৎকারভাবে তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। [*Echoes from East & West* by Roby Dutta, p. 215.] ভারতের ঋষিবৃন্দের সাধনায় আমরা কিন্তু জানিয়াছি, যতদিন 'মন' আছে, ততদিন এই স্বপ্নযন্ত্রণা থাকিবেই—পথ চলিতে পদে পদে ভুল ঘটিবেই। গ্যেটে ইহাও বুঝিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যত দিন মানুষ মানুষী শক্তি লইয়া সংগ্রাম তৎপর, ততদিন তাহার ভুল হইবেই। Es irrt der Mensch so lang' er strebt——So long as a man strives, he makes mistakes. আসলে তিনি পুরাপুরি পৃথিবীর সন্তান—Das Weltkind—The world-child, অহরহঃ সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছেন প্রকৃতির সহিত, চির-অতৃপ্ত তাঁহার অভিযাত্রা—এইজন্য গতি তাঁহার অন্তহীন। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিতে পারেন তাঁহার 'Prometheus' এর অংশবিশেষ, যেমন :

'Here sit I, fashion men
In mine own image,—
A race to be like me,

To weep and to suffer,
To be happy and to enjoy themselves,—
All careless of thee too,
As I ! [An Anthology of World Poetry, p. 784.]

কিংবা, *'Soldier's Song'*-এর শেষাংশ :
'Stormy our life is ;
Such is its boon'. [Ibid, p. 788.]

অথবা, 'Faust'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে দেবদূতবৃন্দের সমাপ্তি-সংগীত :
Wer immer strebend sich bemiiht
Whcever strives without resting.

গ্যেটে-জীবনের এই নিত্য অভিযাত্রার বাণী-ব্যঞ্জনা রবীন্দ্রজীবনেও নানাভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া গোটের সহিত রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্মতম কোনো ভেদ যে নাই, তাহা নহে। প্রেমদর্শন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা অনেকাংশে পৃথক ও সূক্ষ্মধর্মী। 'প্রকৃতি' নামক অধ্যায়ে দেশবিদেশের অন্যান্য বিখ্যাত কবিদের প্রেমভাবের সহিত রবীন্দ্রপ্রেমমানসের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া এই পৃথকত্ব ও সূক্ষ্মধর্মিতা স্পষ্ট করিব। বর্তমানে এইটুকু বলাই প্রাসঙ্গিক হইবে যে, গ্যেটে যেমন মনোজীবনের ঊর্ধ্বলোকে যাইতে চাহেন নাই, রবীন্দ্রনাথও তেমনি মনোজীবন ত্যাগ করিয়া, প্রকৃতিজীবন ত্যাগ করিয়া, বিজ্ঞানজীবনের কোনো তত্ত্বে বিশ্বাস করেন নাই, তত্ত্ব রচনাও করেন নাই।

কিন্তু এই কথাটি নূতন করিয়া কি বলিবার প্রয়োজন আছে? যিনি কবি, তিনি তো মন নিয়াই লীলা করেন—এই লীলাতত্ত্ব তো সর্বজনবিদিত সাধারণ ব্যাপার —ইহা প্রমাণ কবিবার বা ইহার উপর জোর দিবার তাৎপর্য কী, উদ্দেশ্য কী? শ্রীঅরবিন্দের কাব্যবাণী ও দর্শনবাণী এই প্রসঙ্গে আলোচনা করিলে ইহার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য সুস্পষ্ট হইয়া যাইবে। কবি রবীন্দ্রনাথ 'মন' ত্যাগ করেন নাই—ইহা না-হয় সর্বজনবিদিত সাধারণ ব্যাপার হইল, কিন্তু দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ কি মনোবিহীন কোনো তুরীয় তত্ত্বের কথায় বিশ্বাস করিয়াছেন? এই প্রশ্নের উত্তর মিলিলেই রবীন্দ্রনাথের দার্শনিককে তাঁহার কবি হইতে যাঁহারা স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের ধারণা অবশ্যই পরিবর্তিত হইবে। কবি ও দার্শনিক কবিগুরুর এই উভয় সত্তাই মনোজীবনের, প্রকৃতিজীবনের স্রষ্টা; তাহার ঊর্ধ্বলোকের স্রষ্টা কদাপি নহে। এই হিসাবে তিনি গ্যেটেরই সমগোত্রীয়। রবীন্দ্রনাথকে যে 'ভারতবর্ষের গ্যেটে, [*The Golden Book of Tagore* p. 127, 267] বলা হয় তাহার সূক্ষ্ম তাৎপর্য ইহা ছাড়া অন্য কিছু বলিয়া আমি ধারণা করি নাই।

গ্যেটে ও রবীন্দ্রনাথ

মনোজীবনের ঊর্ধ্বলোকে অ-মন তুরীয় বিজ্ঞানে উন্নীত হওয়ার সাধনা ভারতবর্ষের কবিসমাজে যে প্রচলিত নাই এমন নহে। বৌদ্ধ কৃষ্ণাচার্যের চর্যায়, মধ্যযুগীয় সাধুসন্তদের পদাবলীতে, প্রেমবৈরাগী বৈষ্ণববৃন্দের রাগানুগা গীতির সহজ মূর্ছনায়, শাক্ত-কবি রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের একাধিক পদের বৈরাগ্যমাধুর্যে, আধুনিক ঋষিকবি শ্রীঅরবিন্দের কাব্যকবিতায় ভাগবত সৌন্দর্য অ-মন বিজ্ঞানজ্যোতির আনন্দব্যঞ্জনাই প্রধান। ভারতবর্ষের বিজ্ঞানী কবিবৃন্দ মন ছাড়িয়া যে একেবারে বিজ্ঞানেই বুঁদ হইয়া গেছেন, তাহা বলি না, বিজ্ঞানে একেবারে সমাধিস্থ হইয়া চতুর্থে চতুর্থ হইয়া গেলে লোকভাষায় কাব্য-গান আর সম্ভব নহে। তবে ইঁহাদের দৃষ্টি কেবলমাত্র বিজ্ঞানজ্যোতির প্রতিই নিবদ্ধ বলিয়া ইঁহাদের স্বতন্ত্র একটি শ্রেণীতেই ফেলিতে হয়। গ্যেটে বা রবীন্দ্রনাথে এই বিজ্ঞানজ্যোতি যে নাই তাহা নহে, তবে মনকে প্রবৃত্তিশূন্য করিবার সত্যে তাঁহারা বিশ্বাসী নহেন। মনকে সামাজিক ও জাগতিক দিক হইতে সংস্কারশূন্য করিয়া, স্বচ্ছসুন্দর করিয়া, প্রবৃত্তির দর্পণ দ্বারাই যতটা বিজ্ঞানজ্যোতি আহরণ করা সম্ভব, ততটা জ্যোতিই গ্যেটে বা রবীন্দ্রনাথে মেলে। গ্যেটের মত রবীন্দ্রনাথও প্রকৃতির সন্তান, পৃথিবীর সন্তান, বসুন্ধরার 'বিপুল অঞ্চল তলে'-ই তাঁহার আনন্দ। এইজন্য বসুন্ধরার এ-মোড় হইতে সে-মোড় পর্যন্ত অর্থাৎ কামকামনা পূর্ণ প্রাকৃত মনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বেগ হইতে প্রেমবৈরাগ্যপূর্ণ সাত্ত্বিক মনের উচ্চাতিউচ্চ ধী ও ধারণা পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের অধিগতি। মন ত্যাগ করিলে অর্থাৎ মনের ঊর্ধ্বে উঠিয়া গেলে, লোকজীবনের সাধারণ খণ্ডক্ষুদ্র দোষত্রুটিবহুল আশা-আকাঙ্ক্ষার দিকে আর দৃষ্টি থাকে না। তখন দ্বন্দ্ব সত্য নহে, নির্দ্বন্দ্ব নির্বেদ সেই পরমপুরুষই তখন একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া তিনিই সত্য, তিনিই শিব, তিনিই সুন্দর। বিজ্ঞানী কবিরা এই পুরুষেরই গান করিয়া ধন্য। তবে তাঁহারা কবি, এইজন্য মন তাঁহাদের থাকেই থাকে—মনের অতীতে কবিত্ব নাই। আবার কবি হইলেও তাঁহারা বিজ্ঞানী,—এইজন্য মন তাঁহাদের 'পুরুষ' ছাড়া অন্যত্র যায় না।

মনের জগৎ-ই উভয়ের বিচরণ-ভূমি

মহামতি গ্যেটে মানসকবি, মানসলোকের সর্বোচ্চধামে উন্নীত হইয়াছিলেন। তাঁহার সাধনা মানুষের সাধনা, প্রকৃতির সাধনা, 'পুরুষের' সাধনা নহে। দুঃসহ অশান্তি, সংশয় ও মানস-বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া তাঁহার জীবন সুরু হইয়াছে। [গ্যেটের তরুণ বয়সের লেখা উপন্যাস 'ভের্টর', স্মরণীয়।] জাগতিক নানা কাজ, নানা জ্ঞান, নানা সুখসম্পদের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে তাহার জীবন, সুন্দর ও অসুন্দর, আত্মা ও অনাত্মা, ঈশ্বর ও অনীশ্বরের নানা ছায়া লীলা করিয়াছে তাঁহার দীর্ঘ জীবনের পরতে পরতে [ফাউস্ট]। তাহারই মধ্য দিয়া তিনি চলমান জীবনের সান্ত্বনা-ছন্দ রচিয়াছেন :

'Bold is the venture,
Splendid the pay;
And the soldiers go marching,
Marching away.' [Soldier's Song, *World Poetry*; p. 788.]

কিন্তু পরম শেষকে তিনি পাইয়াছেন এ-কথা কেহই বলিবেন না। ফাউস্টের মুখ দিয়া তিনি নিজের কথাই মনে হয় বলিয়াছেন: 'In vain have I scraped together and accumulated all the treasures......I am not a hair's breadth higher.'

উভয়ের পার্থক্য

রবীন্দ্রনাথও গ্যেটের ন্যায় মানস-কবি তবে গ্যেটের সহিত তাঁহার তফাৎ এই, তিনি ভারতীয় দিব্য দর্শনের উত্তরাধিকারী বলিয়া প্রকৃতিপূজার মধ্যেও পুরুষ-প্রেমিকতা তাঁহার আছে, অর্থাৎ বিজ্ঞানের ওপারের আলোর ইশারা দেখিয়া অনন্ত দুঃখনৈরাশ্যের মধ্যেও সান্ত্বনার আনন্দ তিনি অনুভব করেন। গ্যেটের ন্যায় তিনিও চরমকে জানেন নাই, কিন্তু 'I am not a hair's breadth higher'—এ-কথা তাঁহার মুখে শুনিব না, কেননা উত্তরোত্তর চিত্তবিকাশের আশায় আশায় তিনি আত্মসংযত। তিনি প্রেমিক হইয়াও বৈরাগী, বৈরাগী হইয়াও প্রেমিক। প্রেম তাঁহাকে প্রকৃতিপূজায় টানিয়াছে, বৈরাগ্য তাঁহাকে প্রকৃতির রূপে পুরুষের আলো দেখাইয়াছে। সর্বত্র পুরুষের আলো দেখার সাধনা থাকায় রবীন্দ্রনাথ গ্যেটের ন্যায় ভোগ-বিষয়ে অসংযত নহেন, আবার প্রকৃতির রূপমোহের আনন্দে সত্য দেখার প্রবৃত্তি থাকায় তিনি শ্রীঅরবিন্দের ন্যায় যোগ বিষয়ে বিশ্বাসী নহেন। গ্যেটের ন্যায় রবীন্দ্রনাথ মানুষী প্রেমকেই ঈশ্বরপ্রেমের সূচনা বলিয়া ধরিয়াছেন। গ্যেটে যেমন 'মার্গারেটের' পার্থিব প্রেম হইতে 'হেলেনের' স্বর্গীয় প্রেমে অভিসার করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তেমনি 'রাহুর' মোহ-সান্ত প্রেম হইতে 'সুরদাসের' বৈরাগ্যদীপ্ত অনন্ত-প্রেমের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কথা এই, পার্থিব প্রেম মিথ্যা নহে, স্বর্গীয় প্রেমও শুধুমাত্র কবিকল্পনা নহে। মনোজীবনে প্রেমের এই দুই রূপই সত্য।

শ্রীঅরবিন্দের সাধনা

বিজ্ঞানজীবনে অর্থাৎ চতুর্থমার্গে এই দুই-এর দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের কথা অবশ্যই অপ্রাসঙ্গিক। শ্রীঅরবিন্দের সাধনায় প্রেম যে পূজা পায় নাই তাহা নহে, তবে প্রেম তাঁহার সাধনার চরম আদর্শ নহে। প্রেমের কথা শ্রীঅরবিন্দ অবশ্য বলিয়াছেন। তাঁহার তরুণ বয়সের একাধিক কবিতায় মানবিক প্রেমের আনন্দোচ্ছ্বাস লক্ষ্য করিয়াছি। Songs of Myrtilla নামক কাব্যগ্রন্থের একাধিক কবিতা প্রেম-জীবনের আশানিরাশায় গুরুগম্ভীর।

'Love and Death' নামক দীর্ঘ কবিতাটিতে প্রেমের অমরশক্তি প্রতিভার কথাই গুঞ্জরিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীঅরবিন্দ কালিদাস, চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিবর্গের যে

সমস্ত প্রেমের কবিতার ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মানবিক প্রেমোপলব্ধির আনন্দবোধই প্রকাশ পাইয়াছে। তথাপি এ-কথা স্বীকার করিতে হইবে, যে, প্রেম বলিতে পরবর্তী-জীবনে শ্রীঅরবিন্দ যাহা বুঝিয়াছেন, লোকায়ত প্রেম-ধারণার দ্বারা তাহা ধরা আর সম্ভব নহে। লোকজীবনের প্রেমকে শ্রীঅরবিন্দ যৌনক্ষুধার অপর নাম বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, প্রেম হইতেছে 'a form of hunger without permanence'. [*The Life Divine*, Vol. 1, p. 257, foot note.] কবি ভর্তৃহরির মত প্রেমের লোকায়ত উন্মাদনাকে তিনিও ধিক্কার দেন বলিয়া 'নীতিশতকের' অনুবাদে 'Love's Folly'-র স্থান আনন্দভরেই দিয়াছেন :

"Fie on my love and me and him and her ;
Fie, most on love, this madness' Minister.

[*Collected Poems and Plays*, Vol. II, p. 172.]

অপরিবর্তনীয় এক ধ্রুব প্রেমের নৈর্ব্যক্তিক জ্ঞানচেতনার আনন্দে তিনি বিশ্বাসী। নারীতে তিনি তাহার 'রূপের জন্য' (colour rare), অথবা 'যৌবনের জন্য' (virtuous youth)—আকৃষ্ট নহেন। নারী 'নারী' বলিয়া নহে, নারী আত্মা বলিয়াই তিনি তাহাতে প্রেম দেখেন, তাহাতে প্রেরণা অনুভব করিয়া অমরত্বের আনন্দোপলব্ধিতে মুগ্ধ হন :

"Immortal to immortal I made speed.
Change I exceed
And am for Time prepared"

[Immortal love, Ibid, Vol. I, p. 128.]

প্রেম : তৃতীয় স্তর

বস্তুতঃ এইস্থলেই বলিয়া রাখা ভালো যে, প্রেমকে শ্রীঅরবিন্দ জীবনের তৃতীয় স্তর 'Third Stage' [*The Life Divine*, p. 256.]—বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দ বলেন—এই তৃতীয় স্তর অতিক্রম করিয়া 'চতুর্থে' যাইলে তবেই বহুর মধ্যে এক অনন্তের ঐক্যমহিমা উপলব্ধ হইতে পারে। It must come by a fourth status of life in which the eternal unity of the many is realised through the spirit, [Ibid, p. 260.] শ্রীঅরবিন্দ বলেন : মনের রাজ্যে, প্রেমানন্দের আবেগে, সাধারণতঃ যে ঐক্য মহিমার উপলব্ধি আমাদের হইয়া থাকে, তাহা পূর্ণ নহে, পূর্ণের আভাস মাত্র। মনের ক্ষমতা নিতান্তই সীমাবদ্ধ—বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করিবার তাহা যন্ত্র মাত্র। পূর্ণ জ্ঞান পাইবার যোগ্যতা তাহার নাই : Mind is an instrument of analysis and synthesis but not of essential knowledge. Its function is to cut out something vaguely from the unknown thing-in-itself and

call this measurement or delimitation of it the whole and again to analyse the whole into its parts which it regards as separate mental objects. [Ibid, p. 159.]

মনের সীমা তাই ছাড়াইতেই হয়, কেননা 'mind is a passage not a culmination.' মনের সীমা ছাড়ানোর শক্তি সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের মতবাদ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। [The Super Mind as a Creator, Ibid. ch. XII, p. 155.] যোগ-সাধনায় তিনি মনের অতীতে 'অতিমন' (overmind) এবং অতীন্দ্রিয় মনের (super mind) সন্ধান পাইয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দ বলেন, 'অতিমনের' সাহায্যে জাগতিক ও রাষ্ট্রিক জীবনের বৃহত্তর বহু কর্ম করা চলে, জীবনের বহুতর খণ্ড সত্যের আবিষ্কার করাও সম্ভব, কিন্তু তথাপি তাহা পূর্ণ নহে [The Life Divine, Vol. II, ch. XXVI, p. 809.] অতীন্দ্রিয় মনই পূর্ণকে জানিতে পায়, এই অতীন্দ্রিয় পরাজ্ঞানী মনের সাহায্যেই পূর্ণানন্দের সন্ধান সম্ভব [Aim of Life, Ibid, p. 470.]।

অতিমন এবং অতীন্দ্রিয় মন

শ্রীঅরবিন্দ যাহাকে অতিমন ও অতীন্দ্রিয় মন বলিতেছেন, তাহা, বলাই বোধ হয় বাহুল্য, বেদান্তপ্রোক্ত চতুর্থের-ই ইঙ্গিত। শ্রীঅরবিন্দের সাধনা চতুর্থের সাধনা; কিন্তু চতুর্থে একেবারে লীন না হইয়া চতুর্থের প্রভাবজাত ভাব-ব্যঞ্জনা দ্বারা তিনি কাব্য ও দর্শন সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃষ্টির আনন্দ তাঁহাতে রহিয়াছে বলিয়া চতুর্থের এই ভাবপ্রতিভাকেও 'মন' বলিয়া তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন; বস্তুতঃ মন না হইলে 'সৃষ্টি' হয় না, এইজন্য ইহাকে অতীন্দ্রিয় মন বলিয়া মনের সীমা বাড়ানোই সমীচীন। রবীন্দ্রনাথে এই মনের ইঙ্গিত মাঝে মাঝে যে দেখি নাই তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথে যে লোকপ্রেম, প্রকৃতি-প্রেম ও পৃথিবীপ্রেম লক্ষ্য করি, যে-দ্বন্দ্ব ও গতির চাপল্য তাঁহাতে দেখি, তাহাতেই মনে হয় চতুর্থের নির্দ্বন্দ্ব প্রসন্নতা তাঁহার লক্ষ্য নহে। শ্রীরবীন্দ্র আজও চলিতেছেন, শ্রীঅরবিন্দ গন্তব্যে উপনীত হইয়াছেন। শ্রীরবীন্দ্র মনোজীবনের যেন শেষপ্রান্ত, শ্রীঅরবিন্দ বিজ্ঞান-জীবনের যেন দ্বারদেশ। সেই দ্বারপ্রান্তে গান গাহিতেছে অশরীরী এক নামহীন অন্তরাত্মা। একাকিত্বের সজ্ঞান সাধনায় মৃত্যুহীন অনন্তের রসানন্দে সে পুলকোন্মাদ :

শ্রীঅরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথ

Some one broods there nameless and bodiless,
Conscious and lonely, deathless and infinite,
And, sole in a still eternal rapture,
Gathers all things to his heart for ever !

[Ocean Oneness, *Collected Poems and Plays*, Appendix-A p. 362.]

অন্যত্র আর একটি কবিতায় ঐ একই ভাবের রসানন্দ :

Lone on my summits of calm
I have brooded with voices around me,
Murmurs of silence
that steep mind in a luminous sleep,

[Trance Waiting, Ibid. p 363.]

শ্রীঅরবিন্দের কাব্যজীবনে শুধুমাত্র ধ্রুবত্বেরই ইঙ্গিত আছে—দ্বন্দ্বের প্রকাশ নাই, চাওয়া-পাওয়ার আতিশয্য নাই, কর্মময় জগতের ঘাত-প্রতিঘাতের ব্যঞ্জনা নাই। তাঁহার বচন চতুর্থ-পন্থী, তাঁহার ধ্যান যোগদর্শনসম্মত ভাগবতাভিমুখী, তাঁহার আচরণ সংসারাতীত যোগজীবনের আনন্দে আত্মনিষ্ঠ। পবাবিদ্যার বিজ্ঞানানন্দ হইতে তাঁহার অবতরণ বলিয়া প্রাকৃতজীবনের দোষত্রুটিবহুল ভাবাভাবের কোন অভিজ্ঞান তাঁহাব কাব্যে বা দর্শনে আশাই করা যায় না। তাঁহাব 'নদী' নামক কবিতাটি পাঠ করিলেই তাঁহার কবিকর্মের মর্মকথা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। তাঁহাব 'নদী' প্রকৃতির দৃশ্য রূপেব বর্ণনা মাত্র নহে, তাহা জীবন-নদীর তরঙ্গগতির প্রসন্ন ব্যঞ্জনা। মনেব সীমা ছাড়াইয়া বিজ্ঞান-সাগবে নিমগ্ন হওয়ার আনন্দ আছে এই নদী কবিতায়। কবি বলিতেছেন—হে নদী, বাহিয়া চলো সমুদ্র-সঙ্গমে।

Last become, self losing, a sea-motion
and joy boundless and blue laughter.

[The River, Ibid. p. 365.]

এই যে উচ্চতব সমাধিজীবনেব ধ্যানবাণীব আনন্দোদ্বেলতা, ইহার বস সাধারণে যে উপলব্ধি কবিবে, তাহা বলি না। তথাপি শ্রীঅরবিন্দ কবি-ই বটেন, যদিচ সাধারণ লোকজীবনের কবি নহেন, তাঁহাব কবিত্ব ভাগবতজীবনেব জ্যোতিবিম্বিত। বাস্তব-জীবনের নানা আসক্তি হইতে উদ্ধাব পাইতে পাইতে যে ক্রমগতির ব্যাঞ্জনাময মানসিকতা গ্যেটে বা রবীন্দ্রনাথে প্রকাশ পাইয়াছে, শ্রীঅববিন্দে তাহা অবশ্যই মেলে না। শুদ্ধমাত্র ভাগবত-দৃষ্টিতে দেখিলে বলা যায় শ্রীঅববিন্দ কবিব কবি, কবির দার্শনিক, যে-জীবনেব কথা তিনি বলেন, তাহা এখনও আমাদের নিকট 'Nature' নহে, 'Supernature' [*The Life Divine*, Ch, XXVIII, p 945.] অর্থাৎ, লোকবিচারে তাহা নিতান্তই অবাস্তব। আজ-ও আমবা চলিয়াছি, চলিয়াছি অহং হইতে আত্মার পথে। হোঁচট খাইতেছি, উঠিতেছি, পড়িতেছি—আবাব চলিতেছি নূতন আশার সান্ত্বনায়। বাস্তবদৃষ্টিতে তাই গ্যেটে সত্য, ববীন্দ্রনাথ সত্য অর্থাৎ এখনও পতন সত্য, উত্থান সত্য, পতন ও উত্থানের মধ্যবর্তী হইয়া চিরন্তন যাত্রার নিত্য অতৃপ্তি সত্য—অতৃপ্তির মধ্যে সনাতন আশার সান্ত্বনা সত্য।

কিন্তু 'সত্য' কেন বলিতেছি? মন আছে বলিয়াই বলিতেছি। মন যতক্ষণ আছে, ততক্ষণই ইহা সত্য। মনের উর্ধ্বলোকে ভিন্নতর সত্যের আবির্ভাব।

শ্রীঅরবিন্দে কি মন আছে? এ-প্রশ্নের উত্তর পূর্বেই দিয়াছি। মন না থাকিলে সৃষ্টি অসম্ভব; শ্রীঅরবিন্দে মন পরিত্যক্ত হয় নাই। তবে যোগসাধনায় তিনি 'অতিমন' ও 'অতীন্দ্রিয় মন' দ্বারা 'বিজ্ঞান'কে জানিয়াছেন, পরাবিদ্যাকে স্পর্শ করিয়াছেন—তাহার পর সেই স্পর্শসম্ভূত রসানন্দে অর্থাৎ বিজ্ঞানদীপ্ত নবতর মানসানন্দেই মাতিয়াছেন। এই আনন্দ-ভোগের প্রকাশই তাঁহার কাব্য ও দর্শন। এইস্থলে *Collected Poems and Plays* নামক সঙ্কলন গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে মুদ্রিত 'Ascent' নামক কবিতাটির (Appendix A, page 372) সহিত *The Life Divine* নামক দর্শন-গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে মুদ্রিত 'Ascent towards Supermind' নামক প্রবন্ধটি (Ch. XXVI) পাঠ করিলে পাঠক-মর্মে আমার বক্তব্য সুস্পষ্ট হইবে।

'Ascent' নামক কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি :

Into the silence, into the silence
Arise, O Spirit immortal,
Away from the turning wheel, breakng thy magical circle
Ascend, single and deathless :
Care no more for the whispers
  and the shoutings in the darkness,
Pass from the sphere of the grey and the little,
Leaving the cry and the struggle,
Into the silence for ever.

কিন্তু এই মৌনের অনন্ত গভীরে প্রবেশ করিয়া শক্তি লাভ করিলেই যে সাধনার চরম সিদ্ধি লাভ হইবে, তাহা নহে। 'Ascent towards Supermind'-এ শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন :

An overmind light and power may descend in some sort, create a partial form of itself in the being and take a leading part or supervise or intervene while the intuition and illuminating mind and higher mind are still incomplete. [*The Life Divine*, Vol. II, p. 809.]

অতএব মনোমৌনের-ও অতীতে সমাধিস্থ হইতে হইবে। 'Beyond the silence' অগ্রসর হইতে হইবে সাধককে :

Out from the silence, out from the silence
Carrying with thee the ineffable substance

Carrying with thee the splendour and wideness
Ascend, O Spirit immortal,
Assigning to Time its endless meaning,
Blissful enter into the clasp of the Timeless,
Awake in the living Eternal,
taken to the bosom of love of the Infinite,
Live self-found in his endless completeness.

এই যে পূর্ণের আনন্দ—ইহাই শ্রীঅরবিন্দের কাব্যানন্দ। মনে রাখিতে হইবে, শ্রীঅরবিন্দের আনন্দ 'প্রকৃতির' বিচিত্র রূপে অরূপ দেখার আনন্দ নহে; 'পুরুষের' তত্ত্বমহিমার জ্যোতি প্রকৃতির ধর্মে ও মর্মে নিত্য প্রতিফলনের তাহা দিব্য আনন্দ। এইজন্য শ্রীঅরবিন্দের বাণী বা ধ্যান অপরাবিদ্যা-দীপ্ত মনোজগতের প্রবৃত্তিধর্মিতার প্রকাশক হইতে পারে না, তাহা অপরাকে পরায় রূপান্তরিত করিবার আনন্দচেতনায় অভিব্যক্ত।
[The Rishi (Vol. I, p. 145). Jivanmukta (Vo. II, p. 285).]

শ্রীঅরবিন্দ : মিষ্টিক কবি

শ্রীঅরবিন্দের কথা বা কবিতা যে আমরা বুঝি না, অথবা তাহা যে আমাদের কর্মময় ব্যস্ত জগতের বহির্ভূত বলিয়া মনে হয়, তাহা এইজন্য যে, তাহা প্রায়শঃই 'তৃতীয়' লক্ষণাক্রান্ত মনের কথা নহে, তাহা অতিমনের বা অলৌকিক মনের অর্থাৎ বিজ্ঞানানন্দের। মিস্টিক কবিত্বের মর্ম ও ধর্ম সম্পর্ক এখনও আমরা সম্যক্‌ভাবে অবহিত নহি, যখন যথার্থভাবে অবহিত হইব, তখন অবশ্যই বুঝিব, শ্রীঅরবিন্দই বিশ্বের একজন যথার্থ মিস্টিক কবি। তাঁহার ধ্যানের জগত আমাদের মনোজগত হইতে বহু দূরে—মন হইতে বিজ্ঞানের যতটা দূরত্ব—প্রকৃতি হইতে পুরুষ-ধ্যানের যতটা দূরত্ব—ঠিক ততটা। 'পুরুষের' কবিরাই যথার্থ মিস্টিক কবি, লোকজীবনে তাঁহারা শান্ত, দান্ত, নির্বেদ, নির্দ্বন্দ্ব,—মানসজীবনে তাঁহারা 'উদাসীনো গতব্যথঃ'—মানুষী প্রকৃতির বাহিরে তাঁহাদের অবস্থিতি। ['The Vedantin's Prayer' (Vol. I, p. 136), 'Rebirth' p. 138, 'The Triumph song of Trishunco ; (P. 140) 'Parabrahman' p. 142.]। বর্তমান লোকজীবনে তাঁহাদের প্রভাব খুব স্পষ্ট নহে, কিন্তু তথাপি তাঁহাদের ভুলিলে চলে না। ডক্টর সুধীরকুমার

মিষ্টিক কবিতা প্রসঙ্গে ড. সুধীরকুমার দাশগুপ্ত

দাশগুপ্ত যথার্থই বলিয়াছেন: "যে পরিণত পূর্ণশক্তি মানুষ, মনোময় সত্তার অতীত বিজ্ঞানময় সত্তার বোধদ্যুতি এবং আনন্দময় সত্তার বিপুল পুলকসম্ভার পাইয়াছে এবং সেই স্ব-ভূমিতেই বিহার করিয়া নিরন্তর আত্মসুখ আস্বাদন করিতে চায়······তাহার কথা ভুলিলে চলিবে কেন? তাহারাই তো ক্রম-বিবর্তনের পথে প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ, তাহারাই

তো পৃথিবীতে স্বর্গ রচনা করিবে, মানবের মধ্যে মানব-কল্পিত পরিপূর্ণ দেব-মহিমার উদ্ঘাটন করিবে।" [কাব্যালোক, পৃ. ১২]

অন্যত্র,

'মনের অগোচর দেশ হইতে স্থির আনন্দের প্রকাশ না হইলে মনোরাজ্যের বিক্ষোভ প্রশমিত হয় কি করিয়া? উর্বর ভূমি হইতে নবীন চেতনার স্পর্শ না পাইলে ভাব তাহার স্থূলতা পরিহার করিয়া সূক্ষ্মরূপ লাভ করে কি করিয়া? অথবা, নূতন অপর কোন কারণের অপেক্ষা না করিয়া ভাবগুলি আপনা-আপনি সংস্কৃত হয় কি করিয়া?……ভাবাবেগ কি অমনি বিনষ্ট হয় এবং pleasurable calm অর্থাৎ আনন্দময় প্রশান্তি কি অমনি আসিয়া থাকে? সকল প্রশ্নেরই এক উত্তর, 'Taint of egoism' বা অহমিকার দোষ একেবারে দূরীভূত হইলে মনোরাজ্যের অতীত দেশে আমাদের বোধানন্দময় সত্তার প্রকাশ উপলব্ধ হয় এবং তখন সমস্ত অলৌকিক ব্যাপারই সহজে বোধগম্য হয়।' [কাব্যালোক, পৃ. ১৭৮]

পুনশ্চ—

'দিব্য কবি বিজ্ঞানময় অথবা আনন্দময় ভূমিতে সর্বসংস্কারের উর্ধ্বে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রতিভান-শক্তির প্রভাবে কাব্য রচনা করেন।……কিন্তু অনেক কবিই তো মনোময় লোকে বিহার করেন।……মনোময় লোকেও আমাদের দুইটি প্রকৃতি আছে, উচ্চতর প্রকৃতি বা দেবপ্রকৃতি এবং নিকৃষ্ট প্রকৃতি বা পশুপ্রকৃতি। মানুষ মননের বলে শিক্ষা, সাধনা ও অনুশীলন দ্বারা ক্রমশঃ দেবস্বভাবসম্পন্ন হইয়া থাকে। যে কোন প্রকৃতিতেই কিন্তু মানুষের তন্ময়তা বা সমাধি আসিতে পারে।' [তদেব, পৃ. ৫২০-২১]

'কাব্যালোক'

রবীন্দ্রনাথের তন্ময়তা দেবস্বভাবের আনন্দে; মানবত্বের অন্তরে দেবত্ব-বিকাশই তাঁহার লক্ষ্য। মনের নিম্নতম প্রকৃতি হইতে উচ্চতম দেবপ্রকৃতিতে অভিযাত্রার আনন্দে তিনি একাগ্র; দেবপ্রকৃতি যেমন তাঁহার সাধনার বিষয়, শিবমানব তেমনি তাঁহার আদর্শ। [মানুষের ধর্ম] এই দেব-প্রকৃতিসম্ভূত শিবমানব কল্পনায় বিজ্ঞানের লীলাভাস আছে, কিন্তু পূর্ণভাবে তাহা বিজ্ঞান নহে। ঠিক এইজন্যই রবীন্দ্রনাথে দ্বন্দ্ব নিঃশেষিত হয় নাই, গতি গন্তব্যের ইঙ্গিতে আজও প্রাণচঞ্চল। রবীন্দ্রনাথ যে আজও চলিয়াছেন, তাহার কারণ এই। বস্তুতঃ চলাই তাঁহার মতে হওয়া, হইতে-চলাই তাঁহার মতে আনন্দ। শ্রীঅরবিন্দ নির্দ্বন্দ্ব আনন্দধাম হইতে শুদ্ধমাত্র জ্যোতির্ময় জীবনের কথা বলেন। আবেগময় নিত্য বিক্ষিপ্ত জীবনের সীমা হইতে বহু দূরে অ-মন বিজ্ঞানজগতের ধ্যান-ব্যঞ্জনাই তাঁহার কাব্য বা দর্শনের প্রাণবস্তু। বৈদান্তিক 'চতুর্থ' ভূমির আনন্দ পরিবেশনেই তাঁহাকে মনের ভূমিতে নামিতে হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ মনোদেশের বিচিত্র বিশ্বচিত্র দেখিতে দেখিতে মনেরি বাতায়ন-পথ দিয়া চতুর্থের ইঙ্গিতময় জ্যোতি দর্শন করিয়াছেন; এইজন্য রবীন্দ্রনাথ' একদিকে যেমন বৈচিত্র্যের কবি, অপরদিকে তেমনি চতুর্থের ইঙ্গিতময় রশ্মিপাতে বিচিত্র বিশ্বকে অভিনব

শ্রীঅরবিন্দ এবং রবীন্দ্রনাথের দ্বিবিধ ভূমি

এক অদ্বিতীয় রূপে দেখার আনন্দে তিনি একের কবি। শ্রীঅরবিন্দ মনকে নিরুদ্ধ করিয়া চতুর্থে অগ্রসর হইয়াছেন; ফলে মনের বিক্ষিপ্ত রূপরাশির বিচিত্র তরঙ্গ দর্শনে তাঁহার স্পৃহা নাই; অথচ প্রকাশের রসানন্দ তিনি ত্যাগ করেন নাই বলিয়া লোকজগতের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অন্তর্হিত হইতে পারে নাই; তাই তিনি কাব্য করেন, দর্শন করেন। তবে লক্ষ্য করিতে হইবে তাঁহার কাব্য বা দর্শনের ব্যঞ্জনা মনের বিচিত্র ভাবানুভাবের দ্বন্দ্বময় রূপ-সৌন্দর্য নহে, তাহা পুরুষাভিমুখী দেববাসনার আনন্দময় রূপবিভূতি। এ-কথা সত্য, শ্রীঅরবিন্দ বৃত্তির নিরোধ করার তত্ত্বে সম্পূর্ণরূপে আস্থাবান নহেন; তবে সাধনার অবস্থায় নিরোধের অবশ্যই প্রয়োজন আছে। সিদ্ধ হইবার পর নিরোধের প্রয়োজন থাকে না বলিয়া তাঁহার ধারণা। তখন মনের যে আনন্দ, তাহা অতিমনের বা অতীন্দ্রিয় মনেরই আনন্দ।

শ্রীঅরবিন্দকে বুঝিতে চেষ্টা করিলে শ্রীরবীন্দ্র যে কতখানি আমাদের ঘরের লোক এবং বাস্তববাদী, তাহা বুঝা সম্ভব হয়। কোনো অস্পষ্ট দর্শন-প্রহেলিকার ইন্দ্রজাল বিস্তার না করিয়া শ্রীরবীন্দ্র মানবিক মনের কথাই বলিয়াছেন। কাম-কামনা সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশা প্রভৃতি তুচ্ছাতিতুচ্ছ ভাব হইতে প্রেম বৈরাগ্য ক্ষমা ভক্তি প্রভৃতি উচ্চাতিউচ্চ কোনো ভাবকেই তিনি উপেক্ষা করেন নাই। শ্রীরবীন্দ্র আমাদের একান্ত পরিচিত প্রিয় মানুষ— শ্রীঅরবিন্দ যেন আমাদের পরিচিত জগতের ব্যক্তিই নহেন। [শ্রীঅনিলবরণ সম্পাদিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, পৃ. ২৪৭ দ্রষ্টব্য।] আসল কথা, শ্রীঅরবিন্দ চতুর্থোপাসক অর্থাৎ যোগী, শ্রীরবীন্দ্র তৃতীয়োপাসক অর্থাৎ কবি। যোগীর কাব্যও দর্শন, কবির দর্শনও কাব্য। কবির দর্শন তাঁহার কাব্যেরই ভাষ্যস্বরূপ। তাঁহার দর্শন তাঁহার কাব্য হইতে স্বতন্ত্র কোনো বিরুদ্ধ কথা বলিতে পারে না। ধীরভাবে, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের দর্শন 'প্রকৃতির'ই পূজা করিয়াছে, প্রকৃতি হইতে অগ্রসর হইতে হইতে 'পুরুষের' স্বপ্নে মাতিয়াছে। শ্রীঅরবিন্দের পূজা পুরুষেরই পূজা, প্রকৃতিকে জয় করিয়া প্রকৃতির উপর পুরুষের জ্যোতি-প্রভাব বিস্তারের আনন্দ-পূজা। রবীন্দ্রদর্শনে মন দ্বারাই আত্ম-দেখার সাধনা আছে, অরবিন্দদর্শনে আত্মদ্বারাই আত্মার সাক্ষাৎকারের তপস্যা আছে। শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা এই: ভগবান সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান শুদ্ধমাত্র 'হৃদয় মন বুদ্ধির অধিগম্য নহে। আত্মায় ভগবানের সহিত একত্ব উপলব্ধি করিয়া আত্মা দ্বারাই তাহা লাভ করা যায়, আত্মানং আত্মনা'। শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন:

যোগী ও কবি

> 'The instrument is finite in a personal image, the worker is universal with a personal trend, but neither of these is the master, for neither are the true person.
>
> 'Know last the master to be thyself, but to this self put no form and seek for it no definition of quality.

'Thou shalt contain in thy being thyself and all others and be that which is neither thyself nor all others, of works this is the consummation and the summit.' [*Superman*, p. 26-28.]

ব্রহ্মধ্যানে বিভোর হইয়া ব্যক্তিমানস ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এই যে অবলুপ্তির আনন্দ, এই যে নিরুদ্ধ ভূমির আনন্দব্যঞ্জিত অনন্ত বিজ্ঞানোপলব্ধি, ইহাই যোগ। দার্শনিক শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ তাঁহার 'সুখদুঃখ' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে যোগ ও যোগজাত সুখ সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, এস্থলে তাহা উল্লেখ করিলে শ্রীঅরবিন্দের কাব্যভাবের ব্যাখ্যা কতকটা সহজ হইতে পারে :

'আত্মাকে প্রত্যক্ষ করা, চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া আত্মার পরিচিন্তনে অভিনিবিষ্ট হওয়ার নামই যোগ। বিষয় হইতে যখন ইন্দ্রিয়সকল বিযুক্ত হয়, বাহিরের যাবতীয় ক্রিয়া যখন বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন আত্মা আপনাতে আপনি নিমগ্ন হইয়া যে সুখ প্রাপ্ত হন, সেই সুখই চরম সুখ।'

শ্রীঅরবিন্দের কবিত্ব এই 'চরম সুখের' ধারণা দ্বারা ধরিতে হইবে। 'দেবজন্ম' নামক পুস্তকে শ্রীঅরবিন্দের বাণী এইভাবে ধরা হইয়াছে :

যোগীর কবিত্ব

'সসীম খণ্ডতাকে, ইন্দ্রিয়দত্ত পৃথকত্বকে অতিক্রম করিয়া আত্মায়, বৃহতে পৌঁছিতে চাই। বিচারকে পরিণত করিতে হইবে বিবেকে, বুদ্ধিকে পরিণত করিতে হইবে বোধিরূপে। এই নবজন্মের আরম্ভে আমরা চাই কবিদৃষ্টি।

এই 'কবিদৃষ্টি' দ্বারা আত্মার সূক্ষ্মতর স্তরগুলি পর্যবেক্ষণ করা সহজ হয়।

'মানুষের আত্মা, তাহার রসগ্রাহী সত্তা, তাহার অন্তরস্থ পুরুষও এক নয়, বহু। প্রধানতঃ তিনটি নির্দেশ করা যাইতে পারে। প্রথম, তাহার দেহের ও দেহের অন্তর্গত প্রাণের মধ্যে যে আত্মা; দ্বিতীয়, তাহার মানসক্ষেত্রের মধ্যে প্রতিষ্ঠা যে আত্মার; তৃতীয়তঃ, দেহ ও মনের উপরে অন্তরের অন্তরে অধিষ্ঠিত যে নিগূঢ় আত্মা। শারীর পুরুষ, মানস পুরুষ, অধ্যাত্ম পুরুষ। উপনিষদে : অন্নময় ও প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় পুরুষ।'
[দেবজন্ম, শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত]

অন্যত্র—

'দেবজন্ম'

'মানুষের আর একটি স্তর আছে তাহা এই মনেরও অতীত। সেখানে মানুষ আর মানুষ নয়, দেবতা। দেবতার প্রতিষ্ঠান—বিজ্ঞানলোকে। এখানে দুঃখের ছায়া মাত্র নাই, সুতরাং সুখ-দুঃখের, শ্রেয়-প্রেয়ের কোনো দ্বৈত নাই এখানে; শুধু আছে আনন্দ, অনাবিল অখণ্ডিত আনন্দ। মানুষের মধ্যে তাহার এই বিজ্ঞানময় পুরুষ যখন জাগরিত হইয়াছে, সে যখন তাহার অধ্যাত্ম সত্তায় প্রতিষ্ঠিত, উহারই ধর্মে তাহার অনুভূত সকল উপলব্ধি যখন রাঙাইয়া উঠিয়াছে, তখন দুঃখ একেবারে লুপ্ত হইয়াছে, দুঃখের আনন্দ বলিয়াও কোনো জিনিস তখন আর নাই।' [তদেব]

এই 'বিজ্ঞানময় পুরুষের' সাধনা যোগীদেরই সাধনা; মানুষের নহে, কবির নহে। রবীন্দ্রনাথ মানুষের সাধক, লোকজগতের দার্শনিক, প্রকৃতিজীবনের কবি। প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রকৃতিজীবনের কবি জগতে বিস্তর আছেন, তবে আর রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব কোথায়? প্রকৃতিজীবনের অন্যান্য বিখ্যাত কবিকুলের মনোধর্ম ও প্রেমসাধনা সম্পর্কে আলোচনাকালে এই প্রশ্নটির উত্তর দিব। কালিদাস, ভবভূতি, গ্যেটে, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, ব্রাউনিঙ্‌ প্রভৃতি কবিগণ প্রকৃতিজীবনেরই কবি বটেন, কিন্তু একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলেই দেখা যাইবে যে, তাঁহাদের মনোধর্ম ও রবীন্দ্রনাথের মনোধর্ম এক নহে। কোথায় এক নহে, এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে ও কী কী কারণে এক নহে, ধীরভাবে তাহা জানিতে চেষ্টা করিলেই রবীন্দ্র-মনোদর্শনের তাৎপর্য ও সার্থকতা উপলব্ধ হইবে। বর্তমানে এইটুকু জানিয়াই আমাদের শান্ত থাকিতে হইবে যে, কবি রবীন্দ্রনাথের ন্যায় দার্শনিক রবীন্দ্রনাথও মনোলোকের ঐশ্বর্য দর্শনেই প্রেরণাবোধ করিয়াছেন। মনোলোকের মধ্যে থাকিয়া লোকমানসের উন্মোচনেই সেই দার্শনিকের আনন্দ। তাঁহার আধ্যাত্মিকতা মনোময় মোহন আধ্যাত্মিকতা—তাহাতে নিষ্ক্রিয়তা অপেক্ষা সক্রিয়তারই প্রাধান্য। কবিদার্শনিকের ভাগবতধর্মিতা লোকমানস-বহির্ভূত বিশেষ কোনো তত্ত্বদর্শন নহে। বাস্তব এই লোকজীবনকেই উচ্চতর ভূমিতে সক্রিয়ভাবে উন্নীত করিবার তাহা পথ বা উপায় মাত্র। কবিগুরুর দর্শনধ্যান যোগিগুরুর দর্শনধ্যানের ন্যায় মুষ্টিমেয় কয়েকজনের সাধনবস্তু মাত্র নহে, তাহা বিশ্বমানুষের, বিশ্বমানসের। যোগসাধনায় সিদ্ধ হইয়া বিজ্ঞান হইতে মনে নহে, পরা হইতে অপরায় নহে, কিন্তু সহজ সাধনায় সক্রিয় রহিয়া মন হইতে বিজ্ঞানাভিমুখে, অপরা হইতে পরার পবিত্র ইঙ্গিতে স্বাভাবিকভাবেই কবীন্দ্রের অগ্রগতি। এইজন্য গতিপথে যত কাম-কামনা, সুখ-দুঃখ, মোহ-মৃত্যু, আশা-নৈরাশ্য, লোভ-লালসার বাধা আসিয়াছে, তাঁহার চলমান কাব্যজীবনে অহরহঃ তাহার ক্রিয়া. প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে, দ্বন্দ্ব-চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে, কিন্তু কোনোটাতেই তিনি আসক্ত হইয়া বসিয়া পড়েন নাই। তিনি চলিয়াছেন। স্বর্গতঃ অজিতকুমার চক্রবর্তী যথার্থই বলিয়াছেন:

মনোভূমির কবি রবীন্দ্রনাথ

'কবির কাব্যের মধ্যে আমরা তাঁহার সেই বিশ্ব-অভিসারের ইতিহাস দেখিতে পাই তিনি তাঁহার অনুভূতির আবেগে ছুটিয়া চলিয়াছেন, মনে করিয়াছেন এইবার যাহা চাই তাহা পাইয়াছি কিন্তু সেই বেগের দ্বারাই তিনি দ্রুতগতিতে পাওয়ার অন্তে গিয়া ঠেকিয়াছেন—তখন আবার তাহা হইতে বাহির হইবার জন্য বেদনা এবং নূতন পথে প্রবেশ'। [প্রবাসী, আষাঢ় ১৩১৮]

দার্শনিক দিক হইতে বলা যায়, যোগিগুরু পুরুষের আলোকে বিশ্বকে দেখিয়াছেন, কবিগুরু প্রকৃতির রূপালোকে পুরুষকে, অরূপকে, বিচিত্ররূপে দেখিয়াছেন। যোগিগুরুর দেখা যেন শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন তিনি তত্ত্ববিষয়ে নিশ্চিন্ত; কবিগুরুর দেখা শেষ হয়

নাই—তত্ত্ববিষয়ে তিনি তাই গতিধর্মের পূজারী। কবিগুরু 'আমাদেরই লোক'; যোগিগুরু আমাদের মধ্যে যাঁহারা যোগধর্মী ও বিজ্ঞানধর্মী শুদ্ধমাত্র তাঁহাদেরই। বর্তমান জগতে ও জীবনে কবিদর্শনই গ্রহণযোগ্য; অনাগত কোনো যুগে মানুষ যদি কখনও মনকে বিজ্ঞানে উন্নীত করিয়া সমষ্টিগতভাবে সিদ্ধিলাভ করে, তখন যোগিগুরুর আনন্দদর্শনও বাস্তব বলিয়া গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে।

'আমাদেরই লোক'

শ্রীঅরবিন্দের সহিত শ্রীরবীন্দ্রনাথের সাধন-প্রতিভার তুলনামূলক এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বুঝা সহজ হইবে, রবীন্দ্রদর্শনের প্রতিপাদ্য কী—এবং রবীন্দ্রনাথ কোন্ স্তরের, কোন্ লোকের দার্শনিক। তিনি মনোদার্শনিক, এইজন্য তাঁহার জীবনে গতিই সত্য, শান্তি নহে। [বলাকার 'শঙ্খ' কবিতাটি স্মর্তব্য]। গ্যেটের মত অনন্ত গতি ও অক্লান্ত প্রয়াসই (ewig strebend sich bemiihen)—তাঁহার জীবনদর্শন। Self হইতে soul-এ নিত্য গতির আনন্দবাণীই রবীন্দ্রবাণী। রবীন্দ্রব্রহ্ম এই গতিব্রহ্ম। রবীন্দ্রসাধনা এই গতিসাধনা।

রবীন্দ্রনাথের এই সাধনার তত্ত্ব মনন সহকারে বিচার করিলেই দেখা যাইবে তাঁহার উপাস্যদেবতা বস্তু-অবচ্ছিন্ন বেদান্ত-ব্রহ্ম নহেন, মানবত্ব বিকাশের অন্তর্মূলে যে ব্রহ্ম ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি স্বরূপে বিরাজিত, সেই রূপব্রহ্ম, রসব্রহ্ম রবীন্দ্র-চিন্তিত ব্রহ্মদেব। ব্যক্তির অন্তরে ব্যক্তিব্রহ্ম, মানবের অন্তরে ধর্মে কর্মে, গুণে গানে ক্রমশঃ আবির্ভূত পরমমানব, রূপের অন্তরে রূপলক্ষ্মী, সূর্যের অন্তরে সূর্যেশ্বর, নিখিলের সর্বকার্যে, সর্বধ্যানে, সর্বজ্ঞানে কোথাও প্রকটভাবে, কোথাও অপ্রকটভাবে লীলা করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথ ইঁহারই তত্ত্ব জানেন, লোকে লোকে ইঁহারই তত্ত্ব দেখেন। জগৎ যে সত্য, তা ইঁহারই স্পর্শানুভূতির আশীর্বাদে।

রবীন্দ্র-চিন্তিত ব্রহ্মদেব

'I must emphasize this fact that this world is a real world only in its relation to a Central Personality'. [*Personality*, p. 98]

'Central Personality' কথাটিকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'মানুষের ধর্মে' 'পরমমানব' নামে আখ্যাত করিয়াছেন। ইঁহার রূপ আছে, আকার আছে, মন দিয়া ইঁহার আভাস অন্ততঃ পাওয়া যায়।

'নিরাকার যখন মনের অগম্য তখন তাঁহাকে সুগম আকারে পূজা করাই ভালো। ...... অনন্ত আকাশ আমাদের কাছে মণ্ডলবদ্ধ কিন্তু তাই বলিয়া ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া আকাশ দেখার সাধ মিটাইতে পারি না। আমি যতদূর পর্যন্ত দেখিতে পাই তাহা না দেখিয়া আমার তৃপ্তি হয় না।

'এই যে প্রয়াস, বস্তুত, ইহাই উপাসনা। আমরা শেষ পর্যন্ত গিয়াও যখন তাঁহার শেষ পাই না, আমার মন যখন একাকী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যাত্রা করিয়া বাহির হয়, যখন অগণ্য গ্রহচন্দ্রতারকার অনন্ত জটিল জ্যোতিররণ্য মধ্যে সে হারাইয়া যায়, এবং প্রভাতকরপ্লাবিত

নীলাকাশের মহোচ্চদেশে বিলীন-প্রায় বিহঙ্গমের মতো উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গাহিয়া উঠে, তুমি ভূমা, আমি তোমার শেষ পাইলাম না—তখন তাহাতেই সে কৃতার্থ হয়। সেই অন্ত না পাইয়াই তাহার সুখ, ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।' [সাকার ও নিরাকার, আধুনিক সাহিত্য]

অন্যত্র আবার :

'He is Vishwakarma, that is, in a multiplicity of forms and forces lies his outward manifestation in nature, but his inner manifestation in our soul is that which exists in unity'. [Soul Consciousness, *Sadhana*, p. 37]

'The individual man must exist for Man the Great, and must express him in disinterested works in science and philosophy, in literature and arts, in service and worship. This is his religion which is working in the heart of all his religions in various names and forms······ On the surface of our being we have the ever changing phases of the individual self but in the depth there dwells the Eternal Spirit of human unity beyond our direct knowledge.' [*Religion of Man* : p. 17]

রবীন্দ্র-ব্রহ্মতত্ত্বের একটি গান :

আমার মাঝে তোমারি মায়া জাগালে তুমি কবি।
আপন মনে আমারি পটে আঁকো মানস-ছবি।
তাপস তুমি ধেয়ানে তব
কী দেখো মোরে কেমনে কব,
আপন-মনে মেঘ-স্বপন
আপনি রচো রবি।
তোমার জটে আমি তোমারি ভাবের জাহ্নবী ॥ [গীতমালিকা]

রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনাকালে স্থিরভাবে তাঁহার ব্রহ্মসম্পর্কিত ধারণাগুলির ধ্যান যদি না করা যায় তবে পরিশেষে অনেক জটিলতা উপস্থিত হইতে পারে। তাঁহার ব্রহ্মকে মানব-নিরপেক্ষ এবং মানবকে ব্রহ্ম-নিরপেক্ষ ভাবা যে চলে না, তাহা উল্লেখ না করিলেও চলে ; কিন্তু স্পষ্টভাবে এই ধারণা আমরা করি নাই বলিয়া তাঁহার কাব্যকে জীবনোদয়ের গভীর বাণী হিসাবে অথবা দর্শনকে জীবনোপলব্ধির ললিত ভাষ্য হিসাবে গ্রহণ করি নাই। ভারতীয় দর্শনশাখাগুলির সংস্কারে প্রভাবিত হইয়া আমরা অনেকেই রবীন্দ্রদর্শন বিচার করিতে গিয়াছি। রবীন্দ্র-রচনাবলী ও বেদান্ত-রচনাবলীর মধ্যে ব্রহ্মকে যেভাবে

শাঙ্কর ব্রহ্ম ও রবীন্দ্রব্রহ্ম

রূপায়িত করা হইয়াছে তাহাতে উভয় চিন্তনার ভাবগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন রবীন্দ্র-চিন্তিত ব্রহ্মকে 'বেদান্ত ব্রহ্ম' নামে অভিহিত করিয়াছেন; [*Philosophy of Rabindranath*] ইহাতে যে মারাত্মক কোনো ভুল হইয়াছে তাহা বলি না, কিন্তু বেদান্তব্রহ্ম বলিতে যদি শাঙ্করব্রহ্মের কথা মনে পড়িয়া যায়, তবে রবীন্দ্রব্রহ্মকে উপলব্ধি করা সহজসাধ্য হইবে বলিয়া মনে করি না। উপনিষদের রূপোজ্জ্বল ব্রহ্মদেবকেও বেদান্ত ব্রহ্ম বলা যায়, কিন্তু আচার্য শঙ্কর যে ব্রহ্মবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়া গেছেন, তাহার প্রভাব আজও পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী মহলে বিদ্যমান আছে বলিয়া রবীন্দ্রব্রহ্মকে বুঝাইতে নূতন একটি নাম দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথের দার্শনিকটিকে যাঁহারা তাঁহার কবি হইতে পৃথক ভাবিয়াছেন, তাঁহারা বেদান্তব্রহ্ম বলিতে শাঙ্করব্রহ্মকে মনে করিয়া তাহার সহিত রবীন্দ্রব্রহ্মের ভাবগত ঐক্যস্থাপনে মনে মনে প্রয়াস পাইয়া থাকিবেন। আসল কথা, বেদান্তব্রহ্ম বলিতে শাঙ্করব্রহ্মকে যদি মনে পড়ে এবং সেই ভাবে ভাবিত হইয়া রবীন্দ্রব্রহ্মকে যদি তদনুসারে বিচার করিতে বসি, তবে পদে পদে যুক্তি ও তথ্যের বাধা তো পাইবই। বেদোপনিষদের রূপোজ্জ্বল ব্রহ্ম-বিভূতিই রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করিয়াছে, বেদান্তব্রহ্ম বলিতে পাছে 'বস্তু-অবচ্ছিন্ন' শাঙ্করব্রহ্মকে মনে পড়ে, সেই ভয়ে রবীন্দ্রব্রহ্মকে আমার নিজের ভাষায় 'মনোব্রহ্ম' এবং প্রাচীনভাষায় 'বেদব্রহ্ম' নামে অভিহিত করিতে চাহি। ক্রমশঃ দেখা যাইবে, রবীন্দ্রব্রহ্মকে বেদব্রহ্ম নামে অভিহিত করার যৌক্তিকতা যথেষ্টই আছে।

বেদান্তব্রহ্ম ও বেদব্রহ্ম

বেদান্তে জগৎকে অস্বীকার করা হয় নাই সত্য, কিন্তু ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য যে সমস্ত সাধনার কথা তাহাতে বলা আছে, তাহা সাধন করিতে হইলে জগৎকে স্বীকার করা হয় না, পরন্তু জগদতীত কোনো এক অচিন্তনীয় বিজ্ঞানলোকে সমাধি লাভ করিতে হয়। জগৎ লইয়া, জগতের বৈচিত্র্য লইয়া, তাহার রূপরসগন্ধ লইয়া, তাহার ভোগসম্পদের বহুধাবিচিত্র রূপাভিলাষ লইয়া বেদান্ত যত আনন্দ পাইয়াছেন, তাহার কোটিগুণ আনন্দ অনুভব করিয়াছেন চৈতন্য সাক্ষাৎকারের জন্য প্রস্তুতি লইয়া। স্বরূপ-চৈতন্যে প্রমুদিত হওয়াই বেদান্তের মুখ্য উদ্দেশ্য কিন্তু স্মরণ রাখা ভালো যে, মনোবৃত্তি-প্রতিবিম্বিত আভাস-চৈতন্য লইয়া বেদান্ত তুষ্ট নহেন। সূর্য দেখিয়া, সাগর দেখিয়া, পৃথিবীকে নমস্কার করিয়া যে ব্রহ্মভাব অন্তরে প্রমুদিত হয়, যে অখণ্ডের দীপ্তিতে অন্তরাত্মা অতীন্দ্রিয় সত্তায় উন্নীত হইতেছে বলিয়া মনে হয়, সে ব্রহ্মভাব বেদব্রহ্মভাব।

ড. মহেন্দ্রনাথ সরকার লিখিয়াছেন :

> Nature is raised from its inertness to a medium of expression and the concrete is felt and enjoyed but the mind cannot rise above the delight of the rhythm and harmony and embrace

the transcendent. Consciousness cannot approach that height so long as the feeling attitude has not been displaced by a deeper penetration. This penetration is what really differentiates the teaching of the Upanisads from that of the Vedas. The vision and the appraisement of living nature have no doubt reduced the Vedic pantheon to the conception of an all-permeating Being ; still the mind needs greater penetration to touch the Basic Being.' [*Hindu Mysticism*]

'আদিভূত মৌল সত্তা' বা অদ্বিতীয় ব্রহ্মের ধ্যানে অনুপ্রবিষ্ট হইতে গিয়া বৈদান্তিকগণ মন যেখানে যায় না সেই অগম্য বা দুরধিগম্য ধ্যানের অন্তরে সমাধিস্থ হইয়াছেন; সংসারকে তখন মায়া বা মিথ্যা বলিয়া তাঁহাদের মনে হইয়াছে। কিন্তু বৈদিকগণ প্রায়শঃই সহজ চোখে জগৎকে দর্শন করিয়াছেন, রূপের মধ্যেই রূপেশ্বরের আনন্দলীলা দর্শন করিয়া পুলকিত হইয়াছেন। দার্শনিকদের বিচারে বেদদর্শন অপেক্ষা বেদান্তদর্শন সূক্ষ্মতর বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে ; বেদান্তব্রহ্ম অপেক্ষা বেদব্রহ্ম সহজেই অনুভাব্য বলিয়া কথিতও হইতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সহজসাধনায় যাহা পাইয়াছেন, তাহা ছাড়া ধারণাতীত ব্যাপার লইয়া কোনোদিন 'তর্কাতর্কি' করিবেন না। জগদ্দর্শনের কান্ত রূপলীলার মাহাত্ম্যেই জীবনব্রহ্মকে তিনি অনুভব করিবেন। 'Basic Being'-কে যদি জানিতে হয়, জগতের মধ্যে দিয়াই জানিবেন। বলা বাহুল্য, বেদদর্শনে ইহাই আছে। বেদেই দেখি, জগৎ সুন্দর ; সবিতা সুন্দর ; সমুদ্র সুন্দর। বৈদিক ঋষিরাই ইহজগতের ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হইয়াছেন, প্রকৃতির রূপে অরূপের আলো দেখিয়াছেন। জগৎকে সুন্দর দেখিয়া, সুন্দর করিয়া—জগৎকে ইহজীবনের একটা মনোরম আবাসস্থল জানিয়া জীবন অতিবাহনের মধ্যে ব্রহ্মোপলব্ধির বাণী বেদেই পাওয়া যায়।

ড. সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের আলোচনা

ড. সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখিয়াছেন : 'বেদ ও ব্রাহ্মণের মন্ত্রগুলি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, এই সমস্ত মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ অনুভব করিয়াছিলেন যে, প্রাণী ও অপ্রাণী লইয়া, সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র লইয়া, সরিৎ সাগর লইয়া, স্বর্গলোক অন্তরীক্ষ পৃথিবী লইয়া এই যে বিশ্বভুবন রহিয়াছে, ইহা ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাদের সমস্ত শক্তিই তাঁহা হইতে সমুদ্ভূত, তাঁহারই অলঙ্ঘ্য নিয়মে বিশ্বসংসার প্রবর্তিত হইতেছে, মৃত্যু ও অমৃত তাঁহারই মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বভুবন রূপে তিনি আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন। শুধু বাহিরের জগতের দিক দিয়া নহে, আমাদের অন্তর্জগতের, আমাদের মনোরাজ্যের সমস্ত মননক্রিয়া, সমস্ত প্রাণ-স্পন্দন তাঁহারি প্রভাবে, তাঁহারি লীলায় সম্পন্ন হইতেছে, তিনিই আমাদের চক্ষুর পিতা, 'চক্ষুষঃ পিতা'। তিনি আমাদের মনের প্রেরক। তিনি আপনাকে নাম-রূপের মধ্য দিয়া,

বাক্য ও বস্তুর মধ্য দিয়া প্রকটিত করিয়া রাখিয়াছেন। একদিকে যেমন তিনি বহির্জগৎ-রূপে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন, অপর দিকে তেমনি আমাদের অন্তরের মধ্যে আত্মস্বরূপে বিরাজ করিতেছেন।' [বেদ ও বেদান্ত, দার্শনিকী]

এই যে বেদব্রহ্ম, রবীন্দ্রব্রহ্মের সহিত ইঁহারই ভাবগত ঐক্য ও সাদৃশ্য আছে। ইনি ধারণাতীত নহেন অথচ ধারণা করি যে, ইনি ধারণার বাহিরেও আছেন। ইনি আছেন পিতার রূপে, আবার পিতৃণাং পিতৃতমরূপেও; ইনি আছেন প্রিয়জনের রূপে, আবার প্রিয়াণাং প্রিয়তমরূপেও। 'মানুষের ধর্ম' নামক গ্রন্থে কবি ইঁহাকেই 'ব্যক্তি-মনে' দেখিয়াছেন, 'বিশ্ব-মনে'ও দেখিয়াছেন। ইঁহাকে যখন উপাসনা করি তখন বৈদান্তিকদের ন্যায় জগৎকে মায়া বা মিথ্যা বলিয়া উপেক্ষা করি না, পরন্তু জগৎ-ও ইঁহার লীলা, ইঁহার প্রতিভা এইরূপ একটি আনন্দময় ধারণায় অননুভূত রস আস্বাদন করি। ফলে রাষ্ট্র, সমাজ, সংসার, গৃহ—এসমস্ত মিথ্যা মনে হয় না, ব্রহ্মভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মঙ্গলের জন্য চিন্তা করি, কর্ম করি। কল্যাণের দ্বারা, কর্তব্যের দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, যজ্ঞের দ্বারা আপন চরিত্রে এবং সমাজও রাষ্ট্র-চরিত্রে এই ব্রহ্মকে আহ্বান করি। 'স্বদেশ' নামক গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ এই ব্রহ্মের নিকটই মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন—"ওঁ ইতি ব্রহ্ম" [নববর্ষ, স্বদেশ]।

বেদব্রহ্মই যে রবীন্দ্রব্রহ্মের উপযুক্ত উপমা ইহা মনে করিবার আরো কারণ আছে। পণ্ডিতেরা জানেন বৈদিক ঋষিরা তপোবনে থাকিলেও গৃহস্থ ছিলেন। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, যতিত্ব ও সন্ন্যাসের আশ্চর্য সম্মেলন ছিল তাঁহাদের জীবনে। তাঁহারা ব্রহ্মোপাসনা করিতেন এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ব্রহ্ম অন্বেষণ করিয়া কখনও বা একের মধ্যে বিশ্ববিভূতি দর্শন করিয়া গান গাহিতেন, মন্ত্র দেখিতেন, বৈচিত্র্যকে মানিতেন বলিয়া বিচিত্র প্রকৃতির প্রত্যেক বিভূতিরই এক একটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পনা করিতেন, আবার সকল দেবতার এক দেবতাকে ধ্যান করিয়া পুলকিত হইতেন। তাঁহাদের যে সমস্ত বচন ও মন্ত্র আমরা পাইয়াছি, সেগুলির মধ্যে একদিকে যেমন প্রসন্ন ও প্রশান্ত মনোমহিমার শিবত্ব আছে, অপরদিকে তেমনি পার্থিব অভাববোধ ও পাপবোধের জৈবতাও আছে। বেদের মন্ত্রগুলিকে, আমার মনে হয়, প্রধানতঃ তিনভাগে ভাগ করা যাইতে পারে; প্রথম, পার্থিব অভাব-অভিযোগ ও পাপ-মোচনের মন্ত্র; দ্বিতীয়, বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্যমহিমা উপলব্ধির মন্ত্র; তৃতীয়, উচ্চতর জীবনধ্যান ও ব্রহ্মোপলব্ধির মন্ত্র। এই তিন স্তরের মন্ত্রের মধ্যে প্রায়শঃই মনোবৃত্তিসঞ্জাত আবেগানন্দের প্রাধান্য আছে। গার্হস্থ্যধর্মের সর্বোচ্চস্তরে উন্নীত হইয়া তাঁহারা যে ব্রহ্মকে অনুভব করিয়াছিলেন তাঁহার প্রকাশ জলে, স্থলে, সপ্তলোকে, সপ্ত 'তলে'—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে। বেদব্রহ্ম তাই, আমার মনে আছেন অর্থাৎ 'ব্যক্তি-মনে' আছেন, আবার 'বিশ্ব-মনে'ও আছেন। এই যে বিচিত্র জগৎ দেখিতেছি, ইহার পরতে পরতে এক একটি

বেদব্রহ্মই রবীন্দ্রব্রহ্ম

অধিদেবতার রূপ লইয়া তিনি আছেন। তিনি আছেন নদীতে নদীর-অধিদেবতা হইয়া, সাগরে সাগরদেবতা হইয়া, উষাকালে উষাদেবতা হইয়া, রাত্রিকালে রাত্রিদেবতা হইয়া। এইজন্য বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র বন্দনা বেদে সৌন্দর্যবিহ্বল আশ্চর্য ছন্দে নন্দিত হইয়াছে। শুধু লক্ষণীয় বিষয় এই,—বেদের সদাচারী সরল ঋষিবৃন্দ আপনাদের অভাবের কথা কোথাও লুকাইতে চাহেন নাই। যাহা সত্য, যাহা স্বভাবানুগ, তাহা স্বচ্ছন্দে ও অনাড়ম্বর ভাষায় বর্ণনা করিয়া আকুল প্রার্থনাদ্বারা স্বভাবকে অতিক্রম করিতে চাহিয়াছেন। যেমন,—জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে আহ্বান করিয়া তাঁহারা বলিতেছেন :

বেদব্রহ্ম

হে আপঃ, হে জল, হে জলদেবতা, মহৎসুন্দর ব্রহ্ম দর্শনে অধিকারী করো আমাদের (স্নিগ্ধ নির্মল করো আমাদের।) ইহলোকে অন্নের অভাব যেন আমাদের না থাকে।

ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তান উর্জ্জে দধাতন
মহে রণায় চক্ষসে ॥ [সামবেদ-সংহিতা]

পুত্র-হিতৈষিণী স্নেহময়ী মা যেমন স্তন্যরসদানে সন্তানের কল্যাণ করেন, হে জলদেবতা, তেমনি রসদানে কল্যাণ করো আমাদের।

ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ
উশতীরিব মাতরঃ ॥ [ঋগ্বেদ-সংহিতা, ১০।৯।২]

তোমার যে-রসে সকলে সর্বত্র পরম তৃপ্তি পাইতেছে, আমরাও যেন সেই রসে পরিতৃপ্তি পাই, হে জলদেবতা, এই প্রার্থনা।

ওঁ তস্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ
আপো জনয়থা চ নঃ ॥ [মার্জন-মন্ত্র। সামবেদীয় সন্ধ্যাবিধি দ্রষ্টব্য।]

জলদেবতার প্রতি এই সমস্ত প্রার্থনা-মন্ত্রের মধ্যে যে সহজ ও সরল স্বভাবের প্রকাশ আছে, তা' সহজেই পাঠকের চিত্ত অধিকার করে। জলের মধ্যেও দেবতা আছেন, সেই দেবতা মায়ের মত আমাদের স্নিগ্ধ করে, শীতল করে, এই কল্পনায় চিত্ত রসাবেশে বিভোর হইয়া উঠে। উপনয়নের পর হইতে এই সমস্ত মন্ত্র আবৃত্তি করিতে করিতে রবীন্দ্রনাথ এই রসাবেশে ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন তাহা অনুমান করা কি অন্যায় হইবে? 'প্রভাত সঙ্গীত' ও 'ছবি ও গান'-এর অনেক কবিতায় তিনি যে দিশি দিশি সুন্দরের আবির্ভাব দেখিয়াছেন, সেই দৃষ্টি-প্রতিভা তিনি কি বেদমন্ত্র হইতে লাভ করেন নাই? জলদেবতার এই প্রার্থনার উল্লেখ তিনি কোথাও কোথাও করিয়াছেন [জল. আকাশপ্রদীপ ; *Sadhana*, p. 8.]। উপরন্তু ব্রাহ্মণ হইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং উপনয়নও তাঁহার হইয়াছিল, এই কারণে এই অনুমান করা কি খুবই অসঙ্গত হইবে যে, এই সমস্ত মন্ত্র তাঁহাকে সকাল-সন্ধ্যায় আবৃত্তি করিতে হইত? প্রকৃতির যেদিকে চাহি না কেন,

সর্বত্রই এক একটি অধিদেবতার বা সুন্দরের আবির্ভাব দেখি, দেখি সীমার মধ্যে অসীমের আবির্ভাব—এই মনোময় বাণী কি বিচিত্রছন্দে তিনি বিচিত্র কাব্যের মধ্যে প্রকাশ করেন নাই ?

বেদের সব কথাই যে রবীন্দ্রনাথ বেদবাক্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বলি না। বেদে এমন কতকগুলি প্রার্থনাও পাওয়া যায়, যেগুলি ঋষিদের পাপবোধের নিদর্শন বহন করে। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ এই পাপবোধটুকু গ্রহণ করেন নাই। 'Imitation of Christ'-এর সহিত রবীন্দ্রকাব্যের তুলনামূলক সমালোচনা করিতে গিয়া প্রসিদ্ধ আইরিশ কবি W. B. Yeats রবীন্দ্রনাথের এই কুসুমোপম নিষ্পাপ নির্মলতার উল্লেখ করিয়াছেন। বেদ বা Bible-এ পাপের কথা আছে। রবীন্দ্রনাথে পাপ নাই ; 'পাপেরে নানাছলে' তিনি দেখিয়াছেন বটে, কিন্তু পাপকে পুণ্যের পথে টানিয়া লইবার প্রতিভাই তাঁহার স্বভাব-বৈশিষ্ট্য। সমালোচক অজিতকুমার চক্রবর্তী রবীন্দ্র-প্রতিভার এই দিকটির কিছু আলোচনা করিাছেন।

কয়েকটি প্রার্থনা

বেদের পাপবোধের কথা বলিতেছি। ঋষি গাহিতেছেন :

যেখানে-সেখানে যা-তা খেয়েছি
তাতে যা পাপ হয়েছে,
পরের উচ্ছিষ্ট খেয়েছি
তাতে যা পাপ হয়েছে,
অসৎ আচরণ করেছি
তাতে যা পাপ হয়েছে,
হে জলদেবতা, তা সব থেকে
আমাকে বাঁচাও।

যদুচ্ছিষ্টমভোজ্যং বা যদ্ বা দুশ্চরিতং মম
সর্বং পুনন্তু মামাপোঽসতাঞ্চ প্রতিগ্রহ (গুঁ) স্বাহা॥
[ছান্দোগ্য ৫।১০।৯]

ক্রোধ করে যে পাপ করেছি
সেই পাপ থেকে রক্ষা করো আমাকে,
অকার্য করবো না আর।
রাত্রিকালে যত পাপ করেছি,
রাত্রির অধিষ্ঠাত্রী হে পরমা দেবতা
আমাতে যেন সে পাপ আর না থাকে।

মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং
যদ্রাত্র্যা পাপমকার্ষং
মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না
রাত্রিস্তদবলুম্পতু যৎকিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি ॥ [আচমন মন্ত্র]

সামবেদের একখানি 'ব্রাহ্মণে'র মধ্যে পঞ্চ মহাপাতকের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। যাহারা স্বর্ণ অপহরণ করে, যাহারা সুরাপান করে, যাহারা গুরুদার হরণ কবিতে দ্বিধা করে না, যাহারা ব্রহ্মহত্যা করে এবং যাহারা এই সমস্ত মহাপাতকদের সহিত সংসর্গ করে—এই পাঁচপ্রকার মহাপাতক হইতে দূরে থাকিবার ইঙ্গিতোপদেশ বেদে পাওয়া যায়।

স্তেনো হিরণ্যস্য সুরাং পিবংশ্চ
গুরোস্তল্পমাবসন্ ব্রহ্মহা
চৈতে পতন্তি চত্বারঃ পঞ্চমশ্চাচরংস্তৈঃ ॥ [ছান্দোগ্য ৫।১০।৯]

যদি পাপ করে থাকি দিনের বেলায়,
পাপ করে থাকি রাত্রিতে
হে বায়ু, হে পবনদেবতা,
সেই পাপ থেকে মুক্ত করো আমাদের।

যদি দিবা যদি নক্তম্
এনাংসি চকৃমা বয়ম্
বায়ুর্মা তস্মাদেনসো
বিশ্বান্ মুঞ্চত্বংহসঃ ॥ [বাজসনেয়ি সংহিতা ২০।১৫।১৭]

এই সমস্ত প্রার্থনায় মানবিক সাধনার পরিচয় আছে। বৈদিক ঋষিরাও মানুষ, মানুষের মত হয়তো তাঁহারা পাপ করিয়া ফেলেন কিন্তু পাপে তাঁহাদের সমর্থন নাই; পাপ হইতে তাঁহারা উদ্ধার কামনা করেন। উদ্ধার পাইয়া প্রসন্ন হন। সূর্যের দিকে তাকাইয়া কৃতাঞ্জলি তাঁহারা স্তব করেন:

বেদের সূর্যমন্ত্র

সুন্দর সূর্য।
বিশ্বদেবতার সমষ্টি ওই সূর্যদেবতা।
বিচিত্র আনন্দে উদিত হয়েছে ওই জ্যোতি,
ও যেন বিশ্বভূপতি।
রশ্মি নিচয়ে আলোকিত হয়েছে
স্বর্গমর্তশূন্যদেশ—

আমার ভক্তি জাগুক,
আমার ভক্তি জাগুক ওই জ্যোতির্ময়ে।

ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং
চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ।
আপা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরীক্ষং
সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ ॥ [সূর্যোপস্থান মন্ত্র]

নমস্কার ঐ পূর্বাদ্রিপ্রকাশক তেজোময় সূর্যকে।
ওঁ তরণির্বিশ্বদর্শতো জ্যোতিষ্কৃদসি সূর্য। বিশ্ব মা ভাসি রোচনম্।

বিশ্বভুবনপ্রকাশকারী হে জ্যোতির্ময় সূর্য,
উপাসকের পাপহারী হে সূর্য,
সকলের দর্শনীয় জগৎস্বামী হে সূর্য,
প্রত্যঙ্ বিশ্বং স্বর্দৃশে—
তোমাকে প্রভাসিত দেখে পরিতৃপ্ত বিশ্বদর্শনেন্দ্রিয় ॥

[মধ্যাহ্নকালীন সূর্যোপস্থান।
ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যাবিধি দ্রষ্টব্য]

আরও কয়েকটি বেদবাণী

আহা—
আমিই বুঝি সূর্যজ্যোতি ব্রহ্মা,
ব্রহ্মজ্যোতি আমি শিব,
শিবজ্যোতি আমি বিষ্ণু,
বিষ্ণুজ্যোতি আমি শিব।

ওঁ অর্ক জ্যোতিরহং ব্রহ্মা
ব্রহ্মজ্যোতিরহং শিবঃ
শিবজ্যোতিরহং বিষ্ণুঃ
বিষ্ণুর্জ্যোতিরহং শিবঃ ॥

এইরূপে বাহির হইতে অন্তর, অন্তর হইতে অন্তরতমের উপলব্ধি বেদমন্ত্রে পাওয়া যায়। বেদের স্কম্ভ ও ব্রহ্ম বর্ণনায় আশ্চর্য কবিত্বপূর্ণ এই উপলব্ধির দর্শন মিলিয়াছে। বলা হইয়াছে, তাঁহার বিরাট বিশ্বরূপ দর্শন সম্ভব হইল এইবার। এইবার বুঝিয়াছি :

তাঁর অঙ্গদেশেই আছে সব,
আছে তপ, আছে ঋত,
আছে ব্রত, শ্রদ্ধা ও সত্য ;

আছে অগ্নি, আছে পবন,
আছে জ্যোৎস্নাময় চন্দ্রমা ;
আছে এই পৃথিবী,
আছে অন্তরীক্ষ
আছে স্বর্গ,
আছে স্বর্গাতীত মহাস্বর্গ।

কস্মিন্নঙ্গে তপোঽস্যাধিতিষ্ঠতি
কস্মিন্নঙ্গে ঋতমস্যাধ্যাহিতং
ব্রতংক্ব শ্রদ্ধাংস্য তিষ্ঠতি
কস্মিন্নঙ্গে সত্যমস্য প্রতিষ্ঠিতম্।
কস্মাদঙ্গাৎ দীপ্যতেঽগ্নিরস্য
কস্মাদঙ্গাৎ পবতে মাতরিশ্বা
কস্মাদঙ্গাং বিনিমীতেঽধি চন্দ্রমাঃ
মহঃ স্কম্ভস্য মিসানোঽঙ্গম্।
কস্মিন্নঙ্গে তিষ্ঠতি ভূমিরস্য
কস্মিন্নঙ্গে তিষ্ঠতি অন্তরীক্ষম্
কস্মিন্নঙ্গে তিষ্ঠতি আহিতা দ্যৌঃ
কস্মিন্নঙ্গে তিষ্ঠতি উত্তরং দিবঃ॥ [অথর্ববেদ, দশম মণ্ডল ৭।৮]

কিন্তু এই দৃষ্টি, এই অনুভূতি কাহাদের হয়? কাহারা এমনতর দেখিতে পায়?

ধীর যাঁরা, যাঁরা সুমন, যাঁরা সংযত
পশ্যন্তি ধীরাঃ সুমনো বা॥
আহা—
সুমন হক, স্বস্তি আসুক মানুষের।
স্বস্তির্মানুষেভ্যঃ॥

মানুষের এই পৃথিবী, এঁকে নমস্কার।
নমঃ পৃথিব্যৈ॥

ঊর্ধ্বস্থিত সত্যলোক, অধোলোক, লোকালোক পর্বত
চারিদিকের দেববৃন্দ ও ব্রাহ্মণ, তোমাদের
নমস্কার—সকলকে নমস্কার।

ওঁ আসত্যলোকাদাপাতালাদালোকালোকপর্বতাৎ
যে সন্তি ব্রাহ্মণা দেবাস্তেভ্যো নিত্যং নমো নমঃ ॥

আমরা ভালোবাসি সেই ক্ষেম
যা বর্তমান ও ভবিষ্যতের রোগশোক নাশ করে।
আমরা যজ্ঞ করি, আমরা ফল চাই,
যজমান গৃহস্থের মঙ্গল চাই আমরা।
মঙ্গল হক পুত্রদের
সুখে থাকুক গবাদি পশু
দেবতার আশীর্বাদ বর্ষিত হক তাদের শিরে।
ওঁ তচ্ছংয়োরাবৃণীমহে
গাতুং যজ্ঞায়
গাতুং যজ্ঞপতয়ে।
দৈবী স্বস্তিরস্তু নঃ
স্বস্তির্মানুষেভ্যঃ
ঊর্ধ্বং জিগাতু ভেষজং।
শন্নো অস্তু দ্বিপদে
শং চতুষ্পদে ॥

বৈদিক ঋষির বিশ্বজগৎ ও ব্রহ্ম

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত যে কয়েকটি বেদবাণী এই গ্রন্থে উদ্ধৃত করা হইল, তাহা হইতেই সম্ভবতঃ বুঝা সম্ভব হইবে যে, এই জীব-জগৎ বৈদিক ঋষিদের নিকট মিথ্যা ছিল না, বরং অত্যন্ত মনোরম ও মনোময় ছিল। প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য তাঁহারা সরল আবেগানন্দে পর্যবেক্ষণ করিতেন, মানবপ্রকৃতিতে পাপ ছিল বটে কিন্তু পাপকে অতিক্রম করিবার সাধনা ও প্রার্থনা তাঁহারা করিতেন, সাধনায় জয়ী হইলে, চিত্ত ধীর ও স্থির হইলে তাঁহারা প্রকৃতির রূপে বিশ্বনিয়ন্তার রূপচ্ছবি দেখিতে পাইতেন। তখন পৃথিবীকে তাঁহাদের বড় ভালো লাগিত, বড় মধুর লাগিত। তখন মধুর বাতাস বহিত,—মধুর, মধুর, বড় মধুর মনে হইত বিশ্বভুবন। এই মধুর মনোভাবের মধ্য দিয়া যে-ব্রহ্ম আবির্ভূত হইতেন 'রসো বৈ সঃ,' রসে তিনি আছেন। "যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা"—তিনি আর কে, তিনি ইনি, এই ভুবনে ভুবনে লোকে লোকে রূপে রূপে মনে মনে যাঁহাকে দেখিতেছি। অথর্ববেদের স্কম্ভ ও ব্রহ্মবর্ণনার শ্লোক কয়টি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি, বেদে ব্রহ্মকে রূপময় বা সাকার বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। ক্রমশঃ ঋষিরা যখন ভাববিহ্বলতা হইতে যুক্তির বিজ্ঞানে অগ্রসর হইলেন, তখন, অর্থাৎ বেদান্তর যুগে, এই রূপদেব ব্রহ্ম অরূপে রূপান্তরিত হইলেন—ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে এত

সূক্ষ্মতর হইয়া গেলেন যে মন দিয়া তাঁহাকে আর ধরা গেল না, বিজ্ঞানের চৈতন্যে তাঁহার আভাস মাত্র পাওয়া গেল। আচার্য শঙ্কর কহিলেন—বিজ্ঞানের অন্তরে সূক্ষ্মতররূপে আনন্দলোক, শ্রুতিতে এই আনন্দকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। এই আনন্দ যে কী আনন্দ, তাহা মন দিয়া কেমন করিয়া ধরা যাইবে? সুতরাং এই আনন্দব্রহ্মকে পাইতে হইলে জগৎ ভুলিতে হইবে, প্রকৃতির বিশ্ববিধ আবেগকে সন্ন্যাস-তপশ্চরণের দ্বারা দমন করিয়া করিয়া ধাপে ধাপে স্তরে স্তরে উর্ধ্বে ঐ 'আনন্দলোকে' উঠিবে। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ জগৎ-নিরপেক্ষ এই আনন্দে বিশ্বাসী নহেন। জ্ঞানসাধনায় একটু একটু করিয়া ব্রহ্মকে লাভ করার তত্ত্বেও তাঁহার আস্থা নাই। 'সাধনা'-য় তিনি বলিয়াছেন:

> 'We cannot attain the supreme soul by successive additions of knowledge acquired bit by bit even through all eternity because He is One, He is not made up of parts. We can only know Him as heart of our hearts and soul of our souls; we can only know Him in the love and joy and feel when we give up self and stand before Him face to face.' [Self-consciousness, *Sadhana*]

অন্যত্র 'মানুষের ধর্মে' তিনি বলিয়াছেন:

'কেবল জানার দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না। হওয়ার দ্বারা পেতে হবে, দুশ্চরিত্র থেকে বিরত হওয়া, সমাহিত হওয়া, রিপুদমন করে অচঞ্চল মন হওয়া দ্বারাই তাঁকে পেতে হবে। অর্থাৎ এ এমন পাওয়া যা আপনারি চিরন্তন সত্যকে পাওয়া।'

'ভূমা আহারে বিহারে আচারে বিচারে ভোগে নৈবেদ্যে মন্ত্রে তন্ত্রে নয়। ভূমা বিশুদ্ধ জ্ঞানে, বিশুদ্ধ প্রেমে, বিশুদ্ধ কর্মে।'

'যুক্তিতর্কের যোগে বাহ্জ্ঞানের বিষয়কে যেমন করে জানি এ তো তেমন করে জানা নয়, অন্তরে হওয়ার দ্বারা জানা। নদী সমুদ্রকে পায় যেমন যেমন করে প্রতিক্ষণেই সমুদ্র হতে হতে। একদিকে সে ছোট নদী আর একদিকে সে বৃহৎ সমুদ্র। সেই হওয়া তার পক্ষে সম্ভব, কেননা সমুদ্রেব সঙ্গে তার স্বাভাবিক ঐক্য, বিচ্ছেদের ভিতর দিয়ে সেই ঐক্য।'

বেদান্তবাদীরা এইসমস্ত উক্তির বিরুদ্ধে কোনো তর্কযুক্তি যে উত্থাপন করিতে পারেন না, তাহা বলিতে পারি না; তবে পণ্ডিত পাঠক অবশ্যই ইহা স্বীকার করিবেন যে, রবীন্দ্রনাথ বৈদান্তিক কোনো বিশুদ্ধ তর্কের মধ্যে প্রবেশ করিবেন না। তাঁহার 'দর্শনে,' যে 'হওয়ার' কথা আছে, 'চিরন্তন সত্য'কে পাওয়ার জন্য 'জ্ঞানে, প্রেমে, কর্মে' হওয়ার তত্ত্বে যে বিশ্বাস আছে, মানবজীবনের অপূর্ণতার তাহাই তো দ্যোতনা করে। মানব নিজে নদীর মত, সাগরে যে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মিলিত হইয়াই আছে—যত সে 'হয়' ততই সে

নিজেকে 'সাগর' বলিয়া জানিতে পারে। বৈদান্তিকরা হয়তো বলিবেন, মন ছাড়িয়া বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান ভেদ করিয়া সূক্ষ্ম আনন্দে 'আনন্দ' হওয়াই তো 'চিরন্তন সত্য'। রবীন্দ্রনাথ বলিবেন—জগৎকে স্বীকার করিয়া জীবনের রূপরসবর্ণগন্ধকে উপেক্ষা না দিয়া যদি এই 'হওয়া' সম্ভব হয়, তবে এ সত্য, নতুবা নয়। স্পষ্ট বুঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ যে আনন্দ বা যে অরূপের কথা বলেন, তাহা জগৎনিরপেক্ষ বোধাতীত কোনো একটি ব্যাপার নহে। বৈদিক ঋষিদের কল্পনায় রূপাতীতেরও যেমন 'অঙ্গ' আছে, রবীন্দ্রনাথের মনোময় অরূপেরও রূপ আছে। এইজন্য রবীন্দ্রনাথের অরূপ বেদব্রহ্মের মতই 'বিরাট', 'সুদূর' ও 'অনন্ত' হইলেও মনোগোচর। চিত্তসাধনার সর্বোচ্চস্তরে উন্নীত যাঁহারা হইয়াছেন তাঁহারা কিছুতেই রবীন্দ্রনাথের এই অরূপকে বোধ-অবচ্ছিন্ন তত্ত্ব মাত্র বলিবেন না।

বৈদান্তিকের মনাতীত আনন্দ-তত্ত্ব

আর একটি বিষয় আলোচনা করিয়া বর্তমান অধ্যায় আমি শেষ করিব। বেদান্ত বেদেরই অংশ, অথচ বেদব্রহ্ম ও বেদান্তব্রহ্মের এত তফাৎ কেন দেখিতেছি বলা আবশ্যক। বেদান্ত বেদেরই অন্ত এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নাই। কিন্তু বেদান্ত বা উপনিষৎকে দুইভাগে ভাগ করিয়া একভাগে বেদ আর অপরভাগে বেদান্তকে স্থাপিত করাই সমীচীন বলিয়া আমি মনে করিয়াছি। 'বেদান্ত' শব্দে স্বামী বিবেকানন্দ 'ভারতীয় সমগ্র ধর্ম সমষ্টি' বুঝিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'বেদান্ত শব্দে আমি সেই অনাদি অনন্ত জ্ঞানরাশিকেই লক্ষ্য করিতেছি। ভারতের দ্বৈতবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ সকলই উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।' এমন কি 'বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈনধর্মের অংশবিশেষ' তিনি বেদান্ত মধ্যে গ্রহণ করিতে সম্মত আছেন। এক্ষেত্রে বেদ বেদান্তের পার্থক্য বুঝিয়া রাখা ভালো। ['ভারতে বিবেকানন্দ' দ্রষ্টব্য।]

বেদব্রহ্ম ও বেদান্তব্রহ্ম

উপনিষদের যে অংশে ব্রহ্মকে লইয়া তর্কযুক্তির সৃষ্টি হয় নাই, যে অংশে কবিত্বের রস-সুন্দর সহজ আবেগানন্দের মধ্য দিয়া ঋষি-হৃদয়ে ব্রহ্মরূপ প্রতিভাত হইয়াছে, সেই অংশকে আমি নাম দিতে চাই বেদোপনিষৎ বা মানসবেদ, কেননা প্রাচীন বেদের স্বাচ্ছন্দ্য, সারল্য ও সৌন্দর্য তাহাতে অক্ষুণ্ণ আছে বলিয়া আমার ধারণা। অপরপক্ষে, উপনিষদের যে অংশে ব্রহ্ম-বিচার ও ব্রহ্ম লইয়া তত্ত্ব-বিচার সুরু হইয়াছে, যে অংশ লইয়া শঙ্করপ্রমুখ মনীষী দার্শনিকবৃন্দ ন্যায়ানুমোদিত একটি বিশিষ্ট দর্শনশাখা নির্মাণে সমর্থ হইয়াছিলেন, যে অংশের মূলকথা শুধু অনুভব নহে, যুক্তি, শুধু ভক্তি নহে, জ্ঞান, শুধু মন নহে, বিজ্ঞানানন্দ, শুধু স্বভাবোপলব্ধি নহে, সাধনোপলব্ধি—সেই অংশকে আমি বিজ্ঞানো-পনিষৎ বা বিজ্ঞানবেদ নাম দিবার প্রস্তাব করি। এই বিজ্ঞানোপনিষদের 'আনন্দব্রহ্ম' রবীন্দ্রনাথের 'জীবনব্রহ্ম' নহেন। রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম মানেন এবং ব্রহ্মের উপর কোনো কিছুই তিনি স্বীকার করেন না—এইটুকু জানিয়াই যাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে মানস-ত্যাগী বৈদান্তিক বলিয়া ধারণা করিবেন, তাঁহারাই তাঁহার কাব্যে

মানসবেদ ও বিজ্ঞানবেদ

মানব-প্রীতি ও বাসনা-বিহ্বলতা দেখিয়া কবিকে পৃথক বলিয়া মনে করিবেন। বৈদান্তিকগণ বলেন, ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মই হইয়া যান, সুতরাং তাঁহার মধ্যে অপূর্ণতা কিছুই থাকিতে পারে না। অন্তরে বাহিরে তিনি পূর্ণ, এইজন্য অভাবের কোনো বোধ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না, ফলে তিনি 'নিবাত নিষ্কম্প দীপের' মত 'জীবন্মুক্ত' জীবন যাপন করিতে থাকেন। তখন তাঁহার জীবনে গতি নাই, বেগ নাই। রবীন্দ্রনাথকে যদি এইরূপ গতিবিহীন ব্রহ্মবাদী বলিয়া কল্পনা করা যায়, তবেই তাঁহার কাব্য রচনাকে হয় অবিশ্বাস্য একটা ঘটনা বলিয়া প্রমাণ করিতে হয়, নয় কাব্যকে মর্যাদা দিতে গিয়া বলিতে হয়, তাঁহার দর্শন একটা মানসিক চিন্তাবিলাস ছাড়া আর কিছু নহে। তাঁহাকে যাঁহারা বৈদান্তিক রূপে ব্যাখ্যা করিতে গিয়াছেন, তাঁহারা কবির দর্শনতত্ত্বকে হয়তো সম্মান দেওয়া হইল বলিয়া মনে করিয়াছেন, কিন্তু একজন পূর্ণ বৈদান্তিকের মধ্য দিয়া মানস-চিন্তার অন্তহীন আবেগাবলীর প্রকাশ কেমন করিয়া হয়, দুরূহ এই প্রশ্নেরও জন্ম দিয়া ফেলিয়াছেন। হীরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বৈদান্তিকরূপে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শেষে স্বীকার না করিয়া পারেন নাই যে তিনি একজন রূপধর্মী অর্থাৎ বেদধর্মী ব্রহ্মবাদী। বলা বাহুল্য, সাকারোপাসনা বা রূপে রূপে বিশ্ববৈচিত্র্যে চৈতন্যের আভাস দেখার চেতনা বা সাধনা বৈদান্তিকদের মতে মনোময় ব্রহ্মের সাধনা। বৈদান্তিকগণ বলিবেন, বিজ্ঞানজগতের প্রকাশেই জীবের ব্রহ্মত্ব অর্থাৎ পূর্ণতা লাভ হয়। এটা না হওয়া পর্যন্ত সাধনা চলে। সাধনা চলে, কেননা তখনও অনেক অভাব থাকে। অভাব যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ গতি থাকে। রবীন্দ্রনাথকে যে অনেক সময় গতিবাদী বলিয়া মনে হয় তাহার কারণ বেদান্তপ্রোক্ত এই বিজ্ঞান তাঁহা হইতে অনেক তফাৎএ আছেন। নিশ্চয়তার সুর রবীন্দ্রনাথে ধ্বনিত হইয়াছে তবু এ কথাও সত্য, মাঝে মাঝে তাঁহার মধ্যে অনিশ্চয়তার ও সংশয়ের সুর বাজিয়া উঠে। বেদান্ত বলিবেন, মনের অতীতে বিজ্ঞানকে না পাওয়া পর্যন্ত সংশয় থাকে, ব্যাকুলতা থাকে, 'ঘরের ঠিকানা হলো না গো', মন তবু করে যাই যাই' [খেয়া]—এই ভাব থাকে। বলা বাহুল্য, এই যাই-যাই ভাবটাই গতি। এই গতির আবেশেই রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের আভাস পান, 'নামটি কবে ঘোচাবে নাথ' [গীতাঞ্জলি] বলিয়া গান গাহিয়া উঠেন। বুঝা যায়, মনোময় স্তরের শীর্ষদেশে উন্নীত হইয়া তিনি দেখেন বিজ্ঞানবেদের ইঙ্গিত, নিম্নদেশে দেখিতে পান অন্নময় প্রাণময় গতিচঞ্চল জগৎ। বিজ্ঞানকে তিনি সম্পূর্ণভাবে চাহেন নাই বলিয়া মন রহিয়া গিয়াছে, গতি থামে নাই। বিজ্ঞানের আভাস-দীপ্ত মনোব্রহ্মের দৃষ্টিতে তিনি প্রাণময় ও অন্নময় জগৎকে দেখিয়াছেন, ফলে তাঁহার জগৎ আমাদের এই খণ্ডক্ষুদ্র বিভ্রান্ত জগতের প্রতিচ্ছবি হইতে পারে নাই। অকথিত এক পুণ্য আলোকে উদ্‌ভাসিত হইয়া তাঁহার জগৎ অমূর্ত কোনো রহস্যের আভাস দিয়া যায়। তিনি যখন বলেন :

রবীন্দ্রনাথের মানসবেদ

রবীন্দ্রসাহিত্যে তাই দ্বন্দ্ব ও গতি

জড়ায়ে আছে বাধা

জড়ায়ে আছে বাধা ছাড়ায়ে যেতে চাই,
ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে,
মুক্তি চাহিবারে তোমার কাছে যাই,
চাহিতে গিয়ে মরি লাজে। [গীতাঞ্জলি-১৪৫]

তখন কাব্যিক স্বভাবসৌন্দর্যে আমরা মুগ্ধ হই বটে, কিন্তু এই কয় পংক্তির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য গ্রহণ করিয়া তাঁহার দর্শন ও কাব্যের স্বরূপ সন্ধানে স্বচ্ছন্দে আমরা তৎপর হইতেও পারি। ইহজীবনে 'limitations' অনেক, বাধা অনেক; গতিপথের অন্তরায় সেই সমস্ত বাধাগুলি। অভিযাত্রী মহাপ্রাণ কখনই চাহে না এই সমস্ত বাধার অক্টোপাস-বন্ধনে বন্দী থাকিতে। তাই 'ছাড়ায়ে যেতে চাই'। ছাড়িতে ছাড়িতে, সমস্ত কিছু ত্যাগ করিতে করিতে চলি। ত্যাগ করি বলিয়াই গতিকে জানি। ত্যাগ, ত্যাগ, ত্যাগ—সমস্ত ত্যাগ করিতে চাহি, কিন্তু এই 'চাওয়া'—এই 'বোধ' তো ত্যাগ করিনে। বলি এটা গেলে তো সবই যাইবে। ওটি ছাড়িতে পারিব না। 'ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে'। ব্যথা বাজে, মন রহিয়া যায়, রহিয়া যায় প্রবৃত্তি। তথাপি মুক্তি চাহিতে কি কোনো বাধা আছে? কে আমার মনকে বাঁধিবে? 'মুক্তি চাহিবারে তোমার কাছে যাই'।

ছাড়ায়ে যেতে চাই

কিন্তু চাহিতে গিয়া লজ্জা কেন? বুঝিতে পারি মনোবিহীন নৈষ্কর্ম্য আমার সাধনা নহে। 'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।' কিন্তু তবু যে মুক্তি চাই, তাই লজ্জা। মুক্তি মানবজীবনে সত্য নয়, সত্য গতি। 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে' বলিয়া আরো অগ্রসর হইতে হইবে। 'অসংখ্য বন্ধনের' মধ্য দিয়া চলিতে হইবে নব নব কর্মে, নব নব ধ্যানে, নব নব জ্ঞানের আনন্দে। মানবজীবনের ইহাই শ্রেয়। ইহা না বুঝিয়া কী ছাই মুক্তি চাহিতে গিয়াছি!

'ঈশোপনিষৎ বলেন, শত বৎসর তোমাকে বাঁচতে হবে, কর্ম তোমার না করলে নয়। শত বৎসর বাঁচাকে সার্থক করো কর্মে। এমনতর কর্মে যাতে প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রমাণের সঙ্গে বলতে পারা যায়, সোহহম্। এ নয় যে, চোখ উল্‌টিয়ে, নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে থাকতে হবে মানুষ থেকে দূরে।…সোহহম্ সমস্ত মানুষের সম্মিলিত অভিব্যক্তির মন্ত্র, কেবল একজনের না।' [মানুষের ধর্ম]

রবীন্দ্রনাথকে যাঁহারা 'এস্‌কেপিস্ট্' বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা উপযুক্ত বচনগুলি পড়িলেই বুঝিবেন, জগতের বন্ধনে থাকার জন্য, মনের মন্দিরে সাত্ত্বিক প্রসন্নতা লইয়া অহরহঃ পূজা দিবার জন্য রবীন্দ্রনাথের ব্যাকুলতা কত গভীর। মনের মত মনের তিনি কবি, মনের মত মনোদর্শনের তিনি মনোময় সাধক। এইটুকু বুঝিতে কেবলি গোলমাল করিয়া ফেলি বলিয়াই তাঁহার কাব্য বা দর্শনের যথাযথ মর্মার্থ ধরা আমাদের পক্ষে সম্ভব

মনের সাধক কি 'এস্‌কেপিস্ট্'?

হয় না। নিজেরা জীবনের যে স্তরে আছি, সেই স্তর হইতে রবীন্দ্রনাথকে বিচার করিতে যাই বলিয়াই কেহবা তাঁহাকে এস্‌কেপিস্ট্, কেহবা তাঁহাকে মিস্‌টিক্ বলিতেছি। আসলে তিনি এস্‌কেপিস্ট্ নহেন, জগতে ও মনোজগতেই তিনি আছেন এবং থাকিতে চাহেন। তিনি মিস্‌টিক-ও নহেন, বিজ্ঞানের বাক্‌বিহীন মনোবিহীন আনন্দস্তরের কোনো কথা বা কোনো গান তিনি গাহেন নাই। মনের যে সমুন্নত স্তরে বসিয়া তিনি গান গাহেন,—অনেক নিচু স্তরে আমরা থাকি বলিয়া সে মনকে আমরা জানি না, বুঝি না; ফলে তাঁহার কথাগুলি আমাদের নিকট মিস্‌টিক্ বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জানেন মিস্‌টিক্ অবাঙ্‌মনসগোচরের রহস্যকুহেলী সৃষ্টি করিতে তিনি চাহেন নাই। সুতরাং তাঁহার ব্রহ্মবাদকে বুঝিতে হইলে 'হওয়ার' সাধনায় মনের নিম্ন ভূমি হইতে উচ্চ ভূমিতে উঠিতে হইবে।

অথবা 'মিস্‌টিক্' ?

'মানুষ একদিকে মৃত্যুর অধিকারে আর একদিকে অমৃতে; একদিকে সে ব্যক্তিগত 'সীমায়' আর একদিকে বিশ্বগত বিরাটে। এই দুয়ের কোনোটাকেই উপেক্ষা করা চলে না। মানুষ নিজেকে জানে 'তদ্‌দূরে তদ্বন্তিকে চ। সে দূরেও বটে, সে নিকটেও।'

[মানুষের ধর্ম]

এই যে উচ্চতম মর্মবোধ, ইহাই রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মবোধ। রবীন্দ্রনাথের অভিমত এই, মানুষ তাহার নিজের মর্মবোধের অসীমত্ব হইতেই ব্রহ্মকে পাইবে। মানুষের মন যত বড়, যত বিরাট হইবে, ব্রহ্মও তাহার নিকট তত বড়, তত বিরাট বলিয়া প্রতিভাত হইবে। বেদের ঋষিরা এই ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথও আপন সত্ত্বগুণান্বিত মনের জ্যোতি-প্রতিভায় এই ব্রহ্মকে অনুভব করিয়াছেন। বেদোপনিষদের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ এইজন্য। একটু ধীরভাবে লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, উপনিষৎ হইতে যে সমস্ত বাছা-বাছা পংক্তিগুলি রবীন্দ্রনাথ চয়ন ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেগুলি বিজ্ঞানবেদের তত্ত্ব যত বহন করে, তদপেক্ষা ঢের বেশী বহন করে মানস-বেদানন্দের রসোপলব্ধি। বিভিন্ন উপনিষদে বিভিন্ন মত বিভিন্ন প্রকারে প্রকাশিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ আপনার মনোধর্মের অনুকূল কতকগুলিমাত্র গ্রহণ করিয়াছেন। যে যে অংশে নির্মল চিত্তের প্রসার আছে, জগতকে ব্রহ্মাশ্রয়ী রূপে দেখিবার ভঙ্গি আছে, লোক-কল্যাণের আবেগানুভূতি আছে, রবীন্দ্রনাথ সেই সেই অংশই গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ বেদের ব্রহ্মবোধ ও লোককল্যাণই তাঁহার আদর্শ। আমরা যখন তাঁহাকে উপনিষৎ প্রভাবিত কবি বলি, তখন মনে রাখিতে হইবে তিনি বেদোপনিষদের কবি, বিজ্ঞানোপনিষদের কবি নহেন। বেদান্ত-প্রোক্ত চৈতন্য-সন্ধানে যে যে কৃচ্ছ্র সাধন সাধককে করিতে হয়, রবীন্দ্রনাথ কখনই সেগুলি মান্য করিবেন না। সহজভাবে তিনি বাঁচিতে চাহিবেন, মানুষের পৃথিবীকে

রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মবোধ

ভালোবাসিবেন, মানুষের মঙ্গল চাহিবেন, অন্যায় দেখিলে বেদের ঋষিদের মতই ক্রুদ্ধ হইবেন, নিখিলের সর্বত্র ব্রহ্ম দেখিবেন বিমল আনন্দে।

এই সমস্ত কারণে, পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি, মনীষী রাধাকৃষ্ণনের অভিমতকে আমি সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে করি নাই। আমি এ বিষয়ে একেবারে নিঃসন্দেহ যে, বেদব্রহ্মই রবীন্দ্রব্রহ্ম, বিজ্ঞানব্রহ্ম নন। মুহুর্মুহু তিনি উপনিষদের বয়ান তুলেন, ব্রহ্মানুভাবী বহু সঙ্গীত রচনা করেন—এই কারণে বাহ্যতঃ তাঁহাকে বিজ্ঞানব্রহ্মের উপাসক বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু এই মনে-হওয়ার মূলে সত্য নাই।

বেদান্তব্রহ্ম নয়, বেদব্রহ্মই রবীন্দ্রব্রহ্ম

রবীন্দ্রনাথ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম মানেন, অখণ্ডতত্ত্বে তিনি বিশ্বাসী, দেশ বা পৃথিবী হইতেও ব্রহ্ম তাঁহার নিকট অনেক বড়—কিন্তু মূল এই কথাটি আমাদের মনে রাখিতেই হইবে যে, বেদান্তবাদীদের ন্যায় ব্রহ্মদর্শনে মনের বাহিরে তিনি কখনও অগ্রসর হইতে চাহেন নাই। কিন্তু কথা উঠিতে পারে, মনের দ্বারাই ব্রহ্মকে পাওয়া যায় এমন কথা কি বেদান্তে পাওয়া যায় না? পাওয়া যায় না যে তাহা নয়। মনের দ্বারা ব্রহ্মকে অনুভব করার কথা শ্রুতিতে আছে বটে—মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্ [বৃঃ ৪।৪।১৯], কিন্তু মন তাহাকে সম্যক্‌ভাবে যে প্রকাশ করিতে পারে না এমন কথাও বলা আছে—যন্মনসা ন মনুতে [কেন : ১।৫]। আসল কথা, বৈদান্তিকদের মতে মনোবৃত্তির দ্বারা ব্রহ্মবিষয়ক যাহা কিছু অজ্ঞান তাহার নাশ হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্ম তাহাতে সম্যক্ প্রকাশিত হয় না। 'বেদান্তসারে' শ্রীমৎসদানন্দ যোগীন্দ্র বলিয়াছেন: বৃত্তিব্যাপ্যতাঙ্গীকারেণ ফলব্যাপ্যত্বপ্রতিষেধ-প্রতিপাদনাৎ। মনোবৃত্তি প্রতিফলিত চৈতন্য অর্থাৎ আভাস-চৈতন্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে অসমর্থ হয়—সুতরাং মনের দ্বারা দর্শন কর এবং মন দর্শন করিতে অসমর্থ—এই দুই পক্ষই যথার্থ। বৈদান্তিকদের মত এই, ব্রহ্মণ্যজ্ঞাননাশায় বৃত্তিব্যাপ্তির্ব্যপেক্ষিতা—ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান নাশের জন্য বৃত্তিগ্রাহ্যত্য স্বীকার করিতে হয়। [পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত বেদান্তসার, পৃ. ১৭৮-৭৯]

রবীন্দ্রনাথে এই বৃত্তিগ্রাহ্যতাই স্বীকৃত হইয়াছে। অন্তঃকরণবৃত্তি এবং তৎস্থ আভাস-চৈতন্য অর্থাৎ মনোবৃত্তি-প্রতিবিম্বিত চৈতন্য তাঁহার। স্বরূপ-চৈতন্যের প্রতীক্ষায় তাঁহার সাধনা—একথা সত্য হইলেও এই সাধনায় মনোবৃত্তির প্রভাব বেশি পরিমাণে থাকায় সাধন-চতুষ্টয়ের (শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সমাধি) শেষ অনুষ্ঠান অর্থাৎ ভাব ও সমাধি নির্বিকল্প রূপ গ্রহণ করে নাই, গ্রহণ করিয়াছে সবিকল্প রূপ। নির্বিকল্প সমাধির (বা ধ্যানের) যে চারি প্রকার বিঘ্নের কথা (লয়, বিক্ষেপ, কষায় ও রসাস্বাদ) শাস্ত্রে লিখিত আছে, রবীন্দ্রনাথ সেই চারিটি বিঘ্নের প্রথম দুইটি বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াছেন, কিন্তু রাগাদি বাসনায় অভিভূত হইয়া চিত্তবৃত্তির সবিকল্পক আনন্দ তিনি অনুভব করেন অর্থাৎ রসাস্বাদ তাঁহার

নিকট বিঘ্ন বলিয়াই গণ্য নহে। 'বেদান্তসারে' বলা হইয়াছে : নাস্বাদয়েদ্রসং তত্র নিঃসঙ্গ প্রজ্ঞয়া ভবেৎ। বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী ইহার টীকা করিয়াছেন এই : রসং সবিকল্পকানন্দং নাস্বাদয়েৎ। আনন্দমাত্রেণ কৃতার্থতাং ন মন্বীত। কিন্তু প্রজ্ঞয়া বিবেকাবুদ্ধ্যা নিঃসঙ্গ সবিকল্পানন্দে অনাসক্তো ভবেদিত্যর্থঃ। যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমাস্মৃতা।

বলা বাহুল্য, বৈদান্তিকদের এই সমস্ত অভিমত রবীন্দ্রনাথ কিছুতেই গ্রহণ করিবেন না। মনকে নির্বাতস্থ দীপের ন্যায় নিশ্চল করিতে তিনি কখনই চাহেন নাই। প্রজ্ঞার দ্বারা নিঃসঙ্গ হইতেও চাহিবেন না। তিনি বলিবেন, 'মানুষের মন চায় মানুষের মন' [কবিকাহিনী]; তিনি বলিবেন, 'মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই' [কড়ি ও কোমল]। রসাস্বাদকে তিনি জীবনানন্দ কহিবেন, এবং রসের মধ্যেই দেখিবেন ব্রহ্ম। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন যথার্থই বলিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথ 'মানসবেদের পূজারী'। [***Tagore Brithday Number***, p. 256] এই মানসবেদের অর্থাৎ অন্তঃকরণের ভাব-ভগবানের আশীর্বাদে বিচিত্র উপলব্ধি তাঁহার সম্ভব হইয়াছে। মনের দ্বারা ব্রহ্মবিভূতি দর্শন করা সম্ভব হইয়াছে। মনের ধর্ম হইতেছে প্রবৃত্তি। আবার মানসিক বিচারে প্রবৃত্তির সমুচ্চস্তর হইতেছে প্রেম। মনোব্রহ্ম তাই প্রেমস্বরূপ। এই প্রেমব্রহ্মের সর্বব্যাপী ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ আপন সত্তা হইতেই অনুভব করিয়াছেন। বৈদিক ঋষিদের মত অনুভব করিয়াছেন সূর্যে চন্দ্রে আকাশে বাতাসে তিনি আছেন, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে অখণ্ড সত্তায় মিলিত করিয়া প্রেমস্বরূপ তিনি আছেন। তিনি আসিবেন, তিনি কবিকে গ্রহণ করিবেন—এই আনন্দেই কবির ব্রহ্মোপাসনা :

ইনি মনোব্রহ্ম
—ইনি প্রেমস্বরূপ

'ওগো প্রেমিক, তুমি যে প্রেম কেড়ে নেবে না, তুমি যে মন ভুলিয়ে নেবে—একদিন সমস্ত মনে প্রাণে কাঁদিয়ে তার পরে তোমার প্রেমের ঋণ শোধ করাবে। তাই এত বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে—তাইতো সন্ধ্যা হয়ে আসে তবু আমার অভিসারের সজ্জা হলো না।

[সামঞ্জস্য, শান্তিনিকেতন-১ম খণ্ড]

চতুর্থ অধ্যায়
প্রেমধর্ম

"ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার যা কিছু প্রকাশ সে হচ্ছে পথ-চলতি পথিকের নোট বইয়ের টোকা কথার মত। নিজের গম্যস্থানে পৌঁছে যাঁরা কোনো কথা বলেছেন তাঁদের কথা একেবারে সুস্পষ্ট। তাঁরা নিজের কথাকে নিজের বাইরে ধরে রেখে দেখতে পান। আমি আমার তত্ত্বকে তেমন করে নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখিনি। সেই তত্ত্বটি গড়ে উঠতে উঠতে, বেড়ে চলতে চলতে নানা রচনায় নিজের যে সমস্ত চিহ্ন রেখে গেছে সেইগুলিই হচ্ছে তার পরিচয়ের উপকরণ।"

"পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ উপলব্ধিই ধর্মবোধ—যে প্রেমের একদিকে দ্বৈত আর একদিকে অদ্বৈত ; একদিকে বিচ্ছেদ আর একদিকে মিলন, একদিকে বন্ধন আর একদিকে মুক্তি।"

[আত্মপরিচয়, পৃ. ৪৩, ৭৮]

চতুর্থ অধ্যায়

প্রেমধর্ম

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রেরণা ও দর্শন-চেতনার মূল উৎস হইতেছে প্রেম। জ্ঞান ও কর্ম রবীন্দ্রদর্শনে উপেক্ষিত নহে, তবে প্রেমতত্ত্ব-সমুৎসারিত জ্ঞান ও কর্মই রবীন্দ্রনাথের বিচারে সত্য ও সার্থক। জ্ঞানের প্রকাশে সংশয়ের সমস্ত অন্ধকার দূরীভূত হয়, এ-কথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেন না।

'আমরা জেনেও জানিনে কখন? যখন আমাদের মধ্যে প্রেমের প্রকাশ হয় না', রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, 'একবার ভেবে দেখো না· এই পৃথিবীতে কত শত-সহস্র লোক আমাকে বেষ্টন করে আছে। তাদের যে জানিনে তা নয়, কিন্তু তারা আমার পক্ষে কিছুই নয়। সংসারে আমি এমন ভাবে চলি যেন এই অগণ্য লোক তাদের সুখদুঃখ নিয়ে নেই। তবে কারা আছে? যারা আমার আত্মীয় স্বজন, আমার প্রিয়ব্যক্তি, তারাই অগণ্য জীবকে ছাড়িয়ে আছে। এই কয়েকটি লোকই আমার সংসার। কেন না এদেরই আমি প্রেমের আলোতে দেখেছি। এদেরই আমি কমবেশি পরিমাণে আমার আত্মারই সমান করে দেখেছি। আমার আত্মা যে সত্য, আত্মপ্রেমে সেটা আমার কাছে একান্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেই প্রেম যাদের মধ্যে প্রসারিত হোতে পেরেছে তাদেরই আমি আত্মীয় বলে জানি। তাই তাদের সম্বন্ধে আমার কোনো সংশয় নেই, তারা আমার পক্ষে অনেকটা আমারই মতো সত্য।' [সংশয়, শান্তিনিকেতন-১ম খণ্ড]

আত্মপ্রেম

আত্মপ্রেমের মহিমায় আমি সত্য, আমার প্রেম যাহাতে বা যাহাদের মধ্যে প্রসারিত হইতে পারিয়াছে তাহারাও সত্য। আত্মপ্রেমের মহিমাতেই, সোজা কথায়, আত্মার কামনাতেই বিশ্বভুবন সত্য ও প্রিয় হয়। বিশ্বের জন্যই বিশ্ব প্রিয় নহে, আত্মপ্রেম যদি স্ফূর্তি পায় এই বিশ্বে, তবেই বিশ্ব হয় সত্য ও সার্থক।

আমারি চেতনার রঙে পান্না হোলো সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে,
জ্বলে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে।

গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর'
সুন্দর হোলো সে।
তুমি বলবে, এ যে তত্ত্বকথা,
এ কবির বাণী নয়।
আমি বলব, এ সত্য,
তাই এ কাব্য।
এ আমার অহংকার,
অহংকার সমস্ত মানুষের হয়ে।
মানুষের অহংকার-পটেই
বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প।
তত্ত্বজ্ঞানী জপ করছেন নিশ্বাসে প্রশ্বাসে
না, না, না—
না-পান্না, না-চুনি, না-আলো, না-গোলাপ
না-আমি, না-তুমি।
ও দিকে, অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করেছেন সাধনা
মানুষের সীমানায়,
তাকেই বলে 'আমি'। (আমি, শ্যামলী)

রবীন্দ্রনাথ বলেন, এই 'আমি' মিথ্যা নয়, কেন না আমিকে শ্রেয়ের পথে পরিচালিত করিয়াই মানুষ আত্মাকে প্রকাশ করে।

প্রাচীনকালে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীর নিকট এই আত্মপ্রেম-তত্ত্বটি বড় সুন্দর ভাষায় বুঝাইয়াছিলেন।

'—তুমি ভাবিতেছ মৈত্রেয়ী, যে, পতির জন্যই পতি বুঝি প্রিয় হয়, কিন্তু তাহা সত্য নহে। পতির কামনায় পতি প্রিয় হয় না, আত্মার কামনায় প্রিয় হয় পতি।'

ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি, আত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি, আত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি, আত্মনস্তু কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি।

[বৃহদারণ্যক, ২।৪।৫]

আত্মার কামনাতেই, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, আত্মপ্রেমেই, সর্বলোক প্রিয় হয় ক্রমশঃ। আত্মপ্রেম প্রসারিত হয় নাই যাহার মধ্যে বা যাহাদের মধ্যে, অর্থাৎ প্রেমের আলোকে

যাহাকে বা যাহাদের দেখি নাই, তাহারা যেন থাকিয়াও থাকে না। তাহারা আছে বটে, তাহারা সত্য বটে, কিন্তু তা' হইলে কি হয়, অন্ধের নিকট তাহাদের অস্তিত্ব কে প্রমাণ করিবে?

'ঈশ্বর যে আছেন এবং সর্বত্রই আছেন একথাটা যে আমার জানার অভাব আছে তা নয় কিন্তু আমি অহরহঃ সম্পূর্ণ এমন ভাবেই চলি যেন তিনি কোনোখানেই নেই। এর কারণ কী? তাঁর প্রতি আমার প্রেম জন্মে নি, সুতরাং তিনি থাকলেই বা কী আর না থাকলেই বা কী? তাঁর চেয়ে আমার নিজের ঘরের অতি তুচ্ছ বস্তুও আমার কাছে বেশি করে আছে। প্রেম নেই বলেই তাঁর দিকে আমাদের সমস্ত চোখ যায় না, আমাদের সমস্ত কান যায় না, আমাদের সমস্ত মন খোলে না। এই জন্যে যিনি সকলের চেয়ে আছেন তাঁকেই সকলের চেয়ে পাই নে, তাই এমন একটা অভাব জীবনে থেকে যায় যা আর কিছুতেই কোনোমতেই পোরাতে পারে না। ঈশ্বর থেকেও থাকেন না এত বড়ো প্রকাণ্ড না থাকা আমাদের পক্ষে আর কী আছে! এই না থাকার ভারে আমরা প্রতি মুহূর্তেই মরছি। এই না থাকার মানে আর কিছুই না, আমাদের প্রেমের অভাব। এই না থাকারই শুষ্কতায় জগতের লাবণ্য মারা গেল, জীবনের সমস্ত সৌন্দর্য নষ্ট হোলো। যিনি আছেন তিনি নেই এত বড়ো ক্ষতি কী দিয়ে পূরণ হবে। কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। দিনে রাত্রে এইজন্যেই যে গেলুম। সব জানি, সব বুঝি, কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ।' [সংশয়, শান্তিনিকেতন-১ম খণ্ড]

উচ্ছ্বাস ও আবেগভরে কবি যাহা বলিতে চাহিতেছেন, তাহার মূল কথা এই: শুধুমাত্র জ্ঞানে কিছুই হইবে না, প্রেম চাই। পাশ্চাত্যের একাধিক মনীষীও এই সত্যে এখন বিশ্বাসী হইতেছেন। জড়বিজ্ঞানের খণ্ড-জ্ঞান ও তর্কবুদ্ধি দ্বারা আজ পর্যন্ত ইয়োরোপ যাহাই লাভ করুক না কেন, 'সত্যের অনন্ত সাগর' এখনও তাহার জ্ঞানের বাহিরেই রহিয়া গেছে। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক Sir James Jeans এর ***Physics and Philosophy*** নামক গ্রন্থের উপসংহারটুকুর দিকে দৃষ্টি দিলেই বুঝা যায় জড়বিজ্ঞানের দ্বারা ইয়োরোপ আজ পর্যন্ত কী পাইয়াছে:

> Physics and Philosophy are at most a few thousand years old but probably have lives of thousands of millions of years stretching away in front of them. They are only just beginning to get under way and we are still, in Newton's words, like children playing with pebbles on the sea-shore while the great ocean of truth rolls unexplored beyond our reach.

সত্যের অনন্ত মহাসাগর কোন এক অজানা রাজ্যের অন্তর্লোকেই এখনও প্রবাহিত হইতেছে। সান্ত বুদ্ধি ও জড়জগতের বিজ্ঞান দ্বারা কে ধারণ করিবে অনন্তের পূর্ণত্ব? পাশ্চাত্য দেশের বহু মনীষীকে তাই জ্ঞানের ধাঁধায় পড়িয়া দিশাহারা হইতেই দেখিতেছি। অনেক জানিয়াও, অনেক সৃষ্টি করিয়াও, অনেক ঐশ্বর্য বাড়াইয়াও মানুষ মর্মে মর্মে হইয়া আছে দীন, দরিদ্র, শুষ্ক, রুক্ষ। বিশ্বকল্যাণের সর্বজনীন আনন্দ পরিবেশনের পরিবর্তে মানুষ নিক্ষেপ করিতেছে ভি-টু, এ্যাটম্ বোম্, বিশ্বমারণযজ্ঞের ঋত্বিকরূপে আবির্ভূত হইতেছে লোকশিক্ষক বৈজ্ঞানিকের দল। কেন এমন হইতেছে? রবীন্দ্রনাথ বলিবেন, প্রেমের অভাবেই এমনতর হইতেছে। এই অভাবের শুষ্কতায় জগতের লাবণ্য মারা গেল, জীবনের সমস্ত সৌন্দর্য হইল নষ্ট। এ সকল কথা যে বুঝি না, তাহা নহে। 'সব জানি সব বুঝি, কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ'।

প্রেমের অভাবে সকলি ব্যর্থ। অর্থাৎ এই জীবন তখন অন্তঃসারশূন্য। তখন না বুঝি মানুষের আত্মমহিমা, না জানি জগতের কল্যাণধর্ম, না দেখি প্রকৃতির আনন্দরূপ, না ভাবি ঈশ্বরের অপার করুণা।

রবীন্দ্রদর্শনে, এইজন্য, প্রেমই তত্ত্বের তত্ত্ব। ইহার বড় তত্ত্ব আর নাই।

রবীন্দ্রদর্শনে প্রেমই ব্রহ্ম

মানবের মনোদর্শনে প্রেমই সত্য, প্রেমই শিব, প্রেমই সুন্দর। অর্থাৎ ইহাই ঈশ্বর। রবীন্দ্রনাথের ইহাই ব্রহ্ম।

ব্রহ্ম সম্বন্ধে পূর্ব অধ্যায়ে কিছু আলোচনা করিয়াছি। এই স্থলে আরও কিছু আলোচনা আবশ্যক।

প্রাচীন শাস্ত্রে, বলাই বাহুল্য, ব্রহ্ম লইয়া বিস্তর আলোচনা হইয়াছে। বেদান্তশাস্ত্রে ব্রহ্মজিজ্ঞাসাই প্রধান জিজ্ঞাসা। বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম সর্বত্র আছেন। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। [ছান্দোগ্য, ৩।১৪।১,] সম্মুখে ব্রহ্ম, পশ্চাতে ব্রহ্ম, দক্ষিণে ব্রহ্ম, অধে ব্রহ্ম, উর্ধ্বে ব্রহ্ম—বিশ্বের সর্বত্র সেই ব্রহ্ম।

পুরস্তাদ্ ব্রহ্ম, পশ্চাদ ব্রহ্ম, দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ অধশ্চোর্ধ্বং চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্। [মুণ্ডক, ২।২।১১]

আবার অন্যত্র—

ব্রহ্ম প্রসঙ্গে আরও আলোচনা

স এব অধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ
স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্বম্। [ছান্দোগ্য ৭।২৫।১]
অধে তিনি, উর্ধ্বে তিনি, পশ্চাতে সম্মুখে
তিনি, দক্ষিণে উত্তরে তিনি, সর্বময় তিনি বিশ্বময়॥

কিন্তু এই যে তিনি বা ইনি, মন দ্বারা ইঁহার আভাসমাত্র পাইতে পারি, কিন্তু পূর্ণভাবে ইঁহাকে চিন্তা করা শুধু দুঃসাধ্য নহে, অসাধ্যই বটে। ইনি শব্দহীন, স্পর্শহীন, রূপহীন অব্যয়বস্তু, ইনি রসহীন, গন্ধহীন নিত্য বস্তু।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ। [কঠ, ৩।১৫]

জানা বা অজানার কোন্ শ্রেণীতে রাখিব এই ব্রহ্ম? কোনো শ্রেণীতেই যে ইহাকে রাখার চিন্তা করা যায় না।

অন্যদেব তদ্‌বিদিতাদথো অবিদিতাদধি। [কেন ১।৩]

ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে তত্ত্বোপদেশ প্রদানকালে তাই বলিতেছেন :

তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি, অস্থূলম্,অনণু
অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম আলোহিতম্ অস্নেহম্ অচ্ছায়ম্
অতমঃ অবায়ু অনাকাশম্ অসঙ্গম্ অরসম্ অগন্ধম্
অচক্ষুষ্কম্ অশ্রোত্রম্ অবাক্ অমনো অতেজস্কম্ অপ্রাণম্
অমুখম্ অমাত্রম্ অনন্তরম্ অবাহ্যম্।
[বৃহদারণ্যক, ৩।৮।৮]

শোনো গার্গি, ব্রহ্মের বর্ণনা ব্রহ্মজ্ঞের। নহে স্থূল,
নহে অণু, নহে হ্রস্ব, নহে দীর্ঘ, নহে সে লোহিত
নহে প্রেম, নহে ছায়া, নহে তমঃ, বায়ু বা আকাশ।
সঙ্গ নহে, রস নহে, গন্ধ নহে, নহে মন, প্রাণ।
চক্ষু নহে, কর্ণ নহে, বাক্য নহে, নহে বহ্নিতেজ
মুখ নহে, মাত্রা নহে, নহে ব্রহ্ম অন্তঃ বা বাহিরে॥

ধারণাতীত এই ব্রহ্ম। অবাঙ্‌মনসগোচর এই ব্রহ্মতত্ত্ব। অথচ এই ব্রহ্মজ্ঞানই পুরুষার্থ, মুমুক্ষু পুরুষের একমাত্র লক্ষ্য স্বরূপ। শাঙ্করভাষ্যে স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে : ব্রহ্মাবগতির্হি পুরুষার্থঃ। কিন্তু ব্রহ্মকে জ্ঞানগম্য করা যায় কি প্রকারে? যাজ্ঞবল্ক্যের 'নেতি নেতি' এই 'আদেশ'-প্রভাবে মন এইটুকু মাত্র ধারণা করিতে পারে যে, ব্রহ্ম ধ্যানের, জ্ঞানের বাহিরে এবং তিনি নিরতিশয় মহান্, তাঁহাপেক্ষা বৃহৎ বা ব্যাপক আর কিছুই নাই। ফলতঃ, ব্রহ্মশব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ তাহাই। বেদান্তবাগীশ মহাশয়-কৃত 'ভামতী টীকান্বিত শাঙ্করভাষ্যের' অনুবাদ গ্রন্থে বলা হইয়াছে : 'ব্রহ্মশব্দস্য হি ব্যুৎপাদ্যমানস্য নিত্যশুদ্ধত্বাদয়োঽর্থাঃ প্রতীয়ন্তে। বৃহতের্ধাতোরর্থানুগমাৎ'। অর্থাৎ ব্রহ্ম শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুসন্ধান করিলেই ঐরূপ অর্থ প্রতীত হয়। যথা বৃহ্ + মন্ = ব্রহ্ম। 'বৃহ্' ধাতুর অর্থ বৃদ্ধি—যাহার অন্য নাম বড় বা মহত্ত্ব। 'মন্' প্রত্যয়ের অর্থ নিরতিশয় অর্থাৎ অবধিরাহিত্য। যিনি নিরতিশয় মহান্—যাঁহা অপেক্ষা বৃহৎ ('বড়') ব্যাপক বা উৎকৃষ্ট আর কিছু নাই তিনিই ব্রহ্ম। [বেদান্তবাগীশ-কৃত বেদান্তদর্শনম্, পৃ. ৪৯।৫০]

এই ব্রহ্ম হইতেছেন বিভু—তিনি সর্বদেশ-যুক্ত, অর্থাৎ তিনি সর্বব্যাপী। 'নিত্যং বিভুং সর্বগতং সুসূক্ষ্মম্'। [মুণ্ডক। ১।১।৬] তিনি 'অন্নে' আছেন, 'প্রাণে' আছেন, আছেন 'মনে', 'বিজ্ঞানে', 'আনন্দে'। অন্নময় জগতে থাকিয়া ক্ষুৎ-পিপাসা মিটাইয়াই যাহারা তুষ্ট, তাহারাও ব্রহ্মকে পায়,—পায় অন্নরূপ ব্রহ্মকে। প্রাণময় জগতের চাঞ্চল্যে, উদ্বেগে, বিরোধে, বীরত্বে যৌবন অনুভব করেন যাঁহারা, ব্রহ্ম তাঁহাদেরও জীবনে আবির্ভূত হন,—আবির্ভূত হন প্রাণময় ক্রিয়াশক্তিমান্ কার্যরূপে। মনোময় জগতের সাত্ত্বিক জীবনধ্যানে যাঁহারা আনন্দ-চঞ্চল, জগ-জীবনের সর্ববিধ কামনাবাসনাকেই ক্রমশঃ বিশুদ্ধ করিবার অধীর সাধনায় যাঁহারা নিত্য তৎপর, ব্রহ্ম আবির্ভূত হন তাঁহাদেরও জীবনসাধনায়, আবির্ভূত হন মনোময় ইচ্ছাশক্তিমান্ করণরূপে। অবাঙ্মনসগোচর তত্ত্বজ্ঞানের সাধনায় সিদ্ধপুরুষ যাঁহারা, চিত্তবৃত্তিনিরোধ করিয়া অধ্যাত্মবিজ্ঞানের পূর্ণত্ব লাভ করিয়াছেন যাঁহারা,—বিজ্ঞানময় জ্ঞানশক্তিমান্ কর্তৃরূপ তাঁহাদের। তাঁহাদের ব্রহ্মভাবে শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, রূপ নাই, ব্যয় নাই। তাঁহাদের ব্রহ্ম-ই, 'কঠে'র ভাষায়, 'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্'। কিন্তু ব্রহ্মানুভাবে কিছু কিছু জ্ঞানকর্তৃভাব সাধকে থাকিয়া যায় বলিয়া শ্রুতিতে ইহারও উপরে আর এক স্তর কল্পিত হইয়াছে। তাহা আনন্দময় স্তর। এই স্তরে উন্নীত হইলেই নির্বেদ আনন্দ, পরমামুক্তি। অর্থাৎ তখন ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মই হইয়া যান।

'পঞ্চস্তর' প্রসঙ্গে

বলা হইল, সাধক আপন আপন রুচি, শক্তি, সংস্কার ও অধিকার অনুসারে ব্রহ্ম পায় বা হয়। বুঝাইবার জন্য সাধক জীবনকে পাঁচটি পৃথক স্তরে বা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। আসল কথা সর্বত্রই ব্রহ্ম আছেন। মানুষ শক্তি অনুসারে তাঁহাকে যেভাবে গ্রহণ করে বা করিতে চায়, সেই ভাবে পায় বা হইতে থাকে। কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, অন্নময় স্তরে যাহারা আছে, তাহাদের প্রাণ নাই, মন নাই, জ্ঞান নাই বা আনন্দ নাই। অথবা যাহারা প্রাণময় স্তরে আছে, তাহারা প্রাণ লইয়াই কেবল ব্যস্ত, মন, জ্ঞান বা আনন্দের বালাই নাহি তাহাদের, কিংবা অন্নেও নাই তাহাদের প্রয়োজন। পণ্ডিত পাঠকগণ নিশ্চই জানেন, আমি সাধারণ পাঠককে বুঝাইবার জন্যই বলিতেছি, অন্নময় স্তরে যাহারা আছে, স্থূলভাবে অন্যতর চারিটি স্তরের আলোও তাহাদের মধ্যে ঈষৎভাবে প্রভাসিত হয়। অন্নের বিকারেব মধ্যেও স্থূলভাবে প্রাণের চাঞ্চল্য, মনের সামান্য পুলক, জ্ঞানের অস্ফুট বিকাশ, আনন্দের ঈষৎ স্পর্শ আছেই আছে। এইভাবে প্রাণের ক্রিয়াশক্তিতেও আছে মনের আস্বাদন, জ্ঞানের প্রসাদ, আনন্দের আশীর্বাদ। মন যে ব্রহ্ম অনুভব করে, তাহারও মধ্যে, বলাই বাহুল্য, আছে জ্ঞান ও আনন্দের পুলকতরঙ্গ। তবে এই জ্ঞান বা আনন্দ 'তুরীয় জ্ঞান' বা 'আনন্দ' নহে, অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি-নিরোধের পরবর্তী অবস্থার বিজ্ঞানানন্দ নহে। এই জ্ঞান বা আনন্দ শব্দ হইতে, রূপরস গন্ধস্পর্শ হইতে আসে, কেননা ইহা মনোগত আত্মানন্দ, ইহা অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়ের নির্বেদ বিজ্ঞানানন্দ নহে।

রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মবাদ এইবার স্পষ্ট হইবে। পাঠক বুঝিয়াছেন প্রাণগত ব্রহ্মজ্ঞানে তর্ক, যুক্তি, চাঞ্চল্য, পাণ্ডিত্যাভিমান, মনোগত ব্রহ্মজ্ঞানে পাওয়া না পাওয়ার ভাব, সাত্ত্বিকতার বাসনা, শান্তির জন্য গতি, স্থৈর্য ও ধৈর্যের সাধনা. বিজ্ঞানগত ব্রহ্মজ্ঞানে চিত্তবৃত্তিনিরোধ, অবাঙ্‌মনসগোচর তত্ত্বের আনন্দ, আনন্দগত ব্রহ্মজ্ঞানে ব্রহ্মভাব, ব্রহ্মতে ব্রহ্ম হওয়ায় পরমামুক্তি।

রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্ম রূপবিহীন ব্রহ্ম নহেন। ইঁহার প্রেমরূপ। ইনি প্রেমব্রহ্ম, প্রেমগত ব্রহ্ম। প্রেম চিত্তসাধনার সর্বোচ্চ প্রবৃত্তি। প্রেম যে নিবৃত্তিকে জানে না, তাহা বলি না।

রবীন্দ্রনাথের প্রেমগত ব্রহ্ম

চিত্তের নিম্নগত প্রবৃত্তির প্রতি ইহার নিবৃত্তি কিন্তু উচ্চতর প্রবৃত্তি, অর্থাৎ বিশুদ্ধা বাসনাতে ইহার নিবৃত্তি নাই। বাসনার বাহিরে, প্রবৃত্তির বাহিরে, আস্বাদনের অতীতে প্রেম কল্পনীয় নহে। তর্কের জন্য যদি বলাও যায় যে, প্রেম মনেও আছে মনের বাহিরেও আছে, তবে সেই মনের বাহিরের প্রেম শ্রুতি-প্রোক্ত 'চতুর্থের' ন্যায় ধারণাতীত হইবে, অবাঙ্‌মনসগোচর হইবে। নামের দ্বারা, রূপের দ্বারা তখন তাহার আর নাগাল পাওয়া যাইবে না, তখন তাই তাহা আর প্রেমই নহে, আস্বাদ্য বস্তুই নহে, তখন তাহা সেই 'অশব্দমস্পর্শম-রূপমব্যয়ম্' ছাড়া আর কী!

প্রেমের লীলাভূমি মানুষের এই মন: বাসনার এই অনন্ত জগৎ, রসাস্বাদনের এই আনন্দ-দিব্য স্বর্গধাম। মন ছাড়িয়া প্রেমের লীলা অসম্ভব। এমন যে প্রেম, সুধী পাঠক অবশ্যই জানেন যে, ইহাই এবং ইহাতেই অধিষ্ঠিত, রবীন্দ্রব্রহ্ম। এইজন্য ইহার বহুরূপ, বহু বৈচিত্র্য। আবার রূপে রূপে ইহার একরূপ, এই প্রেমরূপ।

এই প্রেম শুদ্ধমাত্র কথার কথা নহে, শুদ্ধমাত্র কবিকল্পনা নহে। ইহা বাস্তব সত্য। ইহা অন্নে আছে, প্রাণে আছে, মনের সকল স্তরেই আছে। কিন্তু বিজ্ঞানে কি আছে? বিজ্ঞান চিত্তবৃত্তিনিরোধের পরের অবস্থা, বিজ্ঞান-স্তরে প্রেম কল্পনীয় নহে। বিজ্ঞান-স্তরের ব্রহ্মে, পূর্বেই তো বলিয়াছি, রূপ নাই, রস নাই, মন নাই। তাহা দর্শনের বাহিরে, ব্যবহারের বাহিরে, গ্রহণের বাহির, লক্ষণের বাহিরে—মোটকথা, তাহা অনুভবের অতীত, অর্থাৎ চিন্তার অতীত, নির্দেশের অতীত।

অদৃষ্টমব্যবহার্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যম্। [মাণ্ডূক্য, ৭]

বৈষ্ণবগণ, অর্থাৎ উচ্চস্তরের তাত্ত্বিক বৈষ্ণবসাধকগণ, ব্রহ্মতত্ত্বের এই নেতিবাচক অদ্বৈত সংজ্ঞা স্বীকার করিয়া আস্বাদনের অতীত অবস্থাকে কখনই সমর্থন করেন না। কিন্তু প্রেমেই কি তাঁহারা থামিতে পারিয়াছেন? প্রেমও যে তত্ত্বের আভাস মাত্র, সেই 'ভাব' ও 'মহাভাব'-সাধনায় তাঁহারা কি বিশ্বাসী নহেন? 'ভাব' বা 'মহাভাব' আস্বাদ্য বস্তু হইতে পারে, কিন্তু এই 'ভাব' বা 'মহাভাব'কে মন দিয়া বা মানবিক

প্রেমের সংস্কার দিয়া পূর্ণভাবে আস্বাদন করিতে যাওয়া কি বিড়ম্বনা মাত্র নহে? বৈষ্ণব পদকর্তাদের পদাবলীতে যে-আনন্দলীলার সৌন্দর্য দেখা যায়, তাহাতে মানবিক মনোবাসনার প্রশ্রয় যে নাই, তাহা বলি না। 'আড় নয়নে ঈষৎ হাসিয়া আকুল করিল মোরে,' কিংবা 'প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর', অথবা 'নামপরতাপে যার ঐছন করিল গো, অঙ্গের পরশে কিবা হয়,' অথবা আরও সুন্দর, 'চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরাণ সহিতে মোর' প্রভৃতি অতুলনীয় অমর পংক্তিগুলি যে প্রেমভাবের কোনো মানসবহির্ভূত ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ করিতেছে, তাহা বলিব না। কিন্তু বৈষ্ণবগণের তত্ত্ব-দর্শনের স্বরূপ শুদ্ধমাত্র এই পংক্তিগুলিতে অথবা এই জাতীয় আরও পংক্তিতেই তো নিহিত নাই। পাঠক যদি কেবল মাত্র শিল্প হিসাবেই এই পংক্তিগুলি গ্রহণ করিতে চাহেন, আর অগ্রসর হইতে না চাহেন, তবে ইহাদের মধ্যে মানবিক প্রেমাবেগের আনন্দ-সৌন্দর্য আস্বাদন করিয়াই তৃপ্ত হইবেন; কেহবা আবার ইহাদের মধ্যে লালসানন্দের প্রচ্ছন্ন প্রকাশ দেখিয়া আত্মগত ভাবে পুলকিতই হইয়া উঠিবেন। কিন্তু বৈষ্ণবদিগের পদাবলীতে যে মনোভাবের প্রকাশ আছে, শিল্পবিচারে তাহার অনন্ত সার্থকতা থাকিলেও সাধকদের নিকট তাহা ঐ 'ভাব' বা 'মহাভাব'-তত্ত্বের পূর্ণপ্রকাশ নহে, তাহা পূর্বাভাস বা সূচনা মাত্র। সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য, মধুর ও শান্তরস আস্বাদনে মন যে অক্ষম তাহা বলি না, কিন্তু এই সমস্ত মানসিক রসানুভূতির পথ বাহিয়া সাধক যখন 'নিত্য বৃন্দাবনের' আনন্দভবনে অভিযাত্রা করেন, তখন তাঁহার লক্ষ্য আর এই 'মন' নহে, 'মনের সমাধি', 'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা' নহে, 'কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা'। মানসিক ভাবানন্দের সাহায্যে এই 'মন-সমাধির' আনন্দ অথবা 'কৃষ্ণেন্দ্রিয়ের' প্রেমবিলাস আস্বাদন করা কোনোমতেই সম্ভব নহে। এই 'মন-সমাধির' আনন্দকে যদি আস্বাদ্যও বলিতে হয়, তবু ইহা পার্থিব মনোজগতের আস্বাদনের যে বহুদূরে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পদাবলী পাঠ করিয়া যদি তত্ত্বের দিকে পাঠক যাইতে চাহেন, অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়ের রসানুভূতি হইতে আভাস পাইয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়ের রসানন্দে অগ্রসর হইতে চাহেন, তবে এইভাবেই তাঁহাকে বিচার করিতে হইবে। কিন্তু পদাবলী পড়িয়া, কাব্যরসে আনন্দ পাইয়া আপন মনোজগতকে 'দ্বিগুণ সুন্দর' করিবার আবেশে পাঠক যদি তৃপ্তি পান, তা' হইলেও ক্ষতি নাই, কেননা তাহাও কম লাভের বিষয় নহে। কিন্তু বৈষ্ণবপদাবলীই বৈষ্ণবসাধকবর্গের বিশুদ্ধ তত্ত্বের ধারক ও বাহক মনে করিলে ভুল হইবে। পদগুলিকে তত্ত্বের আভাস বলিতে পারি, কিন্তু সেগুলি পূর্ণাঙ্গসুন্দর তত্ত্ব নহে। যে সমস্ত শিল্প-সৌন্দর্যবিশিষ্ট পদ কাব্য হিসাবে আজও বাঁচিয়া আছে, মন দ্বারা সেগুলি অবশ্যই আস্বাদন করি, কিন্তু তত্ত্ব-সাধক এই আস্বাদনটুকু লইয়াই সন্তুষ্ট নহেন। 'পদে' তাঁহারা 'তত্ত্ব' আরোপ করিয়া রসের জৈবতা ও মানসিকতা, অর্থাৎ সবিশেষত্ব অতিক্রম

বৈষ্ণব দর্শনের 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা'

এবং পদাবলীর 'প্রেম'

করিয়া যান। বৈষ্ণবদের ‘পদ’ আছে রসে, সবিশেষ আনন্দে, অর্থাৎ মনের গোচরে; ‘তত্ত্ব’ আছে রসে, তবে তা’ নির্বিশেষ আনন্দ—মনের তাহা অগোচরের আনন্দবস্তু। এই অগোচরের আনন্দ বৈষ্ণবগণ যখনি ছন্দে ধরিতে গেছেন, তখনই তাঁহারা, লক্ষ্য করিলেই দেখিবেন, বুদ্ধিগ্রাহ্য বা মনোগ্রাহ্য ভাষা করিয়াছেন পরিহার। এই কারণে আমি ‘পদের প্রেম’ ও ‘তত্ত্বের প্রেমকে’ এক বস্তু বলিয়া মনে করি নাই। যে মন দ্বারা পদাবলীর প্রেম আস্বাদন করি, বৈষ্ণবদিগের তত্ত্ব-প্রেম ঠিক সেই মনেরই আস্বাদ্য বস্তু নহে।

রবীন্দ্রনাথের প্রেমতত্ত্ব নির্বিশেষ তত্ত্ব নহে, তাহা সবিশেষ আনন্দ-তত্ত্ব, তাহা মনেরি তত্ত্ব—বৈষ্ণবদের মত তাঁহার তত্ত্বে কোনো ধারণাতীত ‘মিস্‌টিক’ ভাবানন্দের প্রশ্রয় নাই। মনকে প্রেমে সুন্দর করিয়া ‘পৃথিবীর’ পথে নামিবার তত্ত্ব তিনি জানেন; বৈষ্ণবগণ মনকে রসে আপ্লুত করিয়া ‘বৃন্দাবনের’ পথে অভিযাত্রার তত্ত্ব মানেন। ভাব-দর্শনের দিক হইতে বৈষ্ণবদের প্রেমতত্ত্ব রবীন্দ্র-তত্ত্ব হইতে অনেক উচ্চস্তরের সন্দেহ নাই, কিন্তু ব্যবহারিক জগতে রবীন্দ্র-প্রেমতত্ত্বই অধিকতর কার্যকরী। রবীন্দ্রনাথ এই তত্ত্ব ও প্রেমকল্পনায় বেদোপনিষদ ও বৈষ্ণবপদাবলীর নিকট ঋণী বটেন, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, বিজ্ঞানোপনিষদের নিকট রবীন্দ্রনাথ যেমন কিছুই গ্রহণ করেন নাই, বৈষ্ণবদের উচ্চতম ভাবদর্শনের বৃন্দাবন-তত্ত্ব হইতেও কিছু গ্রহণ করেন নাই।

এইটুকু বুঝিলে রবীন্দ্রনাথের প্রেমতত্ত্বের স্বরূপ কতকটা হৃদয়ঙ্গম হইবে। অস্বীকার করিলে চলিবে না যে, রবীন্দ্রনাথ মানুষের কবি, মানুষের দার্শনিক। ব্যবহারিক জগৎ সত্যশিবসুন্দরে উদ্‌বুদ্ধ হইলেই রবীন্দ্র-প্রেমসাধনার সিদ্ধিলাভ। ইহার পরের কথা রবীন্দ্রনাথের জন্য নহে। বৃহদারণ্যকের ‘বিজ্ঞানমানন্দম্‌’ (৩৯।২৮), অথবা ‘অথাত আদেশ নেতি নেতি’ (২।৩।৭), কিংবা চৈতন্যচরিতামৃতের ‘প্রেমের পরম সার মহাভাব’-তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের দর্শনালোচনায় প্রযোজ্য নহে। এই তত্ত্বটুকু অনুধাবন করিলেই রবীন্দ্রদর্শন-মানসের স্বরূপও সূর্যের আলোর ন্যায় স্পষ্ট হইয়া যাইবে।

বিজ্ঞানমানন্দম্‌ অথবা মহাভাব-তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের নহে

অবশ্য কোনো কোনো তাত্ত্বিক সমালোচক আমার এই মতবাদ কানে না-ও তুলিতে পারেন। আমি জানি, একাধিক সমালোচক রবীন্দ্রনাথকে প্রাচীন ঋষি ও তাত্ত্বিকদের সমসারে বসাইয়া গতানুগতিকভাবে তাঁহার দর্শনতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন এবং যোগীর ব্রহ্মতত্ত্বের সহিত কবির ব্রহ্মতত্ত্বের সাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়া আনন্দিত হইয়াছেন। অনেকে মনোব্রহ্মের ইতিবাচক গুণাবলীর সম্যক্ স্ফূর্তি ও বিকাশই বেদান্তের চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করিয়াছেন, অনেকে আবার বিজ্ঞানব্রহ্মের নেতি-তত্ত্বকে প্রথমে অস্বীকার করিয়া পরে বোধগম্য করিবার উদ্দেশ্যে ইতি-তত্ত্বের সংজ্ঞা দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়া বিজ্ঞানব্রহ্মের চরম তত্ত্বকে

বস্তুবোধের মধ্যে নামাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় এই সকল তাত্ত্বিকও ধারণাতীত তত্ত্ব-বস্তুকে স্বীকার করেন না বলিয়া বেদান্তের ধারণাতীত 'নেতি আদেশের' বুদ্ধিগত সাধারণ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ব্যাখ্যা তাঁহাদের ভালোই হইয়াছে—বিজ্ঞান-তত্ত্ব তাহাতে মনোগত তত্ত্ব হইয়া যুগোপযোগী, ধারণোপযোগী হইয়াছে, কিন্তু একথা স্বীকার না করিলেই নয় যে, মনোগত তত্ত্বই বেদান্তের চরম আদর্শ নহে। স্বয়ং কবি একথা স্পষ্টভাবে কোথাও স্বীকার করেন নাই, তবে মনোগত তত্ত্বের অতীতে তাঁহার অধিকার নাই একথা স্বীকার করিতে দ্বিধা করেন নাই। বস্তুতঃ, রবীন্দ্রনাথের আনন্দবাদ বা ব্রহ্মবাদকে 'বিজ্ঞানমানন্দম্' মনে করার কোনো যুক্তি বা হেতু আমি কিন্তু খুঁজিয়া পাই নাই। রবীন্দ্রনাথকে অনেকে যে বৈদান্তিক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, একথা 'ব্রহ্ম' নামক অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি। সমালোচকগণ 'বৈদান্তিক' বলিতে শুদ্ধমাত্র রূপময় সগুণ ঈশ্বরোপাসককেই যদি বুঝিয়া থাকেন, তবে রবীন্দ্রনাথকে বৈদান্তিক বলা যে অন্যায় হইবে, তাহা বলি না। কিন্তু বেদান্ত কি শুদ্ধমাত্র সগুণ ঈশ্বরের কথা কহিয়াছেন? ঈশ্বর-তত্ত্বের আরো ঊর্ধ্বে যে ব্রহ্মতত্ত্ব, দর্শনবিচারে তাহাই সকল বিরোধের সমন্বয়, সকল ইতি-নেতির চরম সঙ্গতি—তাহাই অদ্বিতীয় এক-তত্ত্ব। সগুণ ঈশ্বর বা পরিণামী নিত্য, এই অপরিণামী অদ্বয়-তত্ত্ব অপেক্ষা অনেক নিম্নস্তরের তত্ত্ব। বেদান্তে ইহা প্রাণতত্ত্ব। এই প্রাণতত্ত্বেই বিরোধ আছে, পরিণাম আছে, ইতি-নেতির ভাব আছে, বিরোধ কাটাইয়া উঠিবার রাজসিকতা আছে, নূতন বিরোধের সম্মুখীন হইয়া নব নব সৃষ্টির আবেগে অগ্রসর হইবার শক্তি আছে। ধারণার দ্বারা, মননের দ্বারা এই প্রাণতত্ত্বকে অবশ্যই ধরা যায়, ধারণার কালে কখনও কখনও দ্বৈতবোধের প্রভাবেও পড়িতে হয়, কিন্তু সকল প্রকার ধী ও ধারণার, মন ও মননবৃত্তির অতীতে যে ব্রহ্মতত্ত্ব যাজ্ঞবল্ক্য তাহাকে 'নেতি আদেশ' দ্বারা বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। 'প্রাণতত্ত্বের' সাধনায় 'নেতি নেতি আদেশ' নয়, 'ব্রহ্মতত্ত্বের' সাধনাতেই নেতি আদেশ প্রযোজ্য। নেতি আদেশ কেন? মনের সংস্কার দ্বারা আর তাঁহাকে—সেই পূর্ণব্রহ্ম পারমার্থিক সৎ-কে ধরা যায় না। এইজন্য বলা হইয়াছে, মন বা মনন দ্বারা যাহা বুঝিতেছ, তাহা নয়, তাহা নয়।

রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মতত্ত্বে, বলাই বাহুল্য, নেতি আদেশের কোনোই প্রভাব নাই। ধারণাতীত ব্রহ্মতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথের সমর্থনও নাই। মনীষী রাধাকৃষ্ণনের কথা সমর্থন করিয়াই বলি: রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর একটি 'Concrete Spirit'ই বটে। কিন্তু বেদান্ত ব্রহ্ম কি Concrete Spirit?

রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর একটি 'Concrete Spirit'

রাধাকৃষ্ণন বলিতেছেন:

"The Vedantic Absolute as much as Rabindranath's God is a Concrete Spirit." [*The Philosophy of Rabindranath*, p 46,]

এস্থলে কি বুঝিতে হইবে যে, রাধাকৃষ্ণন 'বেদান্তব্রহ্ম' বলিতে বেদান্তপ্রোক্ত সগুণ ঈশ্বরের কথাই বলিতেছেন? সগুণ ঈশ্বরকে Concrete Spirit বলিতে পারি, কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্ম বা ওই 'বিজ্ঞানমানন্দম্' কি Concrete Spirit? রূপব্রহ্ম ও বিজ্ঞানব্রহ্ম কি এক তত্ত্ব?

রাধাকৃষ্ণন এই তত্ত্বের আলোচনা ইচ্ছা করিয়াই এড়াইয়া গেছেন।

বেদান্তে সগুণ ঈশ্বরের কথা আছে, নির্গুণ ব্রহ্মের কথাও আছে। ঈশ্বর ও ব্রহ্ম এক তত্ত্ব নহে। অধিকারভেদে কাহারও নিকট ঈশ্বর প্রতিভাত হন, কাহারও নিকট ব্রহ্ম হন প্রতিভাত। ধারণার দ্বারা ঈশ্বরের মহিমা অবশ্যই ধরা যাইতে পারে, কিন্তু মনের অতীত না হওয়া পর্যন্ত ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি অসম্ভব। ঈশ্বরকে মনোগত করিয়া অর্থাৎ মনকে শুদ্ধবুদ্ধসুন্দর করিয়া, ক্রমশঃ চিত্তবৃত্তিগুলি নিরোধ করিয়া বিজ্ঞানভূমিতে উত্তীর্ণ হইলে পর ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার সম্ভব। এই ব্রহ্মের সাক্ষাৎ হইলে মন বিজ্ঞানানন্দে লীন হয়, তখন জগৎ বা প্রকৃতি বা মানবিক বাসনাপ্রকৃতি কিছুই থাকে না। এই যে তত্ত্ব, বেদান্তে ইহার কথাও তো আছে। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতিটি বাণী এই তত্ত্বেরই তো প্রাণময় ব্যাখ্যা। 'Absolute ব্রহ্ম' বলিতে পণ্ডিতেরা এই তত্ত্বকেই বুঝিয়া থাকেন। কবির ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে এই ব্রহ্মতত্ত্বের প্রভেদ বিস্তর। তথাপি রাধাকৃষ্ণনের মত পণ্ডিত ব্যক্তি যখন বেদান্তব্রহ্ম ও রবীন্দ্রব্রহ্মকে এক ও অভেদাত্মক মনে করার ইঙ্গিত দিতেছেন, [তদেব, পৃ. ২৮-৫১ দ্রষ্টব্য] তখন বুঝা ভালো যে, রাধাকৃষ্ণন বেদান্তপ্রোক্ত ঈশ্বরকেই, অর্থাৎ বেদোপনিষদের মনোময় ব্রহ্মকেই বেদান্তের চরম আদর্শ মনে করিয়াছেন। পণ্ডিতগণ এই মনে-করার যৌক্তিকতা ও সারবত্তা বিচার করিবেন।

ইহা যাজ্ঞবল্ক্যের নির্গুণ ব্রহ্ম নহে

রাধাকৃষ্ণনের দৃষ্টিকোণ

রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মতত্ত্ব—বাসনার জগৎ, ইন্দ্রিয়ের জগৎ, মনের জগৎ হইতে বহির্ভূত তত্ত্ব নহে। বাস্তব জীবনে জ্ঞান, কর্ম ও প্রেমের দ্বারা ক্রমশঃ ইহা প্রতিভাত করিবার তত্ত্ব। সকল হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া নহে, সকলের সহিত যুক্ত হওয়াই এই তত্ত্বের আদর্শ। বিশ্বের সহিত মিলনজনিত প্রেমের আনন্দাস্বাদনই ইহার প্রাণস্পন্দন। বিজ্ঞান-ব্রহ্মবাদে আস্বাদনের কথা কিন্তু আসিতেই পারে না। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মতত্ত্বের সকল ব্যাখ্যাতেই আপনি আস্বাদনের আনন্দ অনুভব করিবেন। আমাদের পক্ষে ইহাই কি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবময় বিষয় নয়? পাশ্চাত্য জ্ঞানদর্শন সাম্প্রতিক যুগে ক্রমশঃ মনোগত ব্রহ্মে উন্নীত হইতেছে বটে, তবে তাহার অন্তর্গূঢ় স্বভাব প্রাণগত ব্রহ্মেই নিহিত। আমরা এতদিন পাশ্চাত্যের এইটুকুকেই সত্য, শ্রেয় ও লক্ষ্য মনে করিয়া

নানা বস্তুবুদ্ধি, নানা বিরোধ, নানা অন্যায় বাসনার প্রশ্রয়ে প্রভূত যুক্তি প্রকাশ করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ এই নানা বিরোধসঙ্কুল প্রাণ-চাঞ্চল্যে মনঃশক্তির 'আনন্দজ্যোতি বিকীরণ করিয়াছেন। সংসার ত্যাগ করিতে বলেন নাই, আবার সংসার লইয়াই একান্তভাবে উন্মত্ত হইতেও কহেন নাই;—সংসারের মধ্যে রহিয়া সংসারের কামনা-বাসনার "দুর্নিবার আবেগকে সৌন্দর্যক্ষেত্রে, অধ্যাত্মলোকে বহমান করিয়া তাহাকে অনেক পরিমাণে সংসারপথ হইতে মানসপথে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন। আমাদের সমাজের সেই চিরক্ষুধাতুর প্রেতটাকে পবিত্র গয়ায় পিণ্ডদান করিবার আয়োজন করিয়াছেন। 'তিনি' কামকে প্রেমে পরিণত করিবার জন্য ছন্দোবদ্ধ কল্পনার বিবিধ পরশ-পাথর প্রয়োগ করিয়াছেন। 'তাঁহার' রচনার মধ্যে যে ইন্দ্রিয়-বিকার কোথাও স্থান পায় নাই তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু বৃহৎ স্রোতস্বিনী নদীতে যেমন অসংখ্য, দূষিত ও মৃত পদার্থ প্রতিনিয়ত আপনাকে আপনি সংশোধন করে তেমনি সৌন্দর্য এবং ভাবের বেগে সেই সমস্ত বিকার সহজেই শোধিত হইয়া চলিয়াছে।" [লোকসাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ]

কবিগুরু স্বয়ং বৈষ্ণবকবি ও সাধকদিগের সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, তাঁহার নিজের প্রেমসাধনার স্বরূপ ব্যাখ্যায় আমি তাহারই কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছি। পাঠক অবশ্যই এই উদ্ধৃতির তাৎপর্য উপলব্ধি করিবেন। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথর সাধনা হইতেছে জীবন সাধনা; আবার জীবনের সর্বোত্তম আদর্শ 'ব্রহ্ম' বলিয়া জীবনসাধনায় ব্রহ্মেশ্বরই হইতেছেন সর্বোচ্চতম উপাস্যদেবতা। কৃচ্ছ্র সাধনার দ্বারা এই উপাস্যদেবতার পূজা করার তিনি পক্ষপাতী নহেন। জীবনই তাঁহার নিকট পূজা। বাস্তব জীবনের বিচিত্র সুখদুঃখ, ক্ষয়ক্ষতি, আশা আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়া ভাব-প্রেরণার রসাস্বাদনে জীবন-জানা ও জীবন-করার সহজ সাধনাই তাঁহার সাধনজীবনের বিশিষ্টতা। রবীন্দ্রনাথের যে ব্রহ্ম, তা' জীবনব্রহ্ম, তা' মানবব্রহ্ম। মানব জীবনে তা' প্রকাশ করা কঠিন নহে বলিয়াই তাহা সত্য। বস্তু-জীবনের ধূলিলিপ্ত অহং-মুখর আবেগানুভূতি হইতে ভাবজীবনের সূর্যকান্ত আত্মচেতনার উত্তুঙ্গ শিখর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত ও পরিস্নাত এই জীবনব্রহ্মের জ্যোতিরাশীর্বাদে। এহেন জীবনব্রহ্ম, বলাই বাহুল্য, 'মেটাফিসিক্যাল এ্যাবস্ট্রাক্‌সন' নহে—পরন্তু জ্ঞানে, কর্মে এবং সর্বোপরি প্রেমসাধনার বৈরাগ্যসুন্দর আনন্দে নিত্য স্ফূর্ত ও মূর্ত।

রবীন্দ্রনাথের মানবব্রহ্ম

এই যে ব্রহ্মসাধনা অর্থাৎ প্রেমসাধনা, জগজীবনে ইহার মূল্য অপরিসীম। নানা ক্ষয় ক্ষতি, কামনাবাসনার মধ্য দিয়া প্রেমের পথে চলা, প্রেমের আদর্শ জীবনে ফুটাইয়া তোলা, ইহাই তো ব্যবহারিক আদর্শ তত্ত্ব। ব্যবহারিক জগতে ইহা স্ফূর্তি পাইলে শান্তির সম্ভাবনা হইবে, মানুষে-মানুষে, দেশে-দেশে, রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে মিলন ও সৌহার্দ্য জাগিবে, সমরের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হইবে, জিগীষা-জিঘাংসা থাকিবে না। অবশ্য প্রাণচঞ্চল রজোগুণপ্রধান জগতের পক্ষে এই আদর্শ আজও যেন চিন্তার বাহিরে রহিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রেমতত্ত্বকে অনেকে যে অমূলক কবিকল্পনা মনে করেন, তাহার কারণ অবশ্য ইহাই। মনের একান্ত নিম্ন তলায় অবস্থান করিয়া রবীন্দ্রনাথ পাঠ করিতে গেলে এইরূপ ভ্রান্তি অহরহঃ হইতেই পারে। এই কারণেই তো বোধ-বিস্তৃতির, হৃদয়-বিস্তৃতির, প্রয়োজন। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলিয়াছেন, 'রবীন্দ্রনাথ আমাদের জন-গণ-মনের অন্ততঃ একশত বৎসর অগ্রগামী। যদি আমরা সে ব্যবধান লুপ্ত করতে পারি, যদি তাঁর নূতন ধর্মবোধ ও চেতনা আমাদের অন্তঃকরণে গ্রহণ করতে পারি, তবে একশত বৎসর পরে আমরা তাঁর কাব্যের অমৃত ফলের অধিকারী হব। আজ আমরা অনধিকারী, তাই তাঁর কাব্য আজ ঈপ্সিত ফল প্রসব করতে পারছে না।' [শারদীয় লোকসেবক, ১৩৫৬]

রবীন্দ্র-প্রেমসাধনা ও যুগমানস

কেমন করিয়া পারিবে? চিত্তসাধনার বহু নিম্নস্তরে আমরা আছি বলিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রেম ও কর্মবাদকে অনেক উচ্চ স্তরের এমন কি জীবন হইতে বহির্ভূত স্তরের বলিয়া আমরা যে মনে করিতে থাকি! ড. বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিকই বলিয়াছেন, আমরা সত্যসত্যই 'অনধিকারী'। যে প্রেম জাগ্রত হইলে আমাদের বাস্তব জীবন দ্বিগুণ সুন্দর হইয়া যায়, আমাদের মানসলোক নবীন সূর্যোদয়ের স্বপ্নে আলোকান্বিত হইয়া উঠে, আমাদের গৃহ, আমাদের সমাজ, আমাদের রাষ্ট্র বাস্তব এই পৃথিবীতেই প্রকাশ করিতে থাকে কল্পনার আনন্দ স্বর্গ, সেই প্রেমের 'ধর্মবোধ ও চৈতনা' যে স্বভাবেরই ঐশ্বর্য ও জীবনেরই আনন্দ-সম্পদ ইহা মনেপ্রাণে যতক্ষণ না জানিতেছি ও মানিতেছি, ততক্ষণ রবীন্দ্রনাথের প্রেমকে বস্তুধর্মী বলিলে অথবা রবীন্দ্রনাথকে বাস্তববাদী বলিলে অর্থহীন তর্কই উত্থিত হইবে। যে রাজকীয় ঐশ্বর্যসম্ভার শ্রাবণের ধারার মত অহরহঃ আমাদের উপর তিনি বর্ষণ করিয়াছেন, অক্ষম আমরা, তাহার মহিমার আনন্দরস আস্বাদনে আজও যথার্থভাবে অধিকারী হই নাই। আজও আমবা মনে করি তাঁহার গান, কথা, তত্ত্ব জীবনবহির্ভূত অন্যতর কোনো স্বর্গ কল্পনা। কবি-সমালোচক বুদ্ধদেব যে বলিয়াছেন: The princely gifts he has rained on his undeserving countrymen. [Tagore Birthday Number. p. 10] তাহা কি বর্ণে বর্ণে সত্য নহে? কাছের মানুষ, মনের মানুষ, রবীন্দ্রনাথকে দূরের মানুষ আমরা যে ভাবি, তাহা কি আমাদের চিত্তদৈন্যেরই পরিচয় বহন করে না? একমাত্র এই কারণেই কি বোধবিস্তৃতির প্রয়োজন স্বীকার করিব না? তত্ত্বজ্ঞানের জন্য না-হয় নাই হউক, রসোপলব্ধির প্রয়োজনেও তো ইহা স্বীকার করিতে হয়।

যাহা একান্ত কাছের বস্তু, তাহাকে দূরের মনে করার মত অরসিকতা, অজ্ঞতা ও অবাস্তবতা আর কিছু নাই। বেদান্ত-আলোকে জীবনবোধকে পরিস্নাত করিয়া নূতনতর বাস্তবজ্ঞান তাই অর্জন করিতেই হইবে। কথাটা শুনিবামাত্র চমকাইয়া উঠিবেন না। আমি কাব্য পড়ার আগে দর্শন পড়ার পক্ষে ওকালতী করিতেছি না। আমার বক্তব্য এই—চিত্তকে উচ্চধামে উন্নীত না করা পর্যন্ত মানুষ সত্যকার রসিক হইতেই পারে না।

যে যত বড় উচ্চ রসিক, তত বড় উন্নত তাহার মন। মনের বন্ধন যাহার আছে, রসের পূর্ণরূপ দেখিতে সে অক্ষম। মনের সর্বস্তরে, সর্বধাপে সে-ই যাইতে পারে, সর্বস্তরের আনন্দ সে-ই উপভোগ করিতে পারে, মনের বন্ধন যাহার নাই। মনের সর্বোচ্চ স্তরে যে উঠিতে পারিয়াছে, মনের সর্বোচ্চ লোকের সূর্যালোকে সে দেখিতে শিখিয়াছে মনোলোকের বিচিত্র রূপাভিসার। বেদান্তশাস্ত্র মনের এই সর্বোচ্চ লোকের কথা বলিয়াছেন, তাহার পর 'এহোবাহ্য' বলিয়া ইহারও অতীতে হইয়াছেন অগ্রসর। সেই যে অগ্রসরতা, ধ্যানবলে তাহারও মধ্যে যিনি উঁকি মারিতে পারেন. মনোলোকের সর্বোচ্চ স্তর তাঁহার নিকট তখন অবাস্তব স্বপ্নকল্পনা বলিয়া মনে হয় না, পরন্তু বাস্তবজীবনের সত্য প্রসঙ্গ বলিয়াই প্রতীয়মান হইতে থাকে।

বস্তুতঃ, বেদান্তের আলোকে রবীন্দ্রতত্ত্ব ও প্রেম দর্শন করিতে শিখিলে রবীন্দ্রনাথকে অবশ্যই আর দূরের জন বলিয়া মনে হইবে না। বেদান্তের 'নেতি নেতি' এই আদেশের সাহায্যে অদ্বয়বাদী মুক্ত পুরুষগণ যে-ব্রহ্মের ধ্যান করেন, সেই ব্রহ্মের, অর্থাৎ 'অস্নেহমসঙ্গমরসমগন্ধম্'-এর তুলনায় রবীন্দ্রনাথের প্রেমব্রহ্ম যে অত্যন্ত স্পষ্ট ও মনোগ্রাহ্য, সে বিষয়ে কাহারও কোনো সন্দেহই থাকিবে না। আসল কথা, মন যখন খণ্ড ক্ষুদ্র নানা বাসনার জালে বন্দী ও অন্ধ, তখনই রবীন্দ্রনাথের প্রেমকে জীবন-নিরপেক্ষ কোনো তত্ত্ব বা কবি-কল্পনা অথবা কবির স্বাতন্ত্র্যসাধনা বলিয়া মনে হইতে পারে। মন উচ্চ হইলে অর্থাৎ উচ্চ বিষয়ে রতি ও তুচ্ছ বিষয়ে মনের বিরতি জাগিলে রবীন্দ্র-প্রেমতত্ত্ব যে মনেরই তত্ত্ব এবং মনকে সুন্দর, উজ্জ্বল, নির্মল ও ভূমাভিমুখী করার বাস্তব প্রয়োজনেই যে কবিগুরু এই তত্ত্ব-প্রসঙ্গের আলোচনা ও পর্যালোচনা করিয়াছেন তাহা সহজেই উপলব্ধি হইবে।

রবীন্দ্রনাথের মনোদর্শনে প্রেমই বৃহত্তমের বৃহত্তর সত্তা। এই প্রেমই তিনি দর্শন করিয়াছেন সর্বত্র, অন্বেষণ করিয়াছেন সর্বত্র,—সকল রূপে, সকল বস্তুতে, জীবনের সকল আবেগ-অনুভূতিতে প্রেমই তিনি আস্বাদন করিয়াছেন। এই প্রেমের দৃষ্টিই, রবীন্দ্রবিচারে, অমৃতদৃষ্টি। প্রেমাশ্রিত দৃষ্টিতে জগৎ সত্য ও সুন্দর। প্রেম ছাড়া অন্য কিছু রবীন্দ্রবিচারে অসত্য, তা' 'প্রকৃতির ছলনা', 'জীবনের মিথ্যা ও কুহক'—অর্থাৎ 'তদল্পম্'।

যো বৈ ভূমা তদমৃতম্

অথ যদল্পং তন্মর্ত্যম্। [ছান্দোগ্য]

রবীন্দ্রনাথ প্রেমকেই ভূমা বলিয়াছেন। রবীন্দ্রদর্শনে এই ভূমার কথা প্রায়শঃই দেখিতে পাইবেন। ভূমা সম্পর্কে প্রসঙ্গতঃ দুই চারিটি কথা এইস্থলে বলিয়া লই। শ্রুতিতে ভূমার সুন্দর ব্যাখ্যা আছে। ভূমার ব্যাকরণগত অর্থ বটে 'বহুত্ব', 'বহুত্ব-বিশিষ্ট'। 'বহোর্ভাব ভূমা'। 'অতিশয়েন বহুঃ ভূয়িষ্ঠঃ'। কিন্তু শ্রুতিতে ভূমা ব্রহ্মেরই প্রতিশব্দ। 'শ্রুতিভ্যো ব্রহ্মনিত্যত্বং সত্যত্বঞ্চাস্য প্রতিভাসি। ইতি বেদান্তসারটীকা'। [শব্দকল্পদ্রুমঃ দ্রষ্টব্য]

রবীন্দ্রদর্শনে প্রেমই ভূমা

তাহা হইলে সহজ ভাষায় ভূমা কী? না, ভূমা বৃহতের বৃহৎ, পরমব্রহ্ম, বিরাটপুরুষ। এমন বিরাটপুরুষ যে, তাঁহার সাক্ষাৎকারে সকল বিশ্বই অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। ক্রমশঃ সকল কিছুই তাঁহাতে লীন হইয়া যায়। তখন তিনি ছাড়া আর কিছু দেখি নে, তখন 'তদন্যৎ অখিলম্ অনিত্যম্' বোধ হয়। এই যে তিনি, যা ছাড়া অন্য কিছু দেখি নে, অন্য কিছু জানি নে, অন্য কিছু মনে আনি নে,—ইনিই ভূমা।

যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি
নান্যৎ বিজানাতি
স ভূমা।

কিন্তু যে স্থলে অন্য কিছু দেখি, অন্য কিছু শুনি বা ধারণায় আনি, সে স্থলে বুঝিতে হইবে ভূমাবোধ সত্য হয় নাই।

অথ যত্রান্যৎ পশ্যতি, অন্যৎ শৃণোতি
অন্যদ্ বিজানাতি
তদল্পম্। [ছান্দোগ্য, ৭।২৪।১]

খাঁটি বৈদান্তিকগণ প্রেমকে ভূমা বলিতে চাহিবেন না এবং কেন চাহিবেন না তাহা আমি জানি। সে বিষয়ে কিন্তু নীরস কোনো আলোচনায় আর সময়ক্ষেপ করিতে চাহি না। বাস্তব জীবনে প্রেমই কল্যাণময় আনন্দব্রহ্ম। প্রেমের চেতনায় সর্বকে আত্মস্থ করা এবং সর্বত্র প্রবেশলাভের আনন্দসাধনায় তৎপর হওয়া ইহলৌকিক জীবনে কম কথা নহে। মহারাষ্ট্রের সাধক কবি তুকারাম একটি স্মরণীয় কবিতায় বলিয়াছেন, অনন্ত ব্রহ্ম তো বাক্য ও মনের অতীত, তাঁহাকে ধরিব কেমন করিয়া? ধরিতে পারি না বলিয়াই তো প্রেমের সহায় লইয়াছি। প্রেমের শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া অর্থাৎ জ্ঞানে প্রেম, কর্মে প্রেম, চিন্তায় প্রেম, জীবনের বিশ্ববিধ আবেগানুভূতিতে প্রেম অনুভব করিয়া অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমমুক্তিলাভ অবশ্যই হইবে।

প্রেমব্রহ্মের অন্যান্য সাধক

ধরার ধারণাপারে বাক্য ও চিন্তার পারে
হে ব্রহ্মন্, স্বরূপ তোমার।
তোমার আভাস পেতে তোমাতে ক্রমশঃ যেতে
প্রেমব্রহ্মে করিয়াছি সার ॥[১]

১ তুকারামের মূল কবিতাটির ইংরেজী অনুবাদই আমি পড়িয়াছি। **Dr. Nicol Macnicol, M.A. D. Litt.** অনূদিত **Psalms of Maratha Saints** নামক গ্রন্থে মহারাষ্ট্রীয় সাধক কবিদের বহু মূল্যবান কবিতা আছে। আলোচ্য কবিতাটির বঙ্গানুবাদ Dr. Nicol-এর ইংরেজী রূপ হইতেই করা হইয়াছে। ইংরেজী রূপটি পাঠকের জ্ঞাতার্থে উদ্ধৃত হইল:

Thy nature is beyond the grasp
Of human speech and thought.
So love I've made the measure-rod
By which I can be taught. [p. 73]

তুকারামের পূর্বে জ্ঞানেশ্বর, মুক্তাবাই, নামদেব, জনাবাই একনাথ, প্রভৃতি বহু মহারাষ্ট্রীয় সাধককবি জ্ঞানের পথ অপেক্ষা প্রেমের পথকেই পছন্দ করিয়াছেন। প্রেমের মহিমাকীর্তনে ইঁহারা নিত্য মুখর, আত্মবিভোর। ইঁহাদের মধ্যে নামদেব প্রেমব্রহ্মকে মাতৃজ্ঞানে সম্বোধন করিয়া এমন কয়েকটি পদ রচনা করিয়াছেন যেগুলি পাঠমাত্র হৃদয়ে ভাবের তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। সমস্ত পদ লইয়া আলোচনা করার অবসর এখানে নাই। একটি পদের মাত্র দুইটি পংক্তি এস্থলে দেখাইতেছি। এই দুইটি পংক্তিতেই প্রেম সম্পর্কে সাধু কবিদের মনোভাব বেশ স্পষ্ট হইয়াছে। নামদেব বলিতেছেন, হে প্রেম, তুমি তো আমার মা। 'তু মাজী মাউলী'

তুমি মাতা ; আমি তব স্তন্যপায়ী শিশু অসহায়
প্রেম পান করাও আমায়।[১]

মধ্যযুগীয় সাধুসন্তদের বহু পদে ও দোঁহায় প্রেমের এইরূপ মাহাত্ম্য নানাভাবে বর্ণিত ও কীর্তিত হইয়াছে। পণ্ডিত শ্রীক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের অক্লান্ত চেষ্টা ও গবেষণার ফলে সেই সমস্ত অমূল্য পদ ও দোঁহাবলী বাঙ্গলা-ভাষাভাষীদের নিকট এখন আর অপরিচিত নহে। এইসকল সাধুকবি বৈদিক ঋষিদের মত সহজ ব্রহ্মভাবেরই, অর্থাৎ প্রেমব্রহ্মেরই উপাসক ছিলেন। তুলসীদাস, দাদূ, কবীর, চরণদাস, মীরাবাঈ প্রভৃতি ভক্ত কবিবৃন্দ সগুণ ঈশ্বর ও প্রেমের মহিমাই কীর্তন করিয়াছেন। জীবন দিয়া ইঁহারা প্রেমসাধন করিয়াছিলেন, বিশুষ্ক তত্ত্বের কচ্‌কচির মধ্যে প্রবেশ করার অভিরুচি তাঁহাদের ছিলই না। নির্গুণব্রহ্ম ও সগুণব্রহ্মবাদ লইয়া জ্ঞানযোগীদের মধ্যে নানা মতভেদ লক্ষিত হয়, কিন্তু কবীর বলিতেছেন, দুই মতবাদই সত্য ও সঙ্গত। দুই-এরই পাল্লা ভারী।

মধ্যযুগীয় সন্তগণ

নির্গুণ হৈ সো পিতা হামারা
সগুণ হুঈ মহতারী।
কাঁহে নিন্দো, কাঁহে বন্দো
দোনো পল্লা ভারী॥ [দোঁহাবলী]

উভয় পক্ষই সত্য বটে, তবে প্রেম বিনা যে কিছুতেই কিছু হইবে না, একথা তুলসীদাস জোর গলায় গাহিয়াছেন :

বিনা প্রেম রীঝৎ নহিঁ
তুলসী নন্দ্‌কিশোর॥ [তদেব]

১ Dr. Nicol এর অনুবাদ : My mother thou ; thy sucking babe am I : Feed me with thy love.

প্রেম ভিন্ন অন্য কিছুতেই প্রসন্নতা জন্মে না প্রেমদেবের। প্রেম চাই-ই চাই। প্রেমের মত প্রেম হইল না বলিয়া ব্যাকুলতা চাই, ক্রন্দন চাই। কবীর বলিতেছেন, প্রেমের জন্য ব্যাকুলতা ও ক্রন্দন ব্যতিরেকে প্রিয়তম সেই প্রেমকে পাইবে কেমন করিয়া ?—

কবীর, চরণদাস, দাদূ

বিন রোয়ে ক্যাঁও পাইয়ে
প্রেম পিয়ারা মিত ॥ [তদেব]

'প্রেম বিনা মন কাঙ্গাল', কহিয়াছেন দাদূ : 'তিন লোকেই বেড়ায় সে যাচিয়া। মন যেই লাগিল স্বামীর সঙ্গে, অমনি পলাইল যত দারিদ্র্য, যত শোক।'

বিনা প্রেম মন রংক হৈ জাচৈ তিনউ লোক।
মন লাগা জব সাঁঈ সৌঁ ভাগে দরিদ্দর শোক ॥

[দাদূ, ক্ষিতিমোহন সেন]

প্রেম বিনা দীন মন ভিক্ষা মাগে ভ্রমি তিন লোক
প্রিয়রে আলিঙ্গে যবে দূরে যায় দরিদ্রতা, শোক ॥

ভক্ত চরণদাসের মতে তাই প্রেমের সমান যোগ আর নাই—প্রেমের সমান জ্ঞানও দৃষ্ট হয় না সংসারে। প্রেমবিহীন সাধু কোনো কাজেরই না। তাঁহার ধ্যানজ্ঞান সবই ব্যর্থ।

প্রেম বরাবর যোগ নাহি
প্রেম বরাবর জ্ঞান
প্রেমভক্তি হীন সাধবা
সবহি থোথা ধ্যান ॥ [দোঁহাবলী]

এই প্রসঙ্গে মীরার সেই বিখ্যাত ভজনটিও স্মরণে আসে :

মীরা কহে বিনা প্রেমসে
না মিলে নন্দলালা ॥ [তদেব]

প্রেমে আত্মসমর্পণ করিয়া ইন্দ্রিয়াতীত আনন্দে অমৃত হওয়ার বাণী 'দাদূ'তে বিচিত্র-ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। পণ্ডিত সেন কর্তৃক সংগৃহীত 'দাদূ-বাণী' এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। 'জীয়ন্তে মরিয়া' থাকার, অর্থাৎ অহংকে দমন করিয়া প্রেম ও ভক্তিতে বিশ্রাম লওয়ার আনন্দ-তত্ত্ব দাদূতে যেমন ফুটিয়াছে, তেমন বোধহয় আর কাহাতেও নহে। একটি তুলিয়া দিতেছি :

জীয়ত মাটী মিলি রহৈ
সাঁঈ সনমুখ হোই।
দাদূ পহিলে মরি রহৈ
পিছে তো সব কোই ॥ [দাদূ, ক্ষিতিমোহন সেন]

পণ্ডিত সেন উক্ত দোঁহার যেরূপ বঙ্গানুবাদ দিয়াছেন, তাহার পদ্যরূপ হইতেছে এই :

জীবন্তে মাটিতে রহ মিলি
সম্মুখে রাখিয়া স্বামিবরে।
হে দাদূ, আগেই রহ মরি
পরে তো সবাই জানি মরে॥

কিন্তু পদ্যানুবাদ অপেক্ষা ভাবানুবাদ দিলেই বোধ হয় দোঁহাটি স্পষ্ট হয়। দাদূ বলিতেছেন, জীবন্তে, অর্থাৎ অহং উদ্দীপ্ত নানা বাসনাময় এই চঞ্চল জীবনে, মাটির মতন অচঞ্চল থাকিবার সাধনা করিয়ো; নিশ্চয় জানিয়ো, স্বামী বিরাজিত আছেন সম্মুখে। হে দাদূ, আগে মর দাদূ, আগে মর দেখি, তবে তো মরিবে সবাই। পরমপ্রেমে আগে হইতে শান্তভাবে আত্মসমর্পণ করো দেখি, তবে তো কামক্রোধাদি অহংবৃত্তি প্রশমিত হইবে আপনা হইতেই।

চঞ্চল জীবনে রহ শান্ত অচঞ্চল মাটি সম
সম্মুখে বিরাজে প্রাণপ্রিয়;
হে দাদূ, পরমপ্রেমে আগে হতে রহ শান্তোপম,
শান্তি পাবে অশান্ত ইন্দ্রিয়॥

ভারতবর্ষের উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রেমব্রহ্মই যে উপাস্য এবং বলাই বাহুল্য, এই ব্রহ্মই যে রূপে রূপে সর্বত্র বিরাজিত, এবং ইঁহার সাধনাই যে মানবজীবনের পুরুষার্থ, এ তত্ত্ব-সত্য কবিগুরু জীবন দ্বারা জানিয়াছেন বলিয়াই মানিয়াছেন। 'দেব সর্বাঠাঈ ভাসে' (একনাথ,) 'সাঁই সনমুখ হোই' (দাদূ,) 'প্রাণ-রসনায় দেখরে চাইখ্যা রসের সাঁই খাঁটি' (বাউল), 'দয়াল আমার সম্মুখে হাজির' (ঈশান ফকীর), 'মানুষ ঝলক দেয় সে দিনের বেলা' (লালন ফকীর) প্রভৃতি পংক্তিতে যে তত্ত্ব প্রকাশ পায়, কবিগুরু তাহাতে বিশেষ ভাবেই প্রভাবিত হইয়াছেন বলা যায়। উপনিষদের যে-যে অংশে এই তত্ত্ব আছে, কবিগুরু সাগ্রহে ও সানন্দে তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন তাঁহার 'The genius of Rabindranath, its character and lineage' নামক মূল্যবান প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের একাধিক কবিতা ও গানের সহিত বেদোপনিষদের হুবহু মিল দেখাইয়া দিয়া এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করিয়াছেন। বস্তুতঃ তত্ত্বের জটিলতা ও নেতি-তত্ত্বের ধারণাতীত অস্পষ্টতা রবীন্দ্রনাথকে কখনও আকর্ষণ করিতে পারে নাই। অন্তর্লীন গহন মনের উপলব্ধি ও আস্বাদন দ্বারা তিনি যাহা জানিয়াছেন, তাহাই তাঁহার নিকট বস্তুসত্য, তত্ত্বসত্য। 'ইতিহাসোপনিষৎ' নামক একখানি অপ্রকাশিত উপনিষৎ হইতে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া পণ্ডিত সেন মহাশয় এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন :

ঋচো হ যো বেদ স বেদ দেবান্
যজুংষি যো বেদ স বেদ যজ্ঞম্ ।
সামানি যো বেদ স বেদ সর্বং
যো মানসং বেদ স বেদ ব্রহ্ম ॥
ঋগ্‌বেদে জ্ঞান যার, জ্ঞান তার ইন্দ্রাদি দেবতা,
যজুর্বেদে জ্ঞান যার, জ্ঞান তার যজ্ঞাদির কথা।
সামবেদে জ্ঞান যার, জ্ঞান তার সর্ববিশ্বলোকে
মনোবেদে ধ্যান যার, ধ্যান তার ব্রহ্মের বারতা ॥

কবিগুরুর এই 'মনোবেদে' ছিল ধ্যান। পণ্ডিত সেন যথার্থই বলিয়াছেন :

'Rabindranath is a follower of this 'Manas Veda' and thus he spiritually belongs to one family with those seekers after truth who in ancient India had followed and realised this Veda of their inner mind.' [*Tagore Birthday Number*]

বাউল কবিদের 'Inner Mind'

বাঙলার বাউল কবিদের মধ্যে এই 'inner mind'-এর, এই মানসবেদের সাধনা ছিল বলিয়া রবীন্দ্রনাথ বাঙলার বাউলগানে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেছেন, 'বাউলদের······স্বর্ণরেখার বাণীধারা'র মধ্যে 'সোনার কণা আছে লুকিয়ে' [পণ্ডিত সেনের 'দাদূ'র ভূমিকা]। নিখিল ভারত দর্শনসভার অধিবেশনের সভাপতিরূপে তিনি যে বিখ্যাত অভিভাষণটি দিয়াছিলেন, তাহাতে এই বাউলদের জীবন ও কাব্যতত্ত্বই বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভারতীয় মানস-জীবনে বস্তু ও তত্ত্ব, কাব্য ও দর্শন যে পৃথক বস্তু নহে, এবং সর্বোপরি নিরক্ষর সাধারণ মানুষের মধ্যেও যে নিগূঢ় আধ্যাত্মিকতা সহজ আনন্দেই প্রকাশ পাইত, বাউলদের একাধিক গান ও কবিতা উদ্ধৃত করিয়া তাহা তিনি চমৎকারভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। [*Illustrated Sisir*, Feb. 1926.] তিনি বুঝাইয়াছেন যে, এই সকল বাউলকবি—

sing of the Eternal Person within him, coming out and appearing before his eyes just as the Vedic Rishi speaks of the Person, who is in him, dwelling also in the heart of the Sun.

রূপ দেখিলাম রে নয়নে
আপনার রূপ দেখিলাম রে।
আমার মাঝত বাহির হইয়া
দেখা দিল আমারে ॥

আত্মোপলব্ধির এই নূতনবাণী, এই নবভাবে জন্মলাভের আনন্দবাণী প্রণিধানযোগ্য। বাউলের গানে এই বাণী অহরহঃ ঝংকৃত হইয়াছে। বাঙলার বাউলরাও ছিলেন এক প্রকার সাধক, 'মনের মানুষের' সাধক।

'আমি মন পাইলাম
মনের মানুষ পাইলাম না।' ['হারামণি', মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন সম্পাদিত]

কিংবা,

'তোমার মনের মধ্যে আছে আর এক মন গো
তুমি মন মিশাও সেই মনের সাথে'।

কি—

'প্রেম করো মন
প্রেমের তত্ত্ব জেনে।'

কি—

'নিঠুর গরজী,
তুই কি মানস-মুকুল ভাজ্‌বি আগুনে?
তুই ফুট্‌ফুটাবি বাস ছুটাবি সবুর বিহনে?'

প্রভৃতি বাউল গানে স্থূল মন অর্থাৎ অহংমত্ত মন ত্যাগ করিয়া আত্মদীপ্ত উজ্জ্বল মনের সন্ধানে ফেরার আনন্দ আছে। শেষোদ্ধৃত পদটিতে ইঙ্গিতে বলা হইয়াছে যে, নীরস জ্ঞানমার্গের কৃচ্ছ্র সাধনার আগুনে মন-মুকুলকে ভাজিলে কোনোই ফলোদয় হইবে না। 'মানস-মুকুল' কথাটি এস্থলে লক্ষ্য করিবার মতো। ঈষৎ বিকশিত এই মন-কলিকা, এখনো যা ফুটে নাই ভালো করিয়া—বাস ছুটানোর বাসনা যাহার হয় নাই চরিতার্থ, অকালে তাহাকে আচম্বিতে তত্ত্বের খোলায় ভাজিতে গেলে বিপরীত ফলই কি ফলিবে না? বাসনা মনের মধ্যে ঘুরঘুর করিয়া ঘুরিবে অথচ 'ফুট্‌ফুটাবি'—কিনা নেতি-তত্ত্বের আদেশ আউড়াইবি যোগী হইয়া, ইহাই কি সত্যের সন্ধান?

মানস-মুকুল

তাৎপর্য এই—সহজভাবে 'সবুর' করিয়া ধীরে ধীরে বিকশিত হইতে হইবে। এই দেহ ও মনকে প্রস্তুত করিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইবে ব্রহ্মপথে। 'পরম গুরু সাঁই' যখন তাড়াহুড়া না করিয়া 'যুগযুগান্তে ফুটায় মুকুল',—তখন সাধক কেন তাড়াহুড়া করিতে চায়?

'দেখ না আমার পরম গুরু সাঁই
সে যুগযুগান্তে ফুটায় মুকুল,
তাড়াহুড়া নাই।'

বস্তুতঃ, মানসমুক্তি তাড়াহুড়ার ব্যাপার নহে। ধীরে ধীরে মনকে সংযত করিয়া মলিনা বাসনা হইতে শুদ্ধা বাসনায় মনকে তুলিয়া অবিদ্যার অন্ধকার হইতে বিদ্যার আলোকে, মুক্তির আলোকে উঠিতে হয় মনের সাধককে। এই যে মুক্তিবাদ, ইহা শূন্যবাদ বা নেতিবাদ নহে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :

> The enlightenment which frees us from this ignorance must not be merely negative. Freedom is not in an emptiness of its contents, it is in the harmony of communication through which we find no obstruction in realising our own being in the surrounding world. It is of this harmony and not of a bare and barren isolation, that the Upanisad speaks when it says that the truth no longer remains hidden in him who finds himself in the All. [The Philosophy of Our People, *Sisir*, Feb. 1926.]

শুধু বেদোপনিষদে নয়, বাউলদের সহজ গানেও যে রবীন্দ্রনাথ এই প্রেম-মিলনের আনন্দতত্ত্ব পাইয়াছেন, সেই কথাই বারংবার তাঁহার অভিভাষণে ব্যক্ত করিয়াছেন। বাউলদের তত্ত্ব, সহজতত্ত্ব ; স্বভাবকে স্বভাব দ্বারা মুক্তি দেওয়ার আনন্দতত্ত্ব,—প্রেমের তত্ত্ব। প্রেমের দৃষ্টিতে মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরদর্শন সম্ভব হয়।

বাউলরা বলেন—

'প্রেম করা কি কথার কথা ?
প্রেমেতে এই জগৎ বাঁধা।'

প্রেম যখন লাভ করি, তখন—

'জীবে জীবে চাইয়া দেখি
সবই যে তার অবতার।
ও তুই, নূতন লীলা কী দেখাবি
যার নিত্যলীলা চমৎকার॥'

তাই যদি হইল, তবে তো 'মানুষ-ই সবার সার'? মানুষই তো গুরু? বস্তুতঃ, বাউল-তত্ত্বে বিশ্বের কেহই অনাত্মীয় নহে, পরন্তু গুরুতুল্য শ্রদ্ধেয় ও প্রেমাস্পদ—

'গুরু বলে কারে প্রণাম করবি মন ?
তোর অতিথ্ গুরু, পথিক গুরু,
ও তোর গুরু অগণন,
ও তোর গুরু সর্বজন॥'

এই হইল প্রেমের দৃষ্টিতে মানুষের রূপদর্শন, মানুষের রূপে গুরুদর্শন এবং সর্বোপরি ঈশ্বরদর্শনের বাউল-তত্ত্ব। বাউলগণ, বলাই বাহুল্য, বিশেষ কোনো নৈষ্টিক তত্ত্বসাধনার দ্বারা এই তত্ত্ব উপলব্ধি করেন না। সহজভাবে মনের বিচিত্র আবেগানুভূতির মধ্য দিয়া মন হইতে মনের মনে, অর্থাৎ প্রেমের সর্বানুভূ আনন্দে উদিত হইয়া এই তত্ত্ব সাধন করেন; ইহাই বাউলের 'মানসবেদ' সাধন। এই প্রসঙ্গে স্বর্গীয় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাউলদের সহজ-সাধনা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হইবে।

বাউলের সহজ-সাধনা

'ইঁহারা (বাউলগণ) অহেতুক প্রেমের সাধনা করেন; ইঁহাদের মতে প্রেম নিষ্প্রয়োজন অর্থাৎ কামনাশূন্য না হইলে কামপূর্ণ প্রেমের দ্বারা মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই।

'বাউলরা বলেন, সত্যকে লাভ করিতে হইবে, এবং সেই সত্যস্বরূপ যিনি, তিনি মানুষের অন্তর্যামী। এই যে মানব দেহ, তাঁহারই দেবমন্দির এবং সেই মন্দিরেই বাস করেন মানুষের 'মনের মানুষ'। এমন কি, সমস্ত জীবই তাঁহার অবতার।

'বাউলরা বলেন—এই মনের মানুষই মানুষেব গুরু। যিনি সহজ সত্যকে উপলব্ধি করিয়া তাহা লোকের গোচর করিয়া দিতে পারেন, তিনিই মানুষের গুরু; পূর্ণ সত্য কেহ উপলব্ধি করিতে পারে না, এইজন্য সকল মানুষেরই মধ্যে যতটুকু সত্য আছে তাহা সন্ধান করিয়া লাভ করাই হইতেছে শিষ্যের কাজ। সুতরাং গুরুর অন্ত নাই।

'সহজভাবে যাহা ধর্ম বলিয়া উপলব্ধি করা যায় তাহারই সাধন করাই বাউলদের সহজ সাধন।······যে রসের বিকাশ সৃষ্টিতে, মনুষ্যদেহেও তাহার আস্বাদ পাওয়া যায়। মানুষের দেহ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড—যাহা নাই ভাণ্ডে তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে। দেহের মধ্যেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সহিত মনের যোগ ঘটে, দেহের মধ্যেই বিশ্বেশ্বরের সহিত আমাদের পরিচয় সহজভাবে ঘটে। এই কায়ার মধ্যেই সমগ্র জগতের ও জগৎপতির যোগ অনুভব করিবার সাধনই সহজসাধন বা কায়া-সাধন।

'দৈহিক শক্তিগুলির সাহায্যে যাহাতে চৈতন্যরূপ আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায়, এবং অখণ্ড চৈতন্যের সহিত মিলিত হইয়া অখণ্ড আনন্দে আত্মোৎসর্গ করিতে পারা যায়, তাহাই সহজিয়া সাধকদের উদ্দেশ্য। [কবিপরিচয়, বঙ্গবীণা]

রবীন্দ্রনাথ পুরাপুরিভাবে প্রচলিত কোনো তত্ত্বই মানেন নাই, কিন্তু বাউলদের এই সহজতত্ত্ব তাঁহাকে বেদোপনিষদের মতই প্রভাবিত করিয়াছে। এক হিসাবে বাউলদের তত্ত্বদর্শন ও তাঁহার মনোদর্শন স্বরূপতঃ এক বলিয়াও যেন মনে হয়। বাউলরা 'মন' মানেন, মনের মধ্যে একটি পরম মন আছে, এ তত্ত্বও তাঁহারা স্বীকার করেন; রবীন্দ্রনাথ 'অহং' মানেন, অর্থাৎ অহংগত মন মানেন—আবার মনের সর্বোচ্চ স্তরে যে মনের মন, যে

বাউল ও রবীন্দ্রনাথ

আত্মগত মন আছে, তাহার উদ্বোধনে সাধন-স্বভাবকে প্রস্তুত রাখিতে বলেন। বাউলরা বলেন—মন পাইয়াছি বটে, কিন্তু মনের মনকে না পাইলে তো আনন্দ নাই; রবীন্দ্রনাথ বলেন, জীবমানব হইয়াছি সত্য, কিন্তু শিবমানবে গতি না হইলে মানবজন্মকে মর্যাদা দিব কোন্ গুণে? বাউলদের গুরু অর্থাৎ আদর্শ হইতেছে মনের মানুষ, রবীন্দ্রনাথের আদর্শ হইতেছে পরম-মানুষ। মনের মানুষকে বাউলরা খোঁজ করেন আপন মনের গহন আনন্দে, মানুষের সেবায় এবং গুরু বন্দনায়; রবীন্দ্রনাথ পরম মানুষকে সন্ধান করেন মানুষের ত্যাগে, সেবার মহত্ত্বে, দুঃখের গৌরবে এবং প্রেমের বৈরাগ্যে। বাউলদের কথা এই —মনসাধনায় হইতে হইবে মনের মানুষ; রবীন্দ্রনাথের কথা এই—প্রেমসাধনায় হইতে হইবে পরম-মানুষ। বাউলরা তত্ত্ব সাধনায় জৈব প্রেম হইতে উত্তীর্ণ ই হইতে চাহেন, তবে জৈব প্রেমকে আচম্বিতে অস্বীকার করিয়া বসেন না; 'দীপকোজ্জ্বল' নামক রসশাস্ত্রে বাউলরাই লিখিয়াছেন—'নরদেহ বিনু নহে রসের আস্বাদন'। রবীন্দ্রনাথে অহংপ্রেম হইতে উত্তীর্ণ হওয়ার বাণী আছে কিন্তু অহংপ্রেমকে উচ্ছেদ করিয়া আত্মার উন্নত প্রেম যে সম্ভব নহে একথা রবীন্দ্রনাথ একান্তভাবেই বিশ্বাস করেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের ক্রমবিকাশের ধারাটি লক্ষ্য করিলেই একথার সত্যতা প্রমাণিত হইয়া যায়। বাউলদের সাধন-তত্ত্বে কৃচ্ছ্র সাধন বা নিয়ম-নিষ্ঠার কোনো বালাই নাই—রবীন্দ্রনাথে যে এসমস্ত নাই সে কথা না বলিলেও চলে। বাউলরা তাঁহাদের তত্ত্ব-সাধনে বিশ্বের সকলকে গুরু বলিয়া অর্থাৎ আত্ম-জাগরণের আনন্দময় প্রতীক বলিয়া স্বীকার করেন; রবীন্দ্রনাথ নিখিল বিশ্বের প্রতিটি রূপেই অরূপের অর্থাৎ আত্মজাগরণের আনন্দময় রূপচ্ছায়ার ইঙ্গিত দর্শন করেন। বাউলদের নিকট বিশ্ব, বিশ্বমানব, বিশ্বপ্রকৃতি চৈতন্যজাগরণের আনন্দাগার; রবীন্দ্রনাথের নিকট বিশ্ব, বিশ্বমানব ও বিশ্বপ্রকৃতি প্রেমোদ্বোধনের আনন্দাগার।

মনের মানুষ
ও
পরম-মানুষ

ভারতীয় দর্শনসভায় প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের যে অভিভাষণটির কথা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে বাউল-তত্ত্বের তিনি যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজের কাব্যদর্শন ও জীবনদর্শন সম্পর্কেও প্রযোজ্য বলিয়া মনে হয়। অভিভাষণের উপসংহারে তিনি একটি বিখ্যাত বাউলপদ তুলিয়া বুঝাইয়াছেন যে, সীমা ও অসীমের মিলন-লীলা চিরকাল অব্যাহত গতিবেগে চলিবে; এই চলাই সত্য,—এই চলা হইতে মুক্তি নাই কাহারো। পদটি এই—

হৃদয় কমল চল্‌তেছে ফুটে কত যুগ ধরি,
তাতে তুমিও বাঁধা, আমিও বাঁধা, উপায় কি করি।
ফুটে ফুটে ফুটে কমল, ফুটার না হয় শেষ;
এই কমলের যে এক মধু, রস যে তায় বিশেষ।

ছেড়ে যেতে লোভী ভ্রমর পারো না যে তাই,
তাই তুমিও বাঁধা, আমিও বাঁধা, মুক্তি কোথাও নাই ॥

রবীন্দ্রনাথ এই বাউল গানটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, এই গানের মধ্যে—

বাউল প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

'The poet sings of the eternal bond of union between the infinite and the finite soul from which there can be no *mukti*, because it is an interrelation which makes truth complete, because love is ultimate, because absolute independence is the blankness of utter sterility. The idea in it is the same as we have in the Upanisad that the truth is neither in pure Vidya nor in Avidya, but in their Union.'

রবীন্দ্রনাথের মনোদর্শনের তথা প্রেমদর্শনের মর্মকথা মূলতঃ ইহাই। রবীন্দ্রনাথ মন ছাড়িতে, প্রেম ছাড়িতে, কদাচ চাহেন নাই। ছাড়া যায় না বলিয়াই তাঁহার ধারণা। তিনি বিশ্বাস করেন রূপের সহিত অরূপের, প্রকৃতির সহিত পুরুষের, অহংএর সহিত আত্মার, মানবের সহিত পরমমানবের, সীমার সহিত অসীমের, ছোট-আমির সহিত বড়-আমির আনন্দলীলা অহরহঃই চলিয়াছে, এ চলার বিরাম নাই কোনোকালে। দুই-এর মধ্যে এই মিলন-তত্ত্ব, এই প্রেমতত্ত্ব আনন্দভরে আস্বাদন করাই জীব-জীবনের উদ্দেশ্য, ইহাদের মধ্যে কোনো একটিকে বাদ দিয়া সত্যের সাধনা হইতেই পারে না। দুই-এর মধ্যে যে কোনো একটিতে জীবন সমর্পণ করার জন্যই সংসারে এত দুঃখ, এত মিথ্যা, এত মালিন্য, এত শোক-বিষাদ। অধিকতর বস্তুবাদীরা বস্তুতেই জীবন সমর্পণ করেন, বস্তুর মধ্যে পাইতে চান ঈপ্সিতকে, বস্তুর পর বস্তুর স্তূপ তাঁহাদের বাড়িতেই থাকে, কিন্তু ঈপ্সিতের দর্শন মেলে না কোনোদিন। অপরপক্ষে ঘোরতর তাত্ত্বিক বিশুদ্ধবিদ্যাবাদীরা বস্তু-নিরপেক্ষ তত্ত্বেতেই জীবন সমর্পণ করিয়া বস্তু-বিশ্বকে অস্বীকার করেন, ফলে তাঁহাদের তত্ত্ব জীবন-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ তত্ত্বমাত্রই হইয়া যায়, জগজ্জীবনের কোনোই কাজে আসে না। 'All broken truths are evil' —বলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। উক্ত অভিভাষণের মধ্যেই এক স্থলে আছে :

'Only because we have closed our path to the inner world of *Mukti*, has the outer world become terrible in its exactions. It is a slavery to continue to live in a sphere where things are, yet where their meaning is obstructed. It has become possible for men to say that existence is evil only because in our blindness we have missed something in which our existence has its

truth. If a bird tries to soar in the sky with only one of its wings it is offended with the wind for buffeting it down to the dust. All broken truths are evil. They hurt because they suggest something which they do not offer. Death does not hurt us but disease does, because disease constantly reminds us of health and yet withholds it from us. And life in a half world is evil, because it feigns finality when it is obviously incomplete, giving us the cup, but not the draught of life. All tragedies consist in truth remaining a fragment, its cycle not being completed.'

বেদান্তের 'বিশুদ্ধবিদ্যার' পক্ষ হইতে কাব্যময় এই যুক্তির বিরুদ্ধে কোনোরূপ প্রতিবাদ যে করা চলে না, তাহা বলি না। কিন্তু প্রতিবাদ আমার উদ্দেশ্য নহে। এই সকল যুক্তি হইতে রবীন্দ্রনাথের মনোদর্শনের ও জীবনতত্ত্বের যে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাহাই মনন ও গ্রহণ করা আমার উদ্দেশ্য। মনোজীবনের মধ্যে থাকিয়াই মনোগত যে পূর্ণ-সত্যের ইঙ্গিত কবিগুরু দিতেছেন, জীব-জীবনের পক্ষে তাহা বিশেষভাবে কার্যকরী বলিয়াই আমি মনে করিয়াছি। যে মনের কোনো বন্ধন নাই সেই মন আত্মার মতই সর্বত্র ব্যাপ্ত হইতে চাহে। কিন্তু পূর্ণভাবে, যথার্থভাবে, হইতে পারে না বলিয়াই গতির তাহার অন্ত থাকে নাই। অবারিত গতিবেগে বিশ্বগত মন কি চাহে? চাহে পূর্ণ সত্যকে। মন এই পূর্ণসত্যকে পূর্ণভাবে কখনও পাইতে পারে কি না পারে, সে কথা লইয়া তর্ক উঠিতে পারে, কিন্তু বন্ধনহীন মন যে রূপে রসে ধর্মে কর্মে অহরহঃ সেই পূর্ণকেই প্রার্থনা করে, সে বিষয়ে তো কোনোই সংশয় নাই। মন বলে, সত্যের অংশটুকু লইয়া নহে, সত্যের পূর্ণরূপ লইয়াই জীবনের আনন্দ, রসের উল্লাস।

মনোজীবনের কোনো একটি বিশেষ আবেগে, বিশেষ কোনো ভাবমূর্তিতে পূর্ণের আভাস মাত্র থাকিতে পারে, কিন্তু বিশুদ্ধ সেই পরম পূর্ণকে নির্দিষ্ট কোনো আবেগের দ্বারা তো ধরা যাইবে না। অথচ মনের যখন পূর্ণের উপরই রহিয়াছে আকর্ষণ, তখন সে চঞ্চল না হইয়া থাকে কেমন করিয়া? এইজন্যই তো বিশেষে আসক্ত হইয়া নিশ্চল হওয়া তাহার স্বভাবে যেন খাপ খায় না। মন, বিশেষ করিয়া মনের মন, খণ্ডে মগ্ন হইয়া, বিশেষে লিপ্ত হইয়া, বেশিক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে না, পরন্তু বিশেষ হইতে বিশেষান্তরে তথা অশেষের অন্তহীন

পদ্মানুসরণে জীবনপান্থকে 'হেথা নয়, হেথা নয়' বলিয়া অহরহঃই 'অন্য কোথাও' টানিয়া লইয়া চলে। এই চলার লীলা শুধু রবীন্দ্রজীবনের লীলা নহে—পরন্তু জগৎসৃষ্টি-ব্যাপারে এই নিত্যলীলার তত্ত্ব রহিয়াছে নিহিত। এই যে চলার লীলা, এই যে আসা-যাওয়ার আনন্দলীলা, আবেগলীলা—অপার ইহার মাধুর্য-মহিমা। বাউলের ভাষায়: 'এই কমলের যে এক মধু, রস যে তায় বিশেষ'। এই রস ত্যাগ করিতে চাহে না মন ভ্রমর, সে আসে, সে আসে রসাস্বাদনে, তাই কমলও ফুটিয়া চলে যুগ যুগ ধরিয়া—'উপায় কি করি'?

সৃষ্টির নিত্যলীলা ও রবীন্দ্রমানসে নিত্যগতি

সৃষ্টিলীলার এই তত্ত্ববাণী কবিগুরুর বিচিত্র কাব্যসৃষ্টি সম্বন্ধেও প্রযোজ্য বলিয়া মনে করি। কবিগুরুর কাব্যশিল্পের সমগ্রতার বাণী ও ব্যঞ্জনা বস্তুতঃ ইহাই। কমল কতভাবে ফুটিতেছে, ফুটার তাহার শেষ নাই—কবিমনেরও তাই তৃপ্তি নাই ক্ষণকাল। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে কবির সমগ্র কাব্যগ্রন্থের মনোদর্শন আলোচনাকালে উপযুক্ত তথ্য ও যুক্তি দ্বারা এই বিষয়টি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিব। তাহাতে আমি এই সত্যটি স্পষ্টভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিব যে, কবিগুরুর সমগ্র কাব্যাবলী যেন একখানি জীবনকাব্য, ইহার বিষয় 'জীবন', বক্তব্য 'প্রেম', প্রতিপাদ্য 'প্রেমের ঐক্যতত্ত্ব'। খণ্ড-খণ্ডভাবে রবীন্দ্রকাব্য পড়িয়া গেলে পাঠক, মহোদয় যে এই প্রেমতত্ত্বের আভাস পাইবেন না, তাহা নহে, তবে সমগ্র কাব্যাবলীর অখণ্ড রূপে যে পূর্ণ কাব্যমানস প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার আবেদনের মধ্যে এই তত্ত্ব অভিনব বৈচিত্র্যের ঔজ্জ্বল্যে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে দেখিবেন। একক কোনো বিশেষ কাব্যপাঠে, যেমন ধরুন 'মানসী' পাঠে, পাঠক যে কাব্যরস ও জীবনের বাণী পাইবেন না, তাহা বলি না, কিন্তু যে আংশিক জীবনের বাণী মানসীর কাব্যে রূপ লইয়াছে, তাহাকেই যদি জীবনের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি মনে করিয়া মনোজীবনের প্রেমাভিমান, দ্বন্দ্ব ও নৈরাশ্যকেই একমাত্র সত্য বলিয়া পাঠক গ্রহণ করিতে থাকেন, তবে বিশেষ একটা জীবনবাদ তাঁহার হয়তো আয়ত্ত হইতে পারে, কিন্তু রবীন্দ্র-জীবন-তত্ত্বের পূর্ণাঙ্গসুন্দর রূপমহিমা তিনি দেখিলেন বলিয়া ধারণা করিব না। ঠিক এইভাবে 'গীতিমাল্যের' মর্মগত আত্মসাধনার বাণী-ঝংকারে পাঠকমহাশয়ের যদি মনে হয় যে, কবি সাময়িকভাবে দ্বন্দ্বসঙ্কুল জীবন হইতে পলায়ন করিয়া কর্মবিমুখ 'আত্মকেন্দ্রিক রসসাধনায়' [রবীন্দ্রসাহিত্য পরিক্রমা—২য়, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য] মগ্ন হইয়াছেন, অথবা রবীন্দ্রনাথের প্রেম অহংজীবন হইতে একান্তভাবেই বিশ্লিষ্ট [*The Philosophy. of Rabindranath*, Dr. Radhakrishnan], অথবা গীতিমাল্য-জাতীয় রচনা রবীন্দ্রনাথেরই যেন রচনা নহে [রবীন্দ্রকাব্য-প্রবাহ, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী, ১ম সং, ভূমিকাংশ], তবে রবীন্দ্রনাথের প্রেমতত্ত্বে পাঠক-মহোদয়ের এখনও অধিকার হয় নাই বলিয়াই মনে করিতে থাকিব। আসল কথা, রবীন্দ্র-কল্পিত প্রেমের সাধনায় শুধু 'মানসী'র ব্যক্তিগত প্রেমাভিমান কিংবা দ্বন্দ্ব ও নৈরাশ্য নহে,

কবিগুরুর অখণ্ড জীবনকাব্য

পরন্তু 'সোনার তরী'র বিশ্বগত আনন্দোপলব্ধি ও 'প্রেমোদ্দেশ' যাত্রার যৌবনাবেগও সত্য; শুধু 'চিত্রা'-'কল্পনা'র কল্পলোকগত রূপোদ্বেজনা ও রূপ হইতে অরূপের আনন্দাস্বাদন নহে, পরন্তু 'চৈতালী'-ক্ষণিকা'র সাধারণ-জীবনগত প্রেমমনোভাবের শিল্পসৌন্দর্যও সত্য; শুধু 'খেয়া'-'গীতিমাল্যে'র মর্মগত ব্যষ্টি-জীবনপ্রস্তুতির আনন্দসাধনা নহে, পরন্তু 'বলাকা'-'পূরবীর' মৃত্যুত্তীর্ণ উদার দর্শনোপলব্ধির সর্বজীবনগত প্রেমপ্রতিভাও সত্য; শুধু 'মহুয়ার' মৃত্যুঞ্জয় মানবপ্রকৃতির অন্তর্মুখী পৌরুষদীপ্তি ও বসন্তোল্লাস নহে, পরন্তু 'বনবাণী'র সংগ্রামচঞ্চল অরণ্য-প্রকৃতির বহির্মুখী প্রাণসাধনার যৌবনোলব্ধিও সত্য। সর্বানুভূ প্রেমের মধ্যে ইহারা অহংএর সহিত আত্মার মত, সীমার সহিত অসীমের মত একত্র আলিঙ্গিত রহিয়া পূর্ণ এক অখণ্ড জীবনসত্যের মহিমাই 'পরিশেষে' প্রকাশ করিয়াছে। যে মনখানি অহংএর মোহ হইতে উদ্বুদ্ধ হইয়া নানা সংশয়, নানা দ্বন্দ্ব ও নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে, মৃত্যুর শোক ও বিচ্ছেদের অনন্ত বেদনা অতিক্রম করিতে করিতেই উপলব্ধি করিয়াছে মৃত্যুহীন মহাজীবনের অখণ্ড আনন্দ, মর্মগত জীবনপ্রস্তুতির অধ্যাত্মসাধনায় শক্তিমান হইয়া প্রেমাভিমুখী হইয়াছে অন্তহীন অটল বিশ্বাসে, বিচিত্র সেই মনের অনন্ত ভাবানুভূতির অনিন্দনীয় শিল্পরূপ পূর্ণাঙ্গসুন্দর একটি অখণ্ড জীবন-তত্ত্বেরই ইঙ্গিত করিয়া যায়।

কাব্যে অখণ্ড জীবন-তত্ত্ব

এই অখণ্ড জীবন-তত্ত্বের আনন্দকে জানিতে হইলে কবির কাব্যসৃষ্টির সমগ্রতার প্রতি দৃষ্টি অবশ্যই দিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেও একথা একাধিক ক্ষেত্রে প্রকাশ করিয়াছেন [বঙ্গভাষার লেখক]। বস্তুতঃ, সমগ্রকে না জানিলে রবীন্দ্রকল্পিত প্রেমের পূর্ণ স্বরূপোলব্ধি শুধু কথার কথা মাত্র। আবার এই প্রেমের স্বরূপ যাঁহার জানা হয় নাই, রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও দর্শনের রস বা সত্যোপলব্ধি তাহার পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর নহে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য এবং কাব্য হইতে মনোদর্শন বিচারকালে প্রেমের তত্ত্ব সম্যগ্‌ভাবে জানিতেই হয়। এই প্রেমের বিচিত্ররূপ, বিচিত্রের মধ্যে আবার সর্বানুভূ এক বিভুরূপ। এই বিশ্বরূপের বৈচিত্র্য তথা বিভুরূপের একত্ব আস্বাদন রবীন্দ্র-মনোদর্শনের আনন্দময় ফলশ্রুতি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সংক্ষিপ্ত আত্মকথায় লিখিতেছেন :

রবীন্দ্রনাথের প্রেমভাবনা

'আমার মধ্যে আমার অন্তর্দেবতার একটি প্রকাশের আনন্দ রহিয়াছে—সেই আনন্দ, সেই প্রেম আমার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, আমার বুদ্ধি মন, আমার নিকট প্রত্যক্ষ এই বিশ্বজগৎ, আমার অনাদি অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যৎ পরিপ্লুত করিয়া আছে। এ লীলা ত আমি কিছুই বুঝি না, কিন্তু আমার মধ্যেই নিয়ত এই এক প্রেমের লীলা।

'আমার মধ্যে এই যাহা গড়িয়া উঠিতেছে এবং যিনি গড়িতেছেন, এই উভয়ের মধ্যে যে একটি আনন্দের সম্বন্ধ, যে একটি নিত্য প্রেমের বন্ধন আছে, তাহা জীবনের সমস্ত ঘটনার

মধ্য দিয়া উপলব্ধি করিলে সুখদুঃখের মধ্যে একটি শান্তি আসে। যখন বুঝিতে পারি, আমার প্রত্যেক আনন্দের উচ্ছ্বাস তিনি আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন, আমার প্রত্যেক দুঃখ বেদনা তিনি নিজে গ্রহণ করিয়াছেন, তখন জানি যে, কিছুই ব্যর্থ হয় নাই, সমস্তই একটা জগদ্ব্যাপী সম্পূর্ণতার দিকে ধন্য হইয়া উঠিতেছে।

'আমি হইয়া উঠিতেছি, আমি প্রকাশ পাইতেছি! আমার মধ্যে কি অনন্ত মাধুর্য আছে, যেজন্য আমি অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অগণ্য সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারকার সমস্ত শক্তিদ্বারা লালিত হইয়া, এই আলোকের মধ্যে, আকাশের মধ্যে চোখ মেলিয়া দাঁড়াইয়াছি আমাকে কেহ ত্যাগ করিতেছে না।

'প্রকৃতি তাহার রূপরসবর্ণগন্ধ লইয়া, মানুষ তাহার বুদ্ধিমন, তাহার স্নেহপ্রেম লইয়া আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে—সেই মোহকে আমি অবিশ্বাস করি না, সেই মোহকে আমি নিন্দা করি না। তাহা আমাকে বদ্ধ করিতেছে না, তাহা আমাকে মুক্তই করিতেছে, তাহা আমাকে আমার বাহিরেই ব্যাপ্ত করিতেছে। নৌকার গুণ নৌকাকে বাঁধিয়া রাখে নাই, নৌকাকে টানিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছে।

'প্রেম প্রেমের বিষয়কে অতিক্রম করিয়াও ব্যাপ্ত হয়। জগতের সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া, প্রিয়জনের মাধুর্যের মধ্য দিয়া ভগবানই আমাদিগকে টানিতেছেন, আর কাহারো টানিবার ক্ষমতাই নাই। পৃথিবীর প্রেমের মধ্য দিয়াই সেই ভূমানন্দের পরিচয় পাওয়া, জগতের এই রূপের মধ্যেই সেই অপরূপকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা, ইহাকেই ত আমি মুক্তির সাধনা বলি।' [বঙ্গভাষার লেখক]

রবীন্দ্রনাথের এই মুক্তি-সাধনার উদ্দেশ্য বুঝা যাইতেছে, সকলের সহিত যুক্ত হওয়া, সকলের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়া। এই সকলের সহিত যুক্ত হওয়ার আনন্দ সাধনায় একদিকে যেমন 'নেতি আদেশ' বরণীয় নহে, অপরদিকে তেমনি প্রেমের কোনোপ্রকার আসক্তি অথবা সামাজিক নীতিবাগীশতাও গ্রহণীয় নহে। যাহা শুভ, যাহা রুচি-সুন্দর, যাহ শিল্প-শোভন, যাহা প্রেরণাপ্রদায়ী, তাহাই বরণীয়, করণীয় ও স্মরণীয়। সামাজিক নীতিধর্ম তাহাতে যদি মর্যাদা পায় তো খুবই ভালো, কিন্তু সামাজিক প্রচলিত নীতিধর্মেব অনুশাসনে অথবা তত্ত্বগত নেতিধর্মের কৃচ্ছ্রসাধনায় রবীন্দ্রনাথের প্রেমধর্ম মুহূর্তকালও পরিচালিত হইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের প্রেমদর্শনে যৌনপ্রেম লক্ষ্য নহে এ কথা অবশ্যই সত্য, কিন্তু যৌনপ্রেমকে ইহা অস্বীকারও করে নাই। দার্শনিক রাধাকৃষ্ণন ধারণা করিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথের প্রেমে যৌনবোধের কোনো বালাই নাই বলিয়াই সাধারণে তাহাকে স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারে না।

'Rabindranath's love is a spiritual love above sex, unintelligible to the world at large.' [*The Philosophy of Rabindranath*]

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রেম যে অহং হইতে আত্মা পর্যন্ত সুপ্রসারিত আনন্দপ্রেম—কোনো বিষয়ে ইহার ঘোরতর উপেক্ষা নাই, কোনো বিষয়ে ইহার ঘোরতর আসক্তিও নাই এবং এই কারণেই যে রূপ হইতে রূপে ও বিচিত্র বিষয়ে অহরহঃ অবাধ গতিবেগে ইহা অগ্রসর হইতে পারিয়াছে—এই মূল কথাটি যদি স্বদেশের দার্শনিকবৃন্দও না অনুভব করেন, তবে তো তাঁহারা বিদেশীয় লেখকদের ন্যায় কবিকে শুদ্ধ মাত্র 'বেদান্তিস্ট' বলিয়া কিংবা 'মিস্টিক্' বলিয়া অথবা 'রিলিজিয়াস্' বলিয়া তাঁহার অধ্যাত্মবাদী বচনগুলিকেই কেবল স্বীকার করিবেন। কিন্তু পাঠক অবশ্যই জানেন রবীন্দ্রনাথের কাব্যদর্শন হইতে পৃথিবীর প্রেম, তাহার মোহ, সংশয়, তাহার সুখদুঃখ, আশানৈরাশ্য, তাহার শোক, বৈরাগ্য প্রভৃতি বিচিত্র আবেগকে কিছুতেই বাদ দেওয়া যায় না। 'মিস্টিক' ও 'রিলিজিয়াস্' প্রেমের গতানুগতিক সংস্কারে কেমন করিয়া এই পৃথিবীর প্রেমকে ধরা যাইবে? তবে তো প্রেমদর্শন সম্পর্কে আমরা এতদিন ভুল ধারণা করিয়াছি? দার্শনিক রাধাকৃষ্ণনের ন্যায় আমাদের মধ্যে যাঁহারা রবীন্দ্রনাথে অধ্যাত্মপ্রেমই দেখিয়াছি, তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের কাব্যগত সাধারণ মানবপ্রেমকে আমল দিই নাই; আবার সাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশীর মত যাঁহারা পৃথিবীর প্রেমকেই লক্ষ্য করিতে গিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মপ্রেমের আনন্দকে উপেক্ষা করিতে দ্বিধা করি নাই। ইহার ফল হইয়াছে এই—আমরা আমাদের অজ্ঞাতসারেই, রবীন্দ্রকাব্য ও দর্শন সম্পর্কে নানা জটিলতার জন্মই দিয়াছি; ভুলও বুঝিয়াছি নানা ক্ষেত্রে। কেহ বলিয়াছি: পরস্পরবিরোধী নানা ভাবে পরিপূর্ণ রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাহিত্য; কেহ বা আবার এই পরস্পব-বিরোধিতার একটি বুদ্ধিগত ব্যাখ্যা দিতে গিয়া বলিয়াছি: রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক হিসাবে ভাগবতমুখী এবং কবি হিসাবে মানবমুখী। অর্থাৎ তিনি দার্শনিককবি নহেন, কবিদার্শনিকও নহেন, তিনি কবি এবং দার্শনিক। তাৎপর্য এই: আমাদের ভিতর কেহ কেহ কবির মধ্যে পরস্পরবিরোধী দুই ব্যক্তিত্ব অনুমানে দ্বিধা করি নাই।

রবীন্দ্র-প্রেমের স্বরূপ বিচার

রবীন্দ্রনাথের প্রেমতত্ত্ব স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিলে এই সমস্ত আংশিক ব্যাখ্যায় বা অনুমানে আর মন ভরিবে না, তখন কবিদার্শনিকের অভিন্নত্ব বুঝিতে কিংবা কবির কাব্যসমূহের ঐক্যতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে কিছুমাত্র ক্লেশ পাইতে হইবে না।

কবিগুরুর প্রেম এক কথায় বা অল্প কথায় স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া বলা সহজ নহে। এই বলিলে কি পাঠকমহাশয়ের মনঃপূত হইবে যে, এই প্রেম 'বন্ধনহীন গ্রন্থি'-বদ্ধ অভিনব এক সর্বানুভূ প্রেম? আনন্দময় এই প্রেম 'মন' ছাড়িয়া নেতি-তত্ত্বে নির্বাণ চাহে না—এইজন্য ইহাকে বলিতেছি 'গ্রন্থি-বদ্ধ', আবার গতিময় এই প্রেম মনের কোনো কোঠায় কোনোরূপ বন্ধন স্বীকার করে না বলিয়া ইহাকে মনে হইতেছে 'বন্ধনহীন'। কোনোরূপ তত্ত্ববন্ধন বা

প্রেম—'বন্ধনহীন গ্রন্থি'

ধর্মসংস্কার স্বীকার না করায় ইহা 'বন্ধনহীন'ই বটে, আবার মধুলুব্ধ ভ্রমরের মত রসের কমল ত্যাগ না করায় ইহাকে 'গ্রন্থি-বদ্ধ'ও বলা যায়।

এই 'প্রেম', রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন,—'প্রেমের বিষয়কে অতিক্রম করিয়াও ব্যাপ্ত হয়।' ইহার অপর নাম তিনি দিয়াছেন 'আনন্দ'। বলাই বাহুল্য, এই আনন্দই তাঁহার 'প্রেমব্রহ্ম'। ইহার আলোকে, ইহার স্পর্শে সকলই আনন্দ। প্রকৃতি আনন্দ। বিশ্ব আনন্দ। মানব আনন্দ। মানবের কামমোহ, সুখদুঃখ, প্রেমবৈরাগ্য সকলই আনন্দ। এইজন্য এসকল হইতে বিযুক্ত হওয়া নহে, ইহাদের সহিত যুক্ত হওয়াই মানসবেদের সাধনাদর্শ। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন :

'এই বিশ্বকে গ্রহণ করিয়া, এই সংসারকে বিশ্বাস করিয়া, এই প্রত্যক্ষকে শ্রদ্ধা করিয়া আমরা যথার্থভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে পারি'। [বঙ্গভাষার লেখক]

অন্যত্র আবার :

> 'To know Him in this life is to be true ; not to know Him in this life is the desolation of death. How to know Him then ? By realising Him in each and all. Not only in Nature, but in the family, in society and in the state, the more we realise the world-consciousness in all, the better for us. Failing to realise it we turn our faces to destruction. [*Sadhana*]

পুনশ্চ—

> Our society exists to remind us, through its various voices, that the ultimate truth in man is not in his intellect or his possessions , it is in his illumination of mind, in his extension of sympathy across all barriers of caste and colour ; in his recognition of the world, not merely as storehouse of power, but as a habitation of man's spirit, with its eternal music of beauty and its inner light of the divine presence'. [*Creative Unity.*]

এই 'Inner Light' বা গুহাহিত জ্যোতির একটি সুন্দর ব্যাখ্যা 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে পাইয়াছি :

'জগতে অনেক গুপ্ত সামগ্রী আছে যার আচ্ছাদন তুলে ফেললেই তা প্রত্যক্ষগম্য হয়ে ওঠে, এ কিন্তু সে রকম নয়—এ আচ্ছন্ন বলে গুপ্ত নয়, এ গভীর বলেই গুপ্ত, সুতরাং একে যখন আমরা জানতে পারি তখনো এ গভীর থাকে।

'মানুষের একটি অন্তরতর ইন্দ্রিয় আছে, তার ক্ষুধাও অন্তরতর, তার খাদ্যও অন্তরতর, তার তৃপ্তিও অন্তরতর।

'এই জন্যই চিরকাল মানুষ চোখের দেখাকে ভেদ করবার জন্যে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। এই জন্য মানুষ, আকাশে তারা আছে, কেবল এইটুকুই মাত্র দেখেই মাটির দিকে চোখ ফেরায় নি, এই জন্যে কোন্ সুদূর অতীত কালে ক্যাল্‌ডিয়ার মরুপ্রান্তরে মেষপালক মেষ চরাতে চরাতে নিশীথ-রাত্রের আকাশ-পৃষ্ঠায় জ্যোতিষ্ক-রহস্য পাঠ করে নেবার জন্যে রাত্রের পর রাত্রে অনিমেষ নিদ্রাহীন নেত্রে যাপন করেছে; তাদের যে মেষরা চরছিল তার মধ্যে কেহই একবারো সেদিকে তাকাবার প্রয়োজন মাত্র অনুভব করে নি।

'কিন্তু মানুষ যা দেখে, তার গুহাহিত দিকটাও দেখতে চায়, নইলে সে কিছুতেই স্থির হোতে পারে না।

'উপনিষৎ তাঁকে বলেছেন—'গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং', অর্থাৎ তিনি গুপ্ত, তিনি গভীর। তাঁকে শুধু বাইরে দেখা যায় না, তিনি লুকানো আছেন। বাইরে যা কিছু প্রকাশিত তাকে জানবার জন্যে আমাদের ইন্দ্রিয় আছে—তেমনি যা গূঢ়, যা গভীর তাকে উপলব্ধি করবার জন্যেই আমাদের গভীরতর অন্তরিন্দ্রিয় আছে। তা যদি না থাকত তা হোলে সে দিকে আমরা ভুলেও মুখ ফিরাতুম না; গহনকে পাবার জন্যে আমাদের তৃষ্ণার লেশও থাকত না।

'গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং'

'এই অগোচরের সঙ্গে যোগের জন্যে আমাদের বিশেষ অন্তরিন্দ্রিয় আছে বলেই মানুষ এই জগতে জন্মলাভ করে' কেবল বাইরের জিনিসে সন্তুষ্ট থাকে নি। মানুষ প্রকাশ্যের চেয়ে গোপনকে কিছুমাত্র কম করে চায় না—এমন কি, বেশি করেই চায়। তার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিরুদ্ধ সাক্ষ্য সত্ত্বেও মানুষ বলেছে দেখতে পাচ্চিনে কিন্তু আরও আছে, শোনা যাচ্চে না কিন্তু আরও আছে।' [গুহাহিত, শান্তিনিকেন,-২য় খণ্ড]

এই 'অরূপমশব্দম্', এই 'গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং', এই গুপ্ত, এই গভীর, এই গহনকে জীব-জীবনে আমরা প্রেমের সাধনার দ্বারা অনুভব করিতে চাহি। প্রেমের টানে বুদ্ধিতে ইহাকে জানিতে চাহি, প্রেমের জ্ঞানে হৃদয়ে ইহাকে মানিতে চাহি, প্রেমের কর্মে জীবনে ইহাকে টানিতে চাহি। এমনি করিয়া প্রেমের সাধনা চলে জীবনে জীবনে। কিন্তু জানার দ্বারা, মানার দ্বারা, টানার দ্বারা, ইহাকে কি সম্পূর্ণভাবে কখনও পাই?

'এ গভীর বলেই গুপ্ত—সুতরাং একে যখন আমরা জানতে পারি তখনো এ গভীর থাকে।'

তাইতো, সহজেই বুঝা যায়, মনোজীবনের নিত্য অনুসন্ধিৎসা, তাহার অন্তহীন বিচিত্র গতি, তাহার অহরহঃ আসা-যাওয়ার অনন্ত আবেগ কিছুতেই কেন থামিতে চাহে

না। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের নিত্য নূতন বৈচিত্র্য এবং দর্শনের আনন্দময় প্রেমগতির মূল রহস্য এইস্থলে কি উদ্ঘাটিত হইতেছে না?

সকল রহস্যের মূলে এই গহন, এই প্রেম। অদ্বৈত এই প্রেমই রূপে রূপে বহুরূপে হইতেছেন প্রকাশিত। রূপে রূপে বহুরূপে যত প্রকাশিত হইতেছেন, ততই গভীর হইতে গভীরতর হইতেছেন এই গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং, এই প্রেম, এই সর্বজগদ্‌গত আনন্দসুন্দর।

এইস্থলে ন্যায়শাস্ত্রের একটি সাধারণ তর্ক পণ্ডিতেরা উত্থাপন করিতে পারেন বলিয়া সন্দেহ হইতেছে। তাঁহারা বলিতে পারেন, ধারণার মধ্যেও যে-অদ্বৈত আসেন তাঁহাকেও যেন প্রেমস্বরূপ বলা চলে না। যুক্তি এই, অদ্বৈতকে প্রেমস্বরূপ বলিলে অদ্বৈত বুঝি আর অদ্বিতীয় থাকেন না, কেননা প্রেমের বিরুদ্ধাচারী অপ্রেমের আর এক অধীশ্বরের কল্পনা যেন বুদ্ধির মধ্যে আসিয়া সমুদিত হয়।

প্রেমের যথার্থ শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হইলে এ সংশয় অন্তরে জাগরিত হইবে বলিয়া আমি মনে করি না। বস্তুতঃ, মনের অনুভব ও যুক্তি এই যে, প্রেম এমনি শক্তিমান যে তাহার মধ্যে সমগ্র বিরোধই সামঞ্জস্যীকৃত হইতে পারে। আপন মহিমায় প্রেম অপ্রেমকেও আলিঙ্গন করে, তাহা না হইলে বুঝিতে হইবে তাহা প্রেমই নহে। যে-প্রেম অ-প্রেমকে দূরে পরিহার করিয়াছে, তাহা প্রেম নহে, তাহা সদসদ্‌ বিচারের একটা সাধারণ লোকজ্ঞান মাত্র। প্রেম কাহাকেও উপেক্ষা করে না, অ-প্রেমকেও না, পরন্তু আপন আনন্দমহিমায় সকল কিছুকেই আপনার মত করিয়া লয়। লোকজ্ঞানকে প্রেম বলিয়া যেখানে ধারণা করা হয়, সেইখানেই প্রেম ও অ-প্রেমের দ্বন্দ্ব কল্পিত হইতে পারে। বলা বাহুল্য, অ-প্রেম ও অসঙ্গতি জাগতিক ও সামাজিক জীবনে দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম আনয়নের জন্যই সৃষ্ট, জগল্লীলার ইহা একটি বিচিত্র ব্যাপার; কিন্তু প্রেমের শক্তি সেই সমস্ত দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের শান্তিময় মীমাংসাকরণেই নিত্য নিরত।

'নিত্য নিরত' শব্দ দুইটি, পাঠক লক্ষ্য করিবেন, ইচ্ছা করিয়াই বসাইয়াছি—বসাইতে পারিতাম 'নিত্য প্রসন্ন'। কিন্তু 'নিরত' কথাটির মধ্যে 'চেষ্টা' ও 'গতি' সূচনা করে। এই চেষ্টা ও গতিই মানবজীবনের পাথেয়। মানুষ মন দিয়া যে প্রেমকে ধরিয়াছে, তাহা যত উচ্চই হউক না কেন, তাহাই কিন্তু চরম নহে। একথা সত্য, বৈষ্ণবসাধকগণ প্রেমকে পুরুষার্থ বলিয়াছেন। 'প্রেমাপুমর্থো মহান্‌'। মাধবেন্দ্রপুরী ঈশ্বরপুরীকে এই আশীর্বাদ দিয়া দীক্ষা দেন: "তোমার হউক প্রেমধন"। যে-প্রেমের কথা বৈষ্ণবগুরুগণ কহিয়াছেন, অথবা প্রেম ও প্রেম-ব্যাকুলতার যে-প্রকাশ বৈষ্ণবগুরুদের মধ্যে আপনি লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা মন দ্বারা আপনি অবশ্যই আস্বাদন করিতে পারেন, কিন্তু যাহা করেন, তাহাই চরম বলিয়া মনে করিতে পারেন না। পূর্বেই ইঙ্গিত দিয়াছি যে, মনের আস্বাদ্য যে প্রেম, বৈষ্ণব-সাধকবর্গের তাহাই পুরুষার্থ নহে, কাম্যও নহে। 'পদাবলী'তে

বৈষ্ণব আদর্শ

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর বাক্য 'হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং ভ্রাম্যতি' [চতুঃশতাব্দধৃত শ্লোক দ্রষ্টব্য] কিংবা শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে শ্রীবিল্বমঙ্গলের বাণী 'কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে' [৪০শ শ্লোক দ্রষ্টব্য] অথবা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুপাদোক্ত অমর বিরহবাণী 'ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ' শ্রীশ্রীমহাপ্রভুপাদোক্ত শ্লোক দ্রষ্টব্য] শুদ্ধমাত্র মানসিক প্রেমভাবের কি বিরহভাবের প্রকাশ নহে।

প্রেমের আদর্শ সম্পর্ক 'প্রেমধর্ম' নামক প্রবন্ধে অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র মহোদয় যাহা বলিয়াছেন তাহা ধীরভাবে প্রণিধানযোগ্য [বৈষ্ণব রসসাহিত্য]। মহাপ্রভুর গোবিন্দবিরহের তীব্রতার কথা উল্লেখ করিয়া অধ্যাপক মিত্র বলিতেছেন : 'শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং—গোবিন্দ বিরহে……সমস্ত জগৎ শূন্য বলিয়া মনে হয়। ইহাই প্রেমের আদর্শ। যে প্রেমে ভগবানকে লাভ করা যায়, যে দুর্লভ প্রেম ভগবানেরও আস্বাদ্য, সে প্রেম কোথায় দেখিতে পাওয়া যায় ?

অকৈতব কৃষ্ণ প্রেম যেন জাম্বুনদ হেম
সেই প্রেম নৃলোকে না রয়।
যদি তার হয় যোগ না হয় তার বিয়োগ
বিয়োগ হইলে কেহ না জীয়য় ॥

"বিরহে হোন্তম্মি ণ কো জীঅই", এমন প্রেম হইলে তার বিরহে কেহ বাঁচিতে পারে না। ইহাই গোপীপ্রেমের আদর্শ।' এই যে প্রেম, 'দুর্লভ প্রেম'—মন দ্বারা ইহার আভাস পাইতে পারি, আস্বাদ পাইতে পারি, কিন্তু পাইতে পাইতে আরো উর্ধ্বে অনুভূতির মার্গ যখন ছাড়িতে চাই, তখন লোকজীবনে প্রেম বলিতে যাহা বুঝি তাহা যেন আর থাকে না; তখন তাহা একপ্রকার অলৌকিক আনন্দভাব যাহাতে 'কামগন্ধ' তো নাইই পরন্তু আমি 'রমণ' কি 'রমণী' এ বোধও নাই। তখন তাহা বিশ্বগত অথচ বিশ্বাতীত এক অভিনব রসানুভূতি যাহার নাম কী দিব বুঝিতে পারি না,—তাহা ঠিক কী, বলা শক্ত। মধ্ব-মত যদি মানিতে হয় তবে বলিতে হইবে তাহার নাম 'শ্রীহরি', চৈতন্যমত যদি মানিতে হয় তবে বলিতে হইবে তাহার নাম 'শ্রীগোবিন্দ'; এবং শ্রুতিমত যদি মানিতে হয়, তবে বলিতে হইবে তাহার নাম নাই, তাহা 'চতুর্থ'। মানুষ যতদিন জগতে আছে, মনের জগতে আছে, ততদিন সে চরমকে পাইতে পারে না, চরমকে একটি মহতী বৃত্তির অনুধ্যানের সহায়তায় মনন ও আস্বাদন করিয়া 'প্রেম' নামে তাহাকে নির্দিষ্ট করিয়া শেষে এই প্রেমকে নানা গুণে, নানা ঐশ্বর্যে বিভূষিত করিয়া ধ্যানে ও মানস-সাধনায় সর্বজগদ্‌গত করিয়া দেখিয়াছে। এই যে সর্বজগদ্‌গত প্রেম, মন-সাধনায় ইহাকেই চরম বলিতে হয় বলুন কিন্তু মানুষ এই চরম প্রেমকে, এই সর্বানুভূ বিভুশক্তি সমন্বিত অপূর্ব প্রেমকে, আজও পায় নাই—তাহার আভাসমাত্রই পাইয়াছে। মানুষের জগতে বিরোধ মেটে নাই—আত্মা-অনাত্মার দ্বন্দ্ব মেটে নাই, হিংসাদ্বেষ, হত্যাকাণ্ড

শেষ হয় নাই, তাইতো মহান্ মানুষের হৃদয়স্থিত প্রেম-ভগবানের আজও নিদ্রা নাই, আলস্য নাই, স্বস্তি নাই; অহরহঃ আজও তিনি সর্ববিরোধের মীমাংসাকরণে 'নিত্যনিরত' রহিয়াছেন।

রবীন্দ্র-প্রেমের লক্ষ্য

প্রেম সমস্যার সমাধান সন্ধান করে, সমাধানে বিশ্বাস রাখে, এইজন্য মীমাংসায় তাহার চেষ্টা ও গতি। প্রসন্নতায় আছে চরমপ্রাপ্তির ইঙ্গিত, কর্মশেষের শান্তি। প্রেমের নির্বেগ শান্তি তো লক্ষ্য নহে; গতির মধ্য দিয়া, সহস্র বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করার মধ্য দিয়া যে শান্তি, মনোময় সেই আনন্দশান্তিই প্রেমের লক্ষ্য।

ঈশ্বরকে এই প্রেমের মধ্যে দেখিলে বুঝা যায় ঈশ্বর অবশ্যই কর্মহীন নহেন। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মেশ্বর বস্তুতঃ নিত্য নিরত, মুহূর্তকাল কর্মহীন নহেন। হেগেলের ঈশ্বরের মত তাঁহার ব্রহ্মেশ্বরও বাধাবিঘ্ন সরাইয়া সরাইয়া পূর্ণের আনন্দরাজ্যে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন। 'কর্মহীন ব্রহ্ম···শূন্যতা', রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন: 'যে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম হতে সমস্ত কিছুই হচ্চে, সেই ব্রহ্মকে এই সমস্ত কিছু বিবর্জিত করে দেখলে সমস্তকে ত্যাগ করা হয়, সেই সঙ্গে তাঁকেও ত্যাগ করা হয়।' [কর্ম, শান্তিনিকেতন-১ম খণ্ড]

যে ব্রহ্ম কর্মহীন নহেন, মন দ্বারা যাঁহাকে ধারণা করিতে, পূজা করিতে, রূপ পরিকল্পনা করিতে আমরা অপারক নহি, দার্শনিক বিচারে সেই ব্রহ্মতত্ত্বকে বৈদান্তিক প্রাণতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব বলিয়া অনেকেই যে তর্ক তুলিবেন, সে কথা আমি পূর্বেই আভাসে জানাইয়াছি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই ব্রহ্মেশ্বর-তত্ত্ব জগৎ-জীবনে যে বিশেষ কার্যকরী, দার্শনিকগণ তা' অবশ্যই অস্বীকার করিবেন না। প্রেমানন্দের

প্রেম ও কর্ম

আবেগে উচ্চতর কর্ম করিতে করিতে ব্রহ্মাভিমুখী হওয়াই জাগতিক জীবনের পরম ধর্ম। ঈশ্বর তো মানুষের আদর্শ—সাধনার দ্বারা ঈশ্বরকল্প হইতে চাওয়াই তো জীবন। Plotinus বলিতেন, ঈশ্বরকে জানিতে হইলে সাধনার স্বভাবে মনকে দীক্ষিত করিয়া স্বর্গীয়তা অর্জনে কর্ম করিতে হইবে। একটি সুন্দর উপমার দ্বারা তিনি তাঁহার এই বক্তব্যটি প্রকাশ করিয়াছেন। নয়ন যেমন তপনকল্প না হইলে তপনসুন্দরের পূর্ণরূপ পায় না দেখিতে, আত্মা তেমনি সাধনার দ্বারা ঈশ্বরকল্প না হইলে ঈশ্বরের পায় না দর্শন।

> 'Even as the eye could not behold the Sun unless it were itself sunlike, so neither could the soul behold God if it were not Godlike.' [*Christian Mysticism.*]

দার্শনিক Lotze অবশ্য এই উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন। বলিয়াছেন তিনি:

> ' It is vain to call the eye sunlike, as if it needed a special occult power to copy what it has itself produced : fruitless are

all mystic efforts to restore to the intuitions of sense, by means of a secret identity of mind with things, a reality outside ourselves.' [*Christian Mysticism*]

রবীন্দ্রনাথ জীবন-বহির্ভূত কোনও তত্ত্ব, 'a reality outside ourselves' মানিতেন না বটে, কিন্তু Potinus-এর উক্তির বিরুদ্ধে Lotze-র ন্যায় প্রতিবাদ অবশ্যই করিতেন না। Potinus-এর আধ্যাত্মিক কর্মবাদের তথা সাধনতত্ত্বের মর্মকথাটি সহজ আনন্দেই ধরিয়া ফেলিয়া অবশ্যই তিনি বলিতেন: সত্যই তো, তপন না হইলে তপনসুন্দরকে দেখিব কী করিয়া? প্রেম না হইলে কেমন করিয়া পাইব প্রেম? পূর্ণভাবে এখনও হই নাই, তাই তো আজও ছুটিয়াছি, নানা কর্মে, নানা ধ্যানে, নানা অভিজ্ঞতায়, নানা চেতনার বিশ্বাসে হইতে-হইতে আজও ছুটিয়াছি।

মনোজীবনে এই যে ছোটার তত্ত্ব, এই যে গতি-দর্শন, ইহার সার কথা হইতেছে সাধনার দ্বারা ক্রমশঃ 'Godlike' হওয়া,—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'শিবমানব,' পরমমানব হওয়া, অর্থাৎ সকলের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়ার সাধনাদ্বারা 'প্রেম' হওয়া। মনোজীবনে 'হওয়া'টাই, হইতে-হইতে চলাটাই, বড় সত্য; পাইয়া-যাওয়া, পাইয়া শেষ হইয়া-যাওয়া, পরমামুক্তির আনন্দে লীন হইয়া যাওয়া, অর্থাৎ ব্রহ্মতে ব্রহ্ম হইয়া যাওয়া, বড় কথা নহে। মনোজীবনে সার কথা প্রেম। প্রেম হইতে হইলে তাই নিত্য দেওয়া, নিত্য চলা, নিত্য সাধনা। বস্তুতঃ নিত্য কর্ম, নিত্য চলা, নিত্য সাধনাই মনের ধর্ম, তথা প্রেমের ধর্ম। St. Ignatius-এর প্রেম-তত্ত্বেও এই চলার তত্ত্ব পাইয়াছি। তিনি বলেন: প্রেম যেন অনন্ত চক্রপথ—ভালো হওয়ার মধ্য দিয়া, ভালো হইতে আরো ভালোর পথে নিত্য অগ্রগতিই প্রেমের ধর্ম। প্রেমের মলিনা বাসনা অর্থাৎ মোহজ জৈবপ্রেম যখন রূপান্তরিত হয়, St. Ignatius-এর ভাষায়, প্রেম যখন, 'Crucified' হয়, তখনই তাহা হইতেছে—

'An eternal circle from goodness, through goodness, and to goodness.' [*Christian Mysticism*]

এই সত্য ও শিবের পথে প্রেমের নিত্য অগ্রগতি—কেননা প্রেমই সত্য ও শিব। আপন স্বরূপোপলব্ধির জন্যই জীবাত্মার মধ্য দিয়া প্রেম অহরহঃ অগ্রসর হইয়া চলে। এই প্রেমের দৃষ্টিতে জগৎব্রহ্মাণ্ড সত্য তো বটেই, সুন্দরও বটে। শুধু এশিয়ার নহে, ইউরোপেরও বহু অধ্যাত্মবাদী এ সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন। Dionysius বলিতেন:

পাশ্চাত্ত্য অধ্যাত্মবাদী

'The Good and Beautiful are the cause of all things that are; and all things love and aspire to the Good and Beautiful which are, indeed, the sole objects of their desire. Since, then,

the Absolute Good and Beautiful is honoured by eliminating all qualities from it, the non-existent also must participate in the Good and Beautiful.'

সংসারে যাহা কিছু দেখিতেছি—ভালো মন্দ সমস্তই সেই সত্যশিবসুন্দরের প্রকাশ, এই যে ভাব, এই যে দৃষ্টি, বলাই বাহুল্য, ইহা প্রেমের দৃষ্টি। ইহার আলোকে, আপাতঃ-দৃষ্টিতে যাহা মন্দ বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহাও ভালো। বস্তুতঃ, মন্দ বলিয়া যাহা মনে করি, খণ্ড দৃষ্টিতে, সাময়িক দৃষ্টিতে দেখি বলিয়াই তাহা মন্দ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকে। ঈশ্বর তথা প্রেমের দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী বলিয়া মন্দও মন্দ নয়, পরন্তু জগৎধর্মের বিপুলায়তন রূপপ্রকাশের ভূমিকায় কোথাও না কোথাও অপূর্ব উপায়ে মন্দ ভালোর সহিত সমঞ্জসীকৃত হইয়া রহিয়াছে। এই তত্ত্বটি মনে রাখিয়াই প্রাচীন Dionysius বলিয়াছেন : 'God sees evil as good.'। সান্ত্বনার কথা এই, আধুনিক যুগের অদ্বয়বাদী Bradley-ও তাঁহার নিজস্ব ভঙ্গী ও ভাষায় এই তত্ত্ব স্বীকার করিতে চাহিয়াছেন।

অখণ্ডজীবনের এই যে ধ্যান ও বিশ্বাস, ইহার জ্যোতি কে দর্শন করে? রবীন্দ্রনাথ বলিবেন, 'প্রেম'। এই প্রেমের উদ্বোধনে প্রথমে দ্বন্দ্ব, সংশয়, তাহার পর স্বরূপোপলব্ধির পথে ক্রমশঃ অগ্রগতি। প্রথমে খণ্ডবোধের মোহে দ্বন্দ্ব, হাহাকার, পরে অখণ্ডবোধের আনন্দে ভালোমন্দ সকলের মধ্যেই সর্বগত জীবনদর্শন—St Augustine কতকটা এই-ভাবেই তাঁহার প্রেমোপলব্ধির কথা লিখিয়াছেন। প্রেমের উদ্বোধনে প্রথমে তাঁহার মনে হইয়াছে—ঈশ্বর হইতে তিনি কত পৃথক, কত ক্ষুদ্র—আবার প্রেমের মাহাত্ম্যেই তাঁহার মনে হইয়াছে, তিনি ঈশ্বরস্বরূপ, তিনি জ্যোতির্ময়।

> 'Love knows the light. What is this which flashes in upon me, and thrills my heart without wounding it? I tremble and I burn, I tremble, feeling that I am unlike Him; I burn, feeling that I am like Him.' [*Christian Mysticism*]

খৃষ্টধর্মাবলম্বী মিস্টিক্‌দের অনেকেই প্রেমকেই সকল ধর্মের সার ধর্ম বলিয়াছেন। Tauler বলিয়াছেন :

> 'Love is the beginning, middle and end of virtue.'

William Ralph Inge তাঁহার ***Christian Mysticism*** গ্রন্থে অসংখ্য মিস্টিক্-এর বাণী ও দর্শন লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। Inge তাঁহার গ্রন্থে Tauler-এর উপর্যুক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন :

'Its (love's) essence is complete self-surrender. We must lose ourselves in the love of God as a drop of water is lost in the ocean.'

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি ইংরেজী গান স্মরণ করুন :

'Give me the strength to raise my
mind high above daily trifles.
And give me the strength to surrender
my strength to thy will with love.'

ইচ্ছা করিয়াই রবীন্দ্র-অনূদিত 'গীতাঞ্জলি'র একাংশ উদ্ধৃত করিলাম। খৃষ্টধর্মাবলম্বী সাধকদের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের উপর প্রভূত পরিমাণে পড়িয়াছে বলিয়া একসময়ে ইউরোপে কেন যে অনেকের ধারণা হইয়াছিল, তাহার কারণ এই ইংরেজী রচনার মধ্য হইতে কিছুটা ধরা যাইতে পারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পাঠককে অবশ্যই স্মরণে রাখিতে হইবে যে, খৃষ্টের প্রেমভাবের সহিত রবীন্দ্রনাথের প্রেমভাবের কতকাংশে সাদৃশ্য থাকিলেও খৃষ্টান মিস্টিকদের প্রেম ও রবীন্দ্রপ্রেম এক বস্তু নহে। খৃষ্টানদের প্রেমের মধ্যে একটি তত্ত্ব-বন্ধন আছে, রবীন্দ্রনাথে সেটি আদৌ নাই। পৃথিবীর নানা বাণী, নানা পথ ও নানা মত হইতে রবীন্দ্রনাথ প্রভূত সম্পদ গ্রহণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু যাহা তাঁহার জীবনদর্শনের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই, তাহা অচিরাৎ বর্জন করিয়া আপন সহজানন্দে অগ্রসর হইয়াছেন। শুধু খৃষ্ট বা খৃষ্টধর্মাবলম্বী প্রেমপথিক সাধুদের নিকটই নহে, বুদ্ধ, চৈতন্য, একনাথ, কবীর, দাদূ প্রভৃতি বহু মানবপ্রেমিকের অসংখ্য দিব্য বচনের জ্যোতিরাশীর্বাদেও তিনি উজ্জ্বল। কিন্তু সকলের বড় কথা হইতেছে তাঁহার নিজের জীবনবাদ—তাঁহার আপন জীবনানুগ গতিময় আনন্দপ্রেম। এই প্রেমধ্যানে যে যখন সাহায্য করিয়াছে, তিনি দুই হাত পাতিয়া তাহা লইয়াছেন, কিন্তু বিশেষ কোনো তত্ত্বে বা বাণীর মোহে কুত্রাপি থামিয়া যান নাই।

এই থামিয়া-না-যাওয়াই রবীন্দ্রকল্পিত প্রেমের কর্ম এবং ধর্ম। ব্রহ্ম কর্মহীন নহেন—প্রেমব্রহ্ম সাধককেও নিষ্কর্মা থাকিতে কখনও দেন না। অহরহঃ কর্মে, ধর্মে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে প্রেমোপাসককে তাই চলিতেই হয়। বর্তমান গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসমূহ হইতে এই প্রেমগতির তত্ত্ব আলোচনা আমি করিব। এই তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্য সম্পর্কেও যে প্রযোজ্য, ইহা বলাই বাহুল্য। লেখকের বিচারে রবীন্দ্রনাট্যের বাণী রবীন্দ্রকাব্য হইতে তত্ত্বতঃ পৃথক নহে। প্রেমজীবনের বিচিত্র গতি ও প্রকৃতিই রবীন্দ্রনাট্যে নানাভাবে রূপায়িত হইয়াছে। রবীন্দ্রসাহিত্যে ও দর্শনে প্রেম ছাড়া যেন কথা নাই। কেমন প্রেম?

গতিধর্মী বিভুপ্রেম। এই প্রেমের দর্শন মেলে কর্তব্যনিষ্ঠায়, কল্যাণকর্মে, আত্মত্যাগে, মনুষ্যত্বের বিকাশে, অহংকারের বিনাশে, মৃত্যুর আনন্দে। অহংমত্ত জৈব বাসনা মানুষকে যেখানে কর্ম ও কর্তব্যের জগৎ হইতে দূরে সরাইতে চাহে, প্রেম সেখানে হয় পীড়িত, সেখানে তাই জাগে অকল্যাণ, অযথা বিরোধ, অন্যায়, অনাচার, বিয়োগান্ত পরিণতি ['রাজা ও রাণী']। সংস্কারাচ্ছন্ন মন পুরাতন পন্থাকেই চিরন্তন সত্য মনে করিয়া কূপমণ্ডূক সংকীর্ণ জীবন লইয়া থাকিতে চাহে, কিন্তু ধর্ম, ধ্যান, তপ,জপ সমস্তই মিথ্যা হয়—যদি না সেসব মানুষের কল্যাণকর্মে হয় নিয়োজিত। সত্যকার ধর্ম হইতেছে প্রেম, যা সকল মানুষের সুখ দুঃখ, ভালোমন্দ লইয়া নিত্য কর্মরত, সাধনতৎপর ['মালিনী']। এই প্রেম বাহিয়া চলে জীবনের পথ, মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশেই ইহার আনন্দ, জাতি-সংস্কারের সংকীর্ণতা ভেদ করিয়া 'মানুষ সবার বড়' বলিতে বলিতে অহরহঃ ইহার অগ্রগতি ['চণ্ডালিকা']। সংস্কার এই প্রেমের পথে বাধা দেয় বিস্তর ['বিসর্জন'], শক্তির মত্ততাও অস্ত্র হানে প্রেমের বরাঙ্গে ['রক্তকরবী'], কিন্তু অবশেষে প্রেমের জয়ই ঘোষিত হয়। এই প্রেম "মানুষের মর্মগ্রন্থি টেনে ছিঁড়ে সেইখানে 'সন্ন্যাসী'র কেঠো আইডিয়ার ব্যাণ্ডেজ বেঁধে অসহ্য ব্যথার 'পরে মস্ত মস্ত বিশেষণ চাপা দিতে" ['বাঁশরি'] চায় না সত্য, কিন্তু 'একজন মানুষকেই আসক্তির দ্বারা ঘিরে নিবিড় স্বাতন্ত্র্যে অতিকৃত' করাও এ প্রেমের ধর্ম নয়। 'ভালোবাসা নইলে দুজন মানুষকে মেলানো যায় না' এ কথা যেমন সত্য, 'ভালোবাসার মিলনে মোহ আছে, প্রেমের মিলনে মোহ নেই' একথাও তেমনি সত্য। পুরন্দরকে ভালোবাসিয়াছিল বলিয়াই সুষমা প্রেমের নিষ্কাম ব্রত লইতে পারিয়াছিল, সোমশংকর বাঁশরিকে ভালোবাসিত বলিয়াই নিস্পৃহ প্রেমের কঠিন ব্রত গ্রহণে হৃদয়ে পাইয়াছিল বল। সুষমার সহিত সোমশংকরের বিবাহ হইল বলিয়া বাঁশরি সুষমাকে ঈর্ষাই করিত, অসার্থক ভালোবাসার অগ্নিদাহনে জ্বলিয়া মরিত অহরহঃ, কিন্তু যখনই সে মর্মে মর্মে বুঝিল যে, সোমশংকর পূর্বের মতই তাহাকে ভালোবাসে, তখনই তাহার দ্বিধা গেল দূর হইয়া, দুঃখের হইল অবসান। আপন অন্তরে সে আপনি 'পাইল' দীক্ষা। তাহার বন্ধন ঘুচিল, সে আর বাঁধিল না কাহাকেও। অর্থাৎ সে সুষমাকে সহজ ভাবেই গ্রহণ করিল, সোমশংকরকেও ব্রতসাধনের পথে সাহায্য করিল।

রবীন্দ্রনাট্যের বাণী

'বাঁশরি' নাট্যে প্রেমতত্ত্বের জটিলতাটি আশ্চর্য শিল্পকৌশলে স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। প্রেমের ব্রতসাধনে অহংদীপ্ত ভালোবাসার মূল্যকেও অস্বীকার করা হয় নাই, তবে বলা হইয়াছে, প্রেমের উদ্বোধনে অহং-এর ঈর্ষাদি ঘুচিয়া যায়, জাগিয়া ওঠে অন্তরের মানুষটি। বস্তুতঃ, প্রেম আবির্ভূত হয় ভিতরের মানুষটিকেই জাগাইতে, তখন শুধু বাঁশরিই যে সহজ মানবী হয় তাহা নহে, 'দস্যুও হয় কবি;' রত্নাকর, বাল্মীকি। 'বনদেবী'র আহ্বান সে তখন পায় শুনিতে, জিঘাংসাবৃত্তি তখন লজ্জিত হইয়া মুখ ঢাকে প্রেমের

অঞ্চলে ['বাল্মীকি প্রতিভা']। এই প্রেম কোনোও বিশেষ রূপে নয়, পরন্তু রূপে রূপে প্রতিরূপে সর্বক্ষেত্রে, সর্বভাবে সর্বযুগে হয় আবির্ভূত। বাহিরের কোনো বিশেষ রূপের মোহে যাহারা প্রেমকে অন্বেষণ করে, তাহারা ঠকে। 'সুদর্শনা রাজাকে বাহিরে খুঁজিয়াছিল। সুরঙ্গমা বলিয়াছিল, অন্তরের নিভৃত কক্ষেই তাঁহাকে মিলে। সুদর্শনা তাহা না শুনিয়া সুবর্ণের রূপে ভুলিল, ভুল করিল। শেষে দুঃখের আঘাতে তাহার অভিমান ক্ষয় হইল—হার মানিয়া প্রাসাদ ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইয়া তবে সে প্রভুর সঙ্গলাভ করিল, যে প্রভু সকল দেশে, সকল কালে, সকল রূপে, আপন অন্তরের আনন্দরসে যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়।' ['অরূপরতন'—কবিপ্রদত্ত ভূমিকা]। বাধাবন্ধহীন এই প্রেমভগবান, নৈষ্কর্ম্য বা আত্মরতি ইহার স্বভাব নহে। অহরহঃ ইহার ডাক আসিতেছে জীবনে জীবনে। 'যে চঞ্চল হাওয়া আমাদিগকে সাধারণ জীবনযাত্রার সংকীর্ণ গণ্ডী হইতে অনন্তের পথে উধাও করিবার চেষ্টা করে, আমাদের সমস্ত সাংসারিক জ্ঞান ও বিষয়বুদ্ধি সে মাদক হাওয়াকে প্রাণপণ শক্তিতে ঠেকাইয়া রাখিতে চাহে। রাজকবিরাজ মৃত্যুর অগ্রদূতরূপে আসিয়া এই সমস্ত বাধাবন্ধকে খুলিয়া দেন, এবং এই জীবন-ব্যাধির চরম চিকিৎসা ও আরোগ্য হইতেছে মৃত্যু—যে আমাদের ভগবানের সহিত পরিচয়ের রুদ্ধদ্বারগুলিকে আবার খুলিয়া দেয় ও জগতের সহিত আমাদের স্বাভাবিক সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করে।' ('ডাকঘর')। [রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্য—ড. শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়]

জগতের সহিত মানুষের স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে চাওয়াই রবীন্দ্র-প্রেমের সত্যধর্ম। লোভে, কামে, আলস্যে, বিলাসে, অকর্মে, নৈষ্কর্ম্যে, জিগীষায়, জিঘাংসায় যে জগৎ আজিও অস্বাভাবিক, রবীন্দ্রনাথের প্রেম তাহাকেই সাধন-স্বভাবের সত্যপথ দেখাইতেছে। এই পথে রুদ্ররূপে আসে মৃত্যু, আসক্তি-অন্ধ মানুষের মন প্রথমে ইহাকে সহ্য করিতে পারে না, করে হাহাকার। কিন্তু মৃত্যু যখন জীবনকে আসক্তির অতীতে জোর করিয়া টানিয়া আনে তখনই আমাদের জীবন জগতের সহিত স্বাভাবিকতার সহজ সম্পর্কের মাহাত্ম্য অনুভব করিতে পায়। তখনই বুঝা যায়, জীবনের পক্ষে মৃত্যু কত মূল্যবান। আসক্তির অস্বাভাবিকতা হইতে সহজ প্রেমের স্বাভাবিকতায় মৃত্যুই জীবনকে আনে টানিয়া। গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে 'বলাকা' আলোচনার প্রসঙ্গে এই মৃত্যু বিষয়ে আমি বিস্তৃতভাবে বিচার করিয়া দেখাইয়া দিব যে, রবীন্দ্র-কাব্যসাহিত্যে মৃত্যু প্রেমেরই অপর রূপ। আসক্তির অন্ধ দৃষ্টিতে মৃত্যুকে ভয়াবহ বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু আসক্তির অতীত দৃষ্টিতে মৃত্যুর মঙ্গলময় প্রেমরূপ প্রতিভাত হয়ই হয়। প্রেমের গতিপথে মৃত্যুর সহায়তা অপরিহার্য।

রবীন্দ্র-ভাবনায় প্রেম ও মৃত্যু

প্রেমকে নানারূপে এবং নানার মধ্যে অদ্বৈত শক্তিরূপে দর্শন করাই রবীন্দ্র-মনোদর্শনের লক্ষ্য। লক্ষ্য করিবেন নানার রূপে মাতিয়াছেন কবি, একের রূপে জাগিয়াছেন দার্শনিক।

প্রেম-সাধনার দুই দিক

একের ধ্যানে দার্শনিক প্রেমকে idealise করিয়াছেন—বিচিত্রের গানে কবি প্রেমকে realise করিয়াছেন। একের আনন্দ এবং বিচিত্রের আনন্দ—অন্তর্লীন প্রেমজীবনের পৃথক প্রকারভেদ মাত্র। প্রেমোপাসনায় এই দুই প্রকার আনন্দই সত্য—এক ছাড়িয়া বিচিত্র কিংবা বিচিত্রকে উপেক্ষা করিয়া এক—মনোদর্শনের, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের প্রেমদর্শনের লক্ষ্যই নহে।

পণ্ডিতদের নিকট না হউক, সাধারণের নিকট রবীন্দ্রনাথের এই প্রেম খুবই জটিল ঠেকে বলিয়া শুনিয়াছি। বস্তুতঃ একই সময়ে এক ও বিচিত্রকে সম্পূর্ণরূপে আমরা পাই না বলিয়া বিষয়টি আমাদের কাছে জটিলই ঠেকে, মনোবহির্ভূত তত্ত্ব বলিয়াই মনে হয়। এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যা বলিয়াছেন, অনুধাবন করিলে মন্দ হয় না :

'আমরা একই সময়ে সীমাকে ও অসীমকে, অহংকে এবং অখিলকে, বিচিত্রকে এবং একেকে সম্পূর্ণভাবে পাইতে পারি না বলিয়াই একবার দিন আসিয়া আমাদের চক্ষু খুলিয়া দেয়, একবার রাত্রি আসিয়া আমাদের হৃদয়ের দ্বার উদঘাটিত করে। একবার আলোক আসিয়া আমাদিগকে কেন্দ্রের মধ্যে নিবিষ্ট করে, একবার অন্ধকার আসিয়া আমাদিগকে পরিধির সহিত পরিমিত করিতে থাকে।' [দিন ও রাত্রি, ধর্ম]।

বক্তব্য এই : এক ও বিচিত্র দুইই জীবনের পক্ষে, অর্থাৎ মনোজীবনের পক্ষে সত্য। বিশ্বজগতে নিজেকে স্বতন্ত্র মনে করিয়া বিচিত্র খণ্ডরূপের লাবণ্য উপভোগ করা যেমন মনোবহির্ভূত তত্ত্বব্যাপার নহে, বিশ্বের সহিত নিজেকে একাঙ্গ ও একাত্ম মনে করিয়া সর্বগত সেই একের আনন্দরসে নিবিড় হইতে চাওয়াও তেমনি অবাঙ্‌মনসগোচর কোন তত্ত্বরহস্য নহে। এই 'চাওয়া' আমাদের মধ্যে আছে বলিয়াই অল্পে আমরা তুষ্ট নহি, আমরা আরও চাই, আরও চলি। সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে,

একের ধ্যান ও বিচিত্রের গান

বামে, উর্ধ্বে, অধে অহরহঃ জাগ্রত আছেন সেই মহান্ এক—ওই এক-ই জীবনের আদর্শ। বিচিত্রকে পাইয়া-পাইয়া, চাহিয়া-চাহিয়া, ছাড়িয়া-ছাড়িয়া, আবার ধরিয়া, পুনরায় ছাড়িয়া জীবন যে বাড়িয়া উঠিতেছে, তাহারই মধ্যে ক্রমশঃ অনুভূত হইতে থাকে সকলকে লইয়া এই একেশ্বর প্রেমব্রহ্ম। এই প্রেমব্রহ্মকে জীবনে উপলব্ধি করা এবং প্রতিষ্ঠা দেওয়াই সকল কর্মের সার কর্ম। জীবনকে 'করা' এবং 'কায়েনমনসাবাচা' হওয়াই রবীন্দ্রনাথের প্রেমজীবনের পরমাদর্শ। এই আদর্শের মৌলিকতা ও বাস্তবতা সম্বন্ধে আমরা এখনও সচেতন হই নাই বলিয়া আমাদের মধ্যে অনেকেই ইউরোপের একাধিক কবির প্রেমাদর্শের আলোকে রবীন্দ্রপ্রেম দর্শন করিতে গিয়াছি। সূক্ষ্মভাবে বিচার না করিলে

রবীন্দ্রনাথের সর্বজগদ্‌গত অর্থাৎ অহং হইতে অখিল পর্যন্ত প্রসারিত প্রেমের কল্প-নবীনতা উপলব্ধি করিতে পারিব না।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রেমের সহিত রবীন্দ্রপ্রেমের সাদৃশ্য অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, কিন্তু ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রেমের আনন্দে বসন্তসুন্দর চপল প্রেমের লাস্য কোথায়? চপল প্রেম ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের আদর্শবিরোধী, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রেমাদর্শে চপলেও আছে অচপলের আনন্দাভাস। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রেমের সহিত রবীন্দ্রনাথের প্রেমের যে একেবারেই কোনো সাদৃশ্য নাই তাহা বলিয়া নূতন কথা বলার মোহে আচ্ছন্ন হইতে চাহি না, কিন্তু পণ্ডিতগণ অবশ্যই জানেন যে, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মনে খৃষ্টধর্মসম্বন্ধীয় তত্ত্ব-বন্ধনের বাধা ছিল বিস্তর, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মন তত্ত্ব-বন্ধনের কোনো বাধাই স্বীকার করে নাই।

রবীন্দ্রনাথ ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ

এইজন্য ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যেখানে অহংদীপ্ত প্রণয়ের চিত্র আঁকিতে শঙ্কিত হন, রবীন্দ্রনাথ সেখানে সহজ আনন্দেই তাহা আঁকিয়া যান, অথচ অখিলের অভিমুখেই তাঁহার অভিসার বলিয়া একদিকে যেমন কোনো অহং-এ তিনি লিপ্ত রহেন নাই, অপরদিকে তেমনি অহংচিত্রে অখিলের আভাস না দেখিয়াও তিনি পারেন নাই। শেলির প্রেম-কল্পনায় সর্বজগদ্‌গত অখণ্ড আছে বটে, কিন্তু ধ্যানজীবনে শেলি যে-অখণ্ডকে ধরিয়াছেন, সেই অখণ্ডের জ্যোতিসম্পদটি বস্তুজীবনের সর্বত্র প্রয়োগ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে করি না। ফুল-ঝরায় তাঁহার দুঃখ, বসন্ত চলিয়া যাওয়ায় তাঁহার বিষাদ, জীবনের ভঙ্গুরতায় তাঁহার হাহাকার, মৃত্যু দেখিয়া তাঁহার নৈরাশ্য—খণ্ডাশ্রয়ী সসীম জীবনবোধেরই প্রমাণ ও প্রাধান্য বহন করে। রবীন্দ্রনাথের বালকবয়সের রচনাবলীতে ('মানসী' পর্যন্ত) এই খণ্ডাশ্রয়ী জীবনভাবের নিদর্শন মেলে। এই খণ্ডগত আসক্ত অহং-বোধের বন্দিত্ব হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অখণ্ডের আলোকে সর্ববস্তু, সর্বভাব, সর্ববিষয়কে নিরীক্ষণ করার হৃদয়বোধ অস্পষ্টভাবে শেলির ধ্যানের মধ্যে উঁকি দিয়াছিল বলা যায়, কিন্তু শেলির যতটুকু প্রেম কাব্য সাহিত্যে প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে মনে হয় ধ্যানে অখণ্ড প্রতিভাত হইলেও জ্ঞানে তিনি শেষ পর্যন্ত খণ্ডভাবেই ছিলেন প্রভাবিত। কবিকল্পনার সহিত বস্তু-প্রকৃতির সর্বত্র সামঞ্জস্য-সাধনে যে প্রেম তপস্যা-সুন্দর,

শেলি, কীট্‌স, ব্রাউনিং

সে প্রেম শেলির মধ্যে দেখিয়াছি বলিয়া মনে করি না। কীট্‌সের প্রেম যৌবনানন্দী রূপানুসন্ধানী বিহ্বল প্রেম, রবীন্দ্রনাথের প্রেম ইহাও বটে, আবার ইহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অপরূপ আর এক রসবস্তুও বটে। ব্রাউনিঙ্‌-এর প্রেমের সহিত রবীন্দ্রপ্রেমের সাদৃশ্য একাধিক কাব্যরসিকই লক্ষ্য এবং বিচার করিয়াছেন। প্রেমব্রহ্মকে রবীন্দ্রনাথ 'আদিকবি', 'বিশ্বকবি' বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন—ব্রাউনিঙ্‌ তাঁহাকে ধ্যান করিয়াছেন 'Perfect Poet'-এর রূপৈশ্বর্যে। মর্ত্যকে স্বর্গের সংযমসৌন্দর্যে এবং স্বর্গকে মর্ত্য-বাসনার আনন্দে নবতর করিয়া

দেখিবার দৃষ্টি-প্রতিভা আছে রবীন্দ্রনাথের প্রেমে। ব্রাউনিঙ্-এর প্রেমের রূপচ্ছবিতেও দেখিতেছি "Half-angel" অর্থাৎ স্বর্গের দূত হইয়াও সে মর্ত্যে নামে; আবার "Half-bird" অর্থাৎ মর্ত্যে নামিয়াও সে ধূলিলিপ্ত বস্তু-পৃথিবীকে সুরের মহিমায় করে স্বর্গসুন্দর। রবীন্দ্রনাথ প্রেমের উজ্জ্বল আলোকে জীবনের দেখিয়াছেন দুই রূপ: অহং ও আত্মা। প্রেমের মাহাত্ম্যে ব্রাউনিঙ্ দেখিয়াছেন মানুষের জীবনে ঠিক দুইটি রূপ: একরূপে মানুষ আছে এই বস্তু-পৃথিবীর কর্মে, কর্তব্যে—'One to face the world with'; অপর রূপে মানুষ আছে প্রণয়িনীর প্রেম-প্রেরণায়—'One to show a woman when he loves her".

ব্রাউনিঙ্ হইতে রবীন্দ্রনাথ প্রভূত প্রেরণা লাভ করিয়াছেন, একথা আজ সর্বজন-স্বীকৃত [*Arnold, Browning and Rabindranath* by Amulya Charan Aikat]। কিন্তু তাই বলিয়া রবীন্দ্রপ্রেম যে সর্বতোভাবেই ব্রাউনিঙ্-প্রেমের অনুরূপ তাহা বলিতে পারি না। টেনিসনের ঋষিসুলভ কান্ত সাত্ত্বিকতা ব্রাউনিঙে নাই, রবীন্দ্রনাথে আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রেম শুদ্ধ মাত্র যৌবন-জগদ্গত রাজসিক আবেগোত্থমে উচ্ছ্বসিতই নহে, টেনিসনের প্রেমের ন্যায় সাত্ত্বিক ধ্যানানন্দে অবারিত এবং উদ্বেলিতও বটে। দ্বন্দ্ব আছে রবীন্দ্রনাথে, কিন্তু সে দ্বন্দ্ব রাজসিক ভোগবিলাসের জৈব দ্বন্দ্ব মাত্র নহে, সাত্ত্বিককে পূর্ণভাবে পাওয়া হয় না বলিয়াই রবীন্দ্রপ্রেমে দ্বন্দ্ব, চঞ্চলতা। ব্রাউনিঙ্ ও রবীন্দ্রনাথ সমসারের কবি হইলেও প্রেমের চিন্তনায় ব্রাউনিঙ্কে রবীন্দ্রনাথ ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন। স্বর্গের চেতনা থাকা সত্ত্বেও বাসনার বন্ধন ছিল ব্রাউনিঙ্-এর মানসে—মর্ত্যের প্রেরণা থাকা সত্ত্বেও,

এমারসন

এমারসনের মত, বন্ধন কাটিবার উদ্যম ছিল রবীন্দ্রনাথে। এমারসনে দেখিয়াছি বিশ্ববৈচিত্র্যের মধ্যে প্রেমৈক্যের অখণ্ড আনন্দরূপ। এমারসনের কল্পনায় প্রেমই প্রকৃতির আত্মা এবং প্রেমই ব্রহ্ম। অহংপ্রেমে আমরা মত্ত হই একথা রবীন্দ্রনাথের মতই এমারসন অস্বীকার করেন নাই:

> 'There are moments when the affections rule and absorb the man, and make his happiness dependent on a person or persons.' [Love, *Emerson's Essays*]

কিন্তু ইহার উর্ধ্বে যে প্রেম 'seeks virtue and wisdom everywhere to the end of increasing virtue and wisdom, সে প্রেমকে গভীরভাবেই উপলব্ধি করিয়াছেন। প্রেমসাধনার পথে আমরা যে কিছুই হারাই না, পরন্তু 'রূপ হতে রূপে', 'প্রাণ হতে প্রাণে' জীবনসুন্দরকে গভীরতররূপে দেখিতে দেখিতে চলি—রবীন্দ্রনাথের ন্যায় দার্শনিক এমারসনের কল্পনায় তাহা পাইয়াছি:

> 'We need not fear that we can lose anything by the progress of the Soul. The Soul may be trusted to the end. That

which is so beautiful and attractive as these relations must be succeeded and supplanted only by what is more beautiful and so for ever.' [*Ibid*]

এই ভাব, এই নিত্য অগ্রগতির আনন্দচাঞ্চল্য, এই উচ্চতর স্বভাবের উদ্বোধনে নিত্য কর্মতৎপরতার আনন্দসাধনা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ও দর্শন-রচনাবলীতে নানাভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ নানা গ্রন্থে নানা প্রবন্ধে ও ভাষণে, নানা কাব্য-কবিতায় ও নানা গীতিনাট্যে বারংবার এই কথাই বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন যে, প্রেমব্রহ্মকে কর্মসাধনার দ্বারা যতই চরিত্রে প্রতিভাত করি, ততই আমরা বৃদ্ধি পাই। তিনি বহুবার বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মেশ্বরকে আপন জীবনের অভিজ্ঞতার দ্বারা জানা এবং চরিত্রে ক্রমশঃ প্রতিভাত করাই মানুষের ধর্ম। সংসারে যাহা ঘটিতেছে, তাহার মধ্যেই ইঁহার লীলা। সংসারের খণ্ড-ক্ষুদ্র বিরোধাবলী অতিক্রম করিতে করিতে এবং ইঁহারই আলোকে সমগ্রের মধ্যে সঙ্গতির আভাস অনুভব করিতে করিতে অগ্রসর হওয়াই জীবজীবনের, জগজ্জীবনের ধর্ম। সংসারে থাকিয়া, সমাজে বসবাস করিয়া যদি ধর্ম পালন করিতে হয়, তবে এই নীতিধর্ম, এই প্রেম-ধর্ম, পালন করিতেই হইবে। ইহার বড় ধর্ম ইহজীবনে আর নাই। 'আমার ধর্ম' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই জীবনধর্মের সুন্দর ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়াছেন। পাঠক ধীরভাবে লক্ষ্য করিলেই দেখিবেন ইহার মধ্যে বাস্তবজীবনের সুখদুঃখ, মৃত্যু, বিচ্ছেদ, পতনস্খলনকে অস্বীকার করা হয় নাই কিংবা বিশ্ববিধ বৈপরীত্য ও বিরোধকে এড়াইয়া যাওয়ার চেষ্টাও হয় নাই, পরন্তু ধর্মজীবনের গতি ও পরিণতিকে মন ও মনন দ্বারা বিচার ও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। জগতের বিশ্ববিধ বিপরীতের বিরোধ কোথায়, কাহার মধ্যে মিটিতে পারে—রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করিয়াছেন, এবং নিজেই তাহার উত্তর দিয়াছেন :

'সমস্ত বিপরীতের বিরোধ মিটতে পারে কোথায় ? অনন্তের মধ্যে। তাই উপনিষদে আছে, সত্যং জ্ঞানং অনন্তম্। প্রথমে সত্যের মধ্যে জড় জীব সকলেরই সঙ্গে এক হয়ে মানুষ বাস করে, জ্ঞান এসে বিরোধ ঘটিয়ে মানুষকে সেখান থেকে টেনে স্বতন্ত্র করে, অবশেষে সত্যের পরিপূর্ণ অনন্তরূপের ক্ষেত্রে আবার তাকে সকলের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়। ধর্মবোধের প্রথম অবস্থায় শান্তম্—মানুষ তখন আপন প্রকৃতির অধীন ; তখন সে সুখকেই চায়, সম্পদকেই চায়, তখন শিশুর মতো কেবল তার রসভোগের তৃষ্ণা, তখন তার লক্ষ্য প্রেয়। তারপরে মনুষ্যত্বের উদ্বোধনের সঙ্গে তার দ্বিধা আসে; তখন সে সুখ এবং দুঃখ, ভালো এবং মন্দ, এই দুই বিরোধের সমাধান খোঁজে—তখন দুঃখকে সে এড়ায় না, মৃত্যুকে সে ডরায় না—সেই অবস্থায় শিবম্, তখন তার লক্ষ্য শ্রেয়। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়—শেষ হচ্ছে প্রেম, আনন্দ। সেখানে সুখ ও দুঃখের, ভোগ ও ত্যাগের, জীবন ও মৃত্যুর গঙ্গাযমুনা সংগম। সেখানে অদ্বৈতম্। সেখানে কেবল যে বিচ্ছেদের ও

বিরোধের সাগর পার হওয়া তা নয়—সেখানে তরী থেকে তীরে ওঠা। সেখানে যে আনন্দ সে তো দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তিতে নয়, দুঃখের ঐকান্তিক চরিতার্থতায়। ধর্মবোধের এই যে যাত্রা, এর প্রথমে জীবন, তারপরে মৃত্যু, তারপরে অমৃত। মানুষ সেই অমৃতের অধিকার লাভ করেছে। কেননা, জীবের মধ্যে মানুষই শ্রেয়ের ক্ষুরধারনিশিত দুর্গম পথে দুঃখকে, মৃত্যুকে স্বীকার করেছে। সে সাবিত্রীর মতো যমের হাত থেকে আপন সত্যকে ফিরিয়ে এনেছে। সে স্বর্গ থেকে মর্ত্যলোকে ভূমিষ্ঠ হয়েছে, তবেই অমৃতলোককে আপনার করতে পেরেছে। ধর্মই মানুষকে এই দ্বন্দ্বের তুফান পার করিয়ে দিয়ে এই অদ্বৈতে, অমৃতে, আনন্দে, প্রেমে উত্তীর্ণ করিয়ে দেয়। যারা মনে করে, তুফান এড়িয়ে পালানোই মুক্তি, তারা পারে যাবে কী করে? সেই জন্যেই তো মানুষ প্রার্থনা করে 'অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা-মৃতং গময়'। 'গময়' এই কথার মানে এই যে, পথ পেরিয়ে যেতে হবে, পথ এড়িয়ে যাবার জো নেই।' [সবুজপত্র, আশ্বিন-কার্তিক, ১৩২৪]

বস্তুতঃ, পথ এড়াইয়া নহে, পথ পারাইয়া আজও চলিয়াছে মানুষ। বিরোধ তাহার মেটে নাই, কিন্তু তাই বলিয়া জীবন-বহির্ভূত, বাসনা-বহির্ভূত কোনো নির্বিরোধ তত্ত্ব-ধর্মকে সমাজ, রাষ্ট্র বা জগৎব্যাপারে কার্যকর বলিয়া সে আজও স্বীকার করিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথের মানবতত্ত্ব তথা প্রেমতত্ত্ব বিরোধকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলার তত্ত্ব নহে—বিরোধকে পারাইয়া-পারাইয়া অহরহঃ অগ্রসর হওয়ার তত্ত্বই তাঁহার প্রেমতত্ত্ব। এইভাবে বিচার করিলে রবীন্দ্রনাথের প্রেমদর্শনের মানবিকতা ও বাস্তব-ধর্মিতাটুকু সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

প্রেম ইহলৌকিক জীবনে বিশুদ্ধ কল্পকথা মাত্র নহে—ইহজীবনে ইহা বাস্তব সত্য। প্রত্যক্ষ বিষয় ও বস্তুধর্মী ধ্রুববাদী আগস্ট কোম্‌তেও একথা স্বীকার করিয়াছেন।

আগস্ট কোম্‌তে

সামাজিক বা রাষ্ট্রিক নিয়ম ও শৃঙ্খলা এবং সর্বোপরি মানবসমাজ ও জীবনের অন্তহীন প্রগতিবাদে কোম্‌তে যেমন বিশ্বাসী ছিলেন, প্রেমের বাস্তব শক্তি ও সামর্থ্য সম্বন্ধেও তেমনি তিনি সচেতন ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মত তিনি প্রেমকে ব্রহ্মরূপে গ্রহণ করেন নাই সত্য, কিন্তু প্রেমই যে ইহলৌকিক জীবনের পরমাদর্শ সে কথা স্বীকার না করিয়া পারেন নাই। তিনি বলেন .

> 'Love, then, is our principle ; order our basis ; and progress our end.' [*System of Positive Polity*, p. 237]

কিন্তু কোন্ প্রেম আমাদের 'Principle'? মনের নিম্নতলগত প্রেম? এই প্রেম কি আমাদের উচ্চজীবন-পথে লইয়া যায়? কখনই নহে। তবে উচ্চপথগত প্রেমই কি

আমাদের Principle, আমাদের আদর্শ? এই আদর্শ কি শুধুমাত্র কল্পকথা? মনের নিম্নতলগত প্রেমকে বাস্তব বলিতে কাহারও দ্বিধা নাই, কিন্তু উচ্চপথগত প্রেমও কি বাস্তব নহে? আমার মধ্যে যাহা নাই, তাহা আমার পক্ষে অবাস্তব বলিয়া মনে হইলেই কি তাহা সত্যসত্যই অবাস্তব হইয়া যায়? সংসারে যদি কাহারও মধ্যে তাহা থাকে তবে তো তাহাকে অবাস্তব বলা যুক্তিযুক্ত হয় না। মোহ হইতে রতি, রতি হইতে প্রীতি, প্রীতি হইতে প্রেম, প্রেম হইতে সর্বজগদ্‌গত প্রেমভাবের আনন্দ যুগে যুগে মানবজীবনে লীলায়িত, বিলসিত হইয়াছে। বৃথা তর্কে মনোনিবেশ না করিয়া বিনয়সহকারে স্বীকার করিয়া লওয়াই ভালো যে, মনের নিম্নতল হইতে উচ্চভূমি পর্যন্ত প্রেমের অস্তিত্ব অনুভবসিদ্ধ সত্য এবং যে হিসাবে অনুভব বা অনুভূতি জীবনের পক্ষে অবাস্তব নহে, সেই হিসাবে এই প্রেম একদিকে যেমন মানবিক ও মানসিক, অপরদিকে তেমনি বাস্তবিকও বটে। তাহা যদি না হইত, তবে প্রেম লইয়া এত তত্ত্ব, এত কল্পনা, এত কাব্য এবং এত ধর্মদর্শন রচিত হইত না। তবে সর্বযুগের সকল মানুষের নিকটই প্রেম যে সর্বজগদ্‌গত ব্রহ্মেশ্বররূপে স্বীকৃত ও গৃহীত হইয়াছে, তাহা বলি না। মানুষ তাহার অধিকার মত প্রেমকে ধারণ করিয়াছে; কেহ তাহাকে ধরিয়াছে মনের নিম্নতলের অধিকতর বাস্তবের আবেগে, কেহ বা তাহাকে ধরিয়াছে মনের উচ্চভূমির বৃহত্তর বাস্তবের আনন্দে। দুই প্রকার 'ধারণ'ই বাস্তব। প্রথমোক্ত 'ধারণ'কে বলি প্রেয়-বাস্তব, দ্বিতীয়োক্ত 'ধারণ'কে বলি শ্রেয়-বাস্তব। প্রেয় হইতে শ্রেয়তে চলা যেখানে অব্যাহত আছে প্রেমকে সর্বজগদ্‌গতরূপে ধরার সম্ভাবনা সেখানে সমধিক। যেখানে এই চলা ব্যাহত হয় নানা আসক্তির প্রতিকূলতায়, সেখানে প্রেম প্রেয়রূপে অর্থাৎ সাধারণ মোহরূপেই থাকিয়া যায়। প্রেমসাধনায় ইহা আশার কথা নহে। অহং হইতে প্রেমের উদ্ভব বটে, কিন্তু যে প্রেমস্পৃহা অহংবন্ধন অতিক্রম করিল না, তাহা তো উত্তরপথে যাইল না। বৈষ্ণব কবি চণ্ডিদাস বলিতেন, মানুষের প্রেম হইতেই অর্থাৎ অহং হইতেই, আধ্যাত্মিক প্রেমে উন্নীত হইতে হয়। কিন্তু মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য জানিতেন, মানুষ হইতেই প্রেম বটে, কিন্তু নরনারীর প্রেম-মিলনে যে মোহ আছে, সেই মোহে মন বন্দী হইয়া গেলে উর্ধ্বপথে উঠা খুবই কঠিন। পরকীয়া তত্ত্বের কথা তিনি বলিতেন সন্দেহ নাই, কিন্তু এই তত্ত্ব উচ্চতর ধর্মবোধের উদ্বোধক হিসাবে ধ্যানজীবনেই গ্রহণযোগ্য, বস্তুগতভাবে এই তত্ত্ব চরিত্রে প্রতিভাত করিবার বিষয় নহে। প্রেমের জৈব মোহ হইতে শিষ্যবর্গকে দূরে না রাখিলে যে কোনো মুহূর্তে পতন ও স্খলন হইতে পারে—এই ছিল মহাপ্রভুর ধারণা। ঐতিহাসিকগণ জানেন, পরবর্তী যুগে মহাপ্রভুর এই ধারণা সত্যে পরিণত হইয়াছিল। সহজিয়াগণ পরকীয়াতত্ত্বের জৈবজীবনগত ব্যাখ্যা দিয়া এবং চণ্ডিদাসের প্রেমকাহিনীর প্রশ্রয় লইয়া

প্রেমের বাস্তবতা

প্রেয়-প্রেম ও শ্রেয়-প্রেম

নরনারীর জৈবপ্রেমকে ভাগবত প্রেমের সূচনা বলিতে চাহিয়াছিলেন। ড. দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার 'বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়' নামক বিখ্যাত সংকলন-গ্রন্থে সহজিয়াদের প্রেমের যেসমস্ত রচনা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে লজ্জা হয়, ধিক্কার আসে, তাহা প্রেমই নহে, অথবা বাস্তববাদীরা যদি তাহাকে প্রেমই বলিতে চাহেন, তবে তাহা ঐ প্রেয়প্রেম, জৈবমোহ যাহার অপর নাম। এই জৈবমোহকে সহজিয়ারা ধর্ম বলিয়া চালাইতেও দ্বিধা করে নাই। ড. সেন ঐতিহাসিক Hallam-এর 'The Students' Middle Ages' নামক গ্রন্থের নজির দেখাইয়া স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন যে, মধ্যযুগীয় ইউরোপেও এই জৈবমোহ বা যৌনপ্রেম ধর্মনীতি বলিয়া প্রচলিত হইয়াছিল।

ড. সেন লিখিতেছেন :

> 'The romantic love between unwedded persons was extolled by the Sahajiyas and elevated into a religion. We know that love between two unwedded persons was also a religious creed in Europe in the medieval ages, but we have it on the authority of Hallam that this love while professing idealistic and platonic dogmas, degenerated into the ordinary vices that human flesh is heir to.' [*Vaisnava Literature*, p. 235-36.]

'প্রেমের সাধনায় বিকারের আশঙ্কা আছে' বলিয়া দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রেম-তত্ত্বের ব্যাখ্যায় সাধককে পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যাবলী যাঁহারা সুরু হইতে শেষ পর্যন্ত পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন, প্রেম সম্পর্কে তাঁহার এই সচেতনতা বিশেষ কোনো দর্শনশাখার বিশুদ্ধ তত্ত্বনীতি হইতে নহে, জীবনের সহজ অভিজ্ঞতা হইতেই ক্রমশঃ সমুদ্ভাসিত হইয়াছে। মোহের মদিরতা হইতে, সংশয়ের যন্ত্রণা হইতে, রতির বিহ্বলতা হইতে, প্রীতির পুলকানন্দ হইতে, প্রেমের পবিত্রতা ও গতিশক্তি হইতে ক্রমশঃ তিনি সর্বজগদ্‌গত প্রেমভাব উপলব্ধি করিয়াছেন। 'কবিকাহিনী' হইতে 'শেষলেখা' পর্যন্ত কাব্যাবলী পাঠ করিলে এই উপলব্ধির ক্রমবিকাশটিই চিত্রের মত মানস-নয়নে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। তখন সহজেই বুঝা যায়, প্রেমের সাধনায় বিশেষ কোনো বিকারের মোহে আচ্ছন্ন হইয়া গেলে একদিকে যেমন বিচিত্রের উপাসনা সম্ভব হয় না, অপরদিকে তেমনি বিচিত্র অভিজ্ঞতার মর্মগত এক ধ্রুব নীতির আনন্দাস্বাদনও সম্ভব হয় না।

প্রেমসাধনায় 'বিকার শঙ্কা'

রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন : 'প্রেমের সাধনায় বিকারের আশঙ্কা আছে। প্রেমের একটা দিক আছে যেটা প্রধানত রসেরই দিক, সেইটের প্রলোভনে জড়িয়ে পড়লে কেবলমাত্র সেইখানেই ঠেকে যেতে হয়, তখন কেবল রস-সম্ভোগকেই আমরা সাধনার চরম সিদ্ধি বলে

জ্ঞান করি। তখন এই নেশায় আমাদের পেয়ে বসে। এই নেশাকেই দিনরাত্রি জাগিয়ে তুলে আমরা কর্মের কঠোরতা, জ্ঞানের বিশুদ্ধতাকে ভুলে থাকতে চাই, কর্মকে বিস্মৃত হই, জ্ঞানকে অমান্য করি।'…

'প্রেম যদি সত্য থেকে, জ্ঞান থেকে, চুরি করে মত্ত হয়ে বেড়ায়, তার সংযম ও ধৈর্য নষ্ট হয়, তার কল্পনা-বৃত্তি উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে, তবে সে নিজের প্রতিষ্ঠাকে নিজের হাতে নষ্ট করে নিজেকে লক্ষ্মীছাড়া করে তোলে।' [বিকারশঙ্কা, শান্তিনিকেতন—১ম খণ্ড]

প্রেমের সাধনাকে কবিগুরু সতী স্ত্রীর সাধনার সহিত তুলনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :

'তাতে ('প্রেমে') সতীর তিন লক্ষণই থাকবে—তাতে হ্রী থাকবে, ধী থাকবে এবং শ্রী থাকবে। তাতে সংযম থাকবে, সুবিবেচনা থাকবে এবং সৌন্দর্য থাকবে। এই সংসারের মধ্যে চলায় ফেরায়, কথায় বার্তায়, কাজে কর্মে, দেনায় পাওনায়, ছোটোয় বড়োয় সুখে দুঃখে, ব্যাপ্তভাবে—সুতরাং সংযতভাবে, নির্মলভাবে, মধুরভাবে প্রকাশ পেতে থাকবে। প্রেমের যে একটি স্বাভাবিক হ্রী আছে, সেই লজ্জার আবরণটুকু থাকলেই তবে সে বৃহৎ-ভাবে পরিব্যাপ্ত হোতে পারে, নইলে কোনো একটা দিকেই জ্বলে উঠে' হয় তো কর্মকে নষ্ট করে, জ্ঞানকে বিকৃত করে, সংসারকে আঘাত করে, নিজেকে একদমে খরচ করে ফেলে। হ্রী দ্বারাই সাধ্বী স্ত্রী আপনার প্রেমকে ধারণ করে, তাকে নানাদিকে বিকীর্ণ করে দেয়, এইরূপে সে প্রেম কাউকে দগ্ধ করে না, সকলকে আলোকিত করে।…

'এই মানস-পুরীতে সাধ্বীর প্রেমে ধী থাকবে, জ্ঞানের বিশুদ্ধতা থাকবে। এ প্রেম সংস্কারজালে জড়িত মূঢ় প্রেম নয়। পশুদের মতো একটা সংস্কারগত অন্ধ প্রেম নয়। এর দৃষ্টি জাগ্রত, এর চিত্ত উন্মুক্ত।…

'তারপরে…এই প্রেমে শ্রী থাকবে, সৌন্দর্যের আনন্দময়তা থাকবে। কিন্তু যদি হ্রীর অভাব ঘটে, যদি ধীর বিকার ঘটে, তবে এই শ্রীও নষ্ট হয়ে যায়।

'আত্মা পরিপূর্ণতার উদ্দেশ্যে যে প্রার্থনা উচ্চারণ করে তার মধ্যে প্রেমের কোনো অঙ্গের অভাব থাকে না। যে অমৃত সে চায় তা পরিপূর্ণ প্রেম, তা কর্মহীন প্রমত্ত প্রেম নয়। বলে, অসতো মা সদগময়—অসত্য হতে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও। বলে, আমি যাকে চাই তিনি যে সত্য, নিজেকে সকল দিকে সত্যের নিয়মে সত্যের বন্ধনে না বাঁধলে তাঁর সঙ্গে যে আমার মিলনবন্ধন সমাপ্ত হবে না। বাক্যে, চিন্তায়, কর্মে সত্য হোতে হবে, তা'-হোলেই যিনি বিশ্বজগতে সত্য, যিনি বিশ্বসমাজে সত্য তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্মিলন সত্য হয়ে উঠবে, নইলে পদে পদে বাধতে থাকবে। এ সাধনা কঠিন সাধনা, এ পুণ্যের সাধনা, এ কর্মের সাধনা।' [তদেব]

অন্যত্র তিনি এই সাধনবিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :

'এই কথাটি মনে রাখতে হবে, ভক্তিরসের, প্রেমরসের মধ্যে যে দিকটি সম্ভোগের দিক, কেবল সেইটিকেই একান্ত করে তুললে দুর্বলতা এবং বিকার ঘটে। ওর মধ্যে একটি শক্তির দিক আছে, সেটি না থাকলে রসের দ্বারা মনুষ্যত্ব দুর্গতি প্রাপ্ত হয়।

'ভোগই প্রেমের একমাত্র লক্ষণ নয়। প্রেমের একটি প্রধান লক্ষণ হচ্ছে এই যে, প্রেম আনন্দে দুঃখকে স্বীকার করে নেয়। কেন না, দুঃখের দ্বারা, ত্যাগের দ্বারাই তার পূর্ণ সার্থকতা। ভাবাবেশের মধ্যে নয়, সেবার মধ্যে, কর্মের মধ্যেই তার পূর্ণ পরিচয়। এই দুঃখের মধ্যে দিয়ে, কর্মের মধ্যে দিয়ে, তপস্যার মধ্যে দিয়ে যে প্রেমের পরিপাক সেই প্রেমই বিশুদ্ধ থাকে এবং সেই প্রেমই সর্বাঙ্গীণ হয়ে ওঠে। ...যাঁরা ভক্তির দ্বারা পূর্ণতার স্বাদ পেয়েছেন তাঁরা কিছুকেই অস্বীকার করবার প্রয়োজন বোধ করেন না—তাঁরা অনায়াসেই কর্মকে শিরোধার্য এবং দুঃখকে বরণ করে নেন। নইলে যে তাঁদের ভক্তির মাহাত্ম্যই থাকে না, নইলে যে ভক্তিকে অপমান করা হয়। ভক্তি বাইরের সমস্ত অভাব ও আঘাতের দ্বারাই আপনার ভিতরকার পূর্ণতাকে আপনার কাছে সপ্রমাণ করতে চায়—দুঃখে নম্রতা ও কর্মে আনন্দই তার ঐশ্বর্যের পরিচয়। কর্মে মানুষকে জড়িত করে এবং দুঃখ তাকে পীড়া দেয়, রসের আবির্ভাবে মানুষের এই সমস্যাটি একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়, তখন কর্ম এবং দুঃখের মধ্যেই মানুষ যথার্থভাবে আপনার মুক্তি উপলব্ধি করে।' [শান্তিনিকেতন—২য় খণ্ড]

এই স্থলে একটি বিষয় স্পষ্ট করিতে হইবে। পাঠক অবশ্যই বুঝিতেছেন, রবীন্দ্রবিচারে প্রেম, ভক্তি ও রস একার্থবোধক শব্দ। প্রেমের বিকার অর্থাৎ বিশেষে লিপ্ত জৈবপ্রেম যে প্রেম নয় তাহা নহে, তাহা প্রেমের অংশরূপে অভিহিতই হইতে পারে, কিন্তু এই অংশবিশেষকেই পূর্ণ ও সর্বস্ব বলিয়া মনে করিয়া তদূর্ধ্বে আর উঠিতে না চাওয়ার বা না পারার প্রবৃত্তি যেখানে প্রবল, সেখানেই রবীন্দ্রনাথ সতর্কতার বাণী শুনাইতে চাহেন। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য এই, উচ্চতর যে প্রেম বিশেষের বন্ধন হইতে মুক্ত, ভক্তি তাহাই। ভক্তি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া মানুষ যখন কর্ম করে, তখন আনন্দাবেগেই, রসের আবেগেই, করে; কর্ম তখন তাহার বন্ধন বা কৃচ্ছ্রসাধন নহে। ভক্তির কর্ম রসেরই প্রত্যক্ষোল্লাস। রসের আবির্ভাবে ভক্তির আনন্দ অথবা ভক্তির আবির্ভাবে নব নব কর্মের বিচিত্র আনন্দোচ্ছ্বাস রবীন্দ্রশাস্ত্রে একই কথা। প্রেমের সাধনা বা ভক্তির সাধনা অথবা রসের সাধনা ঠিকমতো সম্পাদিত হইলে সাধক তখন কিছুকেই উপেক্ষা করে না, আবার কিছুকেই সর্বস্ব বলিয়া আঁকড়িয়া ধরে না। সেই কারণে তখন তাহার নিত্য গতি। ইহাই মুক্তি। এই মুক্তি বা গতির বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ চমৎকার একটি উপমার সাহায্যে বুঝাইয়াছেন :

প্রেম, ভক্তি, রস

'বসন্তের উত্তাপে পর্বতশিখরের বরফ যখন রসে বিগলিত হয় তখন চলাতেই তার মুক্তি, নিশ্চলতাই তার বন্ধন; তখন অক্লান্ত আনন্দে দেশদেশান্তরকে উর্বর করে সে চলতে থাকে :

তখন নুড়ি পাথরের দ্বারা সে যতই প্রতিহত হয় ততই তার সঙ্গীত জাগ্রত এবং নৃত্য উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।'· ····

'ঝরনার যে গতি সে তার নিজেরই গতি, সেইজন্ত এই গতিতেই তার ব্যাপ্তি, মুক্তি, তার সৌন্দর্য। এইজন্ম গতিপথে সে যত আঘাত পায় ততই তাকে বৈচিত্র্য দান করে। বাধায় তার ক্ষতি নেই, চলায় তার শ্রান্তি নেই।

'মানুষের মধ্যেও যখন রসের আবির্ভাব না থাকে, তখনি সে জড়পিণ্ড।······তখনই তার যত খুঁটিনাটি, যত আচার বিচার, যত শাস্ত্রশাসন। তখনই মানুষের মন গতিহীন বলেই বাহিরেও সে আষ্টেপৃষ্ঠে বদ্ধ। তখনই তার ওঠা বসা খাওয়া পরা সকল দিকেই বাঁধাবাঁধি। তখনি সে সেই সকল নিরর্থক কর্মকে স্বীকার করে যা তাকে সম্মুখে অগ্রসর করে না, যা তাকে অন্তহীন পুনরাবৃত্তির মধ্যে কেবলি একই জায়গায় ঘুরিয়ে মারে।

'রসের আবির্ভাবে মানুষের জড়ত্ব ঘুচে যায়। সুতরাং তখন সচলতা তার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়, তখন অগ্রগামী গতিশক্তির আনন্দেই সে কর্ম করে, সর্বজয়ী প্রাণশক্তির আনন্দেই সে দুঃখকে স্বীকার করে।

'বস্তুতঃ, মানুষের প্রধান সমস্যা এ নয় যে, কোন্ শক্তি দ্বারা সে দুঃখকে একেবারে নিবৃত্ত করতে পারে। তার সমস্যা হচ্ছে এই যে, কোন্ শক্তি দ্বারা সে দুঃখকে সহজেই স্বীকার করে নিতে পারে। দুঃখকে নিবৃত্ত করবার পথ যাঁরা দেখতে চান তাঁরা অহংকেই সমস্ত অনর্থের হেতু বলে একেবারে তাকে বিলুপ্ত করতে বলেন, দুঃখকে স্বীকার করবার শক্তি যাঁরা দিতে চান তাঁরা অহংকে প্রেমের দ্বারা পরিপূর্ণ করে তাকে সার্থক করে তুলতে বলেন।' [শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড]

ত্রিবিধ দুঃখকে নিবৃত্ত করার বাণী পাতঞ্জলদর্শনে পাঠক পাইয়াছেন। বলাই বাহুল্য, আত্মাকে মনের অতীতে তুলিয়া লওয়াই এই নিবৃত্তি-সাধনার অপরোক্ষ তাৎপর্য। সুখ-দুঃখের অনুভূতি যেখানে নাই, মনও সেখানে নাই—মনের অস্তিত্ব সেখানে স্বীকার করা সঙ্গত নহে। রবীন্দ্রনাথ মনের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, ফলতঃ মনই তাঁহার সব, এবং এই মনোভুবনেরি দুঃখাদি বিচিত্র আবেগানুভূতির তিনি মহান্ দার্শনিক। এই কারণে দুঃখকে নিবৃত্ত করার কথায় নহে, দুঃখকে সহজে স্বীকার করার কথাতেই তিনি বিশ্বাসী। কিন্তু সহজে স্বীকার করা যায় কোন্ শক্তি বলে? রবীন্দ্রনাথ বলেন, প্রেমই এমন একটা শক্তি, যাহার উদ্বোধনে দুঃখকে সহজেই আমরা স্বীকার করি,—হাসিমুখে, সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় বরণ করিতে ছুটি।

কিন্তু এই প্রেম কেমনতর প্রেম? রবীন্দ্রনাথ বলেন, বিকারবিহীন হইবার আনন্দ-সাধনায় নিত্য সমুদ্ভূত এই শিবপ্রেম—ইহারই অপর নাম বৈরাগ্য-প্রেম বা প্রেম-বৈরাগ্য।

কথাটা কিন্তু বড়ই অস্পষ্ট হইয়া গেল। রবীন্দ্রনাথের এই প্রেমবৈরাগ্য লইয়া পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে এবং সর্বোপরি তাঁহার কাব্যদর্শন আলোচনাপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করিবার সুযোগ লইব। বর্তমান অধ্যায়ে কবির বৈরাগ্য সম্বন্ধে সংক্ষেপতঃ কিছু আলোচনা করিতেছি।

জীব-বৈষয়িকতার উর্ধ্বে দাঁড়াইয়া স্বার্থ-সংকীর্ণতার অতীতে অগ্রসর হইয়া, জগৎদর্শনই সত্যকার জগৎদর্শন, কেননা রবীন্দ্রবিচারে ইহাই সত্যদর্শনের অপর নাম। স্বার্থে, প্রয়োজনে, বৈষয়িকতার বন্ধনে, বদ্ধ হইয়া মানুষ যে জগৎদর্শন করে, সে জগৎ সীমাবদ্ধ জগৎ, তাহা একান্তভাবেই ক্ষুদ্র, তাহা সরীসৃপের গহ্বর, তাহা মণ্ডূকের কূপ মাত্র। এই কারণে তাহা সত্য নহে, তাহা অসত্য। বৃহতের প্রেমে মানুষ ক্ষুদ্রকে উত্তীর্ণ ই হইতে চায়। উচ্চের আহ্বানে মানুষ তুচ্ছকে পরিহার না করিয়া পারে না। এই উত্তীর্ণ হওয়ার সাধনা অথবা পরিহার করার আগ্রহ বা ব্যাকুলতাই রবীন্দ্র-মনোদর্শনের বৈরাগ্য।* এই বৈরাগ্য জীবজীবনে একান্তভাবেই বাঞ্ছনীয়, কেননা এই বৈরাগ্য ব্যতিরেকে জীবপ্রকৃতি শিবপ্রকৃতিতে উন্নীত হইতে পারে না। শিবপ্রকৃতিতে উন্নীত হওয়াই সাধনার চরম সার্থকতা, কারণ প্রেমের পরিপূর্ণ বিকাশ শিবপ্রকৃতিতেই সম্ভব, অন্যত্র না।

প্রেম-বৈরাগ্য

রবীন্দ্রনাথ, পাঠক জানেন, যোগিদার্শনিক নহেন, কবিদার্শনিক। মনের অতীতে তিনি যাইতে চাহেন না, কিন্তু মনের কোনো প্রকার বন্ধনই তিনি সহ্য করিতে পারেন না। রূপবিশেষে তিনি আনন্দপ্রেরণা অনুভব করেন, কিন্তু বিশেষের অন্তর্নিহিত অশেষের আনন্দোপলব্ধিই তাঁহার কবিপ্রতিভার মূল উৎস। তাঁহার বক্তব্য এই যে, মানুষ যখন বিশেষ কোনো বস্তু বা বিষয়ে লিপ্ত হইয়া পড়ে, তখন সেই বিশেষটিই তাহার নিকট একান্তভাবে সত্য হইয়া উঠে, জগতের অন্যান্য বিষয় বা বস্তু তখন অন্ধকারের অন্তরালেই থাকিয়া যায়। মানুষ যাহা ত্যাগ করিতে পারে না বা চাহে না, যাহার জন্য অহরহঃ প্রাণপাত করে, কালক্রমে হয়তো তাহা পায়, কিংবা পায় না, কিন্তু তাহার জন্যই জীবনের গতিপথ তো রুদ্ধ হইয়া থাকে। জীবজগতের বৈষয়িকতার দিকে তাকাইলেই একথার সত্যতা প্রমাণিত হয়। মানুষ অর্থ লইয়াই যদি কেবল প্রমত্ত থাকে তবে অর্থই তাহার নিকট একমাত্র আরাধ্য সত্য হইয়া উঠে, অর্থ ছাড়া আর সমস্তই অনর্থ বোধ হয়। কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য এই ষড়রিপুর স্ফূর্তি-সাধনেই মানুষ যখন ব্যাপৃত থাকে, তখন প্রেমের

* এই প্রসঙ্গে 'মানুষের ধর্ম' নামক গ্রন্থের ভূমিকাংশ দ্রষ্টব্য। বৌদ্ধদর্শনের 'নির্বাণতত্ত্ব' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত ও আলোচনাগুলিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। 'সাধনা' পৃ. ৩১।৩২, দ্রষ্টব্য। শান্তিনিকেতন, ১ম খণ্ডের শেষাংশে বৌদ্ধদর্শনের ব্যাখ্যাও স্মরণীয়। 'দি রিলিজিয়ন অব ম্যান' গ্রন্থে 'দি ক্রিয়েটিভ্ স্পিরিট' স্মরণীয়।

বিশ্ববোধ কিংবা বৈরাগ্যের আনন্দচেতনা তাহার কাছে একটা মিথ্যা কল্পনা বলিয়াই মনে হওয়া স্বাভাবিক।

কিন্তু মানুষের জীবন কি এই নয় যে, অহরহঃ আসক্তির পঙ্কে সে নিমজ্জিত রহিতে পারে না, হাঁফাইয়া উঠে? তামসিকতায় মানুষ বেশিক্ষণ লিপ্ত থাকিতে পারে না; তা যদি থাকিত, তবে মানুষের জীবন 'স্ট্যাটিক'ই হইত, 'ডায়নামিক' সৃষ্টি-লীলায় উন্মত্ত হইতে তাহাকে কদাপি দেখা যাইত না। কিন্তু একথা থাক। বিচার করা যাক, বদ্ধ মানুষ কী চায়, কী পায়। বলাই বাহুল্য, জীবরূপে সে বাঁচিতে চায়; জীবরূপে বাঁচিবার 'রসদ'গুলি সে চায়। যখন পায়, খুশি হয়; যখন পায় না, দুঃখ অনুভব করে। জীব-জীবনে দুঃখ আছে, দারিদ্র্য আছে, বন্ধন আছে, শোক আছে, আছে মৃত্যু, কিন্তু সাধারণ মানুষ কি মনে মনে কখনও ইহার প্রতিকার প্রার্থনা করে? হয়তো করে, কিন্তু সংকীর্ণ কোনো একটি বিশেষ বাসনায় লিপ্ত থাকে বলিয়া এই প্রার্থনা তাহার জীবনে প্রকাশ পায় না। সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া মানুষ দুঃখাদি বহুবিধ আসক্তির পীড়নে পীড়িত হয়, এবং তামসিক নৈরাশ্যে ঈশ্বরকে ডাকিয়া দিনগত পাপক্ষয় করিতে থাকে। সাধারণ এই সংকীর্ণ জীবনের ঊর্ধ্বে যে জীবন মানুষেরই অন্তরে সাধন-অপেক্ষায় স্তব্ধ হইয়া আছে, বন্ধনের অন্ধকারে অন্ধ থাকে বলিয়া সেই জীবনের আলো সে দেখিতে পায় না। কিন্তু শিক্ষাপ্রভাবে, সুকৃতির পুণ্যে, বোধ যখন বিস্তৃত হয়, হৃদয়ের দ্বার ঠেলিয়া দূরাগত জীবন-সূর্যের ঈষৎ রশ্মি যখন মর্মদেশে বিকীর্ণ হইতে থাকে, ক্রমশঃই তাহার অস্থিরতা বাড়ে। অল্পে তখন তাহার সুখ হয় না,—যাহা লইয়া আছে, তাহা হইতে সে তখন মুক্তি চাহে। এই যে মুক্তি-পিপাসার উদ্বোধন, রবীন্দ্র-বিচারে, ইহাই প্রেমের উদ্বোধন, বৈরাগ্যের উদ্বোধন। নৈষ্ঠিক কোনো ধর্মসাধনার কৃচ্ছ্র পদ্ধতি হইতে এই প্রেম বা বৈরাগ্য যে আসে, তাহা নহে; সহজভাবেই ইহা আসে, সহজভাবেই মানসলোকে ক্রমশঃ বিকশিত হইতে থাকে। ইহারি প্রভাবে মানুষ ক্ষুদ্রত্বে হাঁফাইয়া উঠে, বৃহতের পথে চায় ছুটিতে। বৃহতের পথে যখন সে ছুটিয়া যায়, তখন দুই দিক হইতে সে যেন দুই বিশ্বকে লাভ করে। যাহা হইতে বাহির হইয়া আসে, দ্রষ্টা হিসাবে তাহা সে তো লাভ করেই, উপরন্তু বাহির হইতে পারিয়াছে বলিয়া বিশ্বের বিচিত্র রূপচিত্রের অনন্ত মহিমাও সে আস্বাদন করিতে পায়। ক্রমশঃ তাই তাহার এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, বাহির হইতে পারাই জীবন, আসক্ত হইয়া পড়িয়া থাকাই মৃত্যু। এই যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, ইহারই বলে সে তখন বিশেষকে ভালোবাসিয়াও উত্তীর্ণ হইয়া চলে। সে তখন জানে, সংসারের সুখদুঃখ আশানৈরাশ্য প্রভৃতি সকলপ্রকার বন্ধনই তাহার কাছে আনন্দময় এইজন্য যে, বন্ধনের বাহির হইতে দ্রষ্টা হিসাবে তাহার লীলা লক্ষ্য করিবার শিক্ষা তাহার হইয়াছে। সংসার-মঞ্চের নাট্যাভিনয়ে সে যেন অভিনেতা নয়, অভিনয়-দ্রষ্টা। বিশ্ববৈচিত্র্যের বিবিধ রূপাভিনেতার আনন্দলীলা সে দর্শন করে, কিন্তু কোনো একটি

বিশেষ অভিনেতার আসক্তিতে একান্ত-চিত্ত হইয়া তাহাতেই প্রমত্ত হইয়া যায় না। ফলে বিভিন্ন অভিনেতার দ্বারা অভিনীত এই বিচিত্র জগৎ-নাট্যাভিনয়ের মূল কথা-কাহিনীর সমগ্রতার রূপতত্ত্ব তাহার চোখে পড়ে। 'অসংখ্য বন্ধন' তাহার নিকট তাই বন্ধনরূপে বিবেচিত হয় না। বিশ্বের সকল প্রকার বন্ধন তাহার নিকট মুক্তির স্বাদই আনিয়া দিতে থাকে।

আসল কথা, ছাড়িতে চাওয়া এবং ছাড়িয়া যাওয়াই শিল্পজীবনের বৈরাগ্য। 'বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি' অর্থাৎ বৈরাগ্যের নৈষ্ঠিক কৃচ্ছ্রসাধনার সহায়ে মুক্তির বাসনা রবীন্দ্রনাথের নহে বটে, কিন্তু বৈরাগ্যভাবের মধ্যে যে চিত্তস্ফূর্তি, যে ব্রহ্মানুভূতি, অদ্বয়কে অনুভব করিবার যে আকুল আগ্রহ, বন্ধনকে উত্তীর্ণ হইবার যে আনন্দ-সাধনা,—তাহা তিনি কদাচ প্রত্যাখ্যান করেন নাই। অন্তরের এই বৈরাগ্যবোধই বিচিত্রের পথে তাঁহাকে টানিয়াছে, বহুর মধ্যে একের আনন্দরূপ দেখাইয়াছে। অন্তরের এই বৈরাগ্যবোধের আশীর্বাদেই তিনি প্রকৃতির রূপে দেখিয়াছেন অরূপ-মহিমা, মানুষের জীবনে দেখিয়াছেন পরমমানবের মাহাত্ম্য। তাঁহার এই বোধ, এই বৈরাগ্যবোধ জীবপ্রকৃতির স্থূল সাংসারিকতার বিচারে হয়তো সহজবোধ্য নয়। কিন্তু রবীন্দ্রবিচারে জীবপ্রকৃতিই প্রকৃতির শেষ কথা নহে। বিশ্বচৈতন্যের আশীর্বাদ হইতে বিচ্ছিন্ন একক জীবসত্তা অসত্য, অসহায় এবং অর্থহীন। আসক্তিবিহীন আনন্দ-দৃষ্টির দ্বারা বিশ্বরূপ তথা বিশ্বদেবকে দর্শন করার প্রেমানুভূতি বা বৈরাগ্যবোধের মাহাত্ম্যেই জীব সত্য, মহৎ এবং সার্থক। এই সার্থক জীব-সত্তা অহং-এর দাস নয়, প্রকৃতির ক্রীড়নক নয়। সে প্রেমিক। প্রেমের আনন্দে সে প্রকৃতির কুঞ্জে আসে, 'গানে, গন্ধে, আলোকে, পুলকে,' প্লাবিত করে বিশ্বভুবন—কিন্তু আবদ্ধ রহে না কুত্রাপি।

'বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি'

> 'Essentially man is not a slave either of himself or of the world ; but he is a lover. His freedom and fulfilment is in love which is another name for perfect comprehension. By this power of comprehension, this permeation of his being he is united with the all-pervading Spirit, who is also the breath of his Soul'. [*Sadhana*, p. 15.]

খণ্ড-দৃষ্টিতে মানুষ নিজেকে প্রকৃতির দাস বলিয়া মনে করিতে পারে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য এই যে, প্রেমাশ্রয়ী দৃষ্টিতে মানুষ প্রেমিক, মানুষ 'সুদূরের পিয়াসী'। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মহিমায় রবীন্দ্রনাথ যে প্রেম উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা মানুষকে আসক্তির অন্ধকারে টানে না, বাহির করিয়া আনে বিচিত্রের আনন্দময় আলোকপথে। রবীন্দ্রনাথের প্রেম হইতেছে 'এক হয়ে সকলের সনে' সমগ্রতার আনন্দ আস্বাদন [বসুন্ধরা, সোনার তরী]। এইজন্য

'সুদূরের পিয়াসী'

এ প্রেম জাগিলে সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগ্যও জাগে অর্থাৎ বিশেষ হইতে অশেষে, রূপ হইতে অরূপে অগ্রগতির আনন্দরতি হয় উদ্বোধিত। তাহা যদি না হইত, তবে প্রেমের পক্ষে সমগ্রতার আনন্দ আস্বাদন সম্ভবই হইত না। প্রেম যেখানে বদ্ধ, সেখানে সে সমগ্রকে পায় না; প্রেম যেখানে মুক্ত অর্থাৎ আনন্দময় বৈরাগ্যধর্মে দীক্ষিত, সেখানে তাহার জড়ত্ব ঘুচিয়া যায়, সেখানে সে অগ্রগামী গতিশক্তির আনন্দে কর্ম করে, সর্বজয়ী প্রাণশক্তির আনন্দে দুঃখকে স্বীকার করিয়া লয়। মানুষের মোহগ্রস্ত মন দুঃখাদি সমস্যার সমাধান করিতে পারে না, কিন্তু প্রেমগত মন দুঃখকে সহজভাবে স্বীকার করিতে পারে বলিয়া দুঃখ হইতেও জীবনের প্রেরণা, অনাগতের আনন্দ-চেতনা আস্বাদন করিতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'সাধনা' নামক ইংরাজী গ্রন্থে 'দি প্রবলেম অব ইভ্ল্' শীর্ষক প্রবন্ধে এই বিষয়টি স্পষ্ট করিতে চাহিয়াছেন। বস্তুতঃ, মানুষ যখন জীবপ্রকৃতিকেই চরম বলিয়া মনে করে, তখনই তাহার দুঃখাদি সমস্যার সমাধান হয় না। জীবপ্রকৃতির অন্তরে যে শিবপ্রকৃতি অহরহঃ বর্তমান রহিয়াছে, তাহার উন্মেষেই অর্থাৎ প্রেমের উন্মেষেই, সকলপ্রকার বিরোধের অবসান সম্ভব। মানুষ তাহার অন্তরের মধ্যে পরস্পরবিরোধী বহু ভাব, বহু আবেগ তো অনুভব করে —তবু কেন সে নানা বিরোধী শক্তির নিষ্পেষণে নিষ্পিষ্ট হইয়া শেষ হইয়া যায় না? আত্মপ্রেম আছে বলিয়া, নিজেকে সর্বাগ্রে ভালোবাসি বলিয়া, অন্তরের সহস্রবিধ বিরোধী ভাবের মধ্যেও আমি কি সামঞ্জস্য আনিতে চাহিতেছি না? রবীন্দ্রনাথ বলেন, জীব-প্রকৃতিতে মানুষ যে প্রেম অনুভব করে, তাহাও উপেক্ষণীয় নয় এইজন্য যে, তাহা ক্রমশঃ বিশ্বমিলনের অর্থাৎ সমন্বয়ের পথে চলিতে চাহে। জীবপ্রকৃতির প্রেমে অর্থাৎ অহংপ্রেমে, আসক্তি আছে, মোহ আছে, বন্ধন আছে, একথা অবশ্যই সত্য, কিন্তু এই প্রেমই যে আত্মপ্রেমরূপে মানুষের অন্তরে বিরাজমান থাকিয়া মানুষের মনোরাজ্যের পরস্পরবিরোধী বহু আবেগকে সেই এক আনন্দপ্রকাশের পথে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে—তাহা কে অস্বীকার করিবে?

প্রেম—শিবপ্রকৃতির উন্মেষ

প্রবন্ধের সুরুতে আত্মপ্রেমের কথা উল্লেখ করিয়াছি। কথাটাকে আরও একটু স্পষ্ট করি। আমি-মানুষটার মধ্যে অনেক বৈপরীত্য রহিয়াছে—পরস্পরবিরোধী বহু 'ভাবে' আমি নিত্যই আন্দোলিত হইতেছি। আমি সৎ আবার আমিই অসৎ; আমি যোগী আবার আমিই ভোগী; আমি জ্ঞানী আবার আমিই অতিবড় মূর্খ; আমি শান্ত আবার আমিই ভয়াবহভাবে দুর্দান্ত। মানুষ যে অন্তরতঃ একটি bundle of contradictions—একথাটা অবশ্যই মিথ্যা নয়। কিন্তু এত contradictions থাকা সত্ত্বেও আমি বাঁচি কী করিয়া—আছি কোন্ আশায়? বলাই বাহুল্য, আত্মপ্রেমের মহিমাতেই আমি বাঁচি, আমি থাকি। আত্মপ্রেমে আমি আমার নিকট সত্য; আত্মপ্রেমের মাহাত্ম্যেই আমার পরস্পরবিরোধী

আত্মপ্রেমের প্রসঙ্গে

দুর্দান্ত 'ভাব'গুলি আমি-র মধ্যে স্বীকৃত, মিলিত এবং সমন্বিত। আত্মপ্রেম যদি না থাকিত, বিবিধ বৈপরীত্যের মর্মহীন ভীষণ প্রহারে কোন্‌দিন ভাঙিয়া ফাটিয়া চৌচির হইয়া যাইতাম। একথা সত্য, আমি-র মধ্যে বিরোধী তত্ত্বগুলি ও ভাবগুলি অহরহঃ দ্বন্দ্ব জাগায়, জীবনকে অনেক সময় দুর্বহ করিয়া তুলে; কিন্তু ইহাও কি সত্য নহে যে, নিজেকে আমরা যত ভালোবাসি, যত পরিমাণে নিজেকে সার্থক ও চরিতার্থ করিতে চাই, তত পরিমাণেই আমাদের অন্তর হইতে আদর্শের বিরুদ্ধবাদী ভাবগুলি হয় দূরে সরিতে থাকে, নয় স্বীকৃত হইয়া অথবা ধিক্‌ত হইয়া মনের অসীমে রূপান্তরিত হইয়া যায়?

ফলতঃ আত্মাকে ভালোবাসিবার আনন্দাবেগে যখন জাগরিত হই, তখন ক্রমশঃ এই সত্যটিই দর্শন করিতে চাই যে, আত্মদেবকে সর্বগুণসম্পন্ন করিবার শক্তি-সাধনায় তৎপর হইতেছি কিনা। যখন দেখি, সাধনার অভিলাষ আছে কিন্তু শক্তিতে কুলাইতেছে না, তখন অবশ্যই দ্বন্দ্ব জাগে। কিন্তু দ্বন্দ্বের মহিমা এই যে, ইহা আমাদের বহু দুঃখ, বহু অভিজ্ঞতা, কৃতকর্মের বহু অনুশোচনা এবং কামনামধুর বহু বিচ্যুতির মধ্য দিয়া যথাসময়ে আদর্শের পথে টানিয়া লইতে থাকে। গন্তব্যপথে যখন চলিতে থাকি, তখনই বুঝিতে পারি, দ্বন্দ্ব-জাত এত অত্যাচার যে সহ্য করিতেছি—তাহা কেবল নিজেকে প্রবলভাবে ভালোবাসি বলিয়া। আত্মপ্রেমের আলোকে মানুষ লাভ করে দিগন্তপ্রসারী সূর্যদৃষ্টি, সেই কারণে বিশেষের বিশেষ দুঃখে আকৃষ্ট হইয়াও হয় না, সে উহাকে পরীক্ষারূপেই দেখে বা জানে। সে জানে, দুঃখ বিপদ অথবা পাওয়া-না-পাওয়ার মানস-দ্বন্দ্ব আত্মবিকাশেরই প্রাকৃতিক উপায় মাত্র। তাই বাধা তাহার নিকট বাধা নয়, বিশেষের ঔদ্ধত্য তাহার নিকট তৃণাদপি তুচ্ছ। বিশেষের ঔদ্ধত্যে বা অত্যাচারে যাহারা মুমূর্ষু, সাময়িকভাবে দুঃখশোকে বা কামে মোহে তাহারাই হতজ্ঞান হইয়া আত্মহত্যা করিতে চায়। জগতের জনসংখ্যার তুলনায় তাহারা নগণ্য, তাহারা প্রকৃতির ব্যতিক্রম মাত্র।

আসল কথা, প্রত্যেক মানুষই তাহার নিজেকে, তাহার আত্মাকে, ভালোবাসে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের যে বাণী প্রবন্ধের প্রারম্ভে উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা এই প্রসঙ্গে আর একবার দেখুন। শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহোদয় 'ফেলোসিপের লেকচরে'র উপক্রমণিকায় যথার্থই বলিয়াছেন: 'আত্মাতে প্রীতি 'নিরুপাধিক' অর্থাৎ স্বাভাবিক। স্ত্রী-পুত্রাদি সমস্ত বিষয়ে প্রীতি 'সোপাধিক' অর্থাৎ আত্মার প্রীতিসাধন বলিয়া। আত্মা নিরতিশয় প্রিয়, আত্মা অপেক্ষা প্রিয়বস্তু নাই।'

আত্মপ্রেম ব্যাপারটি প্রত্যক্ষতঃ এমনিই সর্বজনস্বীকৃত ব্যাপার যে, ইহার সম্বন্ধে কাহারও কোনো সংশয়ই জাগিতে পারে না। সংসারে তো আমরা তাহাদেরই আত্মজন বা আত্মীয়বন্ধু বলিয়া মনে করি, যাহাদের দেখিলে বা যাহাদের সংস্পর্শে আসিলে আমাদের আত্মার প্রীতি জন্মায়, আনন্দ জাগে। পৃথিবীতে কত সহস্র মানুষ তো রহিয়াছে, কিন্তু কয়জনের জন্য আমি ভাবি? কয়জনের সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ অনুভব করি?

যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় মানুষকে লইয়া আমার সংসার—আমার 'ঘরকন্না' আমার গল্পগুজব, আদর আপ্যায়ন—তাহাদেরই সুখে আমার সুখ, তাহাদেরই দুঃখে আমার দুঃখ। আত্মপ্রেমে আমিকে যেমন সত্য বলিয়া জানি, প্রেমের আলোয় যাহাদের দেখি তাহাদেরও তেমনি সত্য বলিয়া মনে করি। রবীন্দ্রনাথ বলেন: 'সত্যের পরিপূর্ণতাই প্রকাশ, সত্যের পরিপূর্ণতাই প্রেম, আনন্দ।···যে মানুষের প্রকাশ আমার নিকট ক্ষুদ্র, আমার নিকট অস্ফুট, তাহাতে আমার প্রেম অসম্পূর্ণ। যে মানুষকে আমি এতখানি সত্য বলিয়া জানি যে তাহার জন্য প্রাণ দিতে পারি, তাহাতে আমার আনন্দ, আমার প্রেম। অন্যের স্বার্থ অপেক্ষা নিজের স্বার্থ আমার কাছে এত অধিক সত্য যে অন্যের স্বার্থসাধনে আমার প্রেম নাই, কিন্তু বুদ্ধদেবের নিকট জীবমাত্রেরই প্রকাশ এত সুপরিস্ফুট যে তাহাদের মঙ্গল চিন্তায় তিনি রাজ্যত্যাগ করিয়াছিলেন।' [উৎসব, ধর্ম।]

বক্তব্য এই: আত্মপ্রেমে আমি সত্য, প্রেমগত আত্মার নিকট জগৎ সত্য। প্রেমের ধর্মই এই যে, ইহা আপন আলোকে বিশ্বকে আলোকিত করিয়া আপনার মতই সত্য করিয়া লয়। এই সত্য করিয়া লওয়া কবি-কল্পনা নহে, অলীক স্বপ্নমাত্র নহে। আমিকে যখন সত্য মনে করি, তখনই আমি-র জন্য অনেক ক্লেশ স্বীকার করি, আমি-র আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে নানাভাবে চেষ্টা পাই। ঠিক এইভাবেই প্রেমের আলোয় যাহাদের সত্য বলিয়া মনে করি, নানা চিন্তা করি তাহাদেরই মঙ্গলে, নানাপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করি তাহাদেরি আনন্দবর্ধনে। এই প্রেমের আলো যখন গৃহ হইতে সমাজে, সমাজ হইতে বৃহত্তর বিশ্বসমাজের বিস্তৃত ক্ষেত্রে পতিত হয়, তখন গৃহগত আত্মবন্ধুজন হইতে বিশ্বগত অখিলমানবজাতিকেই অধিক সত্য বলিয়া মনে হইতে থাকে। তখন সমগ্র বিশ্বমানবের জন্য কল্যাণচিন্তা ও ত্যাগস্বীকার অবাস্তব বা অস্বাভাবিক নহে। 'দেশে দেশে মোর ঘর আছে' কিংবা 'কত ঘরে দিলে ঠাঁই' বলিয়া আকুল আনন্দে গৃহ হইতে দেশে, দেশ হইতে বৃহত্তর বিশ্বদেশে অহরহঃ চলিতে চাওয়ার অন্তহীন উদ্যত আবেগই এই প্রেম, এই প্রেমের বৈরাগ্য। এই বৈরাগ্য ব্যক্তিসাধনার ধ্যানানন্দে মানুষ হইতে দূরে রহিতে চাহে না; এই বৈরাগ্য ব্যক্তিসাধনার ধ্যান ও প্রেমের আনন্দ বিশ্বের মধ্যে বিকীরণ করিতেই চাহে। এইজন্য 'মানুষের মাঝখানে' এই বৈরাগ্য 'বাঁচিবারে' চায়। বেশ ধীরভাবে চিন্তা করিলেই বুঝা যায়, রবীন্দ্রনাথের এই বৈরাগ্য চিত্তবৃত্তিকে নিরুদ্ধ করিবার তত্ত্ব নহে, চিত্তকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে মুক্তি দিবার আনন্দ-তত্ত্বই এই বৈরাগ্য। ইহা প্রেমই বটে—বৃহত্তর প্রেম। জীব-প্রকৃতিতেও এই প্রেম বীজাকারে আছে বলিয়াই জীব চলিতে জানে অর্থাৎ ত্যাগ করিতে জানে। প্রেমের গতিবেগে এই ত্যাগ শূন্যতা নয়, পরন্তু আনন্দের পূর্ণতা। সতী নারী প্রিয়তমের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে—এই ত্যাগের মর্মমূলে আছে অপার্থিব আনন্দ; দেশের বা দশের জন্য আত্মত্যাগ করে শহীদ—তাহার এই ত্যাগের অন্তরে আছে অপরিমিত আনন্দের

আত্মপ্রেমে বিশ্ববোধ এবং বৈরাগ্য-চেতনা

ঐশ্বর্য। প্রেম হইতে সত্যবোধ, সত্যবোধ হইতে ত্যাগ, ত্যাগ হইতে আনন্দ; আবার এই আনন্দই হইতেছে প্রেম-বৈরাগ্যের অপর নাম।

রবীন্দ্রদর্শনের প্রধানতম প্রতিপাদ্য হইতেছে এই প্রেমবৈরাগ্য, ইহা বলাই বাহুল্য। এই প্রেমবৈরাগ্যই তাঁহার কাব্যমানসে উত্তরোত্তর উজ্জ্বলরূপে বিকশিত হইয়া পরিশেষে সমগ্রতার একটি অপরূপ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে [গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য]। এইজন্য রবীন্দ্রকাব্য ও দর্শন আলোচনায় কবিগুরুর প্রেমের স্বরূপ আমাদের স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া লইতে হয়। এই প্রেমবাদকে প্রাচীনপন্থী দার্শনিকদের প্রচলিত তত্ত্বধারায় প্রবাহিত করা যেমন যুক্তিযুক্ত নহে, তেমনি ইহাকে কবিজনোচিত স্বাতন্ত্র্যসাধনার একটি তত্ত্ববিশেষ বলিয়া উড়াইয়া দেওয়াও সমীচীন নহে। জীবপ্রকৃতির দুইপ্রকার প্রেমের কথাইতো রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করিয়াছেন। বিশেষে আসক্ত সংকীর্ণ প্রেমবৃত্তি মানুষের আছে, আবার এই মানুষই তপস্যার দ্বারা বিশ্ববিশেষের মূলাধার সেই মহা অশেষের প্রেমও অনুভব করে। তখন সে বিশ্বের হয়, কাহাকেও উপেক্ষা করে না, কিন্তু কাহাতেও আসক্ত রহে না; অথচ সকলের জন্য তাহার ত্যাগ দিগ্‌দিগন্তে প্রভাসিত হইতে থাকে। মাটির প্রদীপ একটা বিশেষ গৃহকেই আলোকিত করে—কিন্তু সূর্য আলোকিত করে বিশ্বগৃহ। বিশ্বের প্রতিটি অণুপরমাণু হইতে সুরু করিয়া নভশ্চুম্বী উত্তুঙ্গ পর্বতমালা তাহার আপনার, সকলের জন্যই তাহার উদয়, তাহার ত্যাগ।

প্রেমের দুইদিক

মানুষের প্রেম একদিকে মাটির প্রদীপ, অপরদিকে গ্রহেশ্বর জ্যোতির্ময় সূর্য। দুইই সত্য, দুইই বাস্তব। বলিতেছেন রবীন্দ্রনাথ:

'মানুষের একটা দিক আছে যেখানে বিষয়বুদ্ধি নিয়ে সে আপন সিদ্ধি খোঁজে। সেইখানে আপন ব্যক্তিগত জীবযাত্রা-নির্বাহে তার জ্ঞান, তার কর্ম, তার রচনাশক্তি একান্ত ব্যাপৃত। সেখানে সে জীবরূপে বাঁচতে চায়।

'কিন্তু মানুষের আর একটা দিক আছে যা এই ব্যক্তিগত বৈষয়িকতার বাইরে। সেখানে জীবনযাত্রার আদর্শে যাকে বলি ক্ষতি তাই লাভ, যাকে বলি মৃত্যু তাই অমরতা। সেখানে বর্তমানকালের জন্য বস্তু সংগ্রহ করার চেয়ে অনিশ্চিতকালের জন্য আত্মত্যাগ করার মূল্য বেশি। সেখানে জ্ঞান উপস্থিত প্রয়োজনের সীমা পেরিয়ে যায়, কর্ম স্বার্থের প্রবর্তনাকে অস্বীকার করে। সেখানে আপন স্বতন্ত্র জীবনের চেয়ে যে বড়ো জীবন, সেই জীবনেই মানুষ বাঁচতে চায়।

'স্বার্থ আমাদের যে সব প্রয়াসের দিকে ঠেলে নিয়ে যায় তার মূলপ্রেরণা দেখি জীবপ্রকৃতিতে; যা আমাদের ত্যাগের দিকে তপস্যার দিকে নিয়ে যায় তাকেই বলি মনুষ্যত্ব, মানুষের ধর্ম। [মানুষের ধর্ম, ভূমিকা]

'মানুষের ধর্ম'

অন্যত্র আবার :

'On the surface of our being we have the ever changing phases of the individual self but in the depth there dwells the Eternal Spirit of human unity beyond our direct knowledge.'
[*Religion of Man*, p. 17.]

সুতরাং :

'The individual man must exist for Man the great, and must express him in disinterested works, in science and philosophy, in literature and arts, in service and worship. This is his religion.' [Ibid]

মানুষের এই religion, এই ধর্ম, প্রেমেরই ধর্ম, প্রেমবৈরাগ্যের ধর্ম। এই ধর্মকে জীবন-নিরপেক্ষ তত্ত্বমাত্র মনে করিলে ভুলের প্রশ্রয়ই দেওয়া হইবে। যুগে যুগে মানুষ এই ধর্মের সাধনা করিয়াছে, আজও করিতেছে। জীবপ্রকৃতির মানুষ হইয়াও মানুষ তপস্যার দ্বারা বিশ্ব-প্রকৃতির মানুষ—Man, the great হইবার চেষ্টা করিতেছে, শুদ্ধমাত্র অহং-এর জন্য নয়, বহুর জন্য—আবার বহুকে মিলাইয়া মহান্ সেই একের মহিমাবিকাশের জন্য।

'সেই মানুষের উপলব্ধি সর্বত্র সমান নয় ও অনেকস্থানে বিকৃত বলেই সব মানুষ আজও মানুষ হয়নি। কিন্তু তাঁর আকর্ষণ নিয়ত মানুষের অন্তর থেকে কাজ করচে বলেই আত্মপ্রকাশের প্রত্যাশায় ও প্রয়াসে মানুষ কোথাও সীমাকে স্বীকার করচে না।'
[মানুষের ধর্ম : ভূমিকা]

মানুষ, এই কারণেই, নিজেকে লইয়া অথবা তাহার ক্ষুদ্র পরিবার লইয়া খুশি থাকে নাই, গোষ্ঠীর মধ্যে, সমাজের মধ্যে, রাষ্ট্রের মধ্যে, বিশ্বের মধ্যে নিজেকে বিলাইতে গিয়াছে ; শুধু তাহাই নহে—জগতের অতীতে অনাবিষ্কৃত আরো-জগতের সহিত সখ্য স্থাপনে আগ্রহ করিয়াছে প্রকাশ, সমগ্রকে আলিঙ্গন করিয়া সেই যে 'স একঃ', তাঁহাকে জানিবার জন্য রচিয়াছে ধর্ম-দর্শন, করিয়াছে কাব্য-সাহিত্য, গড়িয়াছে শিল্প-সংস্কৃতি। মানুষের ভুলভ্রান্তি প্রভূত, কিন্তু সকল প্রকার ভ্রান্তি অতিক্রম করিয়াও 'বিশ্বকর্মা মহাত্মার' উদ্দেশ্যে মঙ্গলপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসও তাহার প্রভূত। এই যে প্রয়াস, ইহার মূল অন্বেষণ করিলে অবশ্যই জানা যাইবে, প্রেমই ইহার মূলতত্ত্ব। প্রথমে আত্মপ্রেম, পরে বিশ্বপ্রেম, অর্থাৎ সর্বজগদ্‌গত আনন্দময় বৈরাগ্য-প্রেম।

রবীন্দ্রনাথের এই প্রেমবোধ, প্রেমের স্বরূপ ও ধর্ম সম্বন্ধে এই দর্শনধ্যান, বলাই বাহুল্য, কোনো প্রাচীনপন্থী তত্ত্বদর্শন হইতে আসে নাই। জীবনের নানা অভিজ্ঞতা হইতে খুব ধীরে ধীরে, অথচ নিশ্চিতভাবে, এই বোধ তাঁহার জীবনের দর্শনধ্যানে পরিণতি লাভ

করিয়াছে। আত্মপ্রেমের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে চাঞ্চল্য, যে উদ্যম, যে অস্থিরতা কবি অনুভব করিয়াছেন 'রাহুর প্রেমে' তাহার নিদর্শন আছে। আত্মপ্রেমের আতিশয্যে বিশ্বকে তিনি বিশাল আবেগে আত্মস্থ করিতে চাহিয়াছেন, না পাইয়া হাহাকার করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে 'মানসী'র অপেক্ষাকৃত অখ্যাত কবিতা 'প্রকৃতির প্রতি' একবার পাঠ করুন। পাঠক জানেন, প্রকৃতির রূপে কবি পরবর্তী জীবনে অরূপ দেখিয়াছেন, পরমের আনন্দরূপ লক্ষ্য করিয়া পরম প্রেরণা অনুভব করিয়াছেন, কিন্তু এই কবিতাটির অন্তর্নিহিত বেদনা ও হাহাকারের কারণটি একবার অনুসন্ধান করুন। সুধী পাঠক অবশ্যই বুঝিবেন যে, পূর্ণপ্রেমের অর্থাৎ বৈরাগ্যপ্রেমের আনন্দদৃষ্টিতে এখনও প্রকৃতিকে দেখা হয় নাই বলিয়া 'প্রকৃতির প্রতি' কবিতায় রূপদর্শনে দ্বন্দ্ব, বেদনা ও নৈরাশ্য প্রকাশ পাইয়াছে। আবার এই কবিতাই যে প্রেমানুগত প্রকৃতিবোধের সূচনা তাহা বুঝিতেও কিন্তু কিছুমাত্র বিলম্ব হয় না। 'সোনার তরী' হইতে কবির প্রেম 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' করিয়া বিশ্বময় ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়াছে—'শেষ লেখা'তেও যে তাহা থামিয়াছে, তাহার নিদর্শন নাই। বস্তুতঃ, প্রেমের পক্ষে নিত্য সন্ধান এবং সন্ধান করিতে করিতে নিত্য অগ্রগতিই সত্য; ধ্রুবকে পাইয়া গিয়া, সুস্থির হইয়া, শান্তিলাভের তত্ত্বরস আস্বাদন করা মনোময় প্রেমের ধর্ম নহে।

দার্শনিক বলেন :

'বিশ্বজগতের মধ্যে যে অপ্রমেয় ধ্রুব রহিয়াছেন, তিনি বাহ্যত একভাবে কোথাও প্রতিভাত নহেন—মনই নানার মধ্যে সেই একত্বে দেখে, সেই একত্বে প্রার্থনা করে, সেই একত্বে আশ্রয় করিয়া আপনাকে চরিতার্থ করে। নানার মধ্যে সেই একত্বে পাইলে মনের সুখশান্তিমঙ্গল নাই, তাহার উদ্‌ভ্রান্ত-ভ্রমণের অবসান নাই।…মন আপনার স্বাভাবিক ধর্মবশতই কখনো জানিয়া, কখনো না জানিয়া, কখনো বক্রপথে, কখনো সরলপথে, সকল জ্ঞানের মধ্যে—সকল ভাবের মধ্যে অহরহ সেই পরম ঐক্যের পরম আনন্দকে সন্ধান করিয়া ফিরে।' [প্রাচীন ভারতের 'একঃ', ধর্ম]

এই সন্ধানের কিন্তু শেষ নাই কখনও। কবিগুরুর মনোদর্শনে শেষকথা বলার ভ্রান্তিবিলাস যেমন নাই, তাঁহার কাব্যমানসে চরমকে পাওয়ার শান্তিবিলাসও তেমনি নাই। ['অচলায়তনের' গোঁড়াদের বিরুদ্ধে কবির শ্লেষ স্মরণ করুন, 'ফাল্গুনী' নাট্যের নিত্যগতির অবারিত আনন্দও স্মরণীয়।]; মনোদর্শনের তথা কাব্যমানসের সকল কথার সারকথা তাই নিত্য চলা, নিত্য কর্ম, নিত্য সাধনা, নিত্য সন্ধান। এই সন্ধানই সাধককে জানাইয়া দেয় যে, ইন্দ্রিয়প্রেম অসত্য নহে বটে, কিন্তু ইহাকে উত্তীর্ণ না হইলে প্রেমের সর্বব্যাপিত্ব উপলব্ধ হয় না, বিশ্বের সহিত তথা ব্রহ্মের সহিত সত্যভাবে সংযোগ স্থাপনও সম্ভব হয় না। ইন্দ্রিয়বোধে জীবনের সহিত আমাদের আংশিক পরিচয় ঘটে—কিন্তু পূর্ণ পরিচয় ঘটে প্রেমবোধের মাহাত্ম্যে। জগৎ বা জীবনের কোনো পরিচয়ই পূর্ণ নয়

অর্থাৎ সত্য ও সুন্দর নয়, যতক্ষণ না আমরা প্রেমাশ্রিতরূপে তাহা দর্শন করিতে শিখি। ব্রহ্মাশ্রিত জগৎ যেমন সত্য, প্রেমাশ্রিত জগৎ তেমনি সুন্দর; প্রেমব্রহ্মের আশ্রয়ে কণীয়ান্ হইতে সুরু করিয়া মহীয়ান্ পর্যন্ত সমস্তই সত্য, সুন্দর এবং মঙ্গলেরই দ্যোতক। [The Music Maker, *Religion of Man*, p. 119.]

ইন্দ্রিয়বোধ হইতে প্রেমবোধে নিত্য অগ্রগতির ভাবই রবীন্দ্রনাথের মনোভাব। পাঠক 'মনোভাব' কথাটি এইস্থলে চিহ্নিত করিবেন, কেননা 'মন' শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিতেছি। পাঠক মহাশয় জানেন, বেদান্তে 'মন' হইতেছে তৃতীয় লোকের ভাব—তাহা অন্নময় লোকের তামসক্ষুধার ভাব নহে, প্রাণময় লোকের রাজস চাপল্যের ভাবও নহে, তাহা মনোময় লোকের প্রেমপন্থাভিমুখী সাত্ত্বিক আনন্দভাব। এই 'ভাব' ধূলিলিপ্ত সাংসারিকতার মলিনাবাসনা হইতে ঊর্ধ্বে বটে, কিন্তু জীবন-নিরপেক্ষ নির্বিশেষ 'চতুর্থ' ভাবের অনেক নিম্নস্তরেই ইহার অবস্থিতি। 'মনোভাব' হইতেছে মধ্যপথের অর্থাৎ দুইদিক রাখিয়া সমন্বয়ের ভাব—ইহার একদিকে ইন্দ্রিয়বোধের বাস্তবভাব, অপরদিকে অতীন্দ্রিয় বিজ্ঞানতত্ত্বের সমাধিভাব। 'মন' বলিতে আমি তাই মধ্যগ ভাবকেই বুঝিয়া থাকি। 'মনোভাব' বলিতে আমি ইহাই বুঝাইতে চাই যে, যে ভাব সংসারে রহিয়াও সংসারের ঊর্ধ্বলোকে, আবার ব্রহ্মাভিমুখী হইয়াও সংসারলোকে—সেই ভাবই 'মনোভাব'। বেদান্ত অনুসরণে এই ভাবদর্শনকে আপনি 'মনোদর্শন' নামে অভিহিত করিতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথের 'মনোভাব'

প্রেমই রবীন্দ্রদর্শনের প্রতিপাদ্য ও সাধ্যবস্তু বলিয়া তাঁহার দর্শনের স্বরূপ বিজ্ঞান নহে, মন; শেষকথা নহে, মধ্যপথের মধুরকথা। অর্থাৎ, শেষের দিকে তাঁহার টানটি আছে বটে, কিন্তু গোড়ার দিকে প্রাণও না থাকিয়া পারে নাই। অথচ কেবলমাত্র গোড়ার জগৎএ অর্থাৎ অহংময় বাসনাজগতেই মন স্থির নহে, তাই সাধনা, গতি, বৈচিত্র্যে আনন্দ, বৈচিত্র্যের অন্তরে একের আভাস দর্শনে বিপুল বিরহের পুলকোচ্ছ্বাস। এই কথাগুলি রবীন্দ্রদর্শনের ভাষ্যকারদের ধীরভাবে একবার চিন্তা করিতে অনুরোধ করিতেছি। রবীন্দ্রকাব্যের ন্যায় রবীন্দ্রদর্শনেরও স্বরূপ যে 'মন' সেইকারণে গতির আনন্দ, পরন্তু শান্তি নহে অর্থাৎ নির্বিশেষ সমাধির মনোবিহীন নিস্তরঙ্গতা নহে—তাহা বুঝিতে পারিলেই দার্শনিক রবীন্দ্রনাথকে কবি রবীন্দ্রনাথ হইতে পৃথক করিয়া দেখিবার ভ্রান্তিবিলাস অচিরাৎ বিদূরিত হইবে। এই গ্রন্থের 'সূচনা' হইতে বর্তমান পংক্তি পর্যন্ত এই তুচ্ছ কথাটাই নানাভাবে বলিবার চেষ্টা করিতেছি। 'মন' নামক অধ্যায়ে দেখাইয়াছি, রবীন্দ্রনাথের মন ইন্দ্রিয়বোধ হইতে প্রেমবোধে অহরহঃ অভিসার করিয়াছে। 'ব্রহ্ম' নামক অধ্যায়ে বলা হইয়াছে—মন দিয়া যে ব্রহ্মকে ধারণা করিতে পারি, মনের সমুচ্চস্তরে অর্থাৎ প্রেমবোধের উত্তুঙ্গলোকে উন্নীত হইয়া যে ব্রহ্মকে ধ্যান করি, মানসস্বপ্নে দর্শন করি,

রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্ম সেই মনোব্রহ্ম, প্রেমব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম অদ্বৈতই বটেন, কিন্তু মন দ্বারা এই ব্রহ্মকে জানি বলিয়া দ্বৈত ভাবও সত্য বলিয়া মনে হয়। মন ত্যাগ করে অনেক, কিন্তু নিজেকে ত্যাগ করিতে চাহে না। তা যদি চাহিত, তবে তাহা আর 'মন' থাকিত না, চতুর্থতত্ত্বে লীন হইত। তখন সেই চতুর্থ-দর্শনকে আর 'মনোদর্শন' নামে অভিহিত করিতাম না। প্রাচীনপন্থী অদ্বয়দর্শনের তাহা গতানুগতিক অনুসৃতি বলিয়া প্রসঙ্গ শেষ করিতাম। রবীন্দ্রদর্শনে কিন্তু তাহা করার উপায় নাই। রবীন্দ্রনাথে 'মন আছে' এই ইতি-আদেশটি ভুলিলে চলে না। বলা বাহুল্য, মনের এই অস্তিত্ববোধই সময় সময় দ্বৈতদর্শনে বিশ্বাস আনে। মন ব্রহ্মে আছে—এই ধারণায় অদ্বৈততত্ত্বে বিশ্বাস হয়; আবার মন ব্রহ্মকে ধারণা করিতেছে এই ভাব থাকায় দ্বৈত-তত্ত্বেরও উদ্ভব হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রেমদর্শনে তাই অদ্বৈতও সত্য, দ্বৈতও সত্য বলিয়া স্বীকৃত। রবীন্দ্রনাথ বলেন :

'দর্শনশাস্ত্রে মস্ত একটা তর্ক আছে ঈশ্বর পুরুষ কি অপুরুষ, তিনি সগুণ কি নির্গুণ, তিনি Personal কি Impersonal? প্রেমের মধ্যে হাঁ না একসঙ্গে মিলে আছে। প্রেমের একটা কোটি সগুণ, আর একটা কোটি নির্গুণ। তার একদিক বলে আমি আছি, আর একদিক বলে আমি নেই। 'আমি' না হোলেও প্রেম নেই, 'আমি' না ছাড়লেও প্রেম নেই। সেইজন্যে ভগবান সগুণ কি নির্গুণ সে সমস্ত তর্কের কথা কেবল তর্কের ক্ষেত্রেই চলে, সে তর্ক তাঁকে স্পর্শও করতে পারে না।" [সামঞ্জস্য, শান্তিনিকেতন]

উপর্যুক্ত কথাগুলি অনুসরণ করিলেই রবীন্দ্রমানসের দ্বৈতাদ্বৈতভাবটি, সর্বোপরি দুইদিক বজায় রাখিবার মনোভাবটি দিনের আলোর ন্যায় স্পষ্ট হইয়া যাইবে। 'আমি না হোলেও প্রেম নেই' এই বাক্যের দ্বারা মনের অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করিতেছেন; 'আমি না ছাড়লেও প্রেম নেই' এই বাক্যের ইঙ্গিতে তিনি অহং বা ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তিকে উত্তীর্ণ হইবার নির্দেশ দিতেছেন। তাৎপর্য এই, মনের নীচের তলাকার মলিনাবাসনা ত্যাগ করিয়া মনের উপর তলাকার শুদ্ধাবাসনায় উত্তীর্ণ হইলে পর প্রেম-ব্রহ্মের, সর্বজগদ্‌গত সর্বানুভূ প্রেমের উপলব্ধি সম্ভব। প্রণিধানযোগ্য কথা এই, ব্রহ্মচিন্তার ব্যাপারেও রবীন্দ্রনাথ মন ত্যাগ করার কথা বলেন না, কুত্রাপি বলেন নাই।

মনোদর্শনে দ্বৈত, অদ্বৈত

ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতি এবং প্রকৃতি হইতে মানব রাজ্যে ইহার পর নামিয়া আসুন, সেখানেও দেখিবেন রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের আনন্দপ্রভাব। বলাই বাহুল্য, তাঁহার 'প্রকৃতি' শুদ্ধমাত্র বস্তুপ্রকৃতি, জড় প্রকৃতি নহে, তাঁহার 'মানব' কেবলমাত্র স্থূলধর্মী জীবমানব নহে। মন দ্বারা ব্রহ্ম ধ্যান করিয়া কবিগুরু ব্রহ্মকে যে স্তরে নামাইয়াছেন, ব্রহ্মাশ্রিত মনের মনস্বিতা ও প্রতিভাবলে তিনি প্রকৃতি ও মানবকে ঠিক সেই স্তরে তুলিয়া লইয়া গেছেন। ফলে তাঁহার ধ্যানে ব্রহ্ম, প্রকৃতি, মানব আপন আপন স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও এক অখণ্ডের আনন্দমূর্তিতে অর্থাৎ প্রেমের সর্বজগদ্‌গত মহিমায় প্রকাশ

ব্রহ্ম, প্রকৃতি, মানব

পাইয়াছে। পরবর্তী অধ্যায় দুইটিতে প্রকৃতি ও মানব সম্পর্কিত আলোচনায় আমি দেখাইয়া দিব কবিগুরুর 'প্রকৃতি' মনোময়ী প্রেমপ্রকৃতি, তাঁহার 'মানব' মনোময় প্রেম-মানব। বস্তুতঃ, রবীন্দ্রদর্শনে ব্রহ্ম, প্রকৃতি, মানব সমস্তই মনোময় প্রেমের আলোকে সমুজ্জল।

এইস্থলে একটি নূতন বিষয়ের অবতারণা করিয়া রাখি—পরে এই বিষয়টি লইয়া বিশেষভাবে আলোচনা করিব। বিষয়টি হইতেছে রবীন্দ্রনাথের বাস্তববাদ সম্পর্কে। কবিকে কেহই বাস্তববাদী বলেন না, আমিও বলি না, একথা বলাই বাহুল্য। তবে তাঁহার কাব্যদর্শনে কেমনতর বাস্তবধর্মের প্রত্যয় আছে, তাহা লইয়া বিচার করিবার প্রস্তাব আনিলে মন্দ হয় না। আমরা যাহারা নিতান্ত স্থূলজগতের ইন্দ্রিয়গত বাস্তব লইয়া বড়াই করি, তাহাদের নিকট কবিগুরুর মনোময় প্রেম অবাস্তব বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। কবি মোহিতলাল এই প্রেমকে জীবনের পক্ষে সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, ইহা কবিগুরুর 'স্বাতন্ত্র্য সাধনা' ছাড়া আর কিছু নহে বলিয়াই তাঁহার মনে হইয়াছে। আমি একথা স্বীকার করি নাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন সাধনার সর্বোচ্চ তত্ত্বের অর্থাৎ নির্বিশেষ তত্ত্বের তুলনায় রবীন্দ্রতত্ত্বকে একবার বিচার করিলেই রবীন্দ্রনাথের বাস্তবধর্ম প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। বুঝা যাইবে, জীবনানুগ তাঁহার ধর্ম, জগৎধর্মী তাঁহার সাধনা, তাঁহার কাব্যদর্শন, তাঁহার প্রেমতত্ত্ব। বৈদান্তিক নিবিশেষ তত্ত্বের দৃষ্টিতে দেখিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথের মনোদর্শনকে এক প্রকার বাস্তবধর্মী বলিয়াই আমার মনে হইয়াছে। আমার প্রস্তাব এই, নিম্নস্তরের বাস্তববোধ লইয়া রবীন্দ্রনাথের প্রেমতত্ত্ব বিচার করিবেন না, তাহাতে সুফলের সম্ভাবনা অল্প। একথা আপনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, অন্নময় জড় জগতের তামস দৃষ্টিতে প্রাণময় সৃষ্টি-প্রকৃতির রাজস লীলাকথা অবাস্তব বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহা অবাস্তব নহে। আবার প্রাণময় চপলজগতের অন্ধগতি-বেগের যাঁহারা দার্শনিক—তাঁহাদের যুক্তিবিচারে প্রেমকেন্দ্রাভিযাত্রী মনোময় জীবনগতির আনন্দ অবাস্তব বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহা অবাস্তব নহে। জীবন ও জগতের ক্ষেত্রে 'মন' একটি বাস্তব সত্য। ইহার নিম্নগত প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে আছি বলিয়া উচ্চধর্মী প্রবৃত্তিগুলিকে অবাস্তব স্বপ্নকল্পনা বলিয়া মনে হইতেছে। মনের নিম্নগত প্রবৃত্তির পথ বাহিয়া উচ্চধর্মী প্রবৃত্তিপথে জীবনের অভিযান-বাণীই রবীন্দ্রনাথের কাব্যে নানাছন্দে ও রূপে ক্রমশঃ রূপায়িত হইয়াছে। এই যে অভিযান, এই যে অগ্রগতি, ইহার মূল প্রাণশক্তি ও প্রেরণা হইতেছে প্রেম। রবীন্দ্রকাব্যসমূহে এই প্রেমের ক্রমবিকাশের ধারাটি যদি সন্ধান করা যায়, তবে কবির কাব্যমানসের বাস্তবাভিমুখী প্রেমের বিচিত্রগতির ঐক্যতত্ত্বটি সহজেই ধরা পড়িয়া যাইবে। বুঝা যাইবে, কেন দার্শনিক হিসাবে তিনি প্রেম ছাড়িয়া নির্বেগ বিজ্ঞানভূমে যোগসাধন করিবার তত্ত্ব স্বীকার করেন নাই [মানুষের ধর্ম], —কবি হিসাবে কেন তিনি অহংপ্রেমের অতিকৃতির মোহে, 'মৃত্যুর গুপ্ত প্রেমে' বন্দী রহেন নাই [বলাকা দ্রষ্টব্য]। বুঝা যাইবে, দার্শনিক হিসাবে কেন তিনি ব্রহ্মকে মনোজীবনে

নামাইয়াছেন, কবি হিসাবে প্রেমকে অহং হইতে বিশ্বে তুলিয়া ব্রহ্ম-সমীপে উপস্থাপিত করিয়াছেন। বুঝা যাইবে, ব্রহ্মাশ্রয়ী দার্শনিক হইয়াও অহংকে কেন অস্বীকার করেন নাই—মানুষের কবি হইয়াও কেন অহংএর মোহকে প্রেমরূপে রূপান্তরিত না করিয়া পারেন নাই।

বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ মধ্যপথাশ্রয়ী, তিনি মনোদার্শনিক। এইজন্য তাঁহার প্রেম মানবিকরূপ ধারণ করিয়াও ব্রহ্মাশ্রয়ী, ভাগবতরূপ ধারণ করিয়াও আবার মানবমুখী। কবিকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে হইলে কবিদার্শনিকের এই প্রেমধর্মের আনন্দ-দর্শন শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ করিতে হইবে। কবিদার্শনিকের সুরে সুর মিলাইয়া শান্ত ধ্যানমগ্ন আনন্দে গাহিতে হইবে :

প্রেমের আলোকে
বিকশিত হব আমি ভুবনে ভুবনে
নব নব পুষ্পদলে ; প্রেম আকর্ষণে
যত গূঢ় মধু মোর অন্তরে বিলসে
উঠিবে অক্ষয় হয়ে নব নব রসে
বাহিরে আসিবে ছুটি, অন্তহীন প্রাণে
নিখিল জগতে তব প্রেমের আহ্বানে
নব নব জীবনের গন্ধ যাব রেখে,
নব নব বিকাশের বর্ণ যাব এঁকে।
কে চাহে সংকীর্ণ অন্ধ অমরতা কূপে
এক ধরাতল মাঝে শুধু একরূপে
বাঁচিয়া থাকিতে ? নব নব মৃত্যুপথে
তোমারে পূজিতে যাব জগতে জগতে। [উৎসর্গ-৪৬]

তাই প্রার্থনা :

'আমাদের সমস্ত জ্ঞানের দ্বারা যেন শান্তকে জানিতে পারি, আমাদের সমস্ত কর্মের দ্বারা যেন শিবকে দেখিতে পাই, আমাদের সমস্ত প্রেমের দ্বারা যেন অদ্বৈতকে উপলব্ধি করি।' [শান্তং শিবমদ্বৈতম্, ধর্ম।]

পঞ্চম অধ্যায়

প্রকৃতি

"প্রকৃতি তাহার রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ লইয়া, মানুষ তাহার বুদ্ধি, মন, তাহার স্নেহ, প্রেম লইয়া আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে—সেই মোহকে আমি অবিশ্বাস করি না, সেই মোহকে আমি নিন্দা করি না। তাহা আমাকে বদ্ধ করিতেছে না, তাহা আমাকে মুক্তই করিতেছে; তাহা আমাকে আমার বাহিরেই ব্যাপ্ত করিতেছে। নৌকার গুণ নৌকাকে বাঁধিয়া রাখে নাই, নৌকাকে টানিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। জগতের সমস্ত আকর্ষণপাশ আমাদিগকে তেমনি অগ্রসর করিতেছে।" [বঙ্গভাষার লেখক, পৃ. ৯৮০]

পঞ্চম অধ্যায়

প্রকৃতি

প্রেম হইতে প্রকৃতিতে অবতরণের বাণী রবীন্দ্রদর্শনের ধর্মবাণী ; প্রকৃতির মধ্য দিয়া প্রেমের অভিমুখে অগ্রগতির বাণী রবীন্দ্রকবিতার মর্মবাণী।

অনুসন্ধিৎসু পাঠক একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবেন ব্রহ্ম হইতে প্রেমাস্বাদনের অনুভূতি লইয়া রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক মন ব্রহ্মেই লীন হইয়া যাইতে চাহে নাই, পরন্তু ধাপে ধাপে ধীরে ধীরে অবতরণ করিয়াছে পৃথিবীর পথে। প্রথমে প্রকৃতি, তাহার পর প্রকৃতি হইতে জগতে, জগত হইতে বিশ্বদেশে, বিশ্বদেশ হইতে স্বদেশে, স্বদেশ হইতে মানবে, মানবের বিচিত্র আবেগে, আবেগের মূল কারণ এই অহং-এ। প্রেমাশ্বিত মনের বিচারে অহং সত্য, সকলি সত্য, সকলি অসীমের অর্থাৎ প্রেমের দ্যোতক। এইজন্য প্রকৃতি মধুরা, জগৎ সুন্দর, বিশ্বদেশ মনোহর, স্বদেশ প্রাণপ্রিয়, মানুষ আত্মীয়, মানুষের আবেগগুলি ক্রমবিকাশের কল্যাণে প্রেমাভিমুখী—অহংএর ক্ষেত্র অত্যন্ত উর্বর, সোনার ধান ফলে এই ক্ষেত্রে।

রবীন্দ্রকবিতায় দেখি অহং হইতে জীবনের আরম্ভ। অহংদীপ্ত জড়মন লইয়া প্রকৃতিতে কবি আসিয়াছেন। দুঃখ, শোক, বিচ্ছেদের মধ্য দিয়া জীবনপথে চলিয়াছেন গতিশীল পথিক। প্রথম অবস্থায় পথে পথে যাহা দেখিতেছেন, অহংএর জড়দৃষ্টিতেই দেখিতেছেন। মাঝে মাঝে শঙ্কা জাগিতেছে, বিরোধ গুমরাইতেছে, সংশয় উঠিতেছে মাথা চাড়া দিয়া। কিন্তু 'যেদিন সংশয়ের ক্রন্দন আমাদের মধ্যে সত্য হয়ে ওঠে,···সেদিন আমরা এক মুহূর্তেই বুঝতে পারি প্রেম ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই' [শান্তিনিকেতন-১ম খণ্ড]। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে দেখি, অহংএর বৃন্তটি আশ্রয় করিয়াই প্রেমের অস্ফুট কলিকা দিল দেখা। ক্রমশঃ বিকশিত হইল রূপে-রসে-বর্ণে-গন্ধে। সেই রূপের আলোয়, রসের মাধুর্যে, বর্ণের শুভ্রতায় ও গন্ধের আনন্দে ঘর হইল মধুর, পর হইল সুন্দর। মানুষের তুচ্ছতা, ক্ষীণতা, দীনতা আর তেমন চোখে পড়িল না, চোখে পড়িতে লাগিল মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের সম্ভাবনার আনন্দ। রবীন্দ্রনাথ কহিলেন, এইটাই মানুষের সত্যকার স্বভাব, অর্থাৎ মানুষ অহংএর স্বার্থে লুপ্ত ও গুপ্ত থাকিবে ইহা তাহার স্বভাব নহে,—তাহার স্বভাব স্বার্থের বন্দিত্ব হইতে পরার্থের মুক্তির প্রাঙ্গণে বাহির হইয়া আসা—অসংখ্য বন্ধনের মধ্যে মুক্তির স্বাদ লাভ করা। রবীন্দ্রনাথ এইভাবে জীবন লাভ করিলেন ; মানুষ হইতে সমাজে, সমাজ হইতে রাষ্ট্রের মঙ্গলচিন্তায় মন দিলেন। জাগ্রত মন অর্থাৎ প্রেমাশ্রিত নির্মল মন যত বিস্তার লাভ করিল, ততই তাঁহার চিত্ত ছুটিতে চাহিল দেশ হইতে দেশান্তরে, স্বদেশ হইতে

অহং হইতে প্রেমে

বিশ্বদেশে, বিশ্বদেশ হইতে সমগ্র জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডে, বিশ্বব্যাপিনী এই বহুবর্ণে, বহুস্বর্ণে, বহুগানে, বহুধ্যানে বিমণ্ডিতা স্বভাবসুন্দরীর বিচিত্র ঐশ্বর্যে। সীমার অন্তরে তিনি অসীম দেখিলেন। অসীম দেখিতে দেখিতে উধাও হইলেন। যাহাকে চাই, তাহাকে আজও পাওয়া হইল না বলিয়া বিরহ করিলেন অনুভব। এই বিপুল বিরহ রবীন্দ্রকবিতার একটি বিশেষ দিক। এই বিরহই তাঁহাকে তুচ্ছে আসক্ত রহিতে দিল না কোনোদিন, টান দিল বিশ্ব হইতে বিশ্বান্তরে, অনন্ত ধ্যানানন্দের বিপুল বেদনায়। শেষে এমন ভাব আসিল যখন মন যাই-যাই করিল অহরহঃ। মনের সর্বোচ্চ শিখরে আকাশচারী বিহঙ্গমের মত ধারণাতীত সেই বিজ্ঞান-সৌন্দর্যের আকাশটি প্রায় স্পর্শ করিয়াই বুঝি ফেলিলেন।

কিন্তু মন ত্যাগ করিয়া ধারণাতীতের সৌন্দর্যে লীন হওয়া তাঁহার আদর্শ নহে। মন দিয়া অসীমের অর্থাৎ প্রেম-ব্রহ্মের যতটুকু বিভূতি তিনি আহরণ করিয়াছেন, তাহা লইয়াই অবতরণ করিলেন বিশ্বপ্রকৃতিতে। পৃথিবীর কবি পৃথিবীর নীড়ে ফিরিলেন। কিন্তু অসীম প্রেমব্রহ্মের অনন্ত আকাশের ধ্যানসৌন্দর্য স্পর্শ করিয়াছে তাঁহার চিত্ত—তাই পৃথিবীতে ফিরিয়া যাহা কিছু দেখিলেন, দেখিলেন সেই প্রেমকরোজ্জ্বল নির্মলোদ্দীপ্ত চিত্তের প্রসন্ন দৃষ্টি-আলোকে। তখন প্রকৃতি হইল মধুরা, জগৎ সুন্দর, বিশ্ব মনোহর, স্বদেশ প্রাণপ্রিয়, মানুষ মহান্।

সংক্ষেপতঃ কবি ও দার্শনিকের এই তো মিলনতত্ত্ব, প্রেমের তত্ত্ব। এই প্রেমের তত্ত্বটুকু বুঝিলেই কবির সহজতত্ত্বটুকু হৃদয়ঙ্গম হইবে। বলিয়াছি, ধর্মতাত্ত্বিক কোনো কৃচ্ছ্র সাধনার বিশেষ তত্ত্ব তাঁহার নহে। সহজভাবেই অহং হইতে দিনে দিনে প্রেম পর্যন্ত উত্তীর্ণ হওয়া, আবার সহজভাবেই প্রেম লইয়া ধীরে ধীরে অহং পর্যন্ত অবতরণ করিয়া প্রেমের অমৃতে অহংকে পরিশুদ্ধ করিয়া লওয়া—এই যে গতাগতি, ইহাই রবীন্দ্রদর্শনের সহজতত্ত্ব।

রবীন্দ্রনাথের সহজতত্ত্ব

সহজতত্ত্বের মূল বক্তব্যটুকু একটু কবিত্ব করিয়া বুঝাইতে গেলে ইহাই বলিতে হয় যে, দার্শনিক যখন উর্ধ্বলোক হইতে সূর্য আনিয়াছেন, কবি তখন নিম্নদেশ হইতে পৃথিবীকে গেছেন লইয়া। মধ্যপথে উভয়ের যখন মিলন ঘটিয়াছে—দেখা দিয়াছে সূর্যময়ী পৃথিবী। এই পৃথিবীর কবিও যিনি, দার্শনিকও তিনি।

রবীন্দ্রদর্শনের এই সহজ-তত্ত্বটা জানা হইলেই রবীন্দ্রকাব্য অত্যন্ত সহজ হইয়া যায়। কবি ও দার্শনিক এই দ্বৈত ব্যক্তিত্বের অদ্বৈত সামঞ্জস্যও তখন সহজবোধ্য হইয়া আসে। তখন রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্ম, প্রকৃতি বা জীবমানব সম্পর্কে আর কোনো জটিলতাও থাকে না।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে 'ব্রহ্ম' সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিয়াছি; পরবর্তী অধ্যায়ে 'মানব' সম্পর্কে আলোচনা করিব। বর্তমান অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি সম্পর্কিত বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করিতেছি

রবীন্দ্রদর্শনে ব্রহ্মের পরই প্রকৃতির মূল্য ও মর্যাদা। রবীন্দ্রনাথের মতে প্রকৃতি মায়া নহে, মিথ্যা নহে। প্রকৃতিকে যখন প্রেমস্বরূপ ব্রহ্মের আশ্রিতরূপে গ্রহণ করা হয়, তখন তাহার রূপের দর্পণে ব্রহ্মেরই রূপাতীত অরূপ দৃষ্টিগোচর হইতে পারে। সান্তের দর্পণে অনন্তকে দেখা তখনই সম্ভব হয়। প্রেমাশ্রিত প্রকৃতি প্রেমের মতই অনন্ত, প্রেমের মতই অসীম। কিন্তু প্রেম যেখানে নাই, প্রকৃতিকে যেখানে প্রেমের মধ্য দিয়া দেখা হয় না, সেখানে প্রকৃতি জড় বস্তুপিণ্ড ছাড়া আর কিছু নহে। তখন তাহার রূপে অরূপের আভাস কোথায়? তাহার কল্পনায় সর্বজগদ্‌গত সেই আনন্দ কোথায়?

রবীন্দ্রদর্শনে প্রকৃতি

মনের উত্তুঙ্গ শিখরে উন্নীত হইলে পর প্রেমের অনুভাব যখন রবীন্দ্রনাথের উপচীয়মান হইয়াছে, চোখ দিয়া নয়, মন দিয়াই তখন তিনি বিশ্ববসুন্ধরার রূপলীলা দেখিতে সুরু করিয়াছেন। প্রেমের মধ্য দিয়া মন প্রকাশিত হইতেছে—মন ক্রমশঃ লইতেছে প্রেমেরই রূপ। এই প্রেম-নন্দিত নির্মল মনের মধ্য দিয়া বিশ্ব প্রকাশিত হইতেছে, তাই বিশ্ব আর জড়বৎ পিণ্ডাকার নহে,—বিশ্ব তখন প্রেমসুন্দর মনেরই প্রতিরূপ বলিয়া 'গানে গন্ধে আলোকে পুলকে' পরিপূর্ণ রূপে প্রতীয়মান হইতেছে।

রবীন্দ্রদর্শনে প্রকৃতিদর্শনের অপর নাম হইতেছে দ্রষ্টার হৃদয়দর্শন, মনোদর্শন। মনের যে রূপ ও যে রঙ—প্রকৃতির ঠিক সেই রূপ, সেই রঙ। মন যখন অহংবন্দী, অন্নময় বাসনায় উন্মত্ত, প্রকৃতিও তখন প্রমত্তার ন্যায় প্রতীয়মানা—শ্মশানচারিণীর উলঙ্গ রুক্ষতায় বিদ্রোহিনী যেন বিশুষ্কমূর্তি। তখন সে তো মানুষের সখী নহে, সঙ্গিনী নহে, সে যেন দানবী, সে রাক্ষসী। কালী করালিনীর রোষদীপ্ত মারণমূর্তি লইয়া প্রলয়নৃত্যে সে তখন দিঙ্‌মণ্ডল কম্পিত প্রকম্পিত করে। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির তখনই বিরোধ, তখনই প্রকৃতির উপর জয়লাভ করিবার জন্য উদ্ধত, উদ্যত সংগ্রাম। তখনই মৃত্যুর ভয়ংকরতা, তখনই মৃত্যুর মধ্য দিয়া উন্মত্ত গতিবেগে অন্ধকারে ঝাঁপাইবার জন্য প্রাণ-প্রচেষ্টা। বিজয়ী হইতে পারিলে সাময়িকভাবে তখন আনন্দ, পরাজিত হইলে বিমর্ষচিত্তের দলিত যৌবন লইয়া অমঙ্গলের অধিষ্ঠাত্রী এই প্রকৃতির বিরুদ্ধে সহস্র অভিযোগ, অজস্র অভিশাপ।

আবার মন যখন প্রাণময় চাঞ্চল্যে বিক্ষুব্ধ, বিদ্রোহী, প্রকৃতিও তখন বিদ্রোহিনী। চঞ্চলা রণোন্মত্তা ধরা দিয়াও দেয় না ধরা। কুশাগ্রবুদ্ধি বৈজ্ঞানিক প্রতিভার বন্ধনে এই তাহাকে বন্দিনী করিলাম বলিয়া মনে করিতেছি, পরক্ষণেই দেখি চঞ্চলা মায়াবিনী কোন ফাঁকে বন্ধনমুক্ত হইয়া নবতর কোনো মায়ামূর্তি ধারণ করিয়াছে। বুদ্ধির অহংকার তখন লোপ পাইতে বসে। প্রকৃতির রহস্যান্ধকারের সম্মুখে বুদ্ধির আলোটুকু খদ্যোতের মত তখন নিষ্প্রভ হইয়া যায়। মনীষী বার্গসঁ-র ভাষায় মানুষ তখন ফুকারিয়া উঠে: পার্বত্য সুড়ঙ্গের অন্তহীন অমান্ধকারকে ছোট একটি লণ্ঠনের আলোয় কি দূর করিতে পারিব?

ক্ষুব্ধ মন—
বিরূপা প্রকৃতি

কিন্তু মন যখন মনোময় প্রশান্তির সাত্ত্বিকতায় প্রসন্ন, প্রকৃতির রূপ তখন সূর্যোজ্জ্বল। তখন মনে হয়, প্রকৃতি যেন রবিকরোজ্জ্বল একখানি প্রভাতের রূপ ধরিয়া নামিয়াছে। আকাশের সোনার আলো যেন তাহারি নগ্ন সৌন্দর্যের অনন্ত শুভ্রতার আনন্দ গেল গাহিয়া :

প্রসন্ন মন—
প্রেমাশ্রিতা প্রকৃতি

ওরে মন, খুলে দে মন.
যা আছে তোর খুলে দে!
অন্তরে যা ডুবে আছে
আলোক পানে তুলে দে!

তখন বর্ণে বর্ণে কত ঐশ্বর্য, ভাবে ভাবে কত প্রেরণা, সুরে সুরে কত সঙ্গীত-উচ্ছ্বাস। প্রকৃতি তখন সুন্দরী, শুধু সুন্দরী নহে, পরম সুন্দরের প্রতিরূপ। সীমারূপে সে তখন অসীমা।

আবার মন যদি আর মনে থাকিতে না চাহে, বিজ্ঞানময় যৌগিক ধ্যানে আত্মসমর্পণ করিয়া বিজ্ঞানই হইয়া যায়, প্রকৃতিও তখন বিজ্ঞানে বিজ্ঞান হইয়া রূপহীন নির্বিশেষ অরূপে যায় মিশিয়া। মনের যখন রূপ নাই, প্রকৃতিরও তখন রূপ নাই।

বিজ্ঞানমুখী মন—
অন্তর্হিতা প্রকৃতি

তাই বলিতেছি, মনের যে রূপ, প্রকৃতিরও সেই রূপ। কবি যে একদা খেলাভরে লিখিয়াছিলেন :

'পুষ্পবনে পুষ্প নাহি
আছে অন্তরে'— [গীতিমাল্য, স্বরবিতান]

তা যথার্থই সত্য।

অন্তর যখন পুষ্পবিকশিত নহে, পুষ্পবনের মূল্য তখন কানাকড়ি মাত্র। মন যেখানে সুন্দরকে দেখিবার জন্য অন্তরে-বাহিরে ব্যগ্র নহে, সেখানে সুন্দরের প্রকাশ অর্থহীন। জৈবজীবনের তুচ্ছ কতকগুলি বিকৃত চিন্তা লইয়াই যেখানে ব্যস্ততা, সেখানে প্রকৃতির রূপে সুন্দর দেখিবার মন কোথা, অনুভাব কোথা? 'আমাদের মনই আমাদের চোখকে চেপে রেখেছে—সে যে কত মাথামুণ্ড ভাবনা নিয়ে আছে তার ঠিকানা নেই—সেই অশন-বসনের ভাবনা নিয়ে সে আমাদের দৃষ্টিকে ঝাপসা করে রেখেছে—তাই আমাদের দৃষ্টি নির্মল নির্মুক্তভাবে জগতের সংস্রব লাভ করতেই পারে না।' [শান্তিনিকেতন-১ম খণ্ড]

রবীন্দ্রনাথ তাই 'হওয়ার' উপর বিশেষ জোর দিয়া থাকেন। প্রকৃতিকে চিনিতে হইলে আগে নিজে 'হইতে' হইবে, মনকে প্রস্তুত করিতে হইবে, সাধনার স্বভাবকে জানিতে হইবে অর্থাৎ প্রেমকে জানিয়া প্রকৃতির সহিত সখিত্ব করিলে সুফল ফলিবে। রবীন্দ্রদর্শনে, পূর্বেই বলিয়াছি, প্রেমাশ্রিতা প্রকৃতিই সত্য, প্রেমহীনা প্রকৃতি অহংমত্ত জীবের মতই মিথ্যা।

এই তত্ত্ব বা তত্ত্ববিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ কোনো পুঁথি হইতে বা কোনো দর্শন-মত হইতে গ্রহণ করেন নাই—তাঁহার উনচেতন-লোকের অন্ধকারের ভিতর দিয়া ক্রমে ক্রমে চেতন-লোকের আলোয় ইহা উদিত হইয়াছে [আত্মপরিচয় দ্রষ্টব্য]। তাঁহার বালক বয়সের রচনাগুলির মধ্যেও দেখিতে পাই, প্রকৃতির সহিত নিবিড়ভাবে সখ্য স্থাপনের দ্বারা এই তত্ত্ব ক্রমশঃ তিনি উপলব্ধি করিতেছেন—

> প্রকৃতি আছিল তার সঙ্গিনীর মত।
> নিজের মনের কথা যত কিছু ছিল
> কহিত প্রকৃতি দেবী তার কানে কানে। [কবিকাহিনী, প্রথম সর্গ]

কিন্তু যখনই অহংমত্ত কোনো জৈব-বাসনার মধ্য দিয়া প্রকৃতিকে দেখিতে বা বিচার করিতে গেছেন, তখনই তাঁহার সংশয় জন্মিয়াছে, তখনই মনে হইয়াছে প্রকৃতিতে আনন্দ নাই, সুখ নাই, স্বস্তি নাই, নাই মঙ্গল। 'কবিকাহিনী'তে দেখানো হইয়াছে, আপন মনের মাধুরী, ধৈর্য ও প্রেমের উপরই প্রকৃতির শান্ত রূপসৌন্দর্যের মহিমা নির্ভর করে। কবিকাহিনীর বালককবি প্রকৃতি হইতেই তাহা বুঝিয়াছিলেন।

'কবিকাহিনী'

'কাহিনীর' নায়ক একজন বালককবি। প্রকৃতিকে ভালোবাসিত প্রাণ ভরিয়া, কত কথা কহিত মনে মনে।

> শূন্য আকাশের পটে হে প্রকৃতি দেবী,
> কি কবিতা লিখেছ যে জ্বলন্ত অক্ষরে,
> যতদিন রবে প্রাণ পড়িয়া পড়িয়া
> তবু ফুরাবে না পড়া, [কবিকাহিনী, ১ম সর্গ]

—সে কহিত। কিন্তু হঠাৎ একদা সে অনুভব করিল—সে যেন 'আঁধার গৃহে রয়েছে পড়িয়া।' অশান্তি জাগিল, সংশয় জাগিল, নানাপ্রকার কামনায় চিত্ত হইল বিক্ষিপ্ত। সে মনে ভাবিল, কোনো মানবসঙ্গিনীকে পাইলে বোধহয় তাহার চিত্ত শান্ত হইবে। মানব-সঙ্গিনীর নাম নলিনী; আসিল, কিন্তু কই, 'প্রাণের শূন্যতা' তো ঘুচিল না। বিক্ষিপ্ত চঞ্চলের ন্যায় কবি তখন নলিনীকে ত্যাগ করিয়া বাহির হইল 'ভ্রমিতে পৃথিবী'। কিন্তু তবু শান্তি কোথা? কবি এবার ফিরিয়া আসিল, দেখিল নলিনী আর নাই, চিরকালের জন্য সে ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেছে।

সঙ্গিনীর মৃত্যু দেখিয়া আকস্মিক কী এক রহস্য-চেতনায় কবির চিত্ত হইল পরিপ্লুত। নলিনীকে সে যে কত গভীরভাবে ভালোবাসিত এইবার বুঝিল। সেই ভালবাসা কি ব্যর্থ হইবে? কবি কি তাহার সেই নিগূঢ় মনের প্রেমকে বিশ্বপ্রকৃতির সর্বত্র দেখিবে না?

নলিনী চলিয়া গেছে, তাহার জন্য প্রেম এখনও জাগিয়া আছে, শুধু নাই জৈববাসনার বুভুক্ষু আর্ততা—নিশ্চিন্ত হইল কবি। কামহীন প্রেমের সৌন্দর্য চোখ খুলিয়া দিল কবির। আর তো প্রকৃতিকে মিথ্যা বা অসৎ মনে হইতেছে না! কবি তখন গাহিল :

যা কিছু সুন্দর, দেবি, তাহাই মঙ্গল,
তোমার সুন্দর রাজ্যে হে প্রকৃতিদেবি,
তিল অমঙ্গল কভু পারে না ঘটিতে। [কবিকাহিনী, চতুর্থ সর্গ]

জৈব বাসনার বুভুক্ষা ও চিত্তচাঞ্চল্য প্রকৃতির সৌন্দর্য ও রূপোপলব্ধির পরিপন্থী, দার্শনিক তত্ত্ব-চিন্তনার দ্বারা আহৃত নীরস মানসবৃত্তিও তেমনি প্রকৃতির রূপোপলব্ধির অন্তরায়।

'প্রকৃতির প্রতিশোধে' সন্ন্যাসীর ধারণা ছিল এই যে, প্রকৃতি মায়াবিনী—নানা ফন্দি করিয়া সে মানবকে নানা বাসনার জালে জড়াইয়া রাখে। এই জন্য সে স্থির করিল মন হইতে প্রকৃতিকে সে একেবারে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে। নির্বিশেষ ব্রহ্মের সাধনায় সে বসিল। ক্রমে তাহার বিশ্বাস হইল এই যে, সাধনায় সে সিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ'

বসে বসে চন্দ্র সূর্য দিয়েছি নিবায়ে,
একে একে ভাঙিয়াছি বিশ্বের সীমানা,
দৃশ্য শব্দ স্বাদ গন্ধ গিয়েছে ছুটিয়া,
গেছে ভেঙে আশা ভয় মায়ার কুহক। [প্রকৃতির প্রতিশোধ, প্রথম দৃশ্য]

কিন্তু যেদিন সেই দীনা বালিকাটি তাহার আশ্রয়ে আসিল, পিতা বলিয়া ডাকিল, কোথা হইতে যেন অজস্র স্নেহের বন্যাধারা আসিয়া সন্ন্যাসীর মরুহৃদয় দিল প্লাবিত করিয়া।

আহা পিতা বলে কে ডাকিলি ওরে।
সহসা শুনিয়া যেন চমকি উঠিনু। [তদেব, চতুর্থ দৃশ্য]

কিন্তু মায়াবাদের সংস্কার কি সহজে দূর হয়? সন্ন্যাসী বালিকাকে আশ্রয় দিল, স্নেহ দিল, ভালোবাসিল, কিন্তু মুখে সে মায়াতত্ত্বের নানা ব্যাখ্যা করিল বালিকার কাছে।

জগৎ জীবন্ত মৃত্যু—অনন্ত যন্ত্রণা!
মরণ মরিতে চায়, মরিছে না তবু—
চিরদিন মৃত্যুরূপে রয়েছে বাঁচিয়া।
বিশ্ব মহা মৃতদেহ, তারি কীট তোরা
মরণেরে খেয়ে খেয়ে রয়েছিস্ বেঁচে,—
দুদণ্ড ফুরায়ে যাবে কিলিবিলি করি,
আবার মৃতের মাঝে রহিবি মরিয়া। [তদেব, চতুর্থ দৃশ্য]

এত সব তো কহিল, কিন্তু বালিকার স্নেহ-সন্নিধানে ক্রমশঃ তাহার চিত্তে প্রশান্তি নামিল, কেমন যেন মনে হইল, জগৎ মধুর, প্রকৃতি সুন্দরী। সন্ন্যাসীর চিত্তে সংশয় জাগিল—এ কী, মন এমন স্নিগ্ধ হইয়া উঠিতেছে কেন ?

এ কী রে মদিরা আমি করিতেছি পান !
এ কী মধু অচেতনা পশিছে হৃদয়ে !
এ কী রে স্বপন ঘোরে ছাইছে নয়ন ! [তদেব, ষষ্ঠ দৃশ্য]

সহসা সন্ন্যাসী বিক্ষিপ্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ভূমিতে পদাঘাত করিয়া বালিকাকে ভর্ৎসনা করিল পরুষকণ্ঠে—

আমি যে সন্ন্যাসী যোগী মুক্ত নির্বিকার,
সংসারের গ্রন্থিহীন, স্বাধীন সবল,
এ ধুলায় ঢাকিবি কি আমার নয়ন ! [তদেব, ষষ্ঠ দৃশ্য]

কিন্তু পরক্ষণেই দীনা বালিকাটি করুণ নয়নে তাহার দিকে তাকাইয়া আছে দেখিয়া স্নেহবিগলিত কণ্ঠে কহিল—

বাছা রে অমন করে চাহিয়া কেন রে !
কেন রে নয়ন দুটি করে ছল ছল !
জানিস্ নে তুই মোরা সন্ন্যাসী বিরাগী,
আমাদের এ সকল ভালো নাহি লাগে। [তদেব, ষষ্ঠ দৃশ্য]

কিন্তু ক্রমশঃ ভালো লাগিল। বিশ্বসংসারকে ক্রমশঃ মধুর বলিয়াই মনে হইল। বালিকাকে সে আর ত্যাগ করিয়া কোথাও যাইবে না স্থির করিল। বদ্ধ গুহায় আর তাহার যেন মন টিকিল না। বালিকাকে কহিল—

আয় বাছা, মোরা দোঁহে বাহিরেতে যাই
চাঁদের আলোতে গিয়ে বসি একবার।
(বাহিরে আসিয়া)
আহা এ কী সুমধুর ! এ কী শান্তি সুধা !
কী আরামে গাছগুলি রয়েছে দাঁড়ায়ে !
মনে সাধ যায় ঐ তরু হয়ে গিয়ে
চন্দ্রালোকে দাঁড়াইয়া স্তব্ধ হয়ে থাকি।
ধীরে ধীরে কত কী যে মনে আসিতেছে।
অতীতের অতি দূর ফুলবন হতে
বায়ু যেন বহে আসে নিঃশ্বাসের মতো,
সাথে লয়ে পল্লবের মর্মর-বিলাপ
মিলিত জড়িত শত পুষ্পগন্ধরাশি। [তদেব, অষ্টম দৃশ্য]

ইহার পরও কিন্তু দ্বন্দ্ব জাগিল আবার। যতদিন ঐ মায়াবাদী দার্শনিকতার সংস্কার রহিল তাহার মধ্যে, ততদিন সে পরিপূর্ণ ভাবে জগৎ বা প্রকৃতিকে গ্রহণ করিতে পারিল না। বালিকার স্নেহে সে জড়িত হইয়া পড়িতেছে, প্রকৃতির মুখে সে রূপ দেখিতেছে মধুরার—

এ কী রে চলেছি কোথা, এসেছি কোথায়!………
এখনি ছিঁড়িয়া ফেল্ স্বপনের মায়া। [তদেব, অষ্টম দৃশ্য]

এই বলিয়া একদা সে বালিকাকে একাকিনী রাখিয়া পলাইল গোপনে। ভাবিল, বন্ধন হইল ছিন্ন।

এসেছি অনেক দূরে—আর ভয় নাই।
পায়েতে জড়াল লতা, ছিন্ন হয়ে গেল। [তদেব, একাদশ দৃশ্য]

কিন্তু সত্যই কি ছিন্ন হইল? বালিকাটিকে অহরহঃ সে মনে পড়িল। কবিকাহিনীর বালককবির মতো, প্রতিশোধের সন্ন্যাসীও দূরে গিয়া ভুলিতে পারিল না বালিকাকে। আবার তাহাকে ফিরিতে হইল। কিন্তু আর কি সে বালিকাকে পাইল?

'কাহিনী'র কবির মত 'প্রতিশোধে'র সন্ন্যাসীও বালিকাকে হারাইল বটে কিন্তু মানুষের জগৎকে পাইল ফিরিয়া, সৌন্দর্যের প্রকৃতিকে পাইল ফিরিয়া। ভ্রান্ত সন্ন্যাসিতা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী এইবার লোকসমাজে আসিল। বড় করুণ কণ্ঠেই মানুষকে ডাকিয়া কহিল—

এস ভাই, আজ মোরা করি কোলাকুলি।
আমিও যে একজন তোমাদের মতো,
তোমাদেরি গৃহমাঝে নিয়ে যাও মোরে। [তদেব, পঞ্চদশ দৃশ্য]

'কাহিনী' বা 'প্রতিশোধে'র প্রতিপাদ্য এই—বাসনাবিশেষের প্রভাবে বিকৃত মন নহে, নির্বিশেষের সাধনায় নির্বিকার মনও নহে—দুইয়ের মধ্যবর্তী প্রেমশান্ত নির্মল মনই প্রকৃতির রূপোপলব্ধির অনুকূল। লক্ষণীয় বিষয় এই, কবির জীবন-দর্শনের মূলকথা ও তত্ত্ববিশ্বাস ইহাই। কবির বালকবয়সের রচনাগুলির মধ্যেই যে ইহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, 'কাহিনী' ও 'প্রতিশোধ' তাহার প্রমাণ। তবে একথা স্বীকার অবশ্যই করিতে হইবে যে, বালকবয়সে তিনি যে প্রেম অনুভব করিয়াছেন, তাহার মধ্যে সর্বজগদ্গত প্রেমের অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ভাগবত প্রেমের মহিমা নাই। মানব প্রেমের মধ্য হইতে যে স্নিগ্ধতা তিনি অনুভব করিয়াছেন, তাহারি আবেগে তিনি প্রকৃতির রূপবিভায় দৃষ্টি ফিরাইয়াছেন, ইহাতে যে প্রকৃতি মধুরারূপে প্রতীয়মানা হয় নাই তাহা বলি না, কিন্তু মানবপ্রেম যেহেতু চিত্তবাসনার উত্থান পতনে বাড়ে বা কমে, সেই হেতু মানবপ্রেমের মধ্য দিয়া যতদিন তিনি প্রকৃতিকে দেখিয়াছেন, ততদিন তাঁহার প্রকৃতি নির্মেঘ সনাতন আনন্দচ্ছবির বিগ্রহরূপে

বালককালের প্রকৃতিচেতনা

অধিষ্ঠিত হইতে পারে নাই, পরন্তু কখনও আশাময়ী, কখনও নৈরাশ্যময়ী, কখনও আনন্দিতা, কখনও আনন্দবিহীনা বলিয়া প্রতীয়মানা হইয়াছে। আসল কথা, সর্বজগদ্গত ভাগবত প্রেমই ধ্রুব প্রেম, শাশ্বত প্রেম। এই শাশ্বত ধ্রুবের মধ্য দিয়া দেখিলে তবেই মানবপ্রেমও ধ্রুব বলিয়া উপলব্ধ হইতে পারে, তবেই প্রকৃতির রূপে সনাতন একটি নির্মল সৌন্দর্যের লীলা দেখা সম্ভব হয়। বালক বয়সের কবিতাগুলির মধ্যে প্রেমই আছে, ইহা অস্বীকার করি না; তবে ধ্রুবের মধ্য দিয়া এই প্রেম তখনও প্রকাশিত নহে বলিয়া তৎকালীন প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতাগুলির ভাবে চঞ্চল চিত্ত-প্রকৃতিরই প্রকাশ দেখা যায়।

সন্ধ্যাসঙ্গীতের 'পরিত্যক্ত' কবিতাটি স্মরণ করুন :

বসন্ত চলিয়া গেলে বর্ষা কেঁদে কেঁদে বলে,
'ফুল গেল, পাখী গেল—
আমি শুধু রহিলাম, সবই গেল গো।'
দিবস ফুরালে রাত্তি স্তব্ধ হয়ে রহে,
শুধু কেঁদে কহে,
'দিন গেল, আলো গেল, রবি গেল গো—
কেবল একেলা আমি, সবই গেল গো।'

ইংরেজ কবি শেলির 'The joy has taken flight'-এর ঝংকার কবিতাটিতে রহিয়াছে। বালকবয়সের রচনাহিসাবে বেশ প্রশংসনীয় রচনা সন্দেহ নাই, কিন্তু মনোদর্শনের বিচারে ইহার চিত্তপ্রকৃতি যে যথার্থভাবে রাবীন্দ্রিক নহে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। সব চলিয়া যায়, সবি চলিয়া গেল—প্রকৃতির রূপে অহরহঃ এই মনোভাব ও শোকচ্ছায়া দর্শন জড়ীয় প্রেমাবেগের লক্ষণ। রবীন্দ্রনাথ যতদিন না চিত্তের এই জড়ীয় আবেগ কাটাইয়াছেন, ততদিন তাঁহার প্রকৃতি জীবন্ত লাবণ্যে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে নাই।

'সন্ধ্যাসঙ্গীত'

'হৃদয়ের গীতিধ্বনি' কবিতাটি পড়ুন :

এ প্রাণের ভাঙা ভিতে স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে
ঘুঘু এক বসে বসে গায় একস্বরে,
কে জানে কেন সে গান গায়।
গলি সে কাতর স্বরে স্তব্ধতা কাঁদিয়া মরে
প্রতিধ্বনি করে হায় হায়। [সন্ধ্যাসংগীত]

প্রাণের অশান্ত নৈরাশ্য কয়েকটি সোজাকথায় চমৎকার ফুটিয়াছে, কিন্তু সবার উপরে এই 'ভাঙা ভিত' 'দ্বিপ্রহর' 'ঘুঘু' প্রভৃতি শব্দের অন্তর ভেদ করিয়া প্রকৃতির শ্মশানকল্প রুক্ষ রূপের দারিদ্র্য কি প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে না?

সন্ধ্যাসঙ্গীত হইতে এইরূপ দুঃখমূর্তি প্রকৃতিচিত্রের আরো কয়েকটি উদাহরণ উদ্ধৃত করা যায়। যেমন ধরুন—

ধীরে ধীরে সন্ধ্যার বাতাস
প্রতিদিন আসে মোর পাশ !
দেখে, আমি বাতায়নে, অশ্রু ঝরে দুনয়নে,
ফেলিতেছি দুখের নিঃশ্বাস।
অতি ধীরে আলিঙ্গন করে,
কথা কহে সকরুণ স্বরে,
কানে কানে বলে 'হায় হায় !'
কোমল কপোল দিয়া কপোল চুম্বন করি
অশ্রুবিন্দু সুধীরে শুকায়। [আবার, সন্ধ্যাসংগীত]

কি—

রহিনু দু'দিন।
এখনো রয়েছে শীত, বিহঙ্গ গাহে না গীত,
এখনো ঝরিছে পাতা, পড়িছে তুহিন। [দুইদিন, তদেব]

সন্ধ্যাসঙ্গীত হইতে যে কয়েকটি কবিতাংশ উদ্ধৃত করিলাম মর্মতঃ সেগুলি প্রেমের কবিতা—কিন্তু এই প্রেম অহংমত্ত বাসনার সংস্কারে তখনও বন্দী বলিয়া কবির হৃদয় প্রকৃতির রূপে শান্তির সৌন্দর্য দেখিতে পায় না। বাসনার স্বভাবই এই, যখন সে পরিতৃপ্ত, তখন সে পরিতৃপ্তির একপ্রকার জৈব আনন্দ দেখে দিশি দিশি। কিন্তু বাসনা যদি পরিতৃপ্তির পথে বাধা পায়, তবে সে জগৎকে আর সুন্দর বলিয়া স্বীকার করে না। এইজন্য শিল্পীকে অহংমত্ত বাসনার বন্ধন ত্যাগ করিতেই হয়। সৌভাগ্যক্রমে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ দৈববলেই যেন এই বন্ধন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন।

'প্রভাত সঙ্গীত'

প্রেমের মধ্য দিয়া প্রকৃতি দেখিবার আনন্দ আকস্মিক বিদ্যুচ্ছটার মতই হৃদয় মধ্যে যেন আসিয়া পড়িল। 'প্রভাতসঙ্গীতে' তাঁহার হৃদয় গেল খুলিয়া—মধুর মধুর মনে হইল বিশ্বভুবন। নবজীবনের নূতন 'প্রভাত উৎসবে'—

তরুণ আলো দেখে পাখীর কলরব···
মধুর আহা কিবা মধুর মধু সব !
মধুর মধু আলো, মধুর মধু বায়,
মধুর মধু গানে তটিনী বহে যায় !
যেদিকে আঁখি চায় সেদিকে চেয়ে থাকে,
যাহারি দেখা পায় তারেই কাছে ডাকে,

নয়ন ডুবে যায় শিশির আঁখিধারে
হৃদয় ডুবে যায় হরষ-পারাবারে।

[প্রভাত উৎসব, প্রভাতসঙ্গীত]

আবার 'ছবি ও গানে' আনন্দ-আবেশ আরো যেন ঘনীভূত হইল। যাহা চোখে পড়িল সকলি মনে হইল সুন্দর। অসুন্দরও সুন্দর, বিকৃতও সুন্দর;—সুন্দর সুন্দর, জগতে অসুন্দর কিছু নাই। মধুর মধুর, জগতে অমধুর বলিয়া কিছু নাই।

'ছবি ও গান'

মধুর আলস, মধুর আবেশ,
মধুর মুখের হাসিটি,
মধুর স্বপনে প্রাণের মাঝারে
বাজিছে মধুর বাঁশিটি। [সুখস্বপ্ন, ছবি ও গান]

এইরূপে মন মধুর রসাবেশে যত পরিপ্লুত হইল, বাসনাবিশেষের বন্দিত্ব হইতে মুক্তি পাইয়া মন যত বিহার করিল রূপ হইতে রূপে, প্রেম ততই প্রভাসিত হইল তাঁহার অন্তরের আনন্দ-জগতে।* ক্রমশঃ এই প্রেমকেই তিনি 'অনন্ত' বলিয়া উপলব্ধি করিলেন। তখন হইতেই তাঁহার 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' গেল সুরু হইয়া। রূপ তখন রূপে থাকিয়াও রূপত্ব ত্যাগ করিল, অরূপের আনন্দে হইল নিরুদ্দেশ। রূপের সীমায় কবি তখন আর রূপই শুধু দেখিলেন না, দেখিলেন অন্তর্নিহিত অরূপের ইঙ্গিত। 'জ্যোৎস্না রাত্রের রূপচ্ছবি'র অন্তরালে অরূপা যে 'জ্যোতির্ময়ী' ইন্দ্রিয়ের আড়ালে বিরাজ করিতেছে, কবি তাহারি রূপমহিমা যেন দর্শন করিলেন। ক্রমশঃ এই দর্শনশক্তির সম্মুখেই প্রতিভাত হইল সর্বজগদ্গত 'প্রেমের' মহিমময় অনুপম রূপ। এই রূপের আশ্রয়ে প্রকৃতি হইয়া গেল অনির্বচনীয়া।

কবির কাব্যে ও দর্শনে, প্রকৃতি তাই মায়া নহে, সত্যস্বরূপা। 'আত্মপরিচয়' নামক গ্রন্থে কবি স্পষ্টই লিখিয়াছেন—'প্রকৃতি তাহার রূপরসবর্ণগন্ধ লইয়া, মানুষ তাহার বুদ্ধিমন তাহার স্নেহপ্রেম লইয়া আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে—সেই মোহকে আমি অবিশ্বাস করি না, সেই মোহকে আমি নিন্দা করি না। তাহা আমাকে বদ্ধ করিতেছে না, তাহা আমাকে মুক্তই করিতেছে, তাহা আমাকে আমার বাহিরেই ব্যাপ্ত করিতেছে।'

প্রকৃতিতে মুক্তিচেতনা

প্রকৃতিকে প্রেমব্রহ্মে যুক্ত করিয়া দেখিতে শিখিলে, রবীন্দ্রনাথের ধারণা এই, প্রকৃতি তখন চিত্তকে বদ্ধ করে না, কেন না প্রকৃতি তখন রূপের মধ্য দিয়া অরূপের ইঙ্গিতে দ্রষ্টাকে স্বতঃই নিরুদ্দেশ যাত্রায় বাহির করিয়া দেয়। তখন যাহা সে দেখিতেছে তাহাতেই বদ্ধ না

* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে কবির কাব্যদর্শনের তথা মনোদর্শনের ঐক্যতত্ত্বটুকু বুঝাইবার উদ্দেশ্যে গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত প্রায় সমস্ত উল্লেখযোগ্য কাব্যেরই সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রদান করা হইয়াছে। বর্তমান ক্ষেত্রে সেই সমস্ত কাব্যের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন বোধে নীরব রহিলাম।

হইয়া, যাহা দেখা যায় না তাহারি অভিসারে হয় অগ্রসর। এ এক প্রকারের মুক্তি, মনের বন্ধন-মুক্তি।

রবীন্দ্রনাথের বসন্ত সম্পর্কিত কবিতাগুলি স্মরণ করুন।

১ কল্পনায় 'বসন্ত'র উপর যে কবিতাটি আছে, প্রথমে সেইটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

বসন্তের যে রূপসৌন্দর্য চোখের সাহায্যে দেখা যায়, কবি তাহাতে বিশেষ মুগ্ধ হইলেন না। বসন্তের উচ্ছ্বসিত রূপপ্রবাহে কবির মর্মতটে ভাসিয়া আসিল—

> ·········ক্লান্ত-সুপ্ত-লোকলোকান্তের
> ক্লান্ত মধুরতা।
> তাই আজি প্রস্ফুটিত নিবিড় নিকুঞ্জবন হতে
> উঠিছে উচ্ছ্বাসি'
> লক্ষ দিনযামিনীর যৌবনের বিচিত্র বেদনা,
> অশ্রু, গান, হাসি।

বসন্তের রূপোচ্ছ্বাসের মধ্যে কবি লক্ষ্য করিলেন লক্ষ প্রেমিক-প্রেমিকার বিরহোচ্ছ্বাস ও আনন্দোল্লাস। তবে তো তাঁহারও ব্যক্তিগত আনন্দ ও বেদনাও সঞ্চিত থাকিতে পারে বসন্তের 'মর্মর নিঃশ্বাসে'? কবির মনে হইল, যুগে যুগে বসন্ত যখন অশ্রু, হাসি, গান আপন রূপ ও প্রেমের মধ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখে, তখন তাঁহার ব্যক্তিগত ব্যর্থতাও ব্যর্থতা নহে, তাহা 'অমর' রহিবে বসন্তের আনন্দ-মন্দিরে। 'উত্তপ্ত যৌবনমোহ রক্তরৌদ্রে' এবং 'চৈত্রসন্ধ্যাকাশে' নিশ্চয়ই রঞ্জিত রহিবে চিরকাল।

রবীন্দ্রনাথের বসন্ত-তত্ত্ব

বসন্ত-দর্শনে এই যে ব্যক্তিজীবনের বিচ্ছেদবেদনা ও ব্যর্থতার অবসানবোধ, এই যে গভীরতর মানস-সান্ত্বনার রসোপলব্ধি ইহাই রবীন্দ্রপ্রকৃতির রূপবৈশিষ্ট্য। ইহাই, রবীন্দ্রনাথ বলিবেন, 'আমাকে বদ্ধ করিতেছে না, আমাকে মুক্তই করিতেছে।'

ইহার পর উল্লেখযোগ্য বসন্ত-কবিতা পূরবীর 'শেষ বসন্ত'। বসন্ত শেষ হইয়া আসিতেছে—কিন্তু তাই বলিয়া কবি কি ক্ষণস্থায়িত্বের শঙ্কাবেদনায় শোক করিতে বসিবেন? যাহা হয়, প্রকৃতিতে যাহা ঘটে, তাহাকে যখন সহজভাবে গ্রহণ করা না হয় তখনই তাহা দুঃখ, তাহা নির্বুদ্ধিতা। কবি বলিতেছেন:

> আজিকার দিন না ফুরাতে
> হবে মোর এ আশা পুরাতে
> শুধু এবারের মতো
> বসন্তের ফুল যত
> যাব মোরা দুজনে কুড়াতে।

পূরবীর 'শেষ বসন্ত'

তাহার পর যখন শেষ হইবে বসন্ত, শেষ হইবে এই জীবনের লীলা—সহজভাবেই যাবো চলিয়া। ফিরিয়া চাহিব না, কাঙালের মতো 'নাই নাই' করিয়া কাঁদিব না।

সব ছেড়ে যাব, প্রিয়ে
সমুখের পথ দিয়ে,
ফিরে দেখা হবে না তো আর।

'শেষ বসন্তে'র মধ্যেও তাই দেখি, শেষ সময়েও কবির আনন্দময় নবীন স্বভাবের মুক্তির চেতনা। ক্ষণস্থায়িত্বের জন্য কোনোও নৈরাশ্য নাই। এই জীবনের সুখ বা আনন্দকেই তিনি একান্ত বলিয়া মনে করেন না বলিয়া যাহা শেষ হইবে, তাহা শেষ হওয়াই উচিত ও শ্রেয়, 'ক্ষণিকার' এই দার্শনিকতা তাঁহার 'শেষ বসন্তে'ও দেখিতেছি।

ইহার পর দেখুন বনবাণীর 'বসন্ত'।

বসন্ত 'ধরণীর ধ্যানভরা ধন'। তাহাকে পাইতে হইলে তপস্যার প্রয়োজন আছে। তপস্যায় যখন পরিশুদ্ধ হই, তখনই তাহার দর্শন মেলে। 'ভুবনমোহন' বসন্তকে ক্ষণকালের জন্য পাইবার অভিপ্রায়ে বৈরাগিণী তপস্বিনী বসুন্ধরা—

.........কী তপস্যা করে অনুক্ষণ,
আপনারে তপ্ত করে, ধৌত করে, ছাড়ে আভরণ,
ত্যাগের সর্বস্ব দিয়ে ফল অর্ঘ্য করে আহরণ।
আবর্তিয়া ঋতুমাল্য করে জপ, করে আরাধন
দিন গুণে গুণে,
সার্থক হোলো যে তার বিরহের বিচিত্র সাধন
মধুর ফাল্গুনে।

ক্ষণকালের জন্য বসন্ত মাটির বন্ধনে ধরা দেয়, তারপর নন্দনের আনন্দে যায় চলিয়া। সেই যে ক্ষণকালের জন্য আসা, ক্ষণকালের জন্য হাসা, ক্ষণকালের জন্য ইঙ্গিতে দেখা— তাহাতেই বসুন্ধরার মর্ত্য জীবনের সার্থকতা। ঊর্ধ্বলোক হইতে যে অসীম সীমায় ধরা দিয়া সীমাকে করিয়া যায় অসীমের স্পর্শে মহিমময়ী, দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে সীমাময়ী বসুন্ধরা তাহারি গৌরবে অনন্ত তপস্যার পায় প্রেরণা। ক্ষণকালীন মিলনস্বপ্নের সৌজন্যে বসুন্ধরা বিচ্ছেদের মধ্যেও অনন্ত মিলনানন্দের পায় আস্বাদ।

'বনবাণী'র বসন্ত

নন্দনে আনন্দ তুমি, এই মর্ত্যে, হে মর্ত্যের প্রিয়,
নাই নিত্য হোলে,
সুদূর মাধুর্যপানে তব স্পর্শ, অনির্বচনীয়
দ্বার যদি খোলে।

ক্ষণে ক্ষণে সেথা আসি নিস্তব্ধ দাঁড়াবে বসুন্ধরা
লাগিবে মন্দার-রেণু শিরে তার ঊর্ধ্ব হতে ঝরা,
মাটির বিচ্ছেদ পাত্র স্বর্গের উচ্ছ্বাস-রসে ভরা
রবে তার কোলে।

অনুসন্ধিৎসু পাঠক লক্ষ্য করিবেন, কবির কাব্যজীবনের মূল সুর ও দর্শনজীবনের মূল ভাব বনবাণীর এই 'বসন্ত' কবিতায় চমৎকারভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। রবীন্দ্রকাব্য ও দর্শনের প্রকৃতিগত বাণী এই, ক্ষণকালের অন্তরেই অনন্তের মহিমা দর্শন ও আস্বাদন সম্ভব। ক্ষণকালকে যখন অনন্তে যুক্ত করিয়া দেখি তখন তাহা আর ক্ষণ নহে, তাহা অনন্ত। ক্ষণকালের অস্থায়িত্ব কালের সীমানা পার হইয়া অনন্তে লাভ করে মৃত্যুহীন স্থায়িত্বের সাযুজ্যানন্দ।

আলোচ্য 'বসন্তে' বলা হইল, বসন্ত মর্ত্যভূমিতে নিত্য নহে, কিন্তু খণ্ডদৃষ্টিতে যখন এই অনিত্যতা দেখি, তখনই দুঃখ পাই, তখনই প্রকৃতির উপর অসন্তোষ জন্মায়, কিন্তু অখণ্ড-দৃষ্টিতে যখন দেখি, তখন অনিত্যতা কোথা, যাহা অনিত্য বলিয়া মনে করিতেছি তাহা তো অনিত্য নহে, কেননা তাহা তো নিত্যেরই সংলগ্ন। তাহা যেন হইল, কিন্তু আলোচ্য বসন্ত কবিতাটিতে এই নিত্যের আভাস কোথা? আভাস দ্রষ্টার মনে। চঞ্চল বসন্ত-রূপের উচ্ছ্বাস প্রদর্শন করিয়া নন্দনের আনন্দ নন্দনে গেল ফিরিয়া, কিন্তু মন দিয়া (শুধু চোখ দিয়া নহে) তাহাকে দেখিয়াছি বলিয়া মনে তাহার রূপ অর্থাৎ রূপের বিরহ রহিয়া তো গেল। এই বিরহই বসন্তকে মনের কুঞ্জবনে সাজাইবে নিত্য নব রূপে, নূতন বর্ণে। অনিত্য বসন্ত তো তাই মনে আনিল না শূন্যতা, আনিল ভাবরূপের অনন্ত ব্যঞ্জনা, অনন্ত পূর্ণতা। 'মাটির বিচ্ছেদপাত্র' শূন্য তাই রহিবে না, রহিবে 'স্বর্গের উচ্ছ্বাস-রসে ভরা'।

যে তিনটি বিখ্যাত বসন্ত-কবিতা তিনখানি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ হইতে প্রসঙ্গতঃ উদ্ধৃত করিলাম, সেগুলি ধীরভাবে গবেষণার বোধ লইয়া পাঠ করিলেই দেখা যাইবে, বসন্ত-প্রকৃতির বাসনাময় সুখস্পৃহা অথবা বিহ্বলতা কবিকে বদ্ধ করিতেছে না। পরন্তু বলা যায়, বসন্তরূপের অন্তরে অনন্তের ইঙ্গিত পাইয়া কবি ভাবের নিরুদ্দেশ পথে মুক্তির আনন্দেই যাত্রা করিয়াছেন। খণ্ড জীবনের ক্ষণিক ব্যর্থতা অখণ্ড জীবনের বিস্তীর্ণ পরিবেশে অধিষ্ঠিত রহিয়া কবিচিত্তকে অনন্ত জীবনের ভাবরসে পরিপ্লুত করিয়াছে। তাই বলা হইল—জীবনের প্রণয়ব্যাপারে যে-ক্ষেত্র ব্যর্থ হইয়াছে, যেক্ষেত্রে অশ্রু ফেলিয়াছি, ফেলিয়াছি দীর্ঘশ্বাস, সে ক্ষেত্রও অনুর্বর নহে, সেক্ষেত্রে বিকশিত হইয়াছে অমর যে বেদনার কুসুম, বসন্ত তাহা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে চিরন্তনের একটি মাল্য রচনার অভিলাষে। অতএব বিচ্ছেদের জন্য দুঃখ নাই, বিরহের অশ্রুর জন্য পরিতাপের কারণ নাই। বসন্ত যখন আসিয়াছে, তখন তাহার অন্তরে অযুত স্বর্গের

বসন্তের মর্মবাণী

বিরহোচ্ছ্বাস অনুভব করিয়া আনন্দোপভোগই জীবন ও শিল্পের উদ্দেশ্য। তাই আনন্দ কর। 'তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে করো না বিড়ম্বিত তারে।' আবার যদি এই কথাই সত্য হয় যে, বসন্ত শেষ হইয়া আসিতেছে, তা' আসুক না। শোকের বা নৈরাশ্যের বন্ধনে বদ্ধ রহিব কেন? যতটুকু বসন্ত এখনও আছে, শেষ হইবে এই দুশ্চিন্তায় কেন সেটুকু ব্যর্থ করিব? তাই এসো, আনন্দ সঙ্গীতে হৃদয় লই পূর্ণ করিয়া। তাহার পর যখন স্বাভাবিকভাবেই আসিবে শেষ, ক্ষোভ করিব না, লোভ করিব না, চলিয়া যাইব নিশ্চিন্ত নির্মুক্তির আনন্দে। ·· শেষে বলা হইল, তপস্যার টানে নন্দনের আনন্দ এই বসন্তকে আনিয়াছে ধরার বন্ধনে। চিরকাল সে মর্ত্যে থাকিবে ইহা তো কথার কথা নহে। সে যখন চলিয়া যাইবে—কল্পনয়নে তাহাকে দিশি দিশি দেখিতে থাকিব—খণ্ড-জীবনের শোক-দুঃখ-বিচ্ছেদ ও নৈরাশ্য অনন্ত তাহার আনন্দ-স্পর্শে চিরন্তন একটি স্বপ্নের সুষমায় মণ্ডিত হইয়া দেখা দিবে—ইহাই তো কথার কথা।

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় আরো দুই একটি বিষয় প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করিতে হইবে, সুতরাং বসন্ত লইয়া আলোচনা দীর্ঘ করিবার উপায় নাই। কিন্তু যত পড়িতেছি, ততই মনে হইতেছে কবির বসন্ত লইয়াই একটি বিরাট গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব। কবিজীবনের এই বসন্ত-মনোভাব লইয়া যদি কাব্যোপম একখানি ভাষ্য রচনা করা যায় তবে তাহার মধ্য দিয়া কবির কাব্য ও জীবনদর্শন সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হইতে পারে। বসন্ত সম্পর্কে কবি যে সমস্ত খণ্ড খণ্ড গীতিকাব্য ও গান রচনা করিয়াছেন, কবির মনের গতি ও পরিণতি বুঝাইবার অভিপ্রায়ে সেগুলি যথাযথভাবে সাজাইয়া একখানি গ্রন্থ যদি প্রকাশ করা যায়, তা' হইলে কবির জীবনদর্শন ও প্রকৃতিদর্শন বিনাব্যাখ্যাতেই ব্যাখ্যাত হইতে পারে। বসন্তের পুলকোচ্ছ্বাসের অমিত আনন্দের জন্যই বসন্ত-কবিতাগুলির মূল্য নহে, বসন্তের ক্ষণিকত্বের অপূর্ব দার্শনিকতার জন্যও ইহাদের মূল্য। ক্ষণিক বসন্তের অন্তর হইতে অজস্র প্রেরণা কবি অনুভব করিয়াছেন, আবার ক্ষণিকতার অন্তর ভেদ করিয়া বিশ্বক্ষণের সম্মেলিত এক অখণ্ড অনন্তের আনন্দও তিনি অনুভব করিয়াছেন—বৈচিত্র্যের ও ঐক্যতত্ত্বের দিক দিয়া ইহার পাঠসঞ্চয়ের মূল্য শুধু গৌরবের নহে, আনন্দেরও বটে। তিনটি উল্লেখযোগ্য বসন্তকবিতা আমি উদ্ধৃত করিয়াছি মাত্র, কিন্তু বসন্ত-বিহ্বল আনন্দবাদী কবির লেখনী হইতে যে অজস্র বসন্তধারা বিনির্গত হইয়াছে, বলা বাহুল্য, সেগুলি বিচিত্র ভঙ্গী ও ভাষার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইলেও সুরের দিক দিয়া এক এবং অদ্বিতীয় তত্ত্ব-মানসেরই প্রকাশ। কী সুর? বদ্ধ রহিব না, মুক্ত হইব—এই সুর। যৌবন-জোয়ারে ভাসিয়া চলিব নিত্যকাল। থামিতে আসি নাই—থাকিতে আসি নাই, ইহাই আনন্দ।

'বসন্ত'-নাট্যে বলা হইল, পৃথিবীকে রূপে রসে বর্ণে পূর্ণ করিয়াই বসন্ত চলিয়া যায়; আসক্ত হইয়া থামিয়া থাকার স্বভাব তাহার নহে। যেখানে থামা সেইখানেই বৈচিত্র্যের অবসান। রাজত্বের ভারে ভারাক্রান্ত রাজাকে কবি তাই শিখাইলেন চির-পলাতক এই বসন্ত-মন্ত্র। কবি কহিলেন, মহারাজ, অপূর্ণকে পূর্ণ করিয়াই ত্যাগের আনন্দে যিনি ছুটিতে পারেন, জীবনকে তিনিই জানেন। ঋতুরাজকে তিনিই জানেন।

'বসন্ত'-নাট্য

—ঋতুরাজ? বসন্ত?
—হ্যাঁ মহারাজ। তিনি চির-পলাতক। আমারই মতো। পৃথ্বী তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে পৃথ্বীপতি করতে চেয়েছিল। কিন্তু তিনি—
—বুঝেছি, বোধকরি রাজকোষের অবস্থা দেখে পালাতে ইচ্ছা করছেন।
—পৃথিবীর রাজকোষ পূর্ণ করে দিয়ে তিনি পালান।
—কী দুঃখে?
—দুঃখে নয়, আনন্দে। [বসন্ত]

কেমনতরো আনন্দে? বসন্তের সান্নিধ্যে আসিয়া, তাহার মহিমা বুঝিয়া রাজা এই আনন্দের স্বরূপ চিনিলেন। কহিলেন—

—'ফল ফলাব' বলে কোমর বেঁধে বসলে ফল ফলে না। মনের আনন্দে 'ফল চাইনে' বলতে পারলে ফল আপনি ফলে ওঠে। আম্রকুঞ্জ মুকুল ঝরাতে ভরসা পায় বলেই তার ফল ধরে।

অতএব বসন্তের মূল কথা হইতেছে শিল্পীর অনাসক্ত আনন্দ। আনন্দ আছে, প্রেম আছে—তাই মাটিতে আসা; অনাসক্তি আছে, বৈরাগ্য আছে, তাই থাকিয়াও ছুটিতে চাওয়া, চলিয়া যাওয়া। স্থূলদৃষ্টিতে এই চলিয়া যাওয়ার নাম ক্ষণিকত্ব, ক্ষণস্থায়িত্ব। কিন্তু প্রকৃতিতে কিছু চিরস্থায়ী নহে, ইহাই তো বৈচিত্র্যের কারণ। বৈচিত্র্যের বর্ণে-স্বর্ণে ছন্দে-গন্ধে, নাচিয়া যাওয়া, বাঁচিয়া যাওয়া, হাসিয়া যাওয়া, ভাসিয়া যাওয়া—এই তো, এই তো জীবন, এই তো বসন্ত।

ওগো দখিন হাওয়া, পথিক হাওয়া
পথের ধারে আমার বাসা।
জানি তোমার আসা যাওয়া,
শুনি তোমার পায়ের ভাষা।

আমায় তোমার ছোঁওয়া লাগলে পরে
একটুকুতেই কাঁপন ধরে,
আহা, কানে কানে একটি কথায়
সকল কথা নেয় ভুলিয়ে ॥ [ফাল্গুনী]

কিংবা—

সবাই আপন পানে
আমায় আবার কেন টানে ?
পুরানো শীত পাতা-ঝরা,
তারে এমন নূতন করা ?
মাঘ মরিল ফাগুন হয়ে
খেয়ে ফুলের মার গো ॥ [ফাল্গুনী]

কি—

তোমায় বাঁধব নূতন ফুলের মালায়
বসন্তের এই বন্দীশালায়।
জীর্ণ জরার ছদ্মরূপে
এড়িয়ে যাবে চুপে চুপে ?
তোমার সকল ভূষণ ঢাকা আছে
নাই যে অগোচর গো। [ফাল্গুনী]

কি—

চলি গো, চলি গো, যাই গো চলে।
পথের প্রদীপ জ্বলে গো
গগন তলে।
বাজিয়ে চলি পথের বাঁশি,
ছড়িয়ে চলি চলার হাসি,
রঙীন বসন উড়িয়ে চলি
জলে স্থলে। [ফাল্গুনী]

কি—

যৌবনেরি ঝড় উঠেছে
আকাশ পাতালে।
নাচের তালের ঝংকারে তার
আমায় মাতালে।

কুড়িয়ে নেবার ঘুচল পেশা,
উড়িয়ে দেবার লাগল নেশা,
আরাম বলে, 'এল আমার
যাবার পালা।'
বইল প্রাণে দখিন হাওয়া
আগুন-জ্বালা। [ফাল্গুনী]

অজস্র বসন্ত-গীতির কয়েকটি অংশ মাত্র উপরে উদ্ধৃত হইল। সকল কটিরই বাণী এই—চলো, বহিয়া চলো। ভাসিয়া চলো। গাহিয়া চলো। তবে কি স্থিতি বলিয়া কিছু নাই—কেবলি গতি? না। স্থিতি অবশ্যই আছে। পরম স্থিতি—সেই পরম প্রেম অন্তরে ধ্রুবস্বরূপ বিরাজ করিতেছেন বলিয়াই তো বিশ্ববৈচিত্র্যে এত আনন্দ। প্রকৃতির বিচিত্র রূপধারা প্রবাহিত হইতেছে সেই এক ধ্রুবসুন্দর প্রেমের রূপরাগ বাহিয়া। তাই তো বসন্তে এত আনন্দ পাই—তাই তো বসন্ত আস্বাদন করিতে করিতে রূপে রূপে বিচিত্ররূপে কেবলি ছুটিতে থাকি। ছুটিতে থাকি কেন? কোনো একটি বিশেষরূপে যে তাহাকে পূর্ণভাবে পাই না! বৃহৎ সেই প্রেম বিচিত্রের অজস্র রূপের মহিমায় অরূপ আনন্দ হইয়া বিরাজ করিতেছেন; তাই তো বিচিত্রের অখণ্ড তাৎপর্যের মধ্যেই তাঁহাকে পাই, কোনো একটি বিশেষের মধ্যে তাঁহাকে যেটুকু পাই তাহাতে ঠিক মন ভরে না। প্রেম আছে বলিয়াই গতি আছে। প্রেম না থাকিলে গতিই থাকিত না। কেননা কোনোদিন কোনো এক বিশেষে আসক্ত হইয়া বিশেষ মোহে তখন বন্দী রহিতেই ভালো লাগিত। তারপর প্রকৃতি যখন সেই বিশেষটি কোনোদিন কাড়িয়া লইত, মরিয়া যাইতাম হাহুতাশ করিয়া। গতির মধ্যে আছে স্থিতি—প্রাণের মধ্যে আছে প্রেম—সেই ধ্রুব-প্রেম; রূপে রূপে সেই ধ্রুবকেই দেখি—আবার পূর্ণভাবে পাই না বলিয়া অন্যরূপে এবং অরূপে ছুটি।

পড়ুন—

চোখের আলোয় দেখেছিলেম
চোখের বাহিরে।
অন্তরে আজ দেখব, যখন
আলোক নাহি রে।
ধরায় যখন দাও না ধরা
হৃদয় তখন তোমায় ভরা,
এখন তোমার আপন-আলোয়
তোমায় চাহি রে। [ফাল্গুনী]

কি—

তোমায় নতুন করেই পাব বলে
হারাই ক্ষণে ক্ষণ
ও মোর ভালোবাসার ধন।
দেখা দেবে বলে তুমি
হও যে অদর্শন
ও মোর ভালোবাসার ধন।
ওগো তুমি আমার নও আড়ালের
তুমি আমার চিরকালের
ক্ষণকালের লীলার স্রোতে
হও যে নিমগন,
ও মোর ভালোবাসার ধন॥ [ফাল্গুনী]

প্রকৃতিতে যখন আরোপিত হয় 'অদর্শন' এই 'ভালোবাসার ধন', অর্থাৎ সর্বজগদ্‌গত বৃহৎ প্রেমের দৃষ্টি ও মন লইয়া যখন প্রকৃতিকে দর্শন করি বিপুলাবেগে, তখন প্রকৃতিসুন্দরী হাস্য করে নিত্য নবীনা লীলাসঙ্গিনীর সৌন্দর্যে—তখন তাহার রূপে অনুভব করি নিরুদ্দেশ যাত্রার অজেয় যৌবনাবেগ।

কবির 'বসুন্ধরা' কবিতাটি কি উক্ত বিবৃতির সত্যতা প্রমাণ করে না?

স্বতন্ত্র অস্তিত্বের ব্যবধানে বিপুল এই বসুন্ধরা হইতে মানুষরূপে কবি আজ পৃথক হইয়া পড়িয়াছেন; কিন্তু একদা যখন কবির এই স্বতন্ত্র রূপ প্রকাশিত হয় নাই, তখন কি তিনি বিশ্বের সর্বত্র, অর্থাৎ সূর্য-চন্দ্র, আকাশ-বাতাস, মরু-মেরু, নদী-সাগর, বৃক্ষ-লতা, পুষ্প-পত্র প্রভৃতি বিচিত্র রূপ-প্রকাশের মধ্যে সত্তারূপে সঞ্চারিত হইয়া ছিলেন না? বসুন্ধরাকে দেখিয়া তিনি সর্বগত একত্বের নিবিড় আনন্দ আজ অনুভব করিতেছেন। এই আনন্দের নিকট স্বাতন্ত্র্যের আনন্দ যেন কিছুই নহে। আজ তাই স্বতন্ত্র রহিয়া, পৃথক রহিয়া, সকল বর্ণ-বৈচিত্র্য হইতে দূরে রহিয়া, কবির সুখ নাই, তৃপ্তি নাই। তাই এই আবেদন:

'বসুন্ধরা'

আমারে ফিরায়ে লহ, অয়ি বসুন্ধরে,
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে
বিপুল অঞ্চলতলে। [বসুন্ধরা, সোনার তরী]

এই যে 'বিপুল অঞ্চলতলে' রহিয়া একত্বের নিবিড় অনুভূতি—ইহাই প্রেমানুভূতি। এই প্রেমানুভূতির আশ্রয়ে বসুন্ধরা নিত্য নবীনা, অনন্তযৌবনা। এই অনুভূতির দৃষ্টিতে কবি যেদিকে চাহেন, সেই দিকেই নূতন কিছু পান দেখিতে। প্রেমঘন মনের

দৃষ্টি-প্রতিভা বসুন্ধরার যে রূপচিত্রকে স্পর্শ করে সেই চিত্রই অভিনব বর্ণসম্পাতে বিকচ-কুসুমের মত শুভ্র সুন্দর হইয়া উঠে। 'বসুন্ধরা'র মধ্যে দেখিতেছি, কবি কোনো দৃশ্যকেই উপেক্ষা করিতেছেন না, কিন্তু কোনোটিতেই মধুলুব্ধ মধুপের মত বুঁদ হইয়া বসিয়াও পড়িতেছেন না। মনের চকিত স্পর্শদানে বিশ্বচিত্রকে স্বর্ণ করিয়া করিয়া তিনি চলিতেছেন —দুর্বার গতিরঙ্গে রূপ হইতে রূপান্তরে রূপাতীত সেই অদ্বিতীয় অরূপটি খুঁজিতেছেন, যেখানে—

দাঁড়ায়ে রয়েছ তুমি শ্যাম কল্পধেনু,
তোমারে সহস্রদিকে করিছে দোহন
তরুলতা পশুপক্ষী কত অগণন
তৃষিত পরানি যত, আনন্দের রস
কতরূপে হতেছে বর্ষণ, দিক দশ
ধ্বনিছে কল্লোলগীতে। [বসুন্ধরা, সোনার তরী]

বিশ্বপ্রকৃতির সহিত এই একত্ববোধ এবং এককে অনুভব করিবার আনন্দবোধ রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার মধ্যেও লক্ষ্য করিয়াছি। কবিতায় তিনি যাহা বলিয়াছেন, 'ছিন্নপত্রের' বহুস্থলে ঠিক তাহাই আরো স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে।

'এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরীরে আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূরবিস্তৃত শ্যামলঅঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত—আমি কত দূর দূরান্তর, কত দেশ দেশান্তরের জল-স্থল-পর্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম, তখন শরৎ সূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস, একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ডভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার এই যে মনের ভাব এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত, মুকুলিত, পুলকিত সূর্যসনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে, শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে—সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে এবং নারকোল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থর থর করে কাঁপছে। এই পৃথিবীর উপর আমার যে একটি আন্তরিক আত্মীয়-বৎসলতার ভাব আছে, ইচ্ছা করে সেটা ভালো করে প্রকাশ করতে।' [ছিন্নপত্র]

ইহার সহিত 'বসুন্ধরা' কবিতাটি মিলাইয়া পড়ুন—

তাই আজি কোনদিন শরৎকিরণ
পড়ে যবে পক্কশীর্ষ স্বর্ণক্ষেত্র-'পরে,
নারিকেলদলগুলি কাঁপে বায়ুভরে
আলোকে ঝিকিয়া, জাগে মহাব্যাকুলতা—

মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা
মন যবে ছিল মোর সর্বব্যাপী হয়ে
জলে স্থলে, অরণ্যের পল্লবনিলয়ে,
আকাশের নীলিমায়। ডাকে যেন মোরে
অব্যক্ত আহ্বানরবে শতবার ক'রে
সমস্ত ভুবন।

'এই পৃথিবীটা আমার অনেক দিনকার এবং অনেক জন্মকার ভালোবাসার লোকের মতো আমার কাছে চিরকাল নূতন। আমাদের দুজনকার মধ্যে একটা খুব গভীর এবং সুদূরব্যাপী চেনাশোনা আছে।' [ছিন্নপত্র]

'ওর গাছপালা, নদী, মাঠ, কোলাহল, নিস্তব্ধতা, প্রভাত, সন্ধ্যা সমস্তটা সুদ্ধ দুহাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে।' [ছিন্নপত্র]

'বসুন্ধরা'র কয়েকটি পংক্তি—

হে সুন্দরী বসুন্ধরে, তোমা-পানে চেয়ে
কতবার প্রাণ মোর উঠিয়াছে গেয়ে
প্রকাণ্ড উল্লাসভরে। ইচ্ছা করিয়াছে,
সবলে আঁকড়ি ধরি এ বক্ষের কাছে
সমুদ্রমেখলা-পরা তব কটিদেশ ;

বসুন্ধরার সহিত কবির মানসিক এই আনন্দময় সংযোগ সৌন্দর্য-সৃষ্টিব্যাপারে বিশেষ প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু দার্শনিক মননব্যাপারেও কি ইহা কম প্রয়োজনীয়? পদতলে তৃণগুচ্ছ হইতে শিরোপরি সুদূর নক্ষত্রপুঞ্জ পর্যন্ত বসুন্ধরার বিশ্ববিধ রূপপ্রকাশের সহিত নিবিড় এই একাত্মতা যেখানে সম্ভব হয়, সেখানে প্রাত্যহিক দৈন্যমলিন বাসনার হীনতা আর স্থান পায় না, সেখানে মুক্তমন দিশি দিশি অনির্বচনীয় একটি নিষ্কাম কামনানন্দ অনুভব করিতে থাকে।

'ছিন্নপত্রে' এই নিষ্কাম কামনানন্দের সুন্দর কয়েকখানি চিত্র কবি সাজাইয়া রাখিয়াছেন—

'পৃথিবী যে কী আশ্চর্য সুন্দরী এবং কী প্রশস্ত প্রাণে এবং গভীরভাবে পরিপূর্ণ !… যখন সন্ধ্যাবেলা বোটের উপর চুপ করে বসে থাকি, জল স্তব্ধ থাকে, তীর আবছায়া হয়ে আসে এবং আকাশের প্রান্তে সূর্যাস্তের দীপ্তি ক্রমে ক্রমে ম্লান হয়ে যায়, তখন আমার সর্বাঙ্গে এবং সমস্ত মনের উপর নিস্তব্ধ নতনেত্র প্রকৃতির কী একটা বৃহৎ উদার বাক্যহীন স্পর্শ অনুভব করি! কী শান্তি, কী স্নেহ, কী মহত্ত্ব, কী অসীম করুণাপূর্ণ বিষাদ! এই লোকনিলয় শস্যক্ষেত্র থেকে ঐ নির্জন নক্ষত্রলোক পর্যন্ত একটা স্তম্ভিত হৃদয়রাশিতে আকাশ কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে; আমি তার মধ্যে অবগাহন করে অসীম মানসলোকে একলা বসে থাকি।' [ছিন্নপত্র]

বলা বাহুল্য, এই একলা বসিয়া থাকার আনন্দবোধ পলায়নীবৃত্তির পরিচায়ক নহে, ইহা বিশ্বকে গভীরতরভাবে গ্রহণ করিবারই অখণ্ড মানসপ্রশান্তি। প্রকৃতির রূপমায়ায় আবদ্ধ হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি ইহা নহে, দৈনন্দিন ধূলিলিপ্ত বন্দীজীবন হইতে মুক্তি পাইয়া জীবনকে বিস্তীর্ণ পরিবেশে উপস্থাপিত করার অনির্বচনীয় আনন্দপ্রশান্তিই ইহার নাম। এই বোধের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য, বলা বাহুল্য, সর্বজগদ্‌গত সেই অখণ্ড প্রেম। স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্তী মহাশয়ও ভিন্নতর ভাষায় এইরূপ অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন। 'ছিন্নপত্রের' সংক্ষিপ্ত আলোচনায় তিনি বলিয়াছেন, 'পরিপূর্ণ সৌন্দর্যানুভূতির এই ভাব-ঐক্য এই ছিন্ন-পত্রগুলির মাঝখানে সূত্রের মত থাকায় ইহারা আর এলোমেলো ভাবে উড়িতে পারে নাই। ইহাদের মধ্যে এই একটি কথা—'হে চিরসুন্দর আমি তোরে ভালোবাসি।' তাহাই শেষ কথা এবং চিরকালের কথা। সোনার ভাবের কালিতে লেখা পরম সুন্দর কথা।'

[কাব্যপরিক্রমা]

সুন্দর কথা মানিলাম। কিন্তু 'শেষ কথা' কি না তাহা আলোচনা সাপেক্ষ।

'ছিন্নপত্রের' যুগে অর্থাৎ মানসী-সোনার তরী-চিত্রার যুগে বিশ্বপ্রকৃতিকে কবি যে আবেগময় আনন্দপ্রেম সহকারে বরণ করিয়াছেন, 'পত্রপুটের' যুগে কবি পৃথিবী-প্রকৃতিকে ঠিক সেই অবিমিশ্র আনন্দপ্রেমেই কি বরণ করিতে পারিয়াছেন? 'বসুন্ধরা' কবিতাটিতে দেখিয়াছি প্রকৃতির সকলই সুন্দর, কিন্তু পত্রপুটের 'পৃথিবী' কবিতাটিতে কবি তো সকল কিছুই সুন্দর দেখিতেছেন না। পৃথিবীর দ্বৈতরূপ তো কবির চোখে পড়িতেছে :

'বিপরীত তুমি ললিতে কঠোরে,
মিশ্রিত তোমার প্রকৃতি পুরুষে নারীতে।'
'শুভে অশুভে স্থাপিত তোমার পাদপীঠ।'
'অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী, অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা।'
'স্নিগ্ধ তুমি, হিংস্র তুমি, পুরাতনী, তুমি নিত্যনবীনা।'

[পত্রপুট-৩]

পত্রপুটের 'পৃথিবী'

বলিয়াছি, প্রেমাশ্রিত প্রকৃতি সত্য ও সুন্দর। প্রেমের দৃষ্টিতে প্রকৃতিতে অমঙ্গল নাই, বিরোধ নাই। কিন্তু এই স্থলে পৃথিবীর এই দ্বৈতরূপ দেখিয়া কবির প্রেমতত্ত্বে কি সংশয় জাগিতেছে? প্রবীণ বয়সে কবির হৃদয়াবেগ যখন কমিয়াছে, তখন অভিজ্ঞতার দৃষ্টিতে, জ্ঞানের দৃষ্টিতে তিনি যাহা দেখিতেছেন, তাহাতে মঙ্গল যে নাই তাহা নহে, তবে অমঙ্গলও তো রহিয়াছে। প্রেমে সর্বত্র মঙ্গল কিন্তু জ্ঞানে মঙ্গলামঙ্গল দুই-ই। অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের দ্বারা কবি যাহা দেখিতেছেন তাহাই কি অধিকতর বাস্তব নহে? ইহা যদি গ্রহণযোগ্য অভিমত হয় তবে প্রেমের দৃষ্টিতে জগৎ সুন্দর দেখার তত্ত্ব কি সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে? সর্বজগদ্‌গত প্রেমের দৃষ্টিই কবিকে ঐক্যতত্ত্বে জাগরূক রাখিয়াছে মনে করিয়া এতক্ষণ যে বিশ্বাসের সৌধ নির্মাণ করিয়াছি,

তাহা কি ধূলিসাৎ হইতেছে না? প্রেমে সর্বত্র সুন্দর, দার্শনিকের এই কথাই যদি গ্রাহ্য হয়, তবে বলিতে কি হইবে না যে, 'পৃথিবী' কবিতায় সেই প্রেম কবির মধ্যে আর নাই, কেননা কবির দৃষ্টিতে অন্নরিক্তা ভীষণা পৃথিবীর মরুক্ষেত্রও পতিত হইয়াছে? অন্নরিক্তা কি মঙ্গলময়ী?

তোমার জলহীন ফলহীন আতঙ্কপাণ্ডুর মরুক্ষেত্রে
পরিকীর্ণ পশুকঙ্কালের মধ্যে মরীচিকার প্রেতনৃত্য।
বৈশাখে দেখেছি, বিদ্যুৎচঞ্চুবিদ্ধ দিগন্তকে ছিনিয়ে নিতে এল
কালো শ্যেন পাখীর মতো তোমার ঝড়,
সমস্ত আকাশটা ডেকে উঠল যেন কেশর-ফোলা সিংহ,
তার লেজের ঝাপটে ডালপালা আলুথালু ক'রে
হতাশ বনস্পতি ধূলায় পড়ল উবুড় হয়ে।
হাওয়ার মুখে ছুটল ভাঙ্গা কুঁড়ের চাল
শিকল-ছেঁড়া কয়েদী-ডাকাতের মতো। [তদেব]

মোহিতলাল প্রমুখ সমালোচকবৃন্দ, যাঁহারা কবির কোনো ঐক্যতত্ত্বে বিশ্বাস করেন নাই, বুদ্ধদেব প্রমুখ সমালোচকবৃন্দ, যাঁহারা কবির কাব্যাদর্শে কোনো তত্ত্বেরই সন্ধান পান নাই, প্রমথনাথ প্রমুখ সমালোচকবৃন্দ, যাঁহারা কবি ও দার্শনিকের মধ্যে বিস্তর ভেদ দেখিতেই অভ্যস্ত—তাঁহারা সকলেই 'বসুন্ধরা' ও 'পৃথিবী' এই দুটি কবিতা পাশাপাশি রাখিয়া উপর্যুক্ত প্রশ্নগুলি আমাকে অবশ্যই করিতে পারেন।

কবির মনোদর্শন রচনা করিতেছি, মনখানি দেখিতেই আমি অভ্যস্ত। 'বসুন্ধরা'র অবারিত আনন্দে যে মুক্ত মনের নিত্যগতি আমি লক্ষ্য করিয়াছি, 'পৃথিবী'র অনাসক্ত সুস্থির আনন্দে সেই মুক্ত মনেরই প্রসন্নতা আস্বাদন করিয়াছি। মন লইয়াই সব, মনের মধ্যে অখণ্ড আনন্দতত্ত্বের নিবিড় অনুভূতি না থাকিলে যাহা পাই, যাহা হয়, যাহা হইবে, তাহা সহজভাবে গ্রহণ করা সম্ভব নহে। 'বসুন্ধরা'য় কবি ধর্মাধর্ম, পাপপুণ্য, হিংসা-অহিংসা ঘরপর সমস্তই সহজানন্দে গ্রহণ করিয়াছেন, 'পৃথিবী'তেও কবি অন্নপূর্ণা ও অন্নরিক্তা, ফাল্গুন ও বৈশাখ, স্নিগ্ধ ও হিংস্র—সকলকেই সহজ প্রসন্নতায় স্বীকার করিয়া লইতেছেন। বলা বাহুল্য, এই স্বীকৃতির মর্মকথা হইতেছে অখণ্ড জীবনবোধে বিশ্বাস। এই বিশ্বাস না থাকিলেই বিরোধ; তখনই হা-হুতাশ, নৈরাশ্য, বিদ্রোহিতা, সিনিসিজম্। 'পৃথিবী' কবিতায় কি কোথাও নৈরাশ্য প্রকাশ পাইয়াছে? অখণ্ড জীবনপ্রেমে অবিশ্বাস হইয়াছে প্রকাশিত? পাঠকগণ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, উদাসিনী এই পৃথিবী একদা কবিকে ভুলিয়া যাইতে পারে—এই চিন্তাতেও কবির নৈরাশ্য নাই, দুঃখ নাই, ক্ষোভ নাই। 'শেষ বসন্তে' যেমন বলা হইয়াছে, যাইবার সময় হইলেই চলিয়া যাইব, 'পৃথিবী'তেও তেমনি বলা হইতেছে—সময় হইলে যাইব চলিয়া, 'অমরতার দাবী করব না তোমার দ্বারে।'

'পুনশ্চ'তে 'ভয় কোরো না, লোভ কোরো না, ক্ষোভ কোরো না, জাগো আমার মন' [পয়লা আশ্বিন] প্রভৃতি উক্তির মধ্যে যে মনের পরিচয় আমরা পাইয়াছি, 'পৃথিবী'তে সেই বৈরাগী প্রেমিক মনেরই তো প্রকাশ দেখিতেছি। একদা সর্বত্র আনন্দরূপ দেখিয়াছি, আজ আনন্দরূপ ও নিরানন্দরূপ দুই-ই দেখিতেছি। আনন্দের জন্য গান গাহিতেছি কিন্তু নিরানন্দের জন্য শঙ্কিত হইতেছি না বলিয়া পৃথিবীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে চাহিতেছি না। যেখানে শঙ্কা, সেইখানেই খণ্ডবোধ, সেইখানেই বিরোধ। যেখানে প্রেম, সেইখানেই অখণ্ড, সেইখানেই সমতা, সেইখানেই বৈরাগ্যের বিমল প্রশান্তি।

'বসুন্ধরা'র প্রেম ও 'পৃথিবী'র প্রেম রূপে বিভিন্ন, হৃদয়াবেগের প্রভাবে ও অভাবে বিচিত্র। কিন্তু যে উৎস হইতে এই দ্বৈতের উদ্ভব, তাহার আনন্দ, তাহার তত্ত্বস্বরূপ এক ও অদ্বিতীয়। 'বসুন্ধরা'য় মন বদ্ধ হইতেছে না—রূপে রূপে রূপান্তরে বহিয়া চলিয়া এক উৎসমুখের সন্ধানে ফিরিয়াছে, পৃথিবীর মনও বদ্ধ হইতেছে না, পরন্তু অবারিত আনন্দধৈর্যে দক্ষিণে 'পুরাতনী' ও বামে 'নিত্যনবীনা'কে লইয়া অনাগত কোন্ নামহীন বিস্তীর্ণ জীবনধ্যানে সমাহিত হইতেছে।

কিন্তু না, ইহাও বোধহয় ঠিক কথা বলা হইল না। ঠিক কথা বোধ হয় এই, 'বসুন্ধরা' কবিকে ভোগের পথে টানিয়াই দিয়াছে মুক্তি; 'পৃথিবী' কবিকে নিরাসক্তির মধ্যে মুক্তি দিয়াই বাঁধিয়াছে অঞ্চলে। একদিকে যৌবনবাসনার মুক্তিরূপ, মোহের মধ্যে প্রেমের প্রশান্তি; অপরদিকে জীবনসাধনার মুক্তিরূপ, ত্যাগের মধ্য দিয়া প্রেমের প্রসন্নতা। প্রেম ও বৈরাগ্য; চাই এবং চাইনে। এই দ্বৈতরূপেই তো কবির অদ্বয়দর্শন, প্রেমদর্শন।

'শান্তিনিকেতনে'র তত্ত্বোপদেশ স্মরণ করুন :

'মানুষের মনটা কেবলি যেমন বলছে চাই, চাই, চাই—তেমনি তার পিছনে পিছনেই আর একটি কথা বলছে চাইনে, চাইনে, চাইনে। এইমাত্র বলে, না হোলে নয়, পরক্ষণেই বলে, কোন দরকার নেই।' [ভাঙাহাট, শান্তিনিকেতন]

'থাকছেও বটে যাচ্ছেও বটে ; এই দুয়ের মাঝখানে আমরা ফাঁকও পেয়েছি, আশ্রয়ও পেয়েছি—আমাদের ঘরও জুটেছে, আলো বাতাসও মারা যায়নি!' [তদেব]

'হে আনন্দসমুদ্র, এপারও তোমার ওপারও তোমার! কিন্তু একটা পারকে যখন আমরা পার বলি তখন ওপারের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটে। তখন সে আপনার সম্পূর্ণতার অনুভব হতে ভ্রষ্ট হয়, ওপারের জন্যে ভিতরে ভিতরে কেবলি তার প্রাণ কাঁদতে থাকে। আমার পারের আমিটি তোমার পারের তুমির বিরহে বিরহিনী। পার হবার জন্যে তাই এত ডাকাডাকি।' [পার করো, শান্তিনিকেতন-১]

'এই জন্যেই আমাদের ঘরের মাঝখানেই, আমাদের কাজকর্মের হাটের মধ্যেই দিনরাত রব উঠছে, 'আমায় পার করো।' এইখানেই সমুদ্র, এইখানেই পার।' [তদেব]

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-কবিতার আনন্দরস আস্বাদন করিতে হইলে 'এইখানেই সমুদ্র, এইখানেই পার'—এই বাণীর তাৎপর্য গভীরভাবে উপলব্ধি করা চাই-ই চাই। এইখানেই সমুদ্র, এপার ওপার এইখানেই। খণ্ডদৃষ্টিতে যখন একটা পার-ই কেবল দেখি বা দেখিতে চাহি তখন অন্য পার, অর্থাৎ ইচ্ছায় যে পার-কে পরিহার করি অথবা যে পার সম্বন্ধে অচেতন রহি, সেই পার যদি দেখা দেয়, তখন বিরোধ জাগে, সংশয় উপস্থিত হয়, মনে হয়, যাহা চাহি তাহা যখন পাইলাম না, পৃথিবী তখন সুখের নহে, প্রকৃতি বন্ধু নহে। খণ্ডদৃষ্টিতে খণ্ডই দেখা দেয়, খণ্ডদৃষ্টিতে আচ্ছন্ন মন খণ্ডতেই আসক্ত হইয়া রহে। রবীন্দ্রনাথের উদাসীন প্রকৃতির আনন্দময়তা খণ্ডাশ্রয়ী বিশেষাসক্ত মন লইয়া বিচার করা চলে না। জীবনসমুদ্রের এপার হইতে মনকে সুদূরদিগন্তে উন্নীত করিয়া ওপারের সীমাহীন অদৃশ্য তটরেখার আনন্দসৌন্দর্য নিরীক্ষণ করিতে হয়; নতুবা সীমার মধ্যে অসীমের, বস্তুর মধ্যে ভাবের, মর্তের মধ্যে স্বর্গের, মানুষের মধ্যে সুন্দরের মহিমা ও স্বপ্নচিত্র দেখা সম্ভব হয় না।

প্রকৃতি-কবিতার মর্মবাণী

অন্নরিক্তা ভীষণা পৃথিবীর রূপ, খণ্ডদৃষ্টিতে অমঙ্গলেরই বটে। খণ্ডজীবনের খণ্ডকালাশ্রয়ী খণ্ডমনটুকু লইয়া যখন অন্নরিক্তাকে দেখি, তখন অন্নপূর্ণার অন্য পার চোখে পড়ে না বলিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠি, অবিশ্বাস গর্জিয়া উঠে, প্রকৃতিকে তখন অমঙ্গলের অধিষ্ঠাত্রী উপদেবী বলিয়া বিদ্রোহী রণরঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করি। একশ্রেণীর ইয়োরোপীয় সাধক ও পণ্ডিতসমাজ 'প্রকৃতির প্রতিশোধের' সন্ন্যাসীর মত প্রকৃতির বিরুদ্ধে অহরহঃ যুদ্ধ করিয়াছেন ঘোষণা। সৃষ্টির নিয়মে কোনো সৌন্দর্য নাই, সামঞ্জস্য নাই—এমন ধারণায় ইয়োরোপীয় পণ্ডিতবর্গের মাথা ব্যথা করিয়াছে বহুযুগ ধরিয়া। সৃষ্টিতে এমন সমস্ত অনাবশ্যক প্রাকৃত বস্তু আছে—পণ্ডিতদের ধারণা, যাহা না থাকিলেই ভালো ছিল। আগ্নেয়গিরি, মরুভূমি, প্রবল ঝটিকা, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ এ-সমস্ত যে ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার বুদ্ধির খুব তারিফ করা যায় না। ডক্টর মার্টিনো তো এই সমস্ত উক্তির প্রতিবাদ করিতে গিয়া প্রকাণ্ডকায় একখানা গ্রন্থই রচনা করিয়া বসিলেন [*Study of Religion*]। সেন্ট অগাস্টাইন-এর 'কন্‌ফেসন্'-এর যুগ হইতে সুরু করিয়া আজ আণবিক যুগ পর্যন্ত কেবলই দেখিতেছি প্রকৃতিকে ভীষণা, অহং‌কে মিথ্যা বা শয়তান বলিয়া ব্যাখ্যা দিবার বাসনা ইয়োরোপে অনেকের অন্তরে তরঙ্গ তুলিতেছে। লাইবনিজের 'থিয়োডিসি'র সান্ত ঈশ্বর অন্নপূর্ণা এই সুন্দরী পৃথিবীর প্রণয়সূত্রেই যেন আবদ্ধ; পৃথিবীর বাহিরে তিনি যাইতে চান না। যেন তিনি বলিতে চান পৃথিবীর এই 'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি'। কিন্তু অন্নরিক্তা যে ভীষণা, প্রকৃতি যুগে যুগে হানা দেয় তাঁহার সুন্দর রাজ্যে, ইয়োরোপ দেখিতেছে, লাইবনিজের ঈশ্বর তাহা বোধ করিতে পারেন না। সুতরাং সে ঈশ্বরে আস্থা স্থাপন করা কি সম্ভব?

খণ্ড-দৃষ্টিতে প্রকৃতি

স্টুয়ার্ট মিল তাঁহার 'ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধে' (Essay on Theism) ঈশ্বরকে অসীমরূপে ভাবিতেই পারেন নাই, ফলে প্রকৃতি ও মানুষের সহিত অনেক ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারিয়া নাস্তিক্যভাবেই তাঁহাকে ঝুঁকিতে হইয়াছে। দার্শনিক সোপেনহাওয়ার উপনিষদের আনন্দে আস্থা স্থাপন করিয়া কোনোরকমে একবার সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার নৈরাশ্যবাদে (Studies in Pessimism) বহুতর অপ্রকৃতিস্থ কথাও তাঁহাকে বলিতে হইয়াছে। আধুনিকযুগের বিখ্যাত দার্শনিক রাসেল ও বিখ্যাত কবি টি. এস. ইলিয়ট সংশয়ের ও নৈরাশ্যের বহুতর বিচিত্র অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু রাসেলের 'দার্শনিক প্রবন্ধাবলী', এবং ইলিয়টের 'পতিতজমি' যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন—মানুষ ও প্রকৃতির সহিত মধুর সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে না পারিয়া মরীয়া দার্শনিক চাহিলেন শংকরপন্থীদের মত সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইতে [*Philosophical Essays*], আর মরুপৃথিবীর পতিতজমিগুলির কোনোস্থানেই আত্মার পানীয় সংগৃহীত হইল না দেখিয়া কল্পনাভরে কবি আসিলেন হিমপ্রদেশে গঙ্গাতীরে,--গাহিলেন শান্তি, শান্তি [What the Thunder Said, *Waste Land.*]।

খণ্ডদৃষ্টিতে প্রকৃতিকে দেখিতে গেলেই যত বিপদ, যত বিরোধ। পাশ্চাত্যদেশে আধুনিক ব্রহ্মবিদ্যা (Modern Theism) আজ অবশ্য ও কথা বুঝিতে পারিয়াছে। সগুণ ঈশ্বরের উর্ধ্বে আর একটি অখণ্ড সত্তার কল্পনা এফ্. এইচ্. ব্র্যাড্‌লে প্রমুখ বহু মনীষীর চিন্তায় প্রবেশ করিয়াছে [*Appearance & Reality*]। বস্তুতঃ অখণ্ড জীবনের পটভূমে অখণ্ড কালের আশ্রয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া প্রকৃতিকে যখন দর্শন করা যায় তখনই তাহার মধ্যে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব। তখন অন্নরিক্তার ভীষণত্বকে অস্বীকার অবশ্য করি না, কিন্তু ইহাই যে প্রকৃতির এক এবং অদ্বিতীয় রূপ নহে, তাহা জানা থাকে বলিয়া সাময়িক খণ্ডজীবনে প্রতিভাত অন্নরিক্তার ভীষণত্বে চঞ্চল হই না। তখন এই ভাবিয়া বস্তুজীবনেও সান্ত্বনা পাই যে, বৈশাখে যাহাকে রুদ্রাণী দেখিতেছি, ফাল্গুনে তাহাকেই দেখিব কল্যাণীরূপে; তখন শিব ও রুদ্র, সৃষ্টি ও ধ্বংস এই দুই-ই যে এক অদ্বিতীয় অখণ্ডের রূপভেদ মাত্র, তাহা বস্তুজীবন-বিশ্লেষক বিজ্ঞানবোধেও সত্য বলিয়া স্বীকৃত হয় [ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু]। আসল কথা, সাময়িকতার বন্ধন হইতে উত্তীর্ণ হইয়া চিরন্তনের পটভূমে মানুষকে দণ্ডায়মান হইতেই হইবে; তা না হইলে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গতিপূর্ণ অখণ্ডরূপ হৃদয়দর্পণে প্রতিভাতই হইবে না।

অখণ্ড-দৃষ্টিতে প্রকৃতি

কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, আগে হৃদয়, পরে প্রকৃতি। জাগ্রত হৃদয়ের নিকটই প্রকৃতি জাগ্রত। হৃদয় যখন অখণ্ড আনন্দবোধে উদ্দীপ্ত নহে, প্রকৃতির সঙ্গতিপূর্ণ অখণ্ডসৌন্দর্য-দর্শন তখন কথার কথা মাত্র। প্রকৃতির সহিত রবীন্দ্রনাথের রহস্যগূঢ় নিবিড় সংযোগ এইজন্য যে, আপন প্রেমোদ্দীপ্ত উজ্জল মনের জ্যোতির মধ্য দিয়াই তিনি প্রকৃতিরূপের রহস্যভেদ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রকৃতি তাঁহার নিকট জীবনবহির্ভূত কতকগুলি বস্তুপিণ্ড বা প্রাণহীন চিত্র মাত্র নহে, তাহা তাঁহারি প্রেমের প্রকাশ, তাঁহারি প্রাণযৌবনের প্রতিচ্ছবি। দেশে দেশে দিশি দিশি তিনি যে সর্বজগদ্গত প্রেমের লীলামাহাত্ম্য নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার মানসপ্রকৃতির স্বরূপ নির্ণয়ে সহায়তা করে। তাঁহার প্রকৃতিবিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যে, ঠিক এই জন্যই তাঁহার মানসপ্রত্যয় ও প্রেমানন্দের যত আভাস পাই, প্রকৃতির বস্তুরূপের যথাযথ চিত্র তত পাই না। ইংরেজীতে যাহাকে objective বা বস্তুনিষ্ঠ কবিতা বলে, রবীন্দ্রনাথ ঠিক সেই বস্তুনিষ্ঠ কবিতা একটিও লিখিয়াছেন কি না সন্দেহ। প্রকৃতিবিষয়ক যে কোনো রবীন্দ্ররচিত কবিতা আপনি লইয়া আসুন, আমি তাহার মধ্য হইতে দেখাইয়া দিব রবীন্দ্র-মানসমহিমার স্বর্গচ্ছবি, রাবীন্দ্রিক মন্ময়তার প্রেমকরোজ্জল বর্ণচ্ছটা।

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-কবিতায় মন্ময়তা

কবির 'বসন্ত' কবিতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ইতিপূর্বেই আমি করিয়াছি, এখন তাঁহার বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত প্রভৃতি ঋতুসম্পর্কিত খণ্ডকবিতাগুলির কথা একবার স্মরণ করাইয়া দিতেছি।

বর্ষার কবিতাগুলি মনে করুন। ওগুলি কি বর্ষার বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা? 'এমন দিনে তারে বলা যায়' এই গানখানি আষাঢ়-এর বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা, না বর্ষার ছায়াঘন পরিবেশের মধ্যে প্রেমমধুর বিরহী চিত্তেরই একটি মন্ময় রূপপ্রকাশ? 'ওরে তোরা আজ যাস্‌নে ঘরের বাহিরে'—বর্ষোপগমে পুলকিত প্রেমাবেগের একখানি আনন্দ প্রকাশ ছাড়া আর কি? 'হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে' কবিতাটিতে ময়ূর আছে, মেঘ আছে, দাদুরি আছে, নীপ-নিকুঞ্জ আছে, তড়িৎ-শিখা আছে, নবমালতী আছে, আছে বিকচকেতকী, কিন্তু তবু কি কবিতাটিকে বস্তুনিষ্ঠ বর্ষাবর্ণনা বলিয়া ভ্রম হইতেছে? বর্ষার মেঘমেদুর অম্বরের রূপচ্ছবি অপেক্ষা কবির 'শতবরণের ভাবউচ্ছ্বাস' কলাপের মতই কি কবিতাটিতে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে না? বর্ষার অতুলনীয় কবিতা কল্পনা কাব্যের 'বর্ষামঙ্গল' কবিতাটির কথাই ধরুন:

রবীন্দ্রকাব্যে বর্ষা-প্রকৃতি

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভরভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা।
শ্যামগম্ভীর সরসা।

গুরুগর্জনে নীল অরণ্য শিহরে,
উতলা কলাপী কেকা কলরবে বিহরে
নিখিল-চিত্ত-হরষা
ঘনগৌরবে আসিছে মত্ত বরষা।

ছন্দের ঝংকারে বর্ষাবিচরণের শব্দ শুনা গেল। কানের ভিতর দিয়া ছন্দোমাধুর্য প্রাণের মধ্যে বর্ষার স্নিগ্ধতা লইয়া করিল প্রবেশ। হঁ্যা, বর্ষার অমৃত স্পর্শ আস্বাদন করিলাম বটে। কিন্তু তাহার পর প্রাণে যে রসাবেশ জাগিল, তাহার ভাবে বা রূপে শুধু কি বর্ষার শ্যামকান্তিটুকুই রহিতে পারিল ?

আচ্ছা পড়ুন :

কেতকীকেশরে কেশপাশ করো সুরভি,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পরো করবী,
কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,
অঞ্জন আঁকো নয়নে।
তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া
ভবনশিখীরে নাচাও গণিয়া গণিয়া
স্মিতবিকশিত বয়নে—
কদম্বরেণু বিছাইয়া ফুলশয়নে।

ইহা কি বর্ষার চিত্র ? যদি কেহ ইহাকে অভিনব একটি বাসকশয্যার চিত্র বলিয়া মনে করে, আপনি কি তাহাতে আপত্তি করিবেন ? আবার কেহ যদি এই বাসকশয্যার মধ্য দিয়া প্রেমমধুর কান্ত চিত্তের ব্যঞ্জনা আস্বাদন করিয়া পুলকিত রহে, আপনি তাহার রসিকতায় সন্দেহ করিবেন ?

রূপকে উপলক্ষ্য করিয়া হৃদয়-প্রকাশই রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিবিষয়ক কবিতা ও নাট্যগুলির বৈশিষ্ট্য। এইজন্য তাঁহার রূপবর্ণনার মধ্যে অরূপহৃদয়ের আনন্দ, হয় প্রেমরূপে, নয় বৈরাগ্যরূপে হয় প্রকাশিত। বসন্ত ও বর্ষার রচনাগুলির ন্যায় শরৎরচনাবলী সম্পর্কেও এই কথা প্রযোজ্য। কবির শারদোৎসবের কাহিনী, কথা ও গানগুলি আমার কথার সত্যতা প্রমাণ করে কি না একবার চিন্তা করিয়া দেখুন।

শরতের শুভ্র রৌদ্রবিভায় আকাশ যখন ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে, ছেলের দল তখন ছুটির পুলকে পথে পথে গান গাহিতে হইয়াছে বাহির। কিন্তু টাকা টাকা করিয়া এবং টাকা পুঁজি করিয়াই যাহার একমাত্র আনন্দ সেই লক্ষেশ্বরের এই সমস্ত আনন্দগীতি মোটেই

ভালো লাগে না, শরৎ আলোর রূপমহিমার সে ধারই ধারে না, সে সুদের হিসাবই শুধু বুঝে ভালো। তাই তরুণ কিশোর উপনন্দের প্রভু তাঁহার উত্তমর্ণ এই লক্ষেশ্বরের ঋণশোধ না করিয়াই যখন মারা গেল, তখন বড়ই ভাবনা হইল তাহার। শিষ্য উপনন্দর এই ঋণশোধ করিবার আইনতঃ কোনো দায় নাই, তথাপি গুরুঋণ আনন্দভরেই সে শোধ করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিল। উপনন্দ দরিদ্র কিশোর, সে কেমন করিয়া ঋণ পরিশোধ করিবে? কথা হইল যে পুঁথি লিখিয়া দিয়া গুরুর ঋণ সে পরিশোধ করিবে।

ছেলের দল শরৎ আলোয় গান গাহিয়া ফিরিল, কিন্তু বালক উপনন্দ গানের দিকে দিল না মন। আনন্দের ঋণশোধ করিবার গভীর তপস্যায় সে বসিয়া গেল—বসিয়া গেল পুঁথি লিখনের শ্রমসাধ্য কর্মে।

কিন্তু এই যে ঋণশোধের জন্য একনিষ্ঠ তপস্যা—ইহার যে গভীরতর আনন্দ—তাহা বুঝিবার মত হৃদয় লক্ষেশ্বরের নাই বটে, কিন্তু পৃথিবীতে কাহারও কি নাই?

রাজা বিজয়াদিত্য বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য আস্বাদনের অভিপ্রায়ে রাজপুরীর অহংকার ও আভিজাত্যের বন্ধন ত্যাগ করিয়া গোপনে এই সময় সন্ন্যাসীর বেশে প্রকৃতির উন্মুক্ত ক্রোড়ে আসিয়া বসিলেন। উপনন্দের ঋণশোধের মহিমা তিনিই বুঝিলেন। উপনন্দের হৃদয়-মহত্ত্ব ও হৃদয়ের শুভ্রতা দর্শনে চোখ যেন তাঁহার খুলিয়া গেল। শরৎসৌন্দর্যের মধ্যে, রাজা দেখিলেন, উপনন্দের মত প্রকৃতিও আনন্দের ঋণ পরিশোধ করিতেছে।

শরতের মর্মবাণী—'ঋণশোধ'

প্রকৃতি নানা ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যময়ী—নানা আনন্দের নানা রূপে রূপবতী এই প্রকৃতি। কিন্তু যে শিল্পগুরুর কাছ হইতে সে এত আনন্দ পাইয়াছে, তাঁহার কাছে সে কি ঋণী নহে? সেই ঋণ তাহাকে কি শোধ দিতে হইবে না?

তবে একটি কথা। কষ্ট করিয়া যে ঋণশোধ দেওয়া হয়, তাহাতে মহিমা নাই আনন্দভরে আনন্দের ঋণশোধ করিতে হইবে। উপনন্দ যে কোনো মুহূর্তে বলিতে পারে—গুরু যে ঋণ করিয়া গেছেন, যে ঋণ আমার নহে, আমি তাহা কেন শোধ করিতে যাইব? কিন্তু সে তাহা বলিবে না। গুরুর মহত্ত্বের সৌন্দর্য হইতে বহু মহিমার সৌন্দর্যকে সে আহরণ করিয়াছে। আজ মহিমা প্রকাশের দ্বারাই তাহার গুরুর মহিমার ঋণশোধ করিবে শিষ্য উপনন্দ।

উপনন্দকে দেখিয়াই রাজা বুঝিলেন—শিষ্য-গুরুর আনন্দের ঋণ বিশ্বপ্রকৃতি সৌন্দর্য প্রকাশের দ্বারাই শোধ করিতেছে। প্রকৃতি এত সুন্দরী কেন? প্রকৃতি যে আনন্দের ঋণ পরিশোধের জন্য আনন্দ দান করিতে বসিয়াছে। যত দিতেছে, যত ত্যাগ করিতেছে, ততই তাহার সৌন্দর্য বর্ধিত হইতেছে। যে সৌন্দর্য, যে আনন্দ প্রকৃতি পাইয়াছে, তাহা যদি সে কৃপণের মত লুকাইয়া আপনার ভোগের জন্য রাখিয়া দিত, তবে ধনী কৃপণ

লঙ্কেশ্বরের মত সে দরিদ্ররূপেই রহিত চিরকাল—ঋতুতে ঋতুতে এত ঐশ্বর্যের মহিমায় ঝলমল করিত না কোনোকালে। শিল্পগুরু সেই অরূপের কাছ হইতে সে যাহা পাইয়াছে, তাহাই শোধ দিবার জন্য সে হইয়াছে আনন্দ-তপস্বিনী।

সন্ন্যাসী কহিলেন—

"আমি অনেকদিন ভেবেছি জগৎ এমন আশ্চর্য সুন্দর কেন। কিছুই ভেবে পাইনি। আজ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি—জগৎ আনন্দের ঋণশোধ করছে। বড়ো সহজে করছে না, নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে, ত্যাগ করে করছে। সেইজন্যেই ধানের খেত এমন সবুজ ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছে, বেতসিনীর নির্মল জল এমন কানায় কানায় পরিপূর্ণ। কোথাও সাধনার এতটুকু বিশ্রাম নেই, সেইজন্যেই এত সৌন্দর্য!"

শুনিয়া ঠাকুরদাদা কহিলেন—

"একদিকে অনন্ত ভাণ্ডার থেকে তিনি কেবলি ঢেলে দিচ্ছেন, আর একদিকে কঠিন দুঃখে তারি শোধ চলছে। সেই দুঃখের আনন্দ এবং সৌন্দর্য যে কী সে কথা তোমার কাছে পূর্বেই শুনেছি। প্রভু, কেবল এই দুঃখের জোরেই পাওয়ার সঙ্গে দেওয়ার ওজন বেশ সমান থেকে যাচ্ছে, মিলনটি এমন সুন্দর হয়ে উঠেছে।"

সন্ন্যাসী কহিলেন—

"ঠাকুর্দা, যেখানে আলস্য, যেখানে কৃপণতা, যেখানেই ঋণশোধে ঢিল পড়ে যাচ্ছে সেইখানেই সমস্ত কুশ্রী, সমস্তই অব্যবস্থা।"

ঠাকুরদাদা কহিলেন—

"সেইখানেই যে একপক্ষে কম পড়ে যায়, অন্য পক্ষের সঙ্গে মিলন পুরো হতে পারে না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন—

"লক্ষ্মী যখন মানবের মর্ত্যলোকে আসেন তখন দুঃখিনী হয়েই আসেন; তাঁর সেই সাধনার তপস্বিনীবেশেই ভগবান মুগ্ধ হয়ে আছেন, শত দুঃখেরই দলে তাঁর সোনার পদ্ম সংসারে ফুটে উঠেছে, সে খবরটি আজ ওই উপনন্দের কাছ থেকে পেয়েছি।" [শারদোৎসব]

প্রকৃতির সৌন্দর্যের অন্তরালে আনন্দের যে ঋণ পরিশোধের লীলা চলিতেছে—শরৎ-সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া কবি তাহাই উপলব্ধি করিয়াছেন। এই উপলব্ধির রসানন্দই তাঁহার শরৎ-কবিতাগুলির প্রাণস্পন্দন। বলা বাহুল্য, আনন্দে আনন্দ হইয়া আনন্দপ্রকাশই রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-কবিতাগুলির মর্মকথা। বসন্তের কবিতাগুলি অনিত্যজীবনের অন্তরালবর্তী নিত্য আনন্দের স্বপ্নমহিমা, বর্ষার কবিতাগুলি মানবিক প্রেমবাসনার লীলাচকিত আনন্দোদ্বেজনার সুরসংগীত, শরতের কবিতাগুলি অরূপ আনন্দলোকের আনন্দস্পর্শে দুঃখের মধ্যেও আনন্দ হওয়ার ও দুঃখ সহিয়াও আনন্দ দেওয়ার কান্ত চেতনার বাণীমূর্তি।

শরৎ-কবিতার প্রাণ-স্পন্দন

পড়ুন—

আনন্দেরি সাগর থেকে এসেছে আজ বান।
দাঁড় ধরে আজ বস্‌রে সবাই, টান্‌রে সবাই টান্‌।
বোঝা যত বোঝাই করি
করব রে পার দুখের তরী,
ঢেউয়ের 'পরে ধরব পাড়ি—
যায় যদি যাক্‌ প্রাণ। [শারদোৎসবের গান]

কি—

তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ
দুখের অশ্রুধার।
জননী গো, গাঁথব তোমার
গলার মুক্তাহার।
চন্দ্র সূর্য পায়ের কাছে
মালা হয়ে জড়িয়ে আছে,
তোমার বুকে শোভা পাবে আমার
দুখের অলঙ্কার। [তদেব]

'দুখের অলঙ্কার'-এর সৌন্দর্যটুকু অনুভব করুন। ইতিপূর্বে সুধীর পাঠক অবশ্যই উপনন্দের দুঃখবরণের মহিমাটুকু অনুভব করিয়াছেন। স্নেহের আতিশয্যে মা যখন সন্তানের দুঃখে কাঁদেন, প্রেমের প্রাবল্যে স্বদেশপ্রাণ যখন দেশের দুঃখে কাঁদেন, ভক্তির উচ্ছ্বাসে ভক্তহৃদয় যখন ভগবানকে পাইলেন না বলিয়া আপন অযোগ্যতার দুঃখে ব্যাকুল হইয়া কাঁদেন—তখন সে দুঃখের সৌন্দর্য অপরিমেয়। পাঠক জানেন, উপনন্দের দুঃখ ব্যক্তিগত জীববাসনার সংকীর্ণ দুঃখ নহে, সে দুঃখ আনন্দের ঋণ পরিশোধের জন্য শ্রমতপস্যার সার্থক দুঃখ—দর্পণের ন্যায় তাহা শুভ্র ও স্বচ্ছ—এইজন্য তাহার মধ্য দিয়া মহৎ একটি কান্ত হৃদয়ের স্বর্গোপম আনন্দ-প্রশান্তিই প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। ইহাই যদি প্রকৃতির বুকের শোভা বর্ধন না করিবে তবে কোন্‌ অলঙ্কারে তাহা করিতে পারিবে? এই 'দুখের' যে 'অশ্রুধার' তাহা তো যা-তা পাত্রে সাজানো যায় না,—পিতলের এমন কি রূপার থালাতেও এই 'দুখের অশ্রুধার' কবি সাজাইবেন না, সাজাইবেন 'সোনার থালায়'। মূল্যবান দ্রব্য মূল্যবান আধারেই পায় শোভা। প্রকৃতির শুভ্রকোমল বক্ষের আশ্রয়েই শোভা পায় এই দুঃখ—এই মহৎ হৃদয়ের চেতনাপ্রকাশক দিব্য মানবিক মাহাত্ম্য। কবি কহিলেন চন্দ্রসূর্য অপেক্ষাও ইহার জ্যোতি মহত্তর, উজ্জ্বলতর, তাই চন্দ্রসূর্য যখন পায়ের তলায় শোভমান,

উপনন্দের দুঃখ

'তোমার বুকে শোভা পাবে আমার
দুখের অলঙ্কার।'

প্রকৃতি সৌন্দর্য প্রকাশের দ্বারা আনন্দের ঋণ পরিশোধ করিতেছে, মানুষ হৃদয়-প্রকাশের দ্বারা আনন্দের ঋণ শোধ করিবার প্রয়াস পাইতেছে। হৃদয়ের মহত্ত্বের দ্বারা বিশ্বকে সুন্দর করিতে যে না পারিল, সে কৃপণ, সে কুশ্রী, তাহার দুশ্চরিত্র পঙ্গু হৃদয়ের জন্য প্রকৃতিতে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে, অর্থাৎ সুন্দরের রাজ্যে অসুন্দরের হয় উপদ্রব। প্রকৃতির সৌন্দর্য ভোগ করিব অথচ আত্মার সৌন্দর্যদানে অর্থাৎ ত্যাগপ্রদীপ্ত 'দুঃখের' মহিমায় সেই ভোগের মর্যাদা বাড়াইব না—ইহা হইতেই পারে না। তাই আত্মার সৌন্দর্য প্রকাশে যে কৃপণ, প্রকৃতির সৌন্দর্য ভোগেও সে অপটু, সে লক্ষেশ্বরের মত অন্ধ।

রসজ্ঞ সে-ই হইতে পারে বোধবিস্তৃতি বা হৃদয়বিস্তৃতি যাহার ঘটিয়াছে। অর্থাৎ তুচ্ছ বাসনার বন্ধন কাটাইয়া উচ্চতর বিমল বাসনায় যে উঠিয়াছে। উপনন্দের ত্যাগোদ্দীপ্ত দুঃখের সৌন্দর্য উপলব্ধি করে এমন বোধ কি লক্ষেশ্বরের আছে? যাহার আছে, সে-ই উপনন্দের দুঃখের দৃষ্টান্তে প্রকৃতির আনন্দ-তপস্যার রহস্য পারে আস্বাদন করিতে।

এইজন্যই বলিয়াছি, আগে হৃদয়, পরে প্রকৃতি। বলা বাহুল্য, বুঝাইবার জন্যই এই আগে-পরের কথা উঠিতেছে। সূক্ষ্মভাবে যদি দেখেন তখন অবশ্য দেখিবেন—উভয়েই এমনভাবে ওতঃপ্রোত মিশ্রিত ও মিলিত হইয়া আছে যে, কোন্‌টি আগে, কোন্‌টি পরে বলা শক্ত। সত্যসত্যই আগে-পরের কথা উঠিতেছেই বা কেন! অখণ্ডদৃষ্টিতে সবই তো শান্তং শিবং অদ্বিতীয়ম্!

শ্রেণীত্বের বা পারম্পর্যের কথা খণ্ডদর্শনের কথা। বুঝিবার বা বুঝাইবার পক্ষেই ইহার প্রয়োজন। বোঝা হইয়া গেলে ইহার বিশেষ কোনো প্রয়োজন নাই। সুতরাং তর্ক না করিয়া স্বীকার করাই ভালো, বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যেই আমি আছি বটে, কিন্তু আমি না জাগিলে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে আছি সে-কথা আমার বোধে পৌঁছায় না। রবীন্দ্রনাথের অনেক কথায় বা কবিতায় যে দুর্বোধ্যতা বা ভাববিলাসিতা একদা আরোপ করিয়াছি তা কেবল এইজন্য যে, যে-বোধে উন্নীত হইয়া রবীন্দ্রনাথ জগৎ-ব্যাপার বা প্রকৃতি-সৌন্দর্য দর্শন করিয়াছেন, সে-বোধ সম্পর্কে আমরা অর্ধচেতন বা অচেতনই ছিলাম।

রবীন্দ্রকাব্যে প্রকৃতি হৃদয়েরই প্রতিচ্ছবি

অন্যান্য কবিতাবলীর ন্যায় শরৎকবিতাতেও কবি প্রকৃতির যে রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতির বস্তুনিষ্ঠ রূপচ্ছবি নহে, তাহা তাঁহারি আনন্দময় হৃদয়-প্রকৃতির প্রতিচ্ছবি। 'শরতে আজ কোন অতিথি', 'ওগো শেফালিবনের মনের কামনা', 'বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ', 'আজ বুকের

বসন ছিঁড়ে ফেলে' 'আমার নয়ন-ভুলানো এলে', 'ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়', 'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে' প্রভৃতি গানগুলির ছবি চোখ বুজিয়া, মন মেলিয়াই আস্বাদন করিতে হয়। গ্রীষ্ম, শীত বা হেমন্তের উপরেও কবি যে কয়েকটি গান বা কবিতা রচনা করিয়াছেন সেগুলি সম্পর্কেও এই কথা প্রযোজ্য। বৈশাখে অগ্নিকুণ্ড সম্মুখে রাখিয়া রুদ্র তপস্বীর শান্তিপাঠের আনন্দচিত্র [কল্পনার 'বৈশাখ' দ্রষ্টব্য] কিংবা শীর্ণ শুষ্ক শীতের অন্তরে বসন্তের বিজয়প্রস্তুতির আনন্দচিত্র [বনবাণীর 'শীতের উদ্বোধন' দ্রষ্টব্য] অথবা হেমন্তের কুহেলিকাচ্ছন্ন প্রকৃতির রূপান্তরালে ধ্যানজীবনগত স্তব্ধতার আনন্দচিত্র [নৈবেদ্যর 'স্তব্ধতা' দ্রষ্টব্য] মন দিয়াই দেখিতে হয়, চোখ দিয়া নহে। চোখকে খুশি করিতে করিতে মনে গিয়া পৌঁছায় এমন কবিতা আপনি কালিদাসে পাইবেন, বিদ্যাপতিতে পাইবেন, কীটস্-এ পাইবেন, রাজশেখরে পাইবেন ('কর্পূরমঞ্জরীর' কবি) —কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতায় চোখকে ছাপাইয়া মন এতখানি বৃহৎ হইয়া আসে এবং হৃদয়কে সরাসরি এমনি রসাবেগের আকর্ষণে আচম্বিতে লয় টানিয়া যে, চোখ দিয়া কিছু যেন দেখিতেই পাই না। যতটুকু দেখি, তাহাও মনের রঙে রঞ্জিত থাকায় ভিন্ন এক নূতন ব্যঞ্জনার রূপে হয় প্রকাশিত। এইজন্য রবীন্দ্রকবিতায় একখানি বৃহৎ মনের বিশ্বপ্রভাবই অনুভব করি রূপে, রসে, শান্তে সুন্দরে, সুরে ঝংকারে।

প্রকৃতির রূপচিত্রে কবি নিজেও একখানি বৃহৎ মনের, একখানি 'বিরাট প্রাণের' আভাস পাইয়াছেন। 'বনবাণী'র সূচনায় নিস্তব্ধ বৃক্ষগুলির মহিমা বর্ণনা করিয়া তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, বিচিত্র রূপের অন্তরে অদ্বৈত যে বৃহৎ রূপের আধারটি রহিয়াছে, তাহারি অলোকসামান্য আনন্দবিভায় উচ্ছলিত এই বিশ্বপ্রকৃতি। অদ্বৈত শান্তের আনন্দই বিচিত্র চঞ্চলের আনন্দ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে বিশ্বে বিশ্বে। এই যে চঞ্চলের অন্তরে শান্তের, বিবিধের অন্তরে অদ্বৈতের উপলব্ধি—ইহাই রবীন্দ্রদর্শনে 'মহামুক্তি'।

'ওই গাছগুলো বিশ্ববাউলের একতারা, ওদের মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে, পাতায় পাতায় একতালা ছন্দের নাচন। যদি নিস্তব্ধ হয়ে প্রাণ দিয়ে শুনি তাহলে অন্তরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে। মুক্তি সেই বিরাট প্রাণসমুদ্রের কূলে, যে সমুদ্রের উপরের তলায় সুন্দরের লীলা রঙে রঙে তরঙ্গিত আর গভীরতলে 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্'। সেই সুন্দরের লীলায় লালসা নেই, আবেশ নেই, জড়তা নেই, কেবল পরমা-শক্তির নিঃশেষ আনন্দের আন্দোলন। 'এতস্যৈবানন্দস্য মাত্রাণি' দেখি ফুলে ফলে পল্লবে, তাতেই মুক্তির স্বাদ পাই, বিশ্বব্যাপী প্রাণের সঙ্গে প্রাণের নির্মল অবাধ মিলনের বাণী শুনি।'

'কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ প্রথমপ্রাণ তার বেগ নিয়ে কোথা থেকে এসেছে এই বিশ্বে?'

'সেই প্রৈতি সেই বেগ থামতে চায় না, রূপের ঝরণা অহরহ ঝরতে লাগল, তার কত রেখা, কত ভঙ্গী, কত ভাষ্য, কত বেদনা। সেই প্রথম প্রাণপ্রৈতির নবনবোন্মেষশালিনী সৃষ্টি চিরপ্রবাহকে নিজের মধ্যে গভীর ভাবে, বিশুদ্ধ ভাবে অনুভব করার মহামুক্তি আর কোথায় আছে?' [রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৫শ খণ্ড]

প্রকৃতির বিশ্ববিধ তরু লতা, ফুল পল্লবের বিচিত্র রূপৈশ্বর্য প্রাণ ভরিয়া কবি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে পাইয়াছেন জন্ম জন্মান্তরের ইঙ্গিত। দৃশ্যের মধ্যে অদৃশ্যের অলৌকিক ব্যঞ্জনা অনুভব করিয়া মুক্তির আনন্দে উঠিয়াছেন মাতিয়া। বনবাণীর প্রত্যেকটি কবিতায় মুক্তির আনন্দ ঝংকার দিয়া উঠিয়াছে। বৃক্ষবন্দনা, দেবদারু, আম্রবন, নীলমণিলতা, মধুমঞ্জরী, শাল, নারিকেল, কুরচি অথবা বৃক্ষরোপণের গানগুলির মধ্য দিয়া কবি ঋতুলীলার রহস্যময় ভাবজগৎ হইতে একেবারে মাটির কোলে নামিয়াছেন বটে, কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় মাটিতে নামিয়া মাটির এই দুলালগুলির সুন্দরতার আনন্দলীলার অন্তরে সেই বিশ্বপ্রাণপ্রৈতির আদি উৎসের শান্ত আনন্দচ্ছবিই নিরীক্ষণ করিয়াছেন।

'বনবাণী'— মুক্তির বাণী

'বনবাণী' হইতে কয়েকটি উদাহরণ তুলিয়া দিতেছি।

'আম্রবন' দেখিয়া কবি লিখিলেন :

সুদূর জন্মের যেন ভুলে যাওয়া প্রিয়কণ্ঠস্বর
গন্ধে তব রয়েছে সঞ্চিত
ওগো আম্রবন।
যেন নাম ধরে কোন্ কানে-কানে গোপন মর্মর
তাই মোরে করে রোমাঞ্চিত
আজি ক্ষণে ক্ষণ

'শাল' দেখিয়া লিখিলেন :

অন্তরের নিগূঢ় গভীরে
ফুল ফুটাবার ধ্যানে নিবিষ্ট রয়েছ উচ্চশিরে,
চৌদিকের চঞ্চলতা পশে না সেথায়।

উপেক্ষিত 'কুরচি' ফুলেও কবি সুদূরের ইঙ্গিত দেখিলেন। কুরচির রূপে পাঠ করিলেন সূর্যের আলোর ভাষা।

সূর্যের আলোর ভাষা আমি কবি কিছু কিছু চিনি,
কুরচি পড়েছ ধরা, তুমিই রবির আদরিণী।

'মধুমঞ্জরী' কবিতাতেও বলা হইল, অনন্ত সীমাহীন যে প্রাণ 'গগনে গগনে সিঞ্চিল, গ্রহতারা', সেই প্রাণপ্রৈতির আনন্দপ্রবাহই মধুমঞ্জরীর রূপের তটে আসিয়া লাগিয়াছে।

ভুবনে ভুবনে যে-প্রাণ সীমানাহারা
গগনে গগনে সিঞ্চিল গ্রহতারা
পল্লবপুটে ধরি লয় তারি ধারা,
মজ্জায় লহে ভরি। [তদেব]

রবীন্দ্রদর্শনে বিশ্বপ্রকৃতির এই প্রাণবিকাশের আনন্দতরঙ্গ যেমন সত্য, ইহার অন্তর্নিহিত সেই 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্' তেমনি সত্য। শান্তমদ্বৈতম্-কে যত জানি, 'প্রথম প্রাণপ্রেতির নবনবোন্মেষশালিনী সৃষ্টির চিরপ্রবাহকে নিজের মধ্যে গভীরভাবে বিশুদ্ধভাবে অনুভব করার' শক্তি ততই বাড়ে। এই শক্তির বিকাশ-সাধনই রবীন্দ্র-প্রকৃতির রূপ-বৈচিত্র্যের শিক্ষণীয় তাৎপর্য। 'বনবাণীর' মূল কথাটি তাই 'নারিকেল' কবিতার একটি পংক্তিতে স্পষ্ট করা হইল :

'প্রাণতীর্থে চলো, মৃত্যু করো জয়, শ্রান্তিক্লান্তিহীন।'

বিশ্বের সর্বত্রই প্রাণের প্রকাশ দেখিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রাণ হইতে প্রাণে অভিযানের বাণী তাঁহার প্রকৃতি-কবিতাগুলির ছন্দে ছন্দে ঝংকৃত হইয়াছে। আবার ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, এই প্রাণের অন্তরালে মহাপ্রাণ সেই সর্বানুভূ প্রেম আছে বলিয়া এবং সর্বোপরি সেই বিশ্বাসে রবীন্দ্রনাথ অহরহ উদ্দীপ্ত বলিয়া জীবনের ক্ষণিকতা বা ক্ষণস্থায়িত্বের ব্যাপারে তাঁহার দুঃখ বা নৈরাশ্য নাই। তবে শেলির মধ্যে দুঃখ, সংশয় বা নৈরাশ্য স্থান পাইল কি প্রকারে? আধুনিক স্কুলের ছাত্ররাও তো জানে যে, কবি শেলিও প্রকৃতির অন্তরে প্রেম অনুভব করিয়াছেন, প্রাণের লীলা দেখিয়াছেন! সর্বোপরি একটি অখণ্ডের ধ্যানও শেলির কবিতার মধ্যে বিদ্যুচ্ছটার ন্যায় উদ্দীপ্তও তো হইয়া উঠে!

প্রকৃতি-কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ও শেলি

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি ও তাহার অন্তর্নিহিত প্রেমকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই শেলির উল্লেখ করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ একদা শেলির প্রভাবে প্রভাবিত ছিলেন, অনেকে তাঁহাকে আদর করিয়া 'বাঙলার শেলি' বলিয়াও ডাকিত। ডক্টর কালিদাস নাগ মহোদয়ের কাছে শুনিয়াছি—ইহাতে রবীন্দ্রনাথ নিজেও বিশেষ গৌরববোধ করিতেন। এই দিক দিয়া চিন্তা করিলে রবীন্দ্রনাথের কাব্যালোচনায় শেলির কথা আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। বস্তুতঃ, রবীন্দ্রনাথের সহিত শেলিকাব্যের সাদৃশ্য অনেক। কিন্তু সাদৃশ্য আছে বলিয়াই যে শেলি বা তাঁহার কাব্যদর্শনের উল্লেখ করিতেছি তাহা নহে। শেলির প্রেম বা প্রকৃতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এই কারণে করিতে চাহিতেছি যে, ইহার দ্বারা রবীন্দ্র-প্রকৃতি ও প্রেম আরো স্পষ্ট করিয়া বুঝানো যাইবে। সম্ভবতঃ আরো দুই একজন কবির কথা প্রসঙ্গক্রমে আমাকে উত্থাপন করিতে হইবে। তবে গোড়াতেই সবিনয়ে

জানাইয়া রাখা ভালো যে, প্রবন্ধটিকে অযথা ভারাক্রান্ত করিবার উদ্দেশ্যে আমার এই প্রয়াস নহে। রবীন্দ্রনাথের মনোদর্শনই আমার প্রতিপাদ্য। রবীন্দ্রনাথের মনের স্বরূপ জানিতে চাওয়াই আমার উদ্দেশ্য। যাঁহার বা যাঁহাদের নামোল্লেখ আমি করিব, এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই করিব। অপ্রাসঙ্গিক পাণ্ডিত্যপ্রকাশের অনুচিত রীতি রবীন্দ্রনাথের আলোচনায় শোভন নহে, আমি জানি।

শেলির কথা তুলিয়াছি। সুধী পাঠক অবশ্যই জানেন, শেলির প্রকৃতি-কবিতায় রবীন্দ্র-কবিতার মতোই প্রাণতীর্থে চলার ও মৃত্যুকে জয় করার বাণী আছে। মানুষের 'দুখের অলংকার' প্রকৃতির শোভা বৃদ্ধি করে বলিয়া রবীন্দ্রনাথের যেমন বিশ্বাস, মানুষের মহত্ব ও প্রতিভা প্রকৃতিকে সূর্যোজ্জ্বল করে বলিয়া শেলির তেমনি বিশ্বাস। শেলি মনে করেন, প্রতিভাধর ও প্রেমিকহৃদয় কখনও মরে না।

> He lives, he wakes—'tis Death is dead, not he ;
> Mourn not for Adonai's—thou Young Dawn,
> Turn all thy dew to splendour, for from thee
> The Spirit thou lamentest is not gone. [Adonai's XLI]

প্রতিভা মরে না, মরে না প্রেম, প্রকৃতির আত্মায় থাকে মিশিয়া। প্রকৃতির কলস্বরে শুনা যায় তাহারি কণ্ঠধ্বনি, বজ্রের আর্তনাদে শুনা যায় তাহারি শীরোদ্ধত স্বর-সংগীত। রাত্রিচর মধুবিহগীর গানে গানে তাহারি কণ্ঠগীতি যায় শুনা।

> He is made one with Nature ; there is heard
> His voice in all her music, from the moan
> Of thunder, to the Song of night's sweet bird ;
> [Ibid, XLII.]

তাহার পর প্রকৃতির সম্মেলিত স্বরসাধনা অমর এই প্রতিভার স্পর্শে উজ্জ্বল হইতে যখন উজ্জ্বলতর হইয়া উচ্ছ্বসিত সৌন্দর্যে দিকে দিকে ফাটিয়া পড়ে, অমর সেই রূপৌজ্জ্বল্যকে তখন আবরিত করিতে পারে কোন্ মৃত্যুর অম-কুহেলিকা ?

> The splendour of the firmament of time
> May be eclipsed, but are extinguished not ;
> Like stars to their appointed height they climb,
> And death is a low mist which cannot blot
> The brightness it may veil. [Ibid, XIV]

উপনন্দের দুঃখতপস্যা উজ্জ্বল করে শরতের শ্যামক্ষেত্র, Adonai's এর প্রতিভা ও প্রেম সূর্যসুন্দর করে প্রকৃতির নীলাকাশ। রবীন্দ্রনাথ ও শেলির এই তত্ত্ববিশ্বাস মূলতঃ এক—ইহা বলা যায়। আবার শেলির অসীমোপলব্ধি এবং কল্পনাভরে ঊর্ধ্বলোকে পক্ষবিস্তারের আনন্দের সহিত রবীন্দ্রনাথের অসীমোপলব্ধির ও নিরুদ্দেশ যাত্রার বাহ্যতঃ বেশ কতকটা সাদৃশ্যও আছে বলিয়া মনে হয়। Prometheus Unbound নামক গীতিনাট্যে শেলি দিকে দিগন্তরে সর্বজগদ্গত একটি প্রাণপ্রৈতির যৌবনপ্রেম আস্বাদন করিয়াছেন, এই আস্বাদন, এই প্রাণ-চাঞ্চল্যের দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের সহিত শেলির তুলনা করা চলে। পুরাতনের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রির অবসানে নূতনের জয়ঘোষণার আনন্দোল্লাস শেলির কল্পনাকে যেমন চঞ্চল করে, রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকেও তেমনি চঞ্চল করে।

উপনন্দ ও Adonai

রবীন্দ্রনাথ 'বর্ষশেষ' নামক কবিতায় দুরন্ত ঝটিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

মুক্ত করি দিনু দ্বার,—আকাশের যত বৃষ্টি ঝড়
আয় মোর বুকে,
শঙ্খের মতন তুলি একটি ফুৎকার হানি দাও
হৃদয়ের মুখে।
বিজয়গর্জনস্বনে অভ্রভেদ করিয়া উঠুক
মঙ্গলনির্ঘোষ,
জাগায়ে জাগ্রত চিত্তে মুনিসম উলঙ্গ নির্মম
কঠিন সন্তোষ।

সে পূর্ণ উদাত্তধ্বনি বেদগাথা সামমন্ত্রসম
সরল গম্ভীর
সমস্ত অন্তর হতে মুহূর্তে অখণ্ডমূর্তি ধরি'
হউক বাহির।
নাহি তাহে দুঃখ সুখ পুরাতন তাপপরিতাপ
কম্প লজ্জা ভয়,
শুধু তাহা সদ্যস্নাত ঋজু শুভ্র মুক্ত জীবনের
জয়ধ্বনিময়॥ [কল্পনা]

শেলি তাঁহার বিখ্যাত Ode to the West Wind নামক কবিতায় দুরন্ত ঝটিকাকে আহ্বান করিয়া কহিতেছেন—

Make me thy lyre, even as the forest is :
What if my leaves are falling like its own !

The tumult of thy mighty harmonies
Will take from both a deep autumnal tone,
Sweet though in sadness. Be thou spirit fierce
My spirit! Be thou Me, impetuous one!
Drive my dead thoughts over the Universe
Like withered leaves to quicken a new birth.

[Ode to the West Wind]

'বর্ষশেষ' এবং 'Ode to the West Wind'

ভাষা, ভঙ্গী, চিত্রবিন্যাস, রচনালালিত্য, আলংকারিকতা প্রভৃতির দিক হইতে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, মর্মগত ভাবতাৎপর্যের বিচারে 'বর্ষশেষ' ও 'Ode to the West Wind'– এই দুটি কবিতার মধ্যে বেশ একটি সাদৃশ্য আছে। দুটি কবিতাতেই বীর্যপ্রধান উদাত্তস্বরে নূতন জীবনকে আহ্বান করা হইতেছে, দুই কবির মধ্যেই নবজীবনের রসোল্লাস উঠিয়াছে উদগ্র হইয়া। এই সমস্ত বিচার করিয়া রবীন্দ্রনাথ ও শেলিকে সমপর্যায়ে আনা অসম্ভব নহে। কিন্তু একটি কথা—রবীন্দ্রনাথের ভাগবত বিশ্বাস কি শেলির মধ্যে ছিল? ছিল না। বরং এক সময় শেলি নাস্তিক্যবাদেরই প্রচারক ছিলেন। তা' হউক, তাঁহার কবিতার মধ্যে যে অখণ্ডবোধ প্রকাশ পাইয়াছে, সত্যশিবসুন্দরের যে আহ্বানবাণী ঝংকৃত হইয়াছে তাঁহার কবিতায়, তাহাতে তাঁহাকে শিল্পধর্মের দিক দিয়া আস্তিক্যবোধবিহীন অর্বাচীন বলা চলে না। এদেশের একজন বিখ্যাত সমালোচক তাঁহার কাব্যের মধ্যে তো উপনিষদের ঋষিদের 'অধ্যাত্মবোধ'-ই আস্বাদন করিয়াছেন। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় বলেন, "শেলি উপনিষদের স্রষ্টার ন্যায় বিশ্বের অণু-পরমাণুতে 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান' ঐশী লীলার মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন।" [ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ .৭০] শেলির কবিতাবলীতে অজানিতকে জানিবার ও আদর্শবাদকে বস্তুজগতে সার্থক করিবার একটি প্রাণময় যৌবনাবেগ অহরহঃ যে বিরাজ করে, একটি গভীরতম সূক্ষ্ম অধ্যাত্মবোধ তাঁহার কবিতার মর্মমূলে বিরাজিত রহিয়া ভাবকে বস্তুর বন্ধন হইতে মুক্তি দিবার বাসনায় অহরহঃ যে ব্যাকুল হইয়া রহে একথাও ড. বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ইংরাজীভাষাবিদ্ পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন [তদেব, পৃ. ৮২]। তাঁহার 'The Triumph of Life'-এ জীবনের মূল্য ও মর্যাদা সম্বন্ধে যে জ্বলন্ত দার্শনিক জিজ্ঞাসা বেগবান ছন্দে ও ঝংকারে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাও তাঁহার জীবনের গভীরে প্রবেশ করিবার নিগূঢ় অধ্যাত্মবাসনাই সূচিত করে। কিন্তু তথাপি শেলি সম্বন্ধে একটি সংশয় জাগিয়া থাকে, তাহা এই : শেলির মধ্যে জীবনের ক্ষণিকতার জন্য এত বেদনা কেন, এত হাহাকার কেন, এত নৈরাশ্য কেন? অখণ্ড জীবনকেই যদি

তিনি জানিয়াছেন, তবে তাঁহার তো খণ্ডজীবনের ক্ষণিকতার জন্য দুঃখ বা নৈরাশ্য প্রকাশ করাই উচিত হয় না। প্রতিভা মৃত্যুকে পরাজিত করে একথা তিনি গভীর নৈরাশ্যের মধ্যেও উপলব্ধি করিয়াছেন (Adonais)—কিন্তু সর্বগ্রাসী মৃত্যু যে সর্বত্র, যেমন।

Death is here and death is there,
Death is busy everywhere,
All around, within, beneath,
Above is death—and we are death. [Death]

এবং মৃত্যু যে সুখশান্তি সমস্ত হরণ করে, হরণ করে ভরসা ভয়, হরণ করে আমাদের প্রাণ, টানিয়া শোয়াইয়া দেয় কবরের গহ্বরে—একথাও তিনি খেদের সহিত বলিয়াছেন :

First our pleasures die—and then
Our hopes, and then our fears—and when
These are dead, the debt is due,
Dust claim dust and we die too. [Ibid]

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর জন্য খেদই করিবেন না।* মৃত্যু তাঁহার নিকট অমৃতেরই অপর পিঠ। মৃত্যুকে রবীন্দ্রনাথ জীবনের গতি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের কাব্যাবলী আলোচনাপ্রসঙ্গে তাঁহার ঐক্যতত্ত্ব যখন ব্যাখ্যা করিব, তাঁহার মৃত্যু সম্পর্কিত ধারণাগুলি তখন ব্যাখ্যা করিবার অবসর আমাদের হইবে। তখন দেখাইব, রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবেই ধ্যান করিয়াছেন, এইজন্য শেলির মত জাগতিক নশ্বরতায় নৈরাশ্য প্রকাশ করিবার অবসর তাঁহার নাই। জাগতিক নশ্বরতাকে শেলি মাঝে মাঝে বুদ্ধির দ্বারা উপেক্ষা করিতে যে চাহেন নাই তাহা নহে ('we change but we cannot die'—Cloud কবিতাটি দেখুন) কিন্তু একথা সকল কাব্যরসিকই স্বীকার করিবেন যে, শেলি যেখানে ক্ষণিকতার জন্য হাহাকার করেন, সেইখানেই তাঁহার প্রতিভা অধিকতর জ্যোতির প্রাখর্যে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য—ক্ষণের মধ্যে অনন্ত দেখার আনন্দে, শেলির বৈশিষ্ট্য ক্ষণিকতার জন্য নিষ্ফল আক্রোশের ক্রন্দনে। নিম্নলিখিত কবিতাংশের মধ্যে শেলিপ্রতিভার এই বিশিষ্টতা, লক্ষ্য করুন :

* পরিশেষ দেখুন। 'ধাবমানে'—'মরণের বীণাতারে উঠে জেগে জীবনের গান।'
আবার 'মৃত্যুঞ্জয়ে'—'আমি মৃত্যু চেয়ে বড় এই কথা বলে যাব আমি চলে।'

The flower that smiles to-day
to morrow dies ;
All that we wish to stay
Tempts and then flies ;
What is this world's delight ?
Lightning that mocks the night,
Brief even as bright. [Mutability]

কি—

When hearts have once mingled,
Love first leaves the well-built nest ;
The weak one is singled
To endure what it once possessed.
O, Love ! who bewailest
The frailty of all things here,
Why choose you the frailest
For your cradle, your home and your bier ? [Lines]

কিংবা—

Rarely, rarely, comest thou,
Spirit of Delight !
Wherefore hast thou left me now
Many a day and night ?
Many a weary night and day
'Tis since thou art fled away. [Song]

নৈরাশ্যের এই ললিত স্বরঝংকারই শেলির শেলিত্ব। বিশ্বব্যাপী একটি কান্ত জীবনলীলা উপলব্ধি করা সত্ত্বেও জীবনের ক্ষণিকত্বের জন্য শেলির এই যে ক্রন্দন, ইহাই তাঁহার মানসপ্রকৃতির স্বরূপ নির্দেশ করে। ব্যক্তিগত প্রেমের নশ্বরতা লইয়া শেলিকে যথেষ্ট ক্রন্দন করিতে হইয়াছে, আবার বিশ্বগত অখণ্ড প্রেমের জয় ও চরিতার্থতা সম্বন্ধে কখনও কখনও তাঁহার চেতনা নবতর অধ্যাত্মদৃষ্টিও লাভ করিয়াছে। Epipsychidion-এ দুঃসহ হাহাকারের মধ্যেও করুণ কণ্ঠে তিনি প্রেমের জয় ঘোষণা করিয়াছেন :

Love's very pain is sweet
But its reward is in the world divine
Which, if not here, it builds beyond the grave. [Ibid]

ব্যক্তিপ্রেমে নৈরাশ্য এবং বিশ্বপ্রেমে আশা—এই যে দ্বন্দ্ব, ইহাকে সর্বজগদ্‌গত অখণ্ড জীবনবোধের দৃষ্টান্ত বলা সঙ্গত হইবে না। রবীন্দ্রজীবনে দ্বন্দ্ব আছে, তবে সে দ্বন্দ্ব শেলিজীবনের দ্বন্দ্ব নহে। বসন্ত প্রকৃতির আলোচনায় পূর্বে দেখাইয়াছি, রবীন্দ্রনাথ জীবনের বা সুখের ক্ষণিকত্বের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিবেন না। অনিত্যতার অন্তরেই তিনি নিত্যের স্পর্শ অনুভব করিবেন সর্বত্র। শেলি বিশ্বগত দিক হইতে অনিত্যের মধ্যে নিত্যকে দেখি-দেখি করিবেন, ব্যক্তিগত দিক হইতে অনিত্যতার জন্য হাহাকার করিয়া ফাটিয়াও পড়িবেন। শেলির জীবনে ব্যক্তির সহিত বিশ্বের সামঞ্জস্য স্থাপিত হয় নাই—রবীন্দ্রনাথে হইয়াছে। তবে যে রবীন্দ্রনাথে দ্বন্দ্ব দেখি, তাহা বলাই বাহুল্য, ব্যক্তিবিশ্ব-সমুত্থিত অহং-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব নহে, জীবনের ক্ষণিকত্বের বেদনায় নিষ্ফল আক্রোশসঞ্জাত শেলির দ্বন্দ্ব নহে,—যে বৃহৎ বিশ্বকে ধ্যানে তিনি অনুভব করিয়াছেন, তাহা একান্তভাবে 'আমলকীর মত' করায়ত্ত হয় নাই বলিয়াই তাঁহার দ্বন্দ্বাকুলতা। যে বৃহৎ প্রেমকে তিনি ব্যক্তি ও বিশ্বে, বস্তু ও ভাবে, নশ্বরে ও অবিনশ্বরে, জীবনে ও মরণে, গতিতে ও স্থিতিতে, জগতে ও জগদতীতে, সীমায় ও অসীমে, মোহে ও বৈরাগ্যে, মানুষে ও ঈশ্বরে—সর্বত্র সকলকালে উপলব্ধি ও আস্বাদন করিয়াছেন, সর্বজগদ্‌গত সেই প্রেমকে সম্পূর্ণভাবে এখনও আয়ত্তে আনিতে পারা যায় নাই বলিয়াই তাঁহার দ্বন্দ্ব। রবীন্দ্রকাব্যে মধ্যে মধ্যে যে অনিশ্চয়তার সুর ধ্বনিত হইতে শুনি, সে অনিশ্চয়তা অসীমকে পাইব কি পাইব না—এই ধরনের সংশয়-সঞ্জাত অনিশ্চয়তা—ব্যক্তি ও বিশ্বের পারস্পরিক বিরোধ হইতে এই অনিশ্চয়তার উৎপত্তি নহে। রবীন্দ্রনাথ একটি বিষয়ে একেবারে কৃতনিশ্চয়—তাহা এই যে, খণ্ডজীবন অখণ্ডের মধ্যেই আলিঙ্গিত রহিয়াছে; যাহা হইতেছে, অখণ্ডদৃষ্টিতে তাহা দেখিতে শিখিলেই বুঝা যাইবে, সর্বজগদ্‌গত প্রেমের আনন্দ ও করুণার স্পর্শ তাহাতে আছেই আছে। ঠিক এই জন্যেই রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ঋজু স্বভাবোদ্দীপ্ত দার্শনিক একটি ঐক্যতত্ত্ব মেলে, শেলিতে তাহা মেলে না। শেলি অবস্থান করেন Mood-এর বৈচিত্র্যে—রবীন্দ্রনাথ অবস্থান করেন প্রেম নামক একটি Principle-এর অদ্বিতীয়ত্বে। Mood-এর প্রভাবে শেলির অদ্বৈত দর্শনপ্রাণও বৈচিত্র্যের রঙে রঞ্জিত হইয়া যায়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথে একটি অখণ্ড জীবনগত ধ্রুব প্রেমের Principle আছে বলিয়া বিশ্ববিধ বিচিত্র Mood-এর সংখ্যাহীন শাখানদীগুলি সর্বব্যাপী সেই প্রেমসাগরে মিশিয়া সাগররূপই ধারণ করিয়া বসে।

শেলির দ্বন্দ্ব ও রবীন্দ্রনাথের দ্বন্দ্ব

বলিয়াছি শেলির জীবনে ব্যক্তি ও বিশ্বের সামঞ্জস্য সাধিত হয় নাই; এই সামঞ্জস্য-সাধনের সমস্যা শেলিজীবনের একটি প্রধান সমস্যা। শেলি মনে করিতেন, মানুষ নানা প্রকার রাষ্ট্রবন্ধনে ও সংস্কার বন্ধনে বন্দী বলিয়াই ব্যক্তিজীবনে প্রেম পূর্ণভাবে পায় না প্রতিষ্ঠা। এইজন্য উদাত্তকণ্ঠে মুক্তিবন্দনা গাহিয়াছেন তিনি [Ode to Liberty]। রবীন্দ্রনাথও মুক্তির

দুই কবির প্রেম ও মুক্তি-চেতনা

গান গাহিয়াছেন অনন্ত আবেগে, কিন্তু শেলির মত 'আগে মুক্তি পরে প্রেম' এই তত্ত্বে বিশ্বাস করেন নাই; তিনি বলিবেন 'আগে প্রেম পরে মুক্তি'। প্রেম হইলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে। চারিদিকে যে বিরোধ দেখি, অসামঞ্জস্য দেখি, নিজেকে প্রকৃতির খেলার পুতুল মনে করিয়া যে নিষ্ফল ক্রন্দনে বক্ষ ভাসাই, প্রকৃতিতে ধ্বংসাত্মক রুদ্রলীলা দর্শন করিয়া আতঙ্কে যে শিহরিয়া উঠি—এ সমস্ত প্রেমবিহীন মনের বিকার ছাড়া আর কিছু নহে। প্রেম হইলেই মুক্তি [শান্তিনিকেতন-১],—প্রেম হইতে যে মুক্তি, সেই মুক্তির দৃষ্টিতে ব্রহ্ম, প্রকৃতি ও মানবজীবনের ঐক্যমধুর অচ্ছেদ্য আত্মীয়তা।

The Poet in Philosophy and Affairs নামক প্রবন্ধে James H. Cousins শেলি ও রবীন্দ্রনাথের প্রেম সম্পর্কে তুলনামূলক যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহা এস্থলে অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন :

> "The freedom of love that Shelly dreamed of was freedom for love to find its full expression and voluntarily to seek its affinities; the binding that Rabindranath affirms is the voluntary merging of the self of illuminated human beings with others through love. The one dreamed of love attainable; the other affirms love present, and invincible if put into action. The western poet, from the side of humanity capable of Divinity, says, "We must be free in order to love": the eastern poet, from the side of Divinity in humanity, says, "We must love in order to be free", and affirms the recognition of the essential unity of humanity as the measure and test of all movements that take to themselves the sacred name of freedom." [*Tagore Birthday Number*]

'আগে মুক্তি পরে প্রেম' এবং 'আগে প্রেম পরে মুক্তি' এই দুই প্রকার দার্শনিক মনোভাবের দর্পণে এই দুই মহাকবির বিরাট দুইটি মহৎ মন স্পষ্টভাবে দর্শন করা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের মনোদর্শন এই দুই মনের তুলনামূলক বিচারে অধিকতর স্পষ্ট হইবে বলিয়া সংক্ষেপে আরো দুই চারি পংক্তি লিখিতেছি।

কৃতবিদ্য পাঠককে পুনর্বার বলিয়া দিতে হইবে না যে, শেলির মুক্তি প্রার্থনা প্রেমের জন্যই। প্রেম-ই জীবনের উদ্দেশ্য—কিন্তু হায়, মুক্তিই যখন আসিল না, তখন প্রেমের সার্থকতার মহিমা তো উপভোগ করা গেল না। আগে তাই মুক্তির জন্য সংগ্রাম। সংগ্রাম, সংগ্রাম—বিদ্রোহীর সংগ্রাম। জাগে বিদ্রোহিতা। কিন্তু বিদ্রোহিতা বাধা পায়। জাগে তাই বিরোধিতা, নৈরাশ্য, হাহাকার, নাস্তিকতা। যে প্রেম চাহি,

তাহার পথে এত বাধা কেন? বিশ্বব্যাপী যে প্রেমকে প্রকৃতির রূপে রূপে অনুভব করিতেছি, "যে প্রেমের টানে ঝর্ণা চলিয়াছে নদীর বুকে, নদী চলিয়াছে সাগরে," [Love's Philosophy] মানুষজীবনে তাহার স্পর্শ নাই কেন? "কেন সঙ্গীহীনা বিহঙ্গমা শীত-শীর্ণ শাখায় বসিয়া কাঁদে" [A Widow Bird], "দিন হইতে, রাত্রি হইতে আনন্দ কেন চলিয়া যায়, কেনই বা শ্যামল বসন্ত, সজীব নিদাঘ, শীর্ণ শীতকম্প নিস্পন্দ আমার হৃদয় গভীর নৈরাশ্যে দেয় দোলা?" বিশ্বপ্রকৃতির সহিত ব্যক্তিজীবনের কেন নাই সামঞ্জস্য? কে রচিয়াছে এই পৃথিবী? ভগবান? [A Lament]

> And who made terror, madness, crime, remorse
> Which form the links of the great chain of things
> To every thought within the mind of man
> Sway and drag heavily, and each one reels
> Under the load towards the pit of death;
> Abandoned hope, and love that turns to hate;
> And self-contempt, bitterer to drink than blood;
> Pain, whose unheeded and familiar speech
> Is howling and keen shrieks, day after day;
> And Hell, or the sharp fear of Hell?
>
> [Prometheus Unbound]

মুক্তিপ্রার্থনার আবেগে প্রকৃতিকে ও মানবজীবনকে দেখিতে গিয়া শেলির মন হইয়া উঠিয়াছে রাজসিক চাপল্যে অস্থির, অখণ্ডধর্মী হইয়াও খণ্ডপ্রবণ, আশাবাদী হইতে চাহিয়াও নৈরাশ্যের নিভৃত বেদনায় নির্জিত, উদ্যত হইয়াও অনেক ক্ষেত্রে অসহায়।

রবীন্দ্রনাথের মন এমন নহে। তাঁহার মন প্রেম প্রার্থনা করিয়াছে মুক্তির জন্য। মুক্তি অহং হইতে আত্মায়, উপনিষদের ভাষায়—অন্ধকার হইতে আলোকে, অসৎ হইতে সতে, মৃত্যু হইতে অমৃতে। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস, প্রেম হইলেই তবে এই মুক্তি আসিবে। কিন্তু এখনও সেই প্রেম জীবনে পূর্ণভাবে তো বিকশিত হইল না—জীবনে তাই ব্যাকুলতা রহিয়া গেল। তবে বলাই বাহুল্য, রবীন্দ্রীয় ব্যাকুলতা শেলীয় বিদ্রোহিতা নহে। আবার একথাও প্রণিধানযোগ্য যে, মুক্তির জন্য বিদ্রোহিতা মুক্তি আনিতেও পারে, নাও আনিতে পারে, কিন্তু প্রেমের জন্য ব্যাকুলতা প্রেমেরই অপর নাম। শ্রীভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ যথার্থই বলিয়াছেন, "প্রেমের মধ্যে যে অভাব, তাহা প্রেমেরই বিচিত্র বিলাস, তাহা প্রেম; তাহা জড়ীয় অভাব নহে।" [শ্রীশ্রীমদ্ আচার্যসংলাপ—১ম খণ্ড] এই যে প্রেমের মধ্যে অভাব বা প্রেমের জন্য ব্যাকুলতা—ইহার অন্তরে বিশ্বাসের সান্ত্বনা, সাত্ত্বিকতার

প্রশান্তি, সামঞ্জস্যের আনন্দ। ইহারি আলোকে প্রকৃতিকে দেখিতে পাইয়া রবীন্দ্রনাথের মন হইয়া উঠিয়াছে সাত্ত্বিকতায় সমুজ্জ্বল, খণ্ডের মধ্যে থাকিয়াও অখণ্ডোপাসক, মনের মধ্যে থাকিয়াও বিজ্ঞানাভিমুখী, বৈচিত্র্যকে স্বীকার করিয়াও ঐক্যধর্মী।

বলিয়াছি, প্রেমের আলোকে রবীন্দ্রনাথের-জগৎ সুন্দর, প্রকৃতি শোভাময়ী। বিশ্বকে সুন্দর, সঙ্গতিপূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ দেখার মানসিকতাই রবীন্দ্রনাথের বিচারে 'মহামুক্তি'।

কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রকৃতি-চেতনা

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মনোদর্শনেও এই মহামুক্তির আভাস মেলে। গৃহ-প্রাঙ্গণ, বৃক্ষরাজি, নিস্তব্ধ হ্রদ, নির্জন শান্ত পথ প্রভৃতি বিশ্বদৃশ্যের রূপচ্ছবিতে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রশান্ত মন একখানি সুন্দর স্বপ্ন করিয়াছে দর্শন। শেলি-প্রকৃতির মত ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রকৃতি যৌবনদৃপ্ত বিহ্বল প্রেমের উদ্দীপিকা নহে বটে, কিন্তু প্রাণময়ী এবং ধ্যানপ্রসন্না। প্রকৃতির প্রাণের অন্তরালে বিশ্বগত একটি ঐক্যশক্তির আভাস দেখিতেন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ; এই জন্য শেলি-প্রকৃতির ন্যায় তাঁহার প্রকৃতি সঙ্গতিবিহীনা বা সামঞ্জস্যহীনা নহে। শেলির কল্পনা ও চিন্তার পশ্চাতে সবল কোনো একনিষ্ঠ ভাগবত বিশ্বাসের বনিয়াদ ছিল না—উপরন্তু ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ন্যায় শেলি প্রকৃতির সহচরত্ব চাহেন নাই, চাহিয়াছিলেন প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব; এই কারণে শেলির মন কখনও চঞ্চল, কখনও শান্ত, কখনও বশ্য, কখনও বিদ্রোহী। কিন্তু ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থে দেখি প্রাণপ্রসন্ন গম্ভীরতার বিনয়নম্র মৌনশ্রী, কোমল একখানি কৃতজ্ঞতার অশ্রুসজল আনন্দের প্রশান্তি। প্রেম, শেলীয় প্রেম নহে, রহস্যময় সেই ঐশী প্রেমই ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের বিশ্বপ্রকৃতির সর্বময় কর্তা। প্রেম ভগবান, তাহা অপেক্ষা শক্তিমান কে? পঙ্গুকে তিনি লঙ্ঘন করাইতে পারেন গিরি, শক্তিমান উদ্ধতকে বসাইতে পারেন ধূলায়।

The God of Love—ah, benedicate,
How mighty and how great a Lord is he!
For he of low hearts can make high, of high
He can make low, and unto death bring nigh;
And hard hearts he can make them kind and free.

[Prioress Tale]

এই প্রেম-ভগবানে অটল বিশ্বাস থাকায় ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মন যে-প্রকৃতিকে দেখিয়াছে তাহা ধীরা, তাহা নম্রহৃদয়া, তাহা প্রেমের প্রভাবে প্রাণধন্যা, বিশ্বাসঘাতিকার কোনো মলিনতা তাহাতে কল্পনাই করা যায় না।

··· Nature never did betray
The heart that loved her. [Tintern Abbey.]

প্রকৃতিকে তাই তিনি যৌবনের বিক্ষিপ্ত বাসনার চাঞ্চল্য দ্বারা বিচার করিতে চাহেন নাই; ধীর ও নম্রহৃদয় প্রকৃতির রূপান্তরালে প্রবেশপথ প্রার্থনা করিয়াছেন। প্রবেশ করিয়া যে অমূল্য সম্পদরাজি তিনি লাভ করিয়াছেন, তাহা তাঁহারি ভাষায়:

I have felt
... ... a sense sublime
Of something far more deeply interfused,
Whose dwelling is the light of setting suns,
And the round ocean and the living air,
And the blue sky, and in the mind of man;
A motion and a spirit that impels
All thinking things, all objects of all thought
And rolls through all things. [Tintern Abbey]

প্রকৃতির রূপ দর্শনে এই যে অসীম অদৃশ্যের স্পর্শানুভূতি, এই যে এক অখণ্ডের আনন্দ উদ্দীপনায় আত্মহারা স্বভাবের বিমল প্রসন্নতা, ইন্দ্রিয় হইতে অতীন্দ্রিয় রূপরহস্যে প্রবেশ করিবার এই যে আনন্দঘন জীবনবেগ— ইহাই ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের আদর্শ ও মর্মবাণী। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ইহাই। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এই আদর্শবাণী জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সহস্র বাধাবিপত্তি ও বিরোধী ঘটনা সত্ত্বেও অন্তরে যেমন ধারণ করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথেও দেখি স্বদেশের দুর্গতি, বিদেশীয়ের অত্যাচার, মনুষ্যত্বের অবমাননা, জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ, মানুষে মানুষে অবিশ্বাস প্রভৃতি অমানুষিক অপকীর্তির প্রেমবিরোধী দুরভিসন্ধি ও দুশ্চেষ্টা দর্শনেও প্রেমের সর্বজগদ্‌গত মহান আদর্শের উচ্চ আসন হইতে কখনও সরিয়া দাঁড়াইতে চাহেন নাই। The Prelude-এর অষ্টম সর্গের একস্থানে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যেমন বলিয়াছেন—

প্রকৃতিতে অসীমের স্পর্শানুভূতি

Of this faith
Never forsaken, that by acting well
And understanding, I should learn to love
The end of life and everything we know. [The Prelude]

রবীন্দ্রনাথও তেমনি মনুষ্যজীবনের শত পরাজয় সত্ত্বেও জয়গান গাহিয়াছেন 'মানুষের' 'নবজাতকের' 'চিরজীবিতের' [শিশুতীর্থ, পুনশ্চ]।

বলিয়াছেন তিনি—

And I shall not commit the grievous sin of losing faith in Man..... Another day will come when the vanquished man

will retrace his path of glory, despite all barriers, to win back his lost human heritage. *

এই অটল, অচল ও সুদৃঢ় বিশ্বাসের বলেই ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও রবীন্দ্রনাথ মনুষ্যজীবনে ও প্রকৃতির রূপে শান্তি, সামঞ্জস্য, 'ঈশ্বরে আশ্রয়' ও 'গভীর আরাম' অনুভব করিয়াছেন। অনুভূতির তীব্রতম আনন্দে যখন আত্মহারা হওয়া যায়, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বলিবেন, ঈশ্বরের অনন্ত শান্তিতে পাওয়া যায় আশ্রয়।

The Soul when smitten thus
By a sublime idea whenceever
Vouchsafed for union or communion, feeds
On the pure bliss, and takes rest with God.

[The Prelude VIII]

রবীন্দ্রনাথও বলিবেন, জীবজীবনের বাসনাময় বিচিত্র ও বিক্ষিপ্ত চেষ্টাগুলি সংহৃত করিয়া যখন 'বিশ্বপ্রাণের হাতে' নিজেকে সমর্পণ করা যায়, তখনই অনুভব হয় 'নিখিলের অন্তর্বর্তী গভীর আরাম'। রবীন্দ্রনাথের ভাষাটি এই :

"একবার ক'রে নিজের সমস্ত চেষ্টাকে সম্বরণ করে সম্পূর্ণভাবে সেই বিশ্বপ্রাণের হাতে আমাদের প্রাণকে সমর্পণ করে দিতে হয়—সেই সময়ে আমরা গাছপালার সমান হয়ে যাই, প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের কোন বিচ্ছেদ থাকে না, আমাদের অহঙ্কারের একেবারে নিবৃত্তি হয়, তখনই আমরা নিখিলের অন্তর্বর্তী যে গভীর আরাম তাকেই লাভ করি। জেগে উঠে বুঝতে পারি যে, বিশ্রামকে আমরা এতক্ষণ কেবলমাত্র শূন্যতারূপে পাইনি, তা একটা পূর্ণ বস্তু, আমাদের নিশ্চেষ্টতা নিশ্চৈতন্যের মধ্যেও সে একটা আরাম—সেটা হচ্ছে বিশাল বিশ্বপ্রকৃতির মূলগত আরাম—যে আরামের শ্যামল মূর্তি ও নির্বাক প্রকাশ আমরা শাখাপল্লবিত নিস্তব্ধ বনস্পতির মধ্যে দেখতে পাই।" [রাত্রি, শান্তিনিকেতন-১]

রবীন্দ্রনাথকে বাঙলার শেলি বলা হইত—সেকথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। 'সন্ধ্যা-সঙ্গীতের' নৈরাশ্যমুখর কবিতাগুলির জন্যই যে তাঁহার এই নামে বিখ্যাতি হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। আবার 'প্রভাতসঙ্গীতের' সময় হইতে রবীন্দ্রনাথ যে শেলীয় নৈরাশ্য হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ক্রমশঃই বিশ্বগত একটি প্রেমের আনন্দবিশ্বাসে উন্নীত হইয়া গেছেন, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যাঁহারা অল্পই খোঁজ রাখেন, তাঁহারাও বোধকরি একথা জানেন। বস্তুতঃ মনোদর্শনের বিচারে তাঁহাকে শেলির শ্রেণীতে না বসাইয়া ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের শ্রেণীতে বসাইলেই যেন ভাল হয়। রবীন্দ্রনাথ ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত যে

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এবং রবীন্দ্রনাথ

Poet's address on the celebration of his eightieth birthday.

আলোচনাটি উপরে করিয়াছি, তাহা নিশ্চয়ই আমার এই ধারণাটির সমর্থন করিবে। কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অমিল কিছু নাই।

রবীন্দ্রনাথ ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মনোজগতের ও প্রকৃতিজগতের প্রশান্তিটুকু ধরিবার জন্যই উপর্যুক্ত সাদৃশ্যগত আলোচনার অবতারণা করা হইয়াছে। সূক্ষ্মভাবে এই দুইজন মহাকবির প্রকৃতিচিত্রের মহিমা যদি ধ্যান করা যায়, তবে তাঁহাদের রচনা ও সাধনার পার্থক্যটুকু অবশ্যই ধরা পড়িবে।

বসন্তযৌবনা শোভনার প্রেমকান্ত বৈরাগ্য কল্পনা করুন এবং সঙ্গে সঙ্গে কল্পনা করুন হেমন্তময়ী ধ্যান-তপস্বিনীর বৈরাগ্যশান্ত প্রেম,—এই দুই মানসবৃত্তিকে প্রতিমার মত পাশাপাশি সাজাইয়া ধ্যানের দৃষ্টিতে দেখিতে চেষ্টা করুন উভয়ের রূপগত, মনোগত ও সাধনগত পার্থক্য। বস্তুতঃ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রকৃতিতে তপস্বিনীর যে কৃচ্ছ্রসাধনা লক্ষ্য করি, রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিতে সেই কৃচ্ছ্রসাধনার এতটুকু প্রয়াস পাই না দেখিতে। অর্থাৎ কৃচ্ছ্রসাধনা যে কারণে প্রয়োজন, সেই কারণগুলি আপনা হইতে সহজভাবেই গেছে দূরীভূত হইয়া। অনন্তযৌবনার, দিনে দিনে পলে পলে নৌতনার অন্তহীন লীলামহিমায় অহরহঃ আনন্দ ঝরিতেছে, এই আনন্দের মধ্যে 'কীট্‌সে'র মানবিক বাসনা নাই, 'শেলির' যৌবনোদ্দাম জীবনের দুরাকাঙ্ক্ষা নাই, 'ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের' শিক্ষা ও সংযম-সাধুতার নীতিব্যঞ্জনা নাই। অনন্তযৌবনা উর্বশীর মত বিশ্বমানুষকে এ দুলায়, ভুলায়—নিখিলের বিরহবেদনার কান্ত স্বভাবে স্বপ্নের মত আসে মৃদু পাদবিক্ষেপে,—ধরিতে যান, দিবে না ধরা, মনের মধ্যে কোথায় যেন পড়িবে লুকাইয়া। তাহার পর আবার কোন্ অতর্কিত কান্ত মুহূর্তে আপনার স্বপ্নের গোপন স্তর ভেদ করিয়া মেঘাবৃত আকাশের ফাঁক হইতে চন্দ্রমার প্রকাশের মত দিবে দেখা: অযুত বসন্তের পুষ্পশোভার অমিতব্যয়িতায় হৃদয়কে করিয়া দিবে সৌরভে মন্থর, অকস্মাৎ আপনার মনে হইবে কি যেন পাইয়াছেন, কিন্তু স্থূলভাষায় স্পষ্টভাবে বুঝাইতে পারিবেন না—কী পাইয়াছেন, কিসে এত আনন্দ হইল আচম্বিতে।

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-দর্শনে লেখকের যাহা লাভ হইয়াছে, দেখুন, ভাষার দ্বারা ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু চেষ্টাই সার, মনের মত করিয়া ব্যক্ত করা যাইতেছে না। বস্তুতঃ রবীন্দ্র-প্রকৃতিতে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মত কোনো নীতি, কোনো শিক্ষা, আদর্শগত কোনো সচেতন ইতিকর্তব্য নাই—শুধু 'অকারণ পুলকে' নিজেরি অজ্ঞাতসারে স্বর্গোপম সুন্দর হইয়া যাওয়ার ব্যঞ্জনাটুকুই আছে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রকৃতির রূপে আছে মানবিক ইতিকর্তব্য, রঙে আছে শিক্ষার আলোক-লীলা, বর্ণে আছে উচ্চতর ধ্যানজীবনের মহত্তর চেতনা। তাঁহার 'The Prelude' প্রকৃতির বিশ্ববিদ্যালয়ে মানব ও প্রকৃতি সম্পর্কিত বিচিত্র জ্ঞানাহরণের কাব্যময় কাহিনী ছাড়া আর কী? তাঁহার 'Excursion' নামক

কাব্যেও কি সুগভীর একটি অধ্যাত্মবোধের নিগূঢ় শিক্ষার কথা মেলে না? মানুষ ও প্রকৃতি, প্রকৃতি ও মানুষ অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ—মানুষ প্রকৃতির বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াই হয় সুশিক্ষিত—শতসহস্র দার্শনিক ও ঋষি অজস্র চেষ্টায় যে শিক্ষা দিতে পারে না, প্রকৃতির সামান্যতম ইঙ্গিতেই সে শিক্ষা হয় মর্মগত—এমনিতর বাণীই ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রকৃতি-দর্শনের তাৎপর্য। বলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ :

One impulse from a vernal wood
May teach you more of man
Of moral evil and of good
Than all the sages can.

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি হইতে কোনো শিক্ষা পাই না এমন কথা বলিলে অনেকের হয়তো মনঃপূত হইবে না। আমার বলার কথাটি এই, শিক্ষা দিবার কোনো কথা স্পষ্ট করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিবেন না, শিক্ষা দিবার কোনো আয়োজনই তাঁহার প্রকৃতির পাঠশালায় নাই। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির পাঠশালায় আমরা যখন প্রবেশ করি, প্রকৃতি আসে খেলার সাথী হইয়া, প্রেমের সঙ্গিনী হইয়া, ভাবের গ্রহীতা হইয়া। তাহার সহিত আমরা খেলা করি, প্রেম করি, ভাবে বুঁদ হইয়া ধ্যান-ধ্যান লীলায় কাটাইয়া দিই দিনরাত্রি কিন্তু কখন যে নিজেদেরই অজ্ঞাতসারে প্রাণ বিকশিত হইয়া উঠে সোনার কমলের মত,—বাণী তাঁহার রাঙা পা-দুখানি রাখেন সেই কমলের স্বর্ণাসনে, দেহে দেহে শিহরণ নাচিয়া যায়, মর্মে মর্মে দুলিয়া উঠে শত স্বপ্নের ইন্দ্রধনু—তাহা আমরা বুঝিতেই পারি না। তাহার পর খেলা ছাড়িয়া যখন কাজে নামি, কাজে বল পাই, তখনই বুঝিতে পারি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তাহা না বলিয়াই লইয়াছেন করাইয়া। ইহারই নাম সহজানন্দে সহজভাবে আত্মবিকাশ। ইহাই রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-দর্শন।

প্রশ্ন করিতে পারেন : রবীন্দ্রনাথ কি তবে কোনো শিক্ষা বা নীতি প্রচার করেন নাই? ইহার সহজ উত্তর এই : প্রকৃতির রূপোপভোগের সময় জাগতিক কোনো শিক্ষা বা নীতির কথা তাঁহার মনেই থাকে না। তখন

সমাজ সংসার মিছে সব
মিছে এ জীবনের কলরব।

রূপোপভোগের পর তিনি যা 'হইয়া' উঠেন অর্থাৎ রসের মধ্য দিয়া যে নূতন জীবন তিনি লাভ করেন, তাহার আনন্দপ্রকাশ সুন্দরের চিত্রণে, সত্য ও শিবের বিশ্লেষণে নয়। চিত্রে, গানে, নাট্যে ও কবিতায় যে সুন্দরকে তিনি চিত্রিত করেন, সেই সুন্দর

যে জীবন-বহির্ভূত কোনো তত্ত্বমাত্র নয়, পরন্তু তা যে জীবনগত সত্য ও শিবতত্ত্ব—দর্শনে তাহাই তিনি ব্যাখ্যা করিতে বসেন। এই ব্যাখ্যামূলক রচনাগুলি হইতে যদি জাগতিক ও সামাজিক শিক্ষা ও নীতিবিষয়ক উপদেশ চাহেন, নিশ্চয়ই পাইবেন। বর্তমান লেখক তাঁহার ব্যাখ্যামূলক রচনাগুলির সাহায্যেই বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন—তাঁহার কবিতার 'সুন্দর' ও দর্শনের 'শিবসত্য' পরস্পরবিরোধী তত্ত্ব নহে। সহজভাবে তিনি যাহা পাইয়াছেন তাহাই দর্শনের তত্ত্ব,—আবার দর্শনের তত্ত্ব বলিয়া যাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সহজানন্দে সহজভাবেই তাহাই জীবনে করা যায় আস্বাদন।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রকৃতিদর্শন তথা মনোদর্শনের আর একটি দিক ব্যাখ্যা করিলে রবীন্দ্রনাথের মনোদর্শন স্পষ্টতর হইবে।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রকৃতিকে দেখিয়া অনেক সময় আমার মনে হইয়াছে যে, তাঁহার ব্যক্তিগত সংযম সাধনার ছায়া তাঁহার প্রকৃতিবিষয়ক কবিতাগুলির উপর আসিয়া পড়িয়াছে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রকৃতির শুভ্রকোমল শান্ত ললাটে স্বেচ্ছাকৃত সংযমের কাঠিন্য-রেখা যে দেখিতে পাই, তাহার কারণ বোধহয় ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ব্যক্তিগত কৃচ্ছ্র-সাধনা। আধুনিক মন এই কৃচ্ছ্রসাধনার নিত্য সচেষ্ট তৎপরতাকে মনোবিজ্ঞানের নানা তত্ত্ব দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে পারেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের একটি বিবৃতি হইতে অতি সহজেই আমি অনুমান করিয়াছি—দেহ-প্রেমের দুরন্ত কামনাকে তিনি তীব্র সচেতনতা সহকারে দমন করিতে চাহিতেন। বিবৃতিতে তিনি স্বীকার করিয়াছেন—প্রেমের কবিতা যে তিনি বিশেষ কিছু লেখেন নাই, তার কারণ সুষ্ঠুভাবে ও স্পষ্টভাবে প্রেম প্রকাশ করিতে হইলে তাঁহার সংযমাদর্শের বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বলিয়াছেন :

> "Had I been a writer of love-poetry, it would have been natural to me to write it with a degree of warmth which could hardly have been approved by my principles, and which might have been undesirable for the reader." *

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রেমের কবিতা বিশেষ কিছু লেখেন নাই, কিন্তু রবীন্দ্রপ্রতিভায় প্রেমই প্রাণ প্রেমই হৃদয়, প্রেমই আদর্শ, প্রেমই ব্রহ্ম। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থে প্রেম নাই এমন কথা কেহই বলিবেন না, কিন্তু ধর্মগত সংস্কারের ফলে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রেমকে সর্বজগদ্‌গতরূপে না চিন্তা করিয়া বিশেষ একটি আদর্শতন্ত্রের গণ্ডীর মধ্যেই ধরিয়া রাখিয়াছেন। প্রেম যে তুচ্ছতম মোহের মধ্যে অবতরণ করিয়া মোহকেও প্রেমে রূপান্তরিত করিয়া লইতে পারে, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ধর্মশাস্ত্রে ও আদর্শতন্ত্রে এই তত্ত্ব নাই বলিয়া ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাহা

* Quoted from W. T. Webb's English Litterature, p. 320

বোধ করি কল্পনাতে বা অনুভবে আনিতে পারেন নাই। সুতরাং প্রেমের কবিতা লিখিতে গেলে যে degree of warmth প্রয়োজন, স্বেচ্ছায় চেষ্টার দ্বারা তাহা পরিহার করা ছাড়া তাঁহার আর গত্যন্তর ছিল না। এই পরিহারের ফলে ক্ষতি হইয়াছে এই যে, তাঁহার প্রেম একদিকে যেমন শিল্পের দিক হইতে বিশেষ একটি জগৎসৃষ্টির ক্ষমতা হারাইয়াছে, অপরদিকে তেমনি সর্বানুভূ ও সর্বজগদ্‌গত বিশ্বরূপ প্রদর্শনের পথে বাধাও পাইয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রেম তো এমন নহে। তাহা শিল্পের দিক দিয়া যেমন 'রূপে রূপে বিচিত্ররূপিনী', দর্শনের দিক দিয়া তেমনি বিশ্বরূপের অন্তরে অধিষ্ঠিতা অদ্বিতীয়া 'অন্তরবাসিনী'। রবীন্দ্রনাথ তো বারংবার এই কথাই বলিবেন যে, যে সহজ স্বভাবজীবনে আছি, তাহা মিথ্যা নয়, শুধু প্রেমের স্পর্শ চাই স্বভাবজীবনে। প্রেম হইলেই স্বভাবজীবন দুঃখের মধ্য দিয়া, শোকের মধ্য দিয়া, সাধনার জীবনে একদিন না একদিন যাইবেই রূপান্তরিত হইয়া।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রেমের কবিতা

এই বিশ্বাস ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থে নাই। তাঁহার 'ইক্লিসিয়াস্টিকাল সনেট্' গুলির মধ্যে চিন্তা-গম্ভীর প্রেমোদ্দীপ্ত হৃদয়াবেগের যে পরিচয় পাই তাহাতে সম্প্রদায়গত ধর্মসংস্কারের বন্ধন আছে। এই বন্ধনকে মানিয়া চলাই এবং জীবনে, চরিত্রে, বাক্যে, ব্যবহারে, এমন কি শিল্পসৃষ্টিতেও প্রয়োগ করা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ছিল আদর্শ। এই আদর্শের অনুশাসনে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ জৈবকামনাকে বন্দী করিয়াছিলেন বলা যায়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো কামনাকে মহত্তর হৃদয়ভাবের বিশালক্ষেত্রে মুক্তি দিতে পারেন নাই। মানুষের প্রতি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সহানুভূতি ছিল অন্তহীন, প্রকৃতির প্রতি প্রীতি তাঁহার অনন্যসাধারণ, কিন্তু যে কাম বা মোহকে দমন করিয়া আদর্শের নিগড়ে করিয়াছিলেন বন্দী, অন্তর্নিহিত নির্জিত সেই শীর্ণ কাম ক্ষুধার্ত বিদ্রোহে মধ্যে মধ্যে করুণ ক্রন্দনে যে চিৎকার করিয়াছে, তাহার প্রতি নিত্যকাল বধির থাকার অভিপ্রায়ে তপস্বী ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থকে অহরহঃ সচেষ্ট থাকিতে হইয়াছে। খৃষ্টধর্মীয় এই সচেষ্ট সচেতনা একদিকে যেমন তাঁহাকে মানসিক কৃচ্ছ্রসাধনায় টানিয়াছে, অপরদিকে বহির্জগতে প্রকৃতির রূপেও এই সচেতনতার সংস্কার আরোপিত হওয়ায় তাঁহার প্রকৃতি গম্ভীরা বৈরাগিণীর শ্রীযুক্ত ধীরতা ধারণ করিয়াছে। অতুলচন্দ্র যথার্থই বলিয়াছেন, 'ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যে যোগ, তা' প্রধানতঃ তত্ত্বের যোগ, রসের যোগ নয়। প্রকৃতির সঙ্গে ভাবের কারবারে কবির মন কতদিক থেকে কতখানি পুষ্ট হচ্ছে তার হিসাব। এর আস্বাদ বিভিন্ন।' *

কিন্তু রবীন্দ্র-প্রকৃতি, পূর্বেই বলিয়াছি, কৃচ্ছ্রসাধন জানে না; তাহার অন্তরে নাই সম্প্রদায়গত কোনো তত্ত্বধর্মের সংস্কার। সহজ স্বভাবগত প্রেমের ঔজ্জ্বল্যে সে আনন্দিতা, সাধনার স্বভাবগত প্রেমের আকর্ষণে সে অসীমের পথে অভিসারিকা। মানুষকে এ

* শ্রীযুত অতুলচন্দ্র গুপ্ত লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য: জয়ন্তী উৎসর্গ, পৃ. ২০

উপেক্ষা দেয় না, কিন্তু কোনো মানুষ ইহাকে পারে না বাঁধিতে। উপেক্ষা দেয় না, রূপে রূপে এ আসে, অমিত উচ্ছ্বাসে হাস্য করে আনন্দে। কিন্তু বাঁধিতে যান, চলিয়া যাইবে চকিতে। বৈচিত্র্য-রূপে ইহার প্রেম, অন্তর-রূপে ইহার বৈরাগ্য। দুই মিলিয়া যে হৃদয়-ভাব, রবীন্দ্রপ্রেম কিন্তু তাহারই নাম।

এই প্রেমকে আস্বাদন করিতে না পারিলে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিচিত্রের রসাস্বাদন হয় না বলিয়াই আমার ধারণা। রবীন্দ্র-প্রেমের এই প্রেম ও বৈরাগ্যের তত্ত্বটুকু অর্থাৎ বাসনার ভোগ ও বাসনার ত্যাগের আনন্দটুকু ধারণার মধ্যে না ধরিয়া মাত্র খোলা চোখে যিনি রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিরূপ দেখিতে যান, তিনি হয় তাঁহার রূপচিত্রের বাণীকে দুর্বোধ বলিয়া ক্ষোভ করেন, নয় 'প্যাসানবিহীন' নিষ্প্রাণচিত্র বলিয়া অভিযোগ করেন। রবীন্দ্রনাথের বিচারে রূপের অবশ্যই প্রয়োজন আছে, কিন্তু অন্তর্লীন যে গোপন ভাবটিকে প্রকাশের জন্য রূপের প্রয়োজন, সেই ভাবটিই যদি রূপমোহের জৈবতায় চাপা পড়িয়া যায়, তবে রূপের মূল্য কিছু নাই। কবি কীট্‌সের প্রকৃতিরূপের ন্যায় রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিরূপ ভাস্কর্যশিল্পের মোহময় সৌন্দর্যে উদ্দীপ্ত নহে; যে রূপ দেখিয়া মন লুব্ধ হইয়া, মুগ্ধ হইয়া জৈবতার আনন্দের মধ্যে স্বেচ্ছাবন্দিত্ব গ্রহণ করিয়া বসে, ইন্দ্রিয়চাপল্যের মোহময় রসাবেগটুকুকেই সার বলিয়া মনে করে, সে রূপে ভাব নাই তাহা বলি না, কিন্তু তাহা রবীন্দ্রশিল্পগত অরূপানন্দের মুক্তিময় মহাভাব নহে।

রবীন্দ্রনাথে প্রেম ও প্রকৃতি

বলিতেছেন রবীন্দ্রনাথ :

'ভাব তো রূপকে কামনা করে কিন্তু রূপ যদি ভাবকে মারিয়া একলা রাজত্ব করিতে চায় তবে বিধাতার দণ্ডবিধি অনুসারে তাহার কপালে মৃত্যু আছেই। কেননা সে যতদিনই বাঁচিবে ততদিনই কেবলি মানুষের মনকে মারিতে থাকিবে। ভাবের পক্ষে রূপের প্রয়োজন আছে বলিয়াই রূপের মধ্যে লেশমাত্র অসতীত্ব এমন নিদারুণ। যেখানেই সে নিজেকে প্রবল করিতে চাহিবে সেইখানেই সে নির্লজ্জ, সে অকল্যাণের আকর। কেননা, ভাব যে রূপকে টানিয়া আনে সে যে প্রেমের টান, আনন্দের টান—রূপ যখন সেই ভাবকে চাপা দেয়, তখন সে সেই প্রেমকে আঘাত করে, আনন্দকে আচ্ছন্ন করে। সেইজন্য যাহারা ভাবের ভক্ত তাহারা রূপের এই ভ্রষ্টাচার একেবারে সহিতে পারে না। কিন্তু রূপে তাহাদের পরমানন্দ যখন ভাবের সঙ্গে তাহার পূর্ণ মিলন দেখে। কিন্তু শুধু রূপের দাসখত মানুষের সকলের অধম দুর্গতি।' [রচনাবলী-১১, পৃ. ৫০৭]

আধুনিক কবি-সমালোচকদের নিকট রবীন্দ্রনাথের উপর্যুক্ত কথাগুলি ধর্মসম্বন্ধীয় উপদেশ বলিয়া মনে হওয়াও বিচিত্র নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শনের মূলকথা উপরের পংক্তি-কয়টিতে স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে বলিয়া আমার ধারণা। প্রকৃতির রূপে রবীন্দ্রনাথ বদ্ধ হন না, পরন্তু মুক্তই হন, এই কারণে যে, রূপ হইতে তিনি সর্বজগদ্‌গত প্রেমের আকুল

স্বপ্নে গতি লাভ করিতে পারেন সহজ আনন্দে। এই প্রেম-গতির যে ভাব, তাহার সহিত প্রকৃতিরূপের একটি নিগূঢ় সামঞ্জস্য আছে বলিয়াই প্রকৃতির রূপ তাঁহার নিকট সত্য, শিব এবং সুন্দর, নতুবা ইহাকে মিথ্যা বলিয়া অর্থাৎ 'অকল্যাণের আকর' বলিয়া পরিহার করা তাঁহার পক্ষে বিচিত্র ছিল না। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির চিত্রে যাহা পাইয়া থাকেন, তাহারই মধ্যে একপ্রকার 'না-পাওয়া'র রস অনুভব করেন বলিয়া পাওয়ার মোহে হন না বন্দী, পরন্তু না পাওয়ার টানে বাহির হন বিপুল আবেগে। তিনি বলেন :

'সেই পাওয়াতেই মানুষের মন আনন্দিত যে পাওয়ার সঙ্গে না পাওয়া জড়িত হয়ে আছে।

'যে সুখ কেবল মাত্র পাওয়ার দ্বারাই আমাদের উন্মত্ত ক'রে তোলে না—অনেকখানি না পাওয়ার মধ্যে যার স্থিতি আছে ব'লেই যার ওজন ঠিক আছে, সেই জন্যই যাকে আমরা গভীর সুখ বলি—অর্থাৎ, যে সুখের সকল অংশই একেবারে সুস্পষ্ট সুব্যক্ত নয়, যার এক অংশ নিগূঢ়তার মধ্যে অগোচর, যা প্রকাশের মধ্যেই নিঃশেষিত নয়, তাকেই আমরা উচ্চ শ্রেণীর সুখ বলি।

'পেট ভ'রে আহার করলে পর আহার করবার সুখটা সম্পূর্ণ পাওয়া যায়; দর্শনে স্পর্শনে ঘ্রাণে স্বাদে সর্বপ্রকারে তাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা হয়। সে সুখের প্রতি যতই লোভ থাকুক মানুষ তাকে আনন্দের কোঠায় ফেলে না।

'কিন্তু যে সৌন্দর্যবোধকে আমরা কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়বোধের দ্বারা সেরে ফেলতে পারিনে —যা বীণার অনুরণনের মতো চেতনার মধ্যে স্পন্দিত হোতে থাকে, যা সমাপ্ত হোতেই চায় না, সে আনন্দকে আমরা আহারের আনন্দের সঙ্গে একশ্রেণীতে গণ্যই করিনে। কেবল মাত্র পাওয়া তাকে অপমানিত করে না, না-পাওয়া তাকে গৌরব দান করে।'

[পাওয়া ও না-পাওয়া, শান্তিনিকেতন-১]

রবীন্দ্রপ্রকৃতির রূপলীলা গভীর রসানন্দে যাঁহারা আস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহারাই উপর্যুক্ত রবীন্দ্রবাণীর মর্মগত তাৎপর্য উপলব্ধি করিবেন; তাঁহারা অবশ্যই বুঝিবেন— রবীন্দ্রপ্রকৃতির রূপলীলা কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়বোধের দ্বারাই শেষ হইয়া যায় না, কেননা তাঁহার রূপলীলা এমনি বিচিত্র যে, লুব্ধ ইন্দ্রিয়দল ব্যাকুল হইয়া তাহা ভোগ করিবার জন্য আসিতে না আসিতে মন আসিয়া তাহা কাড়িয়া লয়। ইন্দ্রিয়গুলি তখন নির্বাক বিস্ময়ে হতচেতনের মত মন মহারাজের লীলানন্দ স্বপ্নভরেই বুঝিবা দেখিতে থাকে। কবি কীট্সের কবিতায় ইন্দ্রিয়দল পরমপুলক লাভ করিবার সুযোগ পায়; শুধু তাহাই নহে, কীট্সের ইন্দ্রিয় সুন্দর নিটোল শিল্পমূর্তির রসাস্বাদনে এমনি বলশালী হইয়া ওঠে যে, মন তাহাদের উপর অধিনায়কত্ব করিতেই সাহস পায় না, বরং ইন্দ্রিয়গণের সহিত একত্র সমজুটি হইয়া অপরূপ সৌন্দর্যলীলার রসতরঙ্গে সন্তরণ দেওয়াই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করে। . .

বস্তুতঃ, মানবিক সৌন্দর্যের উচ্ছ্বসিত মোহময়তা আছে কীট্‌সের রূপবর্ণনায়। প্রস্তরমূর্তির নিটোলতার চারুত্ব আছে তাঁহার শিল্পরূপে। পাঠক যেন তাহাদের ধরিতে পারে, হৃদয়ে বরণ করিতে পারে, রেখায় রেখায় তাহাদের প্রতিমূর্তিগুলি অঙ্কিত করিয়াও লইতে পারে। গ্রীকভাস্কর্যের ইন্দ্রিয়রস আছে কীট্‌সের রূপচিত্রে, বোধকরি এইজন্য শেলি তাঁহাকে 'গ্রীক' বলিয়া পাইতেন তৃপ্তি এবং ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ 'পেগান' বলিয়া করিতেন পরিহাস। রবীন্দ্রনাথ গ্রীক নহেন, তিনি ভারতীয়; ভারতীয় হইয়াও তিনি 'পেগান' নহেন, কেননা তাঁহার শিল্পমূর্তি রূপাতীতের ভাব জাগাইতেই নির্দিষ্ট। রবীন্দ্র-কাব্যরসিকগণ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের মূর্তিগুলি ইন্দ্রিয়গোচর জীবনতটে স্পর্শ দিয়াই অন্তর্ধান করে, পাগল হইয়া আমরা তাহাদের পশ্চাতে ধাবিত হই, কিন্তু ধরিতে পারি না। গ্রীক দেবী 'ডাফনীর' অভিমুখে 'এ্যাপলোর' অগ্রগতির মত আমাদের অগ্রগতিও নীরব একটি বিরহের আকুল নিঃশ্বাসে রূপান্তরিত হইয়া যায়। তখন ইন্দ্রিয় ছাড়িয়া অতীন্দ্রিয়ে করি প্রবেশ, চোখ বুজিয়া পলায়মানা রূপপ্রতিমার সৌন্দর্য করি নিরীক্ষণ, আকস্মিক আনন্দাবেগে হৃদয় উঠে পরিপূর্ণ হইয়া। অস্ত গেছে যে 'গৌরব শশী' তাহারই জন্য 'আশা জেগে থাকে প্রাণের ক্রন্দনে'। রবীন্দ্রনাথের 'বিজয়িনী' কবিতাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করুন। আমি তো চোখ দিয়া দেখিতে পাই না, কিন্তু তবু জানি, তাহার মত সুন্দরী কেহ নাই, কোথাও নাই। বিশ্বের সর্বজগৎ হইতে তিল তিল সৌন্দর্য সঞ্চয় করিয়া অনুপমা একটি তিলোত্তমা রচনা করুন, তবু আমি বিজয়িনীর দিকেই নতজানু কৃতাঞ্জলিকরপুটে চাহিয়া রহিব। বর্ণনাতীতা বচনাতীতা এই সুন্দরী, কিন্তু চোখ দিয়া ইহার কতটুকু রূপ দেখিতে পাইয়াছি? কীট্‌সের রূপোচ্ছ্বাসের মত কুসুমিত আনন্দচাপল্যের বস্তুঘন পরিবেশ কোথায় ইহার জগতে? বসন্তের অমিত লাবণ্যে উচ্ছ্বসিত বিজয়িনীর রূপজগৎ, কিন্তু কোথাও এতটুকু আসক্তির বস্তুবিহ্বলতা নাই। বসন্ত সখা মদন এখানে সংযত, সুধীর রসানন্দের সৌন্দর্য-মহিমায় প্রসন্ন। সৌন্দর্যলুব্ধতায় নহে, সৌন্দর্যশান্তির পরমানন্দে কৃতাঞ্জলি এখানে পুষ্পশর। বিচিত্র এই বিজয়িনীর রূপজগৎ, বাসনা আছে আবার বাসনা নাই। যখনি বলি, আছে, আছে, তখনি কে যেন গভীরতর শিল্পানন্দে বলিয়া ওঠে: ইহ বাহ্য আগে কহ। অর্থাৎ 'আছে'র মধ্যে যাহা পাইতেছ, তাহা হইতে দৃষ্টিকে গভীরের পথে ফিরাইয়া দেখ, বুঝিবে যথার্থ রূপ রূপে নাই, আছে অরূপে। আবার যদি বলি নাই নাই, তখনি কে যেন গভীরতর শিল্পানন্দে গাহিয়া উঠে: আছে, আছে—এই যে অন্তর্লীন গহীন হৃদয়ের মধ্যে দূরাগত সংগীতঝংকারের মৃদুমধুর অনুরণনের মত অপরূপ কোন্ আবেশ করিতেছি অনুভব। বাসনা নাই? কে বলিল নাই? কী কারণে কৃতাঞ্জলি তবে বসিয়া আছি? বাসনা আছে? কে বলিল আছে? 'আমি' বলিতে যাহা বুঝেন, অর্থাৎ আমির এই লোকজ্ঞান, এই লোককামনা, এই ভয়, সংকোচ, কাম, মোহ কী

রবীন্দ্র-শিল্পমূর্তির বৈশিষ্ট্য

আমার রহিয়াছে? আমি তো আমিতেই নাই। যৌবন আছে, তাহার চাপল্য নাই, মোহ আছে তাহার মাদকতা নাই, হৃৎস্পন্দন আছে, অথচ ধ্বনি যেন কানে শুনিতেই পাই না। সজ্ঞান এই আত্মবিস্মৃতির—আনন্দময় বাসনার যে রূপ—রবীন্দ্রপ্রকৃতি ইহারই নাম।

কীট্‌সের প্রকৃতি, বলা বাহুল্য, এরূপ নহে। বাসনাবিহীন মৃত মূর্তি হইতেও বাসনার জীবন্তরূপ তিনি পাইবেন দেখিতে। অরূপ অতীন্দ্রিয়তায় তিনি যে যাইবেন না, তাহা নহে; কিন্তু সেখানেও লইয়া যাইবেন মানবিক বাসনানন্দের উত্তপ্ত বসন্তটিকে। কীট্‌সের প্রকৃতিচিত্রগুলিকে কীট্‌সের ভাষাতেই বলা যাইতে পারে:

কবি কীটস্

Divine ye were created, and divine
In sad demeanour, solemn, undisturb'd,
Unruffled, like high Gods, ye liv'd and ruled :
Now I behold in you fear, hope and wrath ;
Actions of rage and passion ; even as
I see them, on the mortal world beneath
In men who die. [Hyperion, lines 329-35]

বস্তুতঃ তারুণ্যের উচ্ছ্বসিত বাসনার আনন্দ এবং ইন্দ্রিয়গত জীবনের অবারিত সৌন্দর্যোচ্ছ্বাস বাদ দিলে কীট্‌সের রূপতত্ত্বে ও প্রকৃতিরূপে আর যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহা কীট্‌স-প্রতিভার দ্যুতিময় ঔজ্জ্বল্যের ধারক বা বাহক নহে।

Heard melodies are sweet, but those unheard
Are sweeter ; [Ode on a Grecian Urn]

কীট্‌স স্বীকার করিবেন; কিন্তু দর্শনে, স্পর্শনে ও শ্রবণে যে সুন্দর ইন্দ্রিয়ের কূলে অহরহঃ উচ্ছ্বসিয়া উঠিতেছে—তাহার প্রতিই কীট্‌সের বিশেষ অনুরক্তি। কীট্‌সের মানসিক তারুণ্য প্রকৃতির প্রতি রূপে দর্শন করিয়াছে ইন্দ্রিয়গত সুন্দরের আনন্দস্বপ্ন; যেখানেই তিনি চোখ মেলিয়াছেন, দেখিয়াছেন 'thing of beauty' এবং এই beauty-ই তাঁহার নিকট Truth, 'Truth, beauty'। কিন্তু, বলাই বাহুল্য, কীট্‌সের এই সত্যসুন্দর অতীন্দ্রিয় কোনো অরূপতত্ত্ব নহে, দর্শন ও স্পর্শনগ্রাহ্য আবেগ ও অনুভাবজীবনের আনন্দ-রোমাঞ্চই ইহার আত্মস্পন্দন।

Stop and consider ! Life is but a day ;
A fragile dew-drop on its perilous way
From a tree's summit [Sleep & Poetry, lines 85-87]

চিত্রটি এমনি স্পষ্ট যে হাত দিয়া যেন ধরিয়াই ফেলিতে পারি ; অথচ জীবন তো সহজ ব্যাপার নহে, দর্শনগ্রাহ্য কোনো চিত্রবিষয়ও নহে, চোখে দেখার কথা দূরে থাক, ধ্যানের মধ্যেও নিগূঢ় এই রহস্যটিকে স্পষ্ট করিয়া দর্শন করা সহজ নয় ; কীট্‌স কিন্তু এই নিগূঢ় জীবনকেই সহজ একটি শিশিরকণার রূপদর্পণে পাইলেন দেখিতে। তত্ত্বের দিক দিয়া ইহার মূল্য কতখানি, তাহা বিচার করিতেছি না, রসের বিচারে আবেগজীবন যে অবারিত আনন্দচাপল্যে ভরিয়া গেল, তাহাই স্বীকার করিতেছি।

অরূপ বিষয়ের আর একটি রূপচিত্র দেখুন :

A drainless shower
Of light is poesy ; 'tis the supreme power ;
'Tis might half slumb'ring on its own right arm.
The very archings of her eye-lids charm
A thousand willing agents to obey,
And still she governs with the mildest sway :

[Sleep & Poetry, lines 235-240]

যাহা দেখার কথা নয়, কীট্‌সের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য এই যে,তাহাই তিনি রঙে রঙে রঞ্জিত করিয়া, ফুলে ফুলে সজ্জিত করিয়া পারেন দেখাইতে। পড়ুন :

Ah, bitter chill it was,
The owl, for all his feathers, was a-cold.

[Eve of St. Agnes-I.]

কি—

Sudden a thought come like a full blown rose
Flushing his brow and in his pained heart
Made purple riot : [Eve of St. Agnes-XVI.]

কিংবা,

Great bliss was with them and great happiness
Grew, like a lusty flower in June's caress.

[Isabella-IX, lines 71-72]

কি—

I cannot see what flowers are at my feet
Nor what soft incense hangs upon the boughs
But in embalmed darkness, guess each sweet

Wherewith the seasonable month endows
The grass, the thicket and fruit-trees wild.

[Ode to a Nightingale, lines 41-45.]

অথবা—

The colours all inflam'd throughout her train,
She writh'd about, convuls'd with scarlet pain :
A deep volcanian yellow took the place
Of all her milder-mooned body's grace ;
And, as the lava ravishes the mead,
Spoilt all her silver mail, and golden brede ;
Made gloom of all her frecklings, streaks and bars,
Eclips'd her crescents, and lick'd up her stars.

[Lamia, lines 153-60.]

চোখ-ঝলসানো এই রূপের বর্ণনা অবাস্তব রূপকথার অজস্র স্বপ্নরঙের ইন্দ্রজাল করে রচনা। বেশ অনুভব করিয়া দেখুন, যে দৃশ্যভাব সম্পর্কে আমরা মোটেই সচেতন নহি, কীট্‌স চকিত তুলির টানে তাহা আঁকিয়া তুলেন, দেখিতে দেখিতে চোখ বিস্ময়ানন্দে বিস্ফারিত হইয়া উঠে—পুলকাবেশের রোমাঞ্চিত অনুভাবে যৌবন হইয়া উঠে চঞ্চল। রঙের খেলা দেখাইয়া যৌবনকে শিশুচিত্তের চাপল্যে নিত্য অধীর করিয়া তুলিতে কীট্‌স বোধ হয় বিশ্বসাহিত্যে অদ্বিতীয় কবি। কিন্তু এ-কথা পাঠককে মনে রাখিতেই হইবে, কীট্‌সের সৌন্দর্য ও রূপানুভূতির মূলে জীবন হইতে সমুদ্ভূত কোনো গভীর তত্ত্বের ইঙ্গিত নাই—খোলা চোখে জগৎকে যত সুন্দর করিয়া দেখা যায়, রঙে রঙে যত রঙিন করিয়া দেখা যায়, কীট্‌স তাহা দেখিয়াছেন। তাঁহার কল্পিত গ্রীক দেবদেবীদের বহু পুরাতন মৃত মূর্তিগুলি নব যৌবনের রূপবৈভবে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে—পড়িতে পড়িতে চক্ষের সম্মুখে ললিত সুন্দর সুঠাম বরতনু যেন ভাসিয়া উঠে, দেখিতে দেখিতে মনে হয়—'যুগ যুগ ধরি রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল'। তাঁহার 'এন্‌ডিমিয়নে' বনদেব 'প্যান' এবং 'হাইপিরিয়নে' সূর্যদেব 'এ্যাপোলো'-এর রূপশিল্পের কথা একবার স্মরণ করুন। 'প্যান'প্রশস্তির মধ্য দিয়া কীট্‌স অতীব সূক্ষ্ম কৌশলে বনপ্রকৃতির যে নয়নমোহন প্রতিমা অঙ্কন করিয়াছেন, তাহাও একবার অনুভব করুন।

O thou, to whom
Broad leaved fig trees even now foredoom
Their ripen'd fruitage ; yellow girted bees
Their golden honeycombs ; our village has

Their fairest blossom'd beans and poppied corn ;
The chuckling linnet its five young unborn,
To sing for thee ; low creeping strawberries
Their summer coolness ; pent up butterflies
Their freckled wings ; yea, the fresh budding year
All its completions—be quickly near,
By every wind that nods the mountain pine,
O forester divine [Endymion-I, lines 251-62.]

কীট্‌সের এই সমস্ত রূপকল্পনার অমিতোচ্ছ্বাস লক্ষ্য করিয়াই লী হাণ্ট বলিয়াছেন :

His (Keats's) region is 'a wilderness of sweets'—flowers of all hue and 'weeds of glorious feature' where, as he says, the luxuriant soil brings

'The pipy hemlock to strange overgrowth.'

এবং ডেভিড ম্যাসন :

'I believe that one of the most remarkable characteristics of Keats is the universality of his sensuousness'.

কীট্‌সের চিরনূতন Ode গুলি পাঠ করিলেই লী হাণ্ট ও ডেভিড ম্যাসনের উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়। বস্তুতঃ, Ode গুলির রূপরাগে যে অত্যাশ্চর্য যৌবনোচ্ছ্বাস, কামনা ও মোহের স্বপ্নসুন্দর উদ্বেল অনুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে, কাব্যবিচারে তাহা শুধু অতি নব নহে, তাহা অভিনবও বটে। রবার্ট ব্রিজেস সত্যই বলিয়াছেন : 'Had Keats left us only his Odes, his rank among the poets would not be lower than it is, for they have stood apart in literature, at least the six most famous of them—Psyche, Melancholy, Nightingale, Greek Urn, Indolence, Autumn.'

একজন বিশিষ্ট বাঙ্গালী শিক্ষাব্রতী কীট্‌সের কতিপয় Ode-এর রূপকল্পনা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অল্পকথায় যাহা বলিয়াছেন এইস্থলে তাহা উল্লেখ করিলেই কীট্‌সের রূপপ্রকৃতি ও প্রকৃতিরূপ সম্বন্ধে বেশ একটি স্পষ্ট ধারণা হইবে : 'তাঁহার (কীট্‌সের) Ode to Psyche-তে তিনি পুষ্পসৌরভপূর্ণ শ্যামল বনস্থলীর মধ্যে কামপ্রিয়া রতিদেবীর আবেশশিথিল, বিলাসবিভ্রমে এলায়িত, মোহময় সৌন্দর্যের ছবি আঁকিয়াছেন। তাঁহার Ode to Autumn-এ তিনি যে কয়েকটি মানবমূর্তি আঁকিয়াছেন তাহারা ঠিক যেন গ্রীক শিল্পীর খোদিত ; এবং Ode on a Grecian Urn-এ তিনি গ্রীক ভাস্কর্যশিল্পের ব্যঞ্জনাপূর্ণ সৌন্দর্যের বিচিত্র স্বাদ নিজে গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে অনুভব করাইয়াছেন।'

[ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস, ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়]

রবীন্দ্রপ্রকৃতি, পূর্বেই আভাস দিয়াছি, কীট্সপ্রকৃতির মতো একান্ত রূপগত নহে,—তাহা রূপগত হইয়াও রূপাতীত ভাবমহিমার অদৃশ্য সৌন্দর্যে লীলায়িত। শেলি, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ও কীট্সের প্রকৃতির সহিত রবীন্দ্রপ্রকৃতির যাঁহারা তুলনামূলক সমালোচনা করিবেন, তাঁহারা রবীন্দ্রপ্রকৃতির দর্শনগত ভেদটুকু নিশ্চয়ই স্মরণ রাখিবেন। রবীন্দ্রপ্রকৃতির রূপরাগের ভাবময় বৈশিষ্ট্যটুকু ধীরবোধের আনন্দে ধরিতেই হইবে—এই ধরার পথে কিছুটা সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যেই ইংরাজী কাব্য সাহিত্যের অমর কবিত্রয়ের প্রকৃতিবোধের সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমি করিয়াছি। আলোচনার দ্বারা এই কথাই আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি যে, শেলির প্রাণচঞ্চলা প্রেমময়ী প্রকৃতি, অথবা ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের জ্ঞানগম্ভীরা ধ্যানময়ী প্রকৃতি কিংবা কীট্সের বসন্তমধুরা মোহময়ী প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি নহে, রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি একান্তভাবেই রাবীন্দ্রিক। রবীন্দ্রনাথের মনোদর্শনের স্বরূপটি যাঁহার জানা হইয়াছে, তিনিই রবীন্দ্রপ্রকৃতির রূপবৈশিষ্ট্যের কারণ সম্বন্ধে অবহিত আছেন। পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ অহং-এর অতিকৃতি ও বন্ধন ছিন্ন করিয়া ক্রমশঃ আত্মমন্দিরে উন্নীত হইতে চাহিয়াছেন। আত্মার আনন্দজ্যোতির মধ্য দিয়াই তিনি প্রকৃতির বস্তুরূপ নিরীক্ষণ করিয়াছেন, ফলে রূপজ্যোতি দেখিয়া যত না তৃপ্ত হইয়াছেন, বস্তুর অরূপ-জ্যোতিটুকু দেখিয়া ততোধিক তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করিয়াছেন। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের দর্শনে আত্মা আছে, কিন্তু সম্প্রদায়গত ধর্মশাস্ত্রের সংস্কার তাঁহাকে আত্মার সর্বব্যাপিতা দেখাইতে পারে নাই, শেলির দর্শনে প্রাণগত আত্মার উন্মেষ দেখিয়াছি, মনোগত প্রশান্তির বোধগত আত্মার ঔদার্যে উন্নীত হইতে তিনি পারেন নাই ; ফলে অখণ্ডত্বে তাঁহার কল্পনা প্রসারিত হইলেও খণ্ডের মৃত্যুকে অখণ্ড অমৃতে একাত্ম করিয়া দেখিবার প্রতিভা তাঁহার ছিল না। কীট্সের কবিতায় দর্শন কিছু নাই বলিলেও চলে, তবে মধ্যে মধ্যে তাঁহার কবিতায় ও পত্রে দর্শনাভাসের দীপ্তি ক্ষণপ্রভার চকিত রশ্মিলীলার আনন্দ দান করিয়াছে বলা যায়। কীট্সের আত্মা ভোগগত বাসনার স্বপ্নে চঞ্চলাধীর, কিন্তু আনন্দিত। এইজন্য তাঁহার প্রকৃতি দর্শনগত, স্পর্শনগত, শ্রবণগত ইন্দ্রিয়প্রকৃতি। অধিকদিন বাঁচিয়া থাকিলে ইন্দ্রিয়াতীত চিন্ময়ী প্রকৃতির অরূপ ঐশ্বর্যের প্রশান্তি হয়তো তাঁহার রচনায় দেখা যাইত, কিন্তু যাহা হয় নাই, তাহা লইয়া আনুমানিক গবেষণায় বিশেষ ফল আছে বলিয়া মনে করি না। রবীন্দ্রনাথের মন ইন্দ্রিয়বন্ধন স্বীকার করিয়াও মুক্তির সন্ধানে চলিয়াছে। এইজন্য দৃশ্যকে স্বীকার করিয়াও তাঁহার কাব্য ও কথামালা অদৃশ্যের আনন্দস্বপ্নে এত ব্যাকুল—প্রেমের আনন্দ অনুভব করিয়াও বিরহের উদ্দীপ্ত কান্ত-আনন্দে এত সুষমাময়। দার্শনিক বিচারে মুক্তি অবশ্য তিনি পান নাই, কিন্তু কাব্যিক বিচারে মুক্তি তাঁহার গেছে মিলিয়া। চিত্রে চিত্রে, দৃশ্যে দৃশ্যে, রঙে রঙে তিনি যাহা দেখিয়াছেন, তাহাতেই তিনি গতির চাঞ্চল্য করিয়াছেন অনুভব, অর্থাৎ রূপ হইতে রূপান্তরে হইয়াছেন অগ্রসর। লিপ্ত থাকেন নাই কোথাও,

রবীন্দ্র-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য

ইহাই তাঁহার মুক্তি। অজস্র বৈচিত্র্যের মধ্যে তিনি গতায়াত করিতে পারিয়াছেন এই কারণে যে, একদিকে যেমন তিনি উচ্চতম প্রেমকেই অর্থাৎ প্রেমবোধকেই আদর্শ করিয়াছেন, অপরদিকে তেমনি, প্রেমের জন্যই, কোনো বিশেষে, কোনো সংস্কারে, কোনো বিশেষ ধর্ম বা মোহে আবিষ্ট হইয়া পড়েন নাই। বিশেষ রূপমোহে তিনি আবিষ্ট হইয়াছেন একথা যখনই আপনার মনে হইবে, তখনি বেশ ধীরভাবে ধারণা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, চূড়ান্ত কোনো মোহের মধ্যেও প্রেমালোকের ইঙ্গিত দর্শন করিয়া বিশেষের অন্তরে অশেষ আনন্দ তিনি আস্বাদন করিতেছেন।[১] তাঁহার রচনায় মোহ প্রেমরূপে, বিশেষ অশেষরূপে, রূপ অরূপ-রূপে প্রভাসিত হইয়াছে ঠিক এই কারণে। এই যে রবীন্দ্রপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য ইহার তুলনা কেবল বৈদিক ঋষিকবিদের কোনো কোনো স্তোত্রে বা প্রশস্তিতে মেলে। বৈদিক ঋষিদের যে প্রকৃতি ধ্যানরসিক ভাবুকদের আনন্দেই কেবল আবির্ভূত হইত, রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য এই, তিনি সেই ধ্যানময়ী অরূপাকে রসমূর্তি দান করিয়াছেন। এই রসমূর্তি একদিকে যেমন কালিদাসের রূপপ্রকৃতির ন্যায় যৌবনে অজস্র বসন্তবিহ্বলতার মোহমাধুরী বিস্তার করে, অপরদিকে তেমনি বৈদিক ঋষিকবির রূপপ্রকৃতির ন্যায় অন্তরে অনন্ত ভাবপ্রসন্নতার মোহহীন প্রেমবিলাস করে প্রকাশ।[২]

মহাকবি কালিদাসের কবিত্বের সহিত রবীন্দ্রনাথের কবিত্বের অনেকক্ষেত্রেই মিল আছে, এবং সর্বোপরি কালিদাসের কবিত্ব-প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ বহুলভাবে প্রভাবিতও বটেন। 'রবীন্দ্রনাথ উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর কবি কিন্তু তিনি কালিদাসের কালেই জন্মেছেন' ['জয়ন্তী উৎসর্গ', পৃ. ২৫], অতুলচন্দ্রের এই উক্তি অনেকাংশে সত্যও বটে, কিন্তু বেশ ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, কালিদাসের প্রকৃতি ও রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি সর্বাংশে যে এক তাহা নহে। কালিদাসের অনিন্দ্যসুন্দর বস্তুনিষ্ঠ সৌন্দর্যবর্ণন-রীতি রবীন্দ্রনাথের নহে। রবীন্দ্রনাথের মন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সৌন্দর্যে ও রূপে বেশিক্ষণ স্থির হইয়াই থাকিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ যাহা দেখেন, প্রায়শঃই ভাবের দৃষ্টিতে ভাসা-ভাসা ভাবেই যেন দেখেন, এইজন্য রবীন্দ্রচিত্রে যাহা দেখি তাহা ছাড়া অন্য কিছু দেখিতেছি বলিয়া ভাবিতে থাকি। [বলাকার ৪০ নং কবিতাটি পড়ুন।] কালিদাস যাহা দেখেন, মধুর অথচ ব্যাকুল বাসনার দৃষ্টিতে স্পষ্ট করিয়া দেখেন, তাঁহার বাসনার স্পর্শে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপজগৎ নবতর রূপে ওঠে উদ্ভাসিত হইয়া। শুধু তাহাই নহে—প্রকৃতির রূপের কোনোদিকটাই কালিদাসের দৃষ্টি

কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ

১. গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে কবির কাব্যসমূহের ধারাবাহিক আলোচনাকালে এই বিষয়টি উপযুক্ত তথ্য ও তত্ত্ব-ব্যাখ্যার দ্বারা বিশ্লেষিত হইয়াছে।

২. 'ব্রহ্ম' নামক অধ্যায়ে বৈদিক কবিদের কথালোচনা দেখুন।

এড়াইয়া যায় না—গ্রীষ্ম হইতে বসন্ত পর্যন্ত সমস্ত ঋতুলীলার পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপ-স্বাতন্ত্র্য তিনি ললিত কৌশলে কবিতাছন্দে ফুটাইয়া তুলেন। রবীন্দ্রনাথের বর্ণনপ্রকৃতি ঠিক তো এইরূপ নহে। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির দিকে দুই চোখ মেলিয়া যতটা চাহেন, মন মেলিয়া ততোধিক দৃশ্য দেখিয়া থাকেন। এই জন্য বস্তুবিচারে অনেক দৃশ্য তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া যায়,—যাহা চোখে ধরে, তাহা আসলে মনে ধরিয়াছে বলিয়াই চোখে ধরিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। মনের দ্বারা দৃষ্ট চিত্রগুলির বর্ণনা সর্বতোভাবে বস্তুনিষ্ঠ হয় না—স্বপ্নাশ্রয়ী ভাব-বিহ্বলতার সম্মোহনে আবিষ্ট হইয়া যায়।

কালিদাসের কবিতায় স্বপ্নাশ্রয়িতার আনন্দ যথেষ্ট পরিমাণে আছে, কিন্তু একটু ধীরভাবে অনুভব করিলেই বুঝা যায়, কালিদাসের স্বপ্নাশ্রয়িতার মূলেও আছে বস্তুঘন সৌন্দর্যবাসনার যৌবনাবেগ। রাবীন্দ্রিক স্বপ্নাশ্রয়িতার মূলে বস্তুর ইঙ্গিত বা ইশারা মাত্র আছে, এইজন্য রবীন্দ্রচিত্র চোখকে যতটা ভুলাইতে পারে, মনকে তাহা অপেক্ষা ঢের বেশী ভুলাইতে চাহে।

•

কথা উঠিতে পারে, কালিদাসের চিত্র কি মনকে ভুলায় না? অবশ্যই ভুলায়। কিন্তু কোন্ মনকে? রূপগত সৌন্দর্যে আবেগচঞ্চল ইন্দ্রিয়-মনকে, অরূপাশ্রয়ী আনন্দে নিত্য-সঞ্চরমাণ অতীন্দ্রিয়-মনকে নহে। কালিদাস পাঠকালে পৃথিবীকে যেভাবে ভালোবাসি, রবীন্দ্র পাঠকালে ঠিক সেইভাবে ভালোবাসি না। কালিদাস প্রভাবে পৃথিবীকে এমনভাবে ভালোবাসিয়া ফেলি যে, এখান হইতে এক পা আর অগ্রসর হইতে ইচ্ছা হয় না; মধুলুব্ধ ভ্রমরের আবেগে পৃথিবীর রূপবিলাসে তন্ময় হইয়া, বিভোর হইয়া বসিয়া থাকি। রবীন্দ্রপ্রভাবে পৃথিবীকে এমনভাবে ভালোবাসি যে, এই ভালোবাসার আতিশয্যেই পৃথিবী ছাড়িয়া অন্য কোনো স্বপ্ন-পৃথিবীর আনন্দবিশ্বে নীড় রচনায় হই তৎপর। কালিদাসের প্রকৃতিরূপে গ্রহণ করি স্বেচ্ছাবন্দিত্ব, রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিরূপে লাভ করি অজ্ঞাত মুক্তি। কালিদাস পাঠ করিবার পর যাঁহারা রবীন্দ্রনাথ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই বলিবেন: রূপ-পৃথিবীর যথার্থ কবি কালিদাসই, রবীন্দ্রনাথ নহেন। রবীন্দ্রনাথ রূপ হইতে অরূপ-পৃথিবীর মহাকবি; অরূপমহিমার জন্যই তাঁহার রূপের মূল্য। কিন্তু কালিদাসের রূপ রূপই; তাঁহার রূপমহিমা অন্তর্নিহিত কোনো অরূপের অপেক্ষা রাখে না। কালিদাস যখন প্রকৃতির রূপ বর্ণনায় বসেন, তখন পাঠককে কোনো কথা বলিতে বা কোনো কথা ভাবিতে দেন না; বর্ণনা শেষ হইলে রসস্নিগ্ধ যে ভাব পাঠক অনুভব করে, তাহা একমাত্র কালিদাসের বর্ণিত বিষয়ের রসোত্তীর্ণ আনন্দময়তা—তাহাতে পাঠকের নিজস্ব কল্পনার উদ্বৃত্ত সম্পদ থাকে না। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা এই জাতীয় নহে। রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিবেন, তারো বেশী বলাইয়া লইবেন, অন্ততঃ ভাবাইয়া লইবেন পাঠককে দিয়া। পাঠক যত সূক্ষ্ম রসিক, রবীন্দ্রনাথ তত উচ্চস্তরের কবি। যাহা দেখা যায় না, তাহাই দেখিতে

যে পাঠক পটু নহেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে খুব বেশী মুগ্ধ করিবেন বলিয়া মনে করি না। কিন্তু কালিদাস চোখে আঙুল দিয়াই যেন পাঠককে রূপপ্রকৃতির সৌন্দর্য দেখাইতে সুরু করিবেন। আবার বাসনার অমিত স্নিগ্ধতা ও অমিতব্যয়িতার ঔজ্জ্বল্য থাকায় কালিদাস সহজেই পাঠকচিত্তকে আকর্ষণ করিবেন। অনেক সময় আমার তো মনে হইয়াছে কালিদাসের প্রকৃতি ভোগবতী মদালসার মত মধুরা। অনন্ত যৌবনের ভোগোদ্দীপ্ত দৃষ্টি দিয়া তিনি রূপময়ী প্রকৃতির বিচিত্র অঙ্গশোভা নিরীক্ষণ করিয়াছেন। কামনার উত্তপ্ত স্বপ্নবিহ্বলতায় ভাষা তাঁহার অন্তহীন প্রাণোদ্দীপনায় চঞ্চল ও উদ্ভাসিত। বস্তুগত প্রকৃতির প্রত্যক্ষগোচর রূপশোভার বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা তাঁহার তরুণ বয়সের লেখা 'ঋতুসংহারে' র‍্যাফেলের চিত্রের মতই প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। কালিদাস প্রকৃতিতে অনন্ত যৌবনলীলার অজস্র চাপল্য লক্ষ্য করিয়াছেন, কিন্তু লীলার অন্তরে, রবীন্দ্রের ন্যায়, কোনোরূপ লীলাময়ের গোপন প্রতিভা লক্ষ্য করেন নাই। তাঁহার কাব্যে প্রকৃতির সহিত মানুষের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক প্রায়শঃই লক্ষিত হইয়াছে, এই কারণে প্রকৃতি তাঁহার কাছে প্রাণময়ী ও প্রেমময়ীই বটে। কিন্তু কালিদাসের প্রাণ ও প্রেম তত্ত্বাশ্রয়ী কোনো দর্শনাত্মার প্রকাশ নহে, ইন্দ্রিয়-গোচর জীব-বাসনার সৌন্দর্যলিপ্সু রসাবেগেরি তাহা অভিব্যক্তি। প্রকৃতির ও মানুষের কবি কালিদাস, কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি ও মানুষ বসন্তসুন্দরী এই পৃথিবীর সুখ, স্বপ্ন ও সৌন্দর্যের মধ্যেই আধৃত। রবীন্দ্রনাথও প্রকৃতি ও মানুষের কবি, কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি রূপপ্রকৃতির অতীত কোনো অরূপতত্ত্বে আশ্রিত বলিয়াই আদরণীয়া, তাঁহার মানব মানবা-তীত কোনো ভূমাবোধে আশ্রিত বলিয়াই বরণীয়। রবীন্দ্রবর্ণিত চিত্রে আপনি যাহা দেখিবেন, তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অন্যতর কোনো অদেখায় যাইতে না পারিলে আপনার অন্তর রসস্নাত আনন্দে উজ্জীবিত না হইতেই পারে; কালিদাসবর্ণিত চিত্রে যাহা দেখিবেন, তাহাতে যতই বিভোর হইবেন, তন্ময় হইবেন, ততই আপনার রসোদ্বেজনা জাগিবে। গ্রীষ্মের প্রখর তাপে আর্ত হইয়া 'সযৌবনাঃ উন্নতস্তনাঃ প্রমদাঃ' দুর্বহ পরিধেয় পরিহার করিয়া 'স্তনেষু তন্বংশুকং' অর্থাৎ সূক্ষ্ম বস্ত্র ন্যস্ত করিতেছে, কিংবা নিদ্রাগত প্রিয়তমকে প্রেমরতা কামিনী যেমন নানা কৌশলে জাগাইতে চেষ্টা করে, তেমনি রতিনিপুণা বিলা-সিনীরা চন্দনজলসিক্ত ব্যজনের মন্দানিলে, উন্নত স্তনে হারলতার শুভ্রোম্মুক্ত রূপসৌন্দর্যে, কলমধুর বীণাঝংকৃত মন্দমধুর প্রেমসঙ্গীতে, কুসুমেষু মদনকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিতেছে—এই সমস্ত চিত্রে সৌন্দর্য আছে, যৌবনের রসলিপ্সার অমিততীব্রতা আছে, সর্বোপরি আছে বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনার অননুকরণীয় সুখবোধ ও শিল্পরুচি। গ্রীষ্মের এইরূপ বর্ণনা রবীন্দ্রনাথে কোথাও পাওয়া যাইবে না। 'বৈশাখ' নামক কবিতায় নিদাঘের যে বৈরাগ্যমূর্তি অংকিত হইয়াছে, এই প্রসঙ্গে তাহা একবার স্মরণ করুন। বস্তুতে যাহা আছে, কালিদাস তাহাকেই সুষমামণ্ডিত করিয়া বর্ণনা করিবেন; বস্তুতে যাহার আভাস মাত্র, রবীন্দ্রনাথ তাহাকেই রসমূর্তি দান করিবেন। বর্ষার আগমনে 'নববারিদের'

গর্জন-শ্রবণে মদান্বিত বনহস্তিদল প্রতিদ্বন্দ্বিগজগর্জন মনে করিয়া কোথায় বিক্রুষ্ট ভাবে গর্জন করিতেছে, অথবা কোথায় বিমূঢ় ভ্রমর নবোৎপলে বসিতে গিয়া ভুলক্রমে নৃত্যরত ময়ূরের কলাপচক্রে গিয়া বসিতেছে—কালিদাস আনন্দছন্দে তাহা বর্ণনা করিবেন; রবীন্দ্রনাথ বর্ষার বর্ণনা করিতে করিতে অজ্ঞাতসারেই বস্তুরূপ হইতে ভাবরূপে করিবেন প্রবেশ, 'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে' বলিয়া আনন্দের এই নৃত্যছন্দকেই রূপ দিতে থাকিবেন, চোখ নয়, মনকে নাচাইবেন বিভোর পুলকে, বর্ষার 'মত্তমদির বাতাসে' 'শতেক যুগের গীতিকা' করিবেন শ্রবণ,—তাঁহার মনে হইবে বিশ্বযুগের বিশ্বকবিদল যুগ যুগ ধরিয়া যে গান গাহিয়াছেন ও গাহিতেছেন, তাঁহারি পুঞ্জীভূত স্বরছন্দ 'গীত মুখরিত বন বীথিকায়' নন্দিত, নর্তিত হইতেছে। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য ঋতুবর্ণনা সম্পর্কেও এই কথা সত্য বলিয়া আমি মনে করি। শরৎবিষয়ক গান ও কবিতাগুলির কথা মনে করুন। সেগুলি কি শরতের বর্ণনা? সেগুলি কি শরৎকালীন হৃদয়োচ্ছ্বাসের ভাবঘন আনন্দাবেশ নহে?

কেয়াপাতার নৌকো গড়ে সাজিয়ে দিব ফুলে—
তাল দীঘিতে ভাসিয়ে দেব, চলবে দুলে দুলে।
রাখালছেলের সঙ্গে ধেনু
চরাব আজ বাজিয়ে বেণু,
মাখব গায়ে ফুলের রেণু চাঁপার বনে লুটি',
আজ আমাদের ছুটি, ও ভাই, আজ আমাদের ছুটি।

ইহা কি শরতের বর্ণনা? শরতের কান্ত আনন্দগত শুভ্র অবসরের উচ্ছ্বাসই তো ইহার রূপ। এই যে রূপ, ইহা তো বস্তুগত ইন্দ্রিয় রূপ নহে, বস্তুর অতীতে স্বপ্নগত আনন্দরূপই তো ইহার ব্যঞ্জনা। অস্বীকার করি না যে, বস্তু হইতেই ইহার উন্মেষ, কিন্তু ইহার রসরূপ যেখানে স্থিতিলাভ করিতেছে, সেখানে বস্তু অবশ্যই নাই, আছে ভাবের অরূপত্ব।

কালিদাসের শরৎ কিন্তু ভিন্নজাতীয়। কালিদাস শরৎকে দেখিয়াছেন দুই চোখ ভরিয়া। 'রূপরম্যা' শরৎকে তিনি দেখিয়াছেন নববধূর ন্যায় নবসাজে সজ্জিতা। কাশকুসুম ইহার বসন, বিকচকমল ইহার আনন, মদমুখর কলহংস ইহার নূপুরনাদ, পক্ক শালিধান্য ইহার অঙ্গলতিকা।

কাশাংশুকা বিকচপদ্মমনোজ্ঞবক্ত্রা সোন্মাদ হংসরব নূপুরনাদরম্যা।
আপক্কশালিরুচিরা তনুগাত্রযষ্টিঃ প্রাপ্তা শরন্নববধূরিব রূপরম্যা॥

কালিদাসের এই শরৎকে দুই চোখ ভরিয়া যত দেখি ততই দেখিতে সাধ যায়। অসেচনিকা এই রূপরম্যা, ইহার অঙ্গলাবণ্যের সৌন্দর্যে দীপ্যমান যেন বিশ্বপ্রকৃতি। গাহিতেছেন কালিদাস:

কাশৈর্মহী শিশিরদীধিতিনা রজন্যো হংসৈর্জলানি সরিতাং কুমুদৈঃ সরাংসি।
সপ্তচ্ছদৈঃ কুসুমভারনতৈর্বনান্তাঃ শুক্লীকৃতান্যুপবনানি চ মালতীভিঃ॥

শরতে আজ শ্বেতাম্বরা যেন বিশ্বপৃথিবী। কাশকুসুমে আজ পৃথিবী শুভ্রা, রাত্রি শুভ্রা শিশিরকান্তিকিরণে, তটিনীর জল কলহংসে, সরোবর শ্বেত কুমুদে, বনভূমি কুসুমভারনত সপ্তপর্ণে, উপবনসমূহ মালতীকুসুমে শ্বেত হইয়া গেছে একেবারে।

কালিদাসের এই চিত্র স্পষ্টতার সৌন্দর্যে বাস্তবিকই অতুলনীয় এবং অনন্যসাধারণ। তাঁহার হেমন্ত, শীত বা বসন্ত চিত্রও এই স্পষ্টতা ও বস্তুনিষ্ঠতার গুণে অনিন্দ্যসুন্দর। রবীন্দ্রনাথের চিত্রে এহেন স্পষ্টতা আশা করি না, কেননা তাঁহার চিত্রের তাৎপর্যই সম্পূর্ণ বিভিন্ন। হেমন্তে কালিদাসের চোখে পড়িবে রতিনিপুণা বিলাসিনীরা তাহাদের বাহুযুগলে আর বলয় বা অঙ্গদ ধারণ করিতেছে না, কিংবা স্থাপন করিতেছে না 'নিতম্ববিম্বেষু নবং দুকূলম', কিন্তু রবীন্দ্রনাথ হেমন্তের স্তব্ধতায় শ্রবণ করিবেন অসীমকে ঘেরিয়া সীমাসমূহের নৃত্য-কলরোল।

লোকে লোকান্তরে
গ্রহে সূর্যে তারকায় নিত্যকাল ধরে
অণু পরমাণুদের নৃত্যকলরোল,
তোমার আসন ঘেরি অনন্ত কল্লোল॥

হেমন্ত বিষয়ক বর্ণনা হইতে পাঠকের পক্ষে এই দুই মহাকবির রচনারীতি ও ভাবগত পার্থক্য বিষয়ে স্পষ্ট একটি ধারণা করিয়া লওয়া অসম্ভব নহে। তবে একটি কথা এখানে আলোচনা করিবার আছে। 'ঋতুসংহার' কালিদাসের তরুণ বয়সের লেখা, এই কারণে ঋতুসংহার হইতে কালিদাসের কাব্যগত ভাবদর্শন চয়ন করিয়া লওয়া যুক্তিযুক্ত হইবে না বলিয়া অনেক পণ্ডিতই হয়তো নির্দেশ বা উপদেশ দিবেন। ঋতুসংহারে কামসৌন্দর্যের অমিতোচ্ছ্বাস লক্ষ্য করিয়া অনেক সুধী ব্যক্তি আবার ধারণা করেন যে, ইহা কালিদাসেরই রচনা নহে। এবিষয়ে আমি ডক্টর কীথের অভিমতই গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করিয়াছি। [*History of Sanskrit Literature*, Dr. Keith] ঋতুসংহারের রচনারীতি ও বর্ণনাবৈশিষ্ট্য কালিদাসের বলিয়াই আমার সুদৃঢ় ধারণা। কামনাসৌন্দর্যের যে ললিত-বিলাস ঋতুসংহারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, কালিদাসের পরবর্তী রচনাগুলিতে তাহাই যদি বিচিত্র ভাবে ও ভঙ্গীতে প্রকাশিত না হইত, তবে হয়তো ঋতুসংহারকে অন্য কোনো কবির রচনা বলিয়া মনে করার উপযুক্ত কারণ থাকিত। কালিদাসের পরিণত বয়সের রচনায় বৃহত্তর জীবনের নীতিসুন্দর অমর চিত্রাবলী যে পাই নাই তাহা নহে, যে 'রঘুবংশ'কে প্রাচীন পণ্ডিতগণ 'রঘুরপি কাব্যং তদপি চ পাঠ্যম্' বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছিলেন, সেই রঘুবংশকেই উচ্চতর জীবনের ও জীবনানুভাবের অসংখ্য চিত্রের আকর বলিয়া আমার মনে হইয়াছে। শকুন্তলা আসলে প্রেমের কাব্য হইলেও তপোবন-চিত্রের নাটকীয় রূপ ও

রও যাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারাই কালিদাসের সমাজজীবনের উচ্চতর ধ্যান সম্বন্ধে অথবা প্রকৃতি-জীবনের প্রাণময় প্রেমৌদার্য বিষয়ে অবশ্যই অবহিত হইয়াছেন। কালিদাস-কাব্যের এই দিকটি বিচার করিয়া বলিতে হয়, কালিদাস শুধু মর্ত্যের নহেন, তিনি স্বর্গেরও বটেন। কিন্তু একথা কি সত্য নহে যে, তাঁহার স্বর্গও মর্ত্যের ন্যায় মনোহর ও বাসনাময়? ঋতুসংহারে তিনি যে বাসনার আনন্দচিত্র অংকন করিয়াছেন, পুরূরবার প্রেমাতিশয্যে, অগ্নিমিত্রের প্রেমার্ততায় এবং দুষ্মন্তের প্রেমবাসনায় সেই আনন্দচিত্রই কি পূর্ণতর বর্ণ-সুষমায় শ্রীমণ্ডিত হইয়া প্রকাশ লাভ করে নাই? কুমারসম্ভবের হর মহাবল পিনাকীই বটেন, কিন্তু ভস্মীভূত মদনের পুনরুজ্জীবনে তিনি মানবের মতই কি প্রেমবিহ্বল নহেন? রঘুবংশের শেষ সর্গে কালিদাস অমিতাচারী ভোগতৃষ্ণার ভয়ংকরত্ব অংকিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু রাজা অগ্নিবর্ণের যৌবনোদ্দীপ্ত সম্ভোগলীলার বসন্তবিহ্বল যে প্রেমচিত্র তিনি অংকিত করিয়াছেন, তাহা কি তাঁহার প্রতিভার বৈশিষ্ট্য বহন করে না? বাসনার এই বসন্তবিহ্বলতাকে দার্শনিক নীতির দোহাই দিয়া পরিহার করি না, বরং বলি, কালিদাসের কবিপ্রতিভা এই প্রেমচাঞ্চল্য ও বসন্ত-বাসনার উপরই নির্ভর করে। নির্ভীক আনন্দে আমি এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছি যে, কালিদাসের প্রেম কবিহৃদয়ের কামনাগত মর্ত্যপ্রেম, দার্শনিকহৃদয়ের চেতনাগত স্বপ্নপ্রেম নহে। কামনা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অকাম কোনো প্রেমাস্বাদনের আনন্দানুভাব তপস্বিনী শকুন্তলাকে দেখিয়া মুহূর্তের জন্য দুষ্মন্ত-অন্তরে হয়তো উন্মেষিত হইয়াছিল, কিন্তু এই অকাম প্রেমাস্বাদন কালিদাসীয় কাব্য-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য নহে। মেঘদূতকাব্যে অলকাগতির যে চাপল্য বিচিত্র বর্ণসমারোহে প্রভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাও কামনালক্ষ্মীর রূপছায়ায় জ্যোতিসুন্দর। কালিদাসের অলকা কামনা পরিতৃপ্তির দিব্যধাম, সেখানে যাইতে কোনোদিনই পারিব না, কাম তাই পরিতৃপ্তি পাইবে না কোনোকালে, অনন্ত বিরহব্যাকুলতায় ক্রন্দন করিব নিত্যকাল, এই ভাবই তো মেঘদূতের ভাব। মেঘদূত বস্তুপ্রকৃতির বিচিত্র আলেখ্য, কাব্যহিসাবে বিশ্ব-সাহিত্যে ইহার তুলনা নাই, কিন্তু দার্শনিক বিচারে ইহার প্রকৃতির অন্তর্লীন গহীন প্রাণ যদি বিশ্লেষণ করিতে হয়, তবে নিশ্চয়ই ইহাকে রূপাতীত কোনো অরূপ-অলকার কাব্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিব না। রূপে রূপে, বর্ণে বর্ণে, রঙে রঙে বিচিত্র এই অলকা-প্রকৃতি—অজস্র স্বপ্ন বাসনার লাবণ্য ইহার অঙ্গে, প্রত্যঙ্গে। মেঘাভ্যন্তরে বিদ্যুতের মত অলকার অট্টালিকায় বাস করে যত 'ললিতবনিতাঃ'। সকলেরি করদেশে বিরাজ করে লীলাকমল, কেহ যদি কর নাড়ে, মনে হয়, লীলাকমলই বুঝি ওঠে দুলিয়া। কুসুমের সাজসজ্জা তাহাদের কতই না বিচিত্র—চুলে কুন্দকুসুম, আননে লোধ্রকুসুমের শুভ্র পরাগ, কবরীর দুই পাশে প্রস্ফুটিত কুরুবক, কানে শিরীষ ফুল, কপালোপরি সীঁথিমুখে ফুটন্ত কদম্ব। ষড়ঋতুর ষড়বিধ কুসুমে সুসজ্জিতা এই ললিতাবনিতা বাস করে স্বপ্নসুন্দর এই অলকায়:

হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ
চূড়াপাশে নবকুরুবকং চারু কর্ণে শিরীষং
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্।

অলকার এই স্বপ্নরূপ, বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের অরূপদর্শনের আনন্দরূপ নহে; রূপ হইতে রূপেরই ইহা অভিনব কল্পনা মাত্র। কালিদাসের মেঘদূত বস্তুরূপ হইতে উচ্ছ্বসিত অভিনব বস্তুরূপেরই স্বপ্নকাব্য। ইহার ছন্দে ছন্দে যৌবনবিলাস ও বিরহ, অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা ও কামনাসৌন্দর্যের উদ্বেলতা আছে প্রচ্ছন্ন হইয়া। যেমন:

নীবীবন্ধোচ্ছ্বসিতশিথিলং যত্র বিম্বাধরানাং
ক্ষৌমং রাগাদনিভৃতকরেষ্বাক্ষিপৎসু প্রিয়েষু
অর্চ্চিস্তুঙ্গানভিমুখমপি প্রাপ্য রত্নপ্রদীপান্
হ্রীমূঢ়ানাং ভবতি বিফলপ্রেরণা চূর্ণমুষ্টিঃ॥

নির্বাসিত যক্ষ অলকার দিতে তাকাইয়া বিগতদিনের সুখস্মৃতি হইতে নবতর বাসনা-সম্মোহের নূতন স্বপ্ন দেখিতেছে। রত্নপ্রদীপের সম্মুখে প্রণয়িনীর বসন লইয়া টানাটানির যৌবনচিত্র মানসনয়নে দেখিতে দেখিতে দিশাহারা হইতেছে যক্ষ। প্রদীপটি নিভাইবার জন্য লজ্জাবতী সুন্দরী ব্যর্থচেষ্টা করিতেছে, কিন্তু অলকার স্থিরজ্যোতি রত্নপ্রদীপ তো নিভিতেছে না, লজ্জারুণা ললিতার বিবসনা অঙ্গকান্তি তাই প্রেমার্ত যক্ষ দেখিয়া লইতেছে নয়ন ভরিয়া।

প্রকৃতির এই নগ্নকান্তির আনন্দচিত্র কালিদাসের তুলিতে যেমন ফুটে, তেমন অপর কোনো কবির তুলিতে নহে। সৌন্দর্যদর্শন ও প্রদর্শনের এই মনোভাব কালিদাসের 'বিক্রমোর্ব্বশী'তে পাইয়াছি, পাইয়াছি 'মালবিকাগ্নিমিত্রে', পাইয়াছি 'অভিজ্ঞানশকুন্তলে'। আমার তো ধারণা এই, বাসনাগত প্রেমের সৌন্দর্যবিহ্বলতার চিত্র অঙ্কনেই কালিদাসের অদ্বিতীয়ত্ব, তপস্যাগত প্রেমের মহিমা শকুন্তলা বা কুমারসম্ভবে যে লক্ষিত হইয়াছে, কেবলমাত্র তাহাই কালিদাসীয় প্রতিভাবিচারের মাপকাঠি নহে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কুমারসম্ভব ও শকুন্তলার প্রেমতত্ত্বের যে দর্শনব্যাখ্যা দিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই ত' সম্ভব, কিন্তু অনেক সময় আমার মনে সংশয় জাগিয়াছে, কালিদাসের প্রেমতত্ত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন, তাহা রবীন্দ্রনাথেরই মনগড়া কি না। তপস্বিনী শকুন্তলা

মহাভারতেরই একটি খণ্ডচিত্র। শকুন্তলা নাটকে এই তপস্বিনীকে না রাখিয়া উপায় নাই বলিয়াই কবি রাখিয়াছেন, প্রেমের সংযম ও তপস্যার কোনো উচ্চধর্ম ও দর্শনতত্ত্ব প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে কালিদাস তপস্বিনীর চিত্র আঁকিয়াছেন, এমন তো মনে হয় না। অনুরূপ প্রেমকাহিনী 'মালবিকাগ্নিমিত্রে' তপস্যার কোনো বালাই নাই, কিন্তু মিলন তো হইয়া গেল সসম্মানে ও আনন্দসমারোহে। রবীন্দ্রনাথ 'মালবিকার' নাম একাধিক খণ্ডকবিতায় উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার প্রেমদর্শন লইয়া কোনো অভিমত প্রকাশ তো করেন নাই। ইহার কারণ আর কিছু নহে, মালবিকার তপস্যাবিহীন উচ্ছ্বসিত প্রেম রবীন্দ্রচিত্তে ততটা প্রভাব বিস্তার করে না, যতটা করে শকুন্তলার তপঃসিদ্ধ করুণ প্রেম। আমার বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আপন প্রেমদর্শনের আলোকে শকুন্তলা পাঠ করিয়াছেন বলিয়া কালিদাসের মধ্যে প্রেম ও বৈরাগ্যের একটি সমন্বয় তত্ত্ব দেখিতে পাইয়াছেন। রবীন্দ্রদর্শনের আলোকে শকুন্তলার অপূর্ব ভাষ্য প্রকাশিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কালিদাসের শকুন্তলার মত রবীন্দ্রনাথের শকুন্তলাও একটি নূতন সৃষ্টি বলিতেও আপত্তি করিব না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া কালিদাসকে যদি তত্ত্বগত প্রেমদর্শনের তপস্বী কবি বলিয়া কখনও ধারণা হয়, তবে সে ধারণা অবশ্যই পরিহার করিব।

কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, কালিদাস বাসনাময় প্রেম ও নগ্নরূপের বর্ণনব্যাপারে নিত্য অসংযমী। কবির রাজ্যে কালিদাসের মত সংযমী কবি বোধহয় রবীন্দ্রনাথও নহেন। রবীন্দ্রনাথের রচনায় অতিকথনের দোষ একাধিক ক্ষেত্রে পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু কালিদাসে কুত্রাপি নাই। কালিদাসে রবীন্দ্রনাথের ন্যায় উচ্চতর প্রেমের দর্শন নাই, কিন্তু শিল্পবিচারে আশ্চর্য রসিকের অত্যাশ্চর্য সংযম আছে। বলা বাহুল্য, শিল্পস্ফূর্তির জন্য যে সংযমের প্রয়োজন, সেই সংযমের কথাই বলিতেছি। কালিদাসের সাহিত্য হইতে দুই একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিলেই কথাটি স্পষ্ট হইবে।

শকুন্তলা নাটকের তৃতীয় অঙ্কের শেষাংশ তুলিতেছি।

দুষ্মন্ত নির্জন তপোবন-কুঞ্জে শকুন্তলার সহিত মিলিত হইয়াছেন। সন্ধ্যা হয়-হয়। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা "পুহবীএ জো সরণং সো তুহ সমীবে বট্টই" বলিয়া কৌশল করিয়া পলাইয়াছে। প্রেমের সৌরভময় নিস্তব্ধ ও নির্জন পরিবেশটি বড়ই মনোরম বলিয়া মনে হইতেছে। এমন সময় দুষ্মন্ত শকুন্তলার চিবুক ধরিয়া মুখ উত্তোলন করিবার চেষ্টা করিলেন। শকুন্তলা যখন ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেছেন, তখন নেপথ্য হইতে হঠাৎ ইঙ্গিতধ্বনি শোনা গেল :

চক্কবাকবহুএ আমন্তেহি সহঅরং। উবট্টিদা রঅণী। ('চক্রবাক বধূ, সহচরের নিকট হইতে বিদায় লও এইবার। রজনী যে আসিল।')

ইঙ্গিতধ্বনির অর্থ বুঝিলেন শকুন্তলা। আর্যা গৌতমী আসিতেছেন, তিনি বুঝিলেন। দুষ্মন্তকে সসম্ভ্রমে তাই কহিলেন :

পোরব অসংসঅং মম সরীরবুত্তন্তোবলম্ভস্‌স অজ্জা গোতমী ইদো এব্ব আঅচ্ছদি। দাব বিডবান্তরিদো হোহি। ('পৌরবরাজ, আমার শারীরিক কুশল সংবাদ লইবার জন্য আর্যা গৌতমী নিশ্চয়ই আসিতেছেন। শাখান্তরালে এই বেলা আপনি লুকাইয়া পড়ুন।')

—তথা, বলিয়া দুষ্মন্ত শাখান্তরালে লুকাইতে গেলেন। অতৃপ্ত যৌবন-বাসনা অন্তরেই রহিয়া গেল। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই, দুষ্মন্তের এই অতৃপ্তি কাব্যকে আরো সুন্দর করিয়াই তুলিল। ভোগের সার্থকতার চিত্র এই স্থলে শুধু ভারতীয় ধর্ম-সংস্কারেই যে বাধে, তাহা বলিব না, কাব্যসৌন্দর্যের ললিত শিল্পধর্মেও বাধে। কাব্যের এই যে সংযম, ধর্মের জন্য শুধু নহে, কাব্যের জন্যও ইহার প্রয়োজন। রসোচ্ছ্বাসের অমিত আনন্দলীলার তাগিদেই ইহার অভিব্যক্তি। ভোগের দ্বারা কাম নিঃশেষিত হইল না—বরং অতৃপ্তির সৌন্দর্যে লুব্ধ করিয়া তাহাকে জীয়াইয়া রাখা হইল। কামকে চাখিয়া চাখিয়া ধীরতার সহিত একটু একটু করিয়া ভোগ করার নাম শিল্পের সংযম। কথাশিল্পের রসোত্তীর্ণতা এইরূপ সংযমের উপর বিশেষ করিয়াই নির্ভর করে।

মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের অনুরূপ একটি ঘটনার কথা তুলিতেছি। চতুর্থ অঙ্কের শেষাংশ দেখুন।

রাজরাণী ধারিণীকে ভাঁড়াইয়া রাজা অগ্নিমিত্র বিদূষককে সঙ্গে লইয়া গোপনে কুমারী মালবিকার কক্ষে আসিয়াছেন। মালবিকার সঙ্গে ছিল বকুলবালিকা। চতুর বিদূষক কৌশলে তাহাকে দিল সরাইয়া, নিজেও বাহিরে আসিয়া স্ফটিক শিলাস্তম্ভে ঠেস দিয়া হইল নিদ্রাগত। রাজার সম্মুখে একাকিনী মালবিকা ভয়ে ভয়ে রহিল দাঁড়াইয়া। প্রণয়ের নির্জন পরিবেশটি লক্ষ্য করিয়া অগ্নিমিত্র হইলেন কামনাবিহ্বল। প্রেমভাষণ সুরু করিলেন অবারিত আনন্দে।

কিন্তু না। প্রণয়ের পথে বিঘ্ন অনেক। কালিদাসের রীতিই এই—প্রেমের উন্মুক্ত অবসর সৃষ্টি করিয়াই সম্মুখে আনিয়া দিবেন পর্বতপ্রমাণ বাধা। দেখা গেল, রাজা অগ্নিমিত্র যখন প্রেমবচনে মালবিকাকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তখনই বহির্দেশে রাজার পাটরাণী, নাম ইরাবতী, আসিয়া পড়িলেন অতর্কিতভাবে।

বিদূষকের উপর ইরাবতীর ভীষণ ক্রোধ। নিদ্রিত বিদূষককে ভয় দেখাইবার জন্য ইরাবতীর নির্দেশে নিপুণিকা একখানা বাঁকা লাঠি তাহার দিকে দিল ছুঁড়িয়া। বিদূষক জাগিয়া উঠিলেন। চিৎকার করিলেন আতঙ্কে :

—অবিহা অবিহা। দব্বীকরো মে উবরি পরিপড়িদো (গেলাম রে, গেলাম। সর্প পড়িয়াছে আমার উপর।)

—ন ভেতব্যং ন ভেতব্যম্।

বলিয়া রাজা অগ্নিমিত্র প্রিয়বয়স্তকে রক্ষা করিবার জন্য আসিলেন ছুটিয়া। দেখা গেল রাজার পশ্চাতে মালবিকাও আসিতেছেন। কহিতেছেন :

—ভট্টা! মা দাব সহসা নিক্কমিহ্ সপ্পোত্তি ভণাদি। ('প্রিয়তম, হঠাৎ বাহিরে যাইবেন না। সর্পের কথা বলিতেছি।')

প্রণয়ের কুঞ্জমধ্যে ইরাবতীর আকস্মিক অবতারণার শিল্পগত কারণটি বিবেচনা করিয়া দেখুন। ভোগতৃষ্ণার গতি-তরঙ্গে বাধা আনিয়া একদিকে যেমন ভোগলিপ্সাকে উদগ্র করিয়া তোলা হইল, অপরদিকে তেমনি প্রেমিক-প্রেমিকার অনুরাগের প্রগাঢ়তাও অল্প কথায় স্পষ্ট করার সুযোগ লওয়া গেল। মালবিকার 'মা দাব সহসা নিক্কমিহ্' এই উক্তি রাজার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় প্রণয়ই সূচিত করিতেছে। বিদূষকের 'অবিহা অবিহা' বলিয়া চিৎকার—শকুন্তলার 'চক্কবাকবহুএ' ইত্যাদি উক্তির মতই ইঙ্গিতধ্বনি। ইরাবতীর আগমন-বার্তা জানাইয়া রাজাকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য বিদূষক চিৎকার করিয়াছিল কি না জানি না, কিন্তু কবি কালিদাসের শিল্পসংযমের ইহা যে ইঙ্গিতধ্বনি, তাহা স্পষ্ট করিয়াই বলা যায়।

উদাহরণ আর বাড়াইব না। 'কুমারসম্ভব' হইতে আর একটি উদাহরণ দিয়াই প্রসঙ্গান্তরে যাইবার প্রস্তাব করিতেছি। কুমারসম্ভবের অষ্টমসর্গে চিত্রিত হরপার্বতীর রতিবিলাস-চিত্র স্মরণ করুন।

হরপার্বতীর বিবাহ হইয়া গেছে। নবোঢ়া উমার মনোহর রূপ দেখিয়া হরের অন্তরে নব নব ভাব জাগিতেছে।

ব্যাহৃতা প্রতিবচো ন সন্দধে গন্তুমৈচ্ছদবলম্বিতাংশুকা
সেবতে স্ম শয়নং পরাঙ্মুখী সা তথাপি রতয়ে পিনাকিনঃ।

হর কথা কহিতে যান, উত্তর দেন না পার্বতী। আঁচল ধরিয়া টানেন, পার্বতী ছাড়াইয়া পলাইতে চান, শয্যার একপাশে পার্বতী দূরে সরিয়া থাকেন, তবু কী বিচিত্র, পিনাকী তাঁহাতেই রত হইতে থাকেন অহরহঃ।

আবার অন্যত্র :

যন্মুখগ্রহণমক্ষতাধরং দানমব্রণপদং নখস্য যৎ
যদ্রতং চ সদয়ং প্রিয়স্য তৎ পার্বতী বিসহতে স্ম নেতরং।

আল্‌তো আবেগে দুটি একটি সোহাগচুম্বন কিংবা প্রেমাবেগের সহনীয় কিছু অত্যাচার হর যখন সদয়ভাবে করিতেন, পার্বতী তো বাধা দিতেন না, প্রচণ্ড রকমের কিছুর বিরুদ্ধেই ছিল তাঁহার প্রতিকূলতা।

ইহার পর কালিদাস রতিবিলাসের পূর্ণচিত্রই অবশ্য অংকন করিয়াছেন। কিন্তু

লক্ষণীয় বিষয় এই, যতটুকু বলিলে ভোগের আনন্দ সুন্দর ও উপভোগ্য হইয়া প্রকাশ পায়, ততটুকুই তিনি বলিতে জানেন, তাহা ছাড়া একটি শব্দও তিনি উচ্চারণ করেন না। ইহাকেই আমি শিল্পের সংযম নামে অভিহিত করিয়াছি। যৌবনচাপল্যের অজস্র চিত্র কালিদাস অংকন করিয়াছেন, প্রকৃতির রূপে দেখিয়াছেন রমণীয় রমণীরূপের আনন্দ-ইন্দ্রজাল,—কথায় কথায়, ছন্দে ছন্দে, নানারঙ্গে প্রকাশ করিয়াছেন উদগ্র বাসনাচাঞ্চল্যের মোহময় স্বপ্নাতিশয্য, তথাপি শিল্পের বিচারে কোথাও তাঁহাকে অসংযমী ভাবিতে পারি নাই মুহূর্তের জন্য। এইখানেই কালিদাসের কালিদাসত্ব। এই যে কালিদাসত্ব, ইহাই গভীর ও গম্ভীর মহিমায় প্রকাশিত হইয়াছে তাঁহার বিচিত্র প্রকৃতির রূপচিত্রে। 'অনন্তরত্ন-প্রভব' উত্তুঙ্গ হিমাচলের রূপচিত্র, 'তরঙ্গাধরদানদক্ষ' বিশাল সিন্ধুর মহিমময় আলেখ্য, 'নবকুসুমযৌবনা' বনজ্যোৎস্নার আবাসভূমি, তপোবনের শ্যামসৌন্দর্য, 'জ্যোতিচ্ছায়া কুসুমরচিত' অপরূপ অলকার স্বপ্নশোভা—কালিদাসের তুলিকায় অভিনব শ্রী ও সৌন্দর্যে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। ইন্দ্রিয়গোচর প্রত্যক্ষ প্রকৃতিকে কত রঙে ও কত রূপে স্বপ্নময় করিতে পারা যায়, ভারতীয় কাব্যে কালিদাসই তাহা পূর্ণভাবে দেখাইয়াছেন। এইস্থলে শাস্ত্রীমহাশয়ের একটি কথা মনে পড়িয়া গেল: 'বাইরণ জাঁক করিয়া বলিয়াছেন, Description is my forte, কিন্তু বাহ্যজগদ্বর্ণনায় কালিদাস অদ্বিতীয়। সেক্ষপীয়র বাহ্য জগদ্বর্ণনায় হাত দেন নাই, তিনি বাহ্যজগৎ বড় গ্রাহ্যও করিতেন না। মনুষ্য হৃদয়ের উপর তাঁহার আধিপত্য সর্বতোমুখী। তাঁহার যেমন অন্তর্জগতের উপর, কালিদাসের তেমনি বাহ্যজগতের উপর সর্বতোমুখী প্রভুতা।...স্বভাববর্ণনায় তাঁহার সমান্তরাল কেহ নাই। বাহ্য জগদ্‌বর্ণনায় তিনি যে শুদ্ধ সৌন্দর্যমাত্র বর্ণনা করিয়াছেন, এমন নহে। হিমালয়-বর্ণনস্থলে যাহাই করুন, তাঁহার অনেক বর্ণনা এত গভীর যে, ভাবিতে গেলে হৃদয় কম্পিত হয়। কিন্তু তাঁহার স্বভাববর্ণনাই আমরা বড় ভালোবাসি এবং তাহাই অধিক।' [কালিদাস ও সেক্ষপীয়র, হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী, পৃ ২৬৫-৬৬]। বস্তুতঃ কালিদাসের স্বভাব-সৌন্দর্যবর্ণনায় যৌবনের বাসনাবিলাসের হৃদয়োন্মাদকর যে মধুময় স্বপ্ন দেখি, তাহা আর কোনো কবির মধ্যেই দেখি না। কালিদাস সুন্দরের কবি—কিন্তু প্রত্যক্ষ সুন্দরের। অলক্ষ্য সুন্দরের বাণী কালিদাসে যে নাই তাহা বলি না, তবে তাহা কালিদাসের বৈশিষ্ট্য নহে। কালিদাসের অদ্বিতীয়ত্ব বাহ্যজগদ্‌বর্ণনায়, যৌবনবাসনার চিত্র চিত্রণে। কালিদাসের প্রকৃতিচিত্র দেখিয়া অনেক সময় আমার মনে হইয়াছে—কালিদাস বুঝি কামনা, চাঞ্চল্য ও যৌবনবাসনারও মহান্ কবি। তাঁহার প্রকৃতি কামনাময়ী স্বপ্নসোহাগিনী। পুঁথিগত পাণ্ডিত্যের মোহ ও সংস্কার ত্যাগ করিয়া সহজদৃষ্টিতে তাঁহার প্রকৃতিচিত্র অবলোকন করিলে—কি ভিতরে, কি বাহিরে মোহময় যৌবনবাসনার রূপরম্য অমিতোচ্ছ্বাসই দেখিতে পাইবেন। রবীন্দ্রপ্রকৃতি, বলা বাহুল্য, এইরূপ নহে। তাঁহার প্রকৃতির বহির্দৃশ্যে বাসনার রূপ, কিন্তু অন্তর্দৃশ্যে ভিন্নতর ভাবলীলার আনন্দমহিমা।

তনুর অতীত তনু,
পরশ-এড়ানো সে যেন ইন্দ্রধনু
নানা রশ্মিতে রাঙা;…
ধ্যানপ্রতিমারে স্বপ্নরেখায় আঁকে,
অপরূপ অবগুণ্ঠনে তাকে ঢাকে,
অজানা করিয়া তোলে। [প্রত্যর্পণ, বীথিকা]

এই অপরূপ অবগুণ্ঠনে ঢাকা তনুর অতীত তনুর মহিমা ভবভূতির রচনায় খানিক পরিমাণে মেলে, ভবভূতির প্রকৃতি-রূপে আছে অতীত স্মৃতির মৃত্যুহীন অরূপকান্তি। যাহা একদিন পাইয়াছিলাম, আজ হারাইয়াছি, তাহারি রূপদিব্যতার গীতচ্ছবি ভবভূতির উত্তররামচরিতের 'ছায়া' নামক তৃতীয়াংকে অকৃত্রিম কাব্যময়তায় হইয়াছে প্রকাশিত। ভবভূতির প্রকৃতি কালিদাসের প্রকৃতির মত প্রীতিময়ী তো বটেই, উপরন্তু স্মৃতিময়ীর স্বপ্ন-সৌন্দর্যও আছে তাহার অঙ্গ-লাবণ্যে। রূপ হইতে অরূপে গতায়াতের বহু গুঞ্জন শুনিয়াছি উত্তরচরিতের শ্লোকাবলিতে; বিশেষ করিয়া প্রেমের ব্যাপারে অতীন্দ্রিয় একটি ভাবাবেশের প্রভাব তাহাতে বিশেষভাবেই লক্ষ্য করিয়াছি।

দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়া রামভদ্র প্রকৃতির রূপ তো দেখিলেন না, দেখিলেন অতীত স্মৃতিবিমণ্ডিত রূপাতীত ভাবরূপ।

যত্র দ্রুমা অপি মৃগা অপি বন্ধবো মে
যানি প্রিয়াসহচরশ্চিরমধ্যবাত্তম্।
এতানি তানি বহুনির্ঝরকন্দরাণি
গোদাবরীপরিসরস্য গিরেস্তটানি॥

কি তরু, কি মৃগ, যেথা সকলেই বান্ধব আমার,
সেই স্থানে প্রিয়াসনে কতদিন করেছি বিহার।
এই সেই পরিচিত পুরাতন চারু গিরিতট,
নির্ঝর কন্দরে পূর্ণ গোদাবরী নদীসন্নিকট॥
[জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কৃত অনুবাদ]

তরু দেখিয়া বা মৃগ দেখিয়া, গিরিতট দেখিয়া অথবা গোদাবরীর রূপ দেখিয়া ভাবাবেগে সমাধিস্থ হওয়া তো সামান্য প্রেমের লক্ষণ নহে। রামভদ্র কিন্তু অরণ্যলোকের এই সমস্ত পরিচিত দৃশ্য দেখিতে দেখিতে 'হা দেবি দণ্ডকারণ্যবাসপ্রিয়সখি' বলিয়া সমাধিস্থ হইয়া গেলেন। নিকটেই ছিলেন সীতা অদৃশ্যরূপে। তিনি ব্যাকুলা হইলেন রামের এই শোকমূর্তি দর্শনে। তমসাকে

কবি ভবভূতির বৈশিষ্ট্য

ডাকিয়া কহিলেন আর্তকণ্ঠে: ভঅবদি তমসে, পরিত্তাআহি, জীবাবেদি অজ্জউত্তং। (ভগবতি তমসে, রক্ষা করো ; জীবন দান করো আর্যপুত্রের।)

তমসা, মনে রাখিতে হইবে, একটি নদী মাত্র। ভবভূতিতে নূতন দেখিতেছি এই, প্রকৃতি মানুষের মত রূপ ধরিয়া মানুষের পরিচর্যা করিতেছে, মানুষের সহিত মানুষের মতই কথা কহিতেছে, শোক-দুঃখ, আশা-আনন্দ ও সান্ত্বনা প্রকাশ করিতেছে। ভবভূতি, মনে হয়, কালিদাস হইতেও 'রোমান্টিক'। কালিদাস "সন্নিহিতস্তপোবনতরু"পুঞ্জের সহিত কথা কহিয়াছেন, পত্রপুষ্পপল্লব, পশুপক্ষী ও সাগরসরিতের সহিত ব্যবহার করিয়াছেন সহধর্মী আত্মীয়জনের মত, 'সন্তপ্তানাং শরণং' যে পয়োদ মেঘ, তাহার নিকট বিলাপলিপি করিয়াছেন প্রেরণ, কিন্তু কথা কহান নাই কোনো মেঘকে, কোন তরুকে বা কোনো বিহঙ্গকে। কালিদাসের প্রকৃতি প্রাণময় চিত্র হিসাবে দ্রষ্টার সম্মুখে হয় সমুদ্ভাসিত, কিন্তু ভবভূতিতে দেখিতেছি, শুধু চিত্র নয়, প্রেমচরিত্রের জীবন্ত মানবিক মূর্তি। সীতার সখীদল তমসা, মুরলা, গোদাবরী—ইহাদের নদীত্ব যেন পরিচয়ই নহে, সীতার সখীত্বই ইহাদের প্রকৃষ্ট পরিচয়।

সীতা কহিলেন: ভঅবদি তমসে, জীবাবেদি অজ্জউত্তং। তমসা উত্তর করিতেছেন:

> ত্বমেব ননু কল্যাণি সংজীবয় জগৎপতিম্।
> প্রিয়স্পর্শো হি পাণিস্তে তত্রৈব নিয়তো ভরঃ॥

> তুমিই বাঁচাও ভদ্রে রামেরে এখন।
> প্রিয়স্পর্শ তব করই ধ্রুব সঞ্জীবন॥

অদৃশ্যরূপিণী সীতা প্রিয়তমাকে স্পর্শ করিলেন, সহর্ষে দেখিলেন রামভদ্রের চেতনা ফিরিয়া আসিল। বিস্মিত রামভদ্র ইতস্ততঃ চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। সীতা নাই, অথচ সীতার প্রেমস্পর্শ অনুভূত হইতেছে, দিশি দিশি অতীতদিনের প্রেমের স্মৃতিময় দুঃসহ সৌন্দর্য বিকীরিত হইতেছে। 'কিমেতৎ' ?

> স্পর্শঃ পুরা পরিচিতো নিয়তং স এষ
> সংজীবনশ্চ মনসঃ পরিমোহনশ্চ।
> সংতাপজাং সপদি যঃ প্রতিহৃত্য মূর্ছা
> মানন্দনেন জড়তাং পুনরাতনোতি।

> এ যে চিরপরিচিত পরশ তাহার
> সঞ্জীবন সম্মোহন উভয়ি আমার।
> সন্তাপের মূর্ছা ভাঙ্গি' ও করপরশে
> বিহ্বল করে যে মোরে আবার হরষে॥

প্রেমের অরূপ রূপটি অদৃশ্যরূপিণী সীতার মধ্য দিয়া কবি ভবভূতি অভিনব কৌশলে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। প্রিয়াকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, কিন্তু প্রিয়া তো আছেন নিকটেই। চিত্তের আবেগে, আনন্দে, স্বপ্নের সুখবিলাসে, অঙ্গের যৌবনশিহরণে, প্রকৃতির বিভিন্ন রূপবৈচিত্র্যে অনুভব তো করা যাইতেছে। রূপের মধ্য দিয়া অরূপদর্শনের এই যে মানসলীলা, ভবভূতি কাব্যের ও প্রকৃতির ইহাই প্রাণবস্তু। ভবভূতি যেন বলিবেন: অরূপই মানুষের চরিত্রসত্তা, তাহার আত্মার আত্মীয়। বিশ্ববিধ রূপের যবনিকা পতনে মেঘাবৃত চন্দ্রমার মত অরূপ থাকে আচ্ছন্ন হইয়া; দৃষ্টি যখন প্রখর হয়, তখন রূপের যবনিকা ভেদ করিয়া অরূপের লীলাদর্শন হয় সম্ভব। তখন 'চিনি চিনি' বলিয়া চিত্ত ছুটে অনন্ত রহস্যাবেগে, স্বপ্ন দেখে অজস্র।

এই যে রূপ হইতে অরূপের স্মৃতি—উত্তরচরিতের দণ্ডকারণ্য ও গোদাবরী বর্ণনায় তাহা স্পষ্টভাবে বিভাসিত হইয়াছে। অরণ্যের ময়ূর দর্শনে রামভদ্র সীতাকে স্মরণ করিতেছেন, কদম্ববৃক্ষটিকে দেখিয়া সীতাকে তাঁহার বড় ব্যাকুল ভাবেই মনে পড়িতেছে,—কদলীর বন দেখিয়া, তত্রস্থ মৃগশিশুদের দেখিয়া এবং সর্বোপরি রামসীতার বিশ্রামস্থল সেই শিলাতলটি দেখিয়া রামচন্দ্র স্থির আর থাকিতে পারিতেছেন না। বৈষ্ণবকবিদের বিরহিণী রাধা যেমন সর্বত্র শ্যামময় জগৎ দেখিয়াছেন, ভবভূতির রামভদ্র প্রেমাবেগে তেমনি বনভূমিকে সীতাময়ী দেখিয়া শোকার্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন।

বনরূপে সীতারূপ দেখিয়া কাব্যময় সৌন্দর্যের এই বিস্তার রূপ হইতে অরূপের কাব্যতত্ত্বই প্রকাশ করে। তবে বলিয়া রাখা ভালো, রাবীন্দ্রিক অরূপতত্ত্বের সহিত ইহার আকাশ-পাতাল ভেদ আছে। ভবভূতি বস্তুর চিত্রে বস্তুর স্মৃতিই অনুভব করিয়াছেন। আজ যাহা অরূপ, কাল তাহা বস্তুজগতেই ছিল রূপময় প্রত্যক্ষ শোভায় সুন্দর। বিগত বস্তুর মধুময় ও আবেগময় স্মৃতির নামই ভবভূতির অরূপকান্তি। এই দিক দিয়া বিচার করিলে মেঘদূতের কবি কালিদাসের সহিত কিছুটা পরিমাণে তাঁহার সাদৃশ্য আছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সহিত মোটেই নাই। রবীন্দ্রনাথের অরূপ অতীতকালের কোনো রূপমহিমার আবেগময় স্মৃতিমাত্রই নহে, অর্থাৎ ইহজীবনের বস্তু-অতীতেই তাহার স্থিতি নহে, জীবনে জীবনে, আরো জীবনে, গহীনতম অন্ধকারাচ্ছন্ন পুঞ্জীভূত বহু বিশ্বজীবনে তাহার লীলা, অনাদ্যন্তকাল হইতে তাহারই অব্যাহত সুরধ্বনি রোমাঞ্চিত, উদ্বেজিত, শিহরিত হইতেছে ইহলোকগত এই বস্তুজীবনে।

> অনাদিবীণায় বাজে যে রাগিণী গভীরে গম্ভীরে
> সৃষ্টিতে প্রস্ফুটি উঠে পুষ্পে পুষ্পে, তারায় তারায়,
> উত্তুঙ্গ পর্বত-শৃঙ্গে, নির্ঝরের দুর্দম ধারায়,
> জন্ম-মরণের দোলে ছন্দ দেয় হাসি-ক্রন্দনের,
> সে অনাদি সুর নামে তব সুরে, দেহবন্ধনের

পাশ দেয় মুক্ত করি ; বাধাহীন চৈতন্য এ মম
নিঃশব্দে প্রবেশ করে নিখিলের সে অন্তরতম
প্রাণের রহস্যলোকে। [শীতচ্ছবি, বীথিকা]

রবীন্দ্রপ্রকৃতির এই 'অন্তরতম প্রাণের রহস্যলোকে' নিঃশব্দে যতই প্রবেশ করিতে চাহিয়াছি, ততই বিশ্বের অন্যান্য কবি হইতে তাঁহার পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য আমার চোখে পড়িয়াছে। তুলনামূলক সমালোচনার দ্বারা এই বৈশিষ্ট্যকে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা অপেক্ষাকৃত সহজ মনে করিয়া দুই-চারিজন বিখ্যাত কবির কাব্য লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছি মাত্র। পাঠকগণ নিশ্চয়ই বুঝিতেছেন যে, রবীন্দ্রনাথের ভাবগত স্বাতন্ত্র্যটুকু বুঝিবার উদ্দেশ্যেই অন্যান্য কবির কথা আলোচিত হইতেছে। একজন বিরাট কবির সহিত অপর একজন বিরাট কবির দর্শনগত সূক্ষ্ম স্বাতন্ত্র্য কোথায় তাহা বিচার করা মোটেই সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। তুলনামূলক সমালোচনার ব্যাপারে পক্ষপাতিত্বের অন্ধতা সমালোচকের বুদ্ধিবিচারকে অনেকক্ষেত্রেই আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। তবে বর্তমান প্রবন্ধলেখকের এইটুকু মাত্র সুবিধা যে, যথার্থভাবে কবিবর্গের কাব্য বিচার তিনি করিতেছেন না, কাব্য হইতে কবির মনোভাবের আভাসটুকু লইয়া তাহারি সাহায্যে তাঁহাদের মনোদর্শনের স্বরূপটুকু নির্ধারণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত রুচি বা ভালোলাগা-মন্দলাগার প্রভাব খুব বেশি প্রাধান্য নাও পাইতে পারে। বস্তুতঃ একেবারেই যাহাতে না পায় তাহার চেষ্টা লেখক করিতেছেন এবং করিবেন। প্রবন্ধ লেখকের বিশ্বাস এই যে, যে মনের চেতনা বাহিয়া অমর কাব্যরাজি সূর্য হইতে সপ্তরশ্মির মত প্রভাসিত হয়, সেই মনের সাধন-স্বরূপ, তাহার প্রতিভা ও প্রেমবৈশিষ্ট্যের নির্দেশ লইতে পারিলে কাব্যপাঠের ফলশ্রুতি অধিকতর মূল্য ও মর্যাদা লাভ করে, উপরন্তু ইহার দ্বারা বোধ বিস্তৃত হওয়ার সুযোগ থাকায় কবি হইতে কবির সূক্ষ্ম স্বাতন্ত্র্যটুকুর সৌন্দর্যও স্বচ্ছ মানসদর্শনের দর্পণালোকে সহজেই ধরা পড়ে। কাব্যালোচনায় মনোদর্শনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সুধীসমাজকে আজ তাই ধীরভাবে চিন্তা করিতে হইবে। কবিমনের স্বরূপ, উচ্চতা, অধিগতি ও সাধনধর্ম সম্পর্কে আলোচনা যদি ব্যাপকতরভাবে হইতে থাকে, তবে কাব্যালোচনার আর একটি নূতন রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যাইবে। রবীন্দ্রনাথের মনোদর্শন লইয়া গভীরভাবে আমরা আলোচনা করি নাই বলিয়া তাঁহার মন, ব্রহ্ম বা প্রকৃতির স্বরূপ সম্পর্কে এখনও আমরা স্পষ্ট ধারণা করিয়া লই নাই। ফলে এই সকল বিষয় লইয়া তিনি যখন কাব্য রচনা করিয়াছেন, সাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি অনুসারে সাধারণ রীতিতেই ভাসা-ভাসাভাবে তাহা বুঝিয়াছি, রুচি ও বোধানুসারে নানা মত নানাজনে নানাভাবে ব্যক্ত করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে আমরা সকলেই মুগ্ধ, রবীন্দ্রনাথ যে একজন বিরাট কবি সে বিষয়ে আমাদের কাহারো কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু বিশ্বের অন্যান্য

বিরাটবর্গের প্রতিভা হইতে তাঁহার প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য কোথায়, তাহা সূক্ষ্মভাবে এবং সঠিকভাবে জানিতে না পারিলে তাঁহার বিরাটত্বের বিশেষত্ব আস্বাদন সহজ হয় বলিয়া তো মনে করি না। দর্শনজগতের যে মধ্যবর্তী রহস্যলোক অধিকার করিয়া স্বর্গ ও মর্ত্যের সেতুরূপে তিনি দাঁড়াইয়া আছেন, অভিনব সেই 'রহস্যলোকের' সন্ধান করিবার উদ্দেশ্যেই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের অবতারণা। জীবনাচলের উত্তুঙ্গশিখরে সূর্যের মত বিরাজমান রহিয়া তাঁহার দর্শনের প্রেমসূর্য কাব্য বসুন্ধরার বিশ্বদেশে বিকীরণ করিয়াছে বিচিত্র অনুভূতির রাগরশ্মি। বিচিত্র রশ্মির অদ্বিতীয় নায়ক ঐ প্রেমের স্বরূপটি জানা থাকিলে রশ্মি-প্রকৃতির স্বরূপও জানা সহজ হইয়া যায়। পাঠকগণ অবশ্যই অনুভব করিতেছেন, রবীন্দ্রপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে বসিয়া তুলনা প্রসঙ্গে একাধিক অমর কবির প্রেমস্বরূপ, তথা প্রকৃতিস্বরূপ ব্যাখ্যা করার গুরুদায়িত্ব কেন স্কন্ধে লইয়াছি বা লইতেছি। এই ব্যাখ্যার দ্বারা রবীন্দ্রপ্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য বুঝা যদি সহজ না হইতে থাকে, তবে অবশ্য ইহার মান বা মূল্য কিছুই নাই।

সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে আরো অনেক মহান্ কবি আছেন, যাঁহারা কাব্যপ্রতিভার উত্তুঙ্গ শিখরদেশে উন্নীত হইয়া অমরত্বের জ্যোতির্লোকে আছেন দীপ্যমান। তাঁহাদের কাব্যালোচনার প্রলোভন ত্যাগ করা কাব্যামোদীর পক্ষে সত্যসত্যই দুষ্কর। কিন্তু পাঠকগণ আশ্বস্ত হইতে পারেন এই ভাবিয়া যে, সকলের কথা আলোচনা করার স্থান যে ইহা নয়, তাহা আমার অজানা নহে। যাঁহাদের কথা আলোচনা করিলে রবীন্দ্রনাথের বিশাল মনের আনন্দস্বরূপটি অধিকতর স্পষ্টতায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে, তাঁহাদের কথাই আমি আলোচনা করিয়াছি বা করিব। পাঠকগণ মনে রাখিবেন, যে সকল দার্শনিকের বা কবির কথা ইতিমধ্যে তুলিয়াছি বা পরে তুলিব, অর্থহীন পাণ্ডিত্যপ্রকাশের রুচিহীন মূঢ়তা বা ভাবদৈন্য ইহার কারণ নহে। রবীন্দ্রনাথের মনোদর্শনই আমার প্রসঙ্গ। ইংরাজী কাব্য সাহিত্যের মাত্র দুই তিনজন কবির কথাই আলোচনাপ্রসঙ্গে আমি উত্থাপন করিয়াছি, কিন্তু পণ্ডিতগণ জানেন, অনন্ত নক্ষত্রখচিত ইংরাজী কাব্যাকাশে এমন অনেক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বিরাজমান, যাহাদের আলোকবিভায় পৃথিবীর মানসলোক সূর্যদীপ্তির মহিমায় গৌরবিত হইয়া আছে। প্রেমদর্শন আলোচনাকালে তাঁহাদের দুই একজনের কথা সহজ ভাবেই আসিয়া পড়িবে, যথাস্থানে প্রধানতঃ রবীন্দ্রপ্রেম বুঝিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহাদের কথা আলোচনার মধ্যে টানিয়া আনিব ; কিন্তু কোনোক্রমেই মনোদর্শন আলোচনার সীমা আমি অতিক্রম করিব না। পণ্ডিতগণ অনবিদিত নহেন যে, সংস্কৃত সাহিত্যে ভারবি, মাঘ ও কুমারদাসের নাম বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কিন্তু কালিদাসের ও ভবভূতির প্রকৃতিকথা আলোচনাপ্রসঙ্গে কাব্যগত দর্শনের দিক হইতে রবীন্দ্রপ্রকৃতি সম্পর্কে আমার

যাহা বলিবার ছিল ইঁহাদের আলোচনা উত্থাপিত হইলে নূতন করিয়া তাহারি পুনরাবৃত্তি করিতে হয়; প্রকৃতিবর্ণনায় ইঁহাদের ভাষাগত ও রীতিগত স্বাতন্ত্র্য থাকিতে পারে, কিন্তু কালিদাস হইতে ভাবগত বিশেষ কিছু স্বাতন্ত্র্য ইঁহাদের নাই। ভবভূতিতে কিছু আছে, রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে বুঝিবার উদ্দেশ্যে ভবভূতির প্রকৃতি-কথা সেই কারণেই উল্লিখিত ও আলোচিত হইয়াছে। ভারবিতে প্রকৃতি-বর্ণনা নাই এমন কথা আমি বলি না, বরং এই কথাই বলি, তাঁহার 'কিরাতার্জ্জুনীয়ম্' প্রকৃতিরই চিত্রশালা। ভারবির 'সপাকশস্যাহিতপাণ্ডুতাগুণা' 'আসাদিতযৌবনা' পৃথিবীর রূপ, অথবা 'সমুদ্রযোষিতা'র 'তরঙ্গিতক্ষৌমবিপাণ্ডুসৈকত'-রূপ বর্ণনপ্রতিভার আশ্চর্য নিদর্শন বলিয়াই আমি মনে করি। তাঁহার

সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যান্য কবি

উৎফুল্লস্থলনলিনীবনাদমুষ্মাৎ
উদ্ভূতঃ সরসিসম্ভবঃ পরাগঃ। (৫।৩৯)

চিত্তাকাশে স্বপ্নসম্মোহনের বিচিত্র ইন্দ্রজাল করে রচনা। অর্জুনকে তপস্যাচ্যুত করিবার জন্য স্বর্গ হইতে ষড়ঋতুর একই কালে আবির্ভাবের দৃশ্য (১০ম সর্গ), অথবা অপ্সরীদের স্নানের ঘাটের মনোময় বিকল সৌন্দর্য (৮ম সর্গ) কিংবা অরণ্যলোকে শান্ত সন্ধ্যার কান্ত আবির্ভাব (৯ম সর্গ) কবিকল্পনার জ্যোতিমহিমারই প্রামাণ্য বহন করে। কুমারদাসের 'জানকীহরণে' 'কৃষ্ণমৃগলক্ষণঃ শশী'র বিস্ময়কর মোহন চিত্র অথবা 'দূরমগুরবিরশ্মির' স্বপ্নময় কল্পনার রূপ (অষ্টম সর্গ, ৫৫—৯২) কিংবা শরৎ বা বসন্তের আবেগোদ্দীপ্ত আনন্দকান্তি (চতুর্থ সর্গ) রীতিগত ও চিত্রগত বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। মাঘের 'শিশুপালবধে' শরদ্বর্ণনা :

স্মিতসরোরুহনেত্রসরোজলা-
মতিসিতাঙ্গবিহঙ্গহসদ্দিবম্
অকলয়ন্মুদিতামিব সর্বতঃ
স শরদং শরদম্বরদিঙ্মুখাম্। (৬।৫৪)

ভারবি, মাঘ, কুমারদাস

অথবা তাঁহার ষড়ঋতুর বিচিত্র বর্ণনা (ষষ্ঠ সর্গ) স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার যোগ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে এই সমস্ত কবিকথার উদ্ধৃতির প্রয়োজন, সেই উদ্দেশ্য কালিদাস ও ভবভূতির আলোচনাতেই সাধিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। রবীন্দ্রনাথ একসময় কবি জয়দেবের অনুরাগী ছিলেন; জয়দেবের "স্মরসমরোচিতবিরচিতবেশা" বিলাসিনী প্রকৃতির 'ললিতাননচন্দ্রা' দর্শনের প্রলোভন জাগিতে পারে, কিন্তু রবীন্দ্র-মনোদর্শনের কোনো উদ্দেশ্য তাহাতে সাধিত হইবে না। জয়দেব অথবা প্রাকৃত কবি রাজশেখরের প্রকৃতিতে ('কর্পূরমঞ্জরী') বসন্তবিলাসজাত উদ্দীপ্ত বাসনার যৌবনধন্য লাবণ্য আছে, বিদ্যাপতিতে আছে রূপমুগ্ধ কামনার যৌবনোচ্ছল রসমূর্তি :

যঁহা যঁহা ঝলকত অঙ্গ
তঁহি তঁহি বিজরীতরঙ্গ।
হেরইতে সে ধনি থোর
অব তিন ভুবন অগোর॥

চণ্ডীদাসের প্রকৃতি তো প্রেমে বৈরাগিনী—"মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন,"—পাইয়াও পাওয়া হয় নাই ভাবিয়া—"বিচ্ছেদ ভাবিয়া" চিত্তখেদে যেন মলিনা। গোবিন্দদাস একজন মহান্ কবি, প্রিয়-অভিসারিকা তাঁহার প্রকৃতি, দুর্বার গতি আছে তাঁহার রাগ-প্রকৃতির হৃদয়ছন্দে :

দূতর পন্থগমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি'।

প্রকৃতিবিষয়ক কবিতারচনায় জয়দেব বাজশেখর বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাস বিশেষ কী কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন—এইরূপ একটি প্রশ্ন পণ্ডিতদের কোনো কোনো মহলে জাগিতে যে পারে না, তাহা নহে। প্রথমোক্ত তিনজন কবি বাহ্যপ্রকৃতির রূপৈশ্বর্য বর্ণনায় যথেষ্টই কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন—তাঁহাদের কৃতিত্বসম্পর্কিত বহু উপকরণ আমার কাছে সঞ্চিত আছে। শেষোক্ত দুইজন কবির প্রকৃতি অন্তঃপ্রকৃতি, অন্তর্লীন প্রেমানন্দের অজস্র রঙ আছে সেই প্রকৃতি-চিত্রে। যে রূপ কেবল নয়নগোচর প্রত্যক্ষ রূপ, শুদ্ধমাত্র তাহারি বর্ণনা যে প্রকৃতিবর্ণনা, তাহা নহে; মানসনয়নে যে রূপ উদ্ভাসিত হইয়া পাঠকহৃদয়পটে নব নব ভাবচিত্রের আনন্দ অঙ্কিত করে, তাহার ধ্বনিও প্রকৃতিবর্ণনার বহির্ভূত বিষয় নহে। এই হিসাবে চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাসকে শ্রেষ্ঠ প্রকৃতিকবিদের সমসারে না বসাইয়া আমি তৃপ্তি পাই না। চণ্ডীদাসাদি কবির পদাবলীতে প্রেম ও প্রকৃতি একাঙ্গ ও একাত্ম হইয়া আছে,—ইহাদের প্রেমই প্রকৃতি, প্রেমের বিচিত্ররূপই ইহাদের প্রকৃতিরূপ। বৈষ্ণবতত্ত্বে দৃশ্যমান এই বিশ্বের সমস্তই তো প্রকৃতি,—নারী তো প্রকৃতি বটেই, পুরুষও প্রকৃতি; ইহাদের মন ও প্রেম, প্রেম-মনের বিচিত্র ভাবানুভাবের অজস্র লীলা—সমস্তই প্রকৃতি; একমাত্র প্রেমভগবান শ্রীকৃষ্ণসুন্দরই পরমপুরুষ : ইঁহারি অভিসারে ভক্তহৃদয়ের রাগপ্রকৃতি বিচিত্র রাগানুগা প্রীতির বিশ্বঋতুবিবর্তনে নিত্যকাল অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। এই রাগপ্রকৃতির তাৎপর্য বড় গভীর, এত গভীর যে মনও সেখানে প্রবেশপথ যেন পায় না। ইহার আলোচনা প্রসঙ্গক্রমে যথাস্থানে অবশ্যই করিতে হইবে।

মধ্যযুগীয় কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনায় অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। প্রত্যক্ষগোচর রূপসৌন্দর্যকে ফটোগ্রাফীর নিপুণতায় হুবহু তুলিয়া লইতে তিনি যেমন পারেন, তেমন বুঝি বাঙ্‌লা কাব্যে আর কেহ নহে। 'কালকেতু উপাখ্যানে' ভগবতীর হরিণীরূপটি ভাস্কর্যশিল্পের অনিন্দ্য-সুন্দর নিটোলত্বের মহিমা স্মরণ করাইয়া দেয়। 'ফুল্লরার বার-মাসের

কবিকঙ্কণ
মুকুন্দরাম

দুঃখবর্ণনা'র মধ্যে দরিদ্র পল্লীজনের দৈনন্দিন আটপৌরে জীবনের তথ্যগুলি আশ্চর্যচিত্রের বর্ণসুষমায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। 'ধনপতির উপাখ্যানে' খুল্লনার 'বার মাসের খেদ' কিংবা 'তরুলতা', 'ভ্রমর', 'কোকিল' প্রভৃতির সহিত কথোপকথনের সারল্য ও হৃদয়াবেগের চিত্র মানুষের সহিত প্রকৃতির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্থাপনের বিচিত্র সেতু বলিয়াই আমার ধারণা হইয়াছে। 'মায়াময় কমল কাননের' স্বর্গসুন্দর বর্ণসমারোহ কল্পচাতুর্যের ও বর্ণনশক্তির অনবদ্য উদাহরণ বলা যায়। ময়মনসিংহ গীতিকার পল্লীচিত্রগুলিরও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'মহুয়ার' শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যচিত্র, 'মলুয়ার' গার্হস্থ্যজীবনের সুখ ও দুঃখের চিত্র, 'চন্দ্রাবতীর' ব্যর্থজীবনের নৈরাশ্যবিধুর বৈরাগ্যচিত্র, 'কেনারামপালায়' গ্রাম্য দস্যু-জীবনের, দুরন্ত অথচ সরল কাহিনীচিত্র মধ্যযুগীয় বঙ্গদেশের ঘর হইতে বহির্দেশের বিচিত্র রূপমহিমার সৌন্দর্য বিস্তার করিয়াছে। আধুনিক যুগের মহাকবি শ্রীমধুসূদনের কাব্যেও প্রকৃতির বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনার চমৎকার উদাহরণ পাইয়াছি। প্রাচীন পঞ্চবটীর প্রকৃতিরূপ, চণ্ডী-মন্দিরের ও কানন-সরোবরের বিচিত্র শোভা, স্বর্ণলঙ্কার ঐশ্বর্যোদ্দীপ্ত অপরূপ বর্ণচ্ছটা বর্ণন-কৌশলে অপূর্ব শ্রী ও সৌন্দর্য বিকাশ করিয়াছে। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের বাস্তবপন্থী প্রকৃতিবর্ণনার কথাও এইস্থলে উল্লেখ করিতে পারি। নৈমিষবনের সন্ধ্যাশোভা, দানব-করকবলিত 'বৈজয়ন্তধামের' বেদনার ছবি, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে ইন্দ্রের সহিত বৃত্রের বীরত্বব্যঞ্জক সমরপ্রচেষ্টা কবি হেমচন্দ্র বেশ নৈপুণ্যের সহিতই অংকিত করিয়াছেন। কবিবর নবীনচন্দ্রের তুলিকায় প্রাচীনভারতের আশ্রম, অরণ্য, শৈলমালা ও ঋষিকুটীর-নিচয়ের গম্ভীর চিত্রাবলি প্রাণময় ঔজ্জ্বল্যে অপরূপ হইয়াছে বলিয়াই আমি মনে করি। প্রভাসের শান্ত রূপমহিমা, কুরুক্ষেত্রের বীর্যগম্ভীর সমরায়োজন, রৈবতকের প্রশান্ত শ্রীমণ্ডিত গাম্ভীর্য নবীন-প্রতিভার মৃত্যুহীন উদাহরণ। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, এই সমস্ত কবি-অঙ্কিত প্রকৃতিচিত্রের কাব্যগত চারুত্ব ও বৈশিষ্ট্য যতই থাকুক না কেন, বিস্তৃতভাবে তাহার আলোচনার ক্ষেত্র ও স্থান এপ্রসঙ্গে আমি রাখি নাই। প্রয়োজনবোধে

অন্যান্য কবিবর্গ

যাঁহাদের কথা অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি, আমার বিচারে তাঁহারাই যে কেবলমাত্র 'শ্রেষ্ঠ কবি', তাহা আমি বলি না। পাছে কোনো পাঠক এই ধারণাই করিয়া বসেন, তাই সংক্ষেপে ও দ্রুতগতিতে আরো কয়েকজন মহান্ কবির কথা উল্লেখ করিয়া আমার মনোভাব বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। বিপুলা এই পৃথিবী, অজস্র জাতির অসংখ্য কবি আছেন এই পৃথিবীতে। কয়জনকেই বা আমি জানি, কয়জনেরি বা সন্ধান রাখি? যাহা জানি, তাহার মধ্য হইতেই কয়েকজনের কথা লইয়া সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে বিশেষ একটি বিষয়েরই তো আমি আলোচনা করিতেছি। পৃথিবীতে এমন হয়তো অনেক কবি আছেন, যাঁহাদের কথা আমি কিছুই জানি না কিন্তু যাঁহাদের কথা ও কাব্য আলোচনা করিলে রবীন্দ্রমনোদর্শন দিনের আলোর মত স্বচ্ছ ও স্পষ্ট হইয়া যায়। যোগ্যতর পণ্ডিত ও সুধীব্যক্তি অবশ্যই

তাঁহাদের কথা লইয়া বিস্তৃত আলোচনা করিয়া রবীন্দ্র-মনোদর্শন-সাহিত্য সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবেন।

বর্তমান প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিদর্শন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণকালে কেবলমাত্র আর একজন কবির কথা একটু বিস্তৃতভাবেই আলোচনা করিব—তিনি বাঙ্গলার গীতিকবি বিহারীলাল চক্রবর্তী। বালকবয়সে রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের শিষ্যকল্প ছিলেন বলিয়া অন্ধভক্তিতে আচ্ছন্ন হইয়াই যে এই প্রস্তাব করিতেছি, তাহা নহে। বিহারীলালের প্রকৃতি-দর্শন রবীন্দ্রপ্রকৃতিতে পরিণতি লাভ করিয়াছে বলিয়াই এই প্রস্তাব করিতেছি। বিহারী-লালের প্রকৃতি ও কাব্যপ্রকৃতির আলোচনা শেষ হইলে পাঠক অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন রবীন্দ্রমনোদর্শনে এই আলোচনা একান্তভাবেই অপরিহার্য।

রবীন্দ্রনাথ বিহারীলাল সম্পর্কে লিখিয়াছেন :

'বিহারীলাল ইংরাজী ভাষায় নব্যশিক্ষিত কবিদিগের ন্যায় যুদ্ধবর্ণনাসঙ্কুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতা লিখিলেন না, এবং পুরাতন কবিদিগের ন্যায় পৌরাণিক উপাখ্যানের দিকেও গেলেন না—তিনি নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন। তাঁহার সেই স্বগত উক্তিতে বিশ্বহিত, দেশহিত অথবা সভামনো-রঞ্জনের কোনো উদ্দেশ্য দেখা গেল না। এইজন্য তাঁহার সুর অন্তরঙ্গরূপে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সহজেই পাঠকের বিশ্বাস আকর্ষণ করিয়া আনিল।'

'নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা' বলার মধ্যে সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক মন যেমন ধরা পড়ে, যুদ্ধবর্ণনাসঙ্কুল মহাকাব্যে অথবা দেশানুরাগরঞ্জিত উদ্দীপনা-ময় কাব্যকথায় স্বভাবমন তেমন ধরা পড়ে না। আধুনিক যুগে মহাকাব্য রচিত না হইবার যতগুলি কারণ আছে, তাহাদের মধ্যে এই কারণটি সম্ভবতঃ কবিদের নিকট সর্বপ্রধান কারণ বলিয়া বিবেচিত হইবে যে, মহাকাব্যে কবিকে প্রধানতঃ বস্তুমন হইতে কল্পমনের প্রচুর সাহায্য লইতে হয়—অনেকক্ষেত্রে বস্তু-পরিবেশের প্রভাবকে অতিক্রম ও অস্বীকার করিয়া কতক পরিমাণে কৃত্রিমও হইতে হয়। বিহারীলালের কাব্যের প্রধান গুণ এই—কৃত্রিমতার লেশমাত্রও তাঁহার কাব্যে মেলে না, তাঁহার মন যেমন উলঙ্গসুন্দর, ভাষা তেমন অনাড়ম্বর, বর্ণনভঙ্গী তেমনি সাধারণতার সৌন্দর্যে সহজ ও স্বচ্ছ। প্রকৃতিকে তিনি দেখিয়াছেন শিশুমনের সারল্যপূর্ণ উলঙ্গ দৃষ্টিতে। প্রকৃতিকে দেখিয়া তাঁহার যখন যেমন হৃদয়ভাব জাগিয়াছে, তখন তেমন ভাবই অলঙ্কারবিহীন স্পষ্টভাষায় আনন্দছন্দে রচনা করিতে গিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা বাহ্যতঃ বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা বলিয়া ভ্রম হয়, কিন্তু ধীরভাবে চিন্তা করিলেই বুঝা যায়, বস্তুনিষ্ঠ

কবি বিহারীলাল

বর্ণনার অন্তরালে একটি সহজ মানুষের সাধারণ হৃদয়াবেগের বিস্ময়ই লীলা করিতেছে। তাঁহার 'নিসর্গসন্দর্শন' কাব্যখানি প্রধানতঃ প্রকৃতির প্রত্যক্ষগোচর রূপেরই সুন্দর প্রতিরূপ, কিন্তু সমুদ্রের তরঙ্গোত্থিত শুভ্র ফেনরাশি দেখিয়া যে চিত্র অংকন করিয়াছেন, তাহা লিরিক-মনেরই প্রকাশ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

আহা মরি ও সবার ভিতরে ভিতরে
এক এক ইন্দ্রধনু সেজেছে কেমন।
যেন এরা সসম্ভ্রমে শূন্যে বেড়াইয়া
দেখিতেছে জলধির তুমুল তাড়ন;
যেন সব সুরনারী বিমানে চাপিয়া
ভয়ে ভয়ে হেরিছেন দেবাসুর-রণ।

আবার পূর্ণজ্যোৎস্ন চন্দ্রকে দেখিয়া সমুদ্র যখন উত্তাল তরঙ্গ-বিক্রমে উথলিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন সমুদ্রকে সম্বোধন করিয়া যে প্রশ্ন তিনি করিতেছেন তাহা প্রকৃতি-দৃশ্য হইতে দৃশ্যাতীত প্রেমভাবেরই ব্যঞ্জনা :

কেন তুমি পূর্ণিমার পূর্ণ সুধাকরে
হেরে যেন হয়ে পড় বিহ্বলের প্রায়,
ফুলে ওঠে কলেবর কোন্ রসভরে,
হৃদয় উথুলে কেন চারিদিকে ধায়?

অথবা কেনই আমি সুধাই তোমায়
কার না অমন হয় প্রিয় দরশনে;
ভালোবাসা এ জগতে কারে না মাতায়
সুখের সামগ্রী হেন কি আছে ভুবনে?

বিহারীলালের প্রকৃতিবর্ণনার সহজ সৌন্দর্য তাঁহার কাব্যকে অন্য সকল কবি হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে। বিহারীলালের কাব্যে বাহ্যৌজ্জ্বল্য নাই, অলংকারের চটকে অথবা বেগবান ছন্দোবিক্রমের ওজস্বিতায় কথাকে শাণিত করিবার প্রয়াস তাহাতে দেখা যায় নাই, কিন্তু সুকুমার কবিত্বধর্মের প্রাণসত্তা তাঁহার রচনার পরতে পরতে বিদ্যমান থাকিয়া বৃক্ষশিরে পুষ্পরূপের লাবণ্যের মতো বিকীরিয়া উঠে। সর্বোপরি বৃহৎ বিষয় হইতেছে এই, বিহারীলালের কাব্যে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার ন্যায় সর্বব্যাপী একটি প্রেমবিশ্বাস নিত্য প্রবাহিত রহিয়া তাঁহার সকলপ্রকার রচনা ও বচনকে বৃহত্তর একটি ধ্যানের অসীমে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়। তাঁহার আদর্শবাদী কবিমন বস্তুজগতের নীচতা ও ক্ষুদ্রতা দর্শনে ক্ষুব্ধ হইয়া অরণ্যে চলিয়া যাইতে চাহিয়াছে, 'মানুষ-জন্তুর হুহুংকার' শুনিয়া রবীন্দ্রনাথ

যেমন ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, 'ব্যাঘ্রে সর্পে তত নয়, মানুষ-জন্তুকে যত ডরি' বলিয়া বিহারীলাল ততোধিক ক্ষুব্ধতা প্রকাশ করিয়াছেন, তথাপি প্রেমকে তিনি কোনো দিন ছোট করেন নাই। সৌন্দর্য-কল্পনা ও প্রেমের বিশ্বাস খণ্ডিত ও নিপীড়িত হইয়াছে বস্তুপৃথিবীর রূঢ় আঘাতে, নৈরাশ্য নামিয়াছে মর্মে মর্মে, কাব্যধর্মে নামিয়াছে দুঃখজ্বালার দুঃসহতা, তবু তাঁহার নিগূঢ় সেই প্রেমদেবতার মহিমাবোধ চিত্ত হইতে হয় নাই বিদূরিত।

প্রেম ধ্যান, প্রেম জ্ঞান, প্রেম প্রাণ, মন,
প্রেমেরি জন্যেতে যেন রয়েছে জীবন।
যেথা যাই, দিয়ে যাই প্রেমের দোহাই,
যাহা গাই, প্রণয়ের গুণগান গাই।
হৃদয়ে বিরাজ করে প্রেমের প্রতিমা,
শ্রবণে সঞ্চরে সদা প্রেমের মহিমা।
পূর্ণিমার মনোহর পূর্ণ সুধাকরে
প্রেমেরি লাবণ্য যেন আছে আলো করে। [প্রেমপ্রবাহিনী]

শুধু তাহাই নহে। জগতে যাহা কিছু শুভ্র সুন্দর দেখিতেছি, তাহারই অন্তঃস্থলে প্রেম বিরাজিত আছে বলিয়া বিশ্বচরাচর শুভ্র সুন্দর। সূর্যের এত আলো সেই প্রেমের জন্য, চন্দ্র বা তারার স্নিগ্ধ ঔজ্জ্বল্য সেই প্রেমেরই কারণে :

সূর্য বল, চন্দ্র বল, বল তারাগণ
এরা নয় জগতের দীপ্তির কারণ ;
প্রেমের প্রভায় বিশ্ব প্রকাশিত রয়
তাই তো প্রেমের প্রেমে মজেছে হৃদয় ! [তদেব]

লক্ষ্য করুন এই কথাটি—'প্রেমের প্রেমে'। 'আসাদিতযৌবনা' কোনো পৃথিবীর প্রেমে নহে, 'ললিতাননচন্দ্রা' কোনো রূপসীর প্রেমে নহে,—'প্রেমের প্রেমে'।

ইহাতে কি রবীন্দ্রনাথের সেই সর্বজগদ্‌গত প্রেমের মহিমা ব্যঞ্জিত হইতেছে ? প্রেম করিয়াছি প্রেমের সঙ্গে, যিনি সূর্যের অন্তরালে রহিয়া আলো বিকীরণ করিতেছেন, প্রকৃতির অঙ্গরাগের অন্তরালে থাকিয়া বিচিত্র সৌন্দর্য বিস্তার করিতেছেন—এইভাব কি শেষোক্ত দুই পংক্তিতে অভিব্যক্ত হইয়াছে ?

বিহারীলালের এই প্রেমদর্শনের প্রতি মনীষী সমালোচকগণ যদি ধীরভাবে একবার দৃষ্টি দেন, তবে একদিকে যেমন বিহারীলালের প্রতি সুবিচার করা হইবে, অপরদিকে তেমনি রবীন্দ্রনাথের সর্বজগদ্‌গত প্রেমদর্শনের তথা প্রেমাশ্রিত প্রকৃতিদর্শনের উৎস সন্ধানও সার্থক হইবে। 'বাল্মীকি প্রতিভার' মূল ভাবটি, অর্থাৎ প্রেমভাবটি রবীন্দ্রনাথ বিহারীলাল হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট গ্রহণ করিয়াছিলেন কাব্যশিক্ষা—এসকল কথা

আজ পণ্ডিতজনের কেন সাধারণ কাব্যপাঠকেরও আর অবিদিত নাই। কিন্তু যে প্রেম-দর্শনের অপূর্বত্বের জন্য বিশ্বের বিরাট কবিসঙ্ঘের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, সেই প্রেমদর্শনের মূলতত্ত্বটি জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে বিহারীলাল হইতেই তিনি যে পাইয়াছিলেন, তাহা হয়তো অনেকেই ভাবিয়া দেখেন নাই। বিহারীলালের প্রেমদর্শনের কাব্য 'প্রেমপ্রবাহিনীর' কথা অনেকেই হয়তো আজ বিস্মৃত হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথও ইহার উল্লেখ করেন নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'বিহারীলালের কাব্যসংগ্রহে'র অল্পপরিসর পৃষ্ঠাদেশ অধিকার করিয়া 'প্রেম-প্রবাহিনী' মন্দীভূত স্রোত-তরঙ্গে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, তাহার কলধ্বনি আজিকার কর্মমুখর ঘর্মক্লান্ত ব্যস্ত জীবনের কোনো মুহূর্তকেই স্পন্দিত করে না। আধুনিক রুচিসম্পন্ন সমালোচকবৃন্দ কাব্য হিসাবে ইহাকে হয়তো বিশেষ মূল্যবান বলিয়া মনে করেন না; সরল পয়ারছন্দে অনাড়ম্বর ভাষায় লিখিত নিতান্ত ক্ষুদ্র এই কাব্যখানি আমার কিন্তু অত্যন্ত মধুর লাগিয়াছে। বিশেষতঃ কবির মনোদর্শন ব্যাখ্যা করিতে হইলে এই কাব্যখানির মূল্য কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অল্প কথায় প্রগাঢ় প্রণয়ভাব প্রকাশের ক্ষমতা বিহারীলাল 'প্রেমপ্রবাহিনীতে' যেমন ব্যক্ত করিয়াছেন, তেমন আর কোনো কাব্যে নহে :

একফুল শুঁকিতেম লয়ে পরস্পরে
একফল খাইতেম মুখামুখি করে।
জলে গিয়ে পড়িতেম দিতেম সাঁতার
লুকাচুরি ঝাঁপাঝাঁপি এপার ওপার।
হেরিতেম ময়ূরের নৃত্য অপরূপ
তুলিতেম লতাপাতা ফুল কতরূপ।
যাইতেম ক্ষুদ্র দ্বীপে বিকেল বেলায়
বসিতেম সুকোমল কুসুম শয্যায়।
চারিদিকে জলধারা গায় ধীরে ধীরে
শরীর জুড়ায়ে যায় শীতল সমীরে।
ফুলের রেণুর সঙ্গে জলের শীকর
বিন্দু বিন্দু এসে পড়ে মুখের উপর।
পশ্চিমেতে ঢল ঢল দিনকর ছটা
জরদ পাটল রক্ত-রঞ্জনের ঘটা।
কিরণের ফুল কাটা নীরদমণ্ডলে
যেন সব স্বর্ণপদ্ম ভাসে নীল জলে। [বিরাগ, তদেব]

সরল এই প্রেমের চিত্র স্বভাব-সুন্দরীর উলঙ্গ অঙ্গশোভার মতই সুন্দর। মানবজীবনে এই প্রেম বেশিক্ষণ কেন স্থির থাকে না? 'বিষাদ' নামক তৃতীয় সর্গে প্রেমজীবনের ক্ষণিকত্ব সম্পর্কে কবি এই প্রশ্ন তুলিয়াছেন :

এই দেখেছিনু তুমি বসি সিংহাসনে
ভূষিত রয়েছ নানা রতন-ভূষণে,
খচিত মুকুতা মণি মুকুট মাথায়,
মাণিক জ্বলিছে গলে মুকুতামালায়।
হাসি আসি বিকশিছে চারু চন্দ্রাননে
হাসিমুখে বসিয়াছে ঘেরে সখীগণে।
স্বর্গের শিশির-সম মধুর বচন
ক্ষরিতেছে হরিতেছে সকলের মন।
এই পুন দেখি সেই তুমি একাকিনী
বিজন কানন মাঝে যেন পাগলিনী।
তুমি যেন তুমি নও একি অপরূপ
কি রূপে হইল হেন স্বরূপ বিরূপ। [বিষাদ, তদেব]

মানবজীবনের চিরন্তন এই প্রশ্নের সদুত্তর অন্বেষণে কবি চলিয়াছেন। 'অন্বেষণ' নামক চতুর্থ সর্গে 'ওহে প্রেম, প্রেম তুমি থাক হে কোথায়?' বলিয়া কল্পনাভরে কবি বিশ্বভ্রমণ করিয়াছেন। বিহারীলালের প্রকৃতিচিত্রের বর্ণনপ্রতিভা এই সর্গে চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। "তরুলতাগুল্মতৃণে শ্যামলসুন্দর" গিরি উপত্যকা, উত্তুঙ্গ শৈলশৃঙ্গ, 'স্বচ্ছসলিলা' নির্ঝরিণী, 'দূর্বাদলে শ্যামায়িত বিস্তীর্ণ প্রান্তর' 'নানাবর্ণ কুসুমের স্তবকে রাজিত নিকুঞ্জ-কানন', 'সরোবরে সঞ্চালিত লহরী লীলায়' নৃত্যরতা 'সুন্দরী নলিনীমালার' অন্তঃপুর, 'রূপসীর কপোলের আভার মতন' গোলাপকুসুমের স্বপ্নপুরী ভ্রমণ করিলেন কবি। প্রেম কোথায়? চন্দ্ররশ্মির উত্তরীয়ে অঙ্গ ঢাকিয়া প্রেম কি মন্দ মন্দ পবনান্দোলিতা শুভ্রসুন্দরী বেলি ও যুথিকার দলোপরি আছে শয়ন করিয়া? প্রেম তুমি কোথায়?

রূপের অমূল্য মণি নবীন যৌবন
চাকভাঙা ঢল ঢল মধুর মতন,
যেন সদ্য ফুটে আছে শ্বেত শতদল
নির্মল স্ফটিক জল করে টলমল।
পঙ্কের কাজের মত তক তক করে
তুমি কি ঝাঁপায়ে পড় তাহার উপরে?

রসের লহরী ধায় তরল নয়নে
চঞ্চলা চপলা যেন খেলে নবঘনে।
তুমি কি দোলায়ে গলে কুবলয় মালা
নয়নতরঙ্গে কর লুকোচুরি খেলা? [অন্বেষণ, তদেব]

অথবা—

যথায় যৌবন ভিন্ন নাহিক বয়স,
সুধারস ভিন্ন যাহে নাহি অন্য রস।
প্রণয়কলহ ভিন্ন দ্বন্দ্ব নাই আর,
প্রেমঅশ্রু ভিন্ন নাহি বহে অশ্রুধার,
যথায় আমোদ ছাড়া আর কিছু নাই,
আমোদের যাহা কিছু চাহিলেই পাই,
তথায় কি প্রেম সেই আমোদেতে মিশে
বসি বসি হাসিখেলা করিছ হরিষে? [তদেব]

সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া কবি বুঝিলেন পরম প্রেমের দর্শন মিলিতে পারে চিত্তসাধনার সর্বোচ্চ স্তরের স্বর্গরাজ্যে :

সকলি পবিত্র যথা, সকলি নির্মল
ধর্মের যথার্থ মূর্তি আছে অবিকল,
সুশীলতা শালীনতা ভূষিয়ে নয়ন
সকলের প্রতি করে প্রীতি বরিষণ,
বরফের মত স্বচ্ছ প্রণয়ের ভাব
ইন্দ্রিয়ের বিন্দু তাহে নাহি আবির্ভাব,
অন্তরের মাহাত্ম্যের উন্নতিসাধন
করিতে উভয়ে যেন হয়েছে মিলন—
তথায় কি আছ প্রেম হয়ে তপ্ত মন? [তদেব]

কবি ইঙ্গিতে বুঝাইলেন, প্রেম আছে এই অতীন্দ্রিয় আনন্দ-মিলনে। 'নির্বাণ' নামক পঞ্চম সর্গে কবি স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, বৃহতে মন না দিয়া 'প্রবৃত্তির জলন্ত অনল' দৃষ্টিতে যখন প্রেম দেখিতে চাহি, তখনি 'পীরিতিসুন্দরী' 'ছুটিয়া পলান'। বৃহতে যখন রতি জাগে, 'ভাগ্যোদয়' হয় তখনি, তখনি মন মজিয়া যায় 'অমৃত সাগরে'।

মন যেন মজিতেছে অমৃতসাগরে,
দেহ যেন ফাটিতেছে সমাবেগভরে।
প্রাণ যেন উড়িতেছে সেই দিকপানে
যথার্থ তৃপ্তির স্থান আছে যেই স্থানে।
অহো অহো, আহা আহা একি ভাগ্যোদয়,
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আজি প্রেমানন্দময়। [নবীন, তদেব]

এই প্রেমানন্দময় গভীর দৃষ্টিতেই বিহারীলাল জগৎ ও প্রকৃতি দর্শন করিয়াছেন। তাঁহার মনে হইয়াছে, প্রকৃতির অন্তরে অন্তর-রূপিণী কোনো দেবতা আছেন, প্রেম যাঁহার নাম। সেই তিনি বসিয়া আছেন সবার অলক্ষ্যে—তাঁহারি রূপ-লাবণ্যের বন্যা বাহিয়া প্রমুদিত হইতেছে রূপ-তরঙ্গ। প্রকৃতির রূপ আর কিছু নহে, সেই লোকচক্ষুর বহির্দেশে বিরাজিতা অন্তর্দেবতা প্রেমেরই অঙ্গকান্তি। ইহারি বন্দনা তিনি 'সারদামঙ্গলে' ও 'সাধের আসনে' নানা ভাবে, নানা ভঙ্গীতে করিয়াছেন :

তুমিই বিশ্বের আলো তুমি বিশ্বরূপিণী।
প্রত্যক্ষে বিরাজমান
সর্বভূতে অধিষ্ঠান
তুমি বিশ্বময়ী কান্তি, দীপ্তি অনুপমা ;
কবির যোগীর ধ্যান
ভোলা প্রেমিকের প্রাণ,
মানব মনের তুমি উদার সুষমা। [সাধের আসন]

অন্যত্র—

কে তুমি প্রাণেতে পশি'
ত্রিদিবের পূর্ণশশী
কান্তি-সঙ্কলিত কায়া
অপরূপা ললনা ? [তদেব]

আবার—

তোমার কিরণজাল ভুবন করেছে আলো।
গ্রহতারা শশী রবি
তোমারি বিম্বিত ছবি,
আপন লাবণ্যে তুমি বিভাসিত আপনি। [তদেব]

এই যে অপূর্ব জ্যোতির্ময়ী 'অপরূপ ললনার' ধ্যান-বন্দনা কবি করিয়াছেন, পরিপূর্ণভাবে কোনোদিনই ইহাকে কোনো যোগী বা কোনো কবিই পায় নাই। বিহারীলাল ইহাকে

'কায়াহীন মহাছায়া, বিশ্ববিমোহিনী মায়া' নাম দিয়াছেন। ইহার রহস্য অপার, ইহাকে ঘেরিয়া বিরাজ করে অনন্ত স্বপ্ন :

রহস্য রহস্যময়
রহস্যে মগন রয়।
খুঁজিয়া না পেয়ে তাকে
সবে 'মায়া' বলে ডাকে,
আদরের নাম তাঁর বিশ্ববিমোহিনী।
মানবের কাছে কাছে
সদা সে মোহিনী আছে।
যে যেমন তার ঘরে
তেমনি মূরতি ধরে। [সাধের আসন]

রবীন্দ্রনাথ ইহার ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন : 'তিনি নানা আকারে, নানাভাবে, নানালোকের নিকট উদিত হন। তিনি কখনো জননী, কখনো প্রেয়সী, কখনো কন্যা। তিনি সৌন্দর্যরূপে জগতের অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন, এবং দয়া-স্নেহ-প্রেমে মানবের চিত্তকে অহরহঃ বিচলিত করিতেছেন।' [বিহারীলাল, সমালোচনা সংগ্রহ]

রহস্যময়ী এই তাঁহাকেই কবি কহিতেছেন :

তোমারে হৃদয়ে রাখি
সদানন্দ মনে থাকি,
শ্মশান অমরাবতী দুইই ভালো লাগে। [সারদামঙ্গল]

তোমাকে যখন হৃদয়ে পাই, ভেদবুদ্ধি তখন তিরোহিত হইয়া যায়; অখণ্ডবোধের অনন্তমহিমায় তখন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠি। তখন কি শ্মশান, কি অমরাবতী—তোমারি আলোতে উজ্জ্বল দেখি বলিয়া সকলি ভালো লাগে, সকলি রহস্যময় সৌন্দর্যে অপূর্ব বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু এই রহস্যময়ী তুমিটি কে? কবি বলিয়াছেন—সরস্বতী, সারদা। রবীন্দ্রনাথের বিচারে ইনি বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্যলক্ষ্মী, শেলির 'স্পিরিট অব বিউটি' হইতে ইনি অভিন্না! সুধীগণ বিচার করিবেন, রূপহীন প্রেমের কবিকল্পিত রূপপ্রতিমা এই সারদা কি না। মনে হয়, সারদা প্রেমেরই একটি উপনাম মাত্র। সারদামঙ্গল, আসলে, প্রেমমঙ্গল-কাব্য; এই কারণে ইহার এত বৈচিত্র্য, ইহার ধ্যানে এত রহস্য, রূপে এত বিহ্বলতা, চিন্তায় এত সদানন্দভাব। বস্তুতঃ যথার্থ প্রেমকে যতক্ষণ না উপলব্ধি করি, ততক্ষণ সদানন্দ মনে থাকা অসম্ভব। প্রেম না জাগিলে কিছুই কিছু নয়, সব শূন্য; প্রেম জাগিলে সকলই পূর্ণ, সকলি সুন্দর; তখন আপন হৃদয়সৌরভে আনন্দবিহ্বল হইয়া সৌন্দর্যলক্ষ্মীর উপাসনায় অগ্রসর হওয়া সম্ভব।

ফুটিলে প্রেমের ফুল
ঘুমে মন ঢুল্ ঢুল্,
আপন সৌরভে প্রাণ আপনি পাগল ;
সেই স্বর্গ-সুধাপানে
কত যে আনন্দ প্রাণে
অমায়িক প্রেমিকে তা জানেন কেবল। [তদেব]

অতীন্দ্রিয় এই প্রেমের ভাব অন্তরে প্রমুদিত হইলে তবেই জীবন সুন্দর হয়, মন পবিত্র হয়,' বাসনার মলিনত্ব বিদূরিত হইয়া যায়। এই 'প্রেমের প্রেমে' বিহারীলাল পরম বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, এই কারণে তাঁহার কবিতা হইতে যে মনের পরিচয় পাই, সুবিমল স্নিগ্ধতায় বিকচযূথিকার মত তাহা শুভ্রসুন্দর বলিয়া ধারণা হয়। 'বন্ধুবিয়োগ' নামক কাব্যে এই তাঁহার কুসুমোপম শুভ্র মনটি কী অপূর্ব মহিমার গৌরবেই না বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে! নৈর্ব্যক্তিক প্রেমদর্শনের অতীন্দ্রিয় ঔজ্জ্বল্য ব্যক্তিগত প্রেমমানসকে কত শুচিসুন্দর ও রুচিমোহন করিতে পারে, 'বন্ধুবিয়োগ' কাব্যে আমি তাহারই প্রমাণ পাইয়াছি। সমালোচকবৃন্দ এই কাব্যখানিকে যতই উপেক্ষা করুন, কবির ব্যক্তিগত মনের শুভ্রতা ইহাতে দিনের আলোর মত যেরূপ স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে মনোদর্শনকামী সমালোচকের মন গভীর আনন্দ না পাইয়া পারে না। বাঙলাদেশে 'অটোবায়োগ্রাফিক্যাল' কাব্যের বড় আদর নাই, বিদেশে আছে। অটোবায়োগ্রাফিক্যাল কবিতা ঠিক 'লিরিক' জাতীয় নহে, ইহাতে কবির ব্যক্তিজীবনের ঘটনার ছায়া শুধু নয়, ছায়াসহ কায়াও অনেকসময় দেখা যায়। বন্ধুবিয়োগে কবির ব্যক্তিজীবনের বহু ঘটনা এবং জীবনগত অন্তরঙ্গ বহু বন্ধুর কথা পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহার দ্বারাই যে কাব্যের মনোরমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা আমি বলি না। স্বর্গত বন্ধুজনের জন্য শোক করিতে করিতে আবেশবিহ্বল ভাষায় কবি যে কয়েকখানি চিত্র আঁকিয়াছেন, এবং সর্বোপরি আপনারি অজ্ঞাতে আপন মনের যে শুভ্রকোমল প্রেমমানসের প্রতিচ্ছবি রাখিয়া গেছেন, মনোদর্শনের বিচারে তাহার মূল্য অপরিসীম। নিদ্রিতা প্রেয়সীর ছবিখানি দেখুন। প্রেয়সী নিদ্রা যাইতেছেন

শয্যায় শোভে,—

গায়ের উপরে বায়ু ঝুর্ ঝুর্ করে ;
শোভিছে চন্দ্রের করে নীরব বদন,
নিমীলিত হয়ে আছে কমল নয়ন।
সুদীর্ঘ অরাল পক্ষ্ম পবনহিল্লোলে
অল্প অল্প হেলে হেলে কেঁপে কেঁপে দোলে।

কপোল গোলাপ ফুল গোলাপি আভায়
অধর পল্লব নব কিবা শোভা পায়।
পাশে গিয়ে বসিলেন স্নেহার্দ্র পরাণে
রহিলেন স্থির চক্ষে চেয়ে মুখপানে।
বায়ুবশে পদ্মদল করে থর থর
তেমনি উঠিল কেঁপে প্রিয়ার অধর।
কলস্বরে ধীরে ধীরে ফুটিল বচন,
'আমি যত বাসি তুমি বাস না তেমন'।
অমনি আদরে ধোরে করিয়ে চুম্বন,
কোলেতে বসায়ে, তুলে ধরিনু নয়ন।
'ফিরিয়ে আসিবে তুমি ছিল নাত মনে,
তার হাত এড়াইয়ে আসিলে কেমনে?'
ও কি প্রিয়ে, একি, নাকি দেখিছ স্বপন,
প্রলাপের মত কথা এ আর কেমন!
'তাই তো, সত্যই এই হেরিনু স্বপনে',
আর কথা সরিল না, হাসি এল মনে।
'আচম্বিতে পরী এক কোথা থেকে এল,
তোমারে হৃদয় থেকে কেড়ে লয়ে গেল।
হাসে পূর্ণিমার চাঁদ, কুমুদিনী হাসে,
কোথা থেকে এসে রাহু সেই চাঁদে গ্রাসে।'
কথায় কথায় কত রসের তামাসা,
প্রেমময় স্নেহময় কত ভালোবাসা। [সরলা, বন্ধুবিয়োগ]

সরল পয়ার ছন্দে গৃহজীবনের এমন মধুর কাহিনী রচনা একমাত্র কবি বিহারীলালেই সম্ভব। 'বন্ধুবিয়োগ' কাব্যে এইরূপ সরল ভাষায় লিখিত আরো অনেক মধুর কাহিনী ও চিত্র পাওয়া যাইবে। কৈশোরকালের দুরন্তপনার চিত্র, সতীরমণীর চরিত্রচিত্র, সরলা বঙ্গ-নন্দিনীর রূপচিত্র, কাব্যখানিকে অশেষ গৌরব দান করিয়াছে। বলা বাহুল্য, অপার্থিব প্রণয়ের বিকারবিহীন মনোভাব লইয়া নারীকে তিনি দেখিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নারীচিত্র চিত্রনে এতটুকু ইন্দ্রিয়বাসনার চিহ্নমাত্র নাই। বালক-মনা অনেক আধুনিকের ইহা ভালো না লাগিতে পারে, কিন্তু উচ্চতর প্রেমের যাঁহারা আস্বাদ পাইয়াছেন, তাঁহারাই এই প্রেমপ্রসন্ন সৌন্দর্যোপাসনার মর্ম-মহিমা উপলব্ধি করিবেন।

নারীকে, বিহারীলাল, বিচিত্ররূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যে নারীর আট প্রকার চিত্র আমরা পাইয়াছি।

সুরবালা, চির পরাধীনী,
করুণসুন্দরী, বিষাদিনী,
প্রিয়সখী, বিরহিনী,
প্রিয়তমা, অভাগিনী,—
এই অষ্ট বঙ্গ-সীমন্তিনী। [বঙ্গসুন্দরী]

তাঁহার 'সুরবালার' ছবিতে নীল নলিনীর নির্মল সৌন্দর্য উঠিয়াছে ফুটিয়া। সূর্য, একদিন দেখিলেন, 'সুরনদীর জলে' নীল নলিনীদলের সহিত 'অপরূপ এক কুমারী রতন' খেলা করিতেছে।

বিকসিত নীল কমল আনন
বিলোচন নীল কমল হাসে,
আলো করে নীল কমল বরণ
পুরেছে ভুবন কমল বাসে।
তুলি তুলি নীল কমল কলিকা
ফুঁ দিয়ে ফুটায় অফুটদলে,
হাসি হাসি নীল নলিনী বালিকা
মালিকা গাঁথিয়ে পরিছে গলে।
লহরী লীলায় নলিনী দোলায়
দোলেরে তাহায় সে নীলমণি,
চারিদিকে অলি উড়িয়া বেড়ায়
করি গুনু গুনু মধুর ধ্বনি। [তদেব]

কল্পলোকের নীলপরীর মত বঙ্গললনা এই 'সুরবালার' স্বপ্নময়ী নীল-নলিনী মূর্তি যৌবনস্বপ্নে নেশার মত এক প্রকার তন্দ্রাচ্ছন্নতার আবেশ জাগাইয়া দেয়; আবার 'অন্ধকারাগারে' নিত্য বন্দিনী 'চিরপরাধীনীর' মূক ম্লান অসহায় মূর্তি অকথিত বেদনার আবেগে চিত্তকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলে। গৃহের দাসীও 'গঞ্জনা' সহিতে না পারিয়া কাজ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু অভাগিনী এই বন্দিনী বঙ্গ-ললনার মুক্তির আলোক দেখিবার কোনো উপায় যেন নাই।

অভাগিনীর নাই কিছুই উপায়,
কেনা-দাসী আমি কুলের নারী। [তদেব]

প্রেমের উপাসকের চিত্তে কোনোরূপ বন্ধন থাকিতে পারে না। কবি বিহারীলাল উচ্চতম প্রেমের রহস্যমন্ত্র জানিয়াছিলেন ও অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়া শিল্পী হিসাবে

কোনো বিশেষ চিত্রে বা বিষয়ে আসক্ত হইয়া পড়েন নাই। স্বপ্নভরে তিনি ভাবলোকের উত্তুঙ্গ কল্পশিখরে উন্নীত হইয়াছেন, আবার একান্ত বস্তুগত জগতের ধূলিলিপ্ত সহায়হীন নৈরাশ্যলোকেও অবতরণ করিয়াছেন। 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যে কোথাও রোমান্টিক কল্পমহিমার স্বপ্নস্বর্গে সুদূর নক্ষত্রলোকের ইশারায় তিনি উঠিয়া গেছেন, কোথাও সহায়সম্পদবিহীন বস্তুসমাজের দুঃখদগ্ধ সংসার-শ্মশানে নামিয়া আসিয়াছেন। বঙ্গসুন্দরী কাব্যে নারীর বিচিত্ররূপ দেখিতেছি। 'দুখীদের দুখে দুখী' হইয়া নারী কোথাও 'করুণাসুন্দরী' দেববালার মত 'সরল উজল কমল নয়নে' অশ্রুবারি সিঞ্চন করিতেছে, পশুর হাতে পড়িয়া বিষাদিনী নারী অত্যাচারিতা হইতেছে, পশু স্বামীর সুমতি প্রার্থনা করিতেছে :

বরষিয়ে শিরে সুধা শান্তিজল
ফিরাও সতীর পতির মতি।

কোথাও আবার 'প্রিয়সখী' রূপে প্রিয়মনকে স্বপ্নবিহ্বল করিতেছে :

যেন আমি কোন্ অপরূপ লোকে
ঘুমায়ে ঘুমায়ে চলিয়ে যাই ;
বেড়ায়ে বেড়ায়ে চাঁদের আলোকে
সহসা তোমাকে দেখিতে পাই।

কোথাও আবার দেখিতেছি—প্রিয়-বিরহে ব্যাকুলা নারী একাকিনী আর স্থির থাকিতে পারিতেছে না ; কোথাও বা প্রিয়তমারূপে দিয়াছে দর্শন : 'চাঁদের কিরণে ললিত নারী'র রূপে পুলকিত হইতেছে প্রিয় হৃদয় ; কোথাও বা আবার বিশ্বাসঘাতক স্বামী পুনর্বার দারপরিগ্রহ করিতে যাইতেছে বলিয়া অভাগিনী নারী বিষণ্ন বেদনায় হইতেছে নিষণ্ন নিশ্চল।

নারীরূপে স্বপ্নসৌন্দর্য ও বস্তু-নৈরাশ্য দুই-ই দেখিয়াছেন বিহারীলাল। বিহারীলালের রূপদর্শন ও প্রেমভাব যাঁহারা যথার্থভাবে উপলব্ধি করিবেন, তাঁহারা অতি সহজেই রবীন্দ্রপ্রেম ও প্রকৃতি-তত্ত্বের রস আস্বাদন করিতে পারিবেন। গোড়াতে যে বলিয়াছি, বিহারীলালের প্রেম ও প্রকৃতি-দর্শন রবীন্দ্র-দর্শনে পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহা কতদূর সত্য এই প্রসঙ্গে তাহা বিচার করিতেও পারিবেন। বিহারীলাল প্রেমকেই জগৎ সংসারের আদি উৎস এবং সমগ্র রূপ-প্রকাশের অন্তর্নিহিত প্রাণসত্তা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। রবীন্দ্রকাব্যেও দেখিয়াছি যে, এই বিশ্বাসই তাঁহাকে রূপে রূপে অসীমের ও অরূপের সৌন্দর্য দর্শন করাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বেদোপনিষদ্ হইতে জীবনীশক্তি

বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথ

ও ভাবপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু চোখের সম্মুখে একজন প্রেমব্রতী ভাবুককে আদর্শরূপে দেখিয়াছিলেন, মনের মত ভাবের কথা তাঁহার নিকট হইতে শুনিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার জীবনে ও কাব্যে কম প্রভাব বিস্তার করে নাই। শেলি প্রভৃতি ইংরাজকবি অথবা কালিদাস প্রভৃতি সংস্কৃতকবি হইতে তাঁহার দর্শনগত দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্য কিছু-না-কিছু আছেই, কিন্তু বিহারীলাল হইতে রবীন্দ্রনাথের যে কিছু স্বাতন্ত্র্য, তাহা দর্শনগত ভাবের স্বাতন্ত্র্য নহে, রচনাগত ভঙ্গী ও রীতির স্বাতন্ত্র্য। মনোদর্শনের সমালোচকগণ রবীন্দ্রকাব্য-বিচার প্রসঙ্গে বিহারীকাব্যের দর্শনালোচনাকে অপরিহার্য বলিয়াই মনে করিবেন।

কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, বিহারীলালের প্রেমপ্রকৃতি জানা হইলেই রবীন্দ্রপ্রকৃতি জানা হইয়া গেল। বলিয়াছি, বিহারীলালে যে ভাবের উন্মেষ, রবীন্দ্রনাথে তাহারি সম্পূর্ণ পরিণতি দেখা গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রেম কেবলমাত্র কাব্যরচনার একটি প্রেরণা-সত্তা নহে, ইহা একটি বিশাল দর্শন, অহং-বন্দী ক্ষুদ্র জীবন হইতে আত্ম-সূর্যোদ্দীপ্ত উচ্চতম জীবনে ও জীবনধ্যানে ইহার প্রসার ও বিস্তৃতি। বিহারীলালে এই প্রেম পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে তথা কাব্যিক জীবনস্বপ্নে শুভ্রতা বিস্তারে সহায়তা করিয়াছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথে এই প্রেম জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সমস্যা হইতে উচ্চতম যাবতীয় সমস্যার সমাধানে হইয়াছে নিয়োজিত। শিল্পজীবনে এই প্রেম বিচিত্রের মধ্যে একের মহিমা আনিয়াছে, বস্তুজীবনে দান করিয়াছে সত্যসুন্দর নির্মলতার গভীর স্বপ্নগরিমা, আবার দর্শন-জীবনে প্রকাশ করিয়াছে ব্রহ্মস্বরূপের সর্বজগদ্‌গত অখণ্ড ঐশ্বর্য। এই প্রেমের দৃষ্টিতেই রবীন্দ্রনাথ জগৎ ও প্রকৃতিকে সুন্দর বলিয়া মানিয়াছেন, সত্য বলিয়া জানিয়াছেন, শিব বলিয়া বরণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি এই প্রেমাশ্রিত প্রকৃতি। প্রকৃতি বিচারে প্রেমের মহিমাবিশ্লেষণ তাই অপরিহার্য।

বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের নিকট প্রকৃতি মায়া নহে। তাঁহার মধ্যে যিনি কবি, তিনি তো প্রকৃতিকে মায়া বলিতেই পারেন না; তাঁহার মর্মস্থিত দার্শনিকটিও প্রকৃতিকে মায়া কহেন নাই। যে প্রকৃতিকে কবি সুন্দরী বলিয়াছেন, দার্শনিক সেই প্রকৃতিকেই সত্য ও শিবরূপা বলিয়া বরণ করিয়াছেন। রবীন্দ্র বিচারে, যাহা যথার্থভাবে সুন্দর, তাহা সত্য ও শিব না হইয়া পারে না, এবং সুন্দর কখনও মানুষকে মোহগ্রস্ত করিয়া মোহেই বন্দী রাখিতে চাহে না। মোহ হইতে উত্তীর্ণ যদি না হওয়া যায়, তবে বুঝিতে হইবে, যাহাতে মোহাচ্ছন্ন হইয়াছি, তাহা সুন্দর হয়তো হইতে পারে, কিন্তু তাহা রবীন্দ্রসুন্দর নহে। রবীন্দ্রের সুন্দর আত্মাকে বদ্ধ করে না, মুক্তই করে, এইজন্য তাহা শুধু সুন্দর নহে, তাহা সত্যসুন্দর ও শিবসুন্দর। আবার অপর পক্ষে, যাহা সত্য ও শিব, তাহা শুধু গাণিতিক সত্য বা

দর্শননৈতিক শিব নহে, তাহা সুন্দরসত্য ও সুন্দরশিবও বটে [শান্তিনিকেতন-২য় খণ্ড]। রবীন্দ্রসত্য বা শিব, জীবন বা স্বভাবনিরপেক্ষ কোনো তত্ত্বসামগ্রী মাত্র নহে, তাহা উন্নততম স্বভাবেরই আনন্দসৌন্দর্য। রবীন্দ্রনাথের 'সুন্দরীপ্রকৃতি' রবীন্দ্রনাথের মনকে কোনোস্থলে বদ্ধ করে নাই, পরন্তু মুক্তির পথেই নানাভাবে টানিয়াছে; এইজন্য প্রকৃতির প্রতি তাঁহার মনোভাব এত প্রসন্ন, এত প্রেমাবনত। প্রকৃতির প্রতি তাঁহার এই যে কোমলকান্ত শান্ত মনোভাব, ইহা শুধু কবির মনোভাব নহে, দার্শনিকেরও মনোভাব। বেশ লক্ষ্য করিয়াছি, এই মনোভাবের মন্দিরে কবি ও দার্শনিক বৈষ্ণবদের রাধাকৃষ্ণের ন্যায় পরস্পর আলিঙ্গিত রহিয়া একাত্মতার পরিচয় দিতেছে। 'প্রকৃতি মায়া, না সত্য', এই জিজ্ঞাসার উত্তরে তাঁহার দার্শনিকটি যদি শঙ্করের ন্যায় 'মায়া অনির্বচনীয়া'র কথা তুলিতেন, বিশ্ব-প্রকাশকে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিবার অভিপ্রায়ে যুক্তিজাল মেলিয়া বসিতেন, তবে নিশ্চিতভাবে এই কথা বলা যাইত যে, তাঁহার মধ্যে অর্থাৎ তাঁহার কবি ও দার্শনিকের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য বা ঐক্যতত্ত্ব নাই। সুখের বিষয়, রবীন্দ্রদর্শন ও কাব্যে বাস্তবিক কোনো বিরোধিতা বা অসামঞ্জস্য দেখা যায় নাই। এক ও অদ্বিতীয় প্রেমের বাণীই তাঁহার কাব্য ও দর্শন। রূপে রূপে সেই এককেই তিনি খুঁজিতেছেন। পূর্ণভাবে পাইতেছেন না, তাই রূপান্তরে আবার ছুটিতেছেন। এই নিত্য-ছোটার ফলে বিশ্বরূপের নানাত্বের দিকে তাঁহার দৃষ্টি যাইতেছে, পুষ্পের মতো নানা রঙের নানা বৈচিত্র্য বিকশিয়া উঠিতেছে তাঁহার কাব্য-কথায়, কিন্তু বলাই বাহুল্য, এই বৈচিত্র্যের মূল কারণটি সেই এক অদ্বিতীয় প্রেম ছাড়া আর কিছু নহে।

এই অদ্বিতীয় প্রেম রবীন্দ্রজীবনে পূর্ণভাবে ধরা দেয় নাই—পাঠকদের বোধ করি একথা নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। ধরা যদি দিত, তাঁহার জীবনে ও ভাবে বৈচিত্র্য আর রহিত না; 'পাইয়াছি' বলিয়া সেই 'এক পাওয়ার' আনন্দবাণীই যোগি-দার্শনিকদের মত গাহিতে থাকিতেন, কিংবা কিছু না গাহিয়া নীরব হওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে করিতেন। বেদান্তবিচারে রবীন্দ্রনাথের সাধনস্তর 'অন্ন' ও 'প্রাণের' ভূমি উত্তীর্ণ হইয়া মনোভূমির উচ্চস্তরে উন্নীত হইয়াছিল। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছি, এই মনোভূমির উচ্চস্তরে বাসনা একেবারে তিরোহিত হয় না, অথচ বাসনালিপ্ত থাকিতেও মন চাহে না। বাসনা ত্যাগ করি না, আবার বাসনায় লিপ্ত রহি না—এই দুইয়ের মধ্যবর্তী স্তরে বিরাজমান রহিয়া মন যে দ্বন্দ্ব অনুভব করে, সেই দ্বন্দ্বের জীবনচাঞ্চল্য নবছন্দের আনন্দে মঞ্জুরিত হইয়াছে রবীন্দ্রকাব্যে, নবতত্ত্বের আনন্দে জ্যোতির্দীপ্ত হইয়াছে রবীন্দ্রদর্শনে।

রবীন্দ্রসাধনার মূলপ্রেরণা ও মূলকথা হইতেছে, কাব্যের ভাষায় প্রেম,—দর্শনের ভাষায় ব্রহ্ম। রবীন্দ্রসাধনায় প্রেম ও ব্রহ্ম একার্থবোধক ভাবসৌন্দর্য। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেখাইয়াছি—রবীন্দ্রব্রহ্ম যোগিদিগের নির্গুণ ব্রহ্ম নহেন। বৈদান্তিক নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিয়া বুঝাইয়াছি যে, মনের অতীতে বিজ্ঞানে বা বিজ্ঞানগত আনন্দে যে ব্রহ্মের স্থিতি, রবীন্দ্রব্রহ্ম সে-ব্রহ্ম নহেন। রবীন্দ্রব্রহ্ম মনোগত ব্রহ্ম। মনের মধ্যেই তাঁহার প্রকাশ। রূপে রূপে তাঁহার আনন্দলীলা। ছন্দে ছন্দে তাঁহার নূপুরনিক্কণ। তাঁহার স্বরূপ কি? প্রেম। এই প্রেম বা প্রেমব্রহ্মই দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের উপাস্য। এই প্রেমব্রহ্ম সর্বজগদ্‌গত—সর্বত্র ইঁহার অধিষ্ঠান। ইনি আলোয় আছেন, ছায়ায় আছেন, দুঃখে আছেন, সুখে আছেন; অহংএ আছেন, আত্মায় আছেন, মৃত্যুতে আছেন, অমৃতে আছেন; রূপে আছেন, অরূপে আছেন। প্রকাশের জগতে যাহা কিছু দেখিতেছি, অপ্রকাশে যাহা কিছু আছে বলিয়া অনুমান করিতেছি, সমস্ততেই তাঁহার আভাস আছে,—এইজন্য জগতে এমন কিছু দেখি না, যাহা অরূপ সেই অসীমের ইঙ্গিত আনে না।

রবীন্দ্র-প্রেমব্রহ্ম প্রসঙ্গে

এই ভাব, পূর্বেই দেখাইয়াছি, বেদ-ভারতের ব্রহ্মভাব। পাঠক দেখিয়াছেন, বেদে ব্রহ্ম শুধু অরূপ নহেন, রূপেও প্রমূর্ত রহিয়াছেন। তিনি জলে আছেন, স্থলে আছেন, আকাশে আছেন, বাতাসে আছেন, আছেন লোকে-লোকে, অন্তরীক্ষে। দৃশ্যজগৎ হইতে অদৃশ্যজগতে গতাগতির আনন্দছন্দ বেদকাব্যের বহুস্থলে মেলে। রবীন্দ্রকাব্য ও দর্শনে এই বেদভাবের স্ফূর্তি দেখিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ বৈদিক ঋষিদের মতই প্রকৃতির রূপে অরূপ ব্রহ্মকে দেখিয়াছেন। তাঁহার প্রকৃতি বস্তুপিণ্ডের সমাহার নহে, ভাবৈশ্বর্যের উদ্দীপনা ও আনন্দ। প্রাচীন মায়াবাদী দার্শনিকরা সাধনার চতুর্থ স্তরে অর্থাৎ বিজ্ঞান-স্তরে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া প্রকৃতি বা প্রকৃতিরূপ বলিয়া তাঁহাদের নিকট কিছু ছিল না, কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই 'অবাঙ্‌মনসগোচর' চতুর্থ স্তর বিশেষ কোনো মর্যাদা পায় নাই। মনোলোক ছাড়িয়া 'অ-মন' কোনো ব্রহ্মসাধনায় রবীন্দ্রনাথের অনুরক্তি ছিল না, বিশ্বাসও ছিল না। মন দিয়াই তিনি ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিয়াছেন, ব্রহ্মাশ্রিত সেই প্রেমগত মন লইয়া তিনি প্রকৃতির কোলে ফিরিয়াছেন, প্রকৃতিতে মধুরাকে, অরূপাকে, জ্যোতির্ময়ীর আবির্ভাবকে অন্বেষণ করিয়াছেন। বৈদান্তিক যোগীরা বলেন, পাঠক জানিয়াছেন, মনের নাশ হইলে জগৎ বা প্রকৃতিকে আর সত্য বলিয়া মনে হয় না, অর্থাৎ প্রকৃতিরও নাশ হয় এবং জগৎ নাই বলিয়া ধারণা হয়। কিন্তু সুখের বিষয়, রবীন্দ্রনাথ মনের উচ্চধামে উন্নীত হইয়াছেন বটে, কিন্তু মনোনাশের কোনো সাধনা তাঁহাতে নাই, বেদান্তের ভাষায় নির্গুণ কেবলচৈতন্যাবস্থায় 'চতুর্থ' সাধনা তাঁহাতে নাই।

'বেদান্তসারে' বলা হইয়াছে : 'অনুপহিত অর্থাৎ বিশুদ্ধ অদ্বয় অনবচ্ছিন্ন কেবলচৈতন্য-মাত্রকে তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থ সংজ্ঞা প্রদত্ত হয়। ভাবার্থ এই যে, বিরাট হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর অপেক্ষা কেবলচৈতন্য যেমন চতুর্থ, সেইরূপ জীবেরও বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ অপেক্ষা কেবল-চৈতন্য অবস্থা তুরীয়। নির্গুণতা হেতু কল্পনা না হওয়ায় 'চতুর্থ' শব্দের উল্লেখ করা হইল। এ বিষয় শ্রুতিপ্রমাণ এই যে, 'শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যতে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ ('মাণ্ডু-৭)। [বেদান্তসার, কালীবর বেদান্তবাগীশ]

দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্ম 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' বটেন, কিন্তু কেবলচৈতন্য এই 'চতুর্থ' নহেন। এই চতুর্থের যাঁহারা সাধক, তাঁহারা মনোনাশের পক্ষপাতী, তাঁহারা যোগিদার্শনিক, কিন্তু কবিদার্শনিক নহেন। রবীন্দ্রনাথের সকল প্রকার সৃষ্টি, ধ্যান ও সাধনার ভিত্তিভূমি হইতেছে মন, এইজন্য তাঁহার মনের রঙে রঞ্জিত হইয়া গেছে তাঁহার ব্রহ্ম, তাঁহার প্রকৃতি, তাঁহার জীবমানব। তাঁহার মনোগত ব্রহ্ম চতুর্থস্তরের নির্গুণ অবস্থা হইতে নামিয়া আসিয়া সগুণ ঈশ্বরের সত্যশিবসুন্দরের রূপ ধারণ করিয়াছে; তাঁহার মনোগত প্রকৃতি দৃশ্যগত স্থূলতার বন্ধন ছিন্ন করিয়া উন্নীত হইয়াছে মনোব্রহ্মের সর্বজগদ্‌গত বিভূতির সৌন্দর্যে, তাঁহার মনোগত মানব বস্তুগত তুচ্ছতার আবর্জনা ঠেলিয়া অগ্রসর হইয়াছে মনঃপ্রকৃতির শান্ত সামঞ্জস্যের ধ্যানসমাহিত সৌম্যতায়।

'প্রভাতের এই পবিত্র প্রশান্ত মুহূর্তে নিজের আত্মাকে পরমাত্মার মধ্যে একবার সম্পূর্ণ সমাবৃত করে দেখো—সমস্ত ব্যবধান দূর হয়ে যাক। নিমগ্ন হয়ে যাই, নিবিষ্ট হয়ে যাই, তিনি নিবিড়ভাবে আমাদের আত্মাকে গ্রহণ করেছেন এই উপলব্ধি দ্বারা একান্ত পরিপূর্ণ হয়ে উঠি।'

'নইলে আমাদের আপনার সত্য পরিচয় হয় না। ভূমার সঙ্গে যোগযুক্ত করে না দেখলে নিজেকে ক্ষুদ্র বলে ভ্রম হয়, নিজেকে দুর্বল বলে মিথ্যা ধারণা হয়।'

[প্রভাতে, শান্তিনিকেতন-১ম খণ্ড]

'বিশাল বিশ্বের বিচিত্র ব্যাপারের মধ্যে যেমন একটি আশ্চর্য সামঞ্জস্য আছে, যেটি থাকাতে সমস্ত চেষ্টার মূর্তি শান্ত ও শক্তির মূর্তি সুন্দর হয়ে উঠেছে—যেটি থাকাতে বিশ্ব-জগৎ একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাশালা অথবা প্রকাণ্ড কারখানাঘরের মতো কঠোর আকার ধারণ করেনি—আমাদের চেষ্টার মধ্যে সেই সামঞ্জস্য থাকবে, আমাদের কর্মের মধ্যে সেই সৌন্দর্য ফুটে উঠবে।' [রাত্রি, শান্তিনিকেতন-১ম খণ্ড]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতির শেষাংশে প্রকৃতির শান্ত ও সুন্দর মূর্তির আদর্শে মানবজীবনের কর্তব্যচেতনাকে পরিচালিত করার নির্দেশ পাওয়া যাইতেছে। নির্দেশটির তাৎপর্য গভীরভাবে গ্রহণ করিতে গেলেই বুঝা যায়, 'হওয়ার' অর্থাৎ যোগ্য হওয়ার, উপযুক্ত হইয়া-ওঠার ইঙ্গিত আছে এই নির্দেশে। যাহা হই নাই, যাহা হইলে জীবন পূর্ণ হইবে, ধন্য হইবে, তাহার কথাই মনুষ্যজীবনে কথার কথা বটে, কিন্তু দার্শনিক বিচারে এই কথা কি

অপূর্ণতার দ্যোতক নহে? 'হইতে হইবে' এই কথার মধ্যে 'অপূর্ণ আছি' এই তাৎপর্যই তো নিহিত আছে। বস্তুতঃ মন যতক্ষণ আছে, জগৎপ্রকৃতি যতদিন আছে, ততদিন এই হওয়ার বাণী, অপূর্ণতার বাণীই সত্য। মনোদর্শন অপূর্ণ হইতে পূর্ণাভিমুখী হওয়ার গতিদর্শন। মনোজীবনের গতি পূর্ণের দিকেই বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহা তো পূর্ণ জীবন নহে। সুখের বিষয় ও গৌরবের বিষয় এই যে, পূর্ণজীবন নহে বলিয়াই মনোজীবন নিত্য গতিশীল, নিত্য চলমান, নিত্যবিকাশের অভিমুখে অগ্রসর। রবীন্দ্রনাথের মনোদর্শন এই নিত্য গতির, নিত্য 'হওয়ার' দর্শন, ইহা চিরস্থির কেবলচৈতন্যাবস্থার 'চতুর্থ' দর্শন নহে।

বলিতেছেন দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ:

'তাঁকে আমরা পাব না, তাঁর মধ্যে আমরা হব। আমার সমস্ত শরীর মন হৃদয় নিয়ে আমি কেবলি হয়ে উঠতে থাকব। ছাড়তে ছাড়তে, বাড়তে বাড়তে, মরতে মরতে, বাঁচতে বাঁচতে আমি কেবলি হব। পাওয়াটা কেবল এক অংশে পাওয়া, হওয়াটা যে একেবারে সমগ্রভাবে হওয়া—সে তো লাভ নয়, সে বিকাশ।' [হওয়া, শান্তিনিকেতন-১ম খণ্ড]

এই যে বিকাশের কথা বলা হইল, ইহাকেও ধীরভাবে একবার বিচার করিতে হইবে। বিকাশের কথা যেখানেই আছে, সেইখানেই স্বাতন্ত্র্যসাধনার কথা আসে কি না একবার চিন্তা করুন। ব্রহ্মে লীন হইয়াই আমি যদি থাকি, তবে তো আমার কোনো স্ফূর্তি নাই, বিকাশ নাই। ব্রহ্ম হইতে আমি যখন স্বতন্ত্র, তখনই বিকাশের কথা উঠিতে পারে। রবীন্দ্রদর্শনে দেখিয়াছি, মানব ব্রহ্মের সহিত এক হইয়াও স্বতন্ত্র, এইজন্য তাহাকে সাধনার দ্বারা ক্রমবিকাশের পথে আসিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ কল্পনা করিয়াছেন যে, ব্রহ্মে এক হইয়াও স্বতন্ত্রভাবে মানুষ যেমন সাধনার দ্বারা অবিরত হইয়া-হইয়া আপন জীবনে ও কর্মে ব্রহ্মের শক্তি ও প্রেম প্রকাশ করিতেছে, বিশ্বপ্রকৃতিও তেমনি ব্রহ্মের সহিত একাত্ম থাকিয়াও ব্রহ্মেরই লীলাপ্রকাশের ক্ষেত্ররূপে সুন্দর স্বাতন্ত্র্যে প্রকাশমানা রহিয়াছে।

'স্বাতন্ত্র্যও সেই অদ্বৈত থেকেই আসে, স্বাতন্ত্র্য সেই অদ্বৈতেরই প্রকাশ।' [তদেব]

'ঈশ্বর যে কেবল মানুষকেই পার্থক্য দান করেছেন, আর প্রকৃতির সঙ্গে মিলে এক হয়ে রয়েছেন একথা বললে চলবে কেন? প্রকৃতির সঙ্গেও তাঁর একটি স্বাতন্ত্র্য আছে, নইলে প্রকৃতির উপরে তাঁর তো কোনো ক্রিয়া চলতো না।' [পার্থক্য, শান্তিনিকেতন-১ম খণ্ড]

'তফাৎ এই যে···মানুষ সেই স্বাতন্ত্র্য-গৌরবের অধিকারটি নিজে ব্যবহার করছে। প্রকৃতির মধ্যে সেই অহঙ্কার নেই, সে জানে না সে কী পেয়েছে।'

'ঈশ্বর এই প্রকৃতিকে কী দিয়ে পৃথক করে দিয়েছেন? নিয়ম দিয়ে।'

'নিয়ম দিয়ে না যদি পৃথক করে দিতেন তা হোলে প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর ইচ্ছার যোগ থাকত না। একাকার হয়ে থাকলে ইচ্ছার গতিবিধির পথ থাকে না।'

'বিশ্বজগতে ঈশ্বর জলের নিয়ম, স্থলের নিয়ম, বাতাসের নিয়ম, আলোর নিয়ম, মনের নিয়ম নানাপ্রকার নিয়ম বিস্তার করে দিয়েছেন। এই নিয়মকেই আমরা বলি সীমা। এই সীমা প্রকৃতি কোথাও থেকে মাথায় করে এনেছে তা তো নয়। তাঁর ইচ্ছাই নিজের মধ্যে এই নিয়মকে, এই সীমাকে স্থাপন করেছে—নতুবা, ইচ্ছা বেকার থাকে, কাজ পায় না। এই জন্যেই যিনি অসীম তিনিই সীমার আকর হয়ে উঠেছেন—কেবলমাত্র ইচ্ছার দ্বারা, আনন্দের দ্বারা। সেই কারণেই উপনিষৎ বলেন, "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।' সেই জন্যেই বলেন, 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি' যিনি প্রকাশ পাচ্ছেন তাঁর যা কিছু রূপ তা আনন্দরূপ—অর্থাৎ মূর্তিমান ইচ্ছা—ইচ্ছা আপনাকে সীমায় বেঁধেছে, রূপে বেঁধেছে।' [তদেব]

প্রকৃতির বিশ্বরূপে ইচ্ছাময় ঈশ্বরের ইচ্ছাই হইয়াছে প্রকটিত। বলা হইল, নিয়মের দ্বারা ঈশ্বর প্রকৃতিতে পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন—বহুতর রূপে বিচিত্রা তাই বিশ্বপ্রকৃতি। কিন্তু প্রশ্ন এই : বহুতর নিয়মের পার্থক্যে বিচিত্রা জগৎপ্রকৃতি ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত ও ছিন্নভিন্ন হইয়া থাকে না কেন? জলের নিয়মের সহিত স্থলের নিয়মের কোনো মিল নাই, বাতাসের সহিত আলোর নিয়মের পার্থক্য প্রচুর, মনের নিয়ম ও প্রাণের নিয়মও এক নহে, এমত অবস্থায় জগৎ সমষ্টিরূপ ধারণ করিল কী প্রকারে?

এই প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ নিয়মের অন্তরে ঈশ্বরীয় শক্তির কথা তুলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, প্রকৃতিতে ঈশ্বর নিয়মের দ্বারা, সীমার দ্বারা যে পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন, তাহা শুদ্ধমাত্র পার্থক্যই নহে, তাহার অন্তর্মূলে এমন একটি 'শক্তি' আছে, যাহা চিরন্তন পার্থক্যকে চিরকালই অতিক্রম করিতেছে।

'ঈশ্বরের শক্তি এই সমস্ত পার্থক্যের উপর কাজ করে একে এক অভিপ্রায়ে বাঁধছে। সমস্ত স্বতন্ত্র নিয়মবদ্ধ দাবাবোড়ের ঘুঁটির মধ্যে একই খেলোয়াড়ের শক্তি একটি এক-তাৎপর্যবিশিষ্ট খেলা অভিব্যক্ত করে তুলছে।'

"শক্তি যোগাৎ'—শক্তি যোগের দ্বারা। শক্তি এক যোগ। এই যোগের দ্বারাই ঈশ্বর সীমাদ্বারা পৃথক্‌কৃত প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন—নিয়মের সীমারূপ পার্থক্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাঁর শক্তি দেশের সঙ্গে দেশান্তরের, রূপের সঙ্গে রূপান্তরের, কালের সঙ্গে কালান্তরের বহুবিচিত্র সংযোগ সাধন করে এক অপূর্ব বিশ্বকাব্য সৃজন করে চলেছে।'

'এমনি করে যিনি অসীম তিনি সীমার দ্বারাই নিজেকে ব্যক্ত করছেন, যিনি অকাল-স্বরূপ খণ্ডকালের দ্বারা তাঁর প্রকাশ চলেছে। এই পরমাশ্চর্য রহস্যকেই বিজ্ঞানশাস্ত্রে বলে পরিণামবাদ। যিনি আপনাতেই আপনি পর্যাপ্ত তিনি ক্রমের ভিতর দিয়ে নিজের ইচ্ছাকে বিচিত্ররূপে মূর্তিমান করছেন, জগৎরচনায় করছেন, মানবসমাজের ইতিহাসে করছেন।' [তদেব]

বলা হইল, রূপে রূপে বিচিত্ররূপে বিধাতার শক্তির প্রকাশ হইতেছে। প্রকৃতি বিশ্ববিধাতার শক্তির ক্ষেত্র। প্রকৃতির একদিকে নিয়ম, নিয়মে সীমা ও পার্থক্য; অপর দিকে শক্তি অর্থাৎ সীমার অন্তরে অসীমের শক্তি, বিশ্বখণ্ডের অন্তরে একতাৎপর্যবিশিষ্ট গুহাহিত অখণ্ডত্ব। প্রকৃতি কেবল বাসনাময় ইন্দ্রিয়গোচর রূপসমষ্টি মাত্র নহে, অখণ্ডদর্শনের স্বচ্ছ-সুন্দর দর্পণও এই রবীন্দ্রপ্রকৃতি। রবীন্দ্রনাথের ধারণা ও কল্পনা এই যে, ঈশ্বরকে জানিতে হইলে এই প্রকৃতির মুখোমুখী আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে, বিচিত্রের রূপরাশি দেখিতে দেখিতে অদ্বিতীয় সেই 'অরূপরতন'কে অন্বেষণ করিতে হইবে, প্রকৃতির সৃষ্টিমূর্তি ও ধ্বংসমূর্তি এই দ্বিবিধ মূর্তির মহিমার মধ্যে অরূপশক্তির লীলা দেখিতে হইবে।

শেষের কথাটায় বোধ হয় সংশয় জাগিল। সৃষ্টিমূর্তির প্রসন্নতার আলোকে আনন্দ অনুভব করা কঠিন নহে, কিন্তু ধ্বংসমূর্তির মধ্যে যে মৃত্যুলীলা দেখি, তাহাও কি সেই মঙ্গলময় মহেশ্বরের শক্তিলীলা? ইয়োরোপে তো এই ধ্বংস ব্যাপারটির জন্য নাস্তিক্যভাবের আন্দোলন উঠিয়াছে বহু যুগ ধরিয়া। ইয়োরোপের অনেক পণ্ডিত তো মঙ্গলের ঈশ্বর ও অমঙ্গলের ঈশ্বর—এই দুই ঈশ্বরের বিরোধ কল্পনা করিয়াছেন নানাভাবে। তবে তো ঈশ্বর সর্বনিয়ন্তা নহেন। মানুষের চঞ্চল মন তাহা হইলে কাঁহাতে চিত্ত স্থির করিবে? হেগেল ইয়োরোপের দর্শনাচার্য। কিন্তু তাঁহার ঈশ্বরও ক্রিয়া-শক্তিমান নিত্যগতিশীল ঈশ্বর। লক্ষবিধ, বিশ্ববিধ বিরোধ অতিক্রম করিয়া করিয়া হেগেলীয় ঈশ্বর অগ্রসর হইয়াছে পূর্ণবিকাশের পথে। আধুনিক দার্শনিকপ্রবর এফ্. এইচ্. ব্র্যাড্‌লে লিখিত *Appearance and Reality* এবং *Essays on Truth and Reality* নামক গ্রন্থদ্বয়ে ব্রহ্মস্বরূপের যে নির্দেশ মেলে, তা' অবশ্য অদ্বৈত বেদান্তের অনুরূপ বলা যায়। বেদান্তে যে বাক্য ও মনের অগোচর 'চতুর্থ' সম্পর্কিত তত্ত্ব আছে, ব্র্যাড্‌লের ব্রহ্ম কতক পরিমাণে সেই তত্ত্বের নিকটবর্তী বলা অসঙ্গত নহে। ব্রহ্মকে ব্র্যাড্‌লে জ্ঞান, শক্তি বা প্রেম নামে অভিহিত করিতে চাহেন নাই; এই সকল শক্তি ব্রহ্ম হইতে যে বহির্ভূত তাহা নহে, তবে ব্রহ্মে যখন এই সকল শক্তি সম্মিলিত হয়, তখন ইহাদের রূপান্তর ঘটে, অর্থাৎ তখন ইহারা আর মানবিক ধারণার অন্তর্গত থাকে না, তখন এমন রূপ ধারণ করে যা মানবের ধারণাবহির্ভূত অবাঙ্‌মনসগোচর নির্বেদ কোনো আনন্দরূপ। বলা বাহুল্য, বেদান্তের 'চতুর্থ' অথবা ব্র্যাড্‌লের 'ব্রহ্ম' সকল কর্ম ও গতির উর্ধ্বদেশে অবস্থিত। ইহারি নিম্নদেশে গতি ও কর্মের ঈশ্বর: ইনি মঙ্গলময়, নিত্য মঙ্গলের জন্য অহরহঃ সাধনা চলিতেছে ইহার মধ্যে। বিরোধ না থাকিলে সাধনা চলে না, তাই বিরোধের সম্মুখীন হইয়া এই ঈশ্বরকে নিত্য নব মঙ্গলজগতের সূচনা করিতে হইতেছে।

রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর, না বলিলেও চলে, বৈদান্তিক নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম নহেন। তিনি গতির ঈশ্বর। তিনি ইচ্ছাময়। 'ইচ্ছার' দ্বারা তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, 'নিয়ম' দ্বারা জগৎ-প্রকৃতিকে পৃথক করিয়াছেন; 'শক্তি' দ্বারা সমস্ত পৃথক জগৎকে এক করিয়া রাখিয়াছেন, 'সৃষ্টিশক্তি' দ্বারা জীবাত্মার সর্ববিধ মঙ্গলশক্তিকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতেছেন; 'প্রলয়শক্তি' দ্বারা জীবাত্মার 'সীমাবদ্ধ শক্তিকে সংহরণ' করিয়া লইতেছেন, অর্থাৎ কোনো ক্ষেত্রেই তাহাকে 'শক্তির চরমতায়' যাইতে দিতেছেন না—'না টাকায়, না খ্যাতিতে, না অন্য কোনো বাসনার বিষয়ে'। [তদেব]

তা' যেন হইল। কিন্তু পরস্পরবিরোধী এই সৃষ্টি ও প্রলয়ের সামঞ্জস্য কোথায়? রবীন্দ্রনাথের সহজ উত্তর, 'প্রেমে'। রবীন্দ্রনাথ বলিবেন যে, হৃদয়ের মধ্যে পরস্পরবিরোধী বহুভাব তো আছে, যেমন, ঘৃণা আছে, ভালোবাসা আছে, পাপ আছে, পুণ্য আছে, স্বার্থবোধ আছে, পরার্থবোধ আছে, অথচ সকলকে জুড়িয়া লইয়া ওই হৃদয়ের মধ্যেই কী এমন একটি পদার্থ আছে, যাহা সমস্ত বিরোধিতার মধ্য দিয়া অখণ্ড একটি পূর্ণ ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করিতে চাহিতেছে? সহজ উত্তর, 'প্রেম'।

এই প্রেম যেমন-তেমন প্রেম নয়, স্বয়ং ঈশ্বর আসিয়া ধরা দেন এই প্রেমের ক্ষেত্রে। এই প্রেমের ক্ষেত্র কোথায় পাই?

'কোথায় পাই? বাহিরে নয়, প্রকৃতিতে নয়, বিজ্ঞানতত্ত্বে নয়, শক্তিতে নয়, পাই অন্তরাত্মায়। কারণ, সেখানে তাঁর আনন্দ, তাঁর প্রেম। সেখানে তিনি নিজেকে দিতে চান। যদি কোন বাধা থাকে তো সে আমাদেরই দিকে, তাঁর দিকে নয়।'

'এই প্রেমে পাওয়ার মধ্যে তামসিকতা নেই, জড়ত্ব নেই। এই যে লাভ এ চরম লাভ বটে কিন্তু পঞ্চত্বলাভের মতো এতে আমরা বিনষ্ট হইনে। ··· শক্তি পাওয়া-ব্যাপারে পেলেই শক্তি নিশ্চেষ্ট হয় কিন্তু প্রেমের পাওয়ায় পেলে প্রেম নিশ্চেষ্ট হয় না বরঞ্চ তার চেষ্টা আরো গভীররূপে জাগ্রত হয়।' [পাওয়া, শান্তিনিকেতন-১ম খণ্ড]

উদ্ধৃতাংশের শেষ বাক্যটি একটু ধীরভাবে পড়িয়া দেখুন। রবীন্দ্রনাথের প্রেম নিশ্চেষ্ট প্রেম নহে, তাহার মধ্যে গতি আছে, চেষ্টার সম্ভাবনা আছে। এই প্রেম, তাহা হইলে, ব্র্যাড্‌লে কল্পিত রূপান্তরিত, অবস্থান্তরিত, ধারণাতীত কোনো নিষ্ক্রিয় প্রেম নহে। একটু পরেই দেখাইব, এই প্রেম বৈষ্ণবীয় প্রেমেরও তুলনা নহে। অনুভূতি-নিরপেক্ষ, বাসনানিরপেক্ষ বোধনিরপেক্ষ প্রেমব্রহ্ম হইতে রবীন্দ্রনাথের প্রেমব্রহ্মের স্বাতন্ত্র্য প্রভূত পরিমাণেই বিদ্যমান রহিয়াছে। ধারণার অন্তর্গত এই প্রেম, মনুষ্যত্বের ক্রমবিকাশে এই প্রেম, মানবিকতার মাহাত্ম্যবোধে এই প্রেম, অসৎ হইতে সতে মৃত্যু হইতে অমৃতে অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে অগ্রগতির সাধনস্বভাবে এই প্রেম। মনোলোকের উত্তুঙ্গ দিব্যধামে রবীন্দ্রনাথের প্রেমব্রহ্মের আনন্দআবির্ভাব। রবীন্দ্র প্রেমদর্শনের নীতিগত

তাৎপর্য এই যে, মন যতই প্রেমালোকে উজ্জল হইবে, জগৎ ততই সুন্দর হইবে, বিরোধসমূহ ততই সামঞ্জস্যের পথে আসিবে, অসঙ্গতির আবর্জনা ততই বিদূরিত হইতে থাকিবে।

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-বিষয়ক আলোচনায় এই প্রেম সম্বন্ধীয় আলোচনা অপরিহার্য। সর্বজগদ্‌গত এই প্রেমের দৃষ্টিতেই রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে দেখিয়াছেন। যে প্রেমব্রহ্মের শক্তির ক্ষেত্র এই প্রকৃতি, সেই প্রেম হইতে প্রকৃতিকে যদি ভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায়, তবেই মনে হয়, প্রকৃতিতে বিরোধ আছে, মৃত্যু আছে, অসঙ্গতি আছে, অসামঞ্জস্য আছে। বস্তুতঃ রবীন্দ্রবিচারে প্রকৃতি প্রেম হইতে স্বতন্ত্র বা স্বতঃসিদ্ধ বস্তু নহে। প্রেমচৈতন্যেরই ইহা রূপান্তর। এই হিসাবে প্রকৃতি তো মায়া নহে, প্রেমের ন্যায়ই তাহা সত্য, শিব এবং সুন্দর।

কিন্তু অদ্বৈতবেদান্তে, সকলেই জানেন, প্রকৃতিকে মায়া বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। অদ্বৈতবাদীগণের 'মায়ার' তত্ত্বকথা জানিতে হইলে ব্রহ্মের কথা কিছু জানা আবশ্যক।

অদ্বৈতবেদান্তে প্রকৃতি ও ব্রহ্ম

অদ্বৈতবাদীগণের ব্রহ্ম, পাঠক জানেন, সর্ববিরোধবিহীন, নিষ্কল, নিষ্ক্রিয় ও নির্বিকার। তিনি 'শান্তং সত্যং শিবমনন্তম্'। না, তাহাও যেন ঠিক বলা হইল না, কেননা বোধগোচর কোনো নাম দিয়া ব্রহ্মকে বুঝানো যুক্তিসঙ্গত নহে। শ্রুতি অনুসরণ করিয়া পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি অবাঙ্‌মনসগোচর, তাঁহার কোনো নাম নাই, তাঁহাকে বুঝাইবার জন্যই বলা হয় তিনি 'চতুর্থম্।'

এই যে ধারণাতীত, নাম-নিরপেক্ষ, নির্বিকার, নিষ্ক্রিয় চতুর্থ, ইনিই জগতের মূলতত্ত্ব। জগৎ ইঁহাতেই আশ্রিত। কিন্তু ইনি যদি নিষ্ক্রিয় নির্বিকার, প্রকৃতি ইঁহাতে অভিন্নভাবে যুক্ত থাকেন কি করিয়া? একজন বিদগ্ধ অদ্বৈতবাদী এই বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করিতেছেন *, "সেই মূলতত্ত্বের স্বরূপভূতরূপেই ক্রিয়াত্মিকা শক্তি বিদ্যমান, ইহা কি আমরা যুক্তিসঙ্গতরূপে কল্পনা করিতে পারি? বিক্রিয়মানা শক্তি কি নির্বিকার তত্ত্বের সহিত অভিন্নভাবে যুক্ত থাকিতে পারে? তাহাতে কি সেই মূলতত্ত্বই বিকারী হয় না? সুতরাং কার্যকারিণী শক্তিকে ব্রহ্মের স্বরূপভূত বলিয়া স্বীকার করা চলে না। অথচ শক্তিকে স্বীকার না করিলে কার্যজগতের কারণ নিরূপণ হয় না। তবে, ব্রহ্ম ও শক্তির সম্বন্ধ কি হইতে পারে? ব্রহ্মই যখন একমাত্র মূলতত্ত্ব, সেই ব্রহ্ম যখন স্বরূপতঃ শক্তিযুক্ত হইতে পারে না, অথচ শক্তি ব্যতীত যখন জগৎপ্রক্রিয়া অসম্ভব, তখন শক্তি ও তৎকার্যকে

* সাধু শান্তিনাথ লিখিত 'অদ্বৈত বেদান্তে মায়া' দেখুন। দর্শন, ৩য় বর্ষ, বৈশাখ।

ব্রহ্মতত্ত্বে অধ্যস্ত বা অযথার্থ প্রতিভাসরূপে স্বীকার করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। ব্রহ্মের সত্তা ব্যতীত শক্তির কোনো সত্তা নাই, শক্তির সত্তা ব্যতীত কার্যজগতের কোনো সত্তা নাই। সুতরাং স্বরূপতঃ জগৎ তন্মূলীভূতা শক্তি হইতে অভিন্ন এবং শক্তি স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। কিন্তু শক্তির পরিণাম ও জগদ্‌বৈচিত্র্য ব্রহ্মস্বরূপের সহিত সঙ্গত হইতে পারে না। অথচ জগতের প্রাতীতিক সত্তাও অস্বীকার করা চলে না। এখন উপায় কি? একমাত্র উপায় এই যে, শক্তি ও জগৎ স্বরূপতঃ না থাকিয়াও প্রতিভাসিত হইতেছে। এই যে তত্ত্বতঃ না থাকিয়াও প্রতিভাসিত হওয়া, ইহার একটি কারণ অবশ্য স্বীকার্য। এই কারণকেই 'মায়া' নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু মায়ার সত্তা কোথায়? ব্রহ্মের ভিতরে বা বাহিরে, ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বা ভিন্নরূপে মায়ারও কোনো সত্তা বা প্রকাশ সম্ভব নয়। আবার মায়া না থাকিলেও জগৎ হয় না। অতএব ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়াই এই অনির্বচনীয়া অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া আছে বলিতে হয়। এই দৃষ্টিতে মায়াই জগতের প্রকৃতি বা উপাদানকারণ এবং ব্রহ্ম মায়ী বা মায়াধীশ।"

রবীন্দ্রনাথ, বলাই বাহুল্য, মায়ার এই সূক্ষ্ম এবং জটিল দার্শনিক ব্যাখ্যায় কোনোদিন প্রবেশ করেন নাই। তাঁহার-দর্শনমানসের পক্ষে এই ব্যাখ্যায় মনঃসংযোগ করাও বোধ করি সঙ্গত নহে। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্ম নির্বিকার নহেন, সর্ববিরোধবিহীন, গতিবিহীন, নিষ্কল, নিষ্ক্রিয় নহেন। সুতরাং প্রকৃতিকে 'মায়া' বলিয়া অদ্বৈততত্ত্বের ন্যায়দর্শনকে সর্ববিধ ত্রুটি ও বিচ্যুতি হইতে দূরে রাখিতে হয় যে উদ্দেশ্যে, সে উদ্দেশ্য রবীন্দ্রদর্শনে নাই। জীবমানবের বাসনাগত জীবনকে উচ্চতর বৃহত্তর জ্ঞান, কর্ম ও প্রেমজীবনে উন্নীত করা এবং জগৎপ্রকৃতির দৃশ্যগত রূপসৌন্দর্যকে মহিমময় ভাবৈশ্বর্যে উদ্দীপ্ত করিয়া দেখা—প্রধানতঃ এই দুটি বিষয়ই রবীন্দ্রদর্শনের বিশেষত্ব। এই দর্শনে, এই মনোদর্শনে, মায়ার স্থান নাই; প্রকৃতি মায়া নহে, তাহা শক্তির ক্ষেত্র। ঈশ্বর নিষ্ক্রিয় নহেন, ক্রিয়াত্মিকা শক্তিই তাঁহার প্রকৃতিলীলা।

দর্শনের বিচারে রবীন্দ্র-প্রকৃতি

দর্শনশাস্ত্রের সূক্ষ্ম ন্যায়বিজ্ঞানের বিচারে রবীন্দ্রনাথের এহেন ব্রহ্মবাদ ও প্রকৃতিবাদ ত্রুটিশূন্য বলিয়া অনেকে নাও মনে করিতে পারেন। কিন্তু একথায় কোনো সংশয় বা সন্দেহ নাই যে, দর্শনকে ত্রুটিশূন্য করিবার অভিপ্রায়ে রবীন্দ্রনাথ পুঁথিগত বিদ্যার দ্বারা কোনোদিনই পরিচালিত হন নাই। তাঁহার কাব্যময় মনীষায় সহজভাবে যাহা সত্য বলিয়া মনে হইয়াছে, তাহাই তিনি সহজ ও সরল বিশ্বাসে প্রকাশ করিয়াছেন, দর্শনের দিক হইতে কোথায় খুঁত রহিয়া গেল, তাহা বিবেচনা করিবার অভিরুচি তাঁহার মধ্যে ছিল না। তাহা যদি থাকিত, তবে কাব্যে তিনি যে প্রকৃতির বন্দনা গাহিয়াছেন, দর্শনে তাহাকেই মায়া বলিয়া মনোবিহীন নির্বেদ সেই নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম-অভীপ্সায় তৎপর হইয়া যাইতেন। ইহা হইলে তাঁহার দর্শন হয়তো

নিখুঁত হইতে পারিত, কিন্তু কাব্যের সহিত তাঁহার দর্শনের বিরোধিতা বাধিত এবং কবির সহিত তাঁহার দার্শনিকের কোনো সম্পর্কও রহিত না। রবীন্দ্রদর্শনের মধ্যে ন্যায়তন্ত্রের যে সূক্ষ্ম সীমারেখায় ত্রুটি আছে বলিয়া তার্কিকরা মনে করিবেন, রসিকরা জানিবেন যে, সেই সূক্ষ্ম সীমারেখাটি অতিক্রম করেন নাই বলিয়াই দার্শনিকের মধ্যে কবির, এবং কবির মধ্যে দার্শনিকের, আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে।

বলিয়াছি রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আধুনিক যুগে একাধিক অদ্বৈতবাদীও জগৎপ্রকৃতিকে একহিসাবে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। তবে তাঁহাদের স্বীকৃতি রবীন্দ্র-স্বীকৃতির তুলনীয় নহে। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি ও প্রেম-বিষয়ক তত্ত্বদর্শনকে আরো স্পষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে আধুনিক শংকরপন্থীদের অভিমত-গুলির সংক্ষিপ্তসার লিপিবদ্ধ করিতেছি।

শংকরভাষ্যের একজন আধুনিক প্রবীণ ব্যাখ্যাকার বলিয়াছেন :

> Sankara has nowhere denied the reality of this world, for who but a mad man would deny it? He is quite explicit on this point in Vedanta Sutras, Commentry III, i. i 21.
>
> If it be said that this world—composed of 'subjective' existences like the sentient body, etc., and 'objective' existences like the earth, etc.—should be denied, (we reply that) no man can possibly deny it.
>
> In reference to 'Jivanmukta' souls, souls emancipated while in life, he affirms that this world would only present a different appearance to them : it would not be abolished.
>
> He allows to sensible things a relative reality. Water, etc, are real relatively to the unreal mirage, ete.
>
> [*On Vedanta*, K. Sastri.]

নব্য শংকরপন্থীদের মত হইতেছে এই, শংকরাচার্য জগৎকে অস্বীকার করেন নাই। জগৎ সত্য এবং জগৎ সেই জগদতীত ব্রহ্মের আশ্রিত। তবে একথা মানিতে হইবে, ব্রহ্ম ও জগৎ একস্তরের বস্তু নহে। তা যদি হইত, তবে দ্বৈততত্ত্বকেও স্বীকার করা অসম্ভব ছিল না। ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়াই জগৎপ্রকৃতির অবস্থিতি— এই হিসাবে ব্রহ্ম সকলকে মিলাইয়া এক অদ্বৈত মূলতত্ত্ব। সান্তের ভাব দিয়া অনন্তকে চিন্তা করিতে গেলেই ব্রহ্ম ও প্রকৃতি এই দুই পৃথক তত্ত্বের অনুমান হয়। অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে, সান্ত অপেক্ষা অনন্ত অনেক উচ্চতর তত্ত্ব। এই হিসাবে ব্রহ্ম জগৎকে আশ্রয় দিয়াও জগদতীত।

নব্য-শঙ্করপন্থীদের মত

ব্রহ্মই অদ্বৈত সত্য, চরম সত্য, 'পারমার্থিক সৎ'। এই পারমার্থিক অর্থে প্রকৃতি মায়া বা মিথ্যা, কিন্তু ব্যবহারিক অর্থে নহে। পারমার্থিক সত্তা ও ব্যবহারিক সত্তায় কোনো বিরোধ নাই। অর্থাৎ ব্যবহারিক সত্তায় যদি কোনো বিরোধের অন্ধকার থাকে, পারমার্থিক সত্তার পুণ্যজ্যোতিতে তাহা অবশ্যই দূরীভূত হয়। এই পারমার্থিক সত্তাই জগৎ-প্রকৃতির মূলভিত্তি—এইজন্য উভয়ের মধ্যে বিরোধ সম্বন্ধ কল্পনা করাই অযৌক্তিক শ্রুতিপ্রোক্ত চতুর্থের কি না অদ্বৈত ব্রহ্মের সহিত কাহারো বিরোধ হইতেই পারে না। ব্রহ্ম বিশ্বের চরম ও পরম সমন্বয়, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই কোথাও।

প্রতিদ্বন্দ্বী থাকিলেই বিরোধ। কিন্তু ব্রহ্ম গুণাতীত, দ্বৈতাতীত; স্থিতি ও গতির ঊর্ধ্বে। Hegelian Perfectionistদের মত ব্রহ্মকে যখন Dynamic বলা হয়, তখন তাঁহাকে পূর্ণ বলা হয় না, পরন্তু পূর্ণের অভিলাষী, নিত্যগতিশীল, আজও অপূর্ণ একটি তত্ত্ব বলিয়া কল্পনা করা হয়। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকরা ব্রহ্মকে Dynamic ভাবিয়া বহু জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছেন, আবার তাহাকে যখন Static বলিয়াছেন, তখন স্থবির সেই ব্রহ্মের নিষ্ক্রিয়তা কেমন করিয়া গতিবিশিষ্ট এই জগৎপ্রকৃতি সৃষ্টি করিল, তাহা ভাবিয়াই পান নাই। অনেকে তাই ব্রহ্মকে স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই; অনেকে সুখস্বর্গে পলায়িত ব্রহ্ম চিন্তনে তৃপ্তি পাইয়াছেন; অনেকে প্রকৃতিধর্ম লইয়াই মাতামাতি করিয়াছেন; অনেকে আবার নিত্যবিরোধপূর্ণ জগতে অসহায় ব্রহ্মেশ্বরের নিত্যসংগ্রাম কল্পনা করিয়া ক্ষিপ্ত হইয়াছেন। বস্তুতঃ যেখানেই বিরোধ সেখানেই দ্বি-ভাগ আছে। বেদান্ত-ব্রহ্মে বিরোধ নাই, গুণ নাই, গতি নাই, বিরোধ গুণ বা গতি যদি কিছু কল্পনা করিতে হয় তবে 'সত্যস্য সত্যম্' সেই অদ্বয় ব্রহ্মেরই আশ্রিত অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের সগুণ ঈশ্বরেই তা করিতে হয়। ঈশ্বরেরও উপরের তত্ত্ব সেই ব্রহ্ম—জাগতিক সকল সত্যের মূলে সেই পরম সত্য।

বলিলাম, সগুণ ব্রহ্ম বা পরিণামী নিত্য পরব্রহ্ম হইতে অনেক নিম্নস্তরের তত্ত্ব। বেদান্তমতে, ইহা প্রাণতত্ত্ব, গতিতত্ত্ব। ইহাতেই বিরোধ আছে, ইতি-নেতির ভাব আছে। কিন্তু ব্রহ্ম ইতি-নেতি সীমাসীমের ঊর্ধ্বে। স্থিতিগতির ঊর্ধ্বে, নিষ্ক্রিয়তা ও ক্রিয়াশীলতার ঊর্ধ্বে। তিনি শিবম্, অর্থাৎ মহান মঙ্গলময় ব্রহ্ম, কিন্তু মনে রাখা ভালো, অমঙ্গলের বিরোধী বস্তু ইনি নহেন, সগুণ ব্রহ্মই অমঙ্গলের বিরোধী, কিন্তু ইনি পরম মঙ্গলময় বস্তু, যা পাপপুণ্য জীবনমৃত্যু বিরোধভাবের মূলীভূত পূর্বাবস্থা। শ্রুতিমতে, পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি—ইনি শান্তমদ্বৈতং শিবং চতুর্থম্।

তাহাই যদি হয়, তবে সৃষ্টি বা প্রকৃতির উদ্ভব হইল কি প্রকারে? কারণ না থাকিলে তো কার্য হয় না—জগৎরূপ কার্য কোন্ কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে? বেদান্তের উত্তর এই, পরমকারণ সেই ব্রহ্ম হইতেই জগৎকার্য নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'সামান্য' হইতেই 'বিশেষ' হয় উন্মেষিত। সে কেমন? শারীরক ভাষ্যে বলা হইয়াছে যে, স্বরূপতঃ সেই সামান্য অর্থাৎ ব্রহ্ম নির্গুণ হইলেও বিশ্বজনের উপাসনার সুবিধার জন্য অর্থাৎ উপাসকের প্রীতির

জন্ত মায়িক ব্রহ্ম হয়েন অর্থাৎ মায়ারূপ ধারণ করেন (১।১।১০)। শারীরক ভাষ্যে আরো বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মের এমন একটি শক্তি সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে, যাহা এই জগৎ-প্রপঞ্চের কারণ। এই শক্তি অনির্বচনীয়া, অব্যক্তা, এবং জগতের বীজস্বরূপা। বলা বাহুল্য, এই শক্তিই ছলনাময়ী মায়া (১।৪।৩)। মায়া দ্বারা ব্রহ্ম প্রপঞ্চ করেন রচনা। কিন্তু স্বরূপতঃ মায়াশক্তিবিহীন এই ব্রহ্ম। একই ব্রহ্ম কখনও মায়িক, সগুণ, কখনও মায়ারহিত, নির্গুণ। মায়াশক্তির দ্বারা তিনি জগৎসৃষ্টি করেন তাই মায়িক, সকলবিধ বিরোধ ও দ্বৈতের ঊর্ধ্বেও থাকেন তাই উপাধিবর্জিত নির্বিশেষ চতুর্থ (১।১।১১)।

ব্রহ্মের তা' হইলে স্বরূপ কল্পিত হইতেছে? হ্যাঁ। ব্রহ্ম নির্বিশেষ মহাসামান্ত। নির্বিশেষ বটে কিন্তু নিঃস্বরূপ নহেন। তাঁ' হইতে আগত কোনো বস্তুই নিঃস্বরূপ নহে। প্রত্যেক বস্তুরই স্বরূপ বা স্বভাব আছে। এই স্বরূপ অসৎ নহে, অর্থাৎ nothing নহে। ['শঙ্কর বেদান্তে ব্রহ্ম ও জগৎ', শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী। দর্শন, ২য় বর্ষ, শ্রাবণ।]

ব্রহ্ম-কারণ হইতে জগৎ-কার্যের উদ্ভব। কার্য বিনষ্ট হইতে পারে, কিন্তু কারণ অর্থাৎ কারণসত্তা বিনষ্ট হয় না। প্রকৃতি বা মানবের সর্ববিধ গুণ কল্পনার দ্বারা সরাইয়া লউন, দেখিবেন সর্বপ্রকার বিশেষবিহীন একটি সত্তা, একটি নির্বিশেষ স্বরূপ আছে। নির্বিশেষ সত্তাই বিশেষ বিশেষ গুণগুলিকে ধরিয়া রাখে। এই সত্তাই মূলতত্ত্ব। ইহাকেই সরাইয়া লওয়া যায় না। সত্তার বিনাশ নাই। যখন সকল বিশেষের লয় হইবে, ওইটি থাকিবে। উহাই প্রকৃতির মূল। এই যে কারণ সত্তা, ইহা হইতে স্বতন্ত্র হইতে গেলেই কার্যগুলি অলীক হইয়া যায়। কারণসত্তাকে বিস্মৃত হইয়া কেবল কার্যগুলিকেই যখন স্বতঃসিদ্ধ বস্তু বলিয়া মনে করি, তখনই, বেদান্ত বলেন, তাহা মিথ্যা হইয়া যায়! তা' না হইলে তাহা সত্য।

'অণু মহদ্বা যদস্তি কিঞ্চিৎ দোত্মনা বিনির্মুক্তমসৎ সম্পদ্যতে।'

ক্ষুদ্র হউক, বৃহৎ হউক, সীমা হউক, অসীম হউক—যাহা কিছুই দেখি না কেন, সেগুলি আত্মা হইতে, কারণসত্তা হইতে বিচ্ছিন্ন ও বির্নির্মুক্ত করিয়া দেখিলেই হয় অসৎ, অলীক বা মায়া।

রবীন্দ্রনাথ আনন্দকে, প্রেমকে, প্রকৃতির কারণ সত্তা বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। 'স্বয়ম্ভূ সেই স্বতোৎসারিত প্রেমই সমস্ত সৃষ্টির মূল' [প্রেম, শান্তিনিকেতন-১] তিনি বলিয়াছেন, সেই প্রেমে আশ্রিত প্রকৃতি মিথ্যা নহে। তাঁহার অভিমত এই, প্রেম হইতে প্রকৃতিকে, জগৎকে, মানবকে, অহংকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলেই সমস্ত মিথ্যা হইয়া যায়।

রবীন্দ্রমতে প্রেমই প্রকৃতির কারণসত্তা

'যিনি অদ্বৈতম্, যিনি নিখিল জগতের সমস্ত বৈচিত্র্যকে একের সীমা লঙ্ঘন করতে দেন না, তাঁকে একাকী ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে জয়ী হতে পারবে

এত বড়ো শক্তি কোন্ রাজার বা রাজ্যে আছে! কেননা সেই অদ্বৈতের সঙ্গে যোগেই শক্তি, সেই যোগের উপলব্ধিকে শীর্ণ করলেই দুর্বলতা।' [শান্তিনিকেতন-২]

এইস্থলে একটি দার্শনিক বিষয়ের আলোচনা বাকি আছে। পাঠকগণ ধীরভাবে চিন্তা করিয়া রবীন্দ্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, কবিগুরু প্রেমকে স্বয়ম্ভূ, অদ্বৈত এবং জগৎসৃষ্টির মূল কারণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু জগতের কারণসত্তারূপে এই প্রেমকে গ্রহণ করার পথে দার্শনিক বিচারে কিছু বাধা আসিতে পারে। বলিয়াছি, মনের অগোচরে কোনো তত্ত্ব যে আছে, রবীন্দ্রনাথ তাহা বিশ্বাস করেন না। মনের দ্বারাই তিনি ব্রহ্মকে ধারণা করিয়াছেন—মনোময়, ইচ্ছাময় রূপে ব্রহ্ম তাঁহার নিকট আবির্ভূত। জগৎরূপ কার্যের বৈদান্তিক কারণসত্তা ও রাবীন্দ্রিক কারণসত্তা তাই এক নহে। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি পরিণামী নিত্য; প্রেমেরও পরিণাম আছে, ক্রমবিকাশের তাহা অধীন। এই হিসাবে মানসপ্রেম জগতের কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, যাহা পরিণামী, তাহা যথার্থবিচারে কারণসত্তা হইতে পারে কি না বিবেচনার বিষয়। যাহা অপরিণামী, যাহা নিত্য ও অদ্বৈত, যাহা আপনাতে আপনি পূর্ণ, যাহা স্থিতি, যাহা ধ্রুব ও শান্ত, তাহাই এই প্রকাশজগতের কারণসত্তা বলিয়া গণ্য। রবীন্দ্রনাথের প্রেম পরিণামী, পূর্ণকে সে আজও অন্বেষণ করিতেছে, গুণ প্রকাশের আনন্দকে সে জানে, জীবনবিকাশের আনন্দচঞ্চল গতিকে আস্বাদন করে, অহং হইতে উত্থিত হইয়া আত্মার বিস্তৃতভূমে পরিব্যাপ্ত হইতে চাহে। বস্তুতঃ, আনন্দময় অগ্রগতির ছন্দ বাণীই তো তাঁহার কাব্য, আনন্দময় অগ্রগতির মন্ত্র-বিশ্বাসই তো তাঁহার দর্শন।

প্রেম ও কারণসত্তা

কিন্তু তাহাই বা কেন, আপনি প্রশ্ন তুলিতে পারেন। রবীন্দ্রদর্শনের সমর্থনে আপনি অবশ্যই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, অপরিণামী নিত্য প্রেমের ধারণাও কি রবীন্দ্রদর্শনে পাওয়া যায় নাই? বিশ্বগতির অন্তরে স্থিতির ধ্রুবত্ব কি রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেন নাই? সেই স্থিতিশীল ধ্রুব প্রেমকে কি সর্বজগদ্‌গত অপরিণামী মূলতত্ত্ব বলিয়া ধারণা করা অসম্ভব?

রবীন্দ্রপ্রেম—পরিণামী ও অপরিণামী

সত্য কথা, রবীন্দ্রনাথ মনের সর্বোচ্চ শিখরে ধারণাতীতের দ্বারদেশে আসিয়া চিরস্থির সেই ধ্রুবসত্তাকে অনুভব করিয়াছেন। অনির্বচনীয় এই অনুভবশক্তিতে তিনি চিরস্থিরের অচপল ইঙ্গিত লক্ষ্য করিয়াছেন; কিন্তু মনের বাহিরে যাইতে চাহেন না বলিয়া একদিকে যেমন নিত্য গতিচঞ্চল তিনি রহিয়াছেন, অপরদিকে তেমনি গতির

ছন্দচাঞ্চল্যে স্থিতির আনন্দাভাসও উপলব্ধি করিয়াছেন। ইহাই রবীন্দ্র-মনোদর্শনের গতি ও স্থিতির রহস্য।

তা যেন হইল। কিন্তু প্রেম-ই অপরিণামী সেই স্থিতিশীল ধ্রুবসত্তা ইহা কেমন করিয়া কল্পিত হয়? প্রেম তো একটি গুণ, একটি রূপ, অন্ততঃ মন দ্বারা যখনই তাহা ধরিতে যাই, তখনই তাহার একটি বিশেষ রূপ ও গুণ তো অনুভব হইতে থাকে। ধ্যানের দ্বারা যখনই এই রূপ ও গুণ হইতে অপরিণামী নিত্যের সর্বব্যাপিত্বে ডুব দেওয়া যায়, তখনি অনুভবগত এই প্রেম কি আর রূপময় প্রেম থাকে? তখন কি অ্যাডলে কল্পিত রূপান্তরিত রূপহীন কোনো সত্তার আভাস আনে না? রবীন্দ্রনাথ কিন্তু স্থিতিশীল সেই অদ্বৈতকেও প্রেম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এইজন্য প্রেমব্রহ্ম অর্থাৎ সগুণ ঈশ্বরই তাঁহার উপাস্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এই প্রেমব্রহ্ম রূপে রূপে ধরা দেন, জীবমানবের প্রেমে আসিয়া দেখা দেন, মানবজীবনের ক্রমবিকাশের পথে আসিয়া মানবকে প্রেরণা দান করেন। এই প্রেম যখন জীবনে জাগে, জীবমানব তখন আর স্থির থাকে না, অগ্রসর হয় শিবমানবত্বে। ['মানব' নামক অধ্যায়ে এই বিষয়টির বিস্তৃত আলোচনা দেখিবেন।] বাড়িতে বাড়িতে, ছাড়িতে ছাড়িতে, মরিতে মরিতে, বাঁচিতে বাঁচিতে মানব ছুটিয়া চলে বিশ্বপ্রেমের আনন্দ-অনুরাগে। 'প্রেম জাহ্নবীর ন্যায় প্রবাহিত হইবার জন্য হইয়াছে। তাহার প্রবহমান স্রোতের উপরে শিলমোহরের ছাপ মারিয়া "আমার" বলিয়া কেহ ধরিয়া রাখিতে পারে না। সে জন্ম হইতে জন্মান্তরে প্রবাহিত হইবে।' [রবীন্দ্ররচনাবলী, ৫ম]

বুঝা যাইতেছে, স্থিতি অপেক্ষা গতির কথাই রবীন্দ্রদর্শনে কেন প্রাধান্য পাইয়াছে। স্থিতির নির্বিকার নিস্পৃহ আনন্দে যোগীদের মত বুঁদ হইয়া যদি তিনি নৈষ্কর্ম্যকে প্রাধান্য দিতেন, তবে জগতের ও জীবনের ক্রমবিকাশের তত্ত্বপ্রেরণা তাঁহাকে কখনই চঞ্চল করিত না। মানুষের পৃথিবীতে মানুষের কবিদার্শনিক-রূপে নামিয়া আসা তাঁহার পক্ষে কোনোদিনই সম্ভব হইত না। কর্ম-বিহীন নির্বিকার ব্রহ্মকে জগৎকারণ ভাবিয়া তাঁহাতেই লীন হইয়া শান্তি কামনার আদর্শ রবীন্দ্রনাথের নহে, কারণসত্তা সম্পর্কিত ন্যায়শাস্ত্রীয় বিচারব্যাপারে কর্মহীন ব্রহ্মকল্পনা দার্শনিক দিক হইতে যতই উপযোগী হউক না কেন, রবীন্দ্রনাথ তাহা বর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার স্পষ্ট উক্তি এই :

রবীন্দ্র-প্রেমে গতি ও স্থিতি

'ব্রহ্মহীন কর্ম অন্ধকার এবং কর্মহীন ব্রহ্ম ততোধিক শূন্যতা। কারণ তাকে নাস্তিকতা বললেও হয়। যে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে সমস্ত কিছুই হচ্চে সেই ব্রহ্মকে এই সমস্ত কিছু বিবর্জিত করে দেখলে সমস্তকে ত্যাগ করা হয়, সেই সঙ্গে তাঁহাকেও ত্যাগ করা হয়।' [কর্ম, শান্তিনিকেতন-১]

'ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। ·········আনন্দের স্বভাবই হচ্ছে ক্রিয়া—আনন্দ স্বতঃই নিজেকে বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে মুক্তিদান করতে থাকে। সেইজন্যই অনন্ত আনন্দের অনন্ত প্রকাশ। ব্রহ্ম যে আনন্দ সে এই অনিঃশেষ প্রকাশধর্মের দ্বারাই অহরহঃ প্রকাশ হচ্ছে। তাঁর ক্রিয়ার মধ্যেই তিনি আনন্দ এইজন্য তাঁর কর্মের মধ্যেই তিনি মুক্ত স্বরূপ।'
[তদেব]

আনন্দস্বরূপ এই 'বিশ্বকর্মা'ই রবীন্দ্রনাথের সর্বজগদ্‌গত প্রেমব্রহ্ম। Pantheism-এর ব্রহ্মের সহিত [Hegel এর Dynamic God] ইহার কতকটা যেন তুলনা করা চলে। ইনি প্রাণশক্তি। জগৎ পালয়িতা ইনি। জগৎপ্রকৃতিকে ক্রমবিকাশের পথে অহরহঃ ইনি আকর্ষণ করিতেছেন।, সৃষ্টি ব্যাপারে যত কিছু বিরোধ দৃষ্ট হয় তা' সমস্ত এঁর নেত্যাত্মক দিক। ইতি ও নেতির মধ্য দিয়া—বিরোধের মধ্য দিয়া সৃষ্টি গতিশীল রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথও 'সাধনা' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, সৃষ্টিব্যাপারে বিরোধের প্রয়োজন আছে। ইতি-নেতি ঈশ্বর-মায়া পুরুষ-প্রকৃতি, এই সমস্ত দ্বৈতভাব প্রয়োজনীয়। নতুবা সৃষ্টিই হয় না। অদ্বৈত প্রেম সম্বন্ধীয় চিন্তনার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ দ্বৈততত্ত্বের প্রসঙ্গ আনিয়া বিরোধের অন্তর্নিহিত সৃষ্টিক্ষমতাটিকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন :

'তর্কের ক্ষেত্রে দ্বৈত এবং অদ্বৈত পরস্পরের একান্ত বিরোধী ; হাঁ যেমন না-কে কাটে, না যেমন হাঁ-কে কাটে, তারা তেমনি বিরোধী। কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে দ্বৈত এবং অদ্বৈত ঠিক একই স্থান জুড়ে রয়েছে। প্রেমেতে একই কালে দুই হওয়াও চাই, এক হওয়াও চাই। এই দুই প্রকাণ্ড বিরোধের কোনটাই বাদ দিলে চলে না, আবার তাদের বিরুদ্ধ রূপে থাকলেও চলবে না। যা বিরুদ্ধ তাকে অবিরুদ্ধ হয়ে থাকতে হবে এই এক সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড এ কেবল প্রেমেতেই ঘটে। এইজন্যই কেন যে আমি অন্যের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করতে যাই, নিজের ভিতরকার এই রহস্য তলিয়ে বুঝতে পারিনে, কিন্তু স্বার্থ জিনিসটা বোঝা কিছুই শক্ত নয়।

'ভগবান প্রেমস্বরূপ কিনা তাই তিনি একককে নিয়ে দুই করেছেন আবার দুইকে নিয়ে এক করেছেন। স্পষ্টই যে দেখতে পাচ্ছি দুই যেমন সত্য, একও তেমনি সত্য। এই অদ্ভুত ব্যাপারটাকেও তো যুক্তির দ্বারা নাগাল পাওয়া যাবে না—এ যে প্রেমের কাণ্ড।

'উপনিষদে ঈশ্বরের সম্বন্ধে এই জন্যেই কেবলি বিরুদ্ধ কথাই দেখতে পাই। য একোঽবর্ণো বহুধাশক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্নিহিতার্থোদধাতি। তিনি এক, এবং তাঁর কোনো বর্ণ নেই অথচ বহু শক্তি নিয়ে সেই জাতিহীন এক, অনেকজাতির গভীর প্রয়োজন সকল বিধান করছেন। যিনি এক তিনি আবার কোথা থেকে অনেকের প্রয়োজন সকল বিধান করতে যান? তিনি যে প্রেমস্বরূপ—তাই, শুধু এক হয়ে তাঁর চলে না, অনেকের বিধান নিয়েই তিনি সার্থক।

'স পর্যগাৎ শুক্রং, আবার তিনি ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্য সমাভ্যঃ—অর্থাৎ অনন্তদেশে তিনি স্তব্ধ হয়ে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন, আবার অনন্তকালে তিনি বিধান করছেন, তিনি কাজ করছেন। একাধারে স্থিতিও তিনি, গতিও তিনি।

'আমাদের প্রকৃতির মধ্যেও এই স্থিতি ও গতির সামঞ্জস্য আমরা একটি জায়গায় দেখতে পাই। সে হচ্ছে প্রেম।' [সামঞ্জস্য, শান্তিনিকেতন-১]

এই যে প্রেম, ইহারি মহিমালোকে জগৎপ্রকৃতি রূপে-রসে-বর্ণে-গন্ধে শোভাময়ী হইয়া রহিয়াছে। প্রেমেরই স্পর্শে প্রকৃতির বিচিত্র রূপ, আবার প্রেমেরই স্পর্শে প্রকৃতির রূপ এক অদ্বিতীয় 'অরূপরতনের' আনন্দজ্যোতিতে রহস্যময়। এই প্রেমের দৃষ্টিতে প্রকৃতিতে বিরোধ থাকিয়াও নাই, গতি থাকিলেও স্থিতি আছে এবং স্থিতি থাকা সত্ত্বেও কর্মের অবসান নাই। প্রকৃতির নিয়ম ও শক্তিকে সহজভাবে মানিয়া লইয়া জীবনের ক্ষেত্রে বাস করিতে পারা, প্রকৃতির শান্ত মূর্তি ও প্রলয় মূর্তি—এই দুইএর মধ্যে অখণ্ড এক মঙ্গলময় সর্বানুভূ মহিমা দর্শন করা, এবং সর্বোপরি ব্যক্তি-প্রকৃতির সহিত বিশ্ব-প্রকৃতির একটি নিবিড়তম আত্মিক সম্বন্ধ উপলব্ধি করা এই প্রেমের বিশেষত্ব। জীবনানুগ এই প্রেম, জীবন হইতে জীবনান্তরে এই প্রেম, ধারণার মধ্যে আনিতে পারা যায় যত জীব, যত জীবন, যত দেশ, যত যুগ, যত ইন্দ্রিয়, যত অতীন্দ্রিয়, যত কাল, যত কালাতীত—সমস্তকেই আলিঙ্গন করিয়া বিরাজমান আছেন সর্বজগদ্‌গত এই আনন্দময় মহান প্রেম। প্রকৃতির বিচিত্র ছবি ও প্রতিচ্ছবিতে এই ইঁহাকেই প্রত্যক্ষ করি নানাভাবে নানা সৌন্দর্যে। সন্ধ্যার প্রশান্ত রূপসৌন্দর্যে ইঁহার আবির্ভাব, অন্ধকারের নিস্তব্ধ অন্তরে ইঁহার হাস্যজ্যোতি, নম্র নীরব গভীর আকাশের সৌম্যতায় ধীরগম্ভীর ইঁহার ঔদার্য, শান্তসুধীর তন্দ্রানিবিড় বাতাসের পুলক স্পর্শে ইঁহার প্রাণপ্রবাহের আন্দোলন। ক্লান্ত ধরার শ্যামলাঞ্চল আসনে উপবিষ্ট ইঁহাকে যেন দেখিতে পাই, স্তব্ধ তারার মৌন মন্ত্রভাষণে শুনিতে পাই ইঁহার অভয় বাণী; দিনের অবসানে নিভৃত পান্থশালার কক্ষমধ্যে কর্মক্লান্ত পথিকজনের মুখে ইঁহার ছবি দেখি, আবার গন্ধ-গহন সন্ধ্যাকুসুম-মালাতে ইঁহার অঙ্গ-সৌরভ যেন আস্বাদন করি। [গীতিমাল্য-১১১]। প্রত্যক্ষগোচর এই যে বিশ্বগত আনন্দপ্রেম, লোকে লোকে, ভাবে ভাবে ইঁহার ব্যাপ্তি, দুঃখে ও অশ্রুতে, শৌর্যে ও স্নেহে, জীবনে ও মরণে, সৃষ্টিতে ও প্রলয়ে ইঁহার লীলাবৈচিত্র্য :

রবীন্দ্র প্রেমালোকে জগৎ-প্রকৃতি

আকাশে দুই হাতে প্রেম বিলায় ওকে?
সে সুধা গড়িয়ে গেল লোকে লোকে।
গাছেরা ভরে নিলো সবুজ পাতায়,
ধরণী ধরে নিলো আপন মাথায়।

ফুলেরা সকল গায়ে নিলো মেখে,
পাখীরা পাখায় তারে নিলো এঁকে।
ছেলেরা কুড়িয়ে নিলো মায়ের বুকে,
মায়েরা দেখে নিলো ছেলের মুখে।
সে যে ঐ দুঃখশিখায় উঠ্‌লো জ্বলে,
সে যে ঐ অশ্রুধারায় পড়লো গলে।
সে যে ঐ বিদীর্ণ বীর-হৃদয় হতে
বহিল মরণরূপী জীবনস্রোতে।
সে যে ঐ ভাঙাগড়ার তালে তালে
নেচে যায় দেশে দেশে কালে কালে॥ [গীতিমাল্য-১০৮]

সর্বজগদ্‌ব্যাপ্ত বিরাট এই প্রেমের উপলব্ধি কখন জাগে? মানব যখন অহংএর মধ্যে বন্দী হইয়া থাকে, তখন জাগে না; অহং হইতে মুক্ত না হইলে ইহার দর্শন পাওয়া সম্ভব নহে। তাই প্রার্থনা এই :

আমার হৃদয় সদা আমার মাঝে
বন্দী হয়ে থাকে।
তোমার আপন পাশে নিয়ে তুমি
মুক্ত করো তাকে। [গীতিমাল্য-১১০]

প্রেম যখন জাগে, মুক্ত হয় তখন জীবমানব : মুক্ত হয় মলিনা বাসনা হইতে, তামসিক জড়ত্ব হইতে, সংশয়সঙ্কুল বিরোধ হইতে। রবীন্দ্রশাস্ত্রে জীবন-সাধনার অপর নামই হইল প্রেমের সাধনা। বৈষ্ণবাচার্যগণও প্রেমের সাধনা করিয়াছেন, তবে তাঁহাদের সাধনার রূপ আলাদা, তত্ত্বও আলাদা। বস্তুতঃ রবীন্দ্রপ্রেম ও বৈষ্ণবপ্রেম এক নহে। রবীন্দ্রপ্রেমের রূপ ইচ্ছাময় আনন্দের রূপ, বৈষ্ণবপ্রেমের রূপ বিজ্ঞানময় আনন্দের রূপ। বৈষ্ণবপ্রেম 'কৃষ্ণেন্দ্রিয়ে প্রীতিইচ্ছা' অর্থাৎ তা' এমন ইচ্ছা যা মানবিক বা মানসিক বাসনা বা ভোগাবেগের অতীত, যা জাগরিত হইলে পুরুষ-প্রকৃতিভেদ লুপ্ত হয়, 'না সো রমণ, না হাম রমণী' জ্ঞান হয় , রবীন্দ্রপ্রেম প্রেমেন্দ্রিয়ে প্রীতি ইচ্ছা অর্থাৎ তা' এমন ইচ্ছা, যা মানবিক বা মানসিক বাসনা বা বোধাবেগেরই অধীন, যা জাগরিত হইলে সকল জগৎ এক অখণ্ড সত্তায় আধৃত বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু বৈচিত্র্যের ও স্বাতন্ত্র্যের সূক্ষ্ম সীমারেখাগুলি একেবারে বিলুপ্ত হয় না। রবীন্দ্রপ্রেম 'আমার মধ্যে তুমি এবং তোমার মধ্যে আমি' এই ভাব জানে, কিন্তু 'না সো রমণ, না হাম রমণী' এই ভাব মানে না। বৈষ্ণবপ্রেম তত্ত্ব হিসাবে সকল

বাসনা, সকল বিরোধ, সকল গতির অতীত তত্ত্ব; রবীন্দ্রপ্রেম বাসনার মধ্য দিয়া, বিরোধের মধ্য দিয়া ক্রমবিকাশের নিত্যগতিশীল তত্ত্ব।

বৈষ্ণবদের প্রেমাশ্রিতা প্রকৃতি রসরূপা, তবে এই রস বাসনার রস নহে; বাসনার মধ্যে যে মাধুর্য অনুভব করি, তাহারি ইঙ্গিতে বৈষ্ণব-রসস্বরূপকে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র। রবীন্দ্রনাথের প্রেমাশ্রিতা প্রকৃতি রসরূপা, কিন্তু এই রস বাসনারই, স্বভাবেরই রস—স্বভাবকে শান্ত করিয়া, নির্মল করিয়া স্বভাব দ্বারাই এই রস উপভোগ করা সম্ভব। বৈষ্ণবদের প্রেম Mystic, আত্মসাধনার তাহা অঙ্গ; রবীন্দ্রনাথের প্রেম Humanistic, জীবনসাধনার তাহা অঙ্গ। এই প্রেম, পূর্বে বলিয়াছি, অহং হইতেই জাগে, ক্রমশঃ তাহার বিকাশ ঘটে। অহংএর সংশয় হইতে আত্মার বিশ্বাসে এই প্রেম যখন প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখন জগৎ সুন্দর হয়, সামঞ্জস্যপূর্ণ বলিয়া সঙ্গতিপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু গতি কি শান্ত হইয়া যায়? না। এই প্রেম গতিকে শান্ত হইতে দেয় না। তবে স্থিতির কথা কেন? তাহা এইজন্য যে, জীব যে-প্রেম অনুভব করে, যে-প্রেমের টানে অহরহঃ অগ্রসর হইয়া চলে প্রাণ হতে প্রাণে, গান হতে গানে, সেই প্রেম পূর্ণ প্রেম হইতে আগত হইলেও জীবাত্মার সীমাময় ক্ষেত্রে আধৃত বলিয়া অপূর্ণ। অপূর্ণে জীবাত্মার সুখ নাই, ভূমাতে বা পূর্ণে তাহার সুখ, এইজন্য প্রেমোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই সুরু হয় পূর্ণাভিমুখে তাহার অগ্রগতি। সেই যে পূর্ণ, যিনি নিখিল বিশ্বকে আপনার মধ্যে প্রেমের টানে রাখিয়াছিলেন এক করিয়া, সেই পূর্ণ, সেই স্থিতি, সেই অচপল ধ্রুব প্রেম সকল গতির ঊর্ধ্বে, অধে ও অন্তরে আছেন বিরাজমান। তাঁহারি ইঙ্গিতে গতি রহিয়াছে প্রাণচঞ্চল, নহিলে গতির তো অর্থই থাকে না।

রবীন্দ্রদর্শনে গতির অন্তরেই আছে স্থিতি, তবে রবীন্দ্রনাথের কথা এই যে, জীবন থাকিতে গতির শেষ হইবে না কোনোকালে। পথ চলিতে চলিতে স্থিতির ইঙ্গিতে হৃদয়বল আহরণ করিয়া নবোদ্যমে আবার পথ চলিব, কিন্তু 'স্থিতি'কে লাভ করিয়া স্থিত হইব না কোনোদিন। সুফীসাধকের প্রেমসাধনায় স্থিতির কল্পনা আছে, প্রেমের সহিত মিলিয়া এক অনন্ত আনন্দে আত্মসম্বিৎ ও স্বাতন্ত্র্য হারানোর তত্ত্ববাণী আছে সুফীদর্শনে; রবীন্দ্রনাথের প্রেমসাধনায় আছে অ-শেষ গতির অবারিত আনন্দোচ্ছ্বাস, ইহার শেষই নাই, 'শেষ কথা কে বলবে?' ফরাসী দার্শনিক বার্গসোঁ-ও অ-শেষ গতির কথা বলেন, তবে বার্গসোঁর গতিতে যতির আশ্বাস নাই, রবীন্দ্রনাথে আছে। এই স্থিতি বা যতির ধারণা হইতেই, আমি অনুমান করিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ বৈদান্তিক 'মনের' উচ্চতম শিখরে উন্নীত হইয়া দূর হইতে বিজ্ঞানস্তরের জ্যোতির্মহিমা লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং এই কারণেই শুধু গতির চাঞ্চল্য নহে, পরন্তু স্থিতির প্রশান্তির মধ্যেও প্রেমকে তিনি অনুভব করিয়াছেন। ব্র্যাড্‌লে, পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, প্রশান্ত এই ধ্রুব প্রেমকে শুধু ধরেন নাই, ইহার অবস্থান্তরিত গুণাতীত সত্তাকেও অনুমান করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ প্রেমের এই অবস্থান্তরিত গুণাতীত সত্তার কথা স্বীকার করেন না, ইহা

পূর্বেই বলা হইয়াছে। যে প্রেম ব্যক্তিসাধনায় উপলব্ধি করি, বিশ্বসাধনায় তাহারই বৃহৎ রূপ দেখি অন্তরিন্দ্রিয়ের আনন্দলোকে; ইহা ছাড়া অন্য কিছু ভাবিতে গেলে স্বতঃই ধারণাতীত এমন কোনো সত্তার কথা আসিয়া পড়ে রবীন্দ্রদর্শনের যাহা প্রতিপাদ্য নহে।

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু লিখিতে গিয়া প্রেমের কথাও কিছু আলোচনা করা গেল। পাঠকগণ নিশ্চই ইহাকে অপ্রাসঙ্গিক মনে করিতেছেন না। পূর্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্ম, প্রকৃতি বা মানব-দর্শন আলোচনায় প্রেমের কথা অপরিহার্য, কারণ প্রেমের আশ্রয় ব্যতিরেকে ইহাদের মূল্য, মহত্ব বা মর্যাদা নাই। পরবর্তী অধ্যায় কয়টিতেও যাহা বলিব, তাহার মধ্যেও এই প্রেমের কথাই প্রাধান্য লাভ করিবে। ক্রমশঃ আমি বুঝাইবার চেষ্টা করিব, প্রেমই রবীন্দ্রনাথের বৈচিত্র্যসাধনার মূলতত্ত্ব এবং ঐক্যতত্ত্ব।

এই প্রেমের আশ্রয়ে প্রকৃতি মধুরা—দুঃখেও মধুরা, শোকেও মধুরা। সৃষ্টিময়ী প্রাণদাত্রী এই প্রকৃতি ধ্বংসময়ী রূপে যে ফুল ঝরায়, পাতা ঝরায়, তা শুধু ধরণীকে নূতন করিয়া সাজাইবারই আনন্দে। প্রলয়ে তাই আতঙ্ক নাই, মৃত্যুতে নাই নৈরাশ্য। মৃত্যু আর কী। এ তো নূতন গতি, নূতন জীবনানন্দে নবোদ্যমে নূতন গতি। (গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে 'বলাকার' আলোচনা দেখুন।) জগৎ যদি থাকে, গতির শেষ নাই। মন যদি থাকে, প্রকৃতির নিত্যনব রূপপরিগ্রহের নাই অবসান।

কবিদার্শনিকের প্রকৃতি তাই বিচিত্রা। একদিকে সে বহুরূপে বর্ণে স্বর্ণে বিভূষিতা, অপরদিকে অন্তরবাসিনী সে এক অদ্বিতীয়া।

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।
কত না বর্ণে কত না স্বর্ণে গঠিত,
কত যে ছন্দে কত সঙ্গীতে রচিত,
কত না গ্রন্থে কত না কণ্ঠে পঠিত—
তব অসংখ্য কাহিনী।

আবার,

অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিনী।
ধীর গম্ভীর গভীর মৌনমহিমা,
স্বচ্ছ অতল স্নিগ্ধ নয়ননীলিমা,
স্থির হাসিখানি উষালোক সম অসীমা,
অয়ি প্রশান্তহাসিনী। [চিত্রা, চিত্রা]

ষষ্ঠ অধ্যায়

মানব

'আমরা অপূর্ণ বলিয়াই সেই পূর্ণস্বরূপকে আমাদের একান্তই চাই, আমরা অপূর্ণ বলিয়াই সেই সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মই আমাদের একমাত্র আনন্দ, একমাত্র মুক্তি। আমরা অপূর্ণ বলিয়াই আমরা অপূর্ণের পূজা করিব না, অপূর্ণের উপরে আমাদের অমর আত্মার, আমাদের অনন্ত জীবনের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিব না, আমরা এই অসৎ, এই অন্ধকার, এই মর্ত্যবিষয়পুঞ্জের মধ্যস্থলে শান্তোদান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা সাধনা করিতে থাকিব, যতদিন না বলিতে পারি

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।'

[রবীন্দ্ররচনাবলী-৯, পরিশিষ্ট]

ষষ্ঠ অধ্যায়

মানব

বলিয়াছি, চিত্তবৃত্তির সমুচ্চ স্তর হইতেছে প্রেম। এই প্রেম যাঁহার চরিত্রে প্রতিভাত হইয়াছে, সমাজে, স্বদেশে, পৃথিবীর প্রতিদেশে, প্রকৃতির প্রতিরূপে সুন্দরের আনন্দরূপ অবলোকন করিয়া ব্যক্তি জীবনেই তিনি যে নন্দিত রহিবেন, তাহা নহে, বিশ্বজীবনের প্রেরণার উৎসস্বরূপ বিবেচিত হইয়া দিশি দিশি প্রেমব্রহ্মের মহিমাও তিনি বিকীরণ করিবেন। সংসারে আজও এই মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নাই সত্য, কিন্তু মানুষের মন তো ইহাকে ধারণা করিতে পারে, স্বপ্ন দেখিতে পারে, কল্পনার পটে ইহার রূপাবয়ব চিত্রিত করিয়া মনোময় মহান আনন্দে জীবজীবন যাপন করিতে পারে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ও দর্শনে যে মানবের চিত্র আমরা দেখিয়াছি, তাহা এই প্রেম-মানবের অমর ভাব-চিত্র। 'অহং' হইতে ইহার সম্ভূতি, কিন্তু আত্মার অবারিত ঔজ্জ্বল্যে ইহার অভিযান। 'কবিকাহিনী'র ব্যক্তি-প্রেম ও প্রকৃতি-প্রেম হইতে ইহার উন্মেষ, 'জন্মদিনের' দ্বিজোত্তম শিবমানবের স্বপ্নপ্রেমে ইহার প্রতিষ্ঠা।

মানুষের জীবনে দুঃখ আছে, মোহ আছে, চাঞ্চল্য আছে, বিপদ বাধা ও বিপর্যয় আছে, পাপতাপের বিপত্তিও আছে। কিন্তু ইহাই মানুষজীবনের সব নহে, শেষ নহে। মানুষের অন্তরস্থিত অহং-প্রেম প্রচণ্ড মত্ততার মধ্য দিয়াও তাহাকে ধাপে ধাপে একটু একটু করিয়া আত্মার মহত্ত্বে অবারিত প্রশান্তির শিবমহিমায় দীক্ষিত করিয়া লয়। জীবনের কোনো স্তর, কোনো ধাপই মিথ্যা নয়; অহংও নয়। 'আমাদের জীবনের সাধনা এই যে, অহং-এর দ্বারা আমরা আত্মাকে প্রকাশ করব। যখন তা না ক'রে ধনকে মানকে বিদ্যাকেই প্রকাশ করতে চাই তখন অহং নিজেকেই প্রকাশ করে, আত্মাকে প্রকাশ করে না।' [আত্মার প্রকাশ, শান্তিনিকেতন-১ম]

শিবমানবের পথে

রবীন্দ্রনাথ তাই বলেন, আমি মিথ্যা নয়, কেননা আমিকে শ্রেয়র পথে পরিচালিত করিয়াই মানুষ আমিকে পায়।

আপন জীবন হইতেই মহাত্মা রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করিয়াছেন—মনোধর্মের সর্বোচ্চ উপাস্য প্রেমব্রহ্মের সাধনায় মানুষ যখন শ্রেয়কে লাভ করে,—অনুভূতিকে নির্মল করিয়া, ইচ্ছাকে 'বিশ্বইচ্ছার সুরে' সংযুক্ত করিয়া [ধর্ম], 'অহংকারের বৃন্ত'-আশ্রয়ে প্রেমের শত-দলটি প্রস্ফুটিত হইয়া 'গৃহ হতে সমাজে, সমাজ হতে দেশে, দেশ হতে মানবে, মানব হতে

বিশ্বাত্মায় ও বিশ্বাত্মা হতে পরমাত্মায়' [পার্থক্য, শান্তিনিকেতন-১] সমাসীন হয়, তখন জগতে অসুন্দর বলিয়া কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না, জগত ও প্রকৃতি তখন সর্বব্যাপী প্রেমসুন্দরের লীলানিকেতন বলিয়াই প্রতিভাত হইতে থাকে। তখন, কেবল তখনই মনে হয়, যে জগৎ সভায় আমরা এসেছি, এখানে রাজত্ব করবার আমাদের অধিকার, এখানে আমরা দাসত্ব করতে আসিনি। যিনি ভূমা তিনি স্বয়ং আমাদের ললাটে রাজটীকা পরিয়ে পাঠিয়েছেন। অতএব আমরা যেন নিজেকে অকুলীন বলে মাথা হেঁট করে সংকুচিত হয়ে সংসারে সঞ্চরণ না করি—নিজের অনন্ত আভিজাত্যের গৌরবে নিজের উচ্চ স্থানটি যেন গ্রহণ করতে পারি।···আমাদের আত্মা উদয়োন্মুখ সূর্যের মতো—আমাদের চিত্তগগনে তার বাধামুক্ত জ্যোতির্ময় স্বরূপে প্রকাশ পাক—তার উজ্জ্বল-চৈতন্যে তার নির্মল আলোকে আমাদের সংসার ক্ষেত্র সর্বত্র পূর্ণভাবে উদ্‌ভাসিত হক। [প্রভাতে, শান্তিনিকেতন-১]

ভাবের এই অনন্ত ঐশ্বর্যে মন যখন পরিপূর্ণ হইয়া রহে, তখন 'প্রাণের শূন্যতা' কেন না মিটিবে? কেন না পূর্ণ হইবে 'সমুদ্র হৃদয়?' কেন না গাহিব:

> বাজাও রাখাল তব সরল বাঁশরী!
> গাও গো মনের সাধে প্রমোদের গান। [কবি-কাহিনী, চতুর্থ সর্গ]

তখন মানুষকে আর কেমন করিয়াই বা তুচ্ছ মনে করিব?

> অপূর্ব আলোকে
> মানুষ দেখিছে তার অপরূপ ভবিষ্যের রূপ,
> পৃথিবীর নাট্যমঞ্চে
> অঙ্কে অঙ্কে চৈতন্যের ধীরে ধীরে প্রকাশের পালা। [জন্মদিনে-৫]

এই যে মানব শিবমানবের উজ্জ্বল চৈতন্যে 'ধীরে ধীরে প্রকাশের' পথে আসিতেছে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহারি কথা কাব্য-কাহিনী ও দর্শনচিন্তায় নানাভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। ধীরভাবে আজ এই বিষয়টি চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। বিশ্বাস করিতে হইবে, রবীন্দ্রনাথ যে সর্বজগদ্‌গত প্রেম-এর কল্পনা করিয়াছেন, পৃথিবীর মানুষই যে এই প্রেমের আধার বলিয়াছেন, তাহা জীবন-নিরপেক্ষ অথবা বস্তুবিরোধী কোনো তাত্ত্বিক মনীষা নহে, বোধাতীত কোনো অ-ব্যাপারও নহে, তাহা এই মানব-রাজ্যেরই মনোময় একটি অত্যুৎকৃষ্ট আদর্শ। এই আদর্শ সাধনার দ্বারা চরিত্রে ও জীবনে প্রতিভাত করিবেন যে মানব, রবীন্দ্রদর্শন সেই অনাগত ভবিষ্য-মানবের মহিমাদর্শন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবিতা সম্পর্কে আলোচনাকালে একবার বলিয়াছেন, তাঁহার কবিতা অসম্পূর্ণ Real এবং পরিপূর্ণ Ideal এর সম্মেলনে জন্মগ্রহণ করে। অর্থাৎ যাহা আছে তাহাকে তিনি উপেক্ষা করেন নাই, কিন্তু যাহা হইবে, যাহা না হইলে নয়, যাহা মানবের অজ্ঞাতসারে ক্রমশঃ হইয়া উঠিতেছে—তাহার কথাই তিনি বিস্তারিতভাবে

বলিতে চাহেন। কবিতার মত কবির মানবদর্শনও অসম্পূর্ণ Real ও পরিপূর্ণ Ideal-এর স্বপ্ন লইয়া উন্মেষিত বলা যায়। যে-মানুষ আজও হয় নাই, যে-মানুষ আজও ক্ষুদ্র, নানা বিভ্রান্তির অতিকৃতিতে উন্মত্ত, প্রাণোদ্ধত জিগীষা ও তামসিক ভেদবুদ্ধির হেয় অমাবস্যায় আচ্ছন্ন, অভীঃ অভীঃ—সেই মানুষের ভবিষ্যৎ অন্ধকার নহে—সেও হইবে, সে জানে না সে হইতেছে, দুঃখের মধ্য দিয়া, লোভের মধ্য দিয়া, ক্ষমতামত্ততার মধ্য দিয়া, অহংকারের মধ্য দিয়া হইয়া উঠিতেছে।

> "ওই কি দেখা যায় আমাদের চরম আশার তোরণ-চূড়া?"
> সে বলে, "না, ও যে সন্ধ্যাভ্রশিখরে
> অস্তগামী সূর্যের বিলীয়মান আভা।"
> তরুণ বলে, "থেমো না বন্ধু, অন্ধ তমিস্র রাত্রির মধ্য দিয়ে
> আমাদের পৌঁছতে হবে মৃত্যুহীন জ্যোতির্লোকে।"
> অন্ধকারে তারা চলে। [শিশুতীর্থ, পুনশ্চ]

এই অন্ধকারে, অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়া, 'প্রত্যক্ষ হইতে অপ্রত্যক্ষ' জগতের ঐশ্বর্য আহরণে মানুষ জানে না, সে চলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, মানুষের এক 'আমি আছে প্রত্যক্ষে,' আর এক 'আমি আছে অপ্রত্যক্ষে'। [মানুষের ধর্ম]। এই অপ্রত্যক্ষটির প্রকাশই হইল মানবত্বের প্রকাশ, পরমমানবের প্রকাশ। এই পরমকে জাগাইবার সাধনাই হইল মানুষের সাধনা। এই জন্য প্রেয় নহে, স্বভাবে বস্তুগতভাবে যাহা আছি তাহা নহে, সাধনার দ্বারা যাহা হইব সেই শ্রেয়-র প্রতি তাহার আকর্ষণ। এই শ্রেয় কোন্ হিসাবে শ্রেয়, এবং কোন্ প্রকারের শ্রেয়? ইহা কি স্বভাব ছাড়া? না, মানুষের স্বভাবেই আছে এই শ্রেয়। বস্তুতান্ত্রিক অহংমত্ত সাংসারিকতার পক্ষে ইহা শ্রেয়, ইহা Ideal—মানুষের ঋজু স্বভাবের সদানন্দে ইহা বস্তুগতভাবে সত্য, ইহা Real; চিত্তসাধনার এতটুকু উচ্চভূমিতে উঠিলেই ইহার অনুভব হয়। আধ্যাত্মিক মোহ বিস্তারের কল্পনাবিলাস ইহা নহে।

এই 'শ্রেয়' লইয়া একটু বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন। বস্তুতান্ত্রিক বিভ্রান্ত মানুষের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেয়োবোধ কাল্পনিক একটা শুষ্ক তত্ত্বরূপে প্রতিভাত হইতে পারে। কবি মোহিতলাল রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেয়োসাধনাকে স্বাতন্ত্র্যসাধনা আখ্যা দিয়া একমাত্র ইহা রবীন্দ্রনাথেরই, অন্য কাহারো পক্ষে সমীচীন নহে, এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। অন্যের পক্ষে ইহা "আধ্যাত্মিক মোহ" জাগরণে উদ্যত হইতে পারে এমন কথাও কবি মোহিতলাল বলিয়াছেন।*

রবীন্দ্রনাথের শ্রেয়োবোধ

* শনিবারের চিঠি, মাঘ, ১৩৫১

মোহিতলালের কথা যদি সত্য হয়, তবে রবীন্দ্রনাথের এই সাধনায় কোনো সর্বজনীনতা নাই বলিয়াই বুঝিতে হইবে। মনের নিতান্ত বস্তুস্তর হইতে দেখিলে রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেয়কে এতই উচ্চ এবং জীবনবহির্ভূত বলিয়া মনে হয় যে, মানবজীবনে ইহা কোনোকালে প্রকাশিত হইবে বলিয়া ধারণাই হয় না, সংশয় জাগে। সুতরাং উহা শুধু রবীন্দ্রনাথেরই এই বলিয়া রবীন্দ্রনাথকে হয়তো আমরা মর্যাদা দিতে চাই, কিন্তু যে সত্যটি সর্বজনগত হইতে পারে বলিয়া কবিগুরু বিশ্বাস করেন, সেই সত্যটির কোনো মর্যাদা বাড়ে না—তাহা বস্তু-অবচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ তত্ত্বরূপে পুঁথির নির্মম পত্রে কেবল জীর্ণই হইতে থাকে। অবশ্য একথা আমি বলি না যে, রবীন্দ্র-শ্রেয়োসাধনা বর্তমানের পক্ষেই সহজসাধ্য। ডক্টর সরোজ দাস মহাশয়ের কথাই সম্ভবতঃ সত্য যে, রবীন্দ্রনাথের ভাব ও সাধনা চরিত্রে বস্তুগতভাবে প্রতিভাত হইতে সহস্রাধিক বৎসর লাগিতে পারে।

এসমস্ত অনুমানের কথা থাক। এখন বিচার করিয়া দেখা যাক, ভারতীয় প্রাচীন শ্রেয়োধর্মের বিচারে রবীন্দ্রনাথের শ্রেয়োধর্ম কোন্ পর্যায়ে পড়ে। প্রাচীন পাতঞ্জল ও বৈদান্তিকদের 'শ্রেয়ে'র তুলনায় রবীন্দ্রনাথের শ্রেয় যে কতটা বস্তুস্তরে নামিয়া আসিয়াছে তাহা ধীরভাবে বিচার করিলেই বুঝা যাইবে, রবীন্দ্রনাথকে যতটা আধ্যাত্মিক মনে করিয়া দূরে সরাইয়া দিতেছি, লোককল্যাণের মহদভিলাষে ততটা পরিমাণে তিনি বস্তুতান্ত্রিক জীবনসাধক।

প্রথমেই বলিয়া রাখা ভালো, রবীন্দ্রনাথ 'শ্রেয়' শব্দের দ্বারা যাহা বুঝাইতে চাহেন, প্রাচীন নিবৃত্তিধর্মী দর্শনের ব্যাখ্যায় তাহা বুঝিতে যাওয়া সমীচীন হইবে না। রবীন্দ্রনাথের শ্রেয় বৌদ্ধদের 'নির্বাণ' নহে, শাঙ্করদিগের 'মোক্ষ' নহে—এমন কি বৈষ্ণবগণ 'রস' বলিতে যাহা বুঝেন, সেই রসও নহে। মানবের অন্তরে 'মানবিকতার মাহাত্ম্যোপলব্ধির' আদর্শই রবীন্দ্রনাথের শ্রেয়। 'দ্বিজত্বের পূর্ণ প্রকাশ' তাঁহার লক্ষ্য। এই প্রকাশতত্ত্বটি, বলা বাহুল্য, মানসবহির্ভূত কোনো তত্ত্ব-ব্যাপার নহে। রবীন্দ্রনাথের অভিমত এই যে, 'মনে যাহা পৌঁছিল না' তাহা গ্রহণের যোগ্য নহে। আত্মাকে তিনি স্বীকার করেন মনের উদয়াচলে তাহার রশ্মিরেখা দেখা যায় বলিয়া; ব্রহ্মকে তিনি সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন, মনের মধ্যে 'সে যে আসে, সে যে আসে।' এই পর্যন্ত আসিয়া আমরা যখন নিতান্ত এই বস্তুগত নিম্নাভিমুখী মন লইয়া রবীন্দ্রমনোদর্শন বিচার করিতে বসি, তখন আমাদের নিশ্চয়ই চমক লাগে; তাঁহার মানসিক এই আধ্যাত্মিকতার চরমোৎকর্ষ লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হই। বুঝিতে পারি সংসারের সুখদুঃখ আশা-নৈরাশ্যের 'অসংখ্য বন্ধনের' মধ্যে থাকিয়াও তাহা হইলে এমন মন পাওয়া সম্ভব, যাহা বোধাতীত কোনো তত্ত্ব-রহস্যের কুয়াশাজাল রচনা না করিয়াই স্পষ্টভাবে বলে: পাইয়াছি, এতটুকু অন্তত: পাইয়াছি।

কতটুকু তিনি পাইয়াছেন? প্রভূত পরিমাণেই পাইয়াছেন। বস্তুগত স্থূল জগতের বিচারে, তিনি যাহা পাইয়াছেন স্বপ্নবৎ তাহাও যেন অলীক, 'তর্ক তারে পরিহাসে'। সাম্প্রতিক সমালোচকেরাও তাই বলিতেছেন, তাহা যেন সাধনযোগ্য নহে, অল্পশক্তি মানুষের মনে তাহা 'আধ্যাত্মিক মোহ' জন্মাইবে। কিন্তু প্রাচীন যোগী, এমন কি আধুনিক একাধিক বেদান্তবাদী শ্রেয়োধর্মের যে সাধন করিয়া গেছেন, তাহার তথ্যে যদি মনোনিবেশ করি, তাহা হইলেই বুঝিব রবীন্দ্রনাথের শ্রেয়োধর্ম খুব কঠিন কিংবা অস্বাভাবিক নহে। ধ্যানী পণ্ডিতেরা নিশ্চয়ই একথা স্বীকার করিবেন যে, আচার্য শংকরের 'আনন্দ' যাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট বিজ্ঞানচৈতন্যও শ্রেয় নহে; বিজ্ঞানচৈতন্যে যাঁহারা নির্বিকল্প সমাধিলাভ করিয়াছেন, মনোব্রহ্মও তাঁহাদের নিকট 'নেতি নেতি'; মনোব্রহ্মের অত্যুজ্জ্বল রূপালোকে যাঁহারা বিশ্বে বিশ্বে ব্রহ্মৈশ্বর্য অবলোকন করেন, প্রাণব্রহ্মের উল্লাসচাপল্য তাঁহাদের নিকট অর্থহীন উদ্দাম বিলাস; প্রাণব্রহ্মের রাজসিক উদ্দীপনায় যাঁহারা নব নব সাজে সংগ্রামে নিত্য অগ্রগতিশীল, অন্নব্রহ্মের নিম্নস্তর তাঁহারা কবে যেন পার হইয়া গেছেন। শ্রেয় কি? যাহা পাইয়াছি বা যাহা পাইয়া আছি তাহা তো শ্রেয় নহে, যাহা পাই নাই, যাহার জন্য এখনও সাধনা করিতেছি, যাহা পাইলে উন্মেষিত হইব, উন্নত হইব, জাগ্রত হইব—দূর হইতে ইশারা পাইতেছি অথচ যাহা উপলব্ধির মধ্যে, আত্মার মধ্যে পূর্ণালোকে এখনও জাগে নাই কিন্তু জাগাইতেই হইবে পাইতেই হইবে,—পাওয়া না হইলে পূর্ণকে জানিব না, 'হইয়া' উঠিব না, এই ভাব—ইহাই তো শ্রেয়। অন্ন তাই প্রাণকে মনে করে শ্রেয়, প্রাণ মনে করে মনকে,—মন আবার চলে ইঙ্গিতে ইশারায় মন হইতে মনের উত্তুঙ্গ শিখরে, কখনও বা তথা হইতে আরো উর্ধ্বে সেই বিজ্ঞানচৈতন্যে। অন্নের জন্য ব্যাকুল হইয়া, প্রাণের উদ্দামতায় বিহ্বল হইয়া আজিকার 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী' যখন ফিরিতেছে এ পাশ ও পাশ'—তখন ইহার পক্ষে রবীন্দ্র-শ্রেয় অর্থাৎ "মানবিকতার মাহাত্ম্যবোধের এই মহান আদর্শ" কাল্পনিক একটা কবি-আদর্শ বলিয়া পরিত্যক্ত হইতে পারে, কিন্তু মানবকে মহান করিবার, জগৎকে স্বর্গের ন্যায় সুন্দর করিবার যে ভাবকল্পনা রবীন্দ্রনাথের শ্রেয়োধর্মে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা যে বস্তু ও জীবন বহির্ভূত কোনো তত্ত্বমাত্র নহে এ কথা যোগীদের শ্রেয়োধর্মের তত্ত্বে দৃষ্টি দিলেই উপলব্ধ হইবে।

ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ যোগী বলিতেছেন: "আমাদের ধর্ম এই তিন দিনের ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়জগৎকেই আমাদের পরম লক্ষ্য বলে না! এই কয়েক হস্ত বিস্তৃত ক্ষুদ্র পৃথিবীতে আমাদের ধর্মের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ নহে। আমাদের ধর্ম এই জগতের সীমার বাহিরে—দূরে, অতিদূরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে—যে রাজ্য অতীন্দ্রিয়, তথায় দেশ নাই, কাল নাই, সংসারের কোলাহল হইতে দূরে, অতিদূরে সেখানে গেলে আর সংসারের সুখদুঃখ স্পর্শ করিতে

পারে না; তখন সমগ্র জগৎই সেই মহিমময় ভূমার আত্মরূপ মহাসমুদ্রে বিন্দুতুল্য হইয়া যায়।" [ভারতে বিবেকানন্দ]

বর্তমান ভারতের আর একজন শ্রেষ্ঠ যোগী বলিতেছেন: "মানুষের আর একটি স্তর আছে তাহা এই মনেরও অতীত, যেখানে মানুষ আর মানুষ নয়, দেবতা। দেবতার প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞানলোকে, এখানে দুঃখের ছায়ামাত্র নাই, সুতরাং সুখদুঃখের শ্রেয়-প্রেয়ের কোনো দ্বৈত নাই—এখানে শুধু আছে আনন্দ, অনাবিল অখণ্ডিত আনন্দ। মানুষের মধ্যে তাহার এই বিজ্ঞানময় পুরুষ যখন জাগরিত হইয়াছে, সে যখন তাহার অধ্যাত্মসত্তায় প্রতিষ্ঠিত, উহারই ধর্মে তাহার অনুভূত সকল উপলব্ধি রাঙ্গাইয়া উঠিয়াছে, তখন দুঃখ একেবারে লুপ্ত হইয়াছে, দুঃখের আনন্দ বলিয়াও কোনো জিনিস আর নাই।"

[দেবজন্ম: সুখ ও আনন্দ]

রবীন্দ্রনাথও একপ্রকার 'অতীন্দ্রিয় রাজ্যে' বিশ্বাস করেন, শ্রীবিবেকানন্দর 'অতীন্দ্রিয় রাজ্যের' ন্যায় মন, দেশ ও কাল হইতে তাহা বহির্ভূত নহে। শ্রীঅরবিন্দের ন্যায় তিনিও একপ্রকার 'অনাবিল অখণ্ডিত আনন্দ' অনুভব করেন, কিন্তু ইহাকে 'মনেরও অতীত' বলিয়া স্বীকার করেন না। রবীন্দ্রনাথের শ্রেয়োধর্ম, অনেকবার বলিয়াছি, মনোধর্মে রঞ্জিত। 'সংসারের কোলাহল হইতে দূরে' যাইয়া নির্জন ব্যষ্টিগত তপস্যার জন্য তাহা উদ্যত নহে। সমষ্টির সহিত 'বিশ্বের সহিত' তিনি তাঁহার "কোনো বিচ্ছেদ স্বীকার করেন না" [আত্মপরিচয়]। ধর্ম তিনি অবশ্যই চাহেন, কিন্তু ধর্ম যদি সংসারের মধ্যে থাকিয়া, সংসারের যাবতীয় সুখদুঃখ স্বীকার করিয়া সাংসারিক জীবনকে দেবযানমার্গে টানিতে না পারে, তবে ধর্মকেও স্বীকার করিতে বোধ করি তাঁহার বাধিবে। দার্শনিক দিক হইতে তাঁহার বিরুদ্ধে যে তর্ক উত্থাপন করা অসম্ভব, তাহা বলি না, এবং এ কথাও আমি সত্য বলিয়াই অনুমান করি যে, বুদ্ধি দিয়া তিনি অবশ্যই যোগিদিগের এই বিজ্ঞানচৈতন্যের সংসার-নিরপেক্ষ ব্রহ্মসত্তা ধরিতে পারিতেন, কিন্তু মানসিক সম্যক উপলব্ধির মধ্য দিয়া তিনি যাহা পান নাই, তাহা কখনই তিনি জগতের ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করেন নাই।

> যেটুকু তোর আছে খাঁটি,
> তার চেয়ে লোভ করিস যদি
> সকলি তোর হবে মাটি। [সীমা, খেয়া]

রবীন্দ্রনাথের 'খাঁটি'টুকু এই—এই সুখে-দুঃখে শোকে-আনন্দে নিত্যচঞ্চল মানুষের মধ্যে মানবত্ব প্রকাশের মনোময় ধ্যান। তাঁহার দর্শনে ইহার বড় উচ্চ কথা বলা হয় নাই। ইহজগতে মানুষ মনের ধারণাশক্তিকে যতদূর সম্ভব উচ্চ করিয়া আপনকার অন্তরস্থিত মহত্ত্বের সীমা নির্দেশ করিতে পারে, যত গুণ, যত ঐশ্বর্য, সত্য শিবসুন্দরের যত বিভূতি, চরিত্রে প্রকাশ করিয়া উন্নত হইতে পারে, রবীন্দ্রনাথ ততদূর, বোধকরি কখনও কখনও

তাহার কিছু বেশি, স্বপ্ন দেখিয়াছেন। এই স্বপ্নসাধনার পথে অন্নময় ও প্রাণময় জীবনের যত কিছু জৈববাসনা আছে, প্রেয় হইলেও তাহা ত্যাগ করিতে করিতে তিনি চলিয়াছেন; চলার আবেগে যে আনন্দ পাইয়াছেন, মানবত্ব বিকাশের তাহা পরম সহায়ক ধারণা করিয়া সানন্দে তিনি তাহা গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রেয়োধর্মের সাধনপথে ত্যাগের প্রয়োজন; রবীন্দ্রনাথ সেইজন্য ত্যাগের উপর মুহুর্মুহু জোর দিয়া থাকেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ত্যাগ এই সংসারের মধ্যে থাকিয়াই বস্তুগতভাবে ও চিত্তগতভাবে বৃহত্তর অন্য কিছু প্রাপ্তির জন্য ত্যাগ। যোগিদের ত্যাগের সহিত, বলাই বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের ত্যাগের বিস্তর প্রভেদ। রবীন্দ্রনাথ ত্যাগ করিতে বলেন সংসারকেই প্রেমের স্বর্গভূমি করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে, যোগীরা ত্যাগ করিতে বলেন সকল শ্রেয়ের পরম শ্রেয়কে পাইয়া সংসারকে অসার ভাবিবার উদ্দেশ্যে।

শ্রেয়োসাধনার ত্যাগের আদর্শ

বিবেকানন্দ বলিতেছেন:

'যাহা কিছু দেখিতেছ—এই সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চ—অনন্তকে জানিবার এইরূপ বৃথা চেষ্টা মাত্র। যেন এই অনন্ত আত্মা নিজ মুখ দর্শনের চেষ্টা করিতেছেন, আর আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সকল প্রাণীই যেন তাঁহার মুখের প্রতিবিম্ব লইবার দর্পণস্বরূপ: এক এক করিয়া এক এক দর্পণে আপনার মুখের প্রতিবিম্ব দর্শন করিবার চেষ্টা করিয়া উহাদিগকে উপযুক্ত না দেখিয়া অবশেষে মনুষ্যদেহে তিনি বুঝিতে পারেন যে, এই সবই সসীম, অনন্ত কখন সান্তের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। তখনই পশ্চাদ্দিকে যাত্রারম্ভ, আর উহাকেই ত্যাগ বা বৈরাগ্য বলে। ইন্দ্রিয় হইতে পিছু হটিয়া এস, ইন্দ্রিয়ের দিকে যাইও না, ইহাই বৈরাগ্যের মূলমন্ত্র। যতই তুমি পশ্চাদ্দিকে ধাবিত হইবে, ততই তোমার সমক্ষে ধীরে ধীরে বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন দেহ প্রকাশিত হইতে থাকিবে, এক এক করিয়া সেগুলি পরিত্যক্ত হইবে, অবশেষে তুমি প্রকৃত যাহা, তাহাই থাকিবে। ইহাই মোক্ষ।" [ভারতে বিবেকানন্দ: বেদান্ত।]

সন্ন্যাসী দার্শনিকের শ্রেয় হইতেছে এই মোক্ষ। ইহাকে পাইতে হইলে যে ত্যাগের প্রয়োজন, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের মধ্যে, কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্যে তাহার অবস্থিতি। রবীন্দ্রনাথের ত্যাগ এই জাতীয় ত্যাগ নহে। তাঁহার শ্রেয়ও মোক্ষ নহে। সংসারের দার্শনিক তিনি, সংসারকেই পূর্ণতররূপে লাভ করাই তাঁহার শ্রেয়োধর্ম।

'ত্যাগের দ্বারা আমরা দারিদ্র্য ও রিক্ততা লাভ করি এমন কথা যেন আমাদের মনে না হয়। পূর্ণতররূপে লাভ করবার জন্যেই আমাদের ত্যাগ।

'আমরা যেটা থেকে বেরিয়ে না আসব সেটাকে আমরা পাব না। গর্ভের মধ্যে আবৃত

শিশু তার মাকে পায় না—সে যখন নাড়ির বন্ধন কাটিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়, স্বাধীন হয়, তখনি সে তার মাকে পূর্ণতরভাবে পায়।

'এই জগতের গর্ভাবরণ থেকে আমাদের সেই রকম করে মুক্ত হোতে হবে—তাহোলেই যথার্থভাবে আমরা জগৎকে পাব—কারণ, স্বাধীনভাবে পাব। আমরা জগতের মধ্যে বদ্ধ হয়ে ভ্রূণের মতো জগৎকে দেখতেই পাই নে—যিনি মুক্ত হয়েছেন, তিনিই জগৎকে জানেন, জগৎকে পান।

'এইজন্যই বলছি, যে লোক সংসারের ভিতরে রয়েছে, সেই যে আসল সংসারী, তা নয়, যে সংসার থেকে বেরিয়ে এসেছে, সেই সংসারী—কারণ, সে তখন সংসারের থাকে না, সংসার তারই হয়, সেই সত্য করে বলতে পারে আমার সংসার।'

[ত্যাগ, শান্তিনিকেতন-১]

বৈষয়িকতায় আচ্ছন্ন হইয়া যে-জগৎ অন্নময় ও প্রাণময় জীবনেই পাক খাইয়া ঘুরিতেছে —রবীন্দ্রনাথের শ্রেয়োধর্ম তাহাদেরি পথ প্রদর্শন করিতেছে বলিয়া বুঝিয়াছি। যে সংসারে আমরা বাস করিতেছি, সেই সংসারের তুচ্ছতা ও মলিনতা, হিংসা ও বিদ্বেষ, ষড়যন্ত্র ও আত্মপ্রতারণা যদি ক্রমশঃ দূরীভূত হয়, মানুষের মন যদি উচ্চতম একটি আদর্শ ধারণা করিয়া অহরহঃ কর্ম করে,—কর্ম করে, ধর্ম করার শ্রদ্ধা লইয়া, রবীন্দ্রনাথ বুঝিবেন তাঁহার আশা সার্থক হইয়াছে। 'প্রাণভরা, ভাষাহরা, দিশাহারা সেই আশা নিয়ে' রবীন্দ্রনাথ জীবনপথের পথিক। এই আশার চরিতার্থতাই তাঁহার আদর্শ।

বর্তমান যুগের নিকট শ্রেয়োবাসনার এই-ই শেষ ধাপ। মানুষের মন যত উচ্চদেশে উঠিতে পারে, যত উচ্চ আকাঙ্ক্ষা করিতে পারে, তুচ্ছকে ত্যাগ করিয়া করিয়া উচ্চকে লাভ করিবার উচ্চাভিলাষে যত নির্মল, যত নির্দগ্ধকল্মষ, যত শিবচরিত্র ও সুন্দর হইতে পারে, রবীন্দ্রনাথের মানবিক এই শ্রেয়োবাসনায় তাহার প্রকাশ আছে।

সাধারণের পক্ষে এই শ্রেয়োবাসনাকে ধারণায় আনা সহজ নহে, আমি জানি; কিন্তু ইহাও জানি, ইহাকে ধারণাগত করিতে হইলে কল্পনায় ইহারও ঊর্ধ্বে আমাদের উঠিতে হইবে। নিচুস্তর হইতে যদি দেখি, নিতান্তই নাগালের বাহিরে মনে করিয়া ইহা হইতে আমরা দূরেই কেবল সরিতে থাকিব। আকাশে উঠিয়া যদি আকাশ দেখি, আকাশ আমার নিকট নাগালের বাহিরের বস্তু বলিয়া মনে হইবে না, নিতান্তই বস্তুজগত বলিয়া বোধ হইবে। আবার আকাশ হইতে আকাশের অতীতে যদি যাওয়া যায়, তাহা হইলে আকাশকে উচ্চতম কোনো ঊর্ধ্বলোক বলিয়াই মনে হইবে না। রবীন্দ্রনাথকে যাঁহারা জীবন দিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন, দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের শ্রেয়োধর্ম প্রাণপণ আনন্দে পালন করিতে চাহেন, তাঁহাদের তাই বস্তুগত অর্থাৎ জৈবজীবনের মলিনবাসনার পটভূমে দাঁড়

রবীন্দ্রনাথের মনোদর্শন করিলে চলে না। তাঁহাদের আকাশে উঠিতে হয়। যাহা আছি তাহার চেতনা হইতে—যাহা হইতে পারি তাহারি চেতনায় চিত্তনিবেশ করিতে হয়। আমি জানি, ইহা সহজ জীবনেও অসম্ভব নহে।

যতক্ষণ রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত উচ্চস্তরের দার্শনিক বলিয়া দূরে পলাইতে থাকিব, ততক্ষণ রবীন্দ্রনাথের অমর কবিতাবলীর আনন্দচেতনার রসসম্ভোগ সম্ভব নহে,—সংসারকে সুখের স্বর্গরূপে দর্শন করিয়া, জীবনকে 'দ্বিগুণ সুন্দর' করাও সম্ভব নহে। এই কারণে মধ্যে মধ্যে আমি বেদান্তের শ্রেয়োধর্মকে চিত্তের মধ্যে আনিয়া রবীন্দ্রসাধনাকে নিতান্তই বস্তুতান্ত্রিক ভাবিতে চেষ্টা করি। বস্তুতঃ ভারতীয় প্রাচীন অধ্যাত্মসাধনায় মনের অগোচরের যে স্তর প্রাতঃস্মরণীয় যোগিবৃন্দ কর্তৃক পরীক্ষিত হইয়াছে, কল্পনাভরে সেই স্তরে উঠিলে রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেয়োবাসনাও প্রেয়োবাসনা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। 'অন্তহীন চাইতে চাওয়ার' বিচিত্র গতিবেগে রবীন্দ্রনাথের শ্রেয়োবাসনা মানবিকতার মহিমা বিকাশে অগ্রসর হইয়াছে। সাধারণের নিকট ইহা শ্রেয়, কেননা ইহাকে উপার্জন করিতে হইলে অনেক প্রকারের ত্যাগই করিতে হয়। যাহা ত্যাগসাপেক্ষ, প্রেয়ের তুলনায় তাহা শ্রেয়। কিন্তু পরম শ্রেয় কী? যোগীরা বলিয়াছেন—যাহা পূর্ণ, সকল অবস্থাতেই যাহা পূর্ণ, যাহার ক্ষয় নাই, লয় নাই, পরিবর্তন নাই। এই পূর্ণ রবীন্দ্রনাথের যতটুকু মনোগত হইয়াছে তাহা হইতেই তিনি বিচার করিয়াছেন—মানবের মধ্যে শিবমানবের বিকাশই পূর্ণত্বের বিকাশ। মানুষ জ্ঞানে, কর্মে, প্রেমে দেবোপম অর্থাৎ শিবমানব হইলেই এই পূর্ণত্বের বিকাশ হইবে। আজ কি তাহা হইয়াছি? হই নাই। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের এই পূর্ণত্ব, এই শিবমানবত্ব আমার নিকট শ্রেয়। এই শ্রেয়ের জন্য জ্ঞাতসারে, অজ্ঞাতসারে আমি অহরহঃ ত্যাগ করিয়া চলিতেছি। শৈশবের কত খেলা না কৈশোরের ঔদাসীন্যে ত্যাগ করিয়াছি; কৈশোরের কত রঙিন গল্পের গ্রন্থ যৌবনের বিজ্ঞতায় দিয়াছি ফেলিয়া; যৌবনের কত মলিন বাসনাবেগ প্রৌঢ়ত্বের প্রিয় প্রজ্ঞায় করিয়াছি ত্যাগ; প্রৌঢ়ত্বের শান্ত বিচারে আজ যাহা ত্যাগ করিতে পারা যায় না ভাবিতেছি, আরো বয়সের গুরু গাম্ভীর্যে অবশ্যই তাহা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব। জীবনটা তো ত্যাগেরই একটা বিস্তৃত ক্ষেত্র। বোধ দিয়া ত্যাগ করিতেছি অনেক, আজ যেটি একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিতেছি, কাল সেটিকে তৃণবৎ তুচ্ছ মনে করিয়া ত্যাগ করিতেছি। অন্তহীন এই ত্যাগ-স্বীকৃতির সৌজন্যেই বৃহতের প্রতি মন যায়। কিন্তু মন কতটুকু? কতদূর সে যাইতে পারে? যতটুকু শ্রেয়ের কল্পনা সে করিতে পারে ততটুকু সে যাইতে সমর্থ। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মানসিক এই শ্রেয়োবোধের পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছে।

বেদান্তের শ্রেয়োধর্ম

কিন্তু মন যেহেতু আত্মা নয়, তাই মন মনেতে আছে; মনের অতীতে অ-মনেও আছে এমন কল্পনা মন করিতে চাহে না। মন একপ্রকার অহংকার, যে তাহার বাহিরে কিছুই স্বীকার করে না, সমস্তকেই সে অধিকার করিতে চাহে। যাহা তাহার অধিকারে নাই—তাহার অস্তিত্বও নাই তাহার কাছে। যোগিগণ এইজন্য মনকে নির্মল করিয়াই ক্ষান্ত নহেন, মনের অতীতে আত্মায় আত্মা হইতে তাঁহাদের সাধনা। তাঁহারা বলেন: 'মন জড় পদার্থ, তবে উহা সূক্ষ্মতর জড়। আমাদের এই দেহ স্থূল, কিন্তু এই দেহের পশ্চাতে সূক্ষ্ম শরীর বা মন রহিয়াছে। ইহাও জড়, কিন্তু সূক্ষ্মতর; আর ইহা আত্মা নহে।' [ভারতে বিবেকানন্দ: বেদান্ত] এইজন্য, যোগীরা কহিবেন, মনের দ্বারা যাহা পাই বা চাহি, তা' পূর্ণ নহে। মানবিক শিবমানবত্বও তাই পূর্ণ নহে, পূর্ণাভাস মাত্র। যোগ-বিজ্ঞানীর নিকট রবীন্দ্রনাথের মানবিক শিবসাধনাও প্রেয়সাধনা। বোধ হয় এই দিক দিয়া বিচার করিয়াই বাঙলার কোনো কোনো দার্শনিক রবীন্দ্রনাথে শ্রেয়োবাসনা নাই বলিয়া অভিযোগ তুলিয়াছেন। [রবি-দীপিতা]

রবীন্দ্র-শিবমানব

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কি আত্মার কথা কহেন নাই? কহিয়াছেন। তবে লক্ষণীয় বিষয় এই, মানসিক তপোলোকের উচ্চ শৈল-শিখরেই রবীন্দ্র-আত্মার অভ্যুদয়। মনের স্বচ্ছতম নির্মল আলোকেই তাঁহার আত্মার সাক্ষাৎকার হয়। তাঁহার আত্মা মনোগত আত্মা। এইজন্য তাঁহার আত্মাকে বুঝিতে পারি, ধারণায় আনিতে পারি, তাহার আবেশে গানে গন্ধে প্রাণে ছন্দে দুলিতে পারি, অলোক-ইশারায় দূর পথে অগ্রসর হইতেও পারি। কতদূর পথে যাইতে পারি? মানবলোকেই যে শিবলোক, সেই শিবলোকে, শিবমানবলোকে যাইতে পারি। ইহাই গন্তব্যস্থল। ইহার জন্যই চলিয়াছি।

কিন্তু যোগীরা বলিবেন, মনের বিকার আছে, সূক্ষ্মতম মনেরও সূক্ষ্মতম একপ্রকার বিকার আছে, দ্বন্দ্ব আছে, সংশয় আছে। মন স্বয়ং পূর্ণ নয়, এইজন্য তাহার ব্যাপ্তিরও একটা সীমা আছে। মানবজীবনের অসীম সত্তার নাম আত্মা, যাহার প্রকাশ হইতেছে মনে, মনের অগোচরে বিজ্ঞানের কেন্দ্রমূলে আনন্দে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের মানসশক্তি লইয়া অতীন্দ্রিয় সত্তার দিব্যতা দর্শন একেবারে যে অসম্ভব, তাহা নহে, রবীন্দ্রসাধনাই তাহার প্রমাণ, কিন্তু সে দর্শন সম্যক দর্শন নহে। পূর্ণকে লাভ করা মনের সামর্থ্যে কুলায় না, পূর্ণকে পাওয়ার বাসনায় উদ্দীপ্ত মন সামর্থ্য মতো সাধনায় তৎপর হইতে পারে কিন্তু পূর্ণকে জানে যে আত্মা, সে 'অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ', তাহার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, ভাঁটা বা জোয়ার নাই, চাঞ্চল্যের কোনো বিক্ষেপ তাহাতে নাই। এই আত্মা 'অন্নে' আছে, 'প্রাণে' আছে, 'মনে' আছে, মনের বাহিরে 'বিজ্ঞানে'ও আছে। এই আত্মা দিয়া যখন

আত্মা পাই তখনই পূর্ণ পাই। এই 'পূর্ণ'কে শ্রেয় বিবেচনা করিয়া সংসারের যাবতীয় বাসনা—জীববাসনা, এমন কি শিববাসনা ত্যাগ করিয়া চলি। ত্যাগের গতিবেগে যখন পরম প্রিয় এই মনটিকেও ত্যাগ করিয়া দাঁড়াই তখন এই জগতে চাহিবার মত কিছুই আর থাকে না, তখন বুঝিতে পারি 'নেতি নেতির' তাৎপর্য কী। তখন মন নাই, সুতরাং প্রবৃত্তি ধর্মের যাবতীয় কার্য তখন সমাপ্ত। তখন আর গতি নয়, শান্তি; মন নয়, আত্মা। 'নেতিবাদ' হইতেছে বিজ্ঞানলোকে অধিষ্ঠিত আত্মার আনন্দ-বিজ্ঞান, ইহা কোথা হইতে কোথাও বিচ্ছিন্ন নয়, পৃথকও নয়; তবে মন দিয়া ইহাকে বুঝিতে পারা অসম্ভব। মন এই 'নেতির' মধ্যে শূন্যতা দেখিয়া শিহরিয়া উঠে, কিন্তু আত্মা জানে ইহা বিশ্বেতির আনন্দময় বিদ্যমানতা।

রবীন্দ্রমানসের বৈশিষ্ট্য

রবীন্দ্রনাথের মন এই আত্মার ইঙ্গিতালোকে উদ্ভাসিত বলিয়া কোনো কিছুর মধ্যেই তিনি 'শূন্যতা' বা 'রিক্ততা' দেখেন না। বিজ্ঞানের তুরীয় জ্যোতি বিদ্যুতের মত মধ্যে মধ্যে তাঁহার চিদাকাশ দীপ্যমান করিয়া যায়, তাঁহার মন হইয়া উঠে সূর্যকল্প ভাস্বর; এই সূর্যকল্প নির্মল মন যদি যোগীদিগের ন্যায় আত্মায় প্রবেশ করিয়া আত্মাই হইয়া যাইত, তবে জগৎ-অবচ্ছিন্ন তত্ত্বকথাই তিনি বলিতে বসিতেন। কিন্তু মন তাঁহার আত্মা হয় নাই, বরং আত্মা তাঁহার মনোগত হইয়াছে, ফলে চিদ্‌ঘন বিজ্ঞানের আভাস পাইলেও, অর্থাৎ আত্মা হইতে জ্যোতি আহরণ করিলেও, মনের টানে—এই জগতের টানে তাঁহাকে ফিরিতে হয়। 'স্বর্গ হইতে বিদায়' [চিত্রা] কবিতাটি তাঁহার এই মনের রসময় প্রকাশ। স্বর্গ হইতে বিদায় লইয়া তিনি মনোময় জগতের অধিরাজত্ব লইতে পৃথিবীর পথে নামিয়াছেন; কিন্তু স্বর্গের ছোঁয়া তো তাহাতে লাগিয়া আছে। দার্শনিক ভাষায় বলিতে গেলে বিজ্ঞানের দীপ্তি আছে তাঁহার মনের শিয়রে। তাই তো দেখি, প্রবৃত্তির বিরোধী না হইলেও নিম্নস্তরের প্রবৃত্তিগুলি যেন 'নেতি নেতি' বলিয়া তিনি ত্যাগ করিয়া চলেন। সামান্যতম প্রবৃত্তিগুলিও ছন্দে রূপায়িত করিতে তিনি কখনও কখনও চেষ্টা করিয়াছেন সত্য [কড়ি ও কোমল দ্রষ্টব্য] কিন্তু বেশ লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় তুচ্ছতম প্রবৃত্তির বন্ধন হইতে তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই উত্তীর্ণ হইয়া যান। তাঁহার কামনার গানগুলির মধ্যে "একদিকে যেমন ইন্দ্রিয়াচ্ছন্ন পরিচ্ছিন্ন প্রেমের একটি লৌকিক বিগ্রহ" দেখিতে পাওয়া যায়, "অপরদিকে তেমনি তাঁহার প্রাণস্বরূপ একটি নব চৈতন্যের উন্মেষও আমাদের চোখে পড়ে।"……"প্রমাতৃচৈতন্য নিজে অসীম, সেইজন্যেই তার মুখ দিয়ে যে সীমার আস্বাদ পাওয়া যায়, তাও অসীম হয়ে দাঁড়ায়……স্পর্শমণির সংযোগে লৌহধাতু স্বর্ণময় হয়ে ওঠে।" [রবি-দীপিতা, পৃ. ১২, ১৬] প্রবৃত্তির বিরোধী না হইলেও জগতের কোনো বস্তু বা বিষয়ে তিনি বেশিক্ষণ মন রাখিতে পারেন না, ত্যাগ ত্যাগ করিয়া

ছুটিতে থাকেন। তাঁহার কাব্যে বৈচিত্র্য দেখা দিয়াছে এই কারণে; আবার নিবৃত্তিযোগী তিনি নহেন বলিয়া এই জগৎকে একেবারে ছাড়িয়া যাইতেও চাহেন না। বিচিত্র তাঁহার মানসগঠন: থাকিয়াও থাকিতে চান না; থাকিতে না চাহিয়াও থাকিয়া যান। রবীন্দ্রমানসের এই দ্বন্দ্ব-বৈশিষ্ট্যটুকু অনুধাবন করিলেই তাঁহার কাব্য ও দর্শন অত্যন্ত সহজ ও স্পষ্ট হইয়া যাইবে। সাধারণ পাঠক রবীন্দ্রমানসের এই বৈশিষ্ট্যটুকু ধরিতে পারেন না বলিয়াই অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাকে ভুল বুঝিয়া থাকেন। আসল কথা, মনোজগতের যে স্তর হইতে তিনি চিন্তা করেন, কল্পনাভরে সেই স্তর, সেই 'লেভেল'টিতে উন্নীত না হইলে রবীন্দ্রনাথের কথাগুলি রহস্যময়তার কুয়াশায় আচ্ছন্ন বলিয়াই মনে হইবে। কিন্তু না, তাঁহাকে বুঝিতে হইবে—তাঁহার মহিমা কীর্তনের জন্য নয়, পাঠক তাঁহার নিজের চিত্তোৎকর্ষের জন্যই তাঁহাকে বুঝিবেন, খুঁজিবেন। রবীন্দ্রনাথ হইতেও আরো সূক্ষ্মস্তরে উঠিয়া নিবৃত্তিধর্মী বৈদান্তিক ও পাতঞ্জলদের দৃষ্টিতে একবার তাঁহাকে দেখিবেন; যদি দেখেন, আমি নিশ্চিত জানি, তাহা হইলে তাঁহাকে আর 'আইডিয়ালিস্ট্', 'ট্র্যান্সেন্ডেনটালিস্ট্' বা 'মিস্টিক' বলিয়া মনে হইবে না, মনে হইবে রিয়ালিস্ট্দের তিনি রিয়ালিস্ট্। তিনি পৃথিবীর, তিনি মানুষের, তিনি প্রকৃতির।

শিবত্ব ও Realism

সত্য বটে ক্লেদাকীর্ণ কুৎসিত এই বর্তমান যুগের হিংসা-দ্বেষ-কামনা-পরিপূরিত মানবের কথা তিনি বলেন নাই। অনাগত মহান যুগে প্রেমমহিমায় যিনি জাগ্রত হইবেন, উদ্যত হইবেন, অনন্ত সাধনার মাহাত্ম্যে শিবমানবে রূপান্তরিত হইবেন, সেই শিবমানবের দর্শনধ্যান রবীন্দ্রনাথ করিয়াছেন। কিন্তু এই শিবমানব কি জীবন-বহির্ভূত? ইনি কি একান্তভাবেই কবিকল্পনা? মানুষের চরিত্রে কি শিবত্ব Real নহে? মানুষ কি কেবল কাদাই ঘাঁটিতে আসিয়াছে—সুন্দর জীবনের সৌন্দর্য ভোগ করিতে আসে নাই? ক্লেদকীর্ণ কদর্য কামের কর্দমে কৃষ্ণকায় বন্য মহিষের মত পড়িয়া থাকাই মানুষের স্বভাব? শুভ্রতম জ্যোৎস্নালোকের বিমল প্রশান্তির স্বপ্ন-সুষমায় বিভোর হওয়ার মত সত্তা কি মানুষে নাই? বিদ্রোহের আস্ফালন, জিগীষার সংগ্রাম, প্রতারণার অভিসন্ধি, ক্ষুধার তাড়না—এই সবই কেবল Real—কিন্তু আত্মক্ষুধার মাহাত্ম্য, চিত্তজয়ের সংগ্রামচেতনা, প্রেমচেতনার কান্ত প্রবৃত্তি—এসব কি মানুষ-জীবনে Real নহে? ইয়োরোপীয় Realism-এর ধারণায় আমরা এতই কি অন্ধ হইয়াছি, অথবা আমাদের মধ্যে আত্মার এতই কি অধঃপতন হইয়াছে যে, এতটুকু সৎ, এতটুকু শান্তি, এতটুকু স্বপ্ন ও ধ্যান আমরা সহ্য করিব না—বলিব, 'আধ্যাত্মিক মোহ' জন্মাইবে?

ভারতীয় মতানুসারে realismকে তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক এই তিন ভাগে ভাগ করিবার প্রস্তাব আনিতেছি।

ক্ষুৎপিপাসা ও কামক্রোধের ক্রন্দন বা আস্ফালন, দুর্বল আস্তিক্য কিংবা উদ্ধত নাস্তিক্য, চাটুকারিতা বা বিদ্রোহিতা, ভিক্ষা কিংবা চৌর্যবৃত্তি যাহাতে প্রকাশ পায়—তাহা তামসিক Realism। শক্তি নাই অথচ শক্তির আস্ফালন, প্রেম নাই শুধু প্রবৃত্তির ক্ষুধা, প্রতিভা নাই অথচ প্রতিষ্ঠার মোহ, জাতি নাই কিন্তু আন্তর্জাতিকতার ঔদ্ধত্য, আদর্শ নাই অথচ সংকল্পের অহংকার যাহাতে প্রকাশ পায়, তাহা রাজসিক Realism। তুচ্ছে উচ্চ দেখিবার মহত্ত্ব, সংগ্রামী বর্তমানের সহায়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে ডাক দিবার আগ্রহ, মানুষে ভূমা এবং ভূমাতেই সুখ যাহাতে প্রকাশ পায় তাহা সাত্ত্বিক Realism।

Real-এর তিনটি স্তর

না বলিলেও চলে এই তিন স্তরই মানুষের জীবনে আছে। কোনো কোনো স্তর আছে 'প্রত্যক্ষে, কোনো স্তর আছে 'অপ্রত্যক্ষে'। জীবনের পক্ষে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ দুই-ই সত্য, দুই-ই Real। নিতান্ত নিম্নস্তরের Real লইয়া আমরা মাতামাতি করি বলিয়া বৃহত্তর রাবীন্দ্রিক Realকে Ideal ভাবিয়া আমরা দূরে পলাই। কিন্তু না, নাম লইয়া বৃথা বাক্‌যুদ্ধ করিতে আমি প্রস্তুত নই। আমি যাহা Real বলিয়া তৃপ্তি পাইতেছি, যদি কেহ তাহাকে Ideal নামে অভিহিত করিয়া খুসি হন, আমি আপত্তি করিব না, কিন্তু ইহাকে স্বভাব-বহির্ভূত কোনো রহস্যময় Ideal বলিয়া কেহ যদি মনে করিয়া থাকেন, তবে নিশ্চয়ই আমি তাহার প্রতিবাদ করিব। রবীন্দ্রনাথ যে শ্রেয়োধর্মের কথা বলিয়াছেন, তামসিক বা রাজসিক Real-এর স্তর হইতে তাহা বিচার করিতে গেলে নিশ্চয়ই তাহা Ideal রূপে গণ্য হইবে, কিন্তু সাত্ত্বিক Real-এর ধারণা যাঁহার একটুকু হইয়াছে তিনিই বলিবেন—রবীন্দ্রনাথের শ্রেয় অত্যন্ত সুন্দর, কেন না ইহা সুগম এবং সুবোধ্য : স্বভাবের বৃন্তটি আশ্রয় করিয়া স্বভাবেরি সহস্র দলরূপে ইহা বিকশিত হইয়া উঠে।

বলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ :

'প্রবৃত্তির প্রেরণায় আমরা যা' করি সেই প্রেয়ের ইচ্ছা মানুষের স্বভাবে বর্তমান আবার যা ইচ্ছা করা উচিত সেই শ্রেয়ের ইচ্ছাও মানুষের স্বভাবে। শ্রেয়কে গ্রহণ করার দ্বারা মানুষ কিছু একটা পায় যে তা নয়, কিছু একটা হয়। সেই হওয়াকে বলে সাধু হওয়া। তার দ্বারা ধনী হয় না, বলী হয় না, সমাজে সম্মানিত হতেও পারে, না হতেও পারে, এমন কি অবমানিত হওয়ার সম্ভাবনাও যথেষ্ট। সাধু হওয়া পদার্থটা কী, প্রকৃতির রাজ্যে তার কোনো কিনারা নাই। শ্রেয় শব্দটাও তেমনি। অপর পক্ষে প্রেয়কে একান্তরূপে বরণ করার দ্বারা মানুষ আর একটা কিছু হয়, তাকে উপনিষদ বলছেন আপন অর্থে হীন হওয়া। ...একান্তভাবে প্রেয়কে অবলম্বন করলে মানুষ বলতে যা বোঝায় সেই সত্য হীন হয়ে যায়। নিজের মধ্যে সর্বকালীন বিশ্বভূমীন মনুষ্যধর্মের উপলব্ধিই সাধুতা, হীনতা সেই মহামানবের

উপলব্ধি থেকে বিচ্যুত হওয়া। প্রাকৃতিক স্বভাবের উপরেও মানুষের আত্মিক স্বভাব যদি না থাকত, তাহলে এসব কথার অর্থ থাকত না। [মানুষের ধর্ম]

শ্রেয় ও প্রেয় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উপর্যুক্ত উক্তি কয়টি ধীরভাবে অনুধাবন করিলেই বুঝা যাইবে রবীন্দ্রদর্শনের মূল কথা কী। মানবপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত সত্যশিবসুন্দরের উদ্বোধনই রবীন্দ্রদর্শনের প্রতিপাদ্য। স্বভাবকে অস্বীকার করিয়া নয়, স্বভাবের মধ্যেই যে শক্তি রহিয়াছে, জ্যোতি রহিয়াছে, যে 'মহামানব' রহিয়াছে, ধীরে ধীরে ত্যাগের দ্বারা, কর্মের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা তাহাকে উদ্বোধিত করাই রবীন্দ্রনাথের আদর্শ।

স্বভাবের বিকাশ ও শিবচেতনার উদ্বোধন

কী গাহিবে, কী শুনাবে! বলো, মিথ্যা আপনার সুখ,
মিথ্যা আপনার দুঃখ। স্বার্থমগ্ন যেজন বিমুখ
বৃহৎ জগত হতে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।
মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যরে করিয়া ধ্রুবতারা,
মৃত্যুরে না করি শঙ্কা। দুর্দিনের অশ্রুজলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি—তারি মাঝে যাব অভিসারে
তার কাছে, জীবন সর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি। কে সে ?

মানবচিন্তাতীত বোধাতীত নির্বিকল্প কোনো চৈতন্যব্রহ্ম এই 'কে' নহে, এই 'কে' আমারি স্বভাবে নিহিত 'মানবিকতার মাহাত্ম্যবোধ'। ক্রমশঃ ইহা উন্মেষিত হইতেছে, ধ্যানে ইহা জানিতে পারি, কর্মে ইহারই প্রতিভার ছায়া পড়ে, বোধে ইহারই আনন্দ সহস্র স্বপ্নে রঙ্গীন হইয়া উঠে। অন্তরের এই বোধ বিধাতার আকর্ষণেই—

রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর-প্রদীপখানি। [এবার ফিরাও মোরে, চিত্রা]

এই যে প্রদীপ, ইহা স্বভাবেরি প্রদীপ, স্বভাবেরি সচ্চিদানন্দের উজ্জ্বল আলোক শিখা। এই আলোকে মানুষকে যখন দেখা যায়, প্রাত্যহিক সংসারের নগণ্য মানুষ বলিয়া আর তাহাকে চেনা যায় না। মনে হয়,

অমরাবতীর শিশু নেমে এল
মর্ত্যের ধূলি নিয়ে
স্বর্গ স্বর্গ খেলতে। [বাঁশী, লিপিকা]

বিয়ে বাড়ীতে উৎসবের যখন বাঁশি বাজে, চারিপাশের পরিবেশ সুরে সুরে গানে গানে ছন্দে আনন্দে ভরিয়া যায়। উৎসবের দৃষ্টিতে যখন সংসারের দিকে চাহিয়া দেখি, দৈনন্দিন গৃহজীবনের খণ্ড ক্ষুদ্র তুচ্ছতাগুলি আর চোখে পড়ে না, তখন ভুলিয়া যাই 'গোপন অতৃপ্তি, গভীর নৈরাশ্য, অবহেলা অপমান অবসাদ, তুচ্ছ কামনার কার্পণ্য, কুশ্রী নীরসতার কলহ, ক্ষমাহীন ক্ষুদ্রতার সংঘাত, অভ্যস্ত জীবনযাত্রার ধূলিলিপ্ত দারিদ্র্য।' [বাঁশী, লিপিকা] আবার যে চেনা মেয়েটিকে ঘেরিয়া এত গান, এত সুর, এত আনন্দ, এত পুষ্প সমারোহ, উৎসবের পরিবেশে নবজীবনোন্মেষের পটভূমে সেই নিতান্ত চেনা মেয়েটিই কি অচেনা কোনো স্বপ্নজগতের সৌন্দর্যের রাণী হইয়া দেখা দেয় না? এই রাণীত্ব কি মিথ্যা?

সুরের ভিতর দিয়ে তাকে
সংসারের মানুষ বলে
আর চেনা গেল না।
সেই চেনাঘরের মেয়ে
অচিন ঘরের বৌ হয়ে দেখা দিলে।
বাঁশি বলে, এই কথাই সত্য। [তদেব]

কিন্তু সংসারও কি এই কথাকে সত্য বলে না? ইহা কি অসম্ভব কোনো কবিত্ব অথবা সত্যাতীত কোনো তত্ত্ববাণী, কিংবা ইহা কি মায়া? মায়া বলিয়া ইহাকে যাহারা উড়াইয়া দিতে চাহেন, তাঁহারা যে সুরের তত্ত্বকে জানেন, তাহা নির্বিকল্প আনন্দে আনন্দ হওয়ার আদর্শকেই সত্য বলিয়া মানে। 'নিজের সত্তাসীমাকে বিলুপ্ত করে অসীমে অন্তর্হিত হওয়ার' [মানুষের ধর্ম] তত্ত্বে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস নাই। বৈষয়িকতার বন্দিত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিয়া ইহলৌকিক জীবনেই মানসিক অধ্যাত্মসম্ভূতির ভূমানন্দ আস্বাদে রবীন্দ্রনাথের অভিরুচি। এইজন্য রবীন্দ্রনাথের 'মানব' 'না বস্তুতে গড়া, না তত্ত্বে' [গল্প, লিপিকা]। বস্তুর বৈষয়িকতার কোনো বিশেষত্ব রবীন্দ্রনাথের মানুষের নাই, যেমন নাই অবাঙ্‌মনসোগোচর তত্ত্বের নির্বিশেষ কোনো নির্বিকার 'আনন্দ'।

রবীন্দ্র-মানব

রবীন্দ্রনাথের মানব-তত্ত্ব তুরীয়-তত্ত্ব ও বস্তুতত্ত্বের মধ্যবর্তী এক সুগম তত্ত্ব। এইজন্য সত্তার বিলুপ্তি নহে, স্ফূর্তিই তাঁহার বিচারে আত্মসাধক। খণ্ডক্ষুদ্র নগণ্য জীবনেও মানসিক এই আত্মবোধের ভূমাস্বাদ কখনও ত্যাগের মধ্য দিয়া, কখনও প্রেমের মধ্য দিয়া, কখনও বা বিচ্ছেদ-বিরহের মধ্য দিয়া অনুভব করিতে করিতে আমরা চলি। এই ভাবেই আমাদের আত্মস্ফূর্তি ঘটে। এইভাবেই ক্রমশঃ তুচ্ছ হইতে উচ্চে সমাগত হইয়া 'মানবিকতার মাহাত্ম্যের' আমরা সন্ধান জানি। ইহা স্বপ্ন নহে, মায়া নহে, মতিভ্রম নহে, কবিকল্পনার ইন্দ্রজালও নহে, ইহা Real, ইহা স্বাভাবিক। দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ

বলিবেন, ইহার কথাই তিনি সত্য বলিয়া জানেন। "অভ্যস্ত জীবনযাত্রার ধূলিলিপ্ত দারিদ্র্যের' মধ্যে যে মানুষকে অহরহঃ দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ তাহাকেই শুধু বাস্তব বলিয়া স্বীকার করিবেন না। পরন্তু নগণ্য সেই মানুষটির গোপন আত্মার অতলে আজও অপরিস্ফুট যে মহিমামণিটি সম্ভূতির অপেক্ষায় রহিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ তাহাও বাস্তবের ন্যায় সত্য বলিয়া জানিবেন। কহিবেন—মানুষ 'বস্তু'তে গড়া নহে, তাহাকে তাই ভাবের স্বর্গে যাইতেই হয়; কহিবেন—মানুষ 'তত্ত্বে' গড়া নহে, তাহাকে তাই 'স্বর্গ স্বর্গ' খেলিবার জন্য' নিঃসীমে না গিয়া 'মর্তের ধূলির' উপরেই নামিতে হয়। শক্তির কবি রামপ্রসাদের 'মানব' 'মানবজমীনে আবাদ করিয়া সোনা' ফলাইবার স্বপ্ন দেখিবেন, পৃথিবীর কবি রবীন্দ্রনাথের 'মানব' মর্ত্যের মাটিতে 'সোনার ধান' ফলাইবার সাধনা করিবেন। রামপ্রসাদের 'সোনা' চিত্তবৃত্তি নিরোধের কঠিন তত্ত্বখনি হইতে উত্থিত হইবে, রবীন্দ্রনাথের 'সোনার ধান' চিত্ত-প্রকৃতির স্নিগ্ধসজল মৃত্তিকার উর্বরতা হইতে প্রাণ পাইবে। জীবপ্রকৃতির উচ্ছেদের কথা রবীন্দ্রনাথ কোথাও কোনোভাবে বলিবেন না, জীবপ্রকৃতিকে শিবপ্রকৃতিতে রূপান্তরিত করার উপদেশই প্রাধান্যলাভ করিয়াছে তাঁহার দর্শনে। মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় প্রবৃত্তি উচ্ছেদে তাঁহার আস্থা নাই [মহাত্মার ব্রহ্মচর্য দ্রষ্টব্য], মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রের 'উচ্ছেদ নয়, দমন'—এই তত্ত্বেও তিনি আস্থা স্থাপন করিবেন কি না সন্দেহ; 'দমন' কথাটির পরিবর্তে সম্ভবতঃ তিনি বলিবেন 'রূপান্তর'। রামকৃষ্ণদেবের কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের কথা বিশেষভাবে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে; রামকৃষ্ণ ছিলেন নিবৃত্তিপন্থী, পরমসাধক। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই, তিনিও বাসনাকে উচ্ছিন্ন করা অপেক্ষা রূপান্তরিত করিবার উপরই অনেক সময় জোর দিতেন। কাম কি করিয়া দূরীভূত হইতে পারে এই প্রশ্নের উত্তরে রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "ওটাকে অন্যদিকে মোড় ফিরিয়ে দাও"। [ব্রহ্মানন্দ সংগৃহীত ধর্মপ্রসঙ্গ] কিন্তু এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে, রবীন্দ্রদর্শন রামকৃষ্ণদেবের ধর্মদর্শনের ন্যায় নিবৃত্তিপন্থী নহে, প্রবৃত্তিপন্থী, যদিও তামসিক ও রাজসিক বস্তুবাদিদিগের বিচারে রবীন্দ্রনাথের প্রবৃত্তিপন্থা প্রচ্ছন্ন নিবৃত্তিধর্ম নামে আখ্যাত হইলেও হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথকে যখন প্রবৃত্তিমুখী বলি, তখন চার্বাকপন্থী প্রবৃত্তি-প্রকৃতিকে নিশ্চয়ই মনে আনি না; তাঁহাকে যখন মানবমুখী বলা হয়, তখন ইয়োরোপীয় Humanism-এর উপমায় তাঁহাকে বুঝিতে যাই না। তাঁহার প্রবৃত্তি জীবপ্রকৃতির 'স্বভাবপ্রবৃত্তি' হইতে সমুদ্ভূত বটে, কিন্তু শিবচেতনায় 'সাধনপ্রস্তুতি' পথে তাঁহার অভিসার। প্রেম নহে, মনোময় মানবিক শ্রেয়েতে তাঁহার অভিযাত্রা। 'আপনাকে সকলের মধ্যে যে উপলব্ধি করে, সেই হয় প্রকাশিত'। [শিক্ষার মিলন, কালান্তর] এই 'প্রকাশিত' হওয়ার শ্রেয়োবাসনায় তাঁহার আত্মসাধন। 'সম্ভূতি' বা অভিব্যক্তি তাঁহার আদর্শ। সত্যশিবসুন্দরের ঐশ্বরিক বিভূতিগুলি চিত্তে ও চরিত্রে প্রতিভাত করার এই প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে আছে বলিয়াই তিনি মানবমুখী। ধ্যানের ও প্রজ্ঞার সহায়তায় যে মানব স্বভাবের মধ্যেই ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিয়াছে, ব্রহ্মের গুণাতীত রহস্য এবং গুণসমন্বিত ঐশ্বর্য

আত্মবোধের অসীমতা হইতেই উপলব্ধি করিয়া জীবজীবনের আদর্শকে করিয়াছে সুখাশ্রয়ী নয়, ভূমাশ্রয়ী, সেই মানবের চিত্ত ও চরিত্রের তত্ত্বানুশীলনই রবীন্দ্রমানসের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মাপেক্ষা মানবকেই উচ্চাসন দিয়াছেন। ব্রহ্মই সত্য, ব্রহ্মই জীবনের সর্বোত্তম আদর্শ। কিন্তু এই আদর্শ, রবীন্দ্রনাথ বলিবেন, মানুষই প্রজ্ঞা-চেতনায় আবিষ্কার করিয়াছে, তাহার পর আত্মচেতনলব্ধ সেই আদর্শানুসারে জীবজীবনকে ব্রহ্মগত, রবীন্দ্র-ভাষায় 'সর্বজগদ্‌গত', করার প্রচেষ্টায় সাধনায় নিরত হইতেছে; 'সঃ' বা সেই 'আদর্শ' এখনও হয় নাই, হইতে যাইতেছে বলিয়াই তাহার মর্যাদা। রবীন্দ্রদর্শন বা কাব্যের বৈশিষ্ট্য মানবমুখিতা বটে, কিন্তু তাঁহার মানব এই 'সঃ' আশ্রয়ী' বলিয়াই তিনি মানবমুখী। ভূমাবোধ বা শ্রেয়োবোধের সম্পদ হইতে যে মানুষ বঞ্চিত, রবীন্দ্রমানব সে মানব নহে। এই কারণে ইয়োরোপীয় মানবমুখিতা হইতে রাবীন্দ্রিক মানবমুখিতা বহুক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বিশ্বঐক্যবোধ লইয়া যে মানব মনোলোকে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, বস্তুলোকে চর্মচক্ষে যে আজও প্রতিভাত হয় নাই অথচ সামান্যতম ত্যাগে যাহার ইশারা মেলে, তুচ্ছতম অর্থহীন গানের সুরে যে 'আসে' বলিয়া চিত্ত রোমাঞ্চিত হয়, অকারণ অবারণ চলার গতিবেগে আকস্মিক যাহার ছন্দে প্রাণমন পুলকিত হইয়া উঠে, ধ্যানে যাহাকে দেখি, ধারণায় যাহার সাধন করি, বাসনায় যাহাকে প্রেমবেদী-মূলে বসাইয়া পূজা দেই, রবীন্দ্রনাথ সেই মর্মমোহন মানববিগ্রহের ধর্মসুন্দর কান্ত পুরোহিত। ব্রহ্মস্বরূপ বিশ্ববৈপরীত্যের যে সমন্বয়তত্ত্ব বৈদান্তিকেরা ধারণা করিয়াছেন তাহারি আদর্শ মনের দ্বারা গ্রহণ করিয়া, জ্ঞানে প্রেমে ও কর্মে প্রতিভাত করিয়া যে মানব আত্মার মধ্যে পরাত্মা এবং পরাত্মার মধ্যে আত্মার মহিমা উপলব্ধি করিবে, রবীন্দ্রনাথের মানুষ সেই 'মানব'। সর্বকালীন বিশ্বভূমীন আত্মমহিমায় প্রতিষ্ঠিত এই মানব, এই 'পরম-মানব' প্রত্যক্ষে জীবপ্রকৃতি : বস্তুমানব; অপ্রত্যক্ষে শিবপ্রকৃতি : মনোব্রহ্ম। মনো-ব্রহ্মের মহিমাসম্ভূত নিত্যসাধনতৎপর মানববৈরাগীর শিবস্বভাবে অসত্য অনিয়ম বা কুৎসিতবৃত্তি কিছু নাই, কেননা তাঁহার স্বভাব প্রেমপ্রভাবে সামঞ্জসীকৃত। তাঁহার ললাটে মনোময় 'সোঽহম্'-তত্ত্বের বিচিত্র তিলক, হৃদয়ে তেজোময়োঽমৃতময় প্রেম, মস্তিষ্কে প্রেমতত্ত্বানুসারী তর্কবিমুখ সিদ্ধার্থ বুদ্ধি, হস্তে কল্যাণাচারী নিরলস বিশ্বকর্ম, চরণে 'অনাগারিক' যৌবনসাধনার সমুচ্ছল গতিনর্তন।*

মানবের এই যে রূপ, বস্তুতান্ত্রিক তর্কদর্শন ইহার বিমুখতা যে করিবে না, তাহা বলি না। প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকেই যাঁহারা একমাত্র সত্য ও মূল্যবান বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের নিকট এই রূপ কবিকপোলকল্পিত বলিয়া অভিহিত হইলেও হইতে পারে। জীবপ্রকৃতির মধ্যে যে হিংসা, যে দ্বেষ, যে আলস্য ও যে আসক্তি অহরহঃ আমরা লক্ষ্য করিতেছি, পাপ ও প্রবঞ্চনার পাশবিকতায় মানুষকে যেভাবে নিমগ্ন রহিতে দেখিতেছি,

* 'মানুষের ধর্ম' হইতে এইরূপ পরিকল্পিত হইয়াছে।

তাহাতে রবীন্দ্রকল্পিত এই মানবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান না হওয়াই অস্বাভাবিক। জীবপ্রকৃতির এই 'মানুষ-জন্তু'কে রবীন্দ্রনাথ যে দেখেন নাই, তাহা নহে—

ক্ষুব্ধ যারা, লুব্ধ যারা,
মাংসগন্ধে মুগ্ধ যারা, একান্ত আত্মার দৃষ্টিহারা
শ্মশানের প্রান্তচর, আবর্জনাকুণ্ড তব ঘেরি
বীভৎস চীৎকারে তারা রাত্রি দিন করে ফেরাফেরি,
নির্লজ্জ হিংসায় করে হানাহানি।
শুনি তাই আজি
মানুষ-জন্তুর হুহুংকার দিকে দিকে উঠে বাজি। [জন্মদিন, সেঁজুতি]

অন্যত্র—

দুঃখ পেয়েছি, দৈন্য ঘিরেছে, অশ্লীল দিনে রাতে
দেখেছি কুশ্রীতারে,
মানুষের প্রাণে বিষ মিশায়েছে মানুষ আপন হাতে,
ঘটেছে তা বারে বারে। [পত্রোত্তর, সেঁজুতি]

চিত্রার একটি কবিতায়—

কোথা হতে ধ্বনিছে ক্রন্দনে
শূন্যতল? কোন্ অন্ধকারা মাঝে জর্জর বন্ধনে
অনাথিনী মাগিছে সহায়? স্ফীতকায় অপমান
অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান
লক্ষ মুখ দিয়া। বেদনারে করিতেছে পরিহাস
স্বার্থোদ্ধত অবিচার; সঙ্কুচিত ভীত ক্রীতদাস
লুকাইছে ছদ্মবেশে। [এবার ফিরাও মোরে]

'পরিশেষে'—

আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রিছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে।
আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে। [প্রশ্ন]

তাঁহার বালক বয়সের একটি কবিতায়ঃ

যা দেখিছ, যা দেখেছ, তাতে কি এখনো
সর্বাঙ্গ তোমার গিরি ওঠে না শিহরি?
কি দারুণ অশান্তি এ মনুষ্যজগতে—
রক্তপাত, অত্যাচার, পাপ, কোলাহল
দিতেছে মানবমনে বিষ মিশাইয়া। [কবিকাহিনী, চতুর্থ সর্গ]

জীবপ্রকৃতির স্থূলধর্মের অস্তিত্বে, একাধিকবার বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ অবিশ্বাস করেন নাই। প্রত্যক্ষকে তিনি কখনই অস্বীকার করিবেন না। তবে তাঁহার কথা এই, প্রত্যক্ষটুকু লইয়াই জীবজীবন সম্পূর্ণ নহে, সত্য নহে। "অহং-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ যে জীবন," রবীন্দ্রনাথ বলিবেন, 'সেটা মিথ্যা'। নানা অতিকৃতি, নানা দুঃখ, নানা বিপর্যয় জড়াইয়া আছে অহং-বন্দী তুচ্ছ জীবনে। "তারা জীয়ন-মরা; তাদের নিঝুম বসতি বোবা সমুদ্রের বালুর ডাঙায়"। [চিরযাত্রী, শ্যামলী]। অন্তহীন তাহাদের দুর্গতি, অবর্ণনীয় তাহাদের 'শাস্তি'।

শাস্তি? শাস্তি তারি তরে
যে পারে না শাস্তিভয়ে হইতে বাহির
লঙ্ঘিয়া নিজের গড়া মিথ্যার প্রাচীর—
কপট বেষ্টন; যে নপুংস কোনোদিন
চাহিয়া ধর্মের পানে নির্ভীক স্বাধীন
অন্যায়েরে বলে নি অন্যায়; আপনার
মনুষ্যত্ব, বিধিদত্ত নিত্য-অধিকার
যে নির্লজ্জ ভয়ে লোভে করে অস্বীকার
সভামাঝে; দুর্গতির করে অহংকার;
দেশের দুর্দশা লয়ে যার ব্যবসায়,
অন্ন যার অকল্যাণ মাতৃরক্ত-প্রায়;
সেই ভীরু নতশির, চিরশাস্তিভারে
রাজকারা-বাহিরেতে নিত্য কারাগারে। [নমস্কার, সঞ্চয়িতা]

অহংবন্দী 'নপুংস' জীবনের যে চিত্র উপর্যুক্ত কয়েকটি পংক্তিতে চিত্রিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া যে মানুষের লজ্জা জাগে না, রবীন্দ্রনাথের 'মানব' সে মানুষ নহে। অহং আপনাকে মলিন দেখিয়া যখন আত্মার আলোকে অভিস্নাত

হইতে চাহে, তখনই তাহার নূতন জীবন লাভ হয়, নূতনরূপে তখনই তাহার দ্বিতীয়বার জন্ম হয়। [রবীন্দ্রনাথের 'Second Birth' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য] রবীন্দ্রদর্শন এই 'দ্বিজত্বের' মহিমোপলব্ধির বাস্তবদর্শন, মানবধর্মের যে গভীর সত্য গোপনে অপ্রত্যক্ষে নিহিত আছে, তাহাকে শ্রেয়োবাসনা ও আনন্দ-সাধনার দ্বারা প্রকাশপথে আনয়ন করার সত্যদর্শন। এই 'দর্শনের' মাহাত্ম্যে ধ্যানের দৃষ্টিতে যে মানবের সাক্ষাৎ পাই, তাহাকে মানব বলি না, বলি 'মানবব্রহ্ম'। 'বহিরিন্দ্রিয়ের ও অন্তরিন্দ্রিয়ের যত কিছু গুণ, তার আভাস তার মধ্যে' [মানুষের ধর্ম], এইজন্য সে মানব; আবার নিরাসক্ত আনন্দমহিমার প্রেমকান্ত কল্যাণকামনা তাহার আত্মায়, এইজন্য সে মানব হইয়াও ব্রহ্মাংশ। অর্থাৎ একদিকে মানব, তাহার ভোগলিপ্সা, তাহার বৈষয়িকতা, তাহার জীবপ্রকৃতি; আর অন্যদিকে ব্রহ্ম, তাহার ত্যাগ, তাহার প্রেম, তাহার মনোময় সর্বব্যাপিত্ব, শিবমহিমায় সম্ভূত হওয়ার আদর্শে তাহার তপস্যা, তাহার বিশ্বপ্রকৃতি। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রমতে, আপনাকে এই বিশ্বপ্রকৃতিতে অর্থাৎ বৃহতে উপলব্ধি করাই সত্য, অহংসীমায় অবরুদ্ধ জানাই অসত্য। "ব্যক্তিগত দুঃখ এই অসত্যে" [মানুষের ধর্ম]। ইহার এই অর্থ নহে যে, অহংটাই মিথ্যা। অহংকে আত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলেই তাহা মিথ্যা, কিন্তু অহং যখন আত্মায় জাগরিত হইবার সাধনায় সচেষ্ট, তখন তাহা রিপু নহে, মায়াও নহে, তাহা চৈতন্যমন্দিরের প্রবেশ-পথ। রবীন্দ্রদৃষ্টিতে অহং আত্মারই অংশ মাত্র, যেমন খণ্ডাকাশ বিশ্বাকাশেরই অংশ। 'বিশ্বব্যাপী আকাশে ও খণ্ডাকাশে যে ভেদ অহং ও আত্মার মধ্যে সেই ভেদ' [মানুষের ধর্ম]। 'অন্তরে অন্তরে জীবমানব বিশ্বমানবে প্রসারিত, সেইদিকে সে সুখ চায় না, সে সুখের বেশি চায়, সে ভূমাকে চায়' [মানুষের ধর্ম]। এই ভূমার মহিমাকে সার্থক করিবার অভিলাষেই জীবমানবের সাধনগতি।

জীবমানবের সাধনগতি

এই সাধনগতিটিকে না জানিলে রবীন্দ্র-কবিতার প্রাণস্পন্দন অনুভব করা অসম্ভব বলিয়াই আমি মনে করি। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রায়ই দেখি, অনির্দিষ্ট কোনো অসীম জীবনের অভিসারে তিনি চলিয়াছেন, যাহা আছি তাহা হইতে 'পেরিয়ে চলার' বাণী অহরহঃ গুঞ্জরিত হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের সুর-সেতারায়—

ওরে চিরপথিক,
করিস্ নে নামের মায়া,
রাখিস্ নে ফলের আশা,
ওরে ঘরছাড়া মানুষের সন্তান।

কালের রথচলা রাস্তায়
বারে বারে কারা তুলেছিল জয়ের নিশানা
বারেবারে পড়েছে চুরমার হয়ে
মানুষের কীর্তিনাশা সংসারে।
লড়াইয়ে-জয়-করা রাজত্বের প্রাচীর
সে পাকা করতে গেছে ভুল সীমানায়।
সীমানা-ভাঙার দল ছুটে আসছে
বহু যুগ থেকে
বেড়া ডিঙিয়ে, পাথর গুঁড়িয়ে,
পার হয়ে পর্বত,
আকাশে বেজে উঠছে নিত্যকালের দুন্দুভি,
—'পেরিয়ে চলো।
পেরিয়ে চলো।' [চিরযাত্রী, শ্যামলী]

এই 'পেরিয়ে চলার' বাণী কি কবিত্ব মাত্র? মানুষের বাস্তবজীবনে ইহার কি কোনো যোগ নাই? রবীন্দ্রনাথকে যে আমাদের ভালো লাগে, তাঁহার কথার সুর-ধ্বনির মধুর ঝংকারে আমাদের অন্তর যে আনন্দ-মন্থর হইয়া উঠে—ইহাতেই কি প্রমাণ পাই না যে, রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন শুধু রাবীন্দ্রিকই নহে, তাহা মানবিক, তাহা বাস্তবজীবনের সুরে সুর মিলানো? যদি বলা হয়, শ্রেষ্ঠ কবির মাহাত্ম্যই এই যে, তিনি কল্পকথার ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া মানুষকে মুগ্ধ করেন, স্তব্ধ করেন—তাই যাহাতে মুগ্ধ বা স্তব্ধ হই, তাহা যে বস্তুর মত সত্য, তাহা মনে করিবার কোনো কারণ নাই, এই যুক্তির বিরুদ্ধে একাধিক উক্তি আমরা প্রয়োগ করিতে পারি। আধুনিক যুগপ্রভাবে প্রভাবিত হইয়া রবীন্দ্রনাথকে যাঁহারা স্বপ্নবাদী বা আদর্শবাদী বলিয়া খুশী রহেন, তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা যাহা আছেন, তাহাই কি চিরকাল রহিতে চান? তাঁহাদের স্বপ্নে, তাঁহাদের সংকল্পে, তাঁহাদের গহীন চিত্তের গোপন অন্তঃপুরে এমন একটি 'অনাগত' কি নাই, যে আভাসে ইঙ্গিতে অহরহঃ তাঁহাদের দুলাইতেছে, ভুলাইতেছে, বলিতেছে: 'পেরিয়ে চলো, পেরিয়ে চলো'? আদর্শ আপনার যাহাই হউক না কেন, আপনি রাজনীতিবিদ্ হউন, সাহিত্যিক হউন, সমাজবেত্তা হউন, অথবা ধার্মিক হউন, অর্থনীতিবিদ্ হউন, দার্শনিক হউন, অথবা বৈজ্ঞানিক হউন—জীবনে যাহা লইয়াই আপনি থাকুন না কেন, আপনার আপন ক্ষেত্রে পেরিয়ে চলার বাণী কি সত্য এবং বাস্তব নহে? মানুষ কি কোনোদিন কোনো কালে অল্পে তুষ্ট থাকিতে পারিয়াছে? আপনকার মনোমত কোনো আদর্শের 'অনাগতে'

তাহার কি মন নাই? অজানায়, অচেনায়, অদেখায় তাহার কি নিত্য অভিসার নহে? নিতান্ত দরিদ্র ব্যক্তি কি ঐশ্বর্যের স্বপ্ন দেখিবে না? নিতান্ত স্বার্থমগ্ন মানুষও কি সময়ে অসময়ে পরার্থের পরম ইশারায় উঠিবে না ব্যাকুল হইয়া? ফাল্গুন যে ঘরে কোনোদিন আসিল না, বসন্তের মধুপ গুঞ্জন যে ঘরে স্বপ্নের মত অলীকই রহিয়া গেল, সেই ঘরে, সেই দুঃখ-দগ্ধ বিমর্ষ ঘরের ভগ্ন খাটিয়ার উপর বসিয়া যে মানুষটি দিনগত পাপক্ষয় করিতেছে, সে কি মুহূর্তের জন্য নীলাকাশের দিকে তাকাইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাসটুকুও ফেলিবে না? রজনী-গন্ধার কোনো উন্মাদ সৌরভ যদি কোনোদিন তাহাকে ব্যাকুল উন্মনা করিয়া তোলে তবে তাহা কি অবাস্তব কোনো দুর্ঘটনা মনে করিব? কবির বাণী হইতে যদি সুপ্ত আত্মার নির্মল সত্তাটুকু জাগিয়া উঠে, অথচ বাস্তব পরিবেশের সহিত বাহ্যতঃ তাহার মিল নাই দেখিয়া যদি রুষিয়া উঠি, তবে আমার রোষোদ্দীপ্ত উদ্ধত স্বভাবই কি প্রমাণ করিবে না, যে 'পেরিয়ে চলা'র সত্য আছে আমার স্বভাবে? স্বার্থমগ্ন ভোগান্ধ কোনো মানুষের চরিত্রে অকস্মাৎ যদি ধিক্কার গর্জিয়া উঠে, যদি মনে হয়, ভোগে সুখ নাই, ত্যাগে সুখ, বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সুখ নাই, বিশ্বের সকলের জন্য জাগরিত হওয়াই সুখ—তবে কি তাহা তাত্ত্বিক কোনো ধর্ম-দর্শনের অবাস্তব কল্পচিন্তনাই মনে করিব? সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্রের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সহসা যদি কোনোদিন প্রাকৃতিক অসীম রহস্যে চিত্ত আলোড়িত হইয়া উঠে—সারাজীবনে যাহা হয় নাই, মুহূর্তেই যদি তাহা সংঘটিত হইয়া যায়, অর্থাৎ মুহূর্তেই যদি বুঝিতে পারি সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্রের সহিত এই বিরাট বিশ্বপ্রকৃতিরই আমি একজন, —আমি তুচ্ছ নহি, আমি ক্ষুদ্র নহি, সূর্যচন্দ্রের মতই আমার প্রয়োজন আছে, আমি জাগিব, আমি মাতিব,

> আমি ঢালিব করুণাধারা,
> আমি ভাঙিব পাষাণ-কারা,
> আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
> আকুল পাগলপারা," [নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, প্রভাত সংগীত]

তাহা হইলে এই ভাবনা কি জীবনবহির্ভূত কোনো কল্পকথা মনে করিয়া বস্তুবাদীরা হাস্য করিয়া উঠিবেন? জীবনের নিচুতলাকার ব্যাপার লইয়া মানুষ যখন ব্যস্ত থাকে, self যখন self লইয়াই থাকে ব্যাপৃত, 'আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরে মরে পলে পলে' [গীতাঞ্জলি], তখন যে স্তরের realism-এর সাক্ষাৎ পাই, জীবনের উপরতলাকার কথা সে স্তরের realism নহে, ইহা আমরা অবশ্যই স্বীকার করিব। কিন্তু ইহাকে অবাস্তব বলিয়া যাহারা আপন অন্ধ বিবরটিকে সত্য মনে করিয়া তুষ্ট রহে, অজ্ঞানতার নির্ঘৃণ্য অহমিকাকেই আত্মা মনে করিয়া যে সব দুর্ভাগা জীবনকে করে সংকীর্ণ, সীমাবদ্ধ, অনাগত ভবিষ্যৎ তাহাদের কি বলিয়া ডাকিবে কে জানে! অর্ধসভ্য বিংশশতাব্দী জীবনের উপর-তলাকার কথাকে 'idealism' বলিয়া সরাইয়া দিতে চাহিতেছে বলিয়াই আজ স্বস্তি নাই,

সুখ নাই—'শান্তির ললিত বাণী শুনাইছে ব্যর্থ পরিহাস' [প্রান্তিক-১৮]—কিন্তু তাই বলিয়া কি মানুষ থামিয়া যাইবে? পরিহাস করুন, শত শত-ism-এর দোহাই দিয়া ইতিহাসের অজস্র নজির তুলিয়া মানুষের মর্মান্তিক হিংসা ও জিঘাংসার কথা সমর্থন করুন, তথাপি জানিব, আপনি যাহা পাইয়া আছেন, তাহাতে আপনার সুখ নাই। আপনি চলিয়াছেন। যে পথে, যে আদর্শে, যে কল্পনায় আপনি থাকুক না কেন, গতির বিরাম আপনার নাই-ই নাই।

বলাই বাহুল্য, এই গতির পথে বাধা বিস্তর, বিচ্যুতি প্রচুর, প্রলোভন অনন্ত না হইলেও অসংখ্য। জীবজীবনে দ্বন্দ্ব ও বিপত্তির শেষ নাই ঠিক এই কারণে। আত্মবোধ, সর্বজগৎগত ভূমাবোধ হইতেছে অহংএর আদর্শ; কিন্তু এই আদর্শ জীবনবহির্ভূত কোনো তত্ত্ব না হইলেও তামসিক বস্তুবিশ্বের বহু সংঘাতে বিড়ম্বিত হইতেছে, সেই কারণে দ্বন্দ্ব জাগিতেছে, বিরোধ হইতেছে উদ্যত, নিরন্তর চলিতেছে সংগ্রাম। দ্বন্দ্ব বা সংগ্রাম একেবারেই থামিয়া যায় যদি তামসিক এই অহং বিশ্ব-সাত্ত্বিকতার নির্মল আত্মাকে চরমভাবে লাভ করিতে পায়। পাওয়া অনেক বাকি রহিয়া গেছে বলিয়াই দ্বন্দ্ব, সংগ্রাম বা সাধনা। দ্বন্দ্বাতীত যে নির্বিশেষ তুরীয় অবস্থার কথা বৈদান্তিকগণ বলিয়া থাকেন, জগতে এবং জগজ্জীবনে সে অবস্থা কখনও আসিতে পারে কি না সে বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা হইতে পারে, এস্থলে সে আলোচনার অবসর নাই। নিতান্ত অপূর্ণ এই গুণ ও গতির পৃথিবীতে ত্রিগুণাতীত তুরীয় অবস্থার অপরোক্ষানুভূতি ব্যষ্টিসাধনায় কেহ কেহ লাভ করিতেও পারেন, কিন্তু সমষ্টির ক্ষেত্রে ইহার মর্যাদা এখনও উপলব্ধ হয় নাই, কবে হইবে তাহাও বলা সহজ নহে। ব্যবহারিক এবং প্রত্যক্ষ সত্য আজ এই, জগতে এখনও সাধনা চলিতেছে এবং চলিবে; পরম শ্রেয়কে যতক্ষণ না পাওয়া যায় ততক্ষণ শ্রেয়োবিকাশের সাধনা সত্য, শ্রেয়ঃ প্রবৃত্তি সত্য। বৈদান্তিকগণ বলিবেন, সকল শ্রেয়ের চরম শ্রেয়ের অবস্থা 'নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব', ইহা সত্যশিবসুন্দরেরও পরের অবস্থা, ত্রিগুণাতীত ব্রহ্মাবস্থা। ত্রিগুণরহিতত্বের পরমাবস্থায় অতৃপ্তি নাই, অপ্রাপ্তি নাই, অসঙ্গতি নাই—সুতরাং কোনো সাধনা নাই, সংগ্রাম নাই, দ্বন্দ্ব নাই। সমস্ত বৈপরীত্যের অবসান এই স্তরে।

বর্তমান পৃথিবীর বধির কর্ণে রবীন্দ্রনাথের মনোময় ভাগবত-সঙ্গীতগুলিও যখন ভাবের ঝংকার তুলিতে অক্ষম হয়, 'উপশাখা' নামে অভিহিত হইয়া রসিক মহলে উপেক্ষিত হইতে থাকে, তখন বৈদান্তিক এই দ্বন্দ্বাতীত তুরীয়-চেতনার তত্ত্ববাণী কতটা যে মূল্যবান বলিয়া গৃহীত হইবে, তাহা ভাবিতেও কৌতুক লাগে। পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি, বৈদান্তিক এই নির্বিশেষ দ্বন্দ্বাতীতের তত্ত্বোপদেশ রবীন্দ্রনাথও গ্রহণ করিতে পারেন নাই; ব্যষ্টিগত

কোনো মুক্তিকেও তিনি স্বীকার করেন না। রবীন্দ্রনাথ যে হওয়ার কথা কহেন, আত্মোপলব্ধির গীতি গাহেন, তাহা সমষ্টির সমবেত আত্মার ঐক্যোপলব্ধির উপযোগী। বুদ্ধি দিয়া যাহা বিচার করা যায় না, হৃদয় দিয়া যাহা অনুভব করা যায় না, বোধ দিয়া যাহা উপলব্ধি করা যায় না, রবীন্দ্রনাথ তাহা বলিবেন না, বিশ্বাসও করিবেন না। এই কারণে বাসনাবিরতি রবীন্দ্রদর্শনের শেষ কথা নহে, বাসনাকে বিমলায়িত করিবার বেদনা ও সাধনাই তাঁহার শেষ কথা। যোগবাশিষ্ঠে শুদ্ধাবাসনার যে তত্ত্বোপদেশ পাওয়া যায়, যে উপদেশ চরিত্রে প্রতিভাত করিয়া বশিষ্ঠ-শিষ্য শ্রীরামচন্দ্র পরমমানবে উন্নীত হইয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়, রবীন্দ্রনাথ সেই শুদ্ধাবাসনার সাধনায় আগ্রহশীল। 'মলিনা বাসনা' নহে, শুদ্ধা বাসনাতেই তাঁহার প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তিমার্গটা নিতান্তই মানবিক, এই কারণে তাঁহার শ্রেয়ঃ ত্রিগুণাতীত ব্রাহ্মিক ভূমা নহে, সত্ত্বগুণগত মানবিক ভূমা। যে ভূমাবোধে মানব ইহজগতেই পরমমানবরূপে পরিকীর্তিত হইবে, সত্যশিবসুন্দরের মহিমা-বিকাশের সহায়তায় জগৎকে করিবে প্রেমপূর্ণ, সুসমঞ্জস ও সঙ্গতিপূর্ণ, সেই ভূমার তত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ আস্থাবান। একথা একান্তভাবেই সত্য যে, এখনও এই ভূমা নিখিলজীবনে স্ফূর্তি পায় নাই, জীবমানব পরমমানবে হয় নাই প্রকাশিত, সেই কারণে রাবীন্দ্রিক এই ভূমাকেও জীবন ও জগৎ নিরপেক্ষ একটা তত্ত্ব মাত্র বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু মানবের অন্তর্নিহিত 'দ্বৈধসত্তার গতিবেগ পরীক্ষা করিলেই বুঝা যাইবে তাহার জীবপ্রকৃতি ক্রমশঃই কোনো না কোনো উপায়ে শিবপ্রকৃতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। মানুষের জিগীষা আছে, জিঘাংসাও আছে, জীবমানবের সহস্র শয়তানি তাহার মধ্যে দেখা গিয়াছে বারংবার, তথাপি একথা সত্য, মানুষ অন্তরে অন্তরে এসমস্ত সমর্থন করে না, সে প্রসন্ন হইতে চায়, শান্তি পাইতে চায়, প্রাণপণে ভ্রান্তি বিমোচনের চেষ্টা করিতে চায়। তাহা যদি না চাহিত, বৃহতের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ শুধু একটা কথার কথাই হইত। মানুষের জীবনে 'মহাত্মার' প্রকাশ কোনোদিনই সম্ভব হইত না। শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাম্যধর্ম, কল্যাণ, সৌন্দর্য, লোকহিতৈষণা কিংবা আধ্যাত্মিকতা কোনোদিনই তাহাকে পাইয়া বসিত না; 'দুপেয়ে' জন্তু হইয়াই সে খুশি রহিত আপন বিবরে। কিন্তু অল্পে সে যে খুশি নহে, সেকথা কেউ না জানুক, সে জানে। বস্তুতঃ 'নাল্পে সুখমস্তি' এই বাণী একান্তভাবে সত্য বলিয়াই মানুষের 'করা' আজও থামে নাই, 'জানা' থামে নাই, 'চলা' থামে নাই, 'বলা' থামে নাই।

মানবিক ভূমা

পূর্বেই ইঙ্গিত দিয়াছি, হওয়ার কথা যেখানেই আছে, সেইখানে প্রবৃত্তিই প্রাধান্য পায়, নিবৃত্তি নয়। রবীন্দ্রদর্শনকে এই কারণে আমরা প্রবৃত্তিধর্মী নাম দিয়াছি। বৈরাগ্যের কথা

তিনি বহুস্থানে বহুভাবে বলিয়াছেন, কিন্তু একটু ধীরভাবে লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় তাঁহার বৈরাগ্য একপ্রকার সূক্ষ্ম প্রবৃত্তিকে মানিয়া লইয়াছে, প্রেমের সহিত একাঙ্গ ও একাত্ম হইয়া নূতন একটি বৈরাগ্যবাদ রচনা করিয়াছে। 'প্রেম' বলিলে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক কবিকুলের যৌবন-যন্ত্রণাময় কামোত্তপ্ত যৌবন-প্রেমকেই শুধু মনে করেন না, পরন্তু জ্যোতির্ময় উজ্জ্বল জীবনের শ্রী হ্রী ও ধী-র মহিমাসম্ভূত ভাগবত আনন্দের কথাও তাঁহার মনে পড়িয়া যায় [শান্তিনিকেতন]। 'বৈরাগ্য' বলিলে তিনি প্রাচীন সাধকবর্গের জগৎ-নিরপেক্ষ উদাসীন 'বিমুক্তের' ভাবই শুধু স্মরণে আনেন না, পরন্তু যে ভাব সংসারের অহংমত্ত বৈষয়িকতাগুলিকে ত্যাগ করিতে বলে, 'পেরিয়ে চলো' এই নির্দেশে জীবনকে দান করে যৌবনবেগ, বিশেষের বন্ধন হইতে, খণ্ডের আসঙ্গ হইতে মহাবিশেষের মুক্তির প্রাঙ্গণে আনে টানিয়া—সেই ভাবের আনন্দকেও তিনি অনুভব করিতে থাকেন। [ফাল্গুনী দ্রষ্টব্য]। রবীন্দ্রনাথের প্রেম ও বৈরাগ্য একই হৃদয়ভাবের বিভিন্ন নাম মাত্র। কণিকার একটি ছোট কবিতায় তাঁহার এই হৃদয়ভাব অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে :

রবীন্দ্র ভাবনায় প্রেম ও বৈরাগ্য

প্রেম বলে, হে বৈরাগ্য তব ধর্ম মিছে।
প্রেম, তুমি মহামোহ—বৈরাগ্য কহিছে॥
আমি কহি, ছাড় স্বার্থ মুক্তিপথ ছাখ্।
প্রেম কহে, তাহ'লে তো তুমি আমি এক॥

[অনুরাগ ও বৈরাগ্য, কণিকা]

প্রেমের মধ্যে বৈরাগ্য, বৈরাগ্যের মধ্যে প্রেম—এই তত্ত্ববাণী রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও শিল্পে সত্য ও সুন্দর হইয়া বিকশিত হইয়াছে। বিচারের সময়ে এই দুই বোধ স্বতন্ত্ররূপে প্রতিভাত হইলেও উপলব্ধির আনন্দে এই দুই মিলিয়া এক অদ্বিতীয়ই বটে।

'যে প্রেম সম্মুখ পানে
চলিতে চালাতে নাহি জানে' [শাজাহান, বলাকা]

সে প্রেমে বৈরাগ্য নাই, সুতরাং রবীন্দ্রনাথের বিচারে তাহা প্রেমই নহে, তাহা মোহাসক্তি, তাহা জীবনকে অহংবন্দী করিবার ফন্দী-ফাঁদ করে রচনা।

আবার,

'লয়ে কুশাঙ্কুরবুদ্ধি শানিতপ্রখরা
কর্মহীন রাত্রিদিন বসি গৃহকোণে
মিথ্যা বলে জানিতেছে বিশ্ববসুন্ধরা' [মায়াবাদ, সোনার তরী]

যে-বৈরাগ্য, তাহাতে প্রেম নাই, সুতরাং রবীন্দ্রনাথের বিচারে তাহা বৈরাগ্যই নহে, তাহা জীবন-বহির্ভূত শূন্য তত্ত্ববাণী, তাহা নৈষ্কর্ম্যের শূন্যতায় যেন মায়াচ্ছন্ন।

রসজ্ঞ পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন, রবীন্দ্রনাথের বৈরাগ্য তাঁহার প্রেমের মতই মনোধর্মী, প্রবৃত্তিধর্মী।[১] তাহা যদি না হইত, অর্থাৎ তাঁহার বৈরাগ্য যদি বিজ্ঞানধর্মী, কি না নিবৃত্তিধর্মী হইত, তাঁহার মনের যেরূপ গঠন, তাহাতে তিনি কবি হিসাবে কালিদাসোপম না হইয়া দার্শনিক হিসাবে শঙ্করোপম হইলেও হইতে পারিতেন। প্রবৃত্তিপন্থী না হইলে প্রেম লইয়া দর্শন করা তাঁহার পক্ষে হয়তো সম্ভব হইত, কিন্তু কবিতা করা সম্ভব হইত না। প্রবৃত্তির উচ্চতম রূপটি দেখিতে না পাইলে তাঁহার পক্ষে প্রেমের সর্বজগৎগত উদার বিস্তৃতি অনুভব করিয়া দার্শনিক হওয়া ও কবিতা করা সম্ভব হইত কিনা ভাবিবার বিষয়। আসল কথা, আমার ধারণা এই, শুদ্ধা বাসনার সাধক বলিয়াই তাঁহার প্রেম বৈরাগ্যধর্মী, তিনি দার্শনিক; স্বভাবে বাসনার আনন্দ আছে বলিয়াই তাঁহার বৈরাগ্য প্রেমধর্মী, তিনি কবি।[২]

প্রেমঘন সুন্দর মনের শান্ত সাধুতার দ্বারা সংসারের কর্ম করিবার আদর্শে তিনি বিশ্বাসী। 'বৈরাগ্যের নামে শূন্য ঝুলির সমর্থন' (শিক্ষার মিলন) কখনও তিনি করেন নাই। তা যদি করিতেন তাহইলে তাঁহার কাব্য ও দর্শনের ঐক্যতত্ত্ব খুঁজিয়া বাহির করা লেখকের পক্ষে দুঃসাধ্য শুধু নহে, অসাধ্যই হইত। দর্শনচিন্তার যে স্তর হইতে তিনি ব্রহ্ম-কল্পনা করিয়াছেন, সে স্তর, পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি, বোধাতীত কোনো অমানসিক বা অমানবিক স্তর নহে। তাঁহার ব্রহ্ম রূপময় প্রেমময় ব্রহ্ম। তিনি পরম-মানব—সত্যে, শিবে, সুন্দরে সর্বানুভূ প্রেম-মানব। ইঁহাকে সংসারে এবং মানবচরিত্রেই জাগাইতে হইবে। সংসারকে ইঁহার মহিমায় উজ্জ্বল করিয়া সংসারকে স্বর্গোপম আবাসস্থল করাই আদর্শ। সংসারে আজও বিরোধ আছে, অন্যায় আছে, প্রবঞ্চনা আছে, তুচ্ছতম মনোবৃত্তির প্রভাবে সংসার আবাসের অযোগ্য হইয়া আছে, তাই সরিতে হয়, তাই ত্যাগ, তাই বৈরাগ্য। রবীন্দ্রনাথের বৈরাগ্য উচ্চে রতি, তুচ্ছে বিরতি। বলা বাহুল্য, এই 'উচ্চ' সংসারবহির্ভূত কোনো তত্ত্ব নহে।

> 'বৈরাগ্যসাধন করব।
>
> সেই খবর শুনেই ত ছুটে এসেছি, এ সাধনায় আমিই ত আপনার সহচর।
>
> তুমি?
>
> হাঁ মহারাজ, আমরাই ত পৃথিবীতে আছি মানুষের আসক্তি মোচন করবার জন্য।

---

১ 'বৃহৎ অনুরাগকে'ই রবীন্দ্রনাথ বৈরাগ্য কহিয়াছেন। 'প্রকৃতির বৈরাগ্য দেখো। সে সকলকেই ভালোবাসে বলিয়া কাহারও জন্য শোক করে না।' রবীন্দ্ররচনাবলী' ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৬২।

২ চৈতালীর 'বৈরাগ্য' নামক কবিতাটি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, বৈরাগ্যের নামে গৃহত্যাগ করিয়া নৈষ্কর্ম্যের আদর্শ রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করিবেন না।

বুঝতে পারলুম না।

এতদিন কাব্য শুনিয়ে এলুম তবু বুঝতে পারলেন না? আমাদের কথার মধ্যে বৈরাগ্য, সুরের মধ্যে বৈরাগ্য, ছন্দের মধ্যে বৈরাগ্য। সেইজন্যেই ত লক্ষ্মী আমাদের ছাড়েন, আমরাও লক্ষ্মীকে ছাড়বার জন্যে যৌবনের কানে মন্ত্র দিয়ে বেড়াই।

তোমাদের মন্ত্রটা কী?

আমাদের মন্ত্র এই যে, ওরে ভাই ঘরের কোণে তোদের থলি-থালি আঁকড়ে বসে থাকস নে—বেরিয়ে পড় প্রাণের সদর রাস্তায়, ওরে যৌবনের বৈরাগীর দল।

সংসারের পথটাই বুঝি তোমার বৈরাগ্যের পথ হ'ল?

তা নয় ত কি মহারাজ? সংসারে যে কেবলি সরা, কেবলি চলা, তারই সঙ্গে সঙ্গে যে লোক একতারা বাজিয়ে নৃত্য করতে করতে কেবলি সরে, কেবলি চলে, সেই ত বৈরাগী, সেই ত পথিক, সেই ত কবি-বাউলের চেলা।' [ফাল্গুনী]

'সংসারের পথটাই' রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বৈরাগ্যের পথ। কিন্তু কোনো খাওয়া-নাওয়া-হিসাব-নিকাশ লওয়ার অহং-বন্দী সংসার সংসার নহে। যে সংসার কেবলি সরে এবং সরিতে বলে, চলে, এবং চলিতে বলে, সেই সংসারই যথার্থ সংসার।

'সংসার জিনিসটা যে কেবল সরে, কেবলি সরায়। এখানে হয় সরতে থাকো, নয় মরতে থাকো। এখানে যে বলেছে আমার যথেষ্ট হয়েছে, এইবার যথেষ্টের মধ্যে বাসা বাঁধব, সেই ডুবেছে।' [পাওয়া, শান্তিনিকেতন-১ম]

বিশেষ আসক্ত হইয়া যে মানুষ 'থলি-থালি আঁকড়ে' পড়িয়াই রহিল, সংসারের স্বরূপ সে জানে না। সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নহে, সবি সরিয়া যায়, কিন্তু এই 'সরা' বা 'ঝরার' নিয়মের সহিত সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া 'পেরিয়ে চলার' যদি বাণী গাহি, ঝরার ছন্দে, সরার আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে সুর বাজাইয়া যদি চলিতে থাকি, সংসারের নিত্য চলার তালে তাল রাখা তা হইলে সম্ভব হয়, দুঃখ থাকে না, নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম হইল বলিয়া মনে হয় না।* যাহা কিছু আঁকড়াইয়া রাখিতে চাই, কালে তাহা যখন

* 'বিচিত্র প্রবন্ধে' 'রুদ্ধগৃহ' নামক রচনায় এই বিষয়টি কবি সৃষ্টি করিয়াছেন। এই প্রবন্ধটির আলোচনা প্রসঙ্গে অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন: রাত্রি প্রভাত হইলেই ছাড়িয়া যাইতে হইবে, পড়িয়া পড়িয়া শোক করিলে হইবে না। কিছুই থাকিতে চাহে না, অথচ আমরা রাখিতে চাই, ইহাই আমাদের শোক দুঃখের কারণ। সকলকে যাইতে দাও এবং তুমিও চলো। জগতের সহিত নিষ্ফল সংগ্রাম করিয়ো না—এই কথা আমরা যেন সার বলিয়া জানি। [রবীন্দ্ররচনাবলী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৬১।]

থাকে না, তখনই প্রকৃতির উপর ক্রোধ করি, মনে করি প্রকৃতি বুঝি নিষ্ঠুরা, আমার বক্ষের ধনটিই কেবল ছিনাইয়া লইল। এই যে মনোভাব—ইহাই তো মোহাসক্তি, ইহাই মায়া। আসল কথা, প্রকৃতির নিয়মে কিছুই ব্যতিক্রম নাই [জিজ্ঞাসা, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী]। সে যথাযথভাবে সবি ফুটাইবে, কালে আবার সবি গুটাইয়া লইবে। এই সত্যটি যখন জানি, তখন ফুটানো দেখিয়া যেমন আনন্দ করি, গুটানো দেখিয়া তেমনিই আনন্দ করি। 'কবি-বাউল'কে যাঁহারা চিনিয়াছেন, তাঁহারাই এই সত্যের মাধুর্য ও সৌন্দর্য উপলব্ধি করিবেন। বুঝিবেন, কবি যে সংসারকে 'বৈরাগ্যের পথ' নামে অভিহিত করিয়াছেন, তাহা শুধু কল্পমধুর কান্ত কবিত্ব নহে, তাহার পশ্চাতে সূক্ষ্ম একটি তাত্ত্বিক সত্য নিহিত রহিয়াছে।

'এই তত্ত্বসত্যটি এতদিন কাব্যে শুনিয়ে এলুম তবু বুঝতে পারলে না'—রবীন্দ্রনাথ আমাদের যেন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আজ আমরা বু'ঝয়াছি, রবীন্দ্রনাথের 'মানব' সংসারে থাকিয়াও কেন অসংসারী বৈরাগী, অসংসারী হইয়াও কেন 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে' নামিয়া প্রেমিকের প্রেমিক। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, মানুষের 'স্থূল আবরণের' অন্তরালে 'অন্তরতম আনন্দময় যে সত্তা' আছে, তাহারি জন্য মানুষের মূল্য ও মর্যাদা। সেই আনন্দময় সত্তাই সত্য, 'কেন না তারই মৃত্যু নেই।' [মানুষের ধর্ম]। অন্তরের অন্তর্নিহিত সেই অমৃত সত্তার প্রতিফলনেই মানুষকে তিনি দেখিয়াছেন, মোহাসক্ত মানুষের 'থলি-থালি'ভরা ক্ষুদ্র সংসার তাই তাঁহার প্রতিপাদ্য নহে, ভূমাশ্রয়ী মানুষেব নিত্যচলমান বৈরাগী স্বভাবটির মাহাত্ম্যই তাঁহার প্রতিপাদ্য। যে সমস্ত সমালোচক বলেন, 'তাঁর রচনায 'ইয়াগো' জাতীয় কোনো সত্যিকার পাপাচারী নাই' [রবীন্দ্রনাথ, ড. সুবোধ সেনগুপ্ত], তাঁহারা কোনোরূপ অত্যুক্তি করিযাছেন বলিয়া আমি মনে করি না। মানব অন্তরেব সর্বকালীন বিশ্বভূমীন মহিমাকে উপলব্ধি করিয়া মানুষকে তিনি বস্তুগত নিম্নভূমি হইতে অনেক উচ্চভূমে লইয়া গিয়াছেন। তাঁহার কাব্য-সাহিত্যে দেখিয়াছি, মানুষ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া মিত্রপক্ষের জন্য প্রসন্নমুখে প্রাণ দিয়াছে, অথচ শত্রুপক্ষীয়ের পরাজয় কামনা করে নাই . রাজ্যৈশ্বর্যের দুর্বার প্রলোভন অক্লেশে দমন করিয়াছে, 'নিষ্ফলের হতাশের দলে' রহিতে পারিয়া অনুভব করিয়াছে অকথিত আনন্দ, 'জয়লোভে' কিংবা 'যশলোভে' 'বীবের সদ্গতি' হইতে মুহূর্তের জন্য ভ্রষ্ট হয় নাই। [কর্ণ-কুন্তী সংবাদ]। সুন্দবী রমণীর বিলাসনিমন্ত্রণে সাড়া তাহার পাওয়া যায় নাই বটে, কিন্তু সেই রমণী যখন 'নিদারুণ রোগে' সর্বজনপরিত্যক্তা হইয়া 'পুর-পরিখার বাহিরে' নিঃস্ব কাঙ্গালিনীর মত পড়িয়া থাকে তখন তাহার 'সময়' হয়, সে আসে, 'নিজ অঙ্কে' রোগিণীর 'আড়ষ্ট শির' তুলিয়া লয়, বহু সমাদরে তাহার শুশ্রূষা করে। [অভিসার]। আত্মপুণ্যবলে

রবীন্দ্র মানব—
প্রেমিক : বৈরাগী

স্বর্গে যাইবার সমস্ত সুযোগ পাইয়াও পাপীর জন্য, তাপীর জন্য সে প্রসন্নমনে 'নাহি যাব বৈকুণ্ঠে আলয়ে' বলিয়া স্বর্গ হইতে বিদায় লয়, 'নরকবাসেই' স্বর্গ সুখ অনুভব করে। [নরক বাস]। সত্যের জন্য, ধর্মের জন্য, ন্যায়ের জন্য জননী হইয়াও অত্যাচারী ও অনাচারী পুত্রকে ক্ষমা করে না, তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে, তাহাকে নির্বাসন দিবার প্রস্তাব রাজার কাছে। [গান্ধারীর আবেদন]। ধর্মকে ধারণ করিয়া নির্ভীক প্রাণে রাজরোষের সম্মুখীন হইতেও সে দ্বিধা বোধ করে না, শির দেয় কিন্তু সার দেয় না। [পূজারিণী]। মৃত্যুকে সে করে না শঙ্কা, জাতির মান, মনুষ্যত্বের গৌরব, পৌরুষের মর্যাদা রক্ষার জন্য সে অবলীলাক্রমে পুত্রকে বলি দিতে পারে, নিজেও 'স্থির হয়ে' মরিতে পারে। [বন্দীবীর]। পুরাণ, ইতিহাস, অবদানশতক, বোধিসত্ত্বাবদান, কল্পলতা প্রভৃতি গ্রন্থের মহান মানব চরিত্রগুলি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ও প্রেমাদর্শের আলোকে সম্পূর্ণ নূতনরূপে প্রভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার মানবদর্শনের মহিমা উপলব্ধি করিতে হইলে এই সমস্ত চরিত্রের রসরূপ ও আনন্দ আস্বাদন করিতে হইবে। ইহার মধ্যে কোনো উপদেশ নাই, তত্ত্ব নাই, জ্ঞান প্রচার করিবার কোনো আড়ম্বর নাই, তথাপি রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের একটি স্বাভাবিক তাত্ত্বিকতা আছে ; মানুষ যেখানে অহংএর তুচ্ছতম স্বার্থ হইতে আত্মার উচ্চতম আনন্দে উন্নীত হইয়াছে, বৈষয়িকতার ঊর্ধ্বে উঠিয়া জীবনকে জানিয়াছে ধ্রুবের আনন্দে, রবীন্দ্র প্রতিভা সেইখানে প্রেরণা পাইয়াছে, চেতনার মাধুর্য রস-সিঞ্চনে সেইখানেই রচনা করিয়াছে বসন্তসুন্দর সুচারু শিল্পোদ্যান। এই শিল্পোদ্যান বাস্তব পৃথিবী হইতে দূরে আছে বলিয়া যাহারা তর্ক করে, জীবনের উচ্চতর স্বপ্ন ও সংকল্প-চেতনার মাধুর্য হইতে তাহারা অবশ্যই বঞ্চিত। শীতের বিশীর্ণ ধরণীর মৃত্যুশীতল ক্লান্ত ক্রোড়ে জড়বৎ পিণ্ডাকার হইয়া যাহারা পড়িয়া রহে, অজস্র বসন্তকুসুমের সৌরভকান্ত স্বর্গ-সৌন্দর্য তাহাদের নিকট অবাস্তব স্বপ্ন বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু শীত যদি আসিয়াছে, বসন্ত কি তাহাদের জীবনে আসিবে না ? বসন্ত আসে নাই, অর্থাৎ এখনও আমরা হইয়া উঠি নাই বলিয়া কবি একদা দুঃখ করিয়াছিলেন। 'আমরা কেবল আপনাকে, একে ওকে তাকে এবং এটা ওটা সেটা লইয়া মহা ধুমধামে ছটফট বা খুঁতখুঁত করিয়া বেড়াইতেছি—প্রকৃত বীরত্ব, উদার মনুষ্যত্ব, মহত্বের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, জীবনের গুরুতর কর্তব্য সাধনের জন্য হৃদয়ের অনিবার্য আবেগ, ক্ষুদ্র বৈষয়িকতার অপেক্ষা সহস্র গুণ শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ—এ সকল আমাদের দেশে কেবল কথার কথা হইয়া রহিল, দ্বার নিতান্ত ক্ষুদ্র বলিয়া জাতির হৃদয়ের মধ্যে ইহারা প্রবেশ করিল না।' [চিঠিপত্র-৪]

'উদার মহত্ত্বকে আমরা কোনোমতে বিশ্বাস করিতেই পারি না। যদি দেখি কোনো এক ব্যক্তি টাকাকড়ির দিকে খুব বেশি মনোযোগ না দিয়া খানিকটা করিয়া সময় দেশের কাজে ব্যয় করে, তবে তাহাকে বলি 'হুজুকে'। আমাদের স্ফীত ক্ষুদ্রত্বের নিকট বড়ো কাজ একটা হুজুক বই আর কিছুই নয়। আমরা টাকাকড়ি, ক্ষুধাতৃষ্ণা এ সকলের একটা অর্থ

বুঝিতে পারি, ক্ষুদ্র প্রবৃত্তির বশে এবং সংকীর্ণ কর্তব্যজ্ঞানে কাজ করাকেই বুদ্ধিমান প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির লক্ষণ বলিয়া জানি, কিন্তু মহৎ কার্যের উৎসাহে আত্মসমর্পণ করার কোনো অর্থই আমরা খুঁজিয়া পাই না। আমরা বলি, ও দল বাঁধিবার জন্য বা নাম করিবার জন্য বা কোনো একটা গোপনীয় উপায়ে অর্থ উপার্জন করিবার জন্য এই কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছে, স্পষ্ট করিয়া কিছু যদি না বলিতে পারি তো বলি, ওর একটা মতলব আছে। মতলব তো আছেই। কিন্তু মতলব মানে কি কেবলি নিজের উদর বা অহংকার তৃপ্তি, ইহা ব্যতীত আর দ্বিতীয় কোনো উচ্চতর মতলব আমরা কি কল্পনাও করিতে পারি না?'

[তদেব]

'উচ্চতর মতলব'—দার্শনিক ভাষায় 'বিশুদ্ধা বাসনা' যদি স্বভাবে জাগাইতে না পারি, তবে রবীন্দ্রসাহিত্য অবশ্যই অবাস্তব স্বপ্নসাহিত্য বলিয়াই পরিগণিত হইবে, এবং রবীন্দ্র-মানব কবিকপোলকল্পিত আনন্দঘন চেতনচিন্ময়রূপে দূর হইতেই 'বাহবা' পাইবে, স্বভাবে স্বভাব হইয়া অভাবগ্রস্ত দীন মানুষের তামসিক হীনতাগুলি দূর করিবে না। উচ্চতর জীবনবোধের প্রতি যতদিন উদাসীন থাকিব, মহত্তর চরিত্রের আনন্দ আস্বাদনে ততদিন আমাদের বঞ্চিতই থাকিতে হইবে, ততদিন রবীন্দ্রমানবের মন্দিরহর্ম্যে প্রবেশ করিবার ছাড়পত্র আমরা পাইতেই পারিব না। মানবের যে রূপ তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন, একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, সে রূপ সত্যশিবসুন্দরের জ্ঞান হইতেই আগত। এ জ্ঞান স্বভাবেই আছে, সাধনার দ্বারা স্বভাবের এই জ্ঞান স্বভাবেই অঙ্কুরিত করিয়া তুলি। ঈশ্বরের যে সগুণ ও সম্ভূত অবস্থা ও রূপের আমরা কল্পনা করিয়া থাকি, সে কল্পনা ও দর্শন একেবারে নিরর্থক হয়, যদি তাহা চরিত্রে প্রতিভাত না হয়। সত্যশিবসুন্দরকে জানিলাম ও মানিলাম—ইহার অর্থ হইতেছে এই যে, সত্য-শিবসুন্দর হইতে হইবে ইহারই নির্দেশ পাইলাম। এই নির্দেশ অমান্য করি জীবপ্রকৃতির তাড়নায়, জীবপ্রকৃতিকে সংযত ও মার্জিত করিয়া এই নির্দেশ মান্য করিতে চলি শিবপ্রকৃতির আকর্ষণে। পশুর জীবনে এবং 'মানুষজন্তুর' জীবনে জীবপ্রকৃতির প্রভাব নানাভাবে লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু মানুষজীবনে শিবপ্রকৃতির আকর্ষণই বিশেষভাবে প্রাধান্য পায়। 'সহজ স্বভাবের চেয়ে সাধনার স্বভাব' পশুর কাছে নহে, মানুষের কাছেই কেবল 'সত্য' বলিয়া বিবেচিত। [মানুষের ধর্ম]। ভাগবতদর্শন তাঁহার নিকট সত্য এইজন্য যে, এই দর্শনমাহাত্ম্যেই একদিকে যেমন বিরোধবিহীন, সঙ্গতিপূর্ণ পরম শান্তিময় এক মহাজীবনের আদর্শ তিনি জ্ঞানের দ্বারা লাভ করেন, অপরদিকে তেমনি, কর্মের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা আপন চরিত্রে ও সমাজে, স্বদেশে ও বিশ্বপৃথিবীতে প্রতিভাত করিবার প্রেরণাও অনুভব করিতে থাকেন। ব্রহ্মস্বরূপ যদি মানবস্বরূপে প্রকাশিতই না হয় তবে ব্রহ্মদর্শন মিথ্যা, দার্শনিকদের স্বকপোলকল্পিত অর্থহীন একটা উপকথা মাত্র।

আধুনিক বস্তুপৃথিবীতে অসংখ্য বিরোধিতা বর্তমান। অসংখ্য অর্বাচীনের অর্থহীন হুহুংকারে আকাশ বাতাস আজ কম্পিত, প্রকম্পিত। ক্ষমতার লোভ এবং দলীয় ও

উপদলীয় স্বার্থের গোপন প্ররোচনায় মানুষ আজ শঠ, প্রতারক, ধ্বংসাত্মক, জিঘাংসু। স্বার্থগত দলীয় রাজনৈতিক ফন্দি-পরিকল্পনার সাহায্যেই মানুষ আজ বিশ্বসমস্যা সমাধানে উদ্যত, অহংকৃত। দুশ্চরিত্র দুরভিসন্ধির উন্মত্ত অহমিকা বৃদ্ধ বটবৃক্ষের ন্যায় ঝুরি নামাইতেছে পৃথিবীর নানা স্থানে, নানা জনপদে। অন্ধকার হইয়াছে আকাশ, বিষাক্ত হইয়াছে বাতাস, অমাচ্ছন্ন হইয়াছে সূর্যের সপ্তরশ্মি। তথাপি মানুষের অন্তর্নিহিত শিবস্বরূপটি কবি অবিশ্বাস করেন নাই।

নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন।
পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাঁধা, সংগীত না মানিল বন্ধন।
ফোয়ারার রন্ধ্র হতে
উন্মুখর উর্ধ্বস্রোতে
বন্দীবারি উচ্চারিল আলোকের কী অভিনন্দন।

[বক্‌সাদুর্গস্থ রাজবন্দীদের প্রতি, পরিশেষ]

বলিতেছেন রবীন্দ্রনাথ :

'As I look around I see the crumbling ruins of a proud civilisation strewn like a vast heap of futility. And yet I shall not commit the grievous sin of losing faith in man. I would rather look forward to the opening of a new chapter in his history after the cataclysm is over and the atmosphere rendered clean with the spirit of service and sacrifice. Perhaps that dawn will come from this horizon, from the East where the sun rises. A day will come when unvanquished man will retrace his path of conquest, despite all barriers, to win back his lost human heritage. [*Crisis in Civilisation.*]

জাগিবে, মানুষ একদা জাগিবে, যে ঐশ্বর্য সে আজ 'সভ্যতার সংকটে' হারাইতে বসিয়াছে, সাধনবলে সে তাহা ফিরাইয়া আনিবে। একদা এই পূর্বদেশ হইতেই তাঁহার 'মানব' জাগ্রত হইবে, উদ্যত হইবে। ব্রহ্ম ক্রমশঃই প্রতিভাত হইবে মানবে, জীবমানব 'পরমমানব' হইবে সাধনবলে।

পরমমানব

'আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে—এখানে সর্বদেশ সর্বজাতি ও সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা—তাঁরই বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহংকার, আমার ভেদবুদ্ধি ক্ষালন করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি।'

[রচনাবলী-১]

মানবজাতির অহংকার ও ভেদবুদ্ধি ক্ষালন করিবার চেষ্টা যতই দুঃসাধ্য হউক, এই চেষ্টার যৌবনাবেগ মানবস্বভাবে আছেই আছে। মানুষ এইজন্যই কবির নমস্ত এবং বরেণ্য। মানুষের দ্বারে তিনি আসিয়াছেন, তাহার রূপদর্শন করিয়াছেন, তাহার মহিমা-কীর্তন করিয়াছেন, মানবজাতির অন্তর্নিহিত এই শিবসত্তার জন্যই। তাঁহার দর্শন বা কাব্যসাহিত্যের মানবমুখিতার মূলে এই সত্যই আছে নিহিত। 'ভাষা ও ছন্দ' নামক বিখ্যাত কবিতায় মানুষকে কবি যেরূপ চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা রসবোধের সহজ আনন্দে গ্রহণ করিতে পারিলেই জীবমানবের অন্তরে শিবসত্তার স্বরূপটি হৃদয়ঙ্গম হইবে।

> 'কহ মোরে বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
> কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম
> ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মত,
> মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয়নি নত,
> সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
> কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
> কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
> সবিনয়ে সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম,
> কহ মোরে সর্বদর্শী হে দেবর্ষি তাঁর পুণ্যনাম'। —

বাল্মীকির এই প্রশ্নের উত্তরে নারদ কহিলেন—এমন মানব তো জীবমানব নয়, শিব-মানব ; নররূপে নরদেবতা. ইনি 'অযোধ্যার রঘুপতি রাম' ছাড়া আর কে ? কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কী বলিবেন ? সর্বদেশ, সর্বজাতি ও সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন যে নরদেবতা, যিনি আমার কামনায় আছেন, আপনার সাধনায় আছেন. রাম, হরি, সকলের স্বভাবে আছেন, বিশ্বমানুষের অভাববোধে আছেন, তাঁহার কথাই কি রবীন্দ্রনাথ বলিবেন না ?

অসীমের চেতনা ও মানববোধ

অসীমের চেতনাই রবীন্দ্রনাথের মানবকল্পনার মূল উৎস। অসীমবোধ অর্থাৎ ব্রহ্ম-চেতনা না থাকিলে এই 'বিশ্বভূমীন, সর্বকালীন' পরম মানবের ধারণা করা কাহারো পক্ষে সম্ভব নহে। পৃথিবীর মন্দিরে আসিয়া রবীন্দ্রনাথ এই বোধমহিমার অলংকারে মানুষকে সজ্জিত করিয়া দেখিয়াছেন। 'সুখদুঃখ বিরহ-মিলনপূর্ণ ক্ষুদ্র খণ্ড দোষত্রুটিবহুল মানবের অন্তঃপুরে তিনি প্রবেশ লাভ করিতে পারেন নাই' [প্রমথনাথ বিশীর রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ, লেখকের ভূমিকাংশ] বটে, কিন্তু ইহা তাঁহার 'ত্রুটি' বা 'দুর্বলতা' বলিয়া মনে করি না, মনে হয় ইহাই তাঁহার প্রতিভার স্বরূপ। অহং-এর মধ্যেই তিনি যদি জীবনের সমগ্রতাকে দেখিতে পাইতেন

তবে বস্তুবিশ্বের ক্ষুদ্র খণ্ড দোষত্রুটিবহুল মানবের জীবনটুকুকেই কাব্যের ও দর্শনের চরম আদর্শ বলিয়া অবশ্যই মানিয়া লইতেন। পূর্বেই আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি অহংসর্বস্বতা অথবা অহংবন্দী জীবন তাঁহার কবিতার বা দর্শনের লক্ষ্য বা আদর্শ নহে। মানুষ যা আছে, তাহাতে তাঁহার সুখ নাই, মানুষ যা হইবে তাহাতেই তাঁহার সুখ। অহংএ তিনি ততটুকু থাকিবেন যতটুকু তাঁহার আত্মবিকাশে তাহা সহায়ক। মানবজীবনের বৃহত্তর স্বভাবই তাঁহার প্রতিপাদ্য, খণ্ড ক্ষুদ্র দোষত্রুটিবহুল অহংদীর্ণ মানবজীবন তাঁহার প্রতিপাদ্য নহে। যাঁহাদের নিকট 'মানবমুখিতা রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রধান ধর্ম' বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, তাঁহারা যদি রাবীন্দ্রিক মানবমুখিতার এই বৃহৎ বৈশিষ্ট্যটুকুর প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তাহা হইলে অতি সহজেই তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, 'দোষত্রুটিবহুল মানবের অন্তঃপুরে' রবীন্দ্রনাথ প্রবেশ না করেন, এমন নহে, তবে দোষত্রুটির সংসারটিকেই একান্ত বলিয়া গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার নাই। বদ্ধ হ্রদে তিনি স্নান করিতে চাহেন নাই এমন কথা আমরা বলি না, তবে সাগরাভিমুখী নদীর চঞ্চল তরঙ্গে গা না ভাসাইলে তাঁহার তৃপ্তি জাগে না, ইহা যে আমরা দেখিয়াছি।

মানবমুখিতাই রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রধান ধর্ম একথা মানিতে আমরাও তো অসম্মত নহি, কিন্তু এ সত্য যে না মানিলেই নয়, যে মানব 'চঞ্চলের লীলা সহচর,' যে মানব অল্পে তুষ্ট নহে, যে মানব পৌরুষে অনুভব করে প্রাণের উদ্দীপনা, ত্যাগে উপলব্ধি করে ভাগবত মহিমা, প্রেমে আস্বাদন করে বিশ্বভূমীন জীবনের সমগ্রতা, সেই মানবের অভিমুখী হওয়াই রবীন্দ্রপ্রতিভার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য।

সাধারণ মানুষের চিত্র রবীন্দ্রনাথ আঁকিতে পারেন নাই বলিয়া অনেক মনীষী সমালোচক একাধিকবার অভিযোগ করিয়াছেন এবং করিতেছেন। কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে, রবীন্দ্রনাথ মানুষকে সাধারণই ভাবিতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথ বলেন: 'মানুষ যদি কেবলমাত্র মানুষের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করিত তবে লোকালয়ই মানুষের একমাত্র মিলনের ক্ষেত্র হইত। কিন্তু মানুষের জন্ম তো কেবল লোকালয়ে নহে, এই বিশাল বিশ্বে তাহার জন্ম। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে তাহার প্রাণের গভীর সম্বন্ধ আছে। তাহার ইন্দ্রিয়বোধের তারে তারে প্রতিমুহূর্তে বিশ্বের স্পন্দন নানা রূপে রসে জাগিয়া উঠিতেছে।' বস্তুতঃ তাঁহার চোখে আমরা সকলেই অসাধারণ, যা' আছি তাহা লইয়া অসাধারণ নহি, যাহা হইয়া উঠিব তাহার মহিমাতেই অসাধারণ। তাই কবি আমাদের আশীর্বাদ করিয়াছেন:

> মৃত্যুঞ্জয় যাহাদের প্রাণ,
> সব তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দীপ যারা জ্বালে অনির্বাণ,
> তাহাদের মাঝে যেন হয়
> তোমাদেরি নিত্য পরিচয়। [জন্মদিনে-১৮]

আজও-অনাগত মাহাত্ম্যের মহিমময় রেখাগুলি একত্র করিয়া আমাদের চিত্র তিনি অংকন করিয়াছেন, তাই তাঁহার চিত্রগুলি আমাদের দৈনন্দিন আটপৌরে ঘরোয়া জীবনের সঙ্গে বস্তুগতভাবে ঠিক মেলে না, কিন্তু একটু সূক্ষ্মভাবে দেখিলেই বুঝা যায় তাঁহার চিত্রগুলির মধ্যে যে মহিমা, যে সৌন্দর্য আছে, তাহাতে আমাদের অন্তরিন্দ্রিয় ব্যাকুল হইয়াই সায় দেয়, উদাসীন আত্মা কেমন যেন পরমাত্মীয় দর্শনে হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথের মানব আমাদের বস্তু-সংসারের হয়তো আত্মীয় নহে, কিন্তু কেবল বস্তু-সংসার লইয়াই কি আমরা ঘর করি? ভাবের সংসারে কত কে যে আসে যায়, কত কথা কহিয়া যায়, কত মন মোহিয়া যায় তাহার খবর কি আমরা রাখি না? ইহা কি Real নহে? আমাদের ভাবের সংসারের আত্মীয়গুলি বস্তু-সংসারের আত্মীয় হইতে পৃথক বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের নিকটও কি ভাবের সংসারটি বস্তুগত-ভাবেই সত্য এবং স্বাভাবিক নহে?

সাধারণ মানুষের চিত্র রবীন্দ্রনাথ আঁকেন নাই কেন, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া আমাদের মধ্যে যাহারা রাজনৈতিক চিত্তবিকারেরই প্রশ্রয় দিয়াছি, অমর-'মানব' দর্শনের মাহাত্ম্য তো আস্বাদনই করি নাই, উপরন্তু রবীন্দ্রনাথের উপর অযথা বহু দোষারোপও করিতে চাহিয়াছি। রবীন্দ্রনাথকে বিচার করিতে গিয়া ধনতন্ত্র, সাম্যতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, শ্রমিকতন্ত্র প্রভৃতি বিশ্বতন্ত্রের মন্ত্র আউড়াইয়া পুরাতন যুগের পুরোহিতগিরি করিতে আমাদের অনেকেই লজ্জাবোধ করি নাই। দৈববশে রবীন্দ্রনাথ ধনীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এই কারণেই তাঁহার চিত্রিত মানুষগুলি সব অভিজাত, জমিদারতনয়ের ন্যায় প্রজাসমাজ হইতে অর্থাৎ মাটির মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন ও পৃথক, এমনিতর অশ্রদ্ধেয় মতবাদ লইয়া তর্কাতর্কি করিলে ছাত্রছাত্রীমহলে হয়তো সাময়িকভাবে খানিকটা নাম ও নেতৃত্ব পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহার দ্বারা সত্য আবিষ্কার হয় বলিয়া আমি মনে করি না। মধ্যযুগীয় পুরোহিতরা যেমন নিজেদের বিশ্বাস মতো সত্যকেই একমাত্র সত্য বলিয়া মনে করিতেন, তাহার বিরুদ্ধে অন্যতর কোনো সত্যকে সত্য হইলেও সত্য বলিতে দিতেন না, ইদানীং রাজনৈতিক সাহিত্য-সমালোচকদল ঠিক সেই মধ্যযুগীয় পুরোহিতদের মতোই নিজেদের দলীয় বিশ্বাসমতো তন্ত্রোপযোগী কথা, মতামত, বিশ্বাস বা তত্ত্বকেই প্রাধান্য দিতে চাহেন। ইঁহাদের মত ও পথকে সমালোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়, আমার বলিবার কথা শুধু এই, রবীন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্রমানবকে বুঝিতে হইলে বিশিষ্ট কোনো দর্শন-শাখার 'তত্ত্ব' অথবা রাজনীতি-শাখার 'তন্ত্রের' সহায়তা লইলে একদেশদর্শিতার অত্যাচারকেই প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। দরিদ্রের অন্তহীন দারিদ্র্য, ক্ষুধার্তের লজ্জাকর বুভুক্ষা, দুঃখীর সহনাতীত দুঃখ সমাজসংসারে চিরকাল থাকিয়া যাক, একথা ধনিক রবীন্দ্রনাথও

কোনদিন স্বপ্নভরেও বলিতে চাহিবেন না। তাঁহার বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত যে সমস্ত নিন্দাবাদ করা হইয়াছে, সে সবের ইতিকথা উত্থাপন করিয়া প্রবন্ধকে ভারাক্রান্ত করিতে এবং অপরোক্ষভাবে নিজেদের লজ্জা ও আত্মদৈন্য বৃদ্ধি করিতে আর চাহি না। আজ স্থিরভাবে এই কথাই বিশ্বাস করি, মানুষ হিসাবে, কবি হিসাবে, দার্শনিক হিসাবে যতটা সম্ভব বস্তুগতভাবেই তিনি দুঃখদগ্ধ, ক্ষুধাদীর্ণ, বেদনাবিধুর ও দারিদ্র্যনিষ্পিষ্ট জগতে নামিয়াছেন, আপন রুচি, প্রবৃত্তি এবং বোধানুসারে তিনি কাজ করিয়াছেন, গান করিয়াছেন, তত্ত্ব করিয়াছেন। তাঁহার কাজ, গান বা তত্ত্ব বিশেষ কোনো 'তন্ত্রের' হুবহু নকল হইল না বলিয়া যদি তিনি 'ধনিকশ্রেণীর স্তম্ভ' রূপে বিবেচিত হন, যদি তাঁহার কাব্যদর্শন ধনিকশ্রেণীর স্বার্থ ও সম্মানের রক্ষাকবচরূপেই গৃহীত বা উপেক্ষিত হয়—তবে দোষ দিব নিজেদের বুদ্ধি বিবেচনার, দোষ রবীন্দ্রনাথকে দিব না।

যুগ আসে, যুগ যায়। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মতের ও মনেরও পরিবর্তন ঘটে। বর্তমানযুগে রবীন্দ্রনাথ সংগ্রাম করিয়াছেন কিন্তু আশা স্থাপন করিয়াছেন ভবিষ্যযুগের উপর। সেই ভবিষ্যমানুষের আহ্বান-গীতি ধ্বনিত হইয়াছে রবীন্দ্র-রাজ্যের মানবকণ্ঠে। এ গীতি যাহারা শুনিবে, তাহারাই লাভবান হইবে, যাহারা শুনিবে না, সংস্কারাচ্ছন্ন বুদ্ধির দীন অহমিকা লইয়া যাহারা বধির থাকিতেই ভালবাসিবে, ক্ষতি হইবে তাহাদেরই। মনে রাখিতে হইবে, রবীন্দ্রনাথ যে মানবের স্বপ্ন দেখিয়াছেন, ত্যাগেই তাহার মহিমা, প্রেমেই তাহার চারিত্র-সৌন্দর্য, কর্মেই তাহার আত্মপ্রকাশ। যোগী-সন্ন্যাসীর ন্যায় সে মানব সমাজের বাহিরে ব্যক্তিসাধন-সহায়তায় মুক্তি পাইতে চাহে না, ভোগী দানবের ন্যায় সমাজের বুকে বসিয়া মানবের রক্ত শোষণ করিতে সে চাহে না। রবীন্দ্রনাথের এই মানব মাটির মানুষকে আত্মার আত্মীয় বলিয়া জানে, বিশ্বের কল্যাণের জন্য শয়নে স্বপনে সাধনতৎপর থাকাটাই আদর্শ বলিয়া মানে, কোথাও কোনো মহত্ত্বের ইশারা দেখিলে আকুল আনন্দে গান গাহিয়া প্রাণ পায়। 'শ্রমিক সংস্কৃতি' গড়িয়া উঠুক, শোষকদের ভুয়া সংস্কৃতির অন্ধ মোহের অবসান ঘটুক, 'দীনের হতে দীন' যাহারা, 'সংকুচিত ভীত ক্রীতদাস' যাহারা, শ্রান্ত, শুষ্ক, ভগ্ন-হৃদয় যাহারা, 'বঞ্চিত' যাহারা, অপমানিত যাহারা, যাহারা 'liable to suffer degradation not fit for human beings,' যাহারা 'অজ্ঞানের অন্ধকারে' আজও রহিয়াছে আবরিত, 'মানুষ-জন্তুর' নিত্য নিষ্পেষণে মানুষ হইয়াও যাহারা মনুষ্যত্ব হারাইয়া 'রিক্তভূষণ' এবং 'দীনদরিদ্র', তাহাদের মধ্যে 'মানুষ' জাগ্রত হউক, ইহা যাহাদের কাম্য, রবীন্দ্রনাথের মানব তাহাদেরি পুরোভাগে আছে দাঁড়াইয়া।

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে।
সবার পিছে, সবার নিচে, সবহারাদের মাঝে ॥ [গীতাঞ্জলি]

রবীন্দ্রনাথের 'মানুষের ধর্ম' সকল মানুষের মিলনের মহিমায়, সকল মানুষের সেবা, প্রেম ও সাম্যের আনন্দে।

এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খ্রীষ্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার,
এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমানভার। [তদেব]

বিশ্বকে আহ্বান করে এই মানুষ। মানুষে মানুষে কোনো ভেদ এ স্বীকার করে না। কৃত্রিম জাতিভেদে ইহার নিদারুণ ঘৃণা। মানুষের সন্তান অস্পৃশ্য নহে, নীচ নহে; সে সত্য, সে শিব। সে সুন্দর।

মোর কথা শোনো,
শতদল পঙ্কজের জাতি নেই কোনো।
যার মাঝে প্রকাশিল স্বর্গের নির্মল অভিরুচি
সেও কি অশুচি? [জলপাত্র, পরিশেষ]

কবির সাবধান-বাণী তাই :

যারে তুমি নিচে ফেলো
সে তোমারে বাঁধিবে যে নিচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে
সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে। [গীতাঞ্জলি]

কিন্তু তামসিক পৌরুষদৃপ্ত বস্তু-জগৎ কি এই সাবধান-বাণী আজও শুনিয়াছে? বুদ্ধিমান বস্তুজগৎ আপন স্বার্থসাধনে কত শত ভেদনীতি, কূটনীতি প্রয়োগ করিতেছে। প্রেম নয়, সাধুতা নয়, সৌজন্য নয়, সৌহার্দ্য নয়, স্বার্থের পর স্বার্থ সাধিত হইলেই বস্তু-জগতে যেন প্রতিষ্ঠা মেলে—

পুরুষে পুরুষে দ্বন্দ্ব
স্বার্থ লয়ে বাধে অহরহ—ভালোমন্দ
নাহি বুঝি তার। দণ্ডনীতি, ভেদনীতি,
কূটনীতি কত শত, পুরুষের রীতি
পুরুষেই জানে। বলের বিরোধে বল,
ছলের বিরোধে কত জেগে উঠে ছল,
কৌশলে কৌশল হানে। [গান্ধারীর আবেদন, কাহিনী]

বর্তমান জগতের এই ভ্রান্ত রাজনীতি-বুদ্ধির কোথায় পরিণতি? 'বলের বিরোধে বল' প্রয়োগ করিয়া, কৌশলের দ্বারা কৌশলকে হনন করিয়া সাম্য আনিব দেশে, শান্তি

আনিব পৃথিবীতে? দলগত প্রতিষ্ঠা এবং ব্যক্তিগত প্রভুত্ব, ব্যক্তিগত সুখ এবং দলগত স্বার্থ সাধিত হইলেই হইল, দেখিব না মানুষ আত্মবিকাশে যথোচিত মর্যাদা পাইল কি না, দেখিব না নিষ্পাপ দুঃখ হইতে ত্রাণ পাইল কি না, দেখিব না ন্যায়ধর্ম রক্ষিত হইল কি না? ভীরুর মত ক্ষমা করাই জীবন? অন্যায় সহ্য করাই পৌরুষ? তাই প্রতিজ্ঞাবাণী :

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হোতে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্য বাক্য ঝলি' উঠে খরখড়্গ সম
তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান॥

অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে॥ [নৈবেদ্য-৭০]

কিন্তু এই প্রতিজ্ঞাবাণী শূন্য বাতাসেই বুঝি ভাসিয়া গেছে। অন্ধ পৃথিবী আসন্ন প্রলয়ের সম্মুখেও ধর্মকে পদানত করিয়া, কর্মকে কলুষলিপ্ত করিয়া, মানুষকে স্বার্থোদ্ধারে নিয়োজিত করিয়া, ঈশ্বরকে পাপ ঢাকিবার অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া উন্মত্তার ন্যায় যেন মাতিয়া উঠিয়াছে। ইহারি প্রভাবে মানুষ শতাব্দী ধরিয়া শঠতা শিখিয়াছে, প্রতারণা শিখিয়াছে, চাতুর্য শিখিয়াছে। অধর্ম করিয়া যখন মানমর্যাদা পাইতে থাকি, পাপ করিয়াই যখন প্রতিষ্ঠা পাই, তখন ধর্ম বা পুণ্যের বাণী নির্বোধের প্রলাপ বলিয়াই তো উড়াইয়া দিব, অথবা এতটুকু শ্রদ্ধা যদি আজও হৃদয়ে সঞ্চিত থাকে, তবে উচ্চতর আদর্শবাদ বলিয়া সুপ্রবীণ বিজ্ঞের ন্যায় অন্য দিকেই তো মুখ ফিরাইব।

বস্তুতঃ জীবপ্রকৃতির মানুষের কাছে পরমমানবের উচ্চতর আদর্শ দিবাস্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা বলিয়া উপেক্ষিত হওয়া বিচিত্র নহে; কিন্তু তাই বলিয়া মানুষের মহত্ত্ব, তাহার সেবাপ্রেম, তাহার ভাগবত বুদ্ধি, তাহার বিশ্বমৈত্রীভাবের উদার আনন্দ নিছক ভাব-বিলাসিতারূপে গণ্য হইতে পারে না। বিপর্যস্ত এই বস্তুপৃথিবীর অন্তহীন বাধা ও বিপত্তির মধ্যে থাকিয়াও আমাদেরি এই জীবনে তো এমন অনেককে দেখিলাম, যাঁহারা মানুষের সেবা ও স্বাধীনতার জন্য শয়নে স্বপনে সহস্রবিধ ত্যাগ স্বীকার করিয়া গেলেন। দেখিলাম, মানুষের চিত্ত-মুক্তির জন্য বৃদ্ধ বয়সেও এক মানব তরুণের মতই উদ্যোগী হইয়া বাহির হইলেন ধূলিমলিন কঙ্করক্লিষ্ট বন্ধুর পথে, ফকিরের মত ঘুরিলেন দ্বার হইতে দ্বারে, গ্রাম হইতে গ্রামে, নিরাশ হইলেন, অবমানিত হইলেন, উপেক্ষিত হইলেন, শেষে প্রাণ পর্যন্ত প্রসন্নমুখে দান করিলেন মানুষের হাতে তবু আশা ত্যাগ করিলেন না, আদর্শকে খাটো করিলেন না।

দেখিলাম, নামহীন গোত্রহীন শতসহস্র সন্ন্যাসী-কল্প তরুণ-মহাত্মা, যাহারা পলে পলে তিলে তিলে আদর্শের জন্য, মানুষের মুক্তির জন্য নিঃশেষে নিরুদ্বেগে প্রাণ দান করিল, সুখ চাহিল না, চাহিল ভূমা, স্বার্থ চাহিল না, চাহিল পরার্থের পবিত্রতা, ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠা চাহিল না, চাহিল সমষ্টির মুক্তি-প্রতিষ্ঠা।

দেখিলাম, জৈব চৈতন্যকে আনন্দচৈতন্যে উন্নীত করিবার মহান উদ্দেশ্যে যোগাসীন হইলেন আর এক জিতেন্দ্রিয় মহাত্মা, ধ্যানের সাত্ত্বিকতায় শুভ্রসুন্দর করিতে চাহিলেন দেশ ও বিশ্বের হৃদয়দেশ ; স্বপ্ন দেখিলেন—আসিতেছে মহান উচ্চ জীবন : ভাগবত জীবন ; সঙ্কল্প করিলেন, জয় আনিয়া দিব, আনিয়া দিব এই ধূলিলিপ্ত মলিন বস্তুজীবনের পটভূমেই।

সবার পুরোভাগে দেখিলাম, শুভ্রকেশ আর্যসদৃশ ঋষিকল্প অপূর্ব কবিমহাত্মা, জ্ঞানে যিনি আকাশের মত উদার, প্রেমে যিনি সাগরের মত গভীর, কর্মে যিনি সূর্যের মত নিরলস। 'সহস্র ব্যাঘাত' সত্ত্বেও মানবিক মহত্ত্বে যিনি অবিশ্বাস করিলেন না ; দানবের আস্ফালন দেখিলেন, 'নাগিনীর' 'বিষাক্ত নিঃশ্বাস' 'বিষাইছে বায়ু'—তাও অনুভব করিলেন, তথাপি কহিলেন জয় হইবে, জয় হইবে, আদর্শের জয় হইবে।

অসভ্য এই বিংশশতাব্দী অনাগত সভ্যশতাব্দীর মানবাদর্শকে অর্থহীন স্বপ্নকল্পনা মনে করিয়া পরিহার করিতে পারে, কিন্তু মানবাত্মার অন্তর্নিহিত সেই আদর্শ সত্য। পৃথিবীতে অজস্র বাধা সত্ত্বেও নিত্যই সে আকর্ষণ করিতেছে। এমন অনেকে আছেন বা ছিলেন যাঁহার একথা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া গৃহীত না হইলেও অবিশ্বাস করেন না। তাঁহারা মনে করেন, বহু বিচ্যুতি, বহু ক্ষতি, বহু লোভ এবং বহু পাপ-বাসনার পথ দিয়া পৃথিবী দুর্বার গতিবেগে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, প্রতিমুহূর্তেই সে সীমার বেড়াজাল ভাঙ্গিতে চাহিতেছে। বস্তুতঃ পৃথিবী যাহা আছে, তাই লইয়া সে খুশী থাকিতেই পারে না। যাহা পাইয়াছি, যা' ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, যাহা পাই নাই তাহার তুলনায় তা একান্তই তুচ্ছ ; তাই যাহা পাইয়া আছি, তাহা লইয়া বিচার ফলপ্রসূ নহে। মানুষ তাই আলোচ্য বিষয় নহে, আলোচ্য বিষয় মানব-ব্রহ্ম।

এই মানব-ব্রহ্ম কাহার ভিতর কতটুকু জাগ্রত হইয়াছে, বলা দুষ্কর। কিন্তু শ্রেয়কে চরিত্রে প্রতিভাত করার জন্য যতটুকু পরিমাণে আপনি সাধনশীল আছেন, ততটুকু পরিমাণে আপনি যে তাঁহাকে পাইয়াছেন তাহা বলা যাইতে পারে। এইস্থলে অধিকার-ভেদের কথা আসিয়া পড়ে। যে একান্ত স্থূল মানুষ, অন্তর্নিহিত মানব-ব্রহ্মের মহিমা তাহার পক্ষে কিছু না বুঝাই স্বাভাবিক। পৃথিবীর সর্বত্রই আজ স্থূল মানুষের রাজত্ব বলিয়া মানব-ব্রহ্মে দিব্যানুভাব বস্তুবিশ্বের চেতনায় তেমন কোনো রেখাপাত করিতেছে না।

অতীত ভারতবর্ষের মহান দার্শনিকগণ নিবৃত্তিপন্থা অনুসরণ করিয়া মানববোধাতীত সমাধি অবস্থায় উন্নীত হইতে পারিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, প্রারম্ভেই উক্ত হইয়াছে, মানব-বোধের অতীতে কখনই যাইতে চাহেন নাই। পৃথিবী যখন বৈষয়িক সংকীর্ণতায় আবদ্ধ,

তখন পৃথিবীকে দূরে ফেলিয়া ব্যক্তিগত সমাধি বা মুক্তি তিনি চাহেন না এমন কথা তিনি একাধিকবার বলিয়াছেন। দুঃখ হইতে দূরে সরিয়া, সমস্যা হইতে পৃথক হইয়া, সংসার হইতে পর্বতকন্দরে প্রবেশ করিয়া যে জীবন-জগৎ বিস্মৃত হইতে চাহে, সে জীবন তিনি স্বীকার করেন নাই ; সমাজে, সংসারে ধ্যানদীপ্ত নির্মল মনের প্রভাব বিস্তার করিয়া সমাজ-সংসারকে উন্নত করিবার, মঙ্গলময় করিবার আনন্দই তাঁহাকে বিশেষ প্রেরণা দান করিয়াছে। এই দিক দিয়া বিচার করিলে বুঝা যায় খানিকটা বস্তুতান্ত্রিক মনোবৃত্তি * তাঁহার আছে। 'আমি তোমাদেরই লোক' তিনি যে বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য আজ আমাদের ধীরভাবে বুঝিয়া লইতে হইবে। বৈদান্তিকরা হয়তো বলিবেন, তাঁহার আধ্যাত্মিকতা বা ভূমাবোধ খানিকটা নিম্নস্তরে নামিয়া আসিয়াছে। কিন্তু সমষ্টিগত আত্মার হিতসাধনের আকাঙ্ক্ষায় জীবনধর্মের যে আদর্শ তিনি বিশ্বাস করিয়াছেন, তাহাও যখন পৃথিবীর অধিকারে আসে নাই তখন চিত্তবৃত্তিনিরোধের অথবা তুরীয় অবস্থার অবারিত আনন্দের তত্ত্ববাণী কতটুকু কার্যকরী হইতে পারে ভাবিবার বিষয়। ব্যক্তিগতভাবে আমি স্বীকার করি, যোগদর্শনের আদর্শ অত্যন্ত মহান এবং নিবৃত্তিমার্গই শ্রেষ্ঠ মার্গ। কিন্তু জীবমানবের বৈষয়িকতার দৈন্য যতদিন না পরম মানবের তপস্যায় লীন হয়, ততদিন নিবৃত্তিমার্গের কথা মুষ্টিমেয় কয়েকজন অধিকারীর মহলেই আবদ্ধ রাখা সমীচীন। আজ মনে হয়, পৃথিবীতে ব্রহ্মোপাসনা অপেক্ষা সত্যশিবসুন্দরের তপস্যাই সত্য, পরম মানবের স্ফূর্তি অত্যাবশ্যক, তাঁহার জন্য সাধনার প্রয়োজনীয়তাও অসীম। এই সাধনা পৃথিবী-মন্দিরেই সম্ভব, কেন না পৃথিবীর মানুষদের লইয়াই এই সাধনা। প্রকাশ করার যখন আর কিছুই থাকিবে না তখনই পৃথিবীর সাধনার শেষ হইতে পারে। নিবৃত্তিধর্ম তখনই পৃথিবীর চরিত্রে অকৃত্রিমভাবেই প্রতিভাত হইবার পথ পাইবে, কর্ম থাকিবে না, সাধনা অবান্তর হইবে। [গীতা ৩।১৭-১৮]

কিন্তু রবীন্দ্রদর্শন, পূর্বেই বলিয়াছি, প্রকাশধর্মী, এই কারণে প্রবৃত্তিপন্থী। প্রবৃত্তির অন্তর্নিহিত প্রেমের সম্যক স্ফূর্তিই হইতেছে আদর্শলাভের অদ্বিতীয় পন্থা। রবীন্দ্রনাথ বলেন, প্রেমই বহুধাবিভক্ত, বহুবিরোধপূর্ণ খণ্ড-বিখণ্ড জগৎকে এক অখণ্ডের মহিমায় প্রকাশ করিতে পারে। প্রেমই সমস্ত বৈপরীত্যের সুন্দর সমন্বয়, এইজন্য রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মের যে ধ্যান করিয়াছেন তাহা প্রেমস্বরূপ, রসস্বরূপ। মানুষ মহিমান্বিত হয় এই প্রেমের পূর্ণ

---

* এই বস্তুতান্ত্রিক মনোভাবই তাঁহাকে গৃহ, সমাজ, শিক্ষা ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত বহু সমস্যায় নিয়োজিত করিয়াছে। তাঁহার 'সমাজ' নামক প্রবন্ধ পুস্তকে, 'শিক্ষা'র যাবতীয় প্রবন্ধে, 'স্বদেশ' বা 'Greater India'র রচনাবলীতে, 'সমূহের' রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় ভাষণগুলিতে একদিকে যেমন উচ্চতম ভাবজীবনের অর্থাৎ সামঞ্জস্য, সঙ্গতি, ঐক্য ও প্রেমের প্রকাশ দেখিয়াছি, অপর দিকে তেমনি বস্তুগত সাধারণ যুক্তির অনন্যসাধারণ ধীশক্তিরও পরিচয় পাইয়াছি। স্বদেশ ও বিশ্বের কোনো সমস্যাই তিনি এড়াইতে চাহেন নাই, ইহাতেই কি প্রমাণিত হয় না, তিনি স্বপ্নবাদী নিছক Idealist নহেন?

প্রকাশে। রবীন্দ্রবিচারে, প্রেমস্বরূপ ব্রহ্মের আদর্শই মানুষের আদর্শ। মানুষ প্রেমিক। মানুষ প্রেম।

> Man can destory and plunder, earn and accumulate, invent and discover, but he is great because his soul comprehends all ··· ··· Essentially man is not a slave either of himself or of the world ; but he is a lover. [*Sadhana*]
>
> He misses himself when isolated ; he finds his own larger and truer self in his wide human relationship. His multi-cellular body is born and it dies ; his multi-personal humanity is immortal. [*The Religion of Man*]

'অহংকারকে ভোগাসক্তিকে উত্তীর্ণ হবে তার প্রেম, তবেই বিশ্বগত আত্মীয়তায় মানুষ হবে মহাত্মা।' [মানুষের ধর্ম]

জনমে মরণে আলোকে আঁধারে
চলেছি হরণে পূরণে,
ঘুরিয়া চলেছি ঘুরণে।···
কোথাও থাকিতে না পারি ক্ষণেক,
রাখিতে পারি নে কিছু—
মত্ত হৃদয় ছুটে চলে যায়
ফেনপুঞ্জের পিছু।
হে প্রেম, হে ধ্রুব সুন্দর,
স্থিরতার নীড় তুমি রচিয়াছ
ঘূর্ণার পাকে থরতর। [উৎসর্গ-১৫]

দ্বিতীয় খণ্ড

কাব্যমানস

প্রেম : ঐক্যতত্ত্ব

অস্থির সত্তার রূপ ফুটে আর টুটে,
'নয় নয়' এই বাণী ফেনাইয়া মুখরিয়া
মহাকাল সমুদ্রের 'পরে।
সেই স্বরে
রুদ্রের ডম্বরুধ্বনি বাজে
অসীম অম্বরমাঝে—
'নয়, নয়, নয়।
ওরে মন, ছাড়ো লোভ, ছাড়ো শোক, ছাড়ো ভয়।
সৃষ্টি নদী, ধারা তারি নিরন্ত প্রলয়।'

[ধাবমান, পরিশেষ]

প্রথম অধ্যায়

কাব্য

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

কাব্য

অথাত প্রেমজিজ্ঞাসা। প্রেমজিজ্ঞাসা অর্থাৎ প্রেমের যথার্থ স্বরূপ জানিবার ইচ্ছাই হইতেছে রবীন্দ্রদর্শনের প্রাণশক্তি। কিন্তু প্রেমের স্বরূপ ও তত্ত্ব জানা কাহার পক্ষে সম্ভব হইতে পারে? কে এই তত্ত্ব জানার যথার্থ অধিকারী?

মানুষ-জীবনের অনন্ত সম্ভাবনায় যিনি আশা রাখেন, 'ঘটে যা তা সব সত্য নহে'—অর্থাৎ বাস্তবে যা ঘটিতেছে, চর্মচক্ষুতে যা ঘটিতে দেখিতেছি, তাহাপেক্ষা 'অধিকতর সত্য' আছেই আছে এই পৃথিবীতে—এই বিশ্বাসের মহিমোজ্জ্বল আলোকে যিনি সূর্যকল্প, —বস্তুভূমির প্রত্যক্ষগোচর ঘটনার অন্তর্ভেদ করিয়াই যিনি 'মনোভূমির' অপরোক্ষ ঘটনার সম্ভাবনাগুলি দেখিতে জানেন, অহং-এর মধ্য হইতেই দেখেন আত্মার অভ্যুদয়, মূর্তের মধ্যেই দর্শন করেন অমূর্তের আবির্ভাব, সীমার মধ্যেই দেখেন অসীম, মানবের অন্তরে দেখেন পরমমানব, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের এক অখণ্ড চেতনসত্তার অনুভাবে চিত্ত যাঁহার নির্দগ্ধকল্মষ ও নির্মল, 'একক বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়া সেই এককে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করার' [স্বদেশ] সত্যে যিনি অন্তরে বাহিরে আস্থাবান, রবীন্দ্রদর্শনের প্রেমতত্ত্বে তাঁহারি কেবল অধিকার আছে।

রবীন্দ্রকাব্য অনুশীলনে এবং রসাস্বাদনে সামর্থ্য সঞ্চয় করিতে হইলে রাবীন্দ্রিক এই প্রেমতত্ত্বে অধিকারী হইতেই হইবে। ইহা শুধু আমার ব্যক্তিগত অভিমত নহে—জার্মানীর মুখ দিয়া ইউরোপও একদা এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিল। বলিয়াছিল—বস্তু বিশ্বের কলরোলের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বাণী উপলব্ধি করা যাইবে না। চিত্তসাধনার উচ্চ স্তরে যাহারা উঠিয়াছে, যাহারা শান্ত, যাহারা প্রসন্ন, যাহারা মহান এক অনন্যসাধারণ চিত্তের আহ্বানগীতিতে সাড়া দিবার কান ও প্রাণ পাইয়াছে, গভীর মৌনে প্রশান্ত আনন্দের মধ্যে তাহারাই অনুভব করিবে রবীন্দ্র-প্রেম ও প্রতিভার মহিমা। বলিয়াছেন Weser Zeitung :

রবীন্দ্রকাব্যানুশীলনে প্রস্তুতি

> For what he has to give cannot be expressed amidst multitudes ; it can only be received by those sensibilities that respond in silence to the gifts of a superior mind. [*Rabindranath Through Western Eyes*, Dr. A. Aronson.]

সামঞ্জস্য, সঙ্গতি এবং 'বৃহৎ অনুরাগে'র জন্য ব্যাকুলতা ও বিশ্বাস না থাকিলে রবীন্দ্র-প্রতিভা উপলব্ধি করা যে সম্ভব নহে, একথা ইউরোপের অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিও একদা স্বীকার করিয়াছিলেন। রোমা রোলাঁ, রথেনস্টাইন, পল ভ্যালেরি, ইয়েটস্, এ-ই, এজরা পাউণ্ড, আন্দ্রে জিদ্, গিলবার্ট মুরে প্রভৃতি মনীষিবৃন্দ রবীন্দ্র-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যাহা যাহা বলিয়াছেন, 'টাইমস্'-এর 'লিটারারি সাপ্লিমেণ্ট'-এর একটি সমালোচনা প্রবন্ধে সেই সমস্তেরই সারমর্ম একদা প্রকাশিত হইয়াছিল, বলা যায়। 'টাইমস্' লিখিয়াছিল :

> And in reading these poems one feels, not that they are the curiosities of an alien mind, but that they are prophetic of the poetry that might be written in England if our poets could attain to the same harmony of emotion and idea. That divorce of religion and philosophy which prevails among us is a sign of our failure in both. We keep our emotions for particular things and cannot carry them into our contemplation of the Universe……Some perhaps will refuse to fall under the spell of this Indian poet because this philosophy is not theirs. If it seems to us fantastic and alien, before we despise it we should ask ourselves the question : What is our philosophy ? We are very restless in thought, but we have none that poets can express. [*Rabindranath Through Western Eyes*]

মানুষ যেখানে অশান্ত, যেখানে অবিশ্বাসী, যেখানে বিশ্ব-ঐক্যের কল্পনায় প্রাণস্পন্দন অনুভব করে না, সেখানে সে সত্যকার জীবনকে জানে না। জীবনকে জানে না, তাই সত্যকার রসিক সে নহে; রসিক নহে, তাই সত্যকার তত্ত্বজ্ঞ সে হইতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞ যে নহে, জীবন তাহার খণ্ড ক্ষুদ্র পরস্পর বিরোধী আবেগ বাসনায় বিশৃঙ্খল। হয় সে খণ্ডের আসক্তিতে বন্দী, নয় যুগের প্রভাবে অন্ধ—সর্বজগদগত জীবনের মহিমা তাহার নিকট অবশ্যই অবাস্তব। মুক্তি যদি চাই, অর্থাৎ ভাবের মুক্তি, আনন্দের মুক্তি, রসের মুক্তি, তত্ত্বজ্ঞ আমাদের হইতেই হইবে। কিন্তু ভুল বুঝিবেন না, কোনো বিশেষ দর্শনতন্ত্রের বিশেষরূপের সাধনার উপর আমি জোর দিতেছি না। রবীন্দ্রনাথ হইতে যে তত্ত্ব জানিয়াছি তাহা জীবনতত্ত্ব, জীবন যাহা ছিল, যাহা আছে, যাহা হইবে, তাহারি তত্ত্ববাণী। আনন্দের মধ্য দিয়া ইহা পাই, চিত্তকে প্রসন্ন রাখিয়া ইহার সন্ধান মেলে, কোথাও বদ্ধ না হইয়া লোকে লোকে বিচিত্রের চিত্রে ইহাকে দেখিয়া চলি। তত্ত্বজ্ঞান চাই। সংশয়-জ্ঞান নহে, বিপর্যয়-জ্ঞান নহে, তত্ত্বজ্ঞান। যাহা পাইয়া আছি তাহা সত্য, না, যাহা পাইব তাহা সত্য, এই যে জ্ঞান, ইহা হইল সংশয়-জ্ঞান। যাহা পাইয়া আছি তাহা নহে, যাহা পাইব তাহাও

নহে, অন্য কিছু, এ রূপ যে জ্ঞান, রবীন্দ্র-বিচারানুসারে বলা যায় তাহা বিপর্যয়-জ্ঞান। যাহা পাইয়া আছি তাহা বাস্তব, যাহা পাইব তাহাও বাস্তব এবং সত্য—সম্ভূত ও অসম্ভূত সমস্ত লইয়া যে জীবন, সবি সত্য—অহং হইতে আত্মোদ্ধার পর্যন্ত সমস্তই সত্যের আধারে আধৃত—সুতরাং অহংএ আছি বলিয়া লজ্জা নাই, অহং হইতে আত্মায় চলিব ; রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছি বলিয়া লজ্জা নাই, রূপ হইতে রূপে রূপে প্রতি রূপে চলিব, চলিতে চলিতে অরূপে ডুবিব, অরূপ হইতে আবার আনন্দমণি আহরণ করিয়া রূপে নামিব, 'মণির' ঔজ্জ্বল্যে রূপকে করিব সুন্দরতর, সৌন্দর্যের হইবে বিস্তার, গভীরতা হইবে অতলস্পর্শী। জগতে ও জীবনে এই যে খেলা, কোথাও না বদ্ধ থাকিয়া রূপে রূপে, ভাবে ভাবে, ধ্যানে ধ্যানে বিচিত্রের এই লীলা—এ সমস্ত সম্পর্কে তীব্র সচেতনতাই রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বজ্ঞান। এই তত্ত্বজ্ঞানের আত্মা কী ? প্রেম।

রবীন্দ্রপ্রতিভার অনন্ত ঐশ্বর্যমণি আহরণে যোগ্য হইতে হইলে প্রেমের তত্ত্ব-গভীরে অবগাহন করিতেই হইবে। রাজসিক আস্ফালনে নহে, সাত্ত্বিক চিত্তের মৌনপ্রসন্নতায় রবীন্দ্রপ্রতিভার ঐশ্বর্য সূর্যের সম্মুখে বসন্তসুন্দরী বসুন্ধরার মত ঝলমল করিয়া উঠে। কিন্তু সাত্ত্বিক প্রসন্নতা কিসে পাওয়া যায় ? চিত্তের বন্ধন কিসে খসিয়া পড়ে ? সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য কিসে প্রাণ ছাইয়া বসে ? রবীন্দ্রনাথ বলিবেন, প্রেমে।

অথাত প্রেমজিজ্ঞাসা। প্রেমের স্বরূপ জানিতে হইবে। কিন্তু তাহারো পূর্বে সূত্র মধ্যস্থিত 'অথ' শব্দটি ব্যবহারের কারণ বিশ্লেষিত হওয়ার প্রয়োজন।

অথাত প্রেমজিজ্ঞাসা·· এই সূত্রের 'অথ' শব্দটি বেদান্তের শঙ্কর-ভাষ্যানুসারে আমি 'অনন্তর' অর্থে ব্যবহার করিতেছি। বেদান্তের প্রথম সূত্রটির (অথাত ব্রহ্মজিজ্ঞাসা) 'অথ' শব্দটির উপর পণ্ডিতেরা জানেন, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য বিশেষভাবে জোর দিয়াছেন। ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় অধিকারী যে নহে, অথবা ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায় অধিকারী হওয়ার জন্য যে মানুষ সাধনা করে নাই, সাধনার দ্বারা গুণসম্পন্ন হয় নাই, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা তাহার পক্ষে অনধিকারচর্চা। শঙ্করাচার্য তাই বলিয়াছেন, 'তত্রাথ শব্দ আনন্তর্য্যার্থঃ পরিগৃহ্যতে।' সূত্রস্থ অথ শব্দের অর্থ 'আনন্তর্য'—বাঙলায় বলা যাইতে পারে 'অনন্তর' 'তাহার পর'। তা হইলে 'অথাত ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'র অর্থ দাঁড়ায়, তাহার পর ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা, ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা। তাহার পর, তা হইলে কাহার পর ? সাধনার দ্বারা অধিকারী অর্থাৎ গুণান্বিত হইবার পর। বস্তুতঃ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ব্যাপারে অধিকারভেদ না মানিয়া উপায় নাই। রবীন্দ্রনাথের প্রেমজিজ্ঞাসা ব্যাপারেও এই অধিকারভেদ মানার প্রয়োজন আছে। চিত্ত যাহার তুচ্ছে আসক্ত, সাময়িক ব্যাপারে অনুলিপ্ত যাহার হৃদয়, তামসিক জগতের বিদ্রোহী বিভ্রান্তিতে নিত্য বিপর্যস্ত যাহার জ্ঞানসত্তা, 'প্রেমজিজ্ঞাসা' তাহার জন্য নহে। 'অথাত প্রেমজিজ্ঞাসা' এই সূত্রস্থিত 'অথ' শব্দটিকে শঙ্করের ন্যায় 'অনন্তর' অর্থে ব্যবহার করিলেই বুঝা যাইবে প্রেমজিজ্ঞাসার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত প্রেমাভিমুখী

'প্রেমজিজ্ঞাসা'

কোন্ সাধনার প্রতি আমি লক্ষ্য করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথের নিকট 'সহজ স্বভাবের চেয়ে …সাধনার স্বভাব যে সত্য' একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

সাধনার স্বভাব উন্মেষিত না হইলে প্রেমজিজ্ঞাসা মানুষকে ব্যাকুল করিতে আসে না। রবীন্দ্রদর্শন ও কবিতার মর্মবাণী যখন সর্বজগদ্‌গত প্রেম, তখন এই প্রেমের সৌন্দর্য ও রসোপলব্ধির প্রয়োজনে সাধনার স্বভাবকে উদ্বোধিত করিতেই হয়। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় মহাশক্তিমান ব্যক্তির পক্ষে যে ধ্যান বা যে সাধনা সম্ভব হইয়াছে তাহা আর কাহারো পক্ষে সম্ভব নহে—এই কথায় বিশ্বাস করার অর্থ হইতেছে অতিশয় ভক্তি দেখাইয়াই কবিকে লোকপৃথিবীর বাস্তব জীবন হইতে দূরে সরাইয়া রাখা। একালের এই অতিশয় ভক্তি সেকালের কটূক্তি ও গালিরই শব্দান্তর। কবি ক্ষোভ করিতেছেন: 'বিশ্বশক্তি যদি আমার কল্পনায় আমার জীবনে এমন বাণীরূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে, যাহা অন্যের পক্ষে দুর্বোধ, তবে আমার কাব্য, আমার জীবন পৃথিবীর কাহারো কোনো কাজে লাগিবে না, সে আমারি ক্ষতি, আমারি ব্যর্থতা। সেজন্য আমাকে গালি দিয়া কোনো লাভ নাই। আমার পক্ষে তাহার সংশোধন অসম্ভব, আমার অন্য কোনো গতি ছিল না।'

[বঙ্গভাষার লেখক]

অর্থাৎ কবিকে সহজ স্বভাবের ঊর্ধ্বে সাধনার স্বভাবের উচ্চতর বাণীই গাহিতে হয়। সহজ স্বভাবের দ্বারা 'কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা জগতের যে পরিচয় পাইতেছি, তাহা জগৎ পরিচয়ের কেবল সামান্য একাংশমাত্র, সেই পরিচয়কে আমরা ভাবুকদিগের, কবিদিগের, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদিগের চিত্তের ভিতর দিয়া কালে কালে নবতররূপে গভীরতররূপে সম্পূর্ণ করিয়া লইতেছি।' [তদেব]

বস্তুতঃ আমাদের স্বভাবে যাহা আছে, রবীন্দ্রনাথ তাহাই সুন্দরতররূপে 'নবতররূপে গভীরতররূপে' প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার সৃষ্টির পানে চাহিয়া আমাদেরি অন্তরের হারাধনটিকে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিয়াছি; দেখিতে দেখিতে আমাদের ছাড়াইয়া হৃদয় আমাদের বহুদূর প্রসারিত হইয়া গেছে: বর্ষণশান্ত শ্যামপ্রকৃতির মত স্নিগ্ধ সজল হইয়াছে আমাদের মন, ভালো লাগিয়াছে সংসার, ভালোবাসিয়াছি এই বিশ্ববসুন্ধরা, বলিতে চাহিয়াছি বিশ্ব আমার জন্য, বিশ্বের জন্য আমি।

এই যে জীবনবোধের রসানুভূতি, ইহা সহজ স্বভাবেই আছে। তবে সাধনার স্বভাব কি? চকিতে ক্ষণিকে উচ্চতর যে জীবনবোধটি বস্তু জগতের অর্থাৎ সহজ স্বভাবের উপর ভাসিয়া উঠে, আবার বস্তুর তাড়নায় কোন সময়ে যেন সুষুপ্তির কোলে নামিয়া যায়, সেই জীবনবোধটিকে চরিত্রে স্থায়ী ভাবে জাগাইয়া রাখিতে পারিলেই সাধনার স্বভাবকে পাওয়া হইবে। তখন খণ্ডের মধ্যেও আনন্দ দেখিব, কিন্তু খণ্ডে আসক্ত হইব না; জানিব, ইহা ছাড়া আরো আছে, জীবন শুধু খণ্ডের জন্য নহে, জীবন অখণ্ড বিশ্বের।

ক-খণ্ডে আমি যেভাবে আছি, খ-খণ্ডে আমি সে ভাবে না থাকিতে পারি, আবার গ-খণ্ডে আমি নূতন কোনো এক মোহন চিত্র দেখিয়া আকুল হইয়া উঠিতে পারি—কিন্তু ক খ গ মিলিয়া যে অখণ্ড আমিটি আমার মধ্যে রহিয়াছে, সে জানে, আমি ক-এ আছি আবার নাই ; খ-এ আছি আবার নাই ; গ-এ আছি আবার নাই। এই আছি এবং নাই—এই দ্বৈত সত্যের সমন্বয়রূপে আমি বিশ্বমধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছি। যেখানে এবং যেরূপেই থাকি না কেন, এই বিশ্ববোধ-এই অখণ্ডবোধটি সচেষ্ট থাকিলেই রবীন্দ্রনাথকে বুঝা অত্যন্ত সহজ।

কথা উঠিতে পারে, এই বিশ্ববোধ না জাগিলেই বা ক্ষতি কি ? বিশেষ বা খণ্ডবোধের আলোড়নেই তো শিল্পের উদ্ভব, শিল্পোপলব্ধির ব্যাপারে বিশেষ বা খণ্ডবোধই সহায়তা করিবে না কেন ?

খণ্ডবাদীদের এই প্রশ্নের উত্তরে আর একটি প্রশ্ন জাগিতেছে। প্রশ্নটি এই—যথার্থ শিল্প কি খণ্ডের মধ্যে আবৃত থাকিয়াও অখণ্ডের ভাবমহিমায় উত্তীর্ণ হইবার আনন্দে উদ্দীপ্ত নহে ? যে শিল্প বিশেষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, যাহার 'সুন্দর' একান্তভাবেই প্রত্যক্ষ এবং ইন্দ্রিয়-গোচর, ইন্দ্রিয়গণ তৃপ্ত হইলেই যাহার মূল্য অবসিত হইয়া যায়, মন যাহা লইয়া ধ্যানের লীলা করিবার অবসর পায় না, শিল্প হিসাবে তাহা কি উচ্চশ্রেণীর বলিয়া রসিকমহল গ্রহণ করিবেন ? জয়দেবের কবিতাশিল্প ইন্দ্রিয়ের অধিকার ছাড়িয়া উদার জীবনবোধের ব্যাপ্তির পটভূমে উত্তীর্ণ হইতে পারে না বলিয়াই কি কালিদাসের কবিতা হইতে নিম্নস্তরের বলিয়া বিবেচিত হয় না ?

রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন : 'জয়দেবের "ললিতলবঙ্গলতা" ভালো বটে, কিন্তু সে শিল্প নহে। ইন্দ্রিয় তাহাকে মন মহারাজের নিকট নিবেদন করে, মন তাহাকে একবার স্পর্শ করিয়াই রাখিয়া দেয়, তখন তাহা ইন্দ্রিয়ের ভোগেই শেষ হইয়া যায়। ললিতলবঙ্গলতার পার্শ্বে কুমারসম্ভবের একটা শ্লোক ধরিয়া দেখা যাক :

আবর্জ্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং
বাসো বসনা তরুণার্করাগম্।
পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব ॥

'ছন্দ আলুলায়িত নহে, কথাগুলি যুক্তাক্ষর বহুল, তবু ভ্রম হয়, এই শ্লোক ললিত-লবঙ্গলতার অপেক্ষাও কানে মিষ্ট শুনাইতেছে। কিন্তু তাহা ভ্রম। মন নিজের সৃজন শক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয়সুখ পূরণ করিয়া দিতেছে। যেখানে লোলুপ ইন্দ্রিয়গণ ভিড় করিয়া না দাঁড়ায়, সেইখানেই মন এইরূপ সৃজনের অবসর পায়। 'পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা'—ইহার মধ্যে লয়ের যে উত্থানপতন আছে, কঠোর কোমলে যথাযথরূপে মিলিত হইয়া ছন্দকে যে দোলা দিয়াছে, তাহা জয়দেবী লয়ের মতো অতিপ্রত্যক্ষ নহে, তাহা নিগূঢ়, মন তাহা আলস্যভরে পড়িয়া যায় না, নিজে আবিষ্কার করিয়া লইয়া খুশি হয়। এই শ্লোকের মধ্যে

যে একটি ভাবের সৌন্দর্য, তাহাও আমাদের মনের সহিত চক্রান্ত করিয়া অপ্রতিগম্য একটি সঙ্গীত রচনা করে। সে সঙ্গীত সমস্ত শব্দসঙ্গীতকে ছাড়াইয়া চলিয়া যায়, মনে হয় কান জুড়াইয়া গেল, কিন্তু কান জুড়াইবার কথা নহে, মানসী-মায়ায় কানকে প্রতারিত করে। আমাদের এই মায়াবী মনটিকে সৃজনের অবকাশ না দিলে, সে কোনো মিষ্টতাকেই বেশিক্ষণ মিষ্ট বলিয়া গণ্য করে না।' [কেকাধ্বনি, বিচিত্র প্রবন্ধ]

আসল কথা, সেই শিল্পই উন্নত শিল্প যাহা মনকে সৃজনের অবকাশ দেয়। যে শিল্পের সৌন্দর্যের ও সঙ্গীতের বিস্তার অপরিমেয়, ইন্দ্রিয় যাহার সীমা না পাইয়া স্তব্ধ হইয়া যায়, মন, সেই সুযোগে, তাহা লইয়াই ধ্যান-ধ্যান খেলিতে সুরু করে, এই খেলাই রসোদ্বোধনার অবারিত আনন্দ। কিন্তু মনই যেখানে ইন্দ্রিয়ের বশবর্তী, ইন্দ্রিয় হইতে কোনো অন্যতর প্রকৃতি মন যেখানে পায় নাই, সেখানে উচ্চতর শিল্পসৃষ্টি যেমন সম্ভব নহে, উচ্চতর শিল্পের উপলব্ধিও তেমনি সম্ভব নহে। রসজীবনের চরমকে জানিতে হইলে খণ্ডের মধ্যে, ইন্দ্রিয়ের মধ্যে বন্দী থাকিলে চলে না, খণ্ডকে পার হইতে না পারিলে রসের চরিতার্থতা লাভ অসম্ভব।

অখণ্ডবোধের মধ্যে কোনো আসক্তি নাই অথচ বৈরাগ্য অর্থাৎ 'বৃহৎ. অনুরাগ' আছে। এই কারণে অখণ্ডবোধই মানুষকে দর্শনের ভাষায় তত্ত্বজ্ঞ এবং শিল্পের ভাষায় রসজ্ঞ করিয়া তুলিতে পারে। যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ বা রসজ্ঞ যিনি, তিনি কিছুতেই কোনো বিশেষ বা খণ্ডে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অধিকারে আবদ্ধ থাকিতে পারেন না। ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাঁহার তপস্যা নহে একথা সত্য, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া ক্ষুদ্র কোনো আবেগাংশে বন্দী থাকা তাঁহার ধর্ম নহে।

রবীন্দ্রনাথ হইতেই আমি এ সমস্ত তত্ত্ব জানিয়াছি। অখণ্ডদৃষ্টিতে যখন অখণ্ড রবীন্দ্রনাথটিকে দেখিতে পাইলাম, তখনই বুঝিলাম সহজ স্বভাবে আমি যাহা চাহি, তাহার দ্বারা পূর্ণ রসজ্ঞ বা তত্ত্বজ্ঞ হওয়া সম্ভব নহে। সহজ স্বভাবে আমি হয়তো 'মানসী'তেই স্ফূর্তি পাই, কিন্তু 'নৈবেদ্য'র রসানুভূতি অর্জন করিতে হইলে ভিন্ন রুচিবোধের সাধনার প্রয়োজন। এইখানেই সাধনার স্বভাবের কথা আসে, ভিন্নতর জীবনবোধের কথা উঠে। এই আমার স্থির বিশ্বাস। জীবনবোধ যাঁহার যত বিস্তৃত রসগ্রাহিতা তাঁহার তত সূক্ষ্ম এবং স্বচ্ছ। এই কথাটি বোধে সত্য হইয়া চরিত্রে প্রতিভাত হইলেই বুঝিতে পারি খণ্ড-রবীন্দ্রনাথের নহে, সমগ্র রবীন্দ্রনাথটির মর্মবাণীই রবীন্দ্রবাণী। সীমার মধ্যে অসীমের মত খণ্ড-রবীন্দ্রের মধ্যে বৃহৎ রবীন্দ্রনাথের আভাস মাত্রই মেলে, পূর্ণরূপটি মেলে না।

'কোন্ গীতিকাব্যরচয়িতার কোন্ কবিতা ভালো, কোন্‌টা মাঝারি তাহাই খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখানো সমালোচকের কাজ নহে। তাঁহার সমস্ত কাব্যের ভিতর দিয়া বিশ্ব কোন্ বাণীরূপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে, তাহাই বুঝিবার যোগ্য। কবিকে উপলক্ষ্য

করিয়া বীণাপাণি বাণী, বিশ্বজগতের প্রকাশশক্তি আপনাকে কোন আকারে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাই দেখিবার বিষয়।' [বঙ্গভাষার লেখক]

বীণাপাণি বাণী কবির সমগ্র সৃষ্টির মধ্য দিয়া জীবনের এই একটি তাৎপর্য প্রকাশ করিয়াছেন : অখণ্ড বোধই জীবনবোধ, রসবোধ। এই অখণ্ডবোধ অর্জন করা যায় কিসে? সাধনার স্বভাবে। সাধন-স্বভাবের আত্মা কী? প্রেম।

ধর্মসাধনার জন্য প্রেম, কর্মসাধনার জন্য প্রেম, তত্ত্বসাধনার জন্য প্রেম, সুরসাধনার জন্য প্রেম, রসোদ্বেজনার জন্য প্রেম, সংক্ষেপে মর্ত্যজীবনে স্বর্গজীবন যাপনার জন্য প্রেম। 'আমরা প্রেমকেই চাই,' [মানুষ, শান্তিনিকেতন-১]—রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, এবং আমাদের দিয়া বলাইয়াছেন।

লক্ষ্য করিতে হইবে 'বলা' এবং 'বলানো' এক জিনিস নহে। বলা খুবই সহজ, যে-সে বলিতে পারে। কিন্তু বলা যখন বলার মত বলা হয়, তখনই তা মানুষকে মুগ্ধ করে, লুব্ধ করে। যাহাকে শুনাই, তাহাকে যদি কথার মত কথা শুনাইতে পারি, যদি কথার ছন্দে, সুরে ও ভঙ্গীতে শুধু সত্য নয়, কল্যাণ, শুধু কল্যাণ নয়, পরন্তু সুন্দর আবির্ভূত হয় অবারিত আনন্দে, তা' হইলে তাহাকে সহজেই জয় করিয়া লই, প্রভাবিত করিয়া লই; তখনই, বলা বাহুল্য, আমার শ্রোতৃবন্ধুর হৃদয় আমারি সুরে গাহিতে থাকে, আমারি ভাবে ভাবিতে থাকে। শিল্পের মাহাত্ম্যই এই।

রবীন্দ্রনাথ প্রেমের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু এমন সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন, এমন বিচিত্র করিয়া বলিয়াছেন যে, অজ্ঞাতসারেই আমরা তাহাতে প্রভাবিত হইয়া গিয়াছি। যে প্রেম আমরা বস্তুজীবনে প্রতিভাত করিতে পারি নাই তাহাই আমাদের সহজ স্বভাবের দ্বারদেশে আসিয়া করাঘাত করিয়াছে, আমাদের ঘুম হইতে দিয়াছে জাগাইয়া। 'কী ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনী' বলিয়া আমরা যখন জাগিয়া উঠিয়াছি, কেমন যেন অভিনব আনন্দ-বেদনায় হৃদয় গুরু গুরু করিয়া উঠিয়াছে, নবতম সুন্দর এক মহান জীবন-স্বপ্নে চিত্ত আলোড়িত আন্দোলিত হইয়াছে। যাহা আছি তাহা লইয়া আর খুশি রহিতে ইচ্ছা হয় নাই 'হইব, হইব', বলিয়া তখন মানসগতির অবারিত তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতেই প্রাণ চাহিয়াছে।

রবীন্দ্র-শিল্পে প্রেম-স্বভাবের উদ্বোধন

শিল্পের দর্শন মানুষকে পূর্ণ না হউক, পূর্ণের ইঙ্গিতটুকু অন্তরে দান করিয়া যায়। অপূর্ণ যে আছি এইটুকু জানিতে পারাও জীবনে পরম লাভ। বৃহত্তের জন্য ক্রন্দন, ইহা সাধারণ ব্যাপার নহে। আমি অপূর্ণ, কিন্তু ক্রন্দন জাগিল : নাল্পে সুখমস্তি; অতএব,

চলো যাই। কোনো কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া নয়, ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ করিয়া নয়, পরন্তু আপনার সহজ স্বভাবের আস্বাদন বোধ হইতেই উন্মেষিত হইয়া যাহা হওয়া উচিত তাহাতে, সেই পূর্ণ আনন্দবোধে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, মানবিকতার মাহাত্ম্যবোধে, অগ্রসর হইয়া চলি। নবোত্থিত নবীন প্রেম আর আমাদের স্থির থাকিতে দেয় না, জীবনকে অহরহঃ এক হইতে আরে, ভাব হইতে ভাবান্তরে লইয়া যাইতে থাকে। এইভাবে আমরা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে, বিশ্ব হইতে বিশ্বান্তরে উধাও হইতে চাই। উধাও নীলাকাশ হইতে, বাসনা আছে বলিয়া, নীড়ে আবার ফিরিতে হয় বটে, কিন্তু নীলাকাশের অবারিত নীলিমার স্বপ্ন চিত্তকে স্বর্গোপম উজ্জ্বল করে বলিয়া সংসারে যাহা দেখি তাহাই স্বর্ণাভ সৌন্দর্যে উজ্জ্বল বলিয়া মনে হইতে থাকে। বৃহতের দৃষ্টিতে সমস্তই বৃহৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অখণ্ডের দৃষ্টিতে খণ্ডও অখণ্ডের আভাস দেয় আনিয়া। তখন খণ্ড ক্ষুদ্র দোষত্রুটিবহুল বস্তু-সংসারের তুচ্ছতাগুলি চোখে পড়ে না, মনে হয় সংসারে যাহা কিছু আছে, যাহা হইতেছে, সমস্তর মধ্যেই সত্য আছে, নিয়ম আছে, সুন্দর আছে, সামঞ্জস্য আছে।

মানুষের মধ্যে অহং বোধই যখন প্রবল, অহং যখন অহং রূপেই সহস্র বাহু বিস্তার করিতে চাহে, তখন রবীন্দ্রনাথের এই শিল্পদর্শন তথা প্রেমদর্শন জীবন-নিরপেক্ষ একপ্রকার ভাববাদী কবিত্ব বলিয়াও সমালোচিত হইতে পারে। কিন্তু একথা কি কবিত্ব মাত্র, যে প্রেমের যতটুকু আলো অহং ধরিতে পারে ততটুকু আলোর মহিমাতেই কোনো না কোনো ক্ষেত্রে সে উজ্জ্বল হইয়া থাকে? মানবরূপী যে দানবটা দেশকে ঠকাইয়া, মানুষকে শোষণ করিয়া টাকার পর টাকা করিতেছে, একটি টাকা অকারণে ব্যয় করিতে গেলে যাহার প্রাণ রুষিয়া উঠে, ফুঁসিয়া উঠে, সেই কৃপণস্বভাব অর্থসর্বস্ব দানবটাই তাহার প্রিয়জনের সন্তুষ্টির জন্য কি অকাতরে টাকা ব্যয় করিয়া চলে না? প্রিয়জনের ক্ষেত্রে সে কি উন্নতস্বভাব সুন্দর মানুষটি নহে, দুর্ভিক্ষের দিনে শতসহস্র মানুষকে পথের কুকুরের মত অনাহারে মরিতে দেখিয়াও হৃদয় যাহার এতটুকু বিগলিত হয় না, সেই নির্মম নরদানবটাই যদি তাহার পোষা কুকুরটির জন্য মাংস একদিন কেনা হয় নাই বলিয়া ভৃত্যদের উপর মারমুখী হইয়া উঠে, মনস্তাত্ত্বিকেরা তখন অবাস্তব কোনো মনের খেলা লক্ষ্য করিতেছেন বলিয়া কি মনে করিবেন?

প্রেমের আলো অহংএর যে অংশে পড়ে সেই অংশটুকু অন্তরে শুভ্রকুসুমের মত প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। ইহা কবিত্ব নহে, অবাস্তব কল্পনা নহে, ইহা দৈনন্দিন গৃহজীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ সাধারণ সত্য। যে বিষয়ে আমাদের প্রেম, সে বিষয়ে আমরা আরাম পাই, স্বস্তি অনুভব করি। যাহার উপর আমাদের প্রেম অর্থাৎ যাহার দ্বারা আমাদের অন্তরে প্রিয়ত্ববোধ জন্মায়, সে আমাদের প্রেমাস্পদ, তাহার জন্য আমরা সর্ববিধ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। অহংএর মধ্যে, সহজ স্বভাবের মধ্যে এই সত্যের তাৎপর্য নিহিত আছে।

জীবজগতের অহংটুকুর মধ্যে প্রেমের সীমাবদ্ধ লীলা আমরা প্রত্যহই লক্ষ্য করি।

নিজের প্রতি প্রেম আছে বলিয়া নিজের ভোগে বিশ্বকে লাগাইতে চাই। আমি ও আমার চারিপাশে যে বা যাহারা আমার সুখ বিধানের জন্য আছে, নিজেকে ভালোবাসি বলিয়া তাহাদেরও ভালোবাসি। অহংএর এই ক্ষুদ্র সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ ভালোবাসাই জৈব স্বভাব, সহজ স্বভাব। কোনো তার্কিকই এই জৈব স্বভাবের বিরুদ্ধে তর্ক তুলেন না।

কিন্তু মানুষের অহং পশুর অহং নহে, সে আপনাকে বিস্তৃত করিতে চাহে। সে সংকীর্ণ গণ্ডীবদ্ধ কতকগুলি প্রিয়-পরিজন লইয়াই খুশি রহে না, সে তাহার আধিপত্য বিস্তার করিতে চাহে দিগ্‌দিগন্তে। তাহার অহংকার তাহাকে ক্ষুদ্র সীমার বাহিরে ঠেলিয়া দেয়, সে অগ্রসর হইতে হইতে দূরদেশে দূরতম সীমাও একদা অতিক্রম করে। ক্ষুদ্র গণ্ডীঘেরা সংসারে অহংপ্রেমে যে সমস্ত স্বার্থ, যে সমস্ত মলিনতা, যে সমস্ত বাসনা থাকে, দূরতম দূরদেশে বিস্তৃত হওয়ার মাহাত্ম্যে ঠিক সেই স্বার্থ, সেই মলিনতা, সেই বাসনা তাহার থাকে না। বাসনা থাকে, তবে তাহার রূপান্তর ঘটে। অহং এই রূপ হইতে রূপের মধ্যে দিয়া যা হইয়া উঠে, তা' ঠিক আর অহং নহে, তা' বৈদান্তিক ভাষায় আত্মা না হইলেও রাবীন্দ্রিক ভাষানুসারে তা সাধনার স্বভাব, তা' আত্মা।

'স্বার্থ ও অভিমানের ঘাত প্রতিঘাত কত আঁকা বাঁকা পথ নিয়ে, কত বিস্তারের মধ্য দিয়ে, ছোটো বড় কত আসক্তির অনুরক্তিকে বিদীর্ণ করে জীবাত্মার প্রেমের নদী প্রেম-সমুদ্রের দিকে গিয়ে মিলছে। প্রেমের শতদল পদ্ম অহংকারের বৃন্ত আশ্রয় করে আত্ম থেকে গৃহে, গৃহ হতে সমাজে, সমাজ হতে দেশে, দেশ হতে মানবে, মানব হতে বিশ্বাত্মায় ও বিশ্বাত্মা হতে পরমাত্মায় একটি একটি করে পাপড়ি খুলে দিয়ে বিকাশের লীলা সমাধান করছে।' [পার্থক্য, শান্তিনিকেতন-১]

রবীন্দ্রনাথের প্রেমদর্শনে এই অংশটি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয়। দার্শনিক দেকার্ত-এর মত অহংবোধকে তিনিও প্রাথমিক প্রাধান্য দিয়াছেন। প্রেমের চিন্তায় যোগী বা সন্ন্যাসীদের মত তিনি যদি অহংকে বাদ দিতেন, তবে তাঁহার দর্শনে ও কাব্যে কোনো সমন্বয় খোঁজা ব্যর্থই হইত। ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথেও অহং পরিপন্থী নহে বরং সহায়ক—এই চিন্তা দর্শনজগতের একটি অভিনব আবিষ্কার বলা যায়। বৈদান্তিকগণ মনের অতীতের তত্ত্বকথা বলিতে চাহেন বলিয়া জগৎ তাঁহাদের নিকট মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে; রবীন্দ্রনাথের নিকট জগৎ মিথ্যা নহে; সুতরাং মানুষ মিথ্যা নহে, মানুষের মধ্যে যত আবেগ, যত প্রবৃত্তি আছে—কিছুই, কিছুই মিথ্যা নহে। কিন্তু ব্রহ্মকে পাইতে চাহিলে কি এ সমস্তকে মিথ্যা কহিব না? রবীন্দ্রনাথ কহিবেন, সর্বজগদ্‌গত ব্রহ্ম বা প্রেমের মধ্য দিয়া এ সমস্ত দেখি বলিয়া এগুলিকে মিথ্যা কহিব না। ব্রহ্ম অহং এর মধ্যেও আছেন। অহংকে কি তিনি তিরস্কার করিতেছেন? না, কারণ: 'তাঁর প্রেমের ক্ষেত্র হচ্ছে অহংকারবদ্ধ জীবাত্মা। এই অহংকারকে জীবাত্মার

সীমা বলে তিরস্কার করলে চলবে না। জীবাত্মার এই অহংকারে পরমাত্মা নিজের আনন্দের সীমা স্থাপন করেছেন—নতুবা তাঁর আনন্দের কোনো মর্ম থাকে না।

'এই অহংকারে যদি কেবল পার্থক্যই সর্বপ্রধান হোত তাহোলে আত্মায় আত্মায় বিরোধ হবার মতোও সংঘাত ঘটতে পারত না—আত্মার সঙ্গে আত্মার কোনো দিক থেকে কোনো সংস্পর্শই থাকতে পারত না। কিন্তু তাঁর প্রেম সমস্ত আত্মাকে আত্মীয় করবার পথে চলেছে, পরস্পরকে যোজনা করে প্রত্যেক স্বাতন্ত্র্যের নিহিতার্থটিকে জাগ্রত করে তুলছে। নতুবা জীবাত্মার স্বাতন্ত্র্য ভয়ংকর নিরর্থক হোত।' [তদেব]

অহংপ্রেমই ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া আত্মানন্দের অভিমুখী হইতেছে, প্রত্যেক স্বাতন্ত্র্যকে যথোচিত মর্যাদা দিয়াই অভিনব একপ্রকার ঐক্য ও আত্মীয়তার তত্ত্ব স্থাপন করিয়া অগ্রসর হইতেছে—রবীন্দ্রনাথের প্রেমদর্শনের এই সাধারণ কথাটি বুঝা হইলেই তাঁহার তত্ত্বদর্শন যে একান্তভাবেই জীবনসম্পর্কিত সুগম তত্ত্ব, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ করিয়া, রেচক পূরক কুম্ভকে তৎপর হইয়া এই অহংপ্রেমকে লাভ করিতে হয় না, সহজ স্বভাবেই ইহা আছে, মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই, অনেক সময় অজ্ঞাতসারেই, ইহাকে সাধনার স্বভাবে উন্নীত করিয়া চলিয়াছে। তবে কথা এই, সহজ স্বভাবের এই প্রেমাভিমুখিতাকে যদি জ্ঞানের দ্বারা ব্যাকুল করিয়া তুলি, তবে তাহার গতি একটু দ্রুততা প্রাপ্ত হয়, সাধনার স্বভাব কর্মে ও প্রেমে অল্পকালের মধ্যে প্রকাশ পাইতে থাকে।

কবিতার মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথের যে শিল্পজীবন প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার ঐতিহাসিক ধারাপ্রবাহ যাঁহারা অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন অহংএর বৃন্তটি আশ্রয় করিয়াই তাঁহার প্রেমাত্মার শতদলটি ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার আত্মা মনোগত আত্মা বলিয়া জীবনবেগ তাঁহার কোনোদিনেই মন্দীভূত হয় নাই। যে মন আত্মাকে, বৃহৎকে জানে না বা চাহে না, সে মন বিশেষে লিপ্ত হইয়া অল্পতেই নিস্তেজ হইয়া পড়ে; সৃষ্টি তাহার সংকীর্ণ—ধ্যান তাহার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ আত্মাতে আত্মা হন নাই সত্য, কিন্তু আত্মা চাহিয়াছেন বলিয়া বৃহত্তর জীবন কেবলি তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে। বেগে বেগে বিচিত্র বেগের অন্তহীন দ্বন্দ্বে ও আনন্দে তিনি মনের আত্মরূপ কি না বিশ্বরূপ, অর্থাৎ 'সীমার মাঝে অসীম'রূপ দেখিতে দেখিতে চলিয়াছেন। আত্মার আত্মা হইয়া অদ্বৈতকে পাওয়াই তাঁহার আদর্শ বটে; কিন্তু এই আদর্শ লাভ করা হয় নাই বলিয়া দ্বৈত বোধও তাঁহার থাকিয়া গেছে। প্রেমের মধ্যে তিনি অদ্বৈতকে অনুভব করিয়াছেন আবার দ্বৈতবোধেও আন্দোলিত হইয়াছেন। এই আন্দোলন, এই দ্বন্দ্ব-দর্শন, দ্বন্দ্ব-লীলার এই বৈচিত্র্যশিল্প তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছে বলিয়াই তিনি কবি। মন আছে, বাসনা আছে, অথচ মন আত্মার স্পর্শ পায়, তাই মন দিয়া তিনি যাহা

স্পর্শ করিয়াছেন তাহাই আত্মার আভাস, অসীমের আভাস দিয়াছে; মন আছে, তাই জগতকে স্পর্শ করেন; মন বৃহতে আছে, তাই স্পর্শ করিয়াই অন্যত্র অর্থাৎ বৃহতে অগ্রসর হন। শান্তি নাই—নিত্য গতি। কেবলি ছুটিতে হইয়াছে, বিশ্বের মধ্যে কোথায় যেন সেই অদ্বৈত, সেই এক, পরম এক আছেন—এই বিশ্বাসে অহরহঃ ছুটিতে হইয়াছে। চলার পথে অজস্র ফুল ফুটাইয়া তিনি চলিয়াছেন; আমরা সেই সমস্ত ফুল লইয়া তাহাদের রূপরসবর্ণের কত না বিশ্লেষণ করিতেছি, কিন্তু মনোগত সেই আত্মা নানাকে ঐক্যের মধ্যে লইয়া অনন্ত অদ্বৈতকে খুঁজিয়া ফিরিতেছেন।

বৈদান্তিকগণ বলিবেন, মন দিয়া অদ্বৈতকে খুঁজিতে গেলে দ্বন্দ্ব নিঃশেষিত হয় না। কিন্তু খুঁজিতে তিনি গিয়াছেন—এ কথা তো অসত্য নয়, কাহারো মন-গড়া কথা নয়। বিশ্বদ্বৈতের মধ্যে তিনি অদ্বৈত প্রেমকে খুঁজিতে চাহিয়াছেন। এই যে খোঁজার তত্ত্ব, এই-ই তাঁহার অদ্বৈত তত্ত্ব—অদ্বৈত প্রেমের তত্ত্ব। রবীন্দ্রকাব্য যত্ন সহকারে বিশ্লেষণ করিয়া যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন এই খোঁজার তত্ত্ব তাঁহার ছোট বড় সমস্ত কাব্যেই প্রকটিত হইয়াছে।

কবির বালকবয়সের কবিতাবলীতে জৈবপ্রেমের আর্তি আছে, কামনা আছে, দুঃসহতম কামবুভুক্ষার বহ্নিময় যন্ত্রণা আছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কোথায় যেন এই বেদনাবোধটুকুও আছে—কী যেন পাইয়াও পাইতেছি না।

প্রকৃতির যত আছে অতুল সৌন্দর্যরাশি,
প্রণয়ের আছে যত সুধা হতে সুধা,
কল্পনার আছে যত তরল স্বর্গীয় গীতি
সকলি হৃদয়ে মোর দিয়াছি ঢালিয়া—

তবু "প্রাণের শূন্যতা" ঘুচিল না। "হৃদয়ের বিনিময়ে হৃদয়" তিনি পাইয়াছেন বটে, কিন্তু প্রেমবিলাসে প্রমত্ত হইয়া "নিশাচর বিলাসকে" সেবা করিতে তিনি পারিবেন না। তবে কী তিনি করিবেন? কী তাঁহার চাই?

এত তারে ভালোবাসি তবু কেন মনে হয়
ভালোবাসা হইল না আশ মিটাইয়া,
আঁধার সমুদ্রতলে কি যেন বেড়াই খুঁজে
কি যেন পাইতেছি না চাহিতেছি যাহা।

'কবিকাহিনীর' বালক কবি কী চাহিয়াছিলেন? কাহিনীতে দেখিতেছি নৈরাশ্য প্রচুর, দ্বন্দ্ব প্রচুর, সংশয় প্রচুর কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই, কাব্যখানিতে প্রেমের অমরত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে ব্যক্তিপ্রেম বিশ্বপ্রেমে একদা উন্নীত হইবে। পড়িলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়, বালককবি কল্পনা করিতেছেন যে, কাহিনীর কবিনায়ক বহু দুঃখ, বহু সংশয় ও বেদনা অতিক্রম করিয়া জীবনের পথে চলিল। ক্রমশঃ তাঁহার যৌবন আসিল ফুরাইয়া, বৃদ্ধ হইল প্রেমিক কবি। 'মুখশ্রী' হইল 'গম্ভীর', যেন হিমাদ্রির চেয়ে 'সমুচ্চ মহান'। নেত্র হইতে স্বর্গীয় জ্যোতি হইল বিকীরিত।

কবিকাহিনী

যেন তাঁর নয়নের শান্ত সে কিরণ
সমস্ত পৃথিবীময় শান্তি বরষিবে।

একদা এই বৃদ্ধ কবি হিমালয়ের পদপ্রান্তে আসিয়া বসিলেন। প্রাচীন কাল হইতে ভারতচূড়ায় দণ্ডায়মান আছে এই হিমালয়, তাহাকে দেখিয়া কবির কত কথাই মনে পড়িল। কবি গাহিলেন, 'মানুষ সৃষ্টির অতি আরম্ভ হইতে হে গিরি, নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া কত রক্তপাত, কত অত্যাচার, কত পাপ তুমি দেখিয়াছ। মানুষ 'অধীনতা শৃংখলে' বন্দী রহিয়া কত কাঁদিয়াছে, তুমি শুনিয়াছ। কিন্তু পৃথিবীর দুঃখ কি দূর হইবে না?'

অত্যাচার গুরুভারে হোয়ে নিপীড়িত
সমস্ত পৃথিবী, দেব, করিছে ক্রন্দন,
সুখশান্তি সেথা হোতে লয়েছে বিদায়।
কবে, দেব, এ রজনী হবে অবসান?
স্নান করি প্রভাতের শিশিরসলিলে
তরুণ রবির করে হাসিবে পৃথিবী?

প্রেমের মহিমায় মহিমান্বিতা জ্যোতির্ময়ী পৃথিবীর স্বপ্ন দেখিলেন কবি। কিন্তু যে পৃথিবীতে মানুষ বাস করিতেছে, সে পৃথিবী তো পরের দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করে না। দিব্য-দৃষ্টিতে কবি তাই অন্য এক নূতন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখিলেন, যে পৃথিবীতে—

অযুত মানবগণ এক কণ্ঠে, দেব,
এক গান গাইবেক স্বর্গ পূর্ণ করি।...
নাই ভিন্ন জাতি আর নাই ভিন্ন ভাষা,
নাই ভিন্ন দেশ ভিন্ন আচার ব্যাভার।

অনাগত সেই সুন্দরী পৃথিবীই কবির প্রেমের উপযুক্ত। সেই পৃথিবীর স্বপ্ন মিথ্যা নয়—
পৃথ্বি সে শান্তির পথে চলিতেছে ক্রমে।

মনোদর্শন বিচারপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই 'কবিকাহিনীর' একটি বিশেষ মূল্য আছে বলিয়া আমি মনে করি। 'কবিকাহিনী'ই কবির প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। কাব্যটি একটি গল্পের মধ্য দিয়া গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। গল্পটির মধ্যে দেখি, প্রকৃতির প্রতি নায়কের অনুরক্তি অসীম কিন্তু প্রেমহীন জীবনে প্রকৃতির কোনো তাৎপর্য নাই, 'মানুষের মন চাহে মানুষের মন' এমন বোধও ইঙ্গিত হানিতেছে। ইহার পর সঙ্গিনী যদি মিলিল, কামনার বিহ্বলতা জাগিল, সহসা কামনার কুশ্রীতায় থাকিতে না পারিয়া আন্দোলিত হইল বৈরাগ্যের ব্যাকুলতা। সঙ্গিনীকে ত্যাগ করিয়া উচ্চতর জীবন অনুসন্ধানে দূরে চলিল কবি-নায়ক। কিন্তু মানুষকে ত্যাগ করিয়া কোথায় পাওয়া যাইবে প্রেম, উচ্চতর জীবনের আস্বাদন? তাই আবার ফিরিয়া আসিল নায়ক। কিন্তু নায়িকা ইহ-সংসারে আর যখন রহিল না, জাগিল উচ্চতর জীবনের প্রেমোপলব্ধি। নায়কের মনে হইল, জগৎ এইবার যথার্থভাবে সুন্দর হইয়াছে। নায়িকা যতদিন ছিল, বাসনাময় প্রেমের আর্তি লইয়া ঘুরিতে হইয়াছে নায়ককে। আজ সে যখন নাই, তখন মর্তের কলুষবাসনা নাই, কিন্তু প্রেমের মাধুর্য ও মাহাত্ম্যবোধ আছে। এই কলুষবিহীন প্রেমের দৃষ্টিতে সুন্দর মঙ্গলময় হইল জগত। প্রকৃতিকে সম্বোধন করিয়া নায়ক কহিল—

তোমার সুন্দর রাজ্যে হে প্রকৃতি দেবি,
তিল অমঙ্গল কভু পারে না ঘটিতে।

এইবার অকস্মাৎ কবি-নায়ক বুঝিতে পারিলেন, যাহাকে তিনি প্রেম দিয়াছেন, তাহার মৃত্যু নাই। প্রেমেই মানুষ অমর হয়। 'নলিনী'কে, কবিকাহিনীর নায়িকাকে, তিনি যে প্রেম দিয়াছেন, সেই প্রেমই নলিনীকে যেন নূতনরূপে ফিরাইয়া দিয়াছে। মর্তের নলিনী কবির অমর্ত্য প্রেম পূর্ণ করিতে পারে নাই, তাই এতদিন কবির 'প্রাণের শূন্যতা' মেটে নাই। অমর্ত্য নলিনী মৃত্যুর মধ্য দিয়া অমৃত হইয়া বিরাট হইয়া আসিল, পূর্ণ করিল কবির 'সমুদ্র হৃদয়', ক্ষোভ তাই মিটিয়া গেল, ঘুচিয়া গেল 'প্রাণের শূন্যতা'। নলিনীকে হারাইয়াই তিনি অভিনব রূপে তাহাকে ফিরিয়া পাইলেন। অতএব আর সংশয় নয়, সন্দেহ নয়—

বাজাও রাখাল তব সরল বাঁশরী,
গাহ গো মনের সাধে প্রমোদের গান।

ইহার পর কাব্যমধ্যে নূতন একটি ভাবের প্রকাশ দেখি। বিশ্বমানুষের মঙ্গলকামনায় কবি-নায়কের সাধনা শুরু হইল। পৃথিবীর শান্তির জন্য কামনা জাগিল। প্রকৃতিপ্রেম হইতে মানবপ্রেম, মানবপ্রেম হইতে বিশ্বপ্রেম ও বৃহৎ অনুরাগ—ইহাই কবিকাহিনীর বাণী।

কাব্যখানিকে তিনভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম ভাগে অহংবদ্ধ মানুষের জীবন; প্রকৃতির জড়রূপে মুগ্ধতা; কামনার চাঞ্চল্য; সঙ্গিনীর সাহচর্যের জন্য প্রমত্ততা। দ্বিতীয় ভাগে সঙ্গিনীর সাহচর্য পাইয়াও অশান্তি; বাসনায় জীবন বিষাক্ত হয় এই বোধের উদয়; ক্রমশঃ বৈরাগ্য; নূতন জীবনের জন্য আকুলতা। তৃতীয় ভাগে নায়িকার মৃত্যুতে নূতন উপলব্ধি, বাসনাবিহীন প্রেমের দৃষ্টিতে জগৎ দর্শন; প্রকৃতি তখন প্রাণময়ী, মঙ্গলময়ী; প্রাণময়ী প্রকৃতিদর্শনে মানবপ্রেম, বিশ্বপ্রেমের, উন্মেষ; বিশ্বপ্রেমের আগ্রহে হিমালয় বন্দনা; সাধন-স্বভাবের উদ্বোধন।

বালকবয়সের লেখা 'কবিকাহিনীর' মধ্যে কবিগুরু অস্পষ্টভাবে যে জীবনদর্শন-এর ইঙ্গিত দিয়াছেন, রসিক পাঠক সহজেই বুঝিতেছেন, তাহা তাঁহার পরিণত বয়সের শিল্প ও দর্শন সম্বন্ধেও একান্তভাবে সত্য। পরবর্তীকালে যে সমস্ত কাব্য তিনি রচনা করিয়াছেন, যে সমস্ত দার্শনিক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, সে সমস্তর মধ্যেও 'কবিকাহিনী'র বাণীই স্পষ্টতর যুক্তি ও বোধের দ্বারা প্রভাসিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। এই কারণে শিল্পরচনা হিসাবে কবি-কাহিনী যতই দোষযুক্ত হউক না কেন, মনোদর্শনের বিচারপ্রসঙ্গে তাহা বিশেষভাবেই প্রণিধানযোগ্য বলিয়া মনে করি। কবিগুরু অবশ্য এই সকল লেখাকে ত্যাজ্য বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। তাঁহার বালকবয়সের রচনাগুলি রক্ষা করিবার ব্যবস্থা যাঁহারা করিতে গেছেন, কবিগুরু পরিহাস করিয়া তাঁহাদের জানাইয়াছিলেন:

'ভূরিপরিমাণ যে সকল লেখাকে আমি ত্যাজ্য বলে গণ্য করি, আপনাদের সম্মিলিত নির্বন্ধে সেগুলিকেও স্বীকার করে নিতে হবে। আমার লজ্জা চিরন্তন হয়ে যাবে এবং তাতে আমার নাম-স্বাক্ষর থাকবে। অর্থাৎ ভাবীকালের সামনে যখন দাঁড়াব তখন গাধার টুপিটা খুলতে পারব না।' [রবীন্দ্ররচনাবলী-১]

ভাবীকালই বিচার করিবে কবীন্দ্রের কবিকাহিনী গাধার টুপি না প্রেমের মুকুট। সাহিত্যের মনোদর্শন যাঁহাদের বিষয়, তাঁহারা কবিকাহিনীর মধ্যে রবীন্দ্র-প্রেম-জিজ্ঞাসার অস্ফুট সম্ভাবনা দেখিয়া এবং পরিণত বয়সের বিখ্যাত কাব্যাবলীর মধ্যে সেই প্রেম-জিজ্ঞাসারই বিপুল পরিণতি দেখিয়া, অখণ্ড একটি মানসবেদের আনন্দই আস্বাদন করিবেন।

'কবিকাহিনী'তে নায়িকার মৃত্যুকে নায়কের প্রেমপ্রতিভায় মহান করিয়া তুলিবার বাণী আছে, 'বনফুলে' নায়কের অপমৃত্যুর গ্লানিমাকে নায়িকার আত্মবিসর্জনের মহিমায় গৌরবান্বিত করিবার কাহিনী আছে। কমলা বনফুলের মতই একান্তে জাগিয়া উঠিয়াছিল। নীরদের উপর ছিল তাহার প্রেম। কিন্তু নীরদের বন্ধু বিজয় ইহা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিল না। একদা লুকাইয়া আসিয়া সে ছুরিকাঘাত করিল নীরদের পৃষ্ঠে। কমলা হায় হায় করিয়া উঠিল। আহত নীরদও ব্যথিত হইল—পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত হইয়াছে বলিয়া নহে, বন্ধু বন্ধুকে হত্যা করিতে আসিল, এই দুঃখে। আর্তকণ্ঠে সে কহিল—

বনফুল

বন্ধুতার ক্ষীণ জ্যোতি প্রেমের কিরণে
(রবিকরে হীন ভাতি নক্ষত্র যেমন)
বিলুপ্ত হয়েছে কিরে বিজয়ের মনে?
উদিত হইবে না কি আবার কখন?

ইহার পর মৃত্যু হইল নীরদের। পাগলিনীর মত হইল বিরহিণী কমলা। 'কমলা বিধবা' একথা ভাবিতে হইল? নীরদ-কমলার বিচ্ছেদ—ইহাও যে ভাবিতে হইল! কমলার আর বাঁচিয়া কি হইবে? ঐ যে নীরদ তাহাকে স্বর্গ হইতে আহ্বান করিতেছে। কমলা এখনই যাইবে।

নীরদ আমাতে চড়ি প্রদোষ তারায়
অস্তগামী তপনেরে করিব বীক্ষণ;
মন্দাকিনী তীরে বসি দেখিব ধরায়
এতকাল যার কোলে কাটিল জীবন।

কহিল কমলা। তারপর নীরদের সহিত মিলিত হইবার কামনায় আত্মবিসর্জন দিল অকুতোভয়ে। কবি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া 'বনফুল' কাহিনী শেষ করিলেন:

কল্পনা! বিষাদে দুখে গাইনু যে গান,
কমলার জীবনের হোলো অবসান।

শেক্সপীয়ার রচিত 'রোমিও জুলিয়েটের' ঘটনা ঠিক এমনতর নহে; কিন্তু একটি বিষয়ে বালক কবির এই 'কাব্যোপন্যাস'-এর সহিত শেক্সপীয়রের নাটকের বেশ মিল আছে। মিল এই—নায়কনায়িকার প্রেম এবং সর্বোপরি প্রেমের জন্য নায়িকার আত্মবিসর্জন।

'ভগ্নহৃদয়ের' বিষয়বস্তুও প্রেম। প্রেমপ্রার্থিনী একজন সহায়হীনা বালিকার উপেক্ষিত প্রণয়ের ইতিকথা বড় মর্মন্তুদ ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে এই গীতিকাব্যে। মুরলা প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিত কবিকে, কিন্তু কবি সে ভালোবাসা সম্বন্ধে তেমন যেন সচেতনই ছিল না। সে ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করিত নলিনীর ভালোবাসা। নলিনী মিশিত অনেক তরুণের সঙ্গে, কবির মন তাই বড়ই বেদনা পাইত। মুখখানি তাহার অহরহঃ বিষণ্ণ বিশুষ্ক থাকিত সেইজন্য। মুরলা ব্যগ্রকণ্ঠে একদা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কবি কহিল—

ভগ্নহৃদয়

নবজাত উল্কানেত্র মহাপক্ষ গরুড় যেমন
বসিতে না পায় ঠাঁই চরাচর করিয়া ভ্রমণ,
উচ্চতম মহীরুহ পদতলে ভূমিতলে লুটে,
ভূধরের শিলাময় ভিত্তিমূল বিদারিয়া উঠে,
অবশেষে শূন্যে শূন্যে দিবারাত্রি ভ্রমিয়া বেড়ায়,
চন্দ্রসূর্য গ্রহ তারা ঢাকি ঘোর পাখার ছায়ায়,
তেমনি এ ক্লান্ত হৃদি বিশ্রামের নাহি পায় ঠাঁই—
সমস্ত ধরায় তার বসিবার স্থান যেন নাই। [১ম সর্গ]

মুরলা তো তাহার হৃদয়াসনে কবিকে বসিতে দিতে প্রস্তুত, কিন্তু মুখ ফুটিয়া সে কথা সে তো বলিতে পারে না! তাহার পর কবির মুখেই যখন সে শোনে যে, নলিনীর প্রণয়ের অভিলাষেই কবির ব্যগ্রতা, তখন তাহার বেদনা রাখিবার আর স্থান কোথায়?

কবি বলিতে থাকে—

মোর এ যে ভালোবাসা রূপমোহ এ কি?
ভালো কি বেসেছি শুধু তার মুখ দেখি?…
মধুর মুখেতে তার আঁখি দরপণে
মনচ্ছায়া হেরিয়াছি কল্পনা-নয়নে!

শুনিতে শুনিতে মুরলা উদাসিনী হইয়া যায়। মুরলা যাহাকে প্রাণ ভরিয়া চাহে, সেই সে প্রাণ-প্রিয়তম তাহারই সম্মুখে অন্য বালিকার জন্য ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে—ইহাপেক্ষা দুঃখময় ব্যাপার আর কি হইতে পারে? মুরলা মুখ ফুটিয়া প্রাণের কথা কবিকে জানাইতে পারে না, গোপনে গুমরায়, কাঁদে, আনমনে দুঃখের গীতিকা গাহে—

যার কোন রূপ নাই যার কোন গুণ নাই
তবুও যে হতভাগ্য ভালোবাসে মনে,
দুইদিন বেঁচে থাকে, কেহ নাহি জানে তাকে,
ভালোবাসে দুঃখ সহে, মরে গো বিজনে। [দশম সর্গ]

ইহার পর ভগ্নহৃদয় মুরলা সন্ন্যাসিনীর মত কোথায় চলিয়া গেল। এইবার কবি তাহার অভাব অনুভব করিল। অনেক অন্বেষণ করিয়া খুঁজিয়া বাহির করিল তাহাকে। কিন্তু মুরলা যখন কবির বিবাহ হইয়া গেছে কিনা জিজ্ঞাসা করিল, কবি কহিল, নলিনীর সহিত আজই তাহার বিবাহ হইয়া গেছে।

মুরলাকে এই সংবাদটুকু দিবার জন্যই কি কবি মুরলার এই শেষ সাক্ষাৎ ঘটানো হইল? কবিকাহিনীর নলিনীর মত অথবা বনফুলের কমলার মত মুরলার মৃত্যু হয় নাই বটে, কিন্তু কবি-নলিনীর বিবাহই কি মুরলার মৃত্যু নহে? যাহাকে প্রাণ ভরিয়া সে ভালোবাসে সেই যখন তাহাকে চাহিল না, সে আর সংসারে থাকিবে কেন? ভগ্নহৃদয়া মুরলা বৈরাগিণী হইয়া গেল। পথে পথে গাহিল—

যার কেহ নাই তার সব আছে
সমস্ত জগৎ মুক্ত তার কাছে। [সপ্তদশ সর্গ]

কবির 'কপিবুক যুগের' কাব্য ও গীতিনাট্যগুলিতে প্রায়শঃই দেখি প্রেম, বিচ্ছেদ, মৃত্যু। মৃত্যু প্রায় সকল কাব্যেই আছে। দেখাইয়াছি কবিকাহিনীতে আছে, বনফুলে আছে, ভগ্নহৃদয়ে ভিন্নরূপে আছে, রুদ্রচণ্ডেও আছে। মৃত্যু কবিকে দোলা দিয়াছে বিস্তর, কিন্তু মৃত্যুকেও অমৃতের অঙ্গ মনে করিয়া প্রসন্ন থাকার বাণী 'কপিবুক যুগে' নাই। পরবর্তী যুগে কবি অনুভব করিয়াছেন, প্রেম যখন অখণ্ডবোধে উন্নীত হয়, তখনই মৃত্যু আর মৃত্যু নহে, তাহা জীবনেরই একটি ভিন্নরূপ। বৃদ্ধ বয়সে 'প্রভাতসংগীতের' ভূমিকার মধ্যে তিনি বলিয়াছেন—"ভাবতে ভাবতেই মনে হল, মৃত্যু তাহলে কী? এক রকম করে তার উত্তর এসেছিল এই যে, জীবন সব কিছুকে রাখে, আর মৃত্যু সব কিছুকে চালায়। প্রতি মুহূর্তেই মরছি আমি, আর সেই মরার ভিতর দিয়েই আমি বাঁচার রাস্তায় এগোচ্ছি, যেন আমার মধ্যে সেলাইয়ের কাজ চলছে—গাঁথা পড়েছে অতীত ভবিষ্যৎ বর্তমান। মুহূর্তকালীন মৃত্যুপরম্পরা দিয়ে মর্ত্যজীবন এই যেমন বেড়ে চলেছে প্রবালদ্বীপের মতো, তেমনি মৃত্যুর পর মৃত্যু আমাকে দিয়ে লোক-লোকান্তরের অভিজ্ঞতার জাল বিস্তার করে চলবে—আমার চেতনার সূত্রটিকে নিয়ে মৃত্যু এক-এক ফোঁড়ে এক-এক লোককে সম্বন্ধ-সূত্রে গাঁথবে।"

'প্রবেশিকা যুগে' এই বোধ অস্পষ্টভাবে কবির মনে জাগিয়াছিল কিন্তু 'কপিবুক যুগে' এ বোধের কোন ইশারা পাই না। এই যুগের মৃত্যুবোধ অথবা প্রেমবোধ খানিকটা জড়ধর্মী এবং অহং-বদ্ধ, কিন্তু ইহাই কি ভবিষ্যযুগের মহান প্রেমদর্শনের সূচনা করিতেছে না? যাহাকে ভালোবাসি, তাহার মৃত্যু হইয়া যায়, তাহার সহিত বিচ্ছেদ ঘটে, অথবা সে অন্য কাহাকে চাহিয়া প্রাণে দাগা দিয়া যায় নির্মমের মত, এই সমস্ত কল্পনাবেগ হইতেই বালককবি প্রেমের ধারণা সুরু করিয়াছেন। তিনি ভাবিতে সুরু করিয়াছেন যে, বিচ্ছেদ হউক, মৃত্যু হউক, যে কোনো কারণেই প্রেম অকৃতার্থ হউক, "ভালবাসা অর্থে আত্মসমর্পণ নহে। ভালবাসা অর্থে, নিজের যাহা কিছু ভাল তাহাই সমর্পণ করা। হৃদয়ে প্রতিমা

প্রতিষ্ঠা করা নহে ; হৃদয়ের যেখানে দেবত্র-ভূমি যেখানে মন্দির, সেইখানে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা।" [মনের বাগান বাড়ি, বিবিধ প্রসঙ্গ]

'বিবিধ প্রসঙ্গ' নামক গ্রন্থে 'মনের বাগান বাড়ি' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি এই কথা বালক বয়সে লিখিয়াছিলেন। বেশ বুঝা যাইতেছে, তাঁহার মধ্যে কিশোর বয়সেই 'আদর্শভাবের চর্চা'র কথা চিন্তায় অন্ততঃ উন্মেষিত হইয়াছে।

"সত্যকার আদর্শ লোক-সংসারে পাওয়া দুঃসাধ্য। ভালবাসার একটি মহান গুণ এই যে, সে প্রত্যেককে নিদেন একজনের নিকটেও আদর্শ করিয়া তুলে। এইভাবে সংসারে আদর্শভাবের চর্চা হইয়া থাকে।" [তদেব]

'বন্ধুত্ব ও ভালবাসা'কে তিনি এক করিয়া ফেলেন নাই—এস্থলে এ কথাটি মনে রাখিতে হইবে। বালক বয়সে বন্ধুত্বকেই প্রেম বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু কবি তাহা মনে করেন নাই।

"প্রেম মন্দির, বন্ধুত্ব বাসস্থান। মন্দির হইতে যখন দেবতা চলিয়া যায়, তখন সে আর বাসস্থানের কাজে লাগিতে পারে না, কিন্তু বাসস্থানে দেবতা প্রতিষ্ঠা করা যায়।" [তদেব]

'আদর্শপ্রেম' নামক প্রবন্ধে কবি লিখিতেছেন—

"ভালবাসিবার জন্যই ভালবাসা নহে, ভাল ভালবাসিবার জন্যই ভালবাসা। তা যদি না হয়, যদি ভালবাসা হীনের কাছে হীন হইতে শিক্ষা দেয়, যদি অসৌন্দর্যের কাছে রুচিকে বদ্ধ করিয়া রাখে, তবে ভালবাসা নিপাত যাক।"

প্রেমের এই চিন্তা, এই বোধই পরবর্তী জীবনে তাঁহাকে বিশ্বপ্রেমের উদার বোধে উন্নীত করিয়াছে। প্রেমই কবির জীবনীশক্তি, সৃষ্টিশক্তি, প্রেমই তাঁহার শিল্প, তাঁহার দর্শন; তাঁহার ব্রহ্ম, মানব, প্রকৃতি। অবশ্য একথা সত্য, 'কপিবুক' বা 'প্রবেশিকা' যুগেই এই ভাব পূর্ণভাবে জাগরিত হয় নাই— কিন্তু ঈষৎ কলিকার মত যে 'ফুটি-ফুটি' করিতেছে—সে বিষয়ে তো কাহারও সংশয় থাকিতে পারে না।

অহং ভেদ করিয়া এই প্রেম মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে চাহিতেছে—বালক বয়সের প্রায় সমস্ত রচনাতেই তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। প্রবেশিকা যুগের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' কাব্যে নৈরাশ্য ও বিমর্ষতার আবেগ ছত্রে ছত্রে মেলে বটে, কিন্তু প্রেমের জন্যই যে এই বিমর্ষতা, প্রেম চাহিয়া না পাওয়ার দুঃখেই যে এই নৈরাশ্য তাহা বুঝিতে এতটুকু কষ্ট হয় না।

সন্ধ্যাসঙ্গীত

চলে গেল, আর কিছু নাহি কহিবার।
চলে গেল, আর কিছু নাহি গাহিবার।…

উৎসব ফুরায়ে গেলে ছিন্ন শুষ্ক মালা
পড়ে থাকে হেথায় হোথায়—
তৈলহীন শিখাগুলি ভগ্নদীপগুলি
ধুলায় লুটায়—
একবার ফিরে কেহ দেখে নাকো ভুলি,
সব চলে যায়। [পরিত্যক্ত]

অহং-জীবনের এই সুর, এই বিমর্ষতা, এই নৈরাশ্য। রবীন্দ্রদর্শন উপলব্ধি করিতে হইলে এই সুরকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। অহং মিথ্যা নয়, মিথ্যা নয় তাহার আবেগ, আসক্তি। শুধু লক্ষ্য রাখিতে হইবে এই আসক্তি কেমন করিয়া আত্মার পথে অগ্রসর হইতেছে, অহং-এর বৃন্তটি অবলম্বন করিয়া কী ভাবে আত্মার শতদল প্রমুদিত হইয়া উঠিতেছে।

আয় দুঃখ, আয় তুই,
তোর তরে পেতেছি আসন।…
জননীর স্নেহে তোরে করিব পোষণ,
হৃদয়ে আয় রে তুই হৃদয়ের ধন।…
আর কিছু নয়
নিরালায় এ হৃদয়
শুধু এক সহচর চায়,
তুই দুঃখ, তুই কাছে আয়। [দুঃখ আবাহন]

অন্য একটি কবিতায়—

ঘুমা দুঃখ হৃদয়ের ধন,
ঘুমা তুই ঘুমা রে এখন।…
কাল উঠিস্ আবার,
খেলিস্ দুরন্ত খেলা হৃদয়ে আমার,
হৃদয়ের শিরাগুলি ছিঁড়ি ছিঁড়ি মোর
তাইতে রচিস্ তন্ত্রী বীণাটির তোর,
সারাদিন বাজাস্ বসিয়া
ধ্বনিয়া হৃদয়।

আজ রাত্রে র'ব শুধু চাহিয়া চাঁদের পানে
আর কিছু নয়। [শান্তিগীত]

'অসহ্য ভালবাসা' কবিতাটিতে কবির হৃদয়াবেগের প্রাবল্য অসংযত মত্ততায় দুরন্ত হইয়া উঠিয়াছে; 'দেহের দুয়ারে মন যবে থাকে যুঝিবারে' তখন কবি যেন নিজেকে আর ধরিয়া রাখিতে পারেন না। ক্ষুব্ধ হইয়া প্রেয়সীকে কহেন—

চাও তুমি দুখহীন প্রেম
ছুটে যেথা ফুলের সুবাস,
উঠে যেথা জোছনা-লহরী,
বহে যেথা বসন্ত-বাতাস।
নাহি চাও আত্মহারা প্রেম
আছে যেথা অনন্ত পিয়াস,
বহে যেথা চোখের সলিল,
উঠে যেথা দুখের নিশ্বাস।

ইহার পর যেন আত্মগতভাবে—

এমন কি কেহ নাই বল্ মোরে বল্ আশা,
মার্জনা করিবে মোর অতি, অতি ভালোবাসা!

'অসহ্য ভালোবাসার' ঠিক পরবর্তী কবিতাতে দেখি প্রেমের নূতন উপলব্ধি। 'অতি ভালোবাসা' তখন 'বিকৃত এ ভালোবাসা' মনে হইতেছে।

'হলাহল' নামক কবিতাটির কথা বলিতেছি।

এমন কদিন কাটে আর।
ললিত গলিত হাস, জাগরণ, দীর্ঘশ্বাস,
সোহাগ, কটাক্ষ মান, নয়ন-সলিল-ধার,
মৃদু হাসি,-মৃদু কথা—আদরের উপেক্ষার—
এই শুধু, এই শুধু, দিনরাত এই শুধু—
এমন কদিন কাটে আর।···
প্রণয় অমৃত এ কি? এ যে ঘোর হলাহল—
হৃদয়ের শিরে শিরে প্রবেশিয়া ধীরে ধীরে
অবশ করেছে দেহ, শোণিত করেছে জল।···
দূরে যাও, দূরে যাও, হৃদয় রে দূরে যাও—
ভুলে যাও, ভুলে যাও, ছেলেখেলা ভুলে যাও।
দূর করো, দূর করো, বিকৃত এ ভালোবাসা—
জীবনদায়িনী নহে, এ যে গো হৃদয়-নাশা।

শিল্পবিচারে এই সমস্ত কবিতার বিশেষ কোনো মূল্য না থাকিতে পারে, কিন্তু কবির মনোদর্শন বিচারে এগুলি যে বিশেষভাবেই মূল্যবান সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নাই। সন্ধ্যাসঙ্গীতের মধ্যে নৈরাশ্য, বিষাদ, দুঃখ, জৈবপ্রেম প্রভৃতি হৃদয়াবেগের প্রচুর প্রশ্রয় আছে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অহং-এর এই সমস্ত অতিকৃতি হইতে মুক্ত হইবার বাসনাও কবির মধ্যে ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। তিনি বুঝিতেছেন—বাসনার অমিতব্যয়িতা 'জীবনদায়িনী' নহে; বাসনার সহিত, বাসনাবন্দী হৃদয়ের সহিত সংগ্রাম তাই করিতেই হইবে। ইহাদের মধ্যে লিপ্ত হইয়া আছি বলিয়াই জীবনের ও প্রকৃতির অন্তরতর আনন্দবৈচিত্র্য হইতে দূরে সরিয়া আছি। আজ যদি মলিনা বাসনা হইতে মুক্ত হইতে পারি, নির্মেঘ প্রসন্নতা লইয়া যদি বিস্তৃত এই প্রকৃতির বুকে নামিতে পারি, সমস্তকেই ফিরিয়া পাইব, বিশ্বের রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধের অবারিত আনন্দে হৃদয় অন্তরতর স্বপ্নসোহাগ অনুভব করিবে। আজ তাই যে হৃদয় আমাকে অন্ধ কামনার মধ্যে বন্দী রাখিয়াছে—বিশ্বজগতের বৈচিত্র্যকে পাইবার আশায় সেই হৃদয়ের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইবে।

আজ তবে হৃদয়ের সাথে
একবার করিব সংগ্রাম।
ফিরে নেব, কেড়ে নেব আমি
জগতের একেকটি গ্রাম।
ফিরে নেব রবি-শশি-তারা,
ফিরে নেব সন্ধ্যা আর উষা,
পৃথিবীর শ্যামল যৌবন,
কাননের ফুলময় ভূষা।
ফিরে নেব হারানো সংগীত,
ফিরে নেব মৃতের জীবন,
জগতের ললাট হইতে
আঁধার করিব প্রক্ষালন।
আমি হব সংগ্রামে বিজয়ী,
হৃদয়ের হবে পরাজয়,
জগতের দূর হবে ভয়।

বিশ্বচরাচরময় উচ্ছ্বাসিবে জয় জয়,
উল্লাসে পূরিবে চারিধার,
গাবে রবি, গাবে শশী, গাবে তারা শূন্যে বসি,
গাবে বায়ু শত শত বার।

চারিদিকে দিবে হুলুধ্বনি,
বরষিবে কুসুম-আসার,
বেঁধে দিবে বিজয়ের মালা
শান্তিময় ললাটে আমার। [সংগ্রাম-সংগীত]

ইহার পর বন্ধনমোচনের সুর বাজিয়াছে 'প্রভাত সঙ্গীতে'। হৃদয়াবেগের গদগদ ভাষা-আন্দোলনই যে জীবন নয়, জীবনের যে কোনো মহত্তর উদ্দেশ্য আছে, গভীরতর কোনো তাৎপর্য আছে, তাহারি ভাবনা প্রভাতসংগীতে ধরা পড়িয়াছে। কেমন একটা নিগূঢ় মননসংস্কার এইবার যেন দানা বাঁধিতে সুরু করিতেছে। কবিকাহিনী হইতে সন্ধ্যাসংগীত পর্যন্ত কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের যে মন ধরা পড়িয়াছে, তাহাতে অহং-এর আবেগ আন্দোলনই প্রবল, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুচ্ছটার মত ভবিষ্যৎ রবীন্দ্র-দর্শনের রূপরশ্মি ইঙ্গিত হানিয়া যায় মাত্র। কিন্তু প্রভাতসংগীতেই দার্শনিক কবির প্রথম সাক্ষাৎ মেলে। মনে হয় কবি এই সময় হইতেই জীবন সম্পর্কে খানিকটা সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন। 'অনন্ত জীবন', 'অনন্ত মরণ'—এই সমস্ত নাম হইতেই স্পষ্ট অনুমান করি, নূতনতর একটি জীবনবোধ কবিকে নূতনতর কোনো যাত্রাপথে টানিতেছে।

প্রভাত সঙ্গীত

কবি স্বয়ং লিখিতেছেন :

"অনন্ত জীবন বলতে আমার মনে এই একটা ভাব এসেছিল—বিশ্ব জগতে আসা এবং যাওয়া দুটোই থাকারই অন্তর্গত, ঢেউয়ের মতো আলোতে ওঠা এবং অন্ধকারে নামা। ক্ষণে ক্ষণে হাঁ এবং ক্ষণে ক্ষণে না নিয়ে এই জগৎ নয়, বিশ্বচরাচর গোচর-অগোচর নিরবচ্ছিন্ন মালা গাঁথা।

"প্রতিধ্বনি কবিতা লিখেছিলুম যখন প্রথম গিয়েছিলুম দার্জিলিং-এ। যে ভাবে তখন আমাকে আবিষ্ট করেছিল সেটা এই যে, বিশ্বসৃষ্টি হচ্ছে একটা ধ্বনি, আর সে প্রতিধ্বনিরূপে আমাকে মুগ্ধ করছে, ক্ষুব্ধ করছে, আমাকে জাগিয়ে রাখছে, সেই সুন্দর, সেই ভীষণ, সৃষ্টির সমস্ত গতিপ্রবাহ নিত্যই একটা কোনো কেন্দ্রস্থলে গিয়ে পড়ছে আর সেখান থেকে প্রতিধ্বনিরূপে নির্ঝরিত হচ্ছে আলো হয়ে, রূপ হয়ে, ধ্বনি হয়ে।"

এই 'কেন্দ্রস্থলের' স্বপ্নই পরবর্তী জীবনে কবিকে অসীমের আনন্দে উন্নীত করিয়াছে। এই কারণে প্রভাতসংগীতই রবীন্দ্রদর্শনের সূচনা বলিয়া ধারণা করিয়াছি। এই সংগীতের

সুর যতই 'অপরিণত' হউক, শিল্প হিসাবে যতই 'অপরিপুষ্ট' হউক, দর্শন বিচারে একান্তভাবেই অপরিহার্য। অহং-এর স্তূপীকৃত পঙ্ক-গহ্বর হইতে আত্মা মুক্তির আকাশে এইবার চোখ মেলিয়াছে।

সহসা আজি এ জগতের মুখ
নূতন করিয়া দেখিনু কেন,
একটি পাখীর আধখানি তান
জগতের গান গাহিল যেন।
যত প্রাণ আছে ঢালিতে পারি,
যত কাল আছে বহিতে পারি,
যত দেশ আছে ডুবাতে পারি,
তবে আর কিবা চাই
পরাণের সাধ তাই। [নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ]

এইবার—

হৃদয় আজি মোর কেমন গেল খুলি!
জগত আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।
ধরায় আছে যত মানুষ শত শত
আসিছে প্রাণে মোর, হাসিছে গলাগলি। [প্রভাত উৎসব]

এইবার নূতন জীবনবোধের ইশারা—অনির্দিষ্ট একটি কেন্দ্রস্থলের ইঙ্গিত—

এই জগতের মাঝে একটি সাগর আছে
নিস্তব্ধ তাহার জলরাশি,
চারিদিক হতে সেথা অবিরাম অবিশ্রাম
জীবনের স্রোত মিশে আসি।
সূর্য হতে ঝরে ধারা, চন্দ্র হতে ঝরে ধারা,
কোটি কোটি তারা হতে ঝরে,
জগতের যত হাসি, যত গান, যত প্রাণ
ভেসে আসে সেই স্রোতোভরে—
মেশে আসি সেই সিন্ধু'পরে। [অনন্ত জীবন]

প্রভাতসংগীতেই দেখি, মৃত্যু সম্পর্কে কবির একটি নূতন ধারণা জাগরিত হইয়াছে। মৃত্যু জীবনের পক্ষে ভয়াবহ কিছু নয়, সমাপ্তির নিশ্চিহ্নতাও নয়, মৃত্যু জীবনের গতি-প্রাণ, তাহার চলমান শক্তি। জীবনে আমরা প্রতি মুহূর্তেই মরি, আবার সেই মরণের উপর নূতন জীবন পাইয়া নূতন বেগে ছুটি নূতনের সন্ধানে। 'মৃত্যু সব কিছুকে চালায়', মৃত্যু না

থাকিলে চলিতেই আমরা পারিতাম না। দুঃখের আঘাতে মৃত্যু, শোকের আঘাতে মৃত্যু, বিচ্ছেদের আঘাতে মৃত্যু—জীবন-প্রাণকে নূতন বেগে দেয় চালাইয়া। এ জীবনে যাহার যত মৃত্যু, তাহার তত চলিবার আবেগ।

মরণ বাড়িবে যত জীবন বাড়িবে তত,
পলে পলে উঠিব আকাশে
নক্ষত্রের কিরণ নিবাসে।
মরণ বাড়িবে যত কোথায় কোথায় যাব
বাড়িবে প্রাণের অধিকার—
বিশাল প্রাণের মাঝে কত গ্রহ কত তারা
হেথা হোথা করিবে বিহার। [অনন্ত মরণ]

মৃত্যুকে এই নূতন দৃষ্টিতে দেখার ভঙ্গী ইতিপূর্বে কবির অন্য কোনো রচনায় দেখি নাই। জীবনকে জীবনরূপে গঠিত হইয়া উঠিতে হইলে মৃত্যুর অমৃতস্পর্শ অপরিহার্য—এই বাণী শুধু কবি-কল্পনা নহে, দার্শনিক চেতনাও বটে। ইহার পর মরণ তাঁহার দৃষ্টিতে 'শ্যাম সমান' সুন্দর হইয়া দেখা দিবে, 'রূপহীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে' সাজাইবার প্রবণতাও জাগিবে শিল্পীমনে, কিন্তু এই নূতন জীবনবোধের মূল চেতনাটি কি?

প্রভাতসংগীতেই বলা আছে—

আনন্দ মাঝারে সব উঠিতেছে ভেসে ভেসে,
আনন্দে হতেছে কভু লীন—

কখন এই আনন্দবোধ জাগিল? কামনার মোহে যখন মগ্ন ছিলাম, 'হৃদয় নামেতে এক বিশাল অরণ্য আছে', সেই অরণ্যের অন্ধকারে যখন বন্দী ছিলাম, তখন এ আনন্দকে জানি নাই। তারপর কখন কি ভাবে জানি না, একটি পাখী আসিল, হৃদয়ের অন্ধ অরণ্যের বাহিরে পথ দেখাইয়া আমাকে 'আনন্দের সমুদ্রের তীরে' লইয়া আসিল।

সহসা দেখিনু রবিকর,
সহসা শুনিনু কত গান।
সহসা পাইনু পরিমল,
সহসা খুলিয়া গেল প্রাণ। [পুনর্মিলন]

'পুনর্মিলন' কবিতাটির তাৎপর্য এই—প্রকৃতির কোলে ছিলাম, প্রকৃতি হইতে সরিয়া অন্ধ মোহ-বিবরে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তাহার পর আজ আবার প্রকৃতির কোলে ফিরিয়া আসিয়াছি—পুনর্মিলন সংঘটিত হইয়াছে। কিন্তু আগের মিলন এবং পরের মিলনে পার্থক্য বিস্তর। আগে প্রকৃতিকে চাহিয়াছি মোহের জড় আবেগে, পরে প্রকৃতিকে পাইতেছি প্রেমের আনন্দ-প্রেরণায়। এই আনন্দ-প্রেরণায় সকলি আজ রহস্যময় ঠেকিতেছে। মনে হইতেছে—যাহা দেখি, যাহা শুনি—তাহারি একটি গোপনতম উৎস যেন কোথায় আছে

সেই উৎস হইতে ভাসিয়া আসিতেছে গান, জাগিয়া হাসিতেছে রূপ। আবার নির্বাপিত হইয়া যখন ফিরিবার সময় হইতেছে, তখন ফিরিয়া যাইতেছে সেই উৎসেরই অন্তরে।

জগতের গানগুলি দূর দূরান্তর হতে
দলে দলে তোর কাছে যায়,
যেন তারা বহ্নি হেরি পতঙ্গের মতো
পদতলে মরিবারে চায়।
জগতের মৃত গানগুলি
তোর কাছে পেয়ে নব প্রাণ
সংগীতের পরলোক হতে
গান যেন দেহমুক্ত গান।
আজি ভাবিতেছি বসে গানগুলি তোরে
না জানি কেমনে খুঁজে পায়—
না জানি কোথায় খুঁজে পায়। [প্রতিধ্বনি]

'মহাস্বপ্ন' কবিতাটিতে এই রহস্য যেন স্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে। বলা হইয়াছে, সৃষ্টির কেন্দ্রস্থলে মহাকাল বসিয়া আছেন—তাঁহারি 'হৃদয়-সমুদ্র' হইতে 'বিশ্বের মতন' সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-উপগ্রহ উদিত হইতেছে। ফুল ফুটিতেছে। নদী ছুটিতেছে। নব নব ঋতুর আবির্ভাব ঘটিতেছে।

এক শুধু পুরাতন, আর সব নূতন নূতন,
এক পুরাতন হৃদে উঠিতেছে নূতন স্বপন।
অপূর্ণ স্বপনসৃষ্ট মানুষেরা অভাবের দাস,
জাগ্রত পূর্ণতা তরে পাইতেছে কত না প্রয়াস।
চেতনা ছিঁড়িতে চাহে আধো-অচেতন আবরণ
দিনরাত্রি এই আশা, এই তার একমাত্র পণ।

'ছবি ও গান' কবির বয়ঃসন্ধিকালের লেখা—অনাগত যৌবনের ইঙ্গিতে ও মিলনের আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত এই কাব্যখানি। প্রভাতসংগীতের মত ভাবের গভীরতা ইহাতে নাই

ছবি ও গান

কিন্তু রূপের প্রসন্নতা আছে। 'আলো-আঁধারে রূপের আভাস' পাইয়া ব্যাকুল আনন্দে কবি প্রকৃতির সর্বত্র চোখ মেলিতেছেন। 'কে' কবিতাটির দোদুল্যমান ছন্দের ঝংকারে যে প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছে, জীবনে আনন্দ-উদ্দীপ্তির মূল উৎস অন্বেষণে তা' চঞ্চল, তা' ব্যাকুল।

আমার প্রাণের 'পরে চলে গেল কে
বসন্তের বাতাসটুকুর মতো !
সে যে ছুঁয়ে গেল নুয়ে গেল রে,
ফুল ফুটিয়ে গেল শত শত।...
সে ঢেউএর মতো ভেসে গেছে,
চাঁদের আলোর দেশে গেছে,
যেখান দিয়ে হেসে গেছে
হাসি তার রেখে গেছে রে।
মনে হল আঁখির কোণে
আমায় যেন ডেকে গেছে সে।

'কে ?' এই প্রশ্নের প্রশ্নকারী কেমন যেন রহস্যাবেগে আবেশোৎফুল্ল ; দূর দেশ হইতে সুন্দরের আভাস দেখিয়া 'তার সঙ্গে নিজের মনের নেশা' মিলাইয়া লইতে উদগ্র। 'সুখ-স্বপ্ন' এবং 'জাগ্রত স্বপ্ন' কবিতায় অনুমান করা গেল প্রেমের স্পর্শই কবির প্রাণে এই রহস্যঘন ভাবোন্মাদনা জাগাইয়াছে। প্রেমের ইশারায় দৃষ্টিতে জাগিয়াছে নূতন জ্যোতি, জগৎ হইয়াছে কুসুমিত সুন্দর। তাই চোখে যা পড়িতেছে তাহাই নূতন, তাহাই অভিনব। 'যোগী' সুন্দর, 'মাতাল'ও সুন্দর। 'সুখের স্মৃতিতে' প্রেরণা, 'আর্তস্বরে'ও প্রেরণা ; 'মধ্যাহ্ন' আর 'পূর্ণিমা', 'পোড়ো বাড়ি' আর 'নিশীথ জগৎ'—সমস্তই আবেশময়, সমস্তই নূতন ভাবের দ্যোতনা জাগায়।

কবি বলিয়াছেন, ছবি ও গান "সহজ হয়নি, কিন্তু সহজ হবার চেষ্টা দেখা যায়।" শিল্পের বিচার আমার প্রসঙ্গ নয় ; কবির মনোদর্শনের দিক দিয়া দেখিতেছি—'ছবি ও গানের' কবি প্রাণের মোহ-জড়তা, অহং-এর দুর্বিনীত দুঃখদাহন হইতে মুক্ত হইয়া ক্রমশঃই সহজ হইয়া উঠিতেছেন।

মধুর আলস, মধুর আবেশ,
মধুর মুখের হাসিটি,
মধুর স্বপনে প্রাণের মাঝারে
বাজিছে মধুর বাঁশিটি। [সুখস্বপ্ন]

কি—

যেন রে কোথায় তরুর ছায়ায়
বসিয়া রূপসী বালা ;
কুসুমশয়নে আধেক মগনা,
বাকলবসনে আধেক নগনা,

সুখদুখগান গাহিছে শুইয়া
গাঁথিতে গাঁথিতে মালা। [জাগ্রত স্বপ্ন]

কিংবা,

হাতে তার কাঁকন দু-গাছি,
কানেতে দুলিছে তার দুল,
হাসি-হাসি মুখখানি তার
ফুটেছে সাঁজের জুঁই ফুল।
গলেতে বাহু বেঁধে
দুজনে কাছাকাছি—
দুলিছে এলোচুল,
দুলিছে মালাগাছি। [দোলা]

কিংবা,

যেখান দিয়ে যায় সে চলে সেথায় যেন ঢেউ খেলে যায়,
বাতাস যেন আকুল হয়ে ওঠে,
ধরা যেন চরণ ছুঁয়ে শিউরে ওঠে শ্যামল দেহে,
লতায় যেন কুসুম ফোটে ফোটে।
বসন্ত তার সাড়া পেয়ে সখা ব'লে আসে ধেয়ে
বনে যেন দুইটি বসন্ত—
দুই সখাতে ভেসে চলে যৌবন-সাগরের জলে,
কোথাও যেন নাহি রে অন্ত। [পাগল]

যে কয়েকটি ছবি ও গানের টুকরো উপরে উদ্ধৃত করা হইল—সেগুলি হইতেই বুঝা যাইবে কবির অন্তরে সহজ আনন্দের আবির্ভাব ঘটিতেছে। 'রাহুর প্রেম' কবিতাটিতে অবশ্য দুরন্ত কাম-বুভুক্ষার উত্তেজনা আছে—ইহাতেই বুঝা যায় সত্যকার রাবীন্দ্রিক প্রেমাদর্শে উন্নীত হইতে এখনও কবির বিলম্ব আছে। তবে কবিতাটির নাম 'রাহুর প্রেম' থাকায় অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, এই জাতীয় প্রেমের উত্তেজনা কবির মধ্যে জাগে বটে, কিন্তু ইহা যে সর্বগ্রাসী রাহুর প্রেম, ইহা যে জলে এবং জ্বালায়—সে বিষয়ে কবি খানিকটা সচেতন হইয়াছেন। এক 'রাহুর প্রেম' ছাড়া আর সমস্ত কবিতারই ভাষায় আছে সহজ স্থৈর্য, ভঙ্গীতে আছে সহজ প্রশান্তি। সন্ধ্যাসংগীতের দুঃখদাহন অবসিত হইয়াছে ; প্রভাত-সংগীতের দার্শনিক রুক্ষতা স্নিগ্ধ ভাবের রসে সঞ্জীবিত হইয়া 'ছবির' রঙিন রেখায় এবং 'গানের' মধুর সুরে বিভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

'কড়ি ও কোমল' কাব্যখানি নবযৌবনের রচনা। অহং-বন্দী প্রবৃত্তির সমস্ত গুণাগুণ ইহার মধ্যে যে নাই, তাহা নহে ; ইহার মধ্যে আছে মোহ, আছে আসক্তি, আছে কবি-জনোচিত আত্মহারা স্বভাবের সম্মোহন, আছে শোকের প্রচ্ছন্ন দুঃখ, আছে বেদনা-বিহ্বলতার গোপন চাঞ্চল্য। কিন্তু এই সঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই সমস্ত মোহ, শোক বা আসক্তির নীহারিকা ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে তাঁহার আজও অনাগত প্রেমের দিগন্ত প্রসারী আলোচ্ছটাও ক্ষণপ্রভার মত আকস্মিকভাবে হৃদয়কে সুদূরের ইঙ্গিত দিয়া যায়। কবির মধ্যে তাই বৃহত্তর জীবনের ইঙ্গিত জাগিতেছে। অহং হইতে তাঁহাকে মুক্তি লইতেই হইবে—'স্বর্গময়ী করুণার পথে' যাইবার জন্য আজ তাঁহাকে প্রস্তুত হইতেই হইবে।

কড়ি ও কোমল

যাত্রা করি বৃথা যত অহংকার হতে,
যাত্রা করি ছাড়ি হিংসা-দ্বেষ,
যাত্রা করি স্বর্গময়ী করুণার পথে,
শিরে ধরি সত্যের আদেশ।
যাত্রা করি মানবের হৃদয়ের মাঝে
প্রাণে লয়ে প্রেমের আলোক,
আয় মা গো যাত্রা করি জগতের কাজে
তুচ্ছ করি নিজ দুঃখ শোক। [মঙ্গল-গীত]

সহজ স্বভাব নহে পরন্তু সাধনার স্বভাবে এইবার যাত্রা করিবার ইশারা জাগিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রেমবোধ বিস্তৃত হইতে সুরু করিয়াছে। যৌবনের চাঞ্চল্য ও মোহ, দেহভোগের উন্মাদনা ও ইন্দ্রিয়াসক্তির প্রবল লিপ্সা তাঁহাকে আর অন্ধ ও আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিতেছে না। নৈরাশ্যের মধ্যেও অতীতযুগের সেই দাহন নাই, আছে কেমন যেন প্রসন্ন চিত্তের সুন্দর মিনতি।

আমি শুধু মালা গাঁথি ছোটো ছোটো ফুলে,
সে ফুল শুকায়ে যায় কথায় কথায়।
তাই যদি, তাই হোক, দুঃখ নাহি তায়,
তুলিব কুসুম আমি অনন্তের কূলে। [ছোটো ফুল]

অনন্ত ঈষৎ ইঙ্গিতে তাঁহার অনুভাবে দেখা দিয়াছে। এইজন্যই দেখি, মানবের দেহাসক্তির মোহ-প্রেম হইতেও তিনি বিরাটত্ব অনুভব করিতেছেন, 'যৌবন স্বপ্নে' বিশ্বের সমস্ত 'আকাশ'কে দর্শন করিতেছেন, 'দক্ষিণাবাতাসে' মাত্র প্রিয়ার বিরহ নিঃশ্বাসই অনুভব করিতেছেন না, পরন্তু 'যেথা ছিল যত বিরহিণী সকলের কুড়ায়ে নিঃশ্বাস' দক্ষিণা-বাতাস তাঁহার 'পরাণে পুলক বিকাশিয়া' প্রবাহিত হইতেছে [যৌবন স্বপ্ন]। প্রিয়ার

সহিত মিলিত হইয়াও তাঁহার মনে হইতেছে পূর্ণ-মিলন সংঘটিত হইল না—"মেলে দোঁহে তবুও মেলে না, তিলেক বিরহ রহে মাঝে।" [ক্ষণিক মিলন]

এই বিরহভাব তো সামান্য নহে—মহান বৈষ্ণব কবিবৃন্দের এই ভাবই তো জীবনী-শক্তি—প্রেমের শক্তি। ইহাই তো অব্যক্ত বা অনন্তের ভাব। যাহা ব্যক্ত, যাহা সান্ত তাহা এই দেহ, দেহজাত প্রেম, প্রেমের ব্যবহার, প্রেমের জন্য আকূতি, ক্রন্দন, মিলনের পিপাসা। দেহ যখন দেহের সঙ্গে মেলে, দেহের রূপে মুগ্ধ হয়, খেলায় মাতে, লীলা করে, তখন যাহা পায় তাহাতেই কি চিত্তের পিপাসা মেটে? মনে কি হয় না, যাহা পাইয়াছি তাহা তুচ্ছ, যাহা পাই নাই তাহারি অনন্তে অবগাহন না করিয়া তাই উপায় নাই? দেহ দিয়া দেহ চাওয়ায় এবং পাওয়ায় শ্রান্তি আছে, ক্লান্তির বেদনাবোধ আছে—কিন্তু দেহ-ভোগের আনন্দ-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যাহা পাই নাই, তাহারই মন্দিরে চিত্ত যখন নয়ন ফেরায়, তখনই বুঝিতে পারে, যাহা পায় নাই, তাহা চাওয়ায় শ্রান্তি নাই, বিভ্রান্তি নাই। এই যে উপলব্ধি, ইহা অসীম হইতে আসে না, দেহ-ভোগের সসীমতা হইতেই ইহার উদ্ভব—অহং-এর বৃন্ত আশ্রয়েই ইহার প্রস্ফুটন। ঈষদ্বিকশিত এই প্রেমকলিকার রূপের আলোকে চোখের ও মনের ম্লানিমা কাটিতে যখন সুরু হয়, প্রিয়া তখন দোষত্রুটি-বহুল খণ্ড ক্ষুদ্র সংসার-জীবনের চেনা সঙ্গিনীটি মাত্র নহেন, পরন্তু ভাবলোকের অচেনা স্বপ্নসঙ্গিনীও বটেন—চেনা বলে মিলিবারে চায়, অচেনা বলিয়া মরে লাজে।

'চেনা' বলিয়া মিলিতে আসি, দেহ-ভোগের আদিম কামনার বার্তা বুঝি বা জানাইতে আসি,—মনে করি, চেনা যখন, তখন তো উহার স্বভাব আমি জানি, ও-ও জানে আমার স্বভাব। তাই লজ্জা নাই, নাই সরম-সজ্জার ছদ্মবেশ। কিন্তু কি বিচিত্র, চেনা বলিয়া যাহাকে মনে করিয়াছি—সে যে, দেখি, অচেনার অনন্ত সৌন্দর্যে মহীয়সী। ইহার কাছে কামনার কুশ্রীতা লইয়া আসিব কী করিয়া? কেমন করিয়া জানাইব, আমার স্বভাবে আছে বুভুক্ষার উদগ্রতা? কামনা তাই আর প্রকাশ করা হয় না, মনে মনে লজ্জায় মরিতে থাকি। এই লজ্জাই নবতর রুচির উন্মেষ, নবতর জীবনবোধের, দার্শনিক ভাষায়, সাধনার স্বভাবের উন্মেষ। প্রেমোন্মেষের এই উষাকালে মুগ্ধ নেত্রে চেনা প্রেয়সীর অচেনা রূপজ্যোতির দিকে চাহিয়া থাকি, মদন যেন রূপসীর পদতলে তূণ ও পঞ্চশর সমর্পণ করিয়া কৃতাঞ্জলি বসিয়া রহে। কামনা তখন কেমন করিয়া কখন যে দূরীভূত হইয়া যায় তাহা জানিতে পারি না, কিন্তু যথার্থ রূপভোগের মধ্যে কামনাতীত যে রহস্য আছে, তাহা যেন অনুভবের মধ্যে আসিতে থাকে।

প্রেমাবেগের আকুল আনন্দে 'চেনা'র মধ্যে এই যে 'অচেনার' অনুভূতি—জৈবজীবনের ইহা একপ্রকার অপ্রত্যক্ষানুভূতি বলিতে পারি। ইন্দ্রিয়ের শক্তিতে যা ধরা পড়ে না, যা চোখে দেখি না, কানে শুনি না, স্পর্শে অনুভব করি না—তাহারি আবেদন অর্থাৎ

অপ্রত্যক্ষানুভূতির বিচিত্র আবেদন রবীন্দ্রসংগীতে অস্ফুটভাবে ধরা পড়িতেছে। এই অনুভূতির সুর যখন প্রাণের যন্ত্রে মূর্ছনা তোলে, ইন্দ্রিয়রতির উদগ্রতায় তখন ছেদ পড়ে। তখন তাহার পরিণতি ভোগে নয়, ধ্যানযোগে, বস্তুতে নয়, ভাবের আনন্দে, দ্রষ্টব্যে নয়, মন্তব্যের মহিমায়, সান্তে নয়, অনন্তের ইঙ্গিতে। প্রত্যক্ষ বিশেষের মধ্যেই অপ্রত্যক্ষ অশেষ বিদ্যমান, যাহাকে দেখিতেছি সে অল্প নহে, সে ভূমাভাস, খণ্ড নয়, অখণ্ডেরই প্রতীক, সসীম নয়, অসীমের এষণা—এই বোধ 'কড়ি ও কোমলে'র ভোগকান্ত বহু মনোভাবের মধ্যে সঞ্চারিত রহিয়াছে। বলাবাহুল্য, এই বোধের পরিণতি হইতেছে সাধন-স্বভাবের মহান প্রেম। প্রেম হইতে প্রবাহিত এই বোধের বা চৈতন্যের উন্মেষে স্বাত্মা ও পরাত্মা, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, পুরুষ ও প্রকৃতি, মানব ও জগৎ উভয়ই অনন্তে আনন্দিত হয়।

> যেন গো আমারি তুমি আত্মবিস্মরণ,
> অনন্ত কালের মোর সুখ দুঃখ শোক,
> কত নব জগতের কুসুম কানন,
> কত নব আকাশের চাঁদের আলোক। [স্মৃতি]

এই কয় পংক্তির মধ্যে দ্বৈতসত্তার প্রেমমিলনে অস্ফুট অদ্বৈতবোধ গুঞ্জরিত হইতেছে। তুমি ও আমি দুই বটে ; কিন্তু তোমাকে দেখিয়া যখন যুগ-যুগান্তের, কল্প-কল্পান্তের হৃদয়-ভাব অন্তরে পুঞ্জীভূত হয়, শুধু এই জগৎ নহে, কত নূতন জগৎ, কত আকাশ, কত চাঁদের আকাশ ভিড় করে স্মৃতির মধ্যে, তখন আমি আর অল্প থাকি না, বিস্তৃত হইয়া যাই দিগ্‌দিগন্তে, জন্ম-জন্মান্তরে, কল্প-কল্পান্তরে ; আমার মধ্যে, আমার বিশ্বরূপের মধ্যে তখন তুমি বিরাজ করিতে থাকো—তুমি স্বতন্ত্র নও, তুমি আমার নহ, তুমি আমি, যুগে-যুগে বিশ্ববিস্তৃতির মধ্যে যাহা ছিলাম তাহাই তুমি ; এই গোপনকথাটি জানাইবার জন্যই প্রত্যক্ষে তোমার আবির্ভাব।

> তোমার মুখেতে চেয়ে তাই নিশিদিন
> জীবন সুদূরে যেন হতেছে বিলীন।

সুদূরের এই বোধই কবিকে ক্রমশঃ উদার জীবনের বিস্তৃত পটভূমিকায় টানিয়াছে। রবীন্দ্রদর্শন ও সাহিত্য পর্যালোচনা করিয়া বুঝিয়াছি—বিশেষের ভোগাসক্তি হইতে প্রেম যখন অশেষের বৃহৎ অনুরাগে উত্তীর্ণ হয়, তখনই তাহার মধ্যে বিচিত্র সৃষ্টিশক্তির নিত্য নব স্ফুরণ হইতে থাকে। বিশেষে আসক্ত প্রেমের সৃষ্টি আপনাতে আপনি বন্দী—বৈচিত্র্যের সীমাতীত বিশ্বভূমে গতায়াত করার প্রতিভা তাহার থাকে না। বিশ্বকবির সৃষ্টি যে বিচিত্র দিকে নিত্যনব অগ্রসর হইয়াছে—তাহার মূলকথা এই বিশ্ববোধ, এই প্রেমবোধ। ইহাই কবি জীবনের 'Dynamic force'। ইহা না থাকিলে কোনো কবিই মহৎ কবির পদমর্যাদায় উন্নীত হইতে পারে না। শ্রীঅরবিন্দ যথার্থই বলিয়াছেন :

'Some dynamic force a poet must have, some general inspiration of which he is the supreme exponent ; or else he cannot rank with the highest'.

নিত্য প্রেরণাদায়িনী এই প্রেমপ্রতিভার আনন্দ লইয়া 'মানসী'তে কবি রবীন্দ্রনাথ কাব্যরচনার প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গেলেন। শিল্প বিচারে 'মানসী', প্রিয়নাথ সেনের ভাষায়, "একখানি অতি উৎকৃষ্ট অপূর্ব গ্রন্থ।...কবি মানব-হৃদয়ের অকৃত্রিম ভাবসমূহের অতলস্পর্শ গভীরতা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছেন বলিয়াই সেই চির সত্যের ভিতর কবিত্বের অমর সৌন্দর্যের সন্ধান পাইয়াছেন। প্রকৃতির চিরসৌন্দর্যের প্রাণ পর্যন্ত দেখিবার চক্ষু তাঁহার আছে বলিয়াই তাঁহাকে বসিয়া বসিয়া চিরদিন রং ঘুঁটিতে হয় নাই। তিনি বাহ্য এবং অন্তর্জগতের এতদূর পর্যন্ত দেখিতে জানেন বলিয়াই এত সৌন্দর্য দেখিতে পাইয়াছেন।" [মানসী, সমালোচনা সংগ্রহ]

মানসী

কিন্তু বাহ্য ও অন্তর্জগতের এতদূর পর্যন্ত দেখিতে জানার রহস্য-মন্ত্র হইতেছে প্রেম—একথা বলাই বাহুল্য। মানসীতে প্রকৃতি, স্বদেশ, স্বপ্ন ও প্রেম—এই কয় স্তরের কবিতা আছে। কিন্তু একটু ধীরভাবে লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় প্রেমই মানসীর প্রধান বিষয়। লক্ষ্য করিতেছি—মানসীতেই কবি স্থির হইয়া বুঝিতেছেন, প্রেমেই আছে অনন্ত জীবন, প্রেমই অনন্ত। যাহাকে ভালোবাসি, যুগে যুগে তাহাকেই ভালোবাসিয়া আসিতেছি বারংবার।

তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি
শতরূপে শতবার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।
চিরকাল ধরে মুগ্ধ হৃদয়
গাঁথিয়াছে গীতহার,
কতরূপ ধরে পরেছ গলায়,
নিয়েছ সে উপহার—
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার। [অনন্ত প্রেম]

ইহাই যদি সত্য হয় তবে বাসনা দিয়া কেন প্রেমকে চাহি, প্রেম দিয়া কেন চাহি না প্রেম?

বিশ্বজগতের তরে ঈশ্বরের তরে
শতদল উঠিতেছে ফুটি ;
সুতীক্ষ্ণ বাসনা-ছুরি দিয়ে
তুমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে ?…
ভালোবাসো, প্রেমে হও বলী—
চেয়ো না তাহারে।
আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের। [নিষ্ফল কামনা]

লক্ষণীয় বিষয় এই, পূর্বের মত প্রেম আর 'রাহুর প্রেম' নহে, সংযমে ধীর হওয়ার সাধনায় তা' গম্ভীর, আসন্ন বিচ্ছেদের দুর্ভাগ্য মুহূর্তেও তা' প্রসন্ন। 'শেষ উপহার' নামক আশ্চর্য একটি সুন্দর কবিতায় দেখি—জৈবজীবনের বাসনা ও আর্তিকে প্রেমের গভীরে বিসর্জন দিয়া কবি যেন পুণ্যস্নান করিয়া উঠিয়াছেন। বলা হইয়াছে—

আমি রাত্রি, তুমি ফুল। যখন মুকুল ছিলে, কত আদরে, কত সন্তর্পণে, কত সংগোপনে তোমাকে ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছি। ভাবিয়াছিলাম, তুমি আমারই থাকিবে, কিন্তু যখন জাগিলে তখন দেখি তুমি রাত্রির নহ. তুমি আন্‌জনার, তুমি প্রভাতের।

আমি রাত্রি, তুমি ফুল। যতক্ষণ ছিলে কুঁড়ি
জাগিয়া চাহিয়া ছিনু আঁধার আকাশ জুড়ি
সমস্ত নক্ষত্র নিয়ে, তোমারে লুকায়ে বুকে ;
যখন ফুটিলে তুমি সুন্দর তরুণ মুখে
তখনি প্রভাত এল ; ফুরাল আমার কাল ;
আলোকে ভাঙ্গিয়া গেল রজনীর অন্তরাল।

আজ তুমি আর আমার নহ। তোমার বাসর ঘরে শত সহস্র বিহঙ্গ আজ গান ধরিয়াছে। মিলনানন্দের কত উৎসব জাগিতেছে। 'এত আলো, এত সুখ, এত গান, এত প্রাণ' আমার তো ছিল না। আমি তোমাকে এমন কী দিয়াছি ?

আমি করেছিনু দান
শুধু নিদ্রা, শুধু শান্তি, সযতন নীরবতা,
শুধু চেয়ে থাকা আঁখি, শুধু মনে মনে কথা।

সুখময় প্রভাত-বাসরের আনন্দোৎসবে হাস্যময়ী থাক তুমি—আমি চলিয়া যাই। 'প্রলুব্ধ প্রভাত' যখন তোমার সুন্দর মুখটির দিকে তাকাইয়া ছিল, 'শত পাখী শত রবে' তোমার নাম ধরিয়া যখন ডাকিয়াছিল, থাকিতে না পারিয়া আমার নয়ন হইতে একটি 'শিশির কণা' তোমার 'নয়ন 'পরে' পড়িয়া গেছে। ক্ষমা করিয়ো আমার এই বেদনার্ত বিহ্বলতা। দিবসের 'প্রখর প্রমোদের' উত্তপ্ত ক্লান্ত রৌদ্রে যদি কখনও তপ্ত হইয়া ওঠো,

এই আমার শিশিরাশীর্বাদ তোমাকে শীতল করিয়া রাখিবে—এই আমার 'বিষাদাশ্রুর' স্নিগ্ধ মহিমা তোমাকে প্রসন্ন এক চিরনূতন আনন্দবেদনায় স্বপ্নসুন্দর করিয়া রাখিবে।

চলে গেনু পরপার।
সেই বিষাদের বিন্দু, বিদায়ের উপহার
প্রখর প্রমোদ হতে রাখিবে শীতল ক'রে
তোমার তরুণ মুখ; রজনীর অশ্রু 'পরে
পড়ি প্রভাতের হাসি দিবে শোভা অনুপম,
বিকচ সৌন্দর্য তব করিবে সুন্দরতম।

বিচ্ছেদের এই কবিতাটি শিল্প হিসাবে আশ্চর্য সুন্দর—উপমার প্রয়োগে, রচনার রীতিতে এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নিটোল সুন্দর কবিতা বিশ্বসাহিত্যে ক'টি আছে বলা শক্ত। কিন্তু শিল্প-বিচার ছাড়াও মনোদর্শনের বিচারে এই কবিতাটির বিশেষ মূল্য আছে। বিচ্ছেদের মধ্যেও যে নির্মল প্রসন্নতা, যে মানসিক স্থৈর্য ও প্রশান্তি কবিতাটিতে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা অহং-প্রেমের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া আত্মাভিমুখী চিত্তের দ্যোতনা করে। এই আত্মাভিমুখী প্রেমিক চিত্তেরই প্রকাশ দেখি 'মেঘদূতে', 'অহল্যার প্রতি' কবিতায়।

অহং-অভিশপ্ত বদ্ধ মন অহল্যার মতই 'পাষাণরূপে ধরাতলে মিশি' 'কী স্বপ্নে দীর্ঘ দিবা নিশি' কাটাইছে, কে জানে, কিন্তু আজ যখন তাহার জাগরণ হইয়াছে, নূতন মনে হইতেছে বিশ্ব-সংসার।

তুমি বিশ্ব-পানে চেয়ে মানিছ বিস্ময়,
বিশ্ব তোমা-পানে চেয়ে কথা নাহি কয়;
দোঁহে মুখোমুখি। অপার রহস্যতীরে
চির পরিচয়-মাঝে নব পরিচয়। [অহল্যার প্রতি]

'মানসীর' যুগের পর রবীন্দ্রনাথেরও চিরপরিচিত এই জীবনের সহিত নব পরিচয় ঘটিল। জীবনটিকে তিনি দেখিলেন নদীর মত—এপারে আমি, এই self, তাহার সংকীর্ণ ক্ষেত্র; অপর পারে আত্মা, সেই soul, তাহার বিচিত্র বিভূতি, অসীম ইঙ্গিত। 'সোনার তরী'তে বলা হইল, এক হিসাবে অহং অর্থাৎ এই আমি, এই তাহার সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ ক্ষেত্রও সত্য।

সোনার তরী

গগনে গর্জন করে মেঘ, অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশে নামে বর্ষা। নদীর কূলে এই সময় একা বসিয়া আছি। ওপারে যাইব কেমন করিয়া? বড় ভয় করে। 'নাহি ভরসা'।

সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ ক্ষেত্রটুকু লইয়া জীবনের কূলে যখন বসিয়া থাকি—অল্প লইয়া যখন চিত্ত বিহ্বল, তখনই তো মেঘ করিবে গর্জন, অন্ধকার হইবে আকাশ, নামিবে বর্ষা। তখনই দোসর থাকিবে না, সাহস বা সান্ত্বনা দিবার কেহ থাকিবে না, নিতান্ত একা, তাই ভরসা পাইব না অন্তরে।

কিন্তু না। ভরসা থাকে না, সংশয় জাগে, দ্বন্দ্বাকুল হয় হৃদয়, তবু জানি, সীমাবদ্ধ অহং-এর ক্ষেত্রটুকুও নয় মিথ্যা। এই ক্ষেত্র হইতে ফসল যদি কিছু ফলে, সে আসিবে, ভিন্‌দেশে তাহা পাঠাইবার জন্য ব্যবস্থাও দিবে করিয়া। ওই যে, গান গাহিয়া, তরী বাহিয়া কে যেন আসিতেছে। মনে হইতেছে - উহাকে আমি চিনি। জীবনে জীবনে জীবনস্বপ্নে উহার মানসমূর্তি যেন দেখিয়াছি। তাই উহাকে আপনার মনে হয়। ক্ষেত্রজ ফসলগুলি, আমার সারা জীবনের সাধনাগুলি, স্বপ্নকামনার সোনার ধানগুলি হাসিমুখে তুলিয়া দেই তাহার তরীতে। সেও প্রসন্নমুখে সব লয়, শুধু আমাকে—এই অহংকে তরীতে লয় না। অহং হইতে যে-প্রেম, বিশ্বের অভিমুখে তাহা বাহির হইয়া যায়, বাহির হইয়া যায় দেশ হইতে দেশান্তরে, কাল হইতে কালান্তরে, কিন্তু আমি নিতান্তই স্থবির, পড়িয়া থাকি মরিবার জন্য।

আমি কতটুকু সত্য? যতটুকু পরিমাণে সে আত্মাকে প্রকাশ করিতে পারে। সেই প্রকাশের জন্যই আমির জন্ম। সেই প্রকাশটুকু হইলেই আমির কাজ হইল শেষ। তখন

শ্রাবণগগন ঘিরে
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,
শূন্য নদীর তীরে
রহিনু পড়ি।
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী ॥

বুঝা যাইতেছে, রবীন্দ্র-কল্পিত অহং-এর দুইটি ক্ষেত্র আছে; এক দিকে অমৃতের ক্ষেত্র, অন্যদিকে মৃত্যুর ক্ষেত্র। অহং যে ক্ষেত্রের দিকে চাহে সেই ক্ষেত্রের রূপে রঙে তাহার রূপ ও রঙ হয়। 'রাণী বিম্ববতী' অহং-এর হিংসা-দ্বেষ-ঈর্ষারূপ মৃত্যুর ক্ষেত্রের দিকে চাহিল, তাই সে হইল কুরূপা।

রাণী কনকরতনে
খচিত করিল তনু অনেক যতনে—

তবু 'মায়াময় কনকদর্পণে' তাহাকে তো সুন্দর দেখাইল না, সুন্দর দেখাইল তাহার 'সতীনের মেয়ের' মুখখানি। বিম্ববতী চিৎকার করিয়া উঠিল—সতীনের মেয়ে এখনও

তবে বাঁচিয়া আছে? সে সুন্দরী বলিয়া তাহাকে দেখিলেই তো ঈর্ষায় জলিয়া যাই। তাইতো তাহাকে মারিয়া ফেলিবার জন্ম সেদিন কৌশলে 'বিষফল' খাওয়াইলাম।

চীৎকারি কহিল রানী কর হানি বুকে,
মরিতে দেখেছি তারে আপন সম্মুখে,
কার প্রেমে বাঁচিল সে সতিনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে।
…ভূমিতলে
চকিতে পড়িল রানী, টুটি গেল প্রাণ—
সর্বাঙ্গে হীরকমণি অগ্নির সমান
লাগিল জলিতে। [বিম্ববতী]

'সোনার তরী' কবিতাটিতে যেমন অহংএর অমৃত ক্ষেত্রের কথা ইঙ্গিতে বলা হইয়াছে, পরবর্তী কবিতা 'বিম্ববতী'তে তেমনি অহংএর মৃত্যুর ক্ষেত্রের কাহিনী কৌশলে বর্ণনা করা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের অহং দর্শনের এই তত্ত্বটুকু লইয়াই স্বতন্ত্র একখানি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব। অনেক সময় আমার মনে হইয়াছে, সন্ন্যাসী দার্শনিকদের মতই রবীন্দ্রনাথ অহংকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিতেন, যদি অহং-এর অমৃত অংশটুকু সহসা তাঁহার অনুভাবে না দেখা দিত। অহংএর অত্যাচার, অহংএর অতিকৃতি ব্যক্তি-জীবনে তিনি গভীর ভাবেই অনুভব করিয়াছেন, আবার এই অহংই যে সোনার ধান ফলাইবার অমৃত ক্ষেত্র, ব্যক্তিজীবনের মাহাত্ম্যবোধ হইতেই ক্রমশঃ তিনি তাহা জানিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই অমৃত ক্ষেত্রটি তাঁহার জানা হইয়াছে বলিয়াই অহংকে, জীবকে, জগৎকে, প্রকৃতিকে মিথ্যা বলিয়া উপেক্ষা করিতে চাহেন নাই। অহংকে মিথ্যা বলিয়া 'নুড়ি'র মত তুচ্ছ করিয়া, প্রকৃতিকে, জগৎকে মায়া বলিয়া 'পরশপাথরের' খোঁজে যে সমস্ত 'ক্ষ্যাপার' দল সংসার সমাজ ত্যাগ করে, রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, ব্যর্থ তাহাদের সাধনা, তাহারা না পায় জগৎকে, না পায় জগদতীতকে। সুন্দরী এই ধরিত্রীর বিচিত্র রূপৈশ্বর্য উপেক্ষা করিয়া 'আকাশের চাঁদ' ধরিবার ভ্রান্ত আগ্রহে যাহারা আকুল, রবীন্দ্রনাথ তাহাদের উদ্দেশ করিয়া পরিহাস করিয়াছেন; বলিয়াছেন—

সোনার জীবন রহিল পড়িয়া
কোথা সে চলিল ভেসে।
শশীর লাগিয়া কাঁদিতে গেল কি
রবিশশীহীন দেশে? [আকাশের চাঁদ]

'সোনার তরী'র অনেকগুলি কবিতায় সন্ন্যাসীদের মায়াবাদের বিরুদ্ধে প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ ধ্বনিত হইয়াছে। 'মায়াবাদ,' 'খেলা,' 'বন্ধন,' 'গতি,' 'মুক্তি,' 'দরিদ্র' প্রভৃতি

চতুর্দশপদীগুলিতে কাব্যত্ব খুব বেশি আছে বলিয়া মনে করি না, কিন্তু কবির নিজস্ব দর্শন-চিন্তা সেগুলিতে দ্ব্যর্থবিহীনভাষায় অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। প্রত্যেক কবিতাতেই পৃথিবীর প্রতি প্রেম ও পূজার ভাবকে যুক্তির দ্বারা সমর্থন করা হইয়াছে। অনেকগুলির মধ্যে সন্ন্যাসীদের প্রতি বেশ খানিকটা উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। যেমন—

লক্ষকোটি জীব লয়ে এ বিশ্বের মেলা
তুমি জানিতেছ মনে, সব ছেলে খেলা ॥ [মায়াবাদ]

কিংবা,

বিনয়ে বিশ্বাসে প্রেমে হাতে লহ তুলি
বর্ণগন্ধগীতময় যে মহা-খেলনা
তোমারে দিয়েছে মাতা ; হয় যদি ধূলি
হোক ধূলি, এ ধূলির কোথায় তুলনা।
থেকো না অকালবৃদ্ধ বসিয়া একেলা—
কেমনে মানুষ হবে না করিলে খেলা! [খেলা]

কি—

স্তন্যতৃষ্ণা নষ্ট করি মাতৃবন্ধপাশ
ছিন্ন করিবারে চাস্ কোন্ মুক্তিভ্রমে! [বন্ধন]

ইহার পর নিজের তত্ত্ববিশ্বাসে গভীর আস্থা স্থাপন করা হইয়াছে। যেমন—

পণ্ডিতের দ্বারে
চাহি না এ জনমরহস্য জানিবারে।
চাহি না ছিঁড়িতে একা বিশ্বব্যাপী ডোর,
লক্ষকোটি প্রাণীসাথে এক গতি মোর। [গতি]

কিংবা,

বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে
আমি একা বসে রব মুক্তি-সমাধিতে? [মুক্তি]

কি—

জন্মেছি যে-মর্ত্যকোলে ঘৃণা করি তারে
ছুটিব না স্বর্গ আর মুক্তি খুঁজিবারে ॥ [আত্মসমর্পণ]

'মর্ত্যকোলের' স্নেহের প্রতি কবির কৃতজ্ঞ প্রেম 'সোনার তরী'তে উপচীয়মান হইয়া উঠিয়াছে। এই সময়কার নিসর্গ কবিতাগুলি, যেমন 'শৈশবসন্ধ্যা,' সমুদ্রের প্রতি,' 'ভরা ভাদরে', 'বসুন্ধরা' অথবা প্রেমের কবিতাগুলি, যেমন 'মানসসুন্দরী', 'দুর্বোধ', 'স্খলন', 'হৃদয়,-

যমুনা'—সদ্যপ্রাপ্ত জীবনবোধের নূতন উদ্বেলতায় উচ্ছ্বসিত। অনেক সময় বাঁধনহারা আনন্দের বেগ চাপিতে না পারিয়া শিল্পগত কিছু কিছু অসংযম যে না আসিয়াছে তাহা নহে। জীবনের সুন্দর যে স্পষ্টভাবে কবির কাছে ধরা দিয়াছে তাহাও বলা চলে না। 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় অবাধ সৌন্দর্য-স্রোতে ভাসিয়া যাওয়ার ধ্বনি আছে, কিন্তু এখনও সে সৌন্দর্যের কেন্দ্রটিকে বোধের মধ্যে স্পষ্ট করিয়া পাওয়া হয় নাই। সুন্দরকে, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, 'ছুঁই ছুঁই' মনে হইতেছে, কখন ও বা ছুঁইয়াই যেন ফেলিয়াছি মনে করিয়া বিহ্বল সঙ্গীতে উদ্বেল হওয়া যাইতেছে—কিন্তু সুন্দরের কেন্দ্রভূমিটি যথার্থভাবে জানা হয় নাই বলিয়া প্রচ্ছন্ন একটি মানস-দ্বন্দ্ব কবিতার ছন্দে গুঞ্জরিত হইতেছে।

এই ত্রুটি কাটিয়া গেছে 'চিত্রা'র রূপোপলব্ধির প্রশান্তিতে। আশ্চর্য কাব্য এই চিত্রা, রবীন্দ্রনাথের তত্ত্ব ও রস একাঙ্গ, একাত্ম হইয়া গেছে এই কাব্যে।

চিত্রা

এই কাব্যগ্রন্থেই কবি বুঝিয়াছেন, যাহা পরম সুন্দর, বাসনার বন্ধনে তাহাকে সম্যকভাবে আনা সম্ভব নহে। আনা যায় না, জানা যায় না, অথচ তাহাকেই আনিবার, জানিবার ও জানাইবার বাসনা কবির জাগিয়াছে। তাহাকে বুঝাইয়া বলি কী প্রকারে? শংকর আত্মা বুঝাইলেন কী করিয়া? আমি চক্ষু নহি, কর্ণ নহি, নাসিকা নহি, মন নহি। নহি, নহি, নহি, নেতি, নেতি, নেতি; তবে কী? অবাঙ্‌মনসোগোচর এই আত্মা, এই সচ্চিদানন্দরূপো ব্রহ্মাত্মা। রবীন্দ্রনাথও সুন্দরকে বুঝাইতে গিয়া বলিলেন, সে কী, কেমন সে, বুঝাইয়া বলা যাইবে না। উপমার দ্বারা তাহাকে খুঁজিতে যাওয়া বৃথা, কোনো সম্বন্ধের সীমায় তাহাকে বুঝিতে যাওয়া অর্থহীন। তবে সে কী, সে কে? সে কি মাতা? নহে। সে কি কন্যা? নহে। সে কি বধূ? নহে, নহে। আজ যাহাকে স্মরণ করিয়া 'উদ্দাম সঙ্গীতে' 'লুব্ধ চিতে' ঘুরিয়া বেড়াইতেছি—নহে, নহে, সে আমার নহে। জৈব বোধ দিয়া, জৈব বুদ্ধি দিয়া সম্পূর্ণভাবে তাহাকে ধরিতে পারা অসম্ভব। প্রথমতম, আদিমতম নিষ্কলুষ সেই পরম সুন্দর, যাহাকে দেখিয়া "মহাম্বুধি অপূর্ব সঙ্গীতে রবে তরঙ্গিতে"—সে আর ফিরিবে না। বাসনার সূক্ষ্মতমের সূক্ষ্মতর বোধালোকে অস্পষ্ট তাহার ইশারা পাই—লুব্ধ লইয়া উঠে যৌবন, অন্তর আন্দোলিত হয় অশান্ত আবেগে—হৃদয় সমুদ্র মন্থন করিয়া বাসনার ভূমিতে

যে মূর্তিটি চরণ ফেলে, না না, সে আমারই বাসনাসঞ্জাত রূপবিলাসিনী, 'অতল অকূলের' অলোক-লোকসম্ভূতা নন্দনবাসিনী উর্বসী সে নহে। বোধের অন্তরে তাহার ইশারা পাইয়া যৌবন বিহ্বলতায় কামনার মধ্যে যাহার প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করি, সে বাসনাবাসিনী উর্বসী, তাহাকে চিনি, চিনি সেই স্বপ্নচারিণীকে। সে-ই আসে 'ডানহাতে' সুধা পাত্র, 'বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে,' 'তাহারই কটাক্ষঘাতে ত্রিভুবন যৌবনচঞ্চল'। সৌন্দর্যবাসনার সূক্ষ্মতম চিত্তসংস্কারের নির্মল বোধনন্দনের অধিবাসিনী যে উর্বসী, "অখিল মানসস্বর্গে অনন্ত-রঙ্গিণী"তো সে-ই। তাহাকেই তো চাহি, কিন্তু তাহাকে আর কি পাওয়া যায়? তাহারই জন্য ব্যাকুল হই, তাহারই জন্য স্বর্গ ও মর্ত্য কাঁদে, কিন্তু 'বধিরা' সে, শোনে না ক্রন্দন, ধরার বন্ধনে ধরা দেয় না কখনও।

> জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা,
> ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণ-শোণিমা।
> মুক্তবেণী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ব-বাসনার
> অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
> অতি লঘুভার।...
> তাই আজি ধরাতলে বসন্তের আনন্দ-উচ্ছ্বাসে
> কার চিরবিরহের দীর্ঘশ্বাস মিশে বহে আসে,
> পূর্ণিমা নিশীথে যবে দশদিক পরিপূর্ণ হাসি
> দূরস্মৃতি কোথা হতে বাজায় ব্যাকুল করা বাঁশি—
> ঝরে অশ্রুরাশি।
> তবু আশা জেগে থাকে প্রাণের ক্রন্দনে
> অয়ি অবন্ধনে। [উর্বসী]

যে রূপ প্রত্যক্ষগোচর, সে-রূপ নহে; অপ্রত্যক্ষ যে রূপের অপূর্ব আলোকে প্রত্যক্ষ-রূপকে অপরূপ বলিয়া বোধ হয়, সেই রূপেরই ইঙ্গিত আছে উর্বসীর ছন্দোবন্ধে। উর্বসীকে অনেকেই কামনার কবিতা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন; কামনাঘন কয়েকটি পংক্তি কৌশলে এই কবিতার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়া সৌন্দর্যের তত্ত্বদর্শনকে কবি শিল্পরসের মাধুর্যে নামাইয়াছেন মাত্র। ইহা কামনার কবিতা নহে, চিত্রার কবিতা; চিত্রে চিত্রে বিচিত্রের অভিসার দেখিতে দেখিতে 'অন্তরবাসিনী' এক রহস্যময়ীর চরিত্রাভাসে উন্নীত হওয়ার বাণী আছে এই অমর কবিতায়। প্রকৃতির যে চিত্রে আমরা বিহ্বল, একটু ধ্যান করিলেই বুঝা যায়, 'উর্বসীবোধের' আলোকে উজ্জ্বল করিয়া তাহা দেখিয়াছি বলিয়াই সে চিত্রে আমরা বিহ্বল হইয়াছি। সে চিত্রের অপূর্ণতা যখন ধরা পড়ে, 'উর্বসীবোধ'ই যখন বুঝাইয়া দেয়, এ নহে, ইহাতে নহে, তখনই ব্যাকুল টানে ফিরিতে চাই 'অবন্ধনা' সেই 'অনন্ত রঙ্গিনীর' টানে। তাহাকে কখনই পাই না, তবু বাসনা গুমরিয়া মরে, দূর

হইতে যেন সুর শুনি, রূপে রূপে তাহার রূপাভাস দেখি, রূপের বাসনায় তাহার প্রতিমা গড়িয়া কাঁদিয়াই একপ্রকার আনন্দ পাই।

'চিত্রা' আলোচনার প্রসঙ্গে প্রথমেই উর্বশী কবিতাটির আলোচনা উত্থাপন করিয়াছি কেন—এ সম্বন্ধে কোনো কোনো পাঠকের কিছু প্রশ্ন জাগিতে পারে। 'উর্বশী' কবিতাটি এমন একটি সৃষ্টি, যাহার মধ্যে self-এর মোহ ও soul-এর সৌন্দর্যবোধ একাত্ম হইয়া রবীন্দ্র-শিল্পরীতি ও দর্শন-এর বৈশিষ্ট্যকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছে। কামনার কলকাকলীর ছন্দোমধুর মন্দ ঝংকারে পাঠকচিত্তকে জৈবকামনার ইন্দ্রজালে বন্দী করিয়াই সৌন্দর্যবাসনার উত্তুঙ্গ উন্মুক্তির প্রাঙ্গণে টানিয়া লওয়া হইয়াছে। দার্শনিক রবীন্দ্রনাথও বলেন, অহং কামনার বৃত্তিগুলি প্রয়োজনীয় এই জন্য যে, এইগুলির সাহায্যেই আমরা আত্মানন্দের মানসস্বর্গে উন্নীত হইতে পারি।

চিত্রায়, বলা বাহুল্য, এই বাণীই প্রকাশ করা হইয়াছে। বিচিত্ররূপিণী প্রকৃতিকে 'বর্ণে' 'স্বর্ণে' 'ছন্দে' 'সঙ্গীতে' 'গ্রন্থে' 'কণ্ঠে' কত বিচিত্রভাবেই কবি পাইয়াছেন, কিন্তু মনে মনে তিনি জানিয়াছেন, সমস্ত বৈচিত্র্যের কেন্দ্রস্থলে থাকিয়া এক প্রাণময়ী রূপনির্ঝরিণী ফল্গুর মত প্রবাহিনী রহিয়াছে। ইন্দ্রিয়ের মোহবোধ হইতে অতীন্দ্রিয়ের আনন্দবোধে উঠিলেই দেখি—তুমি আর বিচিত্ররূপিণী নহ,

অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিনী।
একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে,
একটি পদ্ম হৃদয়বৃন্তশয়নে,
একটি চন্দ্র অসীম চিত্তগগনে—
চারিদিকে চিরযামিনী। [চিত্রা]

চিত্রের অন্তরেই আছে চরিত্রের অরূপ মহিমা। বিচিত্ররূপে বিভূষিতা এই প্রকৃতির রূপ রস বর্ণ গন্ধের কোনোটাই মিথ্যা নহে, কেননা ইহারা অজ্ঞাত কোনো রহস্যময় একেরই দ্যোতনা করিতেছে। সেই এক, সেই 'অন্তরব্যাপিনী' জ্যোতির্ময়ী, সেই 'বিশ্বসোহাগিনী লক্ষ্মী', সেই 'দেবী', সেই 'জীবনদেবতা', সেই 'অন্তর্যামী'—রূপরসবর্ণের অন্তরালে থাকিয়া মানুষের হৃদয়কে, জীবনবোধকে অখণ্ডের পূর্ণতায়, নিগূঢ় এক ঐক্যতত্ত্বের প্রসন্ন মহিমায় অহরহঃ আকর্ষণ করিতেছে। তাহারই সুর যখন শ্রবণ করি, গান না গাহিয়া থাকিতে পারি না—

যে কথা ভাবিনি বলি সেই কথা,
যে ব্যথা বুঝি না জাগে সেই ব্যথা,
জানি না এসেছি কাহার বারতা
কারে শুনাবার তরে। [অন্তর্যামী]

স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহ যেমন সোনা হইয়া যায়, তাহার স্পর্শাবেশে আমি কি নব-জীবনের স্বর্গসন্ধান পাইলাম? কে তুমি? এ কী নব মহিমার অপরূপ নবজন্ম আমাকে দান করিতেছ?

আমার মাঝারে করিছ রচনা
অসীম বিরহ, অপার বাসনা,
কিসের লাগিয়া বিশ্ববেদনা
মোর বেদনায় বাজে? [তদেব]

আর আমি সংকীর্ণ অহংবোধের মধ্যে নাই—বিশ্ববেদনার মাহাত্ম্যবোধে জাগরিত হইয়া উঠিয়াছি। অন্তর তাই অবারিত প্রেমের আনন্দে রচনা করিতেছে অযুত বসন্ত। এইবার আমার 'প্রেমের অভিষেক' হইল।

হাত ধরে মোরে তুমি
লয়ে গেছ সৌন্দর্যের সে নন্দনভূমি
অমৃত আলয়ে। সেথা আমি জ্যোতিষ্মান
অক্ষয়যৌবনময় দেবতাসমান,
সেথা মোর লাবণ্যের নাহি পরিসীমা,
সেথা মোরে অর্পিয়াছে আপন মহিমা
নিখিল প্রণয়ী। [প্রেমের অভিষেক]

সেই মহান প্রেমসৌন্দর্যের বিস্তৃত পটভূমে নিজেকে স্থাপন করিয়া মানবিকতার মাহাত্ম্যবোধের অতুল আনন্দ অনুভব করিলাম। এই বোধের দৃষ্টিতে সুন্দর, সুন্দর সমস্তই। মিথ্যা নয়, মিথ্যা নয় ধরণীর ধূলি।

অয়ি ধূলি, অয়ি তুচ্ছ, অয়ি দীনহীনা,
সকলের নিম্নে থাক নীচতম জনে
বক্ষে বাঁধিবার তরে; সহি সর্ব ঘৃণা
কারে নাহি কর ঘৃণা। গৈরিক বসনে
হে ব্রতচারিণী তুমি সাজি উদাসীনা
বিশ্বজনে পালিতেছ আপন ভবনে
নিজেরে গোপন করি, অয়ি বিমলিনা,
সৌন্দর্য বিকশি তোল বিশ্বের নয়নে;
বিস্তারিছ কোমলতা হে শুষ্ক কঠিনা,
হে দরিদ্রা, পূর্ণা তুমি রত্নে ধানে ধনে। [ধূলি]

প্রেমের দৃষ্টিতে ধূলি শুধু সুন্দরী নহে, মহিমময়ীও বটে। পরবর্তী জীবনে রবীন্দ্রনাথ যে 'সীমার মধ্যে অসীমের সুর' শুনিয়াছেন, বন্ধনকে স্বীকার করিয়াও বন্ধনকে অতিক্রম করার যে বাণী উপলব্ধি করিয়াছেন, চিত্রার কবিতাগুলির মধ্যে তাহারি প্রকাশ দেখিয়াছি। দর্শন বিচারে চিত্রার মূল্য অপরিসীম, শিল্পবিচারেও এ কাব্যের জুড়ি মেলা ভার। বস্তুতঃ তত্ত্ব ও রসের এমন মধুর একাত্মতা কবীন্দ্রের কবিতাতেই শুধু আশা করা যায়।

শান্তিনিকেতনে কবি লিখিয়াছেন :

"আমরা ছোটকে মনে করি তুচ্ছ, বড়োকেই মনে করি মহৎ—যেন গণিতশাস্ত্রের দ্বারা কাউকে মহত্ত্ব দিতে পারে। তেমনি সীমাকে আমরা গাল দিতে থাকি। যেন, সীমা জিনিসটা যে কী তা আমরা কিছুই জানি! সীমা একটি পরমাশ্চর্য রহস্য। এই সীমাই তো অসীমকে প্রকাশ করছে। এ কী অনির্বচনীয়! এর কী আশ্চর্য রূপ, কী আশ্চর্য গুণ, কী আশ্চর্য বিকাশ। একরূপ হতে আর এক রূপ, এক গুণ হতে আর এক গুণ, এক শক্তি হতে আর এক শক্তি—এরই বা নাশ কোথায়! এরই বা সীমা কোন্‌খানে! সীমা যে ধারণাতীত বৈচিত্র্যে, যে অগণনীয় বহুলত্বে, যে অশেষ পরিবর্তন পরম্পরায় প্রকাশ পাচ্ছে তাকে অবজ্ঞা করতে পারে এত বড়ো সাধ্য আছে কার!···অসীমের অপেক্ষা সীমা কোনো অংশেই কম আশ্চর্য নয়, অব্যক্তের অপেক্ষা ব্যক্ত কোনোমতেই অশ্রদ্ধেয় নয়।" [সামঞ্জস্য, শান্তিনিকেতন-১]

এই যে সীমাকেও মহিমময়ী বলিয়া শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করার বাণী—ইহাই চিত্রার সুর, চিত্রার প্রাণবস্তু। গীতাঞ্জলি-গীতালিতে যে বাণী সুরের মধ্য দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে, সেই বাণীই রূপের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে চিত্রায়। ইহার পর রবীন্দ্রনাথ আর যে সমস্ত কাব্য রচনা করিয়াছেন শিল্পসৃষ্টির দিক দিয়া তাহা নূতন রীতি ও ভঙ্গীর জন্য বৈচিত্র্যময় বলিয়া মনে হইয়াছে বটে, কিন্তু তত্ত্ববিচারের দিক দিয়া বলা যায় যে, কবির পরবর্তী সৃষ্টিগুলি সেই এক অদ্বিতীয় প্রেমমহিমার আনন্দবিলাস ছাড়া আর কিছু নহে।

'চৈতালি' কাব্যের কথাই ধরা যাক।

চৈতালিতে কবির প্রেম চিত্রার স্বপ্নদৃষ্টি ত্যাগ করিয়া সংসারের খণ্ড ক্ষুদ্র সাধারণ ঘটনাগুলিও বস্তুদৃষ্টির আলোকে দেখিতেছে। অতি সাধারণ গৃহচ্ছবিও প্রেম-ব্যঞ্জিত বস্তুদৃষ্টির আলোকে মোহময় সৌন্দর্য বিস্তার করিয়াছে। চৈতালির বাণী এই—প্রেম শুধু কল্পলোকেই স্বপ্ন অনুসন্ধান করে না, বস্তুলোকেও স্বর্গ সৃষ্টি করিয়া লয়।

চৈতালি

'পরিচয়' কবিতাটি স্মরণ করুন।

কচি ভাইটি খেলা করিতেছে, দূরে তাহার ছোটো দিদি ঘাটে বসিয়া ঘটি মাজিতেছে। এমন সময় তাহাদের পালিত ছাগবৎসটি কচি ভাইটির নিকট আসিয়া হঠাৎ ডাকিয়া উঠিল। ভাইটি 'ত্রাসে' উঠিল কাঁদিয়া। দিদি তখন ঘটি ফেলিয়া ছুটিয়া আসিল। সে কি ছাগ-বৎসটিকে মারিয়া তাড়াইল? কবি দেখিলেন ও দেখাইলেন—

এক কক্ষে ভাই লয়ে, অন্য কক্ষে ছাগ,
দু'জনেরে বাঁটি দিল সমান সোহাগ।
পশুশিশু, নরশিশু, মাঝে দিদি পড়ে
দোঁহারে বাঁধিয়া দিল পরিচয়ডোরে॥

কবিতাটি এইখানেই শেষ হইয়াছে। অলংকারবর্জিত নিতান্ত সহজ ও সরল ভাষায় বর্ণিত একটি অতি সাধারণ ঘটনা। কিন্তু 'মাঝে দিদি পড়ে' স্বর্গসুন্দর যে চিত্রটি আঁকিয়া গেল তাহাতে 'পশুশিশু' ও 'নরশিশু'ই শুধু বাঁধা পড়িল না, পরন্তু স্বচ্ছ প্রেমের আনন্দ-দৃষ্টি মাঝে থাকিলে বস্তু ও কল্পজগতও যে নবপরিচয় ডোরে বাঁধা পড়ে, তাহাও যেন অপ্রত্যাশিতভাবে জানা গেল।

'সঙ্গী' বা 'করুণা' নামক কবিতাদ্বয়ও এইরূপ অনন্ত প্রেমের সৌন্দর্যে উজ্জ্বল। 'সঙ্গী'র তাৎপর্য এই—

'একটি বেদের মেয়ে' কবরী বাঁধিতেছিল। হঠাৎ 'পালিত কুকুর শিশু' তাহার পিছনে আসিয়া মেয়েটির কেশ লইয়া জুড়িল খেলা। মেয়েটি কুকুরটিকে তিরস্কার করিল কিন্তু তাহাতে কুকুরটির খেলাই গেল বাড়িয়া। বালিকা 'তর্জনী তুলিয়া' স্নেহভরে কুকুরটিকে মারিল, কিন্তু তাহাতেও দুরন্ত কুকুর শিশুটির খেলার উৎসাহ কমিল না। তখন কি হইল?

তখন হাসিয়া উঠি লয়ে বক্ষ 'পরে
বালিকা ব্যথিল তারে আদরে আদরে।

সূক্ষ্ম প্রেমবোধ হইতেছে এই সমস্ত কবিতার ধ্বনি। কবির হৃদয়ের কাছে এই সকল ধ্বনি অত্যন্ত অস্ফুট বলিয়া, অর্থহীন বলিয়া প্রতীয়মান হওয়াও বিচিত্র নহে। তিরস্কার দিয়া যাহাকে সংযত করা যায় নাই, 'আদরে আদরে' তাহাকে আনন্দবেদনায় জাগ্রত করিয়া অতি সহজেই সংযত করা সম্ভব হইয়া গেল।

'করুণা' কবিতাটির ধ্বনি বড়ই মর্মস্পর্শী।

পথের ধারে 'দোকানীর খেলামুগ্ধ ছেলে' গাড়ী চাপা পড়িল। হাহাকার উঠিল চারিদিকে। 'পাষাণকঠিন পথ উঠিল শিহরি।' হঠাৎ দূরের এক হর্মকক্ষ হইতে কাহার ক্রন্দনরোল যেন ভাসিয়া আসিল। নিতান্ত দরিদ্র ও নগণ্য ছেলেটির জন্য হর্মনিবাসিনী কে আবার কাঁদিতেছে? স্বর্গে কি মায়াদেবী করিতেছে হাহাকার?

ঊর্ধ্বপানে চেয়ে দেখি স্খলিতবসনা
লুটায়ে লুটায়ে ভূমে কাঁদে বারাঙ্গনা।

বারাঙ্গনাটি অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে আসিল—কবিতাও শেষ হইয়া গেল। নিগূঢ় স্তব্ধতার মধ্যে আকস্মিক এই বারাঙ্গনার শোকাদীর্ণ ক্রন্দন যেন আচম্বিতে সপ্তমস্বরে উঠিয়াই নামিয়া গেল। এ কী হইল? হইল এই, আকস্মিক এই ক্রন্দনের সুরে শাশ্বতী করুণার একটি জননীমূর্তি রসের আনন্দে টলটল করিয়া উঠিল।

চৈতালির এই সূক্ষ্ম প্রেমবোধই যাহা কিছু তুচ্ছ ও হীন, তাহার প্রতিও কবিকে আকর্ষণ করিয়াছে। বস্তু প্রেমের প্রতিফলনে লইয়াছে কল্পরূপ। বস্তু-জগতে যাহা একান্তই সুলভ বলিয়া মনে করি, তাহাও দুর্লভের মত মূল্যবান।

যাহা-কিছু হেরি চোখে কিছু তুচ্ছ নয়,
সকলি দুর্লভ বলে আজি মনে হয়। [দুর্লভ জন্ম]

অন্যত্র—

ভালোমন্দ সুখদুঃখ অন্ধকার-আলো
মনে হয় সব নিয়ে এ ধরণী ভালো॥ [ধরাতল]

চৈতালিতে নারী আর সামান্যা রমণী নহেন, নারী মানসরূপিণী মহিয়সী। কবি কহিতেছেন, নারীকে যখন প্রেমের দৃষ্টিতে না দেখিয়া অহং-এর দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, তখন তাহাকে যেন দেখাই হয় নাই। জগৎ-লক্ষ্মীকে যদি দেখিতে হয়, তা' হইলে নারীর মহিমময়ী মূর্তি দেখিবার সাধনা করিতে হইবে।

যখন তোমার 'পরে পড়েনি নয়ন
জগৎলক্ষ্মীর দেখা পাইনি তখন। [প্রিয়া]

প্রেমের দৃষ্টিতে আজ জগৎলক্ষ্মীর সাক্ষাৎ মিলিয়াছে।

নাহি দিন নাহি রাত্রি নাহি দণ্ড পল,
প্রলয়ের জলরাশি স্তব্ধ অচঞ্চল;
যেন তারি মাঝখানে পূর্ণ বিকাশিয়া
একমাত্র পদ্ম তুমি রয়েছ ভাসিয়া।
নিত্যকাল মহাপ্রেমে বসি বিশ্বভূপ
তোমামাঝে হেরিছেন আত্মপ্রতিরূপ। [ধ্যান]

নারীকে দেহসর্বস্ব ভাবিলে অথবা তাহাকে অহং দৃষ্টিতে দেখিলে 'বিশ্বভূপের' এই 'মহা-প্রেমের' রসলীলা উপলব্ধি সম্ভব নহে। রবীন্দ্রনাথের প্রেম ক্রমশঃ অহং হইতে আত্মার

অভিমুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে, তাহারি প্রকাশ দেখিয়াছি এই সকল কবিতার পংক্তিতে। নারী যেখানে দেহবিশেষ মাত্র, সেখানে কবির আর স্ফূর্তি নাই। 'অর্ধেক মানবী আর অর্ধেক কল্পনা' লইয়া নারী আবির্ভূতা হইয়াছে কবির কল্পরাজ্যে।

মানসী রূপিণী তুমি তাই দিশে দিশে
সকল সৌন্দর্য মাঝে যাও মিলে মিশে। [নারী]

চৈতালির কবিতাগুলির এই দৃষ্টিভঙ্গী রবীন্দ্রনাথের মনোলোকের একটি বিশেষ দিক উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। রবীন্দ্রদর্শনে মানব যেমন মানবব্রহ্ম বলিয়া বরণীয়, নারী তেমনি মানসরূপিণী জগৎলক্ষ্মী বলিয়া বরণীয়া। যাহা সীমা তাহাই অসীমা, অনন্ত তাহার গরিমার গুণ-গন্ধ—যে প্রেম জাগিলে এই বিচার অন্তরে জাগে, চৈতালিকাব্যে সেই প্রেমের হইয়াছে উন্মেষ। চৈতালির ভাষা সরল, ভঙ্গী সহজ, কেন না যে ভাবদর্শনের প্রকাশ আছে এই কাব্যে, অর্থহীন কোনো অলংকার প্রয়োগের নৈপুণ্যচ্ছটায় রঞ্জিত হইবার অপেক্ষা তাহা রাখে না। 'অলংকার প্রয়োগের চেষ্টা জাগে', কবি বলিয়াছেন, "মনে যখন প্রত্যক্ষবোধের স্পষ্টতা সম্বন্ধে সংশয় থাকে। যেটা দেখছি মন যখন বলে 'এটাই যথেষ্ট', তখন তার উপরে রং লাগাবার ইচ্ছাই থাকে না।" [রচনাবলী-৫, চৈতালির সূচনা দ্রষ্টব্য]

চৈতালিকাব্যে প্রেমের প্রত্যক্ষবোধের স্পষ্টতা সম্বন্ধে আর কোনোই সংশয় নাই। ইহার পর 'কল্পনা'কাব্যে দেখা যাইবে, প্রেম সত্যসত্যই জীবনে প্রতিভাত হইয়াছে বলিয়া

কল্পনা

নিতান্ত 'দুঃসময়েও' কবির হৃদয়মন হয় নাই নির্বাপিত, দুঃখের মধ্য দিয়া, গতি চাপল্যের মধ্য দিয়া, আনন্দের মধ্য দিয়া, নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া কবির কথাগুলি নিত্য নূতন রূপে রসে, ছন্দে ও ভঙ্গীতে এক অদ্বিতীয় প্রেমবোধেরই ইঙ্গিত করিতেছে।

কল্পনার 'দুঃসময়' কবিতাটির কথাই তুলিতেছি।

জীবনে দুঃসময় আসে, আসে দুঃখবেদনা, আঘাত, সংঘাত। মানুষের কবি, পৃথিবীর কবি রবীন্দ্রনাথ তাহা কখনই অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু প্রেমের মহিমালোকে হৃদয়ের মধ্যে যদি নূতন চক্ষু লাভ করি, যদি জীবনের ঊর্ধ্ব, অধঃ, পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ সকল দিকই আমি দেখিতে পাই, যদি জানিতে পারি জীবনে যাহা ঘটিতেছে তাহার কিছুই ফেলা যায় না, তা' সমস্তেরি মূল্য আছে, আছে মর্যাদা, তবে দুঃসময়ে নত হইয়া পড়ি কেন? কেন ভাবিব, সংসারের চলার পথ, আকাশে উড়ার

পথ রুদ্ধ হইল ? প্রেমের দৃষ্টিতে কল্পনার আনন্দকে প্রসারিত করিলেই যে দেখিতে পাইব ভীমকৃষ্ণ অমারাত্রির অন্তর্ভেদ করিয়া—

উর্ধ্ব আকাশে তারাগুলি মেলি অঙ্গুলি
ইঙ্গিত করি তোমা-পানে আছে চাহিয়া।
নিম্নে গভীর অধীর মরণ উচ্ছলি
শত তরঙ্গে তোমা-পানে উঠে ধাইয়া।
বহুদূর তীরে কারা ডাকে বাঁধি অঞ্জলি—
'এসো এসো' সুরে করুণ-মিনতি-মাখা।
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা। [দুঃসময়]

অতএব কোনো ভয় নাই, নির্ভয়ে পাখা মেলিয়া দাও জীবনের আকাশে। জৈবজীবনের খণ্ড ক্ষুদ্র নানাপ্রকার আসক্তি আঁকড়াইয়া থাকি বলিয়াই ভয়, মোহ, আশা, ক্রন্দন। যাহা আঁকড়াইয়া থাকি, তাহা যতক্ষণ আমার থাকে, ততক্ষণই আমার সুখ, যখন আর না থাকে, তখন হায় হায় করিয়া উঠি, মোহগ্রস্ত মুখ থুবড়াইয়া ক্রন্দন করিতে থাকি অবিশ্রাম। কিন্তু জীবনে কি ইহাই করিতে আসিয়াছি ? কেন বুঝি না, দুঃখের, শোকের, আনন্দের, নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া চলাটাই হইতেছে জীবনের বাণী। চলা ছাড়া জীবনে আর কী সত্য আছে ?

ওরে ভয় নাই, নাই স্নেহমোহবন্ধন,
ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা।
ওরে ভাষা নাই, নাই বৃথা বসে ক্রন্দন,
ওরে গৃহ নাই, নাই ফুলশেজ-রচনা।
আছে শুধু পাখা, আছে মহানভ-অঙ্গন
উষা-দিশা-হারা নিবিড়-তিমির-আঁকা।
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

জীবনকে যখন খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখি, তখন যাহা পাই তাহাই একান্ত বলিয়া মনে করি। দুঃসময়ে যদি কাতর হইয়া পড়ি, তবে বুঝিতে হইবে জীবনের অতীত ও ভবিষ্যৎ হইতে বর্তমান এই দুঃসময়টুকুকে বিচ্ছিন্ন করিয়াই দেখিতেছি। এই বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখার মধ্যেই দুঃখ, ইহাই মোহ। জীবনকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখা জীবন-দেবতার অভিপ্রায় নয়। আমার পশ্চাতে আছে সংগ্রামশীল উত্তেজনার অতীত,

বুকের কাছে আছে তিক্ত অভিজ্ঞতার বর্তমান, মাথার উপরে আছে সূর্যোপাসক 'নভ'-জীবনের ভবিষ্যৎ—এই যে অখণ্ড জীবনবোধ, ইহাই রবীন্দ্রজীবনের ও জীবন-দর্শনের ঐক্যতত্ত্ব। এই তত্ত্বের দৃষ্টিতে অর্থাৎ জীবনের সকল স্তর, পর্যায় ও বিভাগ-গুলিকে এক করিয়া অখণ্ড এক জীবন-প্রেমের দৃষ্টিতে দুঃসময়ও নবজীবনের নূতন আলো দেয় আনিয়া। তখন গানে প্রেরণা, প্রাণে প্রেরণা, হৃদয়ে নূতন স্বপ্ন। তখনই জীবন সুন্দর, ভাবঘন এবং গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। পৃথিবীকে তখন মধুরা মনে করি, প্রেমের রূপরাগে রঞ্জিত করিয়া লই প্রকৃতিকে। অহং-প্রেম যেন শিব-তপস্যায় আত্মার চেতনায় ধারণ করে নবীন রূপ। মদনকে তো ভস্ম করি না, তাহাকে স্থূলতার অহং হইতে সূক্ষ্মতর বিস্তৃততর প্রেম-বিলাসে রূপান্তরিত করিয়া লই। তখন—

> ভরিয়া উঠে নিখিল ভব রতিবিলাপ-সংগীতে,
> সকল দিক কাঁদিয়া উঠে আপনি।
> ফাগুনমাসে নিমেষ মাঝে না জানি কার ইঙ্গিতে
> শিহরি উঠি মুরছি পড়ে অবনী। [মদনভস্মের পর]

প্রেম তখন দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত হইয়া যায়, তখন যাহা দেখি তাহাই প্রেম, তাহাই একটি রহস্যসুন্দরের দ্যোতক। তখন কি জ্যোৎস্না দেখি? দেখি জ্যোৎস্নালোকে কাহার শুভ্র বস্ত্রাঞ্চল। তখন কি নীল গগন দেখি? দেখি নীল নভে কাহার নীলাভ নয়ন। তখন কি সীমা দেখি? দেখি সীমাতীত কোনো অসীমের সৌন্দর্য। অর্থাৎ এই কথাই তখন সত্য হয় যে, চোখ দিয়া যাহা দেখি, তাহা দেখি না; মন দিয়া, প্রেম দিয়া যাহা দেখি, তাহাই দেখি। শিল্পীমনের উত্তুঙ্গ শিখরে উঠা তখন সম্ভব হয়। তখন কথা বাচ্যকে ছাড়াইয়া ব্যঞ্জনার আনন্দে উত্তীর্ণ হইতে চাহে। কথা লইয়া তখন উত্তেজনা নয়, ধ্বনি লইয়াই তখন উদ্দীপনা। প্রেম কথার ঔজ্জ্বল্য চাহে না, সে আপনাকেই চায়, অর্থাৎ সে রসের ধ্বনিকে চাহে।

কথার 'কাব্যত্ব' এবং কথার 'তত্ত্ব' রবীন্দ্র-সৃষ্টিতে একই সত্যের দুইটি ভিন্ন নাম মাত্র। রবীন্দ্রনাথের বিচারে অহং আত্মার ইশারা না দিলে সত্য নহে; কথা ধ্বনির ইঙ্গিত না দিলে মধুর নহে। আসল কথা, রবীন্দ্রনাথের চিত্তে তাহাই তরঙ্গ তুলে যাহা বাচ্যকে ছাড়াইয়া গহীন হৃদয়ের কোনো ভাবাবেগকে উন্মেষিত করে। যাহা স্থূল, যাহা আপনাতে আপনি বন্দী, তাহাতে রবীন্দ্রনাথের মন ভরে না। রবীন্দ্রনাথ যেটিতে মনের স্পর্শ দিয়াছেন, না দেখিয়াই তাই বলিয়া দিতে পারি, সেটিতে গভীর কিছু আছে, অতল কিছু আছে, দার্শনিক ভাষায়, অহং নয়, আত্মার ঐশ্বর্যের দীপ্তি কিছু না কিছু আছেই আছে। কল্পনাকাব্য, শুধু কল্পনা-কাব্য কেন, রবীন্দ্রনাথের ছোট বড়ো সমস্ত প্রেমকাব্য সম্পর্কেই এই তত্ত্বটি প্রযোজ্য।

সংসারজীবনের ঘরোয়া প্রেমের মধ্যেও যে রুচির শালীনতা, সংযমের শুভ্রতা ও হৃদয়মহিমার বিস্তৃতি রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আর কোনো কবির মধ্যেই পাই নাই। কিন্তু সংযম বা হৃদয়ের পবিত্রতা থাকিলেই কি কাব্য কাব্যত্ব পায়? না, তাহা বলিতেছি না। সংযমের উপদেশ কাব্য নহে, হৃদয়ের কল্যাণবোধের নীতিকথা কাব্য নহে। আমার কথা হইতেছে এই, উচ্চতর প্রেমের আনন্দে অধিষ্ঠিত রহিয়া রবীন্দ্রনাথ যখন জৈবপ্রেমের কাব্য রচনা করেন তখন জৈবপ্রেমোপযোগী ইঙ্গিতগুলি এমন রুচিসম্মত ভাষণ ও সুরের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতে থাকে যে, সেগুলি বাচ্যের মধ্যেই বন্দী থাকে না, পরন্তু রহস্যময় কোনো অলোকলোকের ইশারা দিয়াই থামিয়া যায়। কথাগুলি যেখানে থামে, মন সেইখান হইতে কথা কহিতে সুরু করে। কিন্তু কী কথা কহে? যে রহস্যময় ব্যঞ্জনার ধ্বনি জাগাইয়া কবিতা থামিয়া গেছে—তাহারি কথা কহিতে থাকে কখনও জ্ঞাতসারে, কখনও অজ্ঞাতে। এইভাবে শিল্পের মধ্য দিয়া রসাবেগের মধ্যে মন একটি বৃহৎ তাৎপর্যের জন্য আপনা হইতেই প্রস্তুত হইতে থাকে। শেষে দেখা যায়, মন ভুলাইয়া, ভালো লাগাইয়া কবি আমাদের যাহা দিয়াছেন—জীবনকে সুন্দরতর করিবার, মনকে মধুরতর করিবার দর্শনতত্ত্ব তাহার মধ্যে রহিয়া গেছে।

পুনর্বার কি বলিয়া দিতে হইবে, এই দর্শনতত্ত্বই প্রেম?

ক্ষণিকা

প্রেমে উদ্দীপ্ত থাকিয়া প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেই হইবে। প্রকৃতি যাহা ছিনাইয়া লইল, তাহার জন্য হাহুতাশ না করিয়া সহজভাবেই বলিতে হইবে—ফেলিয়া দিলাম, আমিও তাহা ফেলিয়া দিলাম। বলা বাহুল্য, এই ভাব শিল্পীর ভাব, দার্শনিকের ভাব। যাহা পাইয়াছি, তাহা লইয়া অবশ্যই আনন্দ করিব, কিন্তু হাত ফস্‌কাইয়া যদি তাহা সরিয়া পড়ে, তাহার জন্য শোক করিব না।

যা আসে আসুক, যা হবার হোক,
যারা চলে যায় মুছে যাক শোক,
গেয়ে ধেয়ে যাক দ্যুলোক ভূলোক
প্রতি পলকের রাগিণী।
নিমেষে নিমেষ হয়ে যাক শেষ
বহি নিমেষের কাহিনী।

[উদ্‌বোধন, ক্ষণিকা]

"যা আসে আসুক," কিছুকেই উপেক্ষা করিব না, ইহাই রবীন্দ্র-প্রেম। "নিমেষে নিমেষ হয়ে যাক শেষ" তাহার জন্য দুঃখ করিব না, ইহাই রবীন্দ্র-বৈরাগ্য।

বৈরাগ্য যখন প্রেমকে জানে, তখন সন্ন্যাস-সমাধিকে একান্ত মনে করে না—সমাধির নির্বিকারত্ব হইতে মুক্তি লইয়া আনন্দ-চাঞ্চল্যের মহিমায় জীবনকে জানে। প্রেম যখন বৈরাগ্যকে জানে, তখন তাহা আর জৈব প্রেমে আবদ্ধ থাকে না, জৈববোধ অতিক্রম করিয়া স্বপ্নপ্রেমে, কবিপ্রেমে উত্তীর্ণ হয়; তখন প্রেম বলে, 'সুন্দরীর কালো আঁখি' দেখিয়া ক্ষণিকের জন্য যদি বিহ্বল হইয়া পড়ি, লজ্জা স্বীকার করিয়া লজ্জা ঢাকিব না। আমি যে জানি, 'কালো আঁখিই' শুধু দেখি নাই, দেখিয়াছি আঁখি-রূপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া 'শ্যাম আষাঢ়ের ছায়া'-রূপ। প্রসন্ন তাহার শুভ্র সুন্দর 'ললাট' দেখিয়াই কি 'চপলতা' প্রকাশ করিয়াছি? আমি যে তাহার ললাটে 'নববরষার বরণডালা' দেখিয়াছি আনন্দে—

তোমার দুখানি কালো আঁখি-'পরে
শ্যাম আষাঢ়ের ছায়াখানি পড়ে,
ঘনকালো তব কুঞ্চিত কেশে
যূথীর মালা;
তোমারি ললাটে নববরষার
বরণডালা। [অবিনয়]

মাঠ দিয়া যাইবার কালে যে কালো মেয়েটি চকিতে একবার চোখে পড়িয়াছে, সত্য সত্যই সে কি কালো? স্থূলবুদ্ধি 'গাঁয়ের লোক' তাহাকে কালো বলিয়া জানে—তাহার প্রকাশের কৃষ্ণত্বটুকুরই তাহারা সন্ধান রাখে। কিন্তু কোনোদিন কি তাহারা মেঘাচ্ছন্ন আকাশের তলায় 'কুটীর হতে ত্রস্ত' পদে তাহাকে আসিতে দেখিয়াছে? যে মেয়েটি—

আকাশ পানে হানি যুগল ভুরু
শুনলে বারেক মেঘের গুরু গুরু—

তাহাকে কি কেহ 'আলের ধারে একা' দাঁড়াইয়া দেখিয়াছে? কেউ, কেউ ছিল না মাঠে, আকাশে ঘন মেঘ, একাকিনী সে

মাথার 'পরে দেয় নি তুলে বাস,
লজ্জা পাবার পায় নি অবকাশ—

এ হেন অবস্থায় তাহাকে যে দেখিয়াছে, সে কি তাহাকে কালো বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারে? তাহার 'হরিণ-চোখের' ত্রস্ত চাঞ্চল্যে কত অতলের ইশারা আছে কে জানে! আড়চোখে সে কি একবার আমাকে দেখিয়াছিল? কেন তাহাকে কালো বলিলে মন সাড়া দেয় না? কালোত্বের অতীতে কী আমি দেখিয়াছি? কেন দেখিয়াছি?

মন রচনা করিয়া চলে কত কথা, এমন কথা যাহা কাব্যে নাই, 'ক্ষণিকা'র কালোরূপের আলোর প্রসন্নতায় চিত্ত ঝলমল করিয়া উঠে। কাব্যের ইহাই তো

রসোদ্বোধনা, ইহাই বোধ-বিভূতির রস-বিজ্ঞান। কৃচ্ছ্র সাধনার ইহা দর্শনতত্ত্ব নহে; বোধ বিভূত হইলেই বুঝা যায়, রূপকে ইন্দ্রিয়ের দৃষ্টিতে দেখিলে তাহা নিষ্প্রাণ জড় ছাড়া আর কিছু নহে। এইজন্য রূপকে প্রাণময় করিবার জন্য, ইন্দ্রিয়ের নয়, মনের সহায়তা লইতে হয়। শুধু সুন্দর হইলেই হইবে না, সুন্দরকে সুন্দরতম করিবার উদ্দেশ্যে পরিবেশের প্রয়োজন। কেন? মনকে আকৃষ্ট করিতে হইবে। মন আকৃষ্ট না হইলে তাহার দর্শনের বন্ধন ঘোচে না। মন যেখানে ঘুমাইয়া থাকে, ইন্দ্রিয়ের সেখানে বিভূত বোধের রসবিজ্ঞানে উত্তীর্ণ হওয়ার সাধ্য নাই। মনের কুম্ভকর্ণ-নিদ্রা ভঙ্গ করিবার জন্য মনের কাছে যাহা পৌছায় তাহারি আশ্রয় লইতে হয়। বস্তুতঃ, চোখ দিয়া নয়; বোধের বা মনের দৃষ্টিতে যখন রূপ দেখি, তখনই তাহা প্রাণ পায়, রূপ হইতে রূপাতীতে অভিসার করে। কালো তখন 'কালো' নয়, কালো তখন 'কৃষ্ণকলি'। তখন তাহার 'হরিণচোখ' যে দেখিয়াছি, তাহা ভুলি না। এইভাবে দৈনন্দিন বস্তুজীবনের 'ক্ষণিকা' অগ্রসর হইয়া চলে রসজীবনের অনন্ত মাহাত্ম্যে। যেখানে যাহা দেখি, যাহা পাই, সবি গ্রহণ করি, উপেক্ষা করিনে কিছুই, তবে এ কথা ঠিক যে, জৈবকামনার স্থূল আবেগকে প্রশ্রয় দিয়া 'কাড়াকড়ি'তে মাতিয়া যাওয়ায় আমার শিল্পস্বভাব আনন্দ অনুভব করে না।

যেথা-সেথা যাই, যাহা-তাহা পাই,
ছাড়িনেকো ভাই, ছাড়িনে।
তাই বলে কিছু কাড়াকাড়ি করে
কাড়িনে। [উদাসীন]

অতি আধুনিক অনেক সমালোচক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ক্ষণিকার রস উপভোগ করিয়া তৃপ্তি পাইয়াছেন। তাঁহারা নিজেদের বোধ অনুসারে ক্ষণিকার যে চিত্র মানসপটে আঁকিয়া লইয়াছেন, তাহার সম্পর্কে কিছু বলিতে চাহি না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের যে মন ক্ষণিকার মধ্যে লীলা করিয়াছে তাহার উদাসীন আনন্দধর্মী রূপটি ধরিতে না পারিয়া রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী অমর কাব্যগুলির উপর যাঁহারা অবিচার করিয়াছেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে বিনয় সহকারে মৃদু প্রতিবাদ জ্ঞাপন না করিলেই নয়। গ্রন্থের সূচনাতেই আমি উল্লেখ করিয়াছি যে, নৈবেদ্য গীতাঞ্জলি প্রভৃতি কাব্যগুলিকে রবীন্দ্রকাব্যের শাখারূপে গ্রহণ না করিয়া কেহ কেহ 'উপশাখা' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই অভিমতের তাৎপর্য এই, রবীন্দ্রমানস নৈবেদ্যাদি কাব্যে যেভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা যেন কবির সত্য স্বভাব নহে, তাহা আকস্মিক আধ্যাত্মিকতার মোহৈশ্বর্যের ইন্দ্রজাল মাত্র, তাহা বাহিরের, তাহা অন্তরের নহে। প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ প্রবীণ সমালোচকবৃন্দ এই অভিমত অবশ্য অগ্রাহ্য করিয়াছেন, কিন্তু কি কারণে

এই অভিমত উপেক্ষণীয়, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করেন নাই। গ্রন্থের সূচনা হইতে বর্তমান পংক্তি পর্যন্ত যাহা যাহা আমি বলিয়া আসিয়াছি তাহাতে নিশ্চয়ই প্রমাণিত হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের মন কোনো বিশেষে বন্দী নহে। তাঁহার বৈরাগ্যদর্শনের তাৎপর্যটুকু গ্রহণ করিলেই কথাটা অত্যন্ত সহজ হইয়া যায়। ক্ষণিকাতেও আমি দেখাইয়াছি, সূক্ষ্ম একপ্রকার বৈরাগ্যবোধ প্রকাশিত হইয়াছে। আসলে, ক্ষণিকার রচয়িতার শিল্পস্বভাবটি হৃদয়গত হইলেই বুঝা যায়, ক্ষণিকার কবি যে নৈবেদ্যাদি কাব্যে হাত দিবেন তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। মনের বন্ধন যাঁহাদের আছে, নৈবেদ্যাদির রস গ্রহণে তাঁহারা সমর্থ নহেন; কিন্তু ক্ষণিকার রসও তাঁহারা সম্যক্‌ভাবে গ্রহণ করেন বলিয়া আমি মনে করি না। ক্ষণিকার মধ্যে শিল্পরূপের যে অনন্তকে ধরা হইয়াছে, তাহা মানবমনের সূক্ষ্ম বোধানন্দের প্রতিভূ। ক্ষণিকা জৈবকামনার গান নহে, জৈবকামনার ভিত্তিতে শিল্পচৈতন্যের যে আবির্ভাব যুগে যুগে কবিমনকে রসাভিব্যক্তির পথে টানে, তাহারি সূক্ষ্মতর ব্যঞ্জনা আছে ক্ষণিকায়। কেহ কেহ বলিয়াছেন বলিয়া জানিয়াছি যে, ক্ষণিকাই অতি আধুনিক কাব্য সাহিত্যকে জন্ম দিয়াছে। এ কথা আমি সত্য বলিয়া মনে করি না। ক্ষণিকার বৈরাগী কবিকে আধুনিকেরা যদি ধরিতে পারিতেন, তবে আধুনিক বাঙ্গলা-কাব্যের রূপ ভিন্নতর হইয়া যাইত।

ক্ষণিকার মধ্যে যে প্রেমের প্রকাশ তাহার মধ্যে সূক্ষ্ম বৈরাগ্যের জ্যোতি আছে বলিয়াই ক্ষণিকা ক্ষণিকা নহে, তাহা অনন্তের সুরে চলে, অনন্তের সুরে চালায়।

এই বৈরাগ্যই 'নৈবেদ্য' কাব্যে ভিন্নরূপ লইয়াছে।

মানুষের মধ্যে আছে ব্যক্তিজীবন ও সমষ্টিজীবন। ব্যক্তিজীবনে আছে সীমা ও অসীমা; সমষ্টিজীবনেও আছে সীমা ও অসীমা। ক্ষণিকা হইতেছে ব্যক্তিজীবনের নিকট প্রতিভাত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বহু সীমারূপের অসীমোপলব্ধি; নৈবেদ্য হইতেছে মানুষের অন্তর্নিহিত সমষ্টিজীবনে প্রতিভাত বৃহত্তর বিশ্ব-সীমার অসীমোপলব্ধি।

নৈবেদ্য

নৈবেদ্যের কবিতাগুলিতে দেখি—বিশ্বের সর্বত্র ঐক্যতত্ত্বের একটি নিগূঢ় স্পর্শ কবি অনুভব করিতেছেন। ধ্যানময় স্তব্ধতার মধ্যে তিনি উপলব্ধি করিতেছেন যে, সেই এক আনন্দময় অখণ্ডকে কেন্দ্র করিয়াই বিশ্বপ্রকৃতির যত বৈচিত্র্যের প্রকাশ।

এই স্তব্ধতায়
শুনিতেছি তৃণে তৃণে ধূলায় ধূলায়,
মোর অঙ্গে রোমে রোমে, লোকে লোকান্তরে
গ্রহে সূর্যে তারকায় নিত্যকাল ধরে
অণু পরমাণুদের নৃত্য কলরোল—
তোমার আসন ঘেরি অনন্ত কল্লোল। [নৈবেদ্য-২৩]

খণ্ডদৃষ্টিতে যে ক্ষণ বা যে দিন কর্মহীন হইয়া থাকায় নষ্ট হইল বলিয়া বোধ হয়, অখণ্ডদৃষ্টিতে তাহাও জীবনের অঙ্গীভূত থাকিয়া নবতর কোনো অনাগত কর্মের ও জীবনের সূচনা করে—

মাঝে মাঝে কতবার ভাবি কর্মহীন
আজ নষ্ট হোলো বেলা, নষ্ট হোলো দিন।
নষ্ট হয় নাই, প্রভু, সে সকল ক্ষণ,
আপনি তাদের তুমি করেছ গ্রহণ
ওগো অন্তর্যামী দেব। অন্তরে অন্তরে
গোপনে প্রচ্ছন্ন রহি কোন্ অবসরে
বীজেরে অঙ্কুররূপে তুলেছ জাগায়ে,
মুকুলে প্রস্ফুটবর্ণে দিয়েছ রাঙায়ে॥ [নৈবেদ্য-২৪]

বিশ্বের সর্বত্র যে প্রাণের লীলা-নর্তন পত্রে, পুষ্পে, তৃণে, পল্লবে সর্বদা বিকশিত ও তরঙ্গিত হইতেছে—বিশ্বব্যাপী জীবজীবনের জন্ম ও মৃত্যুর সমুদ্রদোলায় যে প্রাণ অন্তহীন জোয়ার-ভাঁটায় উঠিতেছে, নামিতেছে,

সেই যুগ যুগান্তের বিরাট স্পন্দন
আমার নাড়ীতে আজি করিছে নর্তন [২৬]

এতদিন রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়া আসিতেছেন, নৈবেদ্যের কয়েকটি কবিতায়—যেমন 'দেহলীলা', 'মুক্তি' প্রভৃতিতে—নূতন করিয়া তাহাই বলিতেছেন। কবি বলিতেছেন, দেহ মিথ্যা নয়, ইন্দ্রিয় মিথ্যা নয়। অসীমের 'অনন্ত আসন' আমার আমি-র মধ্যেই। যেমন—

তোমারি মিলন শয্যা, হে মোর রাজন্,
ক্ষুদ্র এ আমার মাঝে অনন্ত আসন
অসীম বিচিত্র কান্ত। ওগো বিশ্বভূপ,
দেহে মনে প্রাণে আমি এ কী অপরূপ! [২৭]

অন্যত্র—

ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যে-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে। [৩০]

পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ বৈরাগ্য মানেন, কিন্তু সে বৈরাগ্য জগৎ-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ কোনো নির্বিকার বৈরাগ্য-তত্ত্ব নহে। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়', তখন সেই নির্বিকার বৈদান্তিক বৈরাগ্য-সাধনই রবীন্দ্রনাথ চাহেন না, বুঝিতে হইবে। আবার তিনি যখন 'দাও ভক্তি শান্তিরস' বলিয়া প্রার্থনা জানান, তখন যে ভক্তি

মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্যগীতগানে
ভাবোন্মাদমত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা
উদভ্রান্ত উচ্ছলফেন ভক্তিমদধারা—

তিনি চাহিতেছেন না বুঝিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ বৈরাগ্যধর্মী, কিন্তু বৈদান্তিক বৈরাগ্য তাঁহার নয়; রবীন্দ্রনাথ ভক্তিধর্মী, কিন্তু বৈষ্ণব ভক্তি তাঁহার নয়। এই কথাগুলি সম্যক্‌ভাবে যিনি বুঝিয়াছেন তিনি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আর পরস্পরবিরোধী তত্ত্ব পাইবেন না। তিনি তখন সহজেই বুঝিবেন, জগতের সর্বাধিক জ্ঞান ও দর্শনতত্ত্বের মানবিক ও সামাজিক মহিমাটুকু ছানিয়া লইয়া কবি 'ইহলৌকিক জগৎজীবনকেই সুন্দর ও মঙ্গলময় করিতেই চাহিয়াছেন। বৌদ্ধদের 'নির্ব্বাণ' তত্ত্বেও তিনি বিশ্বাসী হইবেন না, কিন্তু বুদ্ধদেবের মানবকল্যাণমন্ত্র ও প্রেম তিনি গ্রহণ করিবেন। জগৎজীবনে মঙ্গল সমায়াত হইলেই তাঁহার সাধনা সিদ্ধি পাইবে—এইরূপ তাঁহার ধারণা। তাঁহার ভক্তি প্রার্থনায় এই কথাই স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

দাও ভক্তি শান্তিরস,
স্নিগ্ধ সুধা পূর্ণ করি মঙ্গলকলস
সংসারভবনদ্বারে। যে ভক্তি-অমৃত
সমস্ত জীবনে মোর হইবে বিস্তৃত
নিগূঢ় গভীর, সর্ব কর্মে দিবে বল,
ব্যর্থ শুভ চেষ্টারেও করিবে সফল
আনন্দে কল্যাণে। সর্ব প্রেমে দিবে তৃপ্তি,
সর্ব দুঃখে দিবে ক্ষেম, সর্ব সুখে দীপ্তি
দাহহীন॥ [৪৫]

অর্থহীন ভাববিলাসিতা মানুষ বা জাতির ধর্ম বা আদর্শ হইতে পারে না। যে-ভাব কর্মে রূপান্তরিত হইয়া জীবনকে মহিমা দিতে পারে, ঈশ্বরের নিকট সেই ভাবের দীক্ষা লইতে হইবে মানুষকে। দুরূহ কর্তব্যভারে, 'দুঃসহ কঠোর বেদনায়' মানুষকে অগ্রসর হইতে হইবে কর্মে কীর্তিতে [৪৭]; 'লোকভয়', 'রাজভয়', 'মৃত্যুভয়' ত্যাগ করিয়া 'অনন্ত আকাশে' মস্তক তুলিতে হইবে মানুষকে [৪৮]; ন্যায়ের সত্যের আত্মমর্যাদার গৌরব রক্ষার্থে 'ভয়শূন্য' রাখিতে হইবে চিত্তকে, সর্ব কর্মে, সকল চিন্তায় মহত্তম আদর্শকে রাখিতে হইবে জীবনের সর্বোচ্চ আসনের গৌরবে [৭২]। নৈবেদ্যের বহু চতুর্দশপদীতে এই সকল জীবনগত সুন্দর নীতি বীর্যপ্রধান অপ্রমত্ত ভাষায় প্রকাশ করা হইয়াছে। 'নিবেদন' কবিতাটিতে বলা হইয়াছে—

বীর্য দেহ দুখে,
যাহে দুঃখ আপনারে শান্তস্মিত মুখে
পারে উপেক্ষিতে। ভকতিরে বীর্য দেহ
কর্মে যাহে হয় সে সফল, প্রীতি স্নেহ
পুণ্যে ওঠে ফুটি। বীর্য দেহ ক্ষুদ্র জনে
না করিতে হীনজ্ঞান, বলের চরণে
না লুটিতে। বীর্য দেহ চিত্তেরে একাকী
প্রত্যহের তুচ্ছতার উর্ধ্বে দিতে রাখি॥ [৯৯]

কাব্য হইতে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন সম্বন্ধে স্পষ্ট অভিমত যাঁহারা জানিতে চাহিবেন, নৈবেদ্য তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান গ্রন্থ সন্দেহ নাই। জীবন, মৃত্যু, প্রেম, বৈরাগ্য, প্রকৃতি, ব্রহ্ম প্রভৃতি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নৈবেদ্যতে যাহা লিখিয়াছেন, ***Sadhana, Personality, Religion of Man, Creative Unity***, শান্তিনিকেতন, ধর্ম, মানুষের ধর্ম প্রভৃতি দর্শন ও ধর্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থে তাহারি ভাষ্য দ্ব্যর্থহীন গদ্যে প্রকাশ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, জীবন যা আছে, তাহাতে খুশি নহি, জীবন যা হইবে, তাহাতেই মন পড়িয়া আছে। বলা হইয়াছে, জীবন সত্য, প্রকৃতি মধুরা। বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম দূরে আছেন, আবার নিকটেও আছেন।

একাধারে তুমিই আকাশ, তুমি নীড়।
হে সুন্দর, নীড়ে তব প্রেম সুনিবিড়
প্রতিক্ষণে নানা বর্ণে নানা গন্ধে গীতে
মুগ্ধ প্রাণ বেষ্টন করিছে চারিভিতে। [৮১]

'মৃত্যু' নামক কবিতাটিতে কবির অখণ্ড দৃষ্টি আশ্চর্য সুন্দর একটি উপমায় প্রকাশিত হইয়াছে। মৃত্যু কী? জীবনেরি একটি দিক। খণ্ড দৃষ্টিতে জীবনকে দেখি বলিয়া জীবনকেই কেবল সত্য বলিয়া জানি এবং মৃত্যুর নামে 'শিহরিয়া কাঁপিতেছি'। কিন্তু খণ্ডদৃষ্টির এই মোহ না কাটাইলেই নয়। যাহা অচেনা তাহার জন্য আমাদের কোনো আবেগ নাই—কিন্তু জন্মগ্রহণের পূর্বে এই 'জীবন সংসার' আমার নিকট অচেনা ছিল না কি? জন্মগ্রহণ করিয়াই দেখি বহুকালের পরিচিত এই প্রকৃতি আত্মীয়ের মতো মধুর। অচেনা এত চেনা ঠেকিল কি করিয়া? মৃত্যুকে অচেনা বলিয়া অনাত্মীয় মনে হইতেছে, কিন্তু—

মৃত্যুর প্রভাতে
সেই অচেনার মুখ হেরিবি আবার
মুহূর্তে চেনার মতো। জীবন আমার
এত ভালোবাসি বলে হয়েছে প্রত্যয়,
মৃত্যুরে এমনি ভালো বাসিব নিশ্চয়।

স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে,
মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে॥ [৯১]

এই যে অখণ্ডবোধ, রবীন্দ্রনাথকে জানিতে হইলে, ইহারি আলোকে তাঁহার কাব্য ও দর্শনজগৎকে লক্ষ্য করিতে হইবে। ইহার পরবর্তী যুগে ভাবের দিক দিয়া আরো সূক্ষ্মতর জীবনে উত্তীর্ণ হইয়া গেছেন, ভাষায় নামিয়াছে প্রচ্ছন্ন জ্যোতির্জীবনের রহস্যমহিমা।

এইবার উৎসর্গের আলোচনা উত্থাপন করিতেছি।

নৈবেদ্যে যে-সুন্দরের নিকট কবি আত্মনিবেদন করিয়াছেন, সেই সুন্দর একান্ত অন্তরতম উৎসর্গের কবিতায়। বলা হইয়াছে, তিনি অপ্রকাশ। মানুষের যে প্রকাশ-জীবন, তাহা তাহার অপ্রকাশ-জীবনের তুলনায় নিতান্তই অল্প। ভূমা হইতেছে সেই অপ্রকাশ, আমরা জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে তাহাকেই চাহি। এইজন্য যাহা পাইয়া আছি, যাহা প্রকাশ, তাহা লইয়া আমরা খুশি নহি; আমরা নিত্যকাল ছুটিতেছি অপ্রকাশের অন্ধকার জ্যোতির্লোকে।

উৎসর্গ

মোর কিছু ধন আছে সংসারে
বাকি সব ধন স্বপনে,
নিভৃত স্বপনে।

ওগো কোথা মোর আশার অতীত,
ওগো কোথা তুমি পরশচকিত,
কোথা গো স্বপনবিহারী।
তুমি এসো এসো গভীর গোপনে
এসো গো নিবিড় নীরব চরণে
বসনে প্রদীপ নিবারি, এসো গো
গোপনে। [উৎসর্গ-৩]

এই যে অপ্রকাশ স্বপনবিহারী, স্থূলমনের স্থূলদৃষ্টির সম্মুখে ইনি প্রকাশমান নহেন। তিনি রাজপথ দিয়া আসেন না, তাঁহার অভিসার অন্তর্লীন গহন জীবনপথে।

তোমারে চিনিব প্রাণের পুলকে,
চিনিব সজল আঁখির পলকে,
চিনিব বিরলে নেহারি পরম
পুলকে।
এসো প্রদোষের ছায়াপথ দিয়ে,
এসো না পথের আলোকে, প্রখর
আলোকে।

উৎসর্গের কবিতাগুলির প্রাণবস্তু হইতেছে প্রসন্ন ভাবগভীর হৃদয়ের প্রেম, তাহার ব্যাকুলতা। যাহাকে চাহি, সে আসি-আসি করিতেছে, ঐ বুঝি আসিয়াই গিয়াছে,—না না, আর তো লুকাইয়া নাই, এইবার যেন মুখোমুখি দেখাই হইয়া গেল—এইরূপ ভাব-ব্যঞ্জনা উৎসর্গ-কবিতার ছত্রে ছত্রে প্রকাশমান। এইজন্য কবিতাগুলিকে প্রথম দৃষ্টিতে মিস্টিক বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু তাহা ভ্রম মাত্র। অপ্রকাশ-এর সহিত কবির এই জীবনযোগ, প্রকাশজগতের পথেই তাঁহাকে নূতনরূপে ক্রমশঃ আকর্ষণ করে, প্রকাশ হইতে অপ্রকাশে অন্তর্লীন হইয়া ধারণাতীত শান্ত অবস্থায় টানিয়া লইয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের এই আধ্যাত্মিক রহস্যভাব বস্তুজীবনেরই একটা দিক মাত্র, ইহা বস্তুজীবনকে আরো ভাবঘন, আরো নির্মলকান্ত, আরো শুভ্রতাসুন্দর করিবার আধ্যাত্মিকতা। অপ্রকাশের দুয়ার হইতে তিনি ততটুকু জ্যোতিই বহন করিয়া আনেন, যতটুকু বস্তুজীবনের উপযোগী, যতটুকু মানসিক ধারণায় সম্পৃক্ত। *Hindu Mysticism* গ্রন্থে ড. সরকার স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন, আধ্যাত্মিক রহস্যজীবনের প্রাথমিক অবস্থায় রূপরসবর্ণগন্ধের উচ্ছ্বসিত প্রাণ-প্রবাহ সাধককে গভীরতরভাবে আন্দোলিত করিয়া তুলে। এই প্রাথমিক রহস্যানন্দের সৃষ্টি-প্রকাশকে ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা মিস্টিক বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু ভারতীয় সাধকবৃন্দ রহস্যজীবনের উত্তুঙ্গশিখরে উঠিতে জানেন বলিয়া ইহাকে অত্যন্ত স্থূল

ব্যাপার অর্থাৎ বস্তুগত জীবনব্যাপার বলিয়াই ধারণা করেন। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের এই রহস্যভাব, রহস্যই নহে; ইহা বস্তুগত জীবনধ্যানে আছে, সাধারণ ধারণার মধ্যেও কখনও কখনও আসে, সামান্যতম আনন্দসম্মোহনেও ইহার ছন্দোধ্বনি শুনা অসম্ভব নহে। সাধকের চিত্তে যখন এ হেন রহস্যানন্দ উন্মেষিত হয়, প্রাণে তখন আনন্দের তুফান বহিতে থাকে, সৃষ্টিশক্তির উদ্দাম পুলকপ্রবাহ তরঙ্গিত হয় অন্তঃপ্রাণে। কিন্তু—

> "Unless the adept can pursue the attitude of complete detachment the mysteries of a still higher and finer spiritual life cannot be revealed to him. The detachment to the dynamic divine in its concrete expression gives the key to the higher expressions beyond creative forms and intelligences in supreme puissance in spiritual life".
>
> [*Hindu Mysticism.*]

রবীন্দ্রনাথ, পূর্ব পূর্ব অধ্যায়েও বলিয়াছি, নির্বিকার কোনো নির্বিশেষ বৈরাগ্যধর্মকে কোনোদিন চাহেন নাই। ভাগবত জ্যোতিপ্রবাহে তরঙ্গিত হইয়া বারে বারে তিনি পৃথিবীর তটে আসিয়াই পৌঁছিয়াছেন, বারে বারে মানুষের জগতকেই একান্ত আপনার বলিয়া মনে করিয়াছেন; বারে বারে সমস্ত আধ্যাত্মিকতার স্বপ্নসৌন্দর্য মানুষ এবং মানুষের পৃথিবীতে ঢালিয়াছেন। এইজন্য তাঁহার অসীম নির্বিশেষ নির্বিকার হয় নাই, সীমার মধ্যে ধরা দিয়াছে, মানুষের জীবনে, প্রকৃতির সৌন্দর্যে, জগতের অণুতে পরমাণুতে লীলায়িত হইয়া অভিনব ভাবসম্মোহনের সৃষ্টি করিয়াছে।

মহাকবি গ্যেটে বলিয়াছেন :

> "Of the Absolute in the theoretical sense I do not venture to speak ; but this I maintain, that if a man recognises it in its manifestation, and always keeps his eye fixed upon it, he will reap a very great reward." [*Christian Mysticism*, Dr. Inge]

মহাকবি রবীন্দ্রনাথ সেই অনন্ত নিত্যদেবের জগল্লীলা সমূহে নয়ন রাখিয়াছেন, তাহার পুরস্কারও পাইয়াছেন অভূতপূর্বভাবে। কিন্তু এই 'নয়ন রাখার' ব্যাপারটিকে ধারণাতীত ব্যাপার বলিয়া মনে করা ঠিক নহে। হিন্দুমতে mysticism ব্যাপারটি কিন্তু অবাঙ্মনসোগোচর তত্ত্বেরই বিষয়ভূত ব্যাপার। কিন্তু কথাটি যেভাবে পত্রে পত্রিকায় এবং আধুনিক সমালোচকদের প্রবন্ধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহা দেখিয়া আমার মনে হয় এ সম্পর্কে আমাদের ধারণা খুব গভীর হয় নাই। বস্তুতান্ত্রিক এই বিপর্যস্ত বিশ্বে খাওয়া-পরার সমস্যা লইয়াই যখন চিত্ত ব্যাপৃত এবং বিক্ষিপ্ত, তখন এতটুকু ভাবের কথা

হইলেই তাহা জীবনবহির্ভূত কোনো অবাস্তব রহস্যবাদ মনে করিয়া বসি। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথকে বহু দুর্ভোগ সহ্য করিতে হইয়াছে। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের অসীম বা অনন্ত মানুষের মাহাত্ম্যবোধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মনের ধ্যান ও ধারণায় তাহাকে জানি। ক্রমশঃ সেই অসীম আমাদের কর্মে, ধর্মে, আত্মোন্নতির কল্যাণবোধে বিকাশ লাভ করিতেছে। ইহারি সহিত 'মনের মনে' আমাদের কথা হয়—ইহাকেই চরিত্রে প্রতিভাত করিবার জন্য আমরা ত্যাগ করি, প্রেম করি, বীরত্বে অগ্রসর হই, বৃহত্তের জন্য উঠি নাচিয়া। এই যে জীবনানুগ মর্মমোহন মহাত্মা আমাদেরি অন্তরে 'স্বপনবিহারী' হইয়া রহিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ শয়নে স্বপনে ইহারি সহিত কথা কহেন। ইহারি ছায়া দেখেন সর্বত্র। ইনি ক-এ আছেন, খ-এ আছেন, গ-এ আছেন, সর্বত্র সকল কালে সকলকে মিলাইয়া ইনি প্রেমরূপে অধিষ্ঠিত আছেন। মনের স্থূলতা জৈবতা দূর হইলেই ইঁহার প্রকাশ স্বচ্ছ হইয়া আসে মনের মধ্যে। মন যে রিয়াল বস্তু, ইহা বোধকরি অতি বড় তীব্র বস্তুবাদীও স্বীকার করিবেন। কিন্তু স্থূল মনই কি কেবল 'রিয়াল'? স্থূলতা ত্যাগ করিয়া যে মন প্রসন্নবোধে উন্নীত হইয়াছে তাহা কি রিয়ালের সীমায় আসিবে না? রবীন্দ্রনাথের মনোদর্শন mystic দর্শন, না realistic দর্শন?

আমি জানি আমার এই কথায় বিস্তর তর্ক উঠিবে। যে যখন তর্ক করে সে তাহার বোধের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া বিশেষ একটি বিশ্বাসে ভর করিয়াই তর্ক করে। বর্তমান শতাব্দীর বোধ অত্যন্ত নিম্নস্তরের, মন তাহার অত্যন্ত স্থূল, নানা অতিকৃতির আবরণে তাহা আচ্ছন্ন। বৃহৎকে, মহৎকে জীবনের পক্ষে বাস্তব বলিয়া গ্রহণ করিতে আজ তাহার মন চাহে না। চারিদিকে বেসুরো মনোভাব, চারিদিকে অন্যায়, পাপ, প্রতারণা, হিংসা। আজ মানুষের মধ্যেই সেই মহাত্মার, সেই জীবনদেবতার, সেই বিশ্বলক্ষ্মীর বাণী শোনা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইতেছে না। তাঁহার কথা বলিবার জন্য, গাহিবার জন্য যেই সুর-সেতারার ঝংকার তুলি, 'স্থূলমতিরা' বলে—'এস্‌কেপ্‌' করিতেছি জগৎ হইতে, 'সূক্ষ্মমতিরা' কহেন—'মিস্টিক' হইতেছে ভাবের বিলাস।

এত আঁধার-মাঝে তোমার
এতই অসংশয়!
বিশ্বজনে কেহই তোরে
করে না প্রত্যয়। [উৎসর্গ-১]

কিন্তু কবি স্পষ্ট করিয়াই জানিয়াছেন তাহা সত্য, তাহা বাস্তব, সকল বাস্তবের সার বাস্তব সেই 'সে'—সেই তুমি।

কেবল তব মুখের পানে
চাহিয়া,

বাহির হনু তিমির-রাতে
তরণীখানি বাহিয়া। [২]

'তিমির রাতে' তরণী বাহিয়া চলিতেছি, ভয় নাই, একদা 'শুভ প্রভাতে' 'সকলের সাথে' মিলিয়া সেই আমার আদর্শকে পাইব।

ভয় নাই তোর, ভয় নাই ওরে, ভয় নাই,
কিছু নাই তোর ভাবনা,
সে-শুভ প্রভাতে সকলের সাথে
মিলিবি, পুরাবি কামনা,— [৯]

বুঝা যাইতেছে, কবির অসীমোপলব্ধি ধর্মতাত্ত্বিকগণের কোনো ব্যক্তিগত মুক্তির আনন্দবাদ বা স্বাতন্ত্র্যবাদ নহে, ইহা সকলের সহিত মিলিয়া ভেদবিহীন সর্বজগদ্‌গত প্রেমের আনন্দোপলব্ধি। বিশ্বপ্রকৃতি, বিশ্বমানুষ, বিশ্বমন—সকলকে একত্র করিয়া যে অখণ্ড প্রেম-মন, প্রেম-ব্যক্তিত্ব রূপে রূপে, আনন্দে আনন্দে ধূলি হইতে স্বর্গধাম পর্যন্ত সর্বত্র বিরাজ করিতেছে, কবি তাহার কথাই গানে গন্ধে ছন্দে আনন্দে প্রকাশ করিতেছেন।

এই যে প্রেম, 'চির পুরানো' এই প্রেম। বুঝি আর নাই বুঝি, এই প্রেম চিরদিন বিশ্বভুবনকে অখণ্ড এক ঐক্যতত্ত্বে ধরিয়া রাখিয়াছে।

হে চির-পুরানো, চিরকাল মোরে গড়িছ নূতন করিয়া,
চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর রবে চিরদিন ধরিয়া, [১৩]

এই কথাটি জানা হইলে এবং মানা হইলে অর্থাৎ অখণ্ড এই প্রেমের আনন্দ অনুভবে পৌছিলে, বিশ্বের কেহই আর পর নহে, তখন সকল মানুষ, সকল জাতি আত্মীয়ের ন্যায় মধুর ও সুন্দর। সকলকে জুড়িয়া যখন আমার প্রেম আছেন, তখন পৃথিবীর কোথায় আমার ঘর নাই?

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া।
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি
সেই দেশ লব বুঝিয়া। [১৪]

বিশ্বভূমীন এই প্রেমবোধ উৎসর্গ কবিতার বৈশিষ্ট্য। এই প্রেমবোধই জগৎজীবনের কেন্দ্রস্বরূপ। জগতে দুঃখ আছে, সংশয় আছে, পতন স্খলন আছে, কিন্তু সকল কিছুর কেন্দ্রস্থলে সেই অসীম প্রেম বিরাজমান থাকিয়া নিখিলকে সুষমামণ্ডিত রাখিতেছে।

স্থির আছে শুধু একটি কিছু
ঘূর্ণির মাঝখানে—
সেইখান হতে স্বর্ণকমল
উঠেছে শূন্যপানে। [১৫]

স্বর্ণকমল এই বিশ্বপ্রকৃতি সহস্রদলের বর্ণবৈচিত্র্য লইয়া সৌরভে গৌরবে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে। প্রকৃতির কোনো চিত্রই মায়া নহে, মিথ্যা নহে এই জন্য যে, এই প্রকৃতি-কমলের কেন্দ্রবৃন্তটি হইতেছে সেই অখণ্ড অদ্বিতীয় প্রাণশক্তি,—সেই প্রেম। ইহারই রশ্মিপ্রভায় ধরণীর 'অণু রেণু সব' অজস্র সৌন্দর্যে ঝলমল করে,—যাহা তুচ্ছ, যাহা নগণ্য, যাহা উপেক্ষণীয়, তাহাও ইহার আনন্দে উচ্ছ্বাসিত রূপে উদ্দীপ্ত থাকে। এই যে সর্বজগদ্‌গত প্রেমের নিত্য বসন্তোৎসব, স্থূল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নহে, শুভ্র নির্মল মনের নয়ন দ্বারাই ইহাকে দেখিতে হয়।

পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন মহোদয় একটি প্রবন্ধে [ঋষি সাধকের বসন্ত উৎসব, দেশ : ১৬শ বর্ষ : ১৫শ সংখ্যা] বড় সুন্দর করিয়া দেখাইয়াছেন, প্রাচীন সাধক ঋষিরাও চক্ষু দ্বারা নহে, মন দিয়াই প্রকৃতিলীলা দর্শন করিতেন।

পণ্ডিত সেন লিখিতেছেন—

"শুধু চক্ষু দিয়া এই লীলা দেখা যায় না, মন দিয়া, হৃদয় দিয়া সেই অপূর্ব রহস্য উপলব্ধি করিতে হইবে। সবাই তো দেখেন চক্ষে, মন দিয়া দেখেন কয়জন ?

পশ্যন্তি সর্বে চক্ষুষা
ন সর্বে মনসা বিদুঃ ॥

"আজ দেখিতে চাই সেই চন্দ্রমাকে যাহা আমাদের মন হইতে বিকশিত।

চন্দ্রমা মনসো জাতঃ।

"সেই চন্দ্রমার কোথাও জীর্ণতা নাই। তাহা নিত্যই নব নব রূপে জায়মান।

চন্দ্রমাশ্চ পুনর্ণবঃ।

"আমাদের অন্তর ও বসন্তচন্দ্রমার মধ্যে আজ যেন কোনো ভেদ প্রভেদ না থাকে। আজ আমাদের মন ও চন্দ্রমা উভয়ে যোগযুক্ত হইয়া এক হইয়া যাউক।

যদিদং মনঃ সোদৃসো চন্দ্রঃ।

"সেই চন্দ্রে শুধু আলোকই পাই না, পাই চৈতন্যকেও, পাই প্রেমের অমৃতকে।

তত যৎ প্রকাশতে চৈতন্যম ॥

উৎসর্গ কবিতায় এই প্রেমচৈতন্যের প্রকাশ দেখি ছত্রে ছত্রে। চিত্রা, কল্পনা, ক্ষণিকা প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে যে প্রেমকে তিনি ইঙ্গিতে জাগাইয়াই চুপ হইয়া গেছেন, উৎসর্গে সেই প্রেমের সহিতই যেন মুখোমুখী কথাবার্তা হইতেছে। যেমন—

তোমারে পাছে সহজে বুঝি তাই কি এত লীলার ছল,
বাহিরে যবে হাসির ছটা ভিতরে থাকে আঁখির জল। [৪]

সাধারণ জৈব মন বাচ্যার্থের মধ্যেই রস খুঁজিতে চাহে। উৎসর্গ কাব্যের কয়েকটি কবিতায় প্রেমকে এমন ভঙ্গীতে প্রকাশ করা হইয়াছে, যাহা অন্তরতঃ সর্বজগদ্‌গত মহিমা-লীলার প্রকাশক হওয়া সত্ত্বেও জৈব চিত্তগত রসরুচির অন্তরায় নহে। উপরে যে দুই

পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম, একটু অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে যে, তাহাদের বাচ্যার্থের মধ্যে যে প্রেম লুকাইয়া আছে, তাহা সাধারণ চিত্তকে অতিসহজেই নাড়া দিতে পারে ; আবার বাচ্যার্থ ছাড়াইয়া যে মহিমময় প্রেমের গৌরব রবীন্দ্রকাব্যের প্রাণস্পন্দন, তাহারও ব্যঞ্জনা দান করে বলিয়া তত্ত্বরসিক ভাবুক চিত্তও গভীরভাবে পুলকিত হইয়া উঠে।

এইরূপ আর একটি উদাহরণ—

আপনারে তুমি করিবে গোপন
কী করি।
হৃদয়ে তোমার আঁখির পাতায়
থেকে থেকে পড়ে ঠিকরি।
আজ আসিয়াছ কৌতুকবেশে,
মাণিকের হার পরি এলো কেশে,
নয়নের কোণে আধো-হাসি হেসে
এসেছ হৃদয়পুলিনে।
ভুলি নে তোমার বাঁকা কটাক্ষে,
ভুলি নে চতুর নিঠুর বাক্যে,
ভুলি নে।
করপল্লবে দিলে যে আঘাত
করিব কি তাহে আঁখিজলপাত।
এমন অবোধ নহি গো।
হাসো তুমি, আমি হাসিমুখে সব
সহি গো। [৫]

আর একটি :

জ্যোৎস্নাসন্ধ্যা তারি মত আকাশ বহিয়া
এলো মোর বুকে,
কোন্ দূর প্রবাসের
লিপিখানি আছে এর
ভাষাহীন মুখে।
সে যে কোন্ উৎসুকের
মিলন কৌতুকে
এলো মোর বুকে। [২৩]

প্রকৃতির সর্বরূপে প্রেমের ইশারাই প্রকট হইতেছে। মন খুলিয়া গেলে অনন্ত সেই প্রেমনাথই দৃশ্যমান হন সর্ববর্ণে, সর্বকর্মে, সর্বচিন্তায়। এইজন্য 'শুধু একরূপে' অর্থাৎ বিশেষ কোনো আসক্তিতে অথবা দর্শনশাখার কোনো বিশেষ তত্ত্বে আবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয় না। নূতন নূতন মৃত্যুমাঝে অর্থাৎ নব নব রূপান্তরের ভিতর দিয়া সেই অনন্ত প্রেমনাথকে পূজা দিতে যাওয়াই তো জীবনসাধনা। এই সাধনাই কবি-দার্শনিকের সাধনা।

প্রেমের আলোকে
বিকশিত হব আমি ভুবনে ভুবনে
নব নব পুষ্পদলে; প্রেম-আকর্ষণে
যত গূঢ় মধু মোর অন্তরে বিলসে
উঠিবে অক্ষয় হয়ে নব নব রসে,
বাহিরে আসিবে ছুটি,—অন্তহীন প্রাণে
নিখিল জগতে তব প্রেমের আহ্বানে
নব নব জীবনের গন্ধ যাব রেখে,
নব নব বিকাশের বর্ণ যাব এঁকে।
কে চাহে সঙ্কীর্ণ অন্ধ অমরতাকূপে
এক ধরাতল মাঝে শুধু একরূপে
বাঁচিয়া থাকিতে? নব নব মৃত্যুপথে
তোমারে পূজিতে যাব জগতে জগতে। [৪৬]

সর্বজগদ্‌গত প্রেমের অন্বেষণ যখন শুধু কথার কথা নহে, ধ্যানজীবনের সর্বোচ্চ ভূমি হইতে ব্যক্তিজীবনের জৈববোধ পর্যন্ত যখন এই প্রেমপ্রভাবে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে, তখন ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতি ও শোকের ঘটনাগুলিও নবতর জীবনের আবেগ আনিয়া দেয়। অখণ্ড জীবনে বিশ্বাস যেখানে প্রবল, সেখানে জীবন ও মৃত্যু অমৃতেরই দুই রূপ। মৃত্যুর মধ্যে অমৃতদর্শনের এই বৈদিক বোধ রবীন্দ্রসাহিত্যের বহু অংশ প্রভাবিত করিয়াছে। রবীন্দ্রকাব্যসাহিত্যে দেখিতেছি, খণ্ড-দৃষ্টিতে যা মৃত্যু, প্রেম-দৃষ্টিতে তাহাই নবজীবনের নবযাত্রা; রবীন্দ্র-কল্পিত মৃত্যুর তাই মোহন রূপ, তাহা শ্যামের মত সুন্দর, তাহা অমৃতের মতই নবীনের আস্বাদন আনে।

স্মরণ

ইহা শুধু শুষ্ক তত্ত্বকথা নহে, জীবনে ইহা বাস্তবের ন্যায় সত্য, ইহা আছে বলিয়াই জীবন 'সুদূরের পিয়াসী'—নিত্যনূতন জয়যাত্রায় বাহির হইবার আনন্দে চঞ্চল। কাব্যিক বা দার্শনিক বিশ্বাসের প্রাণ হিসাবে ইহা যে শুধু গ্রহণীয় তাহা নহে, ব্যক্তিজীবনেও ইহা যে স্মরণীয় ও বরণীয়, রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ' পাঠে আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। আশ্চর্য ধৈর্যে, সংযত বাক্যে, বিশ্বকল্যাণময় অমৃতঘন আনন্দপ্রেমে 'স্মরণের' শোকমণ্ডিত শ্লোকগুলি ঝলমল করিতেছে। রবীন্দ্রনাথ অজস্র সৃষ্টি করিয়াছেন, অজস্র বসন্তের অযুত আনন্দধারা তাহার হৃদয়-উৎস হইতে প্রবাহিত হইয়া জগতকে আত্মহারা করিয়াছে। বিশ্বপ্লাবী সেই সমস্ত আনন্দধারার অমিত ঔজ্জ্বল্যে 'স্মরণ' আজ হয়তো প্রভাহীন—বুঝি বা বিস্মরণের বালুস্তূপেই মগ্নপ্রায়। শিল্পবিচার আমার প্রসঙ্গ নহে কিন্তু ক্ষুদ্র এই 'স্মরণের' মধ্য দিয়া প্রেমের যে মন্ত্র ধ্বনি আমি শুনিয়াছি, তাহা বিস্মৃত হওয়া কোনো রসিকের সাধ্য নহে। আধুনিক বস্তুপৃথিবীর বিপর্যয়সর্বস্ব চিত্তবিকৃতির সম্মুখে নির্মল প্রসন্ন এই প্রেমদীক্ষার স্বচ্ছন্দ হৃদয়প্রকাশ খুব বেশি আকর্ষণীয় বিষয় নহে, আমি জানি। কিন্তু শিল্প হইতে শিল্পীর মন ছানিয়া লইয়া তাহা বিচার করিবার প্রয়োজন যদি কাহারও হয়, তবে তিনি নিশ্চয়ই এই কথায় বিশ্বাস করিবেন যে, শিল্পীর শান্ত আনন্দগত প্রেমপ্রসন্ন মনের যথোচিত কল্যাণমহিমা উপলব্ধি করিতে হইলে এবং সর্বোপরি দার্শনিক রবীন্দ্রনাথটির প্রেমবিশ্বাসী মানসলোক পর্যালোচনা করিতে হইলে 'স্মরণ'-কাব্যের প্রতিটি পংক্তি ধীর শ্রদ্ধায় পাঠ করা কর্তব্য। পত্নীর মৃত্যুর পর কবি 'স্মরণ' রচনা করিয়াছিলেন। জীবন-সঙ্গিনীর স্বর্গারোহণে মর্ত্যজগতে কবির চিত্তে যে শোক-চাঞ্চল্য দেখিয়াছি তাহার মধ্যে এতটুকু সংশয় বা অসংযম মেলে না। এই ধরনের কাব্যে অসংযত শোকোচ্ছ্বাস, সাময়িক নাস্তিক্যভাব ও আবেগবিহ্বলতাই সাধারণে প্রত্যাশা করে। বড়াল কবির 'এষা' যে একদা বাংলাদেশে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল তাহার মর্মগত কারণই এই। কিন্তু স্মরণ-কবিতার অত্যাশ্চর্য বলিষ্ঠ প্রেম, চিত্তস্থৈর্যের প্রগাঢ় পবিত্রতা, প্রেমের অমরত্বে আনন্দময় অগাধ বিশ্বাস, ব্যক্তিপ্রেমকে বিশ্বপ্রেমের পটভূমে স্থাপিত করিবার শ্রী ও শ্রীপূর্ণ ধী ও প্রশান্তি পাঠকচিত্তকে উন্মনা করিয়া তুলে। দার্শনিক মন লইয়া বিচার করিতে গিয়া ইহাই বলিতে হয়—রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তি-রবীন্দ্রের শোকচাপল্যের তরঙ্গোচ্ছ্বাসকে সংহত ও সংযত করিয়া লইয়া কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সামগ্রী করিয়া লইয়াছেন। বলা বাহুল্য, দার্শনিকের তত্ত্বসামগ্রীর মর্মতঃ যাহা অনুকূল নহে, কবীন্দ্রের তাহা কাব্যের সামগ্রী হইতে পারে না। স্মরণের শোকব্যঞ্জিত শ্লোকগুলি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছে দার্শনিক কবির প্রেমের তত্ত্ব তাঁহার ব্যক্তিজীবনেও গভীরভাবে সত্য ও অকৃত্রিম। আধুনিক সমালোচকেরা স্মরণ-কবিতাকে শিল্পবিচারে এতদিন কোনোই মর্যাদা দেন নাই, কিন্তু মনোদর্শন রচনার ক্ষেত্রে এ কথা আজ বলিতেই হইবে যে, স্মরণ-কবিতাগুলি কবির বিশাল প্রেমবিশ্বাসের অবিনশ্বর স্মৃতিস্তম্ভ। নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলি পাঠ করুন

রজনী তাহার হয়েছে প্রভাত,
তুমি তারে আজি লয়েছ হে নাথ—
তোমারি চরণে দিলাম সঁপিয়া
কৃতজ্ঞ উপহার।

কি,

তারে যাহা কিছু দেওয়া হয় নাই,
তারে যাহা কিছু সঁপিবারে চাই,
তোমারি পূজার থালায় ধরিনু
আজি সে-প্রেমের হার। [স্মরণ-২]

কিংবা—

আমার ঘরেতে আর নাই সে-যে নাই—
যাই আর ফিরে আসি, খুঁজিয়া না পাই।
আমার ঘরেতে নাথ, এইটুকু স্থান—
সেথা হতে যা হারায় মেলে না সন্ধান।
অনন্ত তোমার গৃহ, বিশ্বময় ধাম,
হে নাথ, খুঁজিতে তারে সেথা আসিলাম।
দাঁড়ালেম তব সন্ধ্যা-গগনের তলে,
চাহিলাম তোমা-পানে নয়নের জলে।
কোনো মুখ, কোনো সুখ, আশাতৃষা কোনো
যেথা হতে হারাইতে পারে না কখনো,
সেথায় এনেছি মোর পীড়িত এ-হিয়া—
দাও তারে, দাও তারে, দাও ডুবাইয়া।
ঘরে মোর নাহি আর সে অমৃত রস,
বিশ্বমাঝে পাই সেই হারানো পরশ। [৫]

কি,

মিলন সম্পূর্ণ আজি হ'লো তোমা সনে
এ বিচ্ছেদ-বেদনার নিবিড় বন্ধনে।
এসেছো একান্ত কাছে, ছাড়ি দেশকাল
হৃদয়ে মিশায়ে গেছো ভাঙি অন্তরাল। [৮]

অথবা,

হে লক্ষ্মী, তোমার আজি নাই অন্তঃপুর।
সরস্বতীরূপ আজি ধরেছ মধুর,
দাঁড়ায়েছ সঙ্গীতের শতদল দলে।
মানসসরসী আজি তব পদতলে
নিখিলের প্রতিবিম্বে রঞ্জিছে তোমায়। [৯]

অথবা,

লজ্জার অতীত আজি মৃত্যুতে হয়েছো মহীয়সী,—
মোর হৃদি পদ্মদলে নিখিলের অগোচরে বসি
নতনেত্রে বলো তব জীবনের অসমাপ্ত কথা
ভাষাবোধহীন বাক্যে। দেহমুক্ত তব বাহুলতা
জড়াইয়া দাও মোর মর্মের মাঝারে একবার—
আমার অন্তরে রাখো তোমার অন্তিম অধিকার। [১০]

কিংবা,

মৃত্যুর নেপথ্য হতে আরবার এলে তুমি ফিরে
নূতন বধূর সাজে হৃদয়ের বিবাহ-মন্দিরে
নিঃশব্দ চরণ পাতে। ক্লান্তজীবনের যত গ্লানি
ঘুচেছে মরণস্নানে। অপরূপ নবরূপখানি
লভিয়াছ এ বিশ্বের লক্ষ্মীর অক্ষয় কৃপা হতে। [১১]

কি,

আজি এ উদাস মাঠে আকাশ বাহিয়া
তোমার নয়ন যেন ফিরিছে চাহিয়া।
তোমার সে হাসিটুকু,
সে চেয়ে-দেখার সুখ
সবারে পরশি' চলে বিদায় গাহিয়া
এই তালবন গ্রাম প্রান্তর বাহিয়া।
তোমার সে-ভালো-লাগা মোর চোখে আঁকি
আমার নয়নে তব দৃষ্টি গেছ রাখি'।
আজি আমি একা একা
দেখি দু-জনের দেখা,
তুমি করিতেছ ভোগ মোর মনে থাকি'
আমার তারায় তব মুগ্ধদৃষ্টি আঁকি। [২৭]

অলঙ্কারবিহীন নিতান্ত সহজ সরল ভাষায় উচ্ছ্বাসবিহীন যে-অখণ্ড প্রেমের আনন্দ ও বিশ্বাস 'স্মরণ'-শ্লোকে প্রকাশিত হইয়াছে, উপরিউদ্ধৃত কয়েকটি পংক্তি পাঠ করিলে আংশিক-ভাবেও কতকটা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। ব্যক্তিগত বিহ্বলতার ঊর্ধ্বে দাঁড়াইয়া রবীন্দ্র-কাব্যের ধ্রুব-সুন্দর দার্শনিক প্রেম স্মরণ-কবিতায় কী বিচিত্র মহিমায় বিরাজমান রহিয়াছে। সংসারগত জৈব বিহ্বলতার দুঃসহ শোকোচ্ছ্বাসে রবীন্দ্রপ্রেম যদি স্থূল বেদনার মধ্যে আত্মহারা হইয়া যাইত তবে তাঁহার অচল-অটল বৈরাগ্য, তাঁহার মৃত্যুসম্পর্কিত মতবাদ, তাঁহার অখণ্ড আস্তিক্যদর্শন, তাঁহার অচল অটল ধ্রুবপ্রেম—মোট কথা তাঁহার জীবনতত্ত্ব ও দর্শন অনেকক্ষেত্রে সহজ ও অকৃত্রিম বলিয়া ধারণা হইত, অথবা তাহা হইতে ঐক্যতত্ত্ব উদ্ধার করা সহজ হইত না। কবির মনোদর্শন রচনার ক্ষেত্রে 'স্মরণ' কাব্যের মূল্য তাই অপরিসীম।

তুমি মোর জীবনের মাঝে
মিশায়েছ মৃত্যুর মাধুরী।
চির-বিদায়ের আভা দিয়া
রাঙায়ে দিয়েছো মোর হিয়া,
এঁকে গেছো সব ভাবনায়
সূর্যাস্তের বরণ-চাতুরী। [১৩]

রবীন্দ্রনাথের মনটির রূপ ও রঙ এই কয় পংক্তিতে আশ্চর্যভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। জীবনটা তো নানা আসক্তির স্তূপে লিপ্ত থাকিয়া অচল। মৃত্যুর টানেই তাহা চলমান। কিন্তু মৃত্যু কি জোর করিয়া জীবনকে চলমান রাখে? প্রেম বলে, তাহা নহে। রূপ দেখাইয়া, বিস্তৃত বিশ্বগত জীবনের চিত্র দেখাইয়া জীবনকে সে ভাব হইতে ভাবান্তরে, লোক হইতে লোকান্তরে আকর্ষণ করে। জীবনকে সর্বজগদ্‌গত করিবার, বৃহৎ অনুরাগে তুচ্ছ বিষয় ত্যাগ করাইয়া উচ্চ বিষয়ে টান দিবার এই যে শক্তি, ইহাই রবীন্দ্রদর্শনে, মৃত্যুর শক্তি, রবীন্দ্রকাব্যে, 'মৃত্যুর মাধুরী'। জীবনে এই মাধুরীর যখন আস্বাদ হয়, তখন সংসারের বিচিত্র বিষয়ের অথবা প্রকৃতির বিবিধ বৈচিত্র্যের বর্ণ-সৌন্দর্যে ও রূপৈশ্বর্যে আনন্দ পাইয়াও মন চলে সুদূরের ইঙ্গিতে, বর্ণাতীত অনন্তে, রূপাতীত অলোকলোকের রূপাভিসারে। মন তখন কহে, যাহা পাইয়াছি তাহা অসত্য নহে বটে কিন্তু সুদূরের তুলনায় ইহাও বাহ্য, সুতরাং অবারিত আনন্দে, মন, আরো তোমাকে কহিতে হইবে। কহ—

এঁকে গেছো সব ভাবনায়
সূর্যাস্তের বরণ-চাতুরী।

সূর্যাস্তের বর্ণ মধ্যে, কে না জানে, আছে সপ্তবর্ণের রহস্য ইন্দ্রজাল। কিন্তু মাধুরী যে আস্বাদ করিয়াছে, 'চাতুরী' সে ফেলিয়াছে ধরিয়া। সে জানে—ইহাতে আছি বটে, কিন্তু ইহাতেই যদি একান্তভাবে চিরকাল রহিতে চাহি, তবে ঠকিতে হইবে।

ইহাতে আছি আবার ইহাতে নাই—এই কথাই তো তুমি আমাকে জানাইয়া গেলে। জীবনে আছি, জীবনকে উপেক্ষা করি না, তাই গান গাহি। জীবনে পাছে আসক্ত হইয়া, বন্দী হইয়া বাঁচিয়া মরিয়া থাকি, তাই তো, হে প্রেম, জীবনে মৃত্যুর মাধুরী রাখিয়াছ মিশাইয়া। গান গাহি, কিন্তু গাহিতে গাহিতে চলি। পথ চলি, কিন্তু চলিতে চলিতে গাহি—

তুমি মোর জীবনের মাঝে
মিশায়েছ মৃত্যুর মাধুরী,
এঁকে গেছো সব ভাবনায়
সূর্যাস্তের বরণ-চাতুরী।

এইভাবে যদি রবীন্দ্রনাথের জীবনতত্ত্বটি কাব্যের মধ্য হইতে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায়, তা' হইলে তাঁহার কাব্যগত বৈচিত্র্যের কারণটি সহজেই ধরা পড়ে, আবার সকল বৈচিত্র্যের অন্তরালে এক অখণ্ড প্রেমবোধটির অন্বেষণে যে দর্শনপ্রাণ নিত্য ব্যাকুল রহিয়াছে তাহারও স্বরূপ সঙ্গে সঙ্গে জানা হয়। প্রেম সর্বজগদ্‌গত বৈরাগ্যরূপে কবিকে কখনও স্থির রহিতে দেয় নাই, আবার সৌন্দর্যরূপে নিত্য বিভাসিত রহিয়া সর্বত্রই সত্য ও মঙ্গলের রশ্মিলেখায় অলিখিত কোনো একের মন্ত্রও যেন পড়াইতেছে। ফলে কবির নিকট প্রকৃতি রূপে রূপে বিচিত্রা ও মধুরা বটে, কিন্তু দার্শনিকের নিকট, মধুরার অন্তরে যে মধুরতম প্রেমব্রহ্ম নিত্য বিরাজমান রহিয়া নিখিল বিশ্বকে নব নব প্রকাশের পথে আনিতেছে, টানিতেছে, তাহারই মহিমা উপাসনার ও কীর্তনের বিষয় মনে হইয়াছে।

এই মহিমা বাৎসল্যের প্রসন্ন আনন্দে গুঞ্জরিত হইয়াছে 'শিশু' কাব্যে। বাৎসল্যও একপ্রকার প্রেম। দর্শনবিচারে শিশুর কবিতাগুলি একপ্রকার প্রসন্ন প্রেমের কবিতা।

শিশু

এখানে বিস্ময়কর কল্পনারাজ্যের রূপকথা লইয়া অবতরণ করিয়াছে প্রেম। সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ রবীন্দ্ররচনাবলীর তারিখ মিলাইয়া দেখিতে গিয়া 'স্মরণের' পরই 'শিশু' রচনার কারণ-রহস্য ভেদ করিবেন। তাঁহারা বলিবেন, শিশুরচনাকালে কবিকে মাতৃহীন কতকগুলি শিশু লইয়া ব্যাকুলস্নেহে নাড়াচাড়া করিতে হইয়াছিল, সদ্যমাতৃহীন সন্তানদের মায়ের অভাব পূরণ করিতে গিয়া একাধারে পিতা ও মাতা হইতে হইয়াছিল, তাহারই প্রভাবে তাঁহার কল্পনা শিশুদিগের চিত্তহরণ খেলায় এই

শিশুরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। [ড. সুকুমার রচিত বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, ৪র্থ সং, পৃ. ১৯৯ দেখুন]

বৈষ্ণব দর্শনেও প্রেমকে নানাভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, কিন্তু আসলে সেই এক প্রেম না জাগিলে কোনো ভাবের প্রেমাবেগই স্ফূর্তি পায় না। শিশু কবিতায় যে রবীন্দ্রনাথকে দেখি, আশ্চর্য তাঁহার মহিমময় স্নেহগভীর সৌম্য রূপ। সতের বৎসর পূর্বে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবোপলক্ষে কোনো সাহিত্যসভায় কবির শিশুসাহিত্য সম্পর্কে যাহা বলিয়াছিলাম, বর্তমান প্রসঙ্গে তাহা স্বচ্ছন্দে উদ্ধৃত করা চলে :

"মানুষ, বিশেষ করে কবি, যদি চিত্তসাধনার সর্বোচ্চস্তরে না উঠেন, মানুষকে প্রাণ দিয়ে অন্তর দিয়ে সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালোবাসতে না শেখেন, মানুষের প্রত্যেকটি দুঃখ, প্রত্যেকটি বাধা, প্রত্যেকটি অভাব অভিযোগ যদি না বুঝেন, তাহলে তিনি কখনও 'শিশু' বা 'শিশু ভোলানাথে'র মত কাব্য লিখতে সমর্থ হন না। বহু বৎসরের দিয়ে যাওয়া জরা, দুঃখ, দৈন্য, বার্ধক্য প্রভৃতিকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়ে সকলহারা, আত্মহারা শিশু হতে না পারলে, স্বর্গীয় দূতের মত বিশ্বের সকল শিশুদের মুখে অনন্ত সুন্দরের মুখের ছায়া না দেখলে, 'শিশু' বা 'শিশু ভোলানাথের' জন্ম কেউ দিতে পারে না। 'শিশু' ও 'শিশু ভোলানাথের' অপূর্ব দান, কাব্যজগতের অপূর্ব সৃষ্টি, তারাভরা গগনের শুভ্র-সুন্দর শুকতারা; কুসুমভরা কাননের কমল কুসুম, মানুষঘেরা ধরণীর শিশু-সুন্দর।

"পাঁচ বৎসরের শিশু সুখ, আনন্দ ও ব্যথা অনুভব করে, কিন্তু ব্যক্ত করতে পারে না—ঠিক মূক পশু পাখীদের মত। ওরা অবলা। কিন্তু তাই বলে তো অস্বীকার করা চলে না ওদের অনুভবশক্তি নেই, ওদের বোঝবার সামর্থ্য নেই। রবীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্যগুলি ওপর-ওপর বুঝলে এই সত্যটিরই সন্ধান মেলে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিশু-সাহিত্য সৃষ্টির ভেতর বিশ্বশিশুর প্রতিনিধি হয়ে শিশু হয়ে বাস করছেন। শিশুদের হয়ে তাদের মনের কথা অম্লান আনন্দে ব্যক্ত করছেন। রবীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্যে সৃষ্টির ওপরকার ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য এইটি।

"শিশুমনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি কথা রবীন্দ্রনাথের অন্তরের বীণাকে তান দিয়েছে, গান দিয়েছে, প্রাণ দিয়েছে। শিশুর তুচ্ছ বেমানান ভাবনারাশি রবীন্দ্রনাথের অন্তর সভায় পাখীর গান ধরেছে—ফুলের সৌন্দর্য ছড়িয়েছে। ...মনে হয় তাঁর শিশু সাহিত্যগুলি Psychological documents; মনে হয় তপস্যায় তিনি শিশু হয়ে অকস্মাৎ এই সাহিত্য-সৃষ্টি করে ফেলেছেন।" [Asutosh College Magazine, Vol. VIII. April 1932]

'শিশু' রবীন্দ্রপ্রতিভার বিস্ময়কর সৃষ্টিই বটে। শিশুমনের সহিত আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া কবি নবতর এক শিশুমানস সৃষ্টি করিয়াছেন। কবি বয়সে প্রবীণ, জ্ঞানে প্রবীণ, যাহা বলিতেছেন তাহাও প্রাবীণ্যের বাক্‌বৈদগ্ধ্যে প্রোজ্জ্বল, কিন্তু কাব্যের ব্যঞ্জনা হইতেছে চিরন্তন শিশুমনের অনাদি জিজ্ঞাসা, তাহার সর্বজনীন সারল্য-বিভূতির আনন্দমহিমা।

খোকা মাকে শুধায় ডেকে, 'এলেম আমি কোথা থেকে,
কোন্‌খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে।'
মা শুনে কয় হেসে কেঁদে, খোকারে তার বুকে বেঁধে,
'ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে'।

স্বর্গত চিত্তরঞ্জন দাস মহোদয় এই কবিতায় একদা রস পান নাই। তাঁহার যুক্তি ছিল এই, শিশু নাকি এ সব কথা বলিতে পারে না। কবি কবিতার মধ্য দিয়া প্রেম-জীবনের যে কথা প্রকাশ করেন, দৈনন্দিন আটপৌরে জীবনে প্রবীণ মানুষও কি তাহা বলিয়া থাকে? কবিতায় যাহা পাই, তাহা কি বস্তু-কথার নকল মাত্র? তাহা কি অন্তর্গূঢ় আনন্দবেদনার সুভাষিত স্বপ্নবাসনা নহে? ইহা কি মানিব না যে, কথা নহে, কথার ব্যঞ্জনাই কবিতার কথা? শিশু এমন কথা, এসব কথা, বলিতে পারে না জানি, কিন্তু তাই বলিয়া ইহা অকাব্য নহে। শিশুর কথা লইয়া ইহা সুন্দর কবিতা-কথা—এ কথার উপমা কোনো বস্তু-কথা নহে, এ কথার উপমা এই কথাই!

আবার ধরুন—

যদি খোকা না হয়ে
আমি হতেম কুকুর ছানা—
তবে পাছে তোমার পাতে
আমি মুখ দিতে যাই ভাতে,
তুমি করতে আমায় মানা?

সত্যি করে বল্,
আমায় করিসনে মা ছল—
বলতে আমায় দূর দূর দূর।
কোথা থেকে এল এই কুকুর?
যা মা, তবে যা মা,
আমায় কোলের থেকে নামা,
আমি খাব না তোর হাতে,
আমি খাব না তোর পাতে।

শিশু হয়তো মুখে এ সব কথা এমন করিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া বলিতে জানে না। কিন্তু তাহার খেলায়, তাহার লীলায়, তাহার পশুপাখীদের সহিত গলাগলি-ভাবের স্বর্গ-সুন্দর ব্যবহারে, তাহার ভেদবুদ্ধিবিহীন অসামাজিক আনন্দচাঞ্চল্যে এই কথাগুলিই কি ধ্বনিত হইয়া উঠে না? শিশু মুখে না বলিয়া কাজে যাহা প্রকাশ করে, তাহারই মধুর তাৎপর্যটি কি এই কথার মন্ত্রধ্বনিতে ফুটিয়া উঠিতেছে না?

'শিশু' শিশুদেরই পাঠ্য, এইরূপ ধারণা লইয়া যাঁহারা 'শিশু' আলোচনা করিবেন, কবির প্রতি দাস মহাশয়ের মত তাঁহারাই অবিচার করিবেন। 'শিশু' সকলের পাঠ্য অমর প্রেমকাব্য, শিশুপ্রেমের অবারিত লীলার আনন্দোচ্ছ্বাসে স্নেহোচ্ছল। শিশুর কল্পনা, শিশুর বিস্ময়, শিশুর খেলাধূলা, শিশুর গল্প শুনার প্রবৃত্তি, শিশুর 'বাবার মত বড় হওয়ার' সখ—এই সমস্ত বিষয়বস্তু লইয়া শিশু-কাব্যের খণ্ড কবিতাগুলি রচিত হইয়াছে। সকল খণ্ডেই কুসুমে মধুপান-রত মধুপের মত লেখক রবীন্দ্র-মনমধুর সন্ধান পাইয়া অনস্থভূত প্রেম-বেদনার আনন্দে অভিভূত হইয়া উঠিয়াছেন।

আমি যদি দুষ্টামি ক'রে
চাঁপার গাছে চাঁপা হয়ে ফুটি,
ভোরের বেলা মাগো, ডালের 'পরে
কচি পাতায় করি লুটোপুটি,
তবে তুমি আমার কাছে হারো,
তখন কি মা চিনতে আমায় পারো।
তুমি ডাকো, 'খোকা, কোথায় ওরে।'
আমি শুধু হাসি চুপটি ক'রে॥

ব্রজরাখালের বাল্যলীলা বর্ণনাপ্রসঙ্গে বৈষ্ণব কবিবৃন্দও শিশুচিত্তের এই লুকোচুরি খেলার গোপন বাসনাটি এমন সরস ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। অলঙ্কার-শাস্ত্রবিদ্‌গণ অবশ্যই স্বীকার করিবেন, শিশুরা এমনতর কথা বলিতে পারে কি না পারে, কাব্যবিচারে ইহা বড় প্রশ্ন নয়; শিশুমনের এই সরল দুষ্টামির চিরন্তন ইচ্ছা বা বাসনাটাই এই কবিতার কাব্যত্ব; কাব্য বিচারে এই 'কাব্যত্ব' বা রসের ধ্বনিই আসল। আবার রূপধর্মী বৈদিক দার্শনিকগণও স্বীকার কবিবেন যে, এই ধ্বনির অন্তরালে নৈর্ব্যক্তিকভাবে যে প্রেম, লীলার অন্তরালে লীলাময়ের মত, প্রসন্ন উদার হাসি হাসিতেছেন, তাঁহার বিমল মানসলোকের স্বর্গসুন্দর কান্ত জ্যোতি যদি এই কবিতার হীরকখণ্ডে ঠিকরিয়া থাকে, তবে তাহাও উপেক্ষণীয় বিষয় হইবে না।

শিশুকবিতাগুলির মধ্যেও রবীন্দ্রপ্রেমের আনন্দপ্রকাশ বিদ্যমান, ইহাই আমার প্রতিপাদ্য। শিশু যেখানে কথা কহিতেছে সেখানে অপ্রত্যক্ষভাবে, এবং শিশুকে যখন কবি আশীর্বাদ করিতেছেন তখন প্রত্যক্ষভাবে, তাঁহার প্রেমমানস আনন্দরঙ্গে অজস্র লীলা-বিলাসে মাতিয়াছে।

যেমন—

আমি বলি, দাঁড়া খবরদার!
এক পা কাছে আসিস্ যদি আর—

এই চেয়ে দেখ্, আমার তলোয়ার,
টুকরো ক'রে দেব তোদের সেরে।'
শুনে তারা লম্ফ দিয়ে উঠে
চেঁচিয়ে উঠল 'হাঁরে রে রে রে রে'।
তুমি বললে, 'যাসনে খোকা ওরে',
আমি বলি 'দেখো না চুপ করে'।

এখানে কবির প্রেম মানসলীলা করিতেছে অপ্রত্যক্ষভাবে। প্রেম শিশুর বীরত্ব-বাণী ও কল্প-কাহিনীর শিরায় শিরায় সঞ্চারিত রহিয়া স্নিগ্ধ সজল একটি আনন্দরসের কারুণ্য ফুটাইতেছে।

আবার—

পাষাণের বাধা ঠেলেঠুলে নদী আপনার মনে সিধে সে
কলগান গেয়ে দুইতীর বেয়ে যায় চলে দেশ বিদেশে।
যার কোল হতে ঝরণার স্রোতে এসেছে আদরে গলিয়া,
তারে ছেড়ে দূরে যায় দিনে দিনে অজানা সাগরে চলিয়া।
অচল শিখর ছোটো নদীটিরে চিরদিন রাখে স্মরণে,
যত দূরে যায় স্নেহধারা তা'র সাথে যায় দ্রুত চরণে।
তেমনি তুমিও থাকো নাই থাকো মনে করো মনে করো না,
পিছে পিছে তব চলিবে ঝরিয়া আমার আশিস্-ঝরণা।

এখানে প্রত্যক্ষ হইয়াছে কবির প্রেম, শিশুদের সহিত খেলা শেষ করিয়া এইবার যেন প্রেমপুরুষ আপন স্নিগ্ধ জ্যোতির্ময়তায় আবির্ভূত হইয়াছেন। 'জগৎ পারাবারের তীরে' যে সমস্ত শিশুরা খেলা করিতেছে, তাহাদের কাব্যগানের সহজতত্ত্বটুকু এই : শিশুতে শিশু হইয়া খেলা করা যেমন শিল্পগত সত্য, দূর হইতে শিশুদের খেলা দেখিয়া আনন্দ অনুভব বা আশীর্বাদ করা তেমনি দর্শনগত সত্য। লীলাসত্য এবং নিত্যসত্যের মত প্রেমের এই দুই রূপই বাস্তব জীবনগত তত্ত্বসত্য, এই দিক দিয়া বিচার করিলে 'শিশুকে' শুধু শিশুপাঠ্য কাব্য-কাকলি বলিয়াই মনে হইবে না, পরন্তু ইহার মধ্যে সর্বজগদ্গত বিচিত্রপ্রেমের শিশুবৎসল সুন্দর রূপের প্রতিচ্ছবি দেখিয়া গভীরতর আনন্দ অনুভূত হইবে।

রবীন্দ্র কাব্যাবলীর যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা অত্যন্ত দ্রুতবেগে আমি করিয়া চলিয়াছি, পণ্ডিত পাঠক অবশ্যই লক্ষ্য করিতেছেন যে, তাহার উদ্দেশ্য শিল্পবিচার বা রসবিচার নহে, তাহার মূল উদ্দেশ্য হইতেছে—রবীন্দ্রপ্রেমের ক্রমবিকাশের স্তরগুলি একটির পর একটি করিয়া দেখাইয়া দেওয়া। মধ্যে মধ্যে আলোচনা প্রসঙ্গে শিল্পবিচার আসিয়া

পড়িতেছে, কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, রবীন্দ্রমানসের তত্ত্বটুকু সুষ্ঠু ও সরল করিবার উদ্দেশ্যে যতটুকু রসব্যাখ্যার প্রয়োজন ততটুকুতেই আমি হাত দিয়াছি। বলা বাহুল্য, আমার অধিকার ও প্রতিপাদ্য সম্পর্কে আমি সচেতন আছি। আমার বক্তব্য মাত্র এইটুকু যে, রবীন্দ্রদর্শনে যে প্রেমের মন্ত্রমহিমা ব্যাখ্যাত হইয়াছে, যে প্রেম মানুষের অহংকার-বৃন্তটির আশ্রয়ে প্রমুদিত হইয়া দেবতার আত্মায় 'উন্মুক্ত' হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে, ব্রহ্মকে প্রেমস্বরূপ কল্পনা করিয়া সর্বজগদ্‌গত যে প্রেমের তত্ত্ব বিশ্লেষিত হইয়াছে—রবীন্দ্রনাথের কাব্যাবলীর হৃদয়বস্তুও সেই এক অদ্বিতীয় বিশ্বপ্রকৃতিগত প্রেম। দর্শন ও ধর্মতত্ত্বে তিনি যাহা বলিয়াছেন, কাব্যসৌন্দর্যে তিনি যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রকাব্যাবলীর দ্রুত আলোচনা করিয়া যাইতেছি। তাহা প্রমাণিত হইলে কবি ও দার্শনিকের অভিন্নত্ব ও একাত্মতাই যে শুধু লক্ষিত হইবে তাহা নহে, দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে ভ্রান্ত ধারণা দেশে বিদেশে বহু মনীষীর মধ্যেও বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা অপনোদিত হইবে। রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র সৃষ্টির মূলে যে একটি "অনন্ত তাৎপর্য"—একটি শিবসুন্দর ঐক্যতত্ত্ব আছে, তাহা সহজভাবেই বোধের মধ্যে আসিয়া পৌঁছাইবে, এবং সর্বোপরি কবি রবীন্দ্রনাথকে স্পষ্টভাবে উপলব্ধির জন্য দার্শনিক রবীন্দ্রনাথকে যে জানার ও মানার প্রয়োজন তাহা সম্যক্‌ভাবে হৃদয়ঙ্গম হইবে। আলোচ্য অধ্যায়ে তাই রবীন্দ্রকাব্যাবলীর পর্যালোচনা করিয়া দেখাইতেছি যে, কবির সমস্ত কাব্যেই ফল্গুধারার মত এই প্রেমমানস প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, এই প্রেম সহজস্বভাবের এক অহংকামনা হইতে জাগিয়াছে, সাধনস্বভাবের আত্মায় এইবার গিয়া মিশিবে। লক্ষণীয় বিষয় এই, রবীন্দ্রনাথ আপন আবেগে কাব্য লিখিয়া গেছেন বটে, কিন্তু ধাপে ধাপে, স্তরে স্তরে তাঁহার প্রেমবোধ ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া, কী অনন্ত আনন্দেই না আত্মলোকের অসীমে অগ্রসর হইয়াছে। একটির পর একটি রবীন্দ্রকাব্য লইয়া ধীরভাবে যখন অধ্যয়ন করিয়াছি, যেন রবীন্দ্রপ্রেমের ওই ক্রমশঃপ্রকাশ্য ভাবমহিমার সহজ অথচ সাধনগতি আমাকে অপার্থিব বিস্ময়ানন্দে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। যাঁহারা বলেন, রবীন্দ্রকাব্যে কোনো ঐক্যতত্ত্ব নাই, তাঁহারা রবীন্দ্রজীবন ও দর্শনের প্রেমতত্ত্বের সন্ধান না রাখিয়াই খণ্ড খণ্ড ভাবে বোধহয় রবীন্দ্রকাব্য পাঠ করিয়া থাকিবেন। অখণ্ড এই প্রেমতত্ত্বের আনন্দ রবীন্দ্রনাথ বাস্তবজীবন হইতেই নানা দ্বন্দ্বে, নানা দুঃখে, নানা শোকে ও নানা নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া অনুভব করিয়াছেন; বারে বারে তিনি এই বলিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহার অন্তরস্থিত সমস্ত অনৈক্য, সকল দ্বন্দ্ব-সংশয় কে যেন এক সূত্রে গ্রথিত করিয়া জীবনটিকে নানা ফুলের একটি মালার মত মহিমময় শোভন করিয়া তুলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই অনির্দিষ্ট 'কে'-টিকে, গ্রন্থের সূচনাতেই উল্লেখ করিয়াছি, জীবনদেবতা, অন্তর্যামী, ওস্তাদজী প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই জীবনদেবতাই যে সকল অনৈক্যের বা বৈচিত্র্যের অন্তর্নিহিত এক প্রেমতত্ত্ব, সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নাই।

অহং-এর পার হইতে আত্মার পরপারে জীবনতরণী ভাসিয়া চলিয়াছে, তীরে তীরে, বহুতীরে, যত আলো, যত অন্ধকার, যত রূপ, যত রূপাভাস দেখা গিয়াছে—রবীন্দ্রকাব্য-মানসের স্বচ্ছ দর্পণে ততগুলিরই ছায়া পড়িয়াছে, ইহাই রবীন্দ্রকাব্যের বৈচিত্র্যের কায়াতত্ত্ব। শিল্পবিচারই যাঁহাদের প্রসঙ্গ তাঁহারা এই বৈচিত্র্যের রূপরসবর্ণ লইয়া তৃপ্ত রহিবেন। কিন্তু মহৎ শিল্প হইতে মহৎ জীবনের ও মানসলোকের আলেখ্য রচনায় যাঁহারা যত্নবান, তাঁহারাই অবশ্য জানিবেন যে, বিচিত্র এই কবিত্বের অন্তরালে জীবন-জ্যোতিরূপে প্রেম অধিষ্ঠিত রহিয়া কবিকে ধ্যান দিয়াছে, গান দিয়াছে, প্রাণ দিয়াছে অবারিত আনন্দে।

আমি সেই প্রেমের তত্ত্বই অন্বেষণ করিতেছি।

'জগৎ পারাবারের তীর'স্থ শিশুরাজ্যের আনন্দ সন্দর্শন করিয়া রবীন্দ্রপ্রেম এইবার খেয়াঘাটে তরী ভিড়াইল। ওপারে যাইতে হইবে—ও পারের আলো দেখা যাইতেছে।

খেয়া

বুঝি দেরি নাই, আসে বুঝি আসে,
আলোকের আভা লেগেছে আকাশে,
বেলা শেষে মোরে কে সাজাবে ওরে
নব মিলনের সাজে ?
সারা হল কাজ মিছে কেন আজ
ডাক মোরে আর কাজে। [গোধূলিলগ্ন]

আর আমাকে সাধারণ সংসারের কাজে ডাকিয়ো না। আমি 'নব মিলনের সাজে' সজ্জিত হইয়া নবজীবনের বাসর ঘরে এইবার চলিব। এতদিন যাহার জন্য অশ্রু ঢালিয়াছি, সে আসিবে; আমি তাহাকে ছাড়া আর কাহাকেও জানিব না। ওই যে 'আলোকে পুলকে' সে ঢলঢল রূপে বিকশিয়া উঠিতেছে—

একটি মাত্র শ্বেত শতদল
আলোকে পুলকে করে ঢল ঢল,
কখন ফুটিল বল্ মোরে বল্
এমন সাজে
আমার অতল অশ্রুসাগর-
সলিল মাঝে। [প্রভাত]

অশ্রু-সাগরে শতদল ফুটিল, দেখিতেছি। সাগরে কি শতদল ফোটে? কিন্তু কী বিচিত্র, লোকজ্ঞানের অতীতে অবিশ্বাস্য এই ব্যাপারও যে সংঘটিত হইল! কী বিচিত্র পুলকে আজ অশ্রু গড়াইতেছে নয়ন হইতে, কে জানিত, অশ্রুর অন্তরে আছে এত আনন্দধারা! অশ্রু হইতে আনন্দ, সাগর হইতে শতদল—কে বলিল অবিশ্বাস্য এবং ধারণাতীত ব্যাপার মাত্র? আমি যে দেখিতেছি আমারি অতল অশ্রু-সাগরের সলিলোপরি আনন্দের শ্বেত-শতদল উঠিল ফুটিয়া। কখন ফুটিল জানি না, কেমন করিয়া ফুটিল বলিতে পারি না, কিন্তু ফুটিল, সৌরভ ছুটিল, এইটুকু মাত্র বলিতে পারি।

'খেয়া'র সুরে ধ্যানমগ্ন প্রশান্তির আনন্দ। প্রাপ্তির বিহ্বলতা আছে খেয়ার ছন্দে, একের প্রতি সুগভীর বিশ্বাসটি ঘনীভূত হইতেছে প্রসন্ন প্রেমাবেগে। খেয়া বুঝিতে হইলে এই বিশ্বাসটির প্রতি লক্ষ্য রাখা চাই। নায়ক নায়িকার ভালবাসার পটভূমে যে প্রেমবাণী খেয়ার মধ্যে গুঞ্জরিত হইয়াছে, এই বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতেই তাহার তাৎপর্য গ্রহণ করিতে হইবে। খেয়ার প্রেম অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং প্রচ্ছন্ন, গভীর ও অন্তর্গূঢ়। এইজন্যই বোধহয় খেয়ার কবিতা সম্বন্ধে আধুনিক সমালোচকদের ঔদাসীন্য অত্যন্ত প্রবল, বস্তুতান্ত্রিক অহং বোধে খেয়ার প্রেম কোনো মোহই বিস্তার করিতে পারে না। খেয়ার প্রেম এ-যুগের জন্য নহে, কিন্তু কাল অনন্ত, পৃথ্বীও বিপুলা, তাই আশা হয়—অনাগত কোনো এক যুগে সহৃদয় কোনোও তত্ত্বরসিক আসিয়া খেয়ার বিপুলতা বিশ্লেষণ করিবেন।

কবি বলিতেছেন, অকস্মাৎ এক অপ্রত্যাশিত আনন্দ বেদনায় বিদ্যুৎ-শিহরণ খেলিয়া গেল দেহে; কারণ বুঝিলাম না, অনুমানে এইটুকু মাত্র মাত্র বুঝিলাম, হয়তো বা সে আসিল—একেবারে ঘরের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল!

আর আমি থাকিব কেমন করিয়া? একবার যখন তাহার রূপ দেখিয়াছি, মহিমায় ডুবিয়াছি, পৃথিবীর আর কী লইয়া আমি থাকিব? আমার যাহা কিছু আছে, সর্বস্ব দিয়া, কাঙালিনী আমাকে হইতেই হইবে। বৈষ্ণবী রাধার মত তাহারই নাম জপিয়া, কথা চিন্তিয়া, চিত্র আঁকিয়া, গান গাহিয়া বৈরাগিণীর মতই চলিতে হইবে জীবনের পথে।

ওগো মা,

রাজার দুলাল গেল চলি মোর
ঘরের সমুখপথে,
প্রভাতের আলো ঝলিল তাহার
স্বর্ণশিখর রথে।
ঘোমটা খসায়ে বাতায়ন থেকে
নিমেষের লাগি নিয়েছি মা দেখে,

ছিঁড়ি মণিহার ফেলেছি তাহার
পথের ধুলার 'পরে।
মা গো, কী হল তোমার, অবাক নয়নে
চাহিস কিসের তরে। [শুভক্ষণ]

'নিমেষের লাগি', অর্থাৎ 'আধক আধ আধ দিঠি অঞ্চলে', একবার তাহাকে দেখিয়াছি কি না দেখিয়াছি, কী জানি কেমন যেন হইয়া গেলাম। কি করিলাম তখন? কি করিলাম, কবি সহজ করিয়া বলিয়া দিলেন না। আত্মহারা হইলাম? মন দিয়া বসিলাম? আত্ম-সমর্পণ করিলাম?

কবি গাওয়াইলেন—

ছিঁড়ি মণিহার ফেলেছি তাহার
পথের ধুলার 'পরে।

তাহাকে যখন দেখিয়াছি, তখন এই বোধ যদি না জাগিল যে সংসারে মণিরত্ন সবই তুচ্ছ, তবে তাহাকে দেখার মহিমা কী-ই বা বুঝিলাম?

কিংবা,

তাহার রথ চলিবে ধুলার উপর দিয়া, তাহা কি সহ্য করিতে পারি? মণিহারের ঔজ্জ্বল্য বিছাইয়া তাহার পথটি এতটুকু সুন্দর করিয়া কি দিব না?

কি,

ধুলিমলিন অপথে-বিপথে কত কে তাহাকে টান দিয়াছে, এইবার যে পথ দিয়া আমার দ্বারপ্রান্তে সে আসিল, একবার না-হয় সে-পথ মণিরাগে রঞ্জিত করিয়া রাখিলাম।

কি,

যা কিছু আমার আছে, আমার অহংকার, আমার অলংকার, আমার সর্বস্ব—যাক, যাক, কিছুই আর চাহি না, তাহাকে দেখার পর এ সবের আর প্রয়োজন নাই। ইহার পর যদি চোখে জাগে আন্‌জগতের আলো, যদি কেহ মনে করে, কিছু বুঝি আমি পাইয়াছি, আমি পাই নাই বলিয়া কি কাঁদিতে বসিব?

মোর হার-ছেঁড়া মণি নেয়নি কুড়ায়ে,
রথের চাকায় গেছে সে গুঁড়ায়ে
চাকার চিহ্ন ঘরের সমুখে
পড়ে আছে শুধু আঁকা।

তাহাকে দেখিয়াছি, 'বক্ষের মণি না ফেলিয়া দিয়া' থাকিতে পারি নাই—ইহাই কি আমার পরম লাভ নহে? আজও তাহাকে সম্পূর্ণ অধিকারের মধ্যে আনিতে পারি নাই, কিন্তু সে যে আসিয়াছিল, তাহাকে দেখিয়াই মণিহার যে দিয়াছি ফেলিয়া— ইহাই কি

জীবনের পরম 'শুভক্ষণ' নহে? কী দিলাম, কাহাকে দিলাম, কেন দিলাম সবই সবার অগোচরে রহিয়া গেল, কিন্তু প্রত্যক্ষগোচর কি হয় নাই এই 'চাকার চিহ্ন?'

অবাক-নয়নে আমার মুখের পানে তুমি চাহিয়া আছ। আমার মুখে কি অরূপলোকের আলো পড়িয়াছে? আমি তো কিছুই পাই নাই, শুধু দিয়াছি, যাহা দিয়াছি তাহাও গৃহীত হয় নাই, তবু এ কী পুলক-প্রবাহ আমার সারা অঙ্গে? এ কী আলো চক্ষে বক্ষে?

খেয়ার কবিতা এইভাবেই বোধহয় ব্যাখ্যা করা সঙ্গত। অত্যন্ত স্পষ্ট করিতে গেলে কবিতা মারা পড়ে, দর্শনের মূল কথাটুকু মর্মমূলে মধুর রূপে করে না প্রবেশ। খেয়ার অধিকাংশ কবিতা গভীর অন্তর্লীন অন্তরের স্বপ্নময় ভাষায় লিখিত প্রেমের কবিতা। পার্থিব চাওয়া-পাওয়া কিংবা মান-অভিমানের বঞ্চনায় এগুলির অর্থোদ্ধার করা সঙ্গত হইবে না। খেয়ার প্রেম মানুষের প্রেম হইতে অগ্রসর হইয়া মিলিত হইতেছে মানুষেরই দেবত্ব-বোধের অতীন্দ্রিয় কোনো রাগরঞ্জনের ভাবমহিমায়। যাহাকে ভালোবাসি, মানুষ হইয়াও সে আর মানুষ নহে, অতীন্দ্রিয় প্রেম-গরিমার মূর্তিমান সে যেন দেববিগ্রহ। প্রিয় শুধু নহে, সে দেবতা, সর্বানুভূ প্রেমে সে পরমমানব। আবার ভালোবাসিতে শুরু করিয়াছি বলিয়া আমিও যেন আর মানুষ নহি, অলোকলোকসঞ্জাত হৃদয়রহস্যের আমি যেন একখানি ধ্যানের আনন্দ। এই আমির কোনো বাঁধন নাই, পার্থিব কোনো সজ্জা নাই, লজ্জা নাই হৃদয়ের কোনো অংশে। তাহাকে পাইতেছি, এইজন্য পরম আনন্দ, আবার ঠিক পাইতেছি না, এই কারণে আছিও অশান্তিতে—আমির জীবন বহে অপ্রতিহত গতিবেগে। রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাবটিকেই আমি বৈদান্তিক 'মন' ও 'বিজ্ঞানের' মধ্যবর্তী মানস বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি।

'দান' কবিতাটি স্মরণ করুন।

'সন্ধ্যাবেলায় যে মালাটি গলায়' পরিয়াছিলে, ভাবিয়াছিলাম তাহা চাহিয়া লইব। কিন্তু সাহস হইল না চাহিবার।

'সকালবেলায়' হয়তো 'ছিন্নমালা শয্যাতলে' পড়িয়াও থাকিতে পারে এই ভাবিয়া ভোরেই আসিয়াছিলাম 'কাঙালের' মত।

কিন্তু মালা কি পাইয়াছি? যাহাকে পাইয়াছি তাহাকে কী নামে অভিহিত করিব?

নয় এ মালা, নয় এ থালা,
গন্ধজলের ঝারি,
এ যে ভীষণ তরবারি।

এর একদিকে বিপুলতম আনন্দ, অপরদিকে আবার অশান্তি, কী দান আমাকে দিয়া গেছ? এ সহ্য করিবার মত শক্তি আমার কোথা?

শক্তিহীনা মরি লাজে,
এ ভূষণ কি আমায় সাজে।

ভিখারিণীকে এ কী অতুল ঐশ্বর্য তুমি দিয়া গেছ? যখন দিয়াই গেছ তখন অন্য কোনো ভূষণে আর কেন আমাকে সজ্জিত হইতে হইবে? অনন্ত মরণের দহনে অগ্নিময়ী আমি উজ্জ্বলা, তুমি আস বা না আস, নূতন সজ্জা আর আমি করিব না।

তোমার লাগি অঙ্গ ভরি করব না আর সাজ,
নাই-বা তুমি ফিরে এলে ওগো হৃদয়রাজ।

সাজ করি কখন? পৃথিবীর মণিরত্নে মন থাকে কখন? তোমার দান, তোমার ভূষণ যতক্ষণ না পাইয়াছি। তোমার দানের দহনে দীপ্তিময়ী আমি সাজ ফেলিয়া, লাজ ফেলিয়া, সকল বাঁধন ক্ষয় করিয়া হইয়া উঠিব, মরণকে দোসর করিয়া তাহাকে বরণ করিব—

আমি তারে বরণ করে রাখব পরাণময়।
তোমার তরবারি আমার করবে বাঁধনক্ষয়।

'দান' কবিতাটিতে মরণের কথা আসিয়া পড়িয়াছে। রবীন্দ্রকাব্যে মরণের যে একটা বিশেষ অর্থ আছে তাহা আমি ইতিপূর্বে ব্যাখ্যা করিয়াছি। প্রেম রাখিয়া গেল মরণকে আমার দোসর করিয়া, আমিও তাহাকে বিনা দ্বিধায় বরণ করিয়া লইলাম—'মরণ' কথাটির রাবীন্দ্রিক অর্থ জানা না থাকিলে এই সকল কথার ধ্বনি উপলব্ধি করা সহজ হয় না। প্রেম কাহাকে মানুষের দোসর করিয়া দিতে পারে? মরণকেই তো? মরণের চেয়ে বড় জাগরণ জীবনের আর কী আছে? প্রেমের পরমমিত্র মরণ জীবনের যখনই দোসর হয়, জীবনের মায়ানিদ্রা তখনই যায় ভাঙিয়া। সে জাগিয়া উঠে, জীবনজয়ে লাগিয়া যায়। তখন আর আরাম নহে, বিলাস নহে, অল্পে তুষ্টি নহে—পরন্তু যৌবনগতিচাঞ্চল্যে নিত্য নব কর্মে, সংগ্রামে, আঘাতে, সংঘাতে অগ্রসর হওয়াই তখন একমাত্র সত্য। মরণের অমৃত স্পর্শে মৃত্যুহীন যে জীবন, 'অলৌকিক আনন্দের ভার' তাহার জন্য বটে, কিন্তু তাহার বক্ষে বেদনাও অপার হইয়া দেয় দর্শন।

প্রেমের দান পাইয়াছি, আনন্দে ডগমগ হইয়াছে অন্তর, তাই গন্ধজলের ঝারি; কিন্তু দান পাইয়াছি মরণ-দান, স্থির হইয়া আরাম পাইবার সময় কোথায়? 'এ যে ভীষণ তরবারি'।

না বলিলেও হয়তো চলে, প্রেমের অন্তর্গূঢ় আনন্দ-অশান্তিই এই কবিতার রসের ধ্বনি।

প্রেমের দানে আনন্দ তো আছেই, নহিলে চাহিব কেন? পাগল হইব কেন? চাহিব, চাহিব, অনন্তকাল ধরিয়া চাহিব। কিন্তু সর্বজগদ্‌গত রাজাধিরাজ সেই প্রেমকে একেবারে আপনার করিয়া আত্মস্থ করিয়া কি লইতে পারি? পারি না, তাই তো কাঁদিব। কাঁদিব, কাঁদিব, তাঁহাকে পাইবার জন্য অহরহঃ কাঁদিব, কিন্তু মনে কি তৃপ্তির আনন্দটুকু থাকিবে না যে, তাঁহার জন্যই আমার ব্যাকুলতা, তাঁহার জন্যই আমি কাঁদিতেছি?

কাঁদিতে কাঁদিতে অশ্রুসাগর-সলিলে যখন সেই আমার নয়নানন্দ আনন্দ শতদল ফুটিয়া উঠিবে, তখন সংসারের আর অন্য কিছুতেই কি চোখ ফিরাইতে পারিব? অন্য কিছুতে চোখ বা মন ফিরাইতে পারিব না, তাইতো তুচ্ছতার যত বন্ধন আছে, ক্রমশঃ ক্ষয় হইতে থাকিবে—আমিও প্রেমানন্দের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিব। পরিপূর্ণভাবে তাহাকে কিছুতেই পাইব না, কিন্তু যত পাইব না, ততই আমার ব্যাকুলতা বাড়িবে, জেদ বাড়িবে, আবেগ উথলিয়া উঠিবে—তাই কিছুতেই আমি থামিতে চাহিব না।

রবীন্দ্রনাথ বলিবেন, এই থামিতে না-চাওয়ার বেগই মৃত্যুর বেগ। মৃত্যু মানুষকে ঠেলা দিয়া দিয়া আগাইয়া লইয়া চলিয়াছে, ভক্ত গোপিনীদের যেমন প্রেমের টানে আগাইয়া লয় শ্যামসুন্দর, শ্যাম-সমান মৃত্যুও মানুষকে তেমনি আগাইয়া লয়, জাগাইয়া লয়। প্রেম যাহার জাগিয়াছে, মৃত্যু তাইতো তাহার দোসর। মৃত্যু নাই এমন যে প্রেম, তাহা তো জড় প্রেমমাত্র। তাহার গতি কোথায়, বিস্তৃতি কোথায়? শোকের বেশে, ব্যথার বেশে, দুঃখের বেশে আসিবে প্রেম, চিনিয়া লইব তাহাকে, তবেই জীবন-পরীক্ষায় হইবে জয়।

দুখের বেশে এসেছ বলে
তোমারে নাহি ডরিব হে।
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা
নিবিড় করি ধরিব হে। [দুঃখমূর্তি]

দুঃখ শোক ক্ষয় ক্ষতি বিচ্ছেদ ইহারাই তো একপ্রকার মৃত্যু। প্রেমের সাধনায় এই মৃত্যুই তো বন্ধুর মত আত্মাকে অন্ধকার পথে আলো দেখাইয়া করে আকর্ষণ, প্রেমকে একমাত্র সত্য বলিয়া জানিলে হৃদয়ের নিকট এই মৃত্যুর মহিমাই তো কেবল প্রকট হইবে, কারণ, তখন এই মৃত্যু তো আত্মাকে বসিয়া থাকিতে দিবে না।—সংসারের সকল বিষয়, সকল বস্তু, হৃদয়ের সকল আবেগ, প্রকৃতির সকল চিত্র—সমস্তের মধ্যেই সেই পরমপ্রেমকে আকর্ষণ করাইবে। পরমপ্রেমকে অন্বেষণ করার জন্য যে গতি তাহা পরম গতি। এই গতির স্বপক্ষে রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই সায় দিবেন, এই গতির স্বপক্ষে গান ধরিবেন।

কিন্তু গতি থামাইয়া তিনি কি 'স্থির প্রেমের' কথা কহেন নাই? প্রেমকে তিনি কি স্থিতি বলেন নাই?

বলিয়াছেন। কোথায় তিনি গতির কথা বলিয়াছেন, আবার কোন স্থলে কী ভাবিয়া থামিয়া যাওয়ার কথা বলিয়াছেন, স্পষ্ট করিয়া একবার বুঝিয়া লই।

প্রেমবিহীন শক্তির প্রমত্ততায় যখন উদ্যম দেখাই, অন্তহীন তামসগতিবেগে যখন জীবনকে ছুটাই দক্ষিণে বামে, প্রেমকে তখন পাওয়া যাইবে না।

সাংসারিকতার একপ্রকার গতি আছে, সেই গতির আবেগে আচ্ছন্ন আমাদের বস্তুজগৎ। নানা লোভ, নানা বন্ধন, নানা জিগীষা এই গতিধর্মে। এই ধর্ম যখন

মানুষকে পাইয়া বসে, মানুষকে তখন তিনি নিরুদ্যমের বাণী শুনান, বলেন, থামো, প্রেমের বিশ্রামে মন দাও। 'শক্তিতে আমাদের গতি, প্রেমে আমাদের স্থিতি। শক্তি আপনাকে বিক্ষিপ্ত করিতে থাকে, সে চঞ্চল; প্রেম আপনাকে সংযত করিয়া আনে, সে স্থির।' [দিন ও রাত্রি, ধর্ম]

যখন আমি থেমে গেলাম, তুমি
আপনি এলে কবে। [নিরুদ্যম]

অহং-এর প্রমত্ততা যখন থামিল, আসিল প্রেম। 'স্থির' প্রেম, 'ধ্রুব' প্রেম, কিন্তু গতি কি তখন থামিয়া গেল? না ভিন্ন একপ্রকার গতির হইল শুরু। সে গতি অহং-প্রমত্ত বৈষয়িকতার শক্তি-বিক্ষেপের গতি নহে, সে গতি পরমকে পাইবার জন্য আত্মব্যাকুলতার আনন্দ-গতি।

তোমরা আজি ছুটেছ যার পাছে
সে সব মিছে হয়েছে মোর কাছে। [বিদায়]

এই পংক্তিদ্বয়ের ব্যাখ্যা এইবার না করিলেও বোধহয় চলে। সাংসারিকতার অগ্রগতি জীবনস্থিতির গতি নহে, উহা অন্ধ গতি, সুতরাং উহাতে আমার মন নাই, আমি থামিয়াছি। তোমরাও পারো থামিয়া যাও—এই ইঙ্গিতার্থ কি পংক্তিদ্বয়ে গুঞ্জরিত হইতেছে?

রবীন্দ্রনাথ থামিতে বলিয়াছেন আবার চলিতে বলিয়াছেন। কিন্তু ইহা পরস্পর-বিরোধী কথা নহে, কোনো 'মিষ্টিক্' ব্যঞ্জনাও ইহার মধ্যে নাই। ইহার সহজ ও স্পষ্ট ব্যাখ্যা হইতেছে এই: নিজেকে উঁচাইয়া তুলিয়া, অহংকে একান্ত করিয়া অন্ধবেগে যখন চলিতেছি, তখন থামিতে হইবে; কেন না থামিলেই আত্মসম্বিৎ ফিরিবে, আমি শান্ত হইব। শান্ত যখন হইব, বৈষয়িকতার বন্ধন ঘুচিবে, কেন না প্রেম তখন আসিবে হৃদয়ে। প্রেম আসিলেই দেখিব ব্যাকুলতা জাগিয়াছে, 'কই তুমি, কোথা তুমি' বলিয়া ছুটিতে হইতেছে।

খেয়া-কাব্যে এই ছোটার বাণী আছে। ইহা পলায়নের বাণী নহে, নবজাগরণের বাণী, প্রেমাভিনন্দনের বাণী।

ওপারেতে সোনার কূলে আঁধার মূলে কোন্ মায়া
গেয়ে গেল কাজ-ভাঙানো গান। [শেষ খেয়া]

বস্তুদৃষ্টি যাহাকে আঁধার বলিয়া জানে, আমি তাহারই মূলদেশে ওপারের সোনার কূল পাইয়াছি দেখিতে। প্রেমের গভীরতায় যখন মন গিয়াছে, পড়িয়া রহিল বৈষয়িকতার লাভ-লোকসানের হিসাবনিকাশ। এপারের কাজ ভুলিয়াছি—ওপারের কাজ, আমার প্রেমসাধনার কাজ, দাও করিতে।

এখন কেবল একটি পেলেই বাঁচি,
এসেছি তাই ঘাটের কাছাকাছি,
এখন শুধু আকুল মনে যাচি
তোমার পারে খেয়ার তরী ভাসা। [পথের শেষ]

কিন্তু 'এক'কে পাইতে গিয়া কি জগৎকে মায়া কহিব? জগৎ কি সেই এক ছাড়া? জগৎ ছাড়িয়া একের সন্ধানে ঘাটের কাছাকাছি আসিয়াছি, ওপারে যাইলেই সেই এক যাইবে মিলিয়া? ঘর ছাড়িলাম পারে যাইবার জন্য, কিন্তু ঘর কি সেই পার ছাড়া? ঘরের অহং-এ থাকিব না বলিয়া ছাড়িলাম ঘর, কিন্তু পারের ধারণাতীতে কি সত্যই যাইতে চাহি? না না, আমি চাই—

ঘরেও নহে পারেও নহে,
যে জন আছে মাঝখানে।

'ঘরেও নহে' অর্থাৎ ঘরের বৈষয়িকতায় নহে—'ছোট আমির' তুচ্ছ মনোবৃত্তিতে নহে, পরন্তু ঘরের মধ্যেই যে জীবন ত্যাগের ঔজ্জ্বল্যে, বীরত্বের মহিমায়, সৌন্দর্যের আনন্দে প্রকাশিত হইতেছে, সেই ঘরে আছেন প্রেম। 'পারেও নহে'—অর্থাৎ অবাঙ্‌মনসোগোচর তত্ত্বপারে নহে, সংসারকে, জগৎকে মিথ্যা কহিয়া, উপেক্ষা করিয়া অ-সংসার কোনো বিজ্ঞানতত্ত্বের নির্মমতায় নহে, পরন্তু যে পার মনের উচ্চধ্যানের সূর্যালোকে দেয় দর্শন, মানুষের সুন্দরতম চরিত্রের সর্বোচ্চতম শ্রী ও হ্রীর প্রকাশে যাহার আবির্ভাব, সেই পারে আছেন প্রেম। সুতরাং ঘরেও আছেন, পারেও আছেন—নিকটে আছেন, দূরেও আছেন; অর্থাৎ সকলের কেন্দ্রমূলে কেন্দ্রী হইয়া যেখানে যাহা বৃহৎ, যাহা মহৎ, যাহা শোভন, যাহা সুন্দর, যাহা প্রাণময়, যাহা ধ্যানকান্ত, তাহারি, তা'সমস্তরি, আত্মস্বরূপ হইয়া বিশ্বপ্রেম বিরাজিত আছেন উদার আনন্দে।

রবীন্দ্রদর্শনে ইহা ছাড়া কি অন্য কথা কোথাও কিছু বলা হইয়াছে? ঘর জুড়িয়া, ও পার জুড়িয়া বিরাজমান রহিয়াছেন সর্বজগদ্‌গত যে মহাপ্রেম, মানুষের জীবনের তাহাই উপাস্য। দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ এই উপাস্যকে ছাড়িয়া নির্বিশেষ কোনো ধারণাতীত তত্ত্বোপাসনার কথা কোথাও কোনোভাবে কি বলিয়াছেন? দার্শনিককে কবি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবিয়া যাঁহারা গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, অথবা যাঁহারা রবীন্দ্রকাব্যের কোনো-প্রকার ঐক্যতত্ত্বের সন্ধান না পাইয়া কাব্য হইতে তত্ত্বকে বহিষ্কার করিবার অভিপ্রায়ে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, তাঁহাদের আজ নিজস্ব মনগড়া তথ্যের উপর নির্ভর না করিয়া শ্রম সহকারে এইটুকু অবশ্যই অন্বেষণ করিতে হইবে যে, দার্শনিক হিসাবে রবীন্দ্রনাথ বৈদান্তিকদের 'বিজ্ঞানে' অথবা নির্বিশেষ 'আনন্দ'-তত্ত্বে আস্থা স্থাপন করিয়াছেন কি না। যদি করিয়াছেন বলিয়া কেহ প্রমাণ করিতে পারেন, তখন তাঁহার দার্শনিকটিকে কবি

হইতে পৃথক তো ভাবিবই, উপরন্তু তাঁহার মধ্যে পরস্পরবিরোধী চিন্তার প্রশ্রয় দেখিয়া কাব্য হইতে ঐক্যতত্ত্ব অন্বেষণেও উদাসীন থাকা ন্যায়সঙ্গত মনে করিব।

সৌভাগ্যবশতঃ রবীন্দ্রনাথের কবি ও দার্শনিকের মধ্যে বস্তুতঃ কোনো বিরোধিতা নাই; রবীন্দ্রকাব্যের সমগ্রতার সুরটি ধীরভাবে ধরিতে পারিলেই এই উক্তির সত্যতা উপলব্ধ হইবে। অল্প পড়িয়া বেশি লিখিতে যাওয়ার অথবা ভুল বুঝিয়া বেশি পড়িতে যাওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করিয়া রবীন্দ্রদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রকাব্যের আজ নূতন করিয়া আলোচনা করিতে হইবে। দেখিতে হইবে অহং-এর বিশ্ববিধ বিচিত্র বুভুক্ষার মধ্য দিয়া ধাপে ধাপে, স্তরে স্তরে কী আশ্চর্য মহিমায় শিবোজ্জ্বল সেই সর্বজগদ্‌গত সুন্দর প্রেম জীবন জুড়িয়া অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে। 'কবিকাহিনী' হইতে এই 'খেয়া' পর্যন্ত সেই অদ্বৈত প্রেমেরই কি ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করিতেছি না? 'রাহুর প্রেম' কবি একদা গাহিয়াছিলেন; কিন্তু দার্শনিক কি কহেন নাই যে, এই 'রাহুর প্রেম' মিথ্যা নহে, অহং মিথ্যা নহে, কেন না অহংএর বৃন্তটি আশ্রয় করিয়াই প্রেমের শতদল হয় বিকশিত?

রবীন্দ্রনাথ ঘরের প্রেমের কথা যথেষ্ট গাহিয়াছেন, পারের প্রেমের কথা অহরহঃ গাহিতেছেন। এক হইতে আরের উদ্ভব, ঘর হইতে পারের আভাস, পার হইতে ঘরের মহিমা। ইহা কি শুষ্ক তত্ত্ব মাত্র? কিন্তু ইহা না বুঝিলে রবীন্দ্রকাব্য পাঠ অর্থহীন।

খেয়ার 'বালিকাবধূ' কবিতাটি স্মরণ করুন।

'বালিকাবধূ' কবিতাটিতে ঘরের কথা আছে অবশ্যই। কিন্তু শয়নে স্বপনে সুখে দুঃখে যে বিরহিণীটি প্রিয়তমের লীলাসঙ্গিনী, প্রিয়তমের জন্য নিত্য অনুরাগবতী, নিত্য প্রতীক্ষমানা—সেই শাশ্বতী বিরহিণী প্রেমিকার সনাতন পরিচয়ে চেনা বধূটিই অচেনার আনন্দকান্ত রাগশান্ত মাধুর্যে অপরূপ হইয়া দেখা দেয় কি না? ঘরের চেনা বধূটির কান্ত কল্পনায় অচিন 'পারের' স্বর্ণশান্ত বসন্তের স্বপ্ন-সুষমার রশ্মি যখন আসিয়া পড়ে, কোথায় তখন অহংএর বুভুক্ষা, কোথায় 'ছোট-আমির' অসংযত অতিকৃতি? রবীন্দ্রকাব্যে নারী ঘরের বিচারে 'অর্ধেক রমণী' বটে, কিন্তু 'পারের' মহিমায় 'অর্ধেক কল্পনা'ও কি নহে?

অমর্ত্য প্রেমের স্পর্শমণির স্পর্শে মর্ত্যের যাহা কিছু সবই স্বর্ণ হইয়া যায়, নিতান্ত দৈনন্দিন আটপৌরে গৃহজীবনের তুচ্ছতম মান অভিমান হইতে শুরু করিয়া বৃহত্তম প্রেমের শীর্ষদেশ পর্যন্ত সুষমাত স্বর্ণ-স্বপ্নের ইন্দ্রজালে হয় রোমাঞ্চিত। ঘরের সংকীর্ণতায় মগ্ন না রহিয়া পারের অসীমে দৃষ্টি ফিরাইলেই এই প্রেমের দর্শন মেলে। ঘরেই আছে এই প্রেম – শুধু দৃষ্টি অন্ধ করিয়া রাখি বলিয়াই দেখিতে পাই না তাঁহাকে। তিনি আসেন, অহরহঃই ভিখারীর মত হৃদয় ভিক্ষা করিয়া ফেরেন মানুষের দ্বারে।

'কৃপণ' কবিতাটিতে বলা হইয়াছে—তিনি আসিয়া ভিখারীর কাছেও ভিক্ষা মাগিলেন। ভিখারী তাঁহাকে 'একটি ছোট কণা' দিতে পারিল। কিন্তু প্রেমকে যাহা দেই, তাহার

সহস্রগুণ কি ফিরিয়া পাই না? ভিখারী গৃহে ফিরিয়া পাত্র উজাড় করিয়া বিস্মিত হইয়া দেখিল, 'ভিক্ষামাঝে একটি ছোটো সোনার কণা' রহিয়াছে।

পাত্রখানি ঘরে এনে
উজাড় করি—একী!
ভিক্ষামাঝে একটি ছোটো
সোনার কণা দেখি।
দিলেম যা রাজ-ভিখারিরে
স্বর্ণ হয়ে এল ফিরে—
তখন কাঁদি চোখের জলে
দুটি নয়ন ভরে,
তোমায় কেন দিইনি আমার
সকল শূন্য করে। [কৃপণ]

প্রেমের তত্ত্বই হইল এই, যাহা দেই, তাহার সহস্রগুণ, কোটিগুণ পাই ফিরিয়া। ভিখারীর বেশে প্রেম যেন অহরহঃ আনাগোনা করিতেছেন, কিন্তু হৃদয়-কৃপণ আমরা, অহংপ্রেমে উন্মত্ত আমরা, রাজাধিরাজ এই প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করিতেছি আমাদেরই অন্ধ ঔদাসীন্যে। এই যে বিশ্বাস, ইহা শুধু রবীন্দ্রনাথের নয়, ভারতীয় সাধকবর্গেরও বড়ো মনোময়, বড় আবেগময় বিশ্বাস। ভারতের মধ্যযুগে দীন দুঃখী ও আর্তদের ত্রাণের জন্য যে সমস্ত কাঙালসাধু প্রেমের কথা কহিয়া বা গাহিয়া বেড়াইতেন, পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন-শাস্ত্রীর গবেষণার গৌরবে এতদিনে আমরা তাহাদের রচনাবলীর সহিত পরিচিত হইয়াছি। দাদূ, কবীর, নানক, তুলসীদাস, তুকারাম প্রভৃতি ঋষি সাধকদের বহু রচনাতেই প্রেমের এই লোকায়ত তত্ত্বকথা নিহিত আছে। বৈষ্ণব বাউলদের ও সহজিয়াদের বহু গানের মধ্যেও এই তত্ত্বকথার প্রাধান্য লক্ষ্য করিয়াছি। লোকায়ত এই তত্ত্বকথার সন্ধান পাইয়া রবীন্দ্রনাথ এই সত্যটি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে, তত্ত্ব কাব্যের পরিপন্থী নহে, বরং তত্ত্ব কাব্যকে গভীর করে, নবতর ভাবব্যঞ্জনায় শুধু উজ্জ্বল নয়, মধুর করিয়া তুলে। 'পঞ্চভূতে' 'কাব্যের তাৎপর্য' নামক প্রবন্ধে তত্ত্বের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি কথা বলিয়াছেন। কিন্তু মনে রাখিব, জীবনবহির্ভূত, কবিতাবহির্ভূত অর্থহীন তত্ত্বের বিরুদ্ধেই রবীন্দ্রনাথের পরিহাস বা প্রতিবাদ। যে তত্ত্ব ধারণারই অন্তর্ভুক্ত রহিয়া জীবনকে করে মহত্তর এবং কাব্যকে করে গভীরতর, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য, কেন না, এই তত্ত্ব হইতেছে কাব্যের ছন্দ, যতি, অলংকারের মতই 'একটা বড় আশ্রয়'—জ্ঞানের আশ্রয়। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

"সমস্ত শ্রেষ্ঠ কাব্যের ভিতরে এমন একটা কিছু থাকে যাতে আমাদের জ্ঞান তৃপ্ত হয়—যাতে আমাদের মনন বৃত্তিকেও উদ্বোধিত করে তোলে। কবি যদি অত্যন্তই খামখেয়ালি

এমন একটা বিষয় নিয়ে কাব্য রচনা করেন যাতে আমাদের জ্ঞানের কোনো খাদ্য না থাকে অথবা যাতে সত্যের বিকৃতিবশতঃ মননশক্তিকে পীড়িত করে তোলে, তবে সে কাব্যে রসের প্রকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়,—সে কাব্য স্থায়িভাবে ও গভীরভাবে আমাদের আনন্দ দিতে পারে না।······শ্রেষ্ঠকাব্যে প্রথমে আমাদের কানের ও কল্পনাবোধের তৃপ্তি, তারপরে আমাদের বুদ্ধির তৃপ্তি, ও তারপরে হৃদয়ের তৃপ্তি ঘটলে তবেই আমাদের সমগ্র প্রকৃতির তৃপ্তির সঙ্গে কাব্যের যে রস তাই আমাদের স্থায়িরূপে প্রগাঢ়রূপে অন্তরকে অধিকার করে। নইলে, হয় রসের ক্ষীণতা, ক্ষণিকতা, নয় রসের বিকার ঘটে।" [বিকারশঙ্কা, শান্তিনিকেতন-১].

ধারণার অন্তর্ভুক্ত লোকায়ত তত্ত্বদর্শন ভারতীয় কাব্যসংস্কৃতির বাহিরের ব্যাপার যে নহে, এই কথা নিখিলভারত দার্শনিক সম্মেলনের সভাপতির বক্তৃতাতে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করিয়াছেন—

> "In India all the Vidyas......poesy and philosophy······live in a joint family. They never have the jealous sense of individualism maintaining the positive regulations against trespass that seem to be so ripe in the West.
>
> "Plato as a philosopher decreed the banishment of poets from his ideal republic. But in India, philosophy ever sought alliance with poetry, because its mission was to occupy the people's life and not merely the seclusion of scholarship.
>
> "According to our people, poetry naturally falls within the scope of a philosophy when his reason is illumined into a vision. [Philosophy of Our People, *Sisir*, February, 1926.]

খেয়ার রচনার সময় হইতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা বড় বেশি তত্ত্ব-ঘেঁষা হইয়া গেছে, এমনিতর একটি অভিযোগ আধুনিক মহলে শুনিতে পাই বলিয়া কাব্যের তত্ত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দু-একটি কথা প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপন করিলাম। একথা অবশ্য ঠিক যে, জৈব-জীবনের নিচুস্তরে পড়িয়া রহিয়া খেয়া বা গীতাঞ্জলির রসগ্রহণ করা সম্ভব নহে। বলিয়াছি, বোধ বিস্তৃত না হইলে কাব্য শুধু রসহীন নহে, অর্থহীনও বটে। যে বিষয়ে আমার বোধ নাই, সে বিষয়ে আমার চিত্ত সাড়া দেয় না, সুতরাং রসের উদ্বোধন ঘটে না। প্রেম ভিখারীর মত মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছেন—ভারতের ঐতিহ্যগত সহজ এই কল্পতত্ত্বটি যাঁহার মধ্যে নাই, কেমন করিয়া তিনি রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া' বা তাহার পরবর্তী কাব্যগুলির রসগ্রহণ করিবেন? "সীমার মাঝে অসীম"এর তত্ত্বরসটুকু জীবন ভরিয়া যিনি আস্বাদন করেন নাই, রূপে রূপে অরূপ দেখিবার আনন্দকে তিনি বস্তু-অবচ্ছিন্ন অর্থহীন তত্ত্বমাত্র তো বলিতেই পারেন।

গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি প্রভৃতি গীতিগ্রন্থে রাবীন্দ্রিক প্রেমতত্ত্ব অবশ্যই আছে—কিন্তু এই তত্ত্ব রবীন্দ্রপ্রতিভায় তো আকস্মিকভাবে আবির্ভূত হয় নাই। 'কবিকাহিনীর' জড়প্রেমের লোকচাপল্যে ইহার সূচনা, প্রভাতসঙ্গীতের সচকিত প্রেমোন্মেষে ইহার যাত্রারম্ভ, 'চিত্রার' রূপাভিব্যক্তির আনন্দে ইহার আত্মপ্রতিষ্ঠা, 'খেয়ার' রসরূপের মূলোদ্‌ঘাটনে ইহার অভিরাম অনুরাগ।

গীতাঞ্জলি

গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্যে নূতন কথা তো কিছু পাই নাই—চিরন্তন প্রেমের লুকোচুরি খেলার ধ্বনিই তো এই গানগুলির প্রাণ। অহং-মত্ত যখন থাকি, প্রেম তখন থাকে লুকাইয়া। অহংকে সরাইয়া যখন প্রেমের জন্য উদ্যত হই, তাহার 'পায়ের ধ্বনি' যেন শুনি। শুনি— সে আসে, সে আসে, সে আসে।

অহং-এর বহুবিধ বাসনা লইয়া অনেক খেলাই মানুষকে খেলিতে হয়, কতভাবে, কত রূপে কত মৃত্যু আনিয়া দেয় অহং। কত গতিপথে, কত বৈচিত্র্যের পথে, কত অপথে, কত বিপথে ভ্রমণ করিতে হয় সহজ স্বভাবের জীবমানবকে। কিন্তু প্রেমের ইঙ্গিত যখন সূর্যের আলোর মতো পতিত হয় তাহার অন্তরে, তখন আর কি অহং থাকে? তখন—

সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।

এই যে অহংকার ডুবাইয়া দিয়া প্রেম-ব্যাকুলতার মধ্যে নূতন জন্মলাভ, অহং হইতেই ইহার উৎপত্তি; তাই রবীন্দ্রদর্শনে ইহাও মিথ্যা নহে বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু প্রেমের ব্যাকুলতা যখন জাগে তখন অহং-এর আর তো প্রয়োজন নাই। 'সোনার ধান'-গুলি যখন মহাকালের তরীতে স্থান পাইয়া যায়, তখন অহং-এর ছোট ক্ষেতটুকু অব্যক্তের কাল-সলিলে ডুবাইয়া দেওয়াই তো জীবনের কার্য।

তাহা যেন হইল—এইবার, অর্থাৎ প্রেম জাগিবার পর জীবনের নূতন কী কার্য? রবীন্দ্রনাথ কহিবেন, প্রেমের ব্যাকুলতাও প্রেম, এই প্রেমের আদর্শ কর্মে, জ্ঞানে, বাক্যে, ব্যবহারে, জীবনে, মৃত্যুতে, রূপে, অরূপে, প্রতিভাত করাই জীবনের কার্য।

ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা
প্রভু, তোমার পানে, তোমার পানে, তোমার পানে।

বস্তুতঃ গীতাঞ্জলির কথা এই, সংসারে যাহা করিব, যাহা ভাবিব, যাহা প্রচার করিব—তাহার মধ্যে প্রেমের কথাই যেন হয় প্রকাশিত। যে প্রেমকে পরিপূর্ণ আজও পাই নাই, কর্মে, জ্ঞানে, ধ্যানে, গানে তাহা ক্রমশঃই বিকশিত হইয়া উঠুক, চরিত্রকে করুক মহত্তর, হৃদয়কে করুক নির্মলতর। প্রেমবিকাশের পথে যত বাধা, যত বিপত্তি আছে, প্রেমের দয়াতেই তাহা অবসিত হইবে। প্রেমই আমাকে অহং হইতে 'ছিন্ন' করিয়া লইয়া আপনার

মধ্যে গ্রহণ করিবে, 'অন্তর মম বিকশিত' হইয়া উঠিবে ক্রমশঃ, 'মলিন বস্ত্র' ছাড়িয়া আত্মা পরিধান করিবে নবীন বস্ত্র।

এই যে প্রেমবিশ্বাস ও প্রেমানুভূতি, চিত্তনিরপেক্ষ বিশুদ্ধ তত্ত্ববাণী ইহা নহে। চিত্ত যখন প্রস্তুত থাকে, অর্থাৎ বৈষয়িকতার মোহে যখন আচ্ছন্ন না থাকে, তখন চিত্তের নির্মল পটভূমে ইহার জ্যোতি আসিয়া পড়ে।

প্রেমের এই বিষয়টিকে কবির আধ্যাত্মিকতা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। বস্তুতঃ জীবনে আমি যে বিষয়ে প্রস্তুত থাকি, সজাগ থাকি, সেই বিষয়ের রূপ বা রস আমি অনুভব করিতে পারি—অন্য সকল বিষয় আমার নিকট তখন মিথ্যা বা অর্থহীন মনে হইতে পারে। এই যে আকাশ, এই যে সূর্য চন্দ্র, এই যে অগণিত উজ্জ্বল নক্ষত্র—ইহাদের আমরা দেখার মত কখনই বা দেখি, কখনই বা ইহাদের রহস্য বুঝি? সূর্য প্রতিদিন উদিত হইতেছে, চন্দ্রমা প্রতি পক্ষে পূর্ণিমার পুলক-জোয়ারে প্লাবিত করিতেছে পৃথ্বী-লোক। কিন্তু মন যখন প্রস্তুত নহে, তখন কি ইহাদের রূপশোভা আমরা দেখিতে পাই? ধরিত্রীর পথে, উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে, পশ্চিমে কত প্রাণ, কত রহস্য, কত চিত্র তো অহরহঃ ফুটিতেছে; নিজের আত্মগত বিশেষ কোনো ভাবে বা চিন্তায় মগ্ন হইয়া আমরা যখন পথ চলিয়া যাই—পথের চারিপাশের কোন্ চিত্রটিই বা আমাদের লক্ষ্যে পড়ে? লক্ষ্যে পড়ে না, কিন্তু তাই বলিয়া সেগুলি কি মিথ্যা? মিথ্যা যে নহে, তাহা কি প্রমাণ করিতে হইবে? পথ দিয়া চলিতে চলিতে সচকিত, উত্তেজিত, রোমাঞ্চিত কোনো শুভমুহূর্তে সূর্যের দিকে তাকাইয়া কোনোদিন কি ভাবি নাই—সুন্দর সূর্য, এমন সূর্য যেন কোনোদিন দেখি নাই?

সূর্য চিরকালই সুন্দর, অপ্রস্তুত চিত্তের অন্ধকার কালিমায় সূর্যকে আমরা কালো করিয়া রাখি মাত্র। প্রস্তুত মনই সুন্দরকে জানে, রূপের মধ্যে লীলাকে দেখে। 'পরশপাথরের' ক্ষ্যাপা পাথর বিশেষের চিন্তাতেই বিভোর হইয়া পথে পথে, নদীতে, সাগরে, কাননে কান্তারে ভ্রমিয়া বেড়াইল। সবই নুড়ি, সবই মিথ্যা—এই চিন্তা তাহাকে এমনই বিভ্রান্ত করিয়া রাখিল, যে সত্যকার স্পর্শমণিটি যখন পাইল, সে পারিল না জানিতে। তত্ত্বজ্ঞানবিহীন সরল একটি বালক আসিয়া তাহাকে সচকিত করিয়া দিল যে, স্পর্শমণি সে পাইয়াছিল, কিন্তু মন তাহার অন্যত্র, অন্য চিন্তায় রত ছিল বলিয়া মণিকে সে পাইয়াও ফেলিয়াছে হারাইয়া। বস্তুগত সংসারজীবনে বিচিত্র অহং-বিষয়ে প্রস্তুত ও আসক্ত থাকার জন্য অহরহঃ আমরা স্পর্শমণি হারাইয়া ফেলিতেছি। যে ব্যক্তি 'কোনো প্রতিযোগিতায়' হার হইয়াছে বলিয়া দুঃসহ লজ্জায় ও ক্ষোভে মগ্ন হইয়া আছে, পূর্ণচন্দ্রের জ্যোতির্মণি সম্পর্কে সে কি সচেতন হইতে পারে? যৌবনচাপল্যের অস্থির চিত্তপ্রভাবে যে তরুণ ভোগাসক্তির মোহের মধ্যে আছে আবরিত, পূর্ণ বিকশিত চন্দ্রমার শুভ্রহাসির সৌন্দর্যে

সে কি নয়ন ফিরাইবে? যদিই বা ফিরায়, সে কি অরূপের রূপলীলা দেখিবে, না, আপন হৃদয়ের অহং-উদ্দীপ্ত কামবুভুক্ষার ব্যাকুলতা দেখিবে?

মানুষ নানাভাবে অহং-এর নানা কুরুচি, অরুচি ও উগ্ররুচিতে থাকে আচ্ছন্ন। তাই প্রকৃতির রূপে, চরিত্রের মহত্ত্বে, ভাবের প্রশান্তিতে প্রেম আবির্ভূত হইলেও সে তাহা দেখিতে পায় না। আমার, আপনার, তাহার সকলের দ্বারেই প্রেম আনাগোনা করিতেছেন, আমরা প্রস্তুত নহি, আমরা নিদ্রিত, অহংবিলাসে এমনি নিদ্রিত, যে তিনি পাশে আসিয়া বসিলেও ভাঙে না নিদ্রা। তাহার পর যখন কোনোও কারণে মোহ-নিদ্রা ভাঙিয়া যায়, আত্মসম্বিৎ ফিরিয়া আসে, প্রাণের মধ্যে প্রস্তুতির কিছু প্রশান্তি জাগিয়া উঠে, তখন ক্ষোভের যেন থাকে না সীমা। কেন না—

জেগে দেখি দখিন-হাওয়া পাগল করিয়া
গন্ধ তাহার ভেসে বেড়ায় আঁধার ভরিয়া।
কেন আমার রজনী যায়, কাছে পেয়ে কাছে না পায়—
কেন গো তার মালার পরশ বুকে লাগে নি। [গীতাঞ্জলি-৬১]

নিত্য সজাগ থাকিয়া, প্রস্তুত থাকিয়া, সাধনার স্বভাবে অহরহঃ অধিষ্ঠিত থাকিয়া প্রেমোপলব্ধির জন্য এই যে ব্যাকুলতা, ইহাকেই আমি 'প্রস্তুতির দর্শন' নামে অভিহিত করিতে চাহি। বলা বাহুল্য, ইহা ধর্মতাত্ত্বিকদের কৃচ্ছ্র সাধন নহে, সহজ আনন্দেই অহরহঃ প্রেমের জন্য আত্মপ্রস্তুতিই এই দর্শনের বাণী। এই দর্শনবাণী স্বভাবের বাণী। গীতাঞ্জলি স্বভাবেরই প্রসন্ন প্রকাশ। সাধনার স্বভাবে ইহার সুর। শ্রেয়োবোধের আনন্দ ইহার ছন্দ। 'দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে' বলিয়া প্রেমপ্রার্থনা এবং 'আবার এরা ঘিরেছে মোর মন' বলিয়া নিত্য সজাগদৃষ্টির আনন্দ-প্রসন্নতা আত্মপ্রস্তুতির তত্ত্বদর্শন। এই তত্ত্বই বোধে প্রতিভাত হইয়া জীবনকে যুক্ত করে 'সবার সঙ্গে', 'মুক্ত করে' সকল প্রকার 'বন্ধ'।

তখনই বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্ররূপে প্রেমানন্দের দর্শন মেলে—

আমার নয়ন-ভুলানো এলে,
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে।

'হৃদয় মেলে' কথা দুটি লক্ষ্য করিবার মতো। নয়নকে যিনি সত্য সত্যই ভুলাইতে পারেন, নয়ন মেলিয়া তাঁহাকে তো দেখি না, হৃদয় মেলিয়াই তাঁহাকে দেখি।

অন্যত্র কবি লিখিয়াছেন, পুষ্পবনে কি পুষ্প থাকে, পুষ্প থাকে তো অন্তরে। অন্তর যখন পুষ্প-প্রস্তুত নহে, তখন সহস্র পুষ্পের রূপও তো মিথ্যা। প্রেমের মন্ত্রে যখন প্রাণে বসন্ত জাগ্রত হয়, তখনই চারিদিক আনন্দে বিকশিত দেখি।

পুষ্পবনে পুষ্প নাহি আছে অন্তরে।
পরানে বসন্ত এল কার মন্তরে॥

প্রাণে যখন প্রেমের উদ্বোধন হয়, তখনই 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে'। কবি তাই কহিতেছেন, অপ্রস্তুত থাকিয়ো না। বসন্ত যখন দ্বারে করাঘাত করিতেছে, সাংসারিকতার, বৈষয়িকতার ভার বুকে লইয়া প্রত্যাখ্যান করিয়ো না বসন্তের ভাব-ভগবানকে—

তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে
করো না বিড়ম্বিত তারে।

জীবনে দুঃখ থাক, নৈরাশ্য থাক, বেদনা থাক, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যদি প্রেমও থাকে হৃদয়ের সঙ্গী হইয়া, তবে জীবনে অনন্ত সুখ, অনন্ত আশা, অনন্ত কল্পনাও থাকিবে। প্রেম যেখানে, আনন্দ সেখানে। সেখানে 'আম্রমুকুল সৌগন্ধে' আনন্দ, সেখানে 'ঝরাফুলের রাশে রাশে' আনন্দ, সেখানে 'যেদিক পানে নয়ন মেলি ভালো সবি ভালো' বলিয়া আনন্দ, সেখানে 'সবহারাদের দলে' মিলিয়া আনন্দ, সেখানে 'ভজন পূজন সাধন আরাধনা' ত্যাগ করিয়া চাষীদের সহিত 'ধূলার পরে' নামিবার স্বপ্নে আনন্দ। গীতাঞ্জলি একটি আনন্দের শতদল। সরল একটি প্রেম-বিশ্বাসের শুভ্র শতদল বসন্ত বাতাসে যেন দলগুলি মেলিয়া দিয়া স্বপ্ন-প্রকৃতির শোভা বাড়াইতেছে।

গীতাঞ্জলিতে প্রেমের আনন্দে সুন্দর হইয়াছে মন; বিশ্ব তখন সুন্দর, প্রকৃতি তখন সুন্দর। আবার সত্যসত্যই যাহা সুন্দর, রূপের স্থূলত্ব অতিক্রম করিয়া তার রূপ অসীমের ইঙ্গিত দান করে বলিয়াই তাহা সুন্দর। যে সুন্দরে মন কল্পনা রচনার সুযোগ পায় না, মনের নিকট তাহা যথার্থ সুন্দর নহে। মনের নিকট প্রকৃতি সুন্দরী এইজন্য যে, মন প্রকৃতির ঋতুরূপে অলৌকিকের ব্যঞ্জনা অনুভব করে, রসরূপে অনুভব করে অনির্বচনীয়ের মহিমা। অবশ্য এ কথা সত্য যে, মন যদি শুভ্রসুন্দর ও নির্মল না হয়, তবে বিশ্ব বা বিশ্ব প্রকৃতিকে এমনিতর ব্যঞ্জনাময় সৌন্দর্যের আশ্রয়রূপে গ্রহণ করা তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না। রবীন্দ্রনাথের মন প্রেমের আনন্দে যতই সুন্দর ও নির্মল হইয়া উঠিতেছে, ততই তাহা বিশ্বকে সুন্দরতর মধুরতর দেখিতেছে, ততই বোধ হইতেছে দেখার মত দেখা যেন হইল না, পাওয়ার মত পাওয়াও যেন হইল না—ফাঁকি রহিয়া গেল, ফাঁক থাকিয়া গেল।

এই যে মনোভাব, ইহারি নাম বিরহ। কিন্তু এই বিরহ জড়-বিরহ নহে। চেতনার জন্য চেতনার বিরহ। সুন্দরকে দেখিয়া সুন্দরতরের কল্পনানন্দে বিরহ; সুন্দরতমকেও যদি পাওয়া যায়, তথাপি সুন্দরতমেরও সুন্দরতর-র রূপস্বপ্নে যে বিরহ, এ সেই বিরহ। পড়ুন—

সকল জীবন উদাস করিয়া
কত গানে সুরে গলিয়া গলিয়া
তোমারি বিরহ উঠিছে ভরিয়া
আমার হিয়ার মাঝে হে॥

কি—

ওরে বৃষ্টিতে মোর ছুটেছে মন
লুটেছে ঐ ঝড়ে
বুক ছাপিয়ে তরঙ্গ মোর
কাহার পায়ে পড়ে ?

কি—

আমি দেখি নাই তার মুখ, শুনি নাই তার বাণী,
কেবল শুনি ক্ষণেক্ষণে তাহার পায়ের ধ্বনিখানি—

কিংবা—

আকাশ কাঁদে হতাশ সম,
নাইরে ঘুম নয়নে মম—
দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম,
চাই যে বারে বার
পরাণসখা বন্ধু হে আমার।

উপর্যুক্ত যে স্তবক কয়েকটি উদ্ধৃত করা হইল, তাহাদের মধ্যে রাবীন্দ্রিক যে বিরহতত্ত্বের তাৎপর্য রহিয়াছে তাহা ধরিতে না পারিলে রবীন্দ্রনাথের মন ও তাহার স্বরূপ চিন্তন সম্ভব হইবে না। সীমার মধ্যে যে অসীমের লীলাকথা রবীন্দ্রনাথে পাওয়া যায় তাহার মধ্যেও এই বিরহ-তত্ত্ব নিহিত আছে। সীমাকে উপেক্ষা করি নাই, মায়া কহি নাই, বরং প্রেমের দৃষ্টিতে দেখিয়াছি, সীমা তাই সুন্দর। সুন্দর, সুন্দর, বড় সুন্দর এই সীমার জগৎ, কিন্তু কেন ? সুন্দর কেন ? এ যে আমার মনে অনন্ত কল্পনার জন্ম দেয়—, যা' দেখিতেছি তা' ছাড়া আরো কত কী যে দেখাইতে থাকে। আমাকে বলাইতে থাকে : যা' পাইয়াছি তা' অল্প, যা পাওয়া উচিত, তা ভূমা ; তা'তো এখনও পাওয়া হইল না। সুতরাং ব্যাকুলতা জাগিল, বিরহ জাগিল। 'সমুখ দিয়ে স্বপনসম যেয়ো না' বলিয়া ক্রন্দন জাগিল। আবার এ কথাও ঠিক, এই ক্রন্দনই একপ্রকার সূক্ষ্মতর আনন্দ। সে আবার কেমন ? যা' দেখিতেছি, সীমা হইয়াও তা' সীমা নহে ; তাহার মধ্য দিয়া সেই আমার প্রেমের জ্যোতিই তো বিচ্ছুরিত হইতেছে। তবে তো প্রেমকে দেখা যায়। তবে তো সে আমাকে ফাঁকি দেয় নাই। পড়ুন—

আলোয় আলোকময় করে হে
এলে আলোর আলো।
আমার নয়ন হতে আঁধার
মিলালো, মিলালো। [৪৫]

কি—

> জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ
> ধন্য হল, ধন্য হল মানবজীবন।
> নয়ন আমার রূপের পুরে
> সাধ মিটায়ে বেড়ায় ঘুরে,
> শ্রবণ আমার গভীর সুরে
> হয়েছে মগন॥ [৪৪]

গীতিমাল্য

গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালির সুর প্রায় একই—ঐ অসীমের সুর, বৃহত্তর জীবনের সুর, প্রেমের সুর। অসীমের স্পর্শ পাইয়া যে জ্যোতির্ময় মন আনন্দ-মধুর উদ্বেজনায় ব্যাকুল হইয়াছে, তাহারি বিচিত্র অনুভূতির ললিতোচ্ছ্বাস ব্যঞ্জিত হইয়াছে গীতাঞ্জলিতে। গীতিমাল্যেরও এই ভাব, তবে নূতনতা বা পার্থক্য হইতেছে এই যে, প্রেমসুন্দর জ্যোতির্ময় সেই মনখানি লইয়া গীতিমাল্যের কবি নূতন করিয়া বিশ্বাভিসারের পালা সুরু করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ববর্তী রচনায় যে বিশ্বাভিসারের পালা নাই, গীতিমাল্যেই প্রথম, এমন কথা অবশ্যই আমি বলি না। প্রেমের উদ্দেশ্যে লোকে লোকে, দিশি দিশি অগ্রসর হওয়ার দিব্য বাণী রবীন্দ্রনাথের প্রায় সকল কবিতাতেই মেলে: তবে গীতিমাল্যে এই ভাবোপলব্ধি আড়ম্বরবিহীন সহজ ভাষায় এমন স্পষ্টভাবে ফুটিয়াছে, প্রেমের সহজ স্বরূপটি এই সমস্ত সোনার গানগুলিতে এমন আশ্চর্য ব্যঞ্জনার সৌন্দর্যে বিভাসিত হইয়াছে যে, বিশ্বপ্রেমের আনন্দাভিসারের কথা উঠিলেই গীতিমাল্যের কথা ও সুরই মনে পড়িয়া যায়।

গীতিমাল্যের ভাবটি এই : প্রেম পাইয়াছি, আমাকে উজাড় করিয়া দিয়া যাইতে হইবে। কে আছ, এসো, আমাকে 'কিনিয়া' লও। দানের উদ্দেশ্যে, প্রেমের উদ্দেশ্যে, পথে পথে আমি ফিরিতে চাহি, প্রেমও আমার উদ্দেশ্যে ফিরিতে চাহেন পথে পথে; আমি চলি তাঁহার অভিসারে (৭৪), তিনি আসেন আমার অভিমুখে (৯১), মাঝপথে এই লীলা—'কে নিবি গো কিনে আমায়!'

দান দিতে চাওয়াই প্রেমের স্বভাব, না দিতে পারিলেই তাহার ব্যথা, বেদনা, বোঝাভারে কেমন যেন বিষাদঘন ব্যাকুলতা! 'কে নিবি গো কিনে'—এই বাণী প্রেমিকের

বাণী, আবার সর্বানুভূ সেই প্রেম-দেবতারও বাণী। কিনিয়া লও, কিনিয়া লও! কিন্তু কে কিনিবে, কী ভাবে কিনিবে? ঐশ্বর্য ও অস্ত্রশস্ত্রের সমারোহ দেখাইয়া রাজা কি তাহাকে কিনিতে পারে? 'মুকুট মাথে অস্ত্র-হাতে রাজা' তো রথে চড়িয়া আসিলেন, 'কিনবো আমি জোরে' বলিয়া অনেক 'টানাটানি' করিলেন, কিন্তু শূন্যমনে তাঁহাকে কি ফিরিতে হইল না?

'লক্ষেশ্বরের' ন্যায় অর্থবান এক বৃদ্ধ, আসিল 'টাকার থলি' লইয়া। অনেক বিবেচনা করিয়া তো কহিল, 'কিনবো দিয়ে সোনা', কিন্তু সোনা দিয়া কি প্রেমের পসরা কেনা গেল?

তবে কিসে প্রেমকে পাওয়া যাইবে? ললিতাননচন্দ্রা উর্বসীতুল্যা কোনো সুন্দরীর মোহময় হাস্যের বিনিময়েও প্রেম কি মিলিবে না? নির্জন সন্ধ্যায় মুকুলিত বনবিটপীর শিরোদেশে যখন জ্যোৎস্না নামিবে, গন্ধমদির বকুলবিতানে আবির্ভূত হইবে তন্বী কোনো যৌবনচঞ্চলা, মোহবিহ্বল হাস্যচ্ছটায় হৃদয়ে জাগাইবে দুরন্ত কামনার অজস্র বসন্ত, প্রেম তখনও কি থাকিবে উদাসীন অন্যমনা? পড়ুন—

সন্ধ্যাবেলায় জ্যোৎস্না নামে মুকুলভরা গাছে,
সুন্দরী সে বেরিয়ে এলো বকুলতলার কাছে।
বল্‌লে কাছে এসে, "তোমায়
কিন্‌বো আমি হেসে,"
হাসিখানি চোখের জলে মিলিয়ে এলো শেষে;
ধীরে ধীরে ফিরে গেল বনছায়ার দেশে। [গীতিমাল্য-৩১]

অহংকারের হাসিখানি চোখের জলেই গেল ভাসিয়া। মোহ দ্বারা জয় করা গেল না প্রেম, ব্যর্থতার অশ্রু বিসর্জনান্তে সুন্দরী গেল ফিরিয়া। লজ্জা ঢাকিবার জন্য দৃষ্টির আড়ালে ওই যে বনছায়ার দেশে ধীরে ধীরে সে অন্তর্হিত হইয়া গেল! রাজায় নহে, ধনবানে নহে, সুন্দরীতে নহে, তবে প্রেম স্থান লইবে কোথায়? সে কি জগতেই থাকিবে না? মানুষ তাহাকে পাইবে না? কোথায়, কাহার কাছে যাইবে প্রেম? ভয় নাই, যাইবার স্থান আছে। সীমাহীন সাগরের তীরে যেখানে অসীম সূর্যের দীপ্ত রশ্মি হয় বিকীরিত, তরঙ্গে তরঙ্গে লীলাচঞ্চল সেই বিরাটের তীরে—সসীম খেলার সহজ সুখে যে মানুষ অসীম লীলার আনন্দ করে অনুভব, প্রেমকে চিনে সেই মানুষ, প্রেমের স্থান সেই মানুষেরই হৃদয়লোকে—প্রেমকে জানে সেই সকলভোলা আনন্দী। সেই জানে—শক্তি দিয়া নয়, স্বর্ণ দিয়া নয়, মোহ জাগাইয়াও নয়, সহজলীলার অমূল্য আনন্দেই প্রেমকে পাওয়া সহজ এবং সম্ভব। পড়ুন—

সাগর তীরে রোদ পড়েছে, ঢেউ দিয়েছে জলে,
ঝিনুক নিয়ে খেলে শিশু বালুতটের তলে।
যেন আমায় চিনে, বললে,
"অম্‌নি নেবো কিনে"—

বোঝা আমার খালাস হলো তখনি সেই দিনে।
খেলার মুখে বিনামূল্যে নিলো আমায় জিনে॥

রসিক পাঠকগণ নিশ্চয়ই বুঝিতেছেন: 'বালুতটের শিশু' একটি প্রতীক মাত্র। সহজ সারল্য, সহজ পবিত্রতা, সহজ আনন্দ যাঁহাদের আছে, কবি তাঁহাদের দিকেই লক্ষ্য করিতেছেন। বৈষয়িকতার উর্ধ্বে যাঁহাদের চিত্তগতি, গতানুগতিকতার বিপরীত পন্থায় যাঁহাদের অগ্রগতি,—সংসারে যাহা পান অর্থাৎ রূপে যাহা দেখেন, তাহাতেই যাঁহারা অনুভব করেন সংসারাতীত সেই অরূপের আনন্দমহিমা, প্রেমকে জানেন তাঁহারাই। বুদ্ধিমান চতুরের পথ ত্যাগ করিয়া, গতানুগতিকতার পথ ত্যাগ করিয়া, অর্থাৎ জানা পথ পরিহারপূর্বক জানার মধ্যেই যে অজানা, তাহার পথে, সেই সহজ পথে, অহরহঃ চলার বাণী গীতিমাল্যের একটি প্রধান সুর।

সকল জানার বুকের মাঝে
দাঁড়িয়েছিলো অজানা যে,
তাই দেখে আজ বেলা গেল
নয়ন ভরে' আসে।
পশরা মোর পাসরিলাম,
রইলো পথের পাশে। [৫]

সাংসারিকতার পসরা সংসারেই রহিল পড়িয়া। আমি চলিলাম। তা' না হইলে কি 'অচিন্ দেশে' যাওয়া যায়? অহংকে ত্যাগ করি না, নিজে 'হাল ধরা'র অহংকার অর্থাৎ চতুর বৈষয়িকতার অন্ধ উন্মত্ততা লইয়া সকাল সন্ধ্যা ব্যস্ত থাকি, তাই তো তাহাকে, সেই প্রেমকে, পাই না।

আমার এই আলোগুলি
নেবে আর জ্বালিয়ে তুলি,
কেবলি তারি পিছে
তা নিয়েই থাকি ভুলি।

কিন্তু এ-ভুল এইবার ভাঙ্গিয়াছে। বুঝিয়াছি, তুচ্ছতার মত্ততা ত্যাগ করিয়া বৃহতে একেবারে আত্মসমর্পণ না করিলে পাইব না প্রেম।

আমি হাল ছাড়লে তবে
তুমি হাল ধরবে জানি।
যা হবার আপনি হবে
মিছে এই টানাটানি।

ছেড়ে দে দে গো ছেড়ে,
নীরবে যা তুই হেরে,
যেখানে আছিস্ বসে
বসে থাক ভাগ্য মানি॥ [৬]

'ভাগ্য মানি' কথাটির উপর জোর দিতে চাই। ইহা নিশ্চেষ্টতার, পৌরুষবিহীন অদৃষ্টবাদিতার, ইঙ্গিত নহে। কপালে করাঘাত হানিয়া অর্থহীন নৈষ্কর্ম্যে স্থবিরের ন্যায় বসিয়া থাকার বাণী রবীন্দ্রবাণী নহে।

হাল ছাড়িয়াছি, বৈষয়িকতা অর্থাৎ অহং-এর তুচ্ছ বুভুক্ষুবৃত্তি ত্যাগ করিয়াছি, অবশ্যই এইবার প্রেম আসিবে : যদি না আসে, বুঝিব, এখনো সম্পূর্ণ হাল ছাড়া হয় নাই— অহংবোধ ত্যাগ করা হয় নাই। এই যে বিশ্বাস, ইহার উপরেই জোর দেওয়া হইয়াছে 'ভাগ্য মানি' এই কথার দ্বারা। প্রেমে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া অহং তো ত্যাগ করিলাম, আমার ভাগ্যে ত্যাগ করা যথার্থভাবে হইয়াছে কি না পরীক্ষা করিবার জন্য 'ভাগ্য মানিয়া' এই বসিলাম। অবিশ্বাস নহে, সংশয় নহে, সন্দেহ নহে, যোগ্য যদি হইয়া থাকি, সে আসিবে, দ্বার খোলা রাখিয়াছি, সে আসিবে, আমাকে গ্রহণ করিবে :

এই দুয়ারটি খোলা।
আমার খেলা খেলবে বলে
আপনি হেথায় এলো চলে
ওগো আপন ভোলা।
ফুলের মালা দোলে গলে,
পুলক লাগে চরণতলে
কাঁচা নবীন ঘাসে ;
এসো আমার আপন ঘরে,
বসো আমার আসন 'পরে,
লহ আমায় পাশে। [১২]

আবার অন্যত্র :

আমারে দিই তোমার হাতে
নূতন করে নূতন প্রাতে।
দিনে দিনেই ফুল যে ফোটে,
তেমনি করেই ফুটে ওঠে
জীবন তোমার আঙিনাতে
নূতন করে নূতন প্রাতে। [৭৭]

ইতিপূর্বে একাধিকস্থানে একাধিকবার দেখাইয়াছি যে, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস প্রেম দূরে নহেন, দূর যাঁহাকে ভাবি, আপন হতেই তিনি কাছে আসেন, নাম ধরিয়া ডাকেন, ঘুমে জাগরণে নিত্যনব পুলক দান করেন—"খুঁজি যারে···সে-ই আমারে যাচে"।

আমার আমির মধ্যেই আছেন তিনি। আমির সংকীর্ণ প্রেম-বোধ হইতেই ইঁহার উত্থান, আত্মোপলব্ধির বিমল ঔদার্যে ইঁহার পূর্ণাবির্ভাব। সামান্যতম কামনা বাসনা হইতেই একটু একটু করিয়া, মেঘের অন্ধকার ভেদ করিয়া চন্দ্রের মতো, ইনি দেখা দেন, 'স্বপন দেখে চমকে' উঠি, কিন্তু 'অন্যমনে' নানা বিষয়ান্তরে থাকি বলিয়া ইনি 'সঙ্গোপনেই' রহিয়া যান। তাহার পর জীবনের ক্রমবিকাশের মহিমায় মন যখন ক্ষুদ্র বিষয় হইতে বৃহতের পথে চলিতে থাকে, অন্তর দুলিয়া উঠে অবারিত আনন্দে, অজস্র বসন্তের মন্দ মধুর গন্ধে উঠি মাতিয়া। তখন—

ওগো সেই সুগন্ধে ফিরায় উদাসিয়া
আমায় দেশে দেশান্তে।
যেন সন্ধানে তার উঠে নিশ্বাসিয়া
ভুবন নবীন বসন্তে।
কে জানিত দূরে তো নেই সে,
আমারি গো আমারি সেই যে,
এ মাধুরী ফুটেছে হায় রে
আমার হৃদয় উপবনে। [১৭]

মানুষের মধ্যে প্রেমের আবির্ভাবের বাণী বহু রূপকের সাহায্যই কবিগুরু প্রকাশ করিয়াছেন। দার্শনিক বলিয়াছেন, ঈশ্বরের প্রেমের ক্ষেত্র হইতেছে জীবাত্মা; কবির রচনার মধ্যে তাহারি প্রতিধ্বনি বারংবার শুনা যাইতেছে। কবির কল্পনা এই: মানুষের হৃদয়ে তিনি আসেন, কেন না, না আসিয়া তাঁহার তৃপ্তি নাই। অসীম ধন আছে তাঁহার, এ-কথা সত্য, কিন্তু মানুষের হৃদয় হইতে 'কণা-কণা' প্রেম লইয়াই তাঁহার পরমানন্দ। স্থিতির মধ্যে নিষ্ক্রিয় হইয়া তিনি তাই থাকেন না, 'রথ' হইতে নামিয়া আসেন 'ধূলাপথে' —মানুষের সঙ্গে করেন প্রেম। দীন ভিক্ষুকের মতই তিনি মানুষের হৃদয় চাহেন। প্রেমের মহিমায় মানুষ যেন দাতা, আর স্বয়ং সেই অনন্ত মহেশ্বর প্রেমই যেন গ্রহীতা—

আমায় তুমি করবে দাতা
আপনি ভিক্ষু হবে,
বিশ্বভুবন মাতল যে তাই
হাসির কলরবে।

তুমি রইবে না ঐ রথে,
নামবে ধূলাপথে,
যুগযুগান্ত আমার সাথে
চলবে হেঁটে হেঁটে ॥ [৬৩]

প্রেম মানুষের সহিত আনন্দ-গতি-রঙ্গে সমব্যথী ও সমসাথী হইয়া চলিয়াছেন। ইঁনি সঙ্গে সঙ্গে আছেন বলিয়াই জীবন মধুর, প্রকৃতি মনোরমা। প্রেমকে যাহারা অবিশ্বাস করে, তাহারা একবার প্রকৃতির বিচিত্র রূপের দিকে চাহিয়া দেখুক, দক্ষিণ সমীরণের গোপনবাণী শুনুক, বুঝিবে প্রেম আছে কিনা। [৭১ ও ৮০নং গান দুইটিও দেখুন] প্রেম নাই? আকাশ তবে এত গানে গানে ভরা কেন? আকাশ এমনতর রহস্যময় চাহনিতে মুখের পানে কেন থাকে চাহিয়া? তারকার ইঙ্গিতে, পুষ্পের সৌন্দর্যে কেন এত রহস্য? কেন ক্ষণে ক্ষণে অসীম ভাবাবেগে হৃদয় উঠে দুলিয়া?

তবে ক্ষণে ক্ষণে কেন
আমার হৃদয় পাগল হেন?
তরী সেই সাগরে ভাসায়, যাহার
কূল সে নাহি জানে? [৪২]

প্রকৃতির রূপতরঙ্গে ভাসাইতে যাই ভাবের তরী, পাগল হৃদয় ইহাতে যেন তৃপ্ত নহে; রূপতরঙ্গের টান কাটাইয়া সে তরী লইয়া চলে অরূপের অকূল গভীরে। যাহা দেখি তাহা নয়, যাহা দেখি না তাহাই তখন যেন দেখিতে থাকি। তবে কি এই কথাই সত্য যে, যাহার মূল পাই না তাহার আভাস আনে বলিয়াই কূলের মূল্য, রূপের মূল্য?

বস্তুতঃ প্রকৃতি প্রেমদায়িনী কেবল মাত্র বাহ্য রূপের ঔজ্জ্বল্যের জন্যই নহে, অলোক অরূপের অতল মহিমার জন্যও বটে। কিন্তু এই তত্ত্বানন্দ বুঝে কে? যে-মনে প্রেম জাগিয়াছে, সেই মনই এই তত্ত্বানন্দ বুঝিতে পারে।

প্রকৃতি সুন্দরী, প্রকৃতি রহস্যময়ী, প্রাণের মধ্যে প্রেম আছে বলিয়াই। [এই প্রসঙ্গে 'বলাকার' ১৭নং কবিতাটি দেখুন] দার্শনিকের ভাষায়—প্রেমাশ্রিতা বলিয়াই প্রকৃতি মায়া নহে, সত্য। প্রকৃতির রূপে অনুভব করি প্রেমেরই প্রেম। প্রেমই চক্ষুর চক্ষু, হৃদয়ের হৃদয়। ইহারই দৃষ্টিতে দেখি বলিয়া জগৎকে মনে হয় উৎসবোজ্জল। মনে হয় বিশ্বাকাশের অনন্ত আলো যেন আমাকেই উজ্জল করিবে বলিয়া জাগিতেছে।

এত আলো জ্বালিয়েছ এই গগনে
কী উৎসবের লগনে।
সব আলোটি কেমন করে
ফেলো আমার মুখের 'পরে,
আপনি থাকো আলোর পিছনে।

প্রকৃতির রূপে কত আলো, আকাশে কত আলো, অবারিত কত আলোর ঐশ্বর্যে আমাকে তুমি কত ভাবেই না দীপ্যমান করিয়া সূর্যসুন্দর করিয়া তুলিতেছে। অথচ কী বিচিত্র, এত করো, কিন্তু নিজে তো কিছু চাও না, নাম চাহ না, প্রশংসা চাহ না, অহরহঃ নেপথ্যেই তুমি রহিয়া যাও। কৃতজ্ঞতায় আমার হৃদয় তাই পূর্ণ হইয়া উঠে। তোমার প্রেমের কথায় উঠি পঞ্চমুখ হইয়া। আমি যে কিছুই নহি—তোমার মহিমাতেই আমি যে আমি, এই কথাটিই জানাইতে চাহি বিশ্বলোকের ঘরে ঘরে।

প্রেমটি যেদিন জ্বালি হৃদয়-গগনে
কী উৎসবের লগনে।
সব আলো তার কেমন করে
পড়ে তোমার মুখের 'পরে,
আপনি পড়ি আলোর পিছনে। [৬৬]

গীতিমাল্যের এই সুন্দর গানটির মধ্যে রাবীন্দ্রিক প্রেমতত্ত্ব অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। প্রেম জাগিলে একদিকে যেমন অনন্ত আলোর ঐশ্বর্যে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠি, অপরদিকে তেমনি বিনয়-ধীর নম্রতার সৌন্দর্যে উজ্জ্বল হইয়া, অহংকে নয়, আত্মাকে অর্থাৎ প্রেমকেই, প্রকাশ করিতে থাকি। প্রেমের উদ্বোধনে প্রকৃতির সমস্ত রূপ ও আলোর আনন্দ যখন আমিতেই কেন্দ্রস্থ হইয়া যায়, তখন জীবনে আর 'আমি' প্রকাশ পায় না—'প্রেম'ই প্রকাশ পাইতে থাকে বাক্যে, ব্যবহারে, শয়নে, স্বপনে। 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের একস্থানে এই তত্ত্বটিই রবীন্দ্রনাথ নিম্নলিখিত ভাবে বুঝাইয়াছেন :

"নিজেকে যতই দীন বলে জানব তাঁর প্রেমকে ততই বড়ো করে বুঝব। তাঁর প্রেমের ঐশ্বর্যের উপলব্ধিতে তাঁর প্রেমকেই অনন্ত ব'লে জানব, নিজেকে বড়ো ক'রে দাঁড়াব না। জ্ঞান পেলে নিজেকে জ্ঞানী ব'লে গর্ব হয় কিন্তু প্রেম পেলে নিজেকে অধম জেনেও আনন্দ হয়। পাত্র যতই গভীররূপে শূন্য হয়, সুধারসে ভরে উঠলে ততই সে বেশি করে পূর্ণ হয়। এই জন্যে প্রেম যখন লাভ করি তখন নিজেকে বড়ো ক'রে জানাবার কোনো ইচ্ছাই হয় না—বরঞ্চ নিজের অত্যন্ত দীনতা নিজেকে অত্যন্ত সুখ দেয়—তখন তাঁর লীলার ভিতরকার একটি মস্ত বিরোধের সার্থকতা বুঝতে পারি এবং সেই বিরোধকে স্বীকার করে আনন্দের সঙ্গে বলতে পারি যে, জগতে আমি যতই ক্ষুদ্র, যতই দীন দুর্বল, নিজের আমি-নিকেতনে তাঁর প্রেমের দ্বারা আমি ততই পরিপূর্ণ, ততই কৃতার্থ। আমি অনন্ত ভাবে দীন বলেই দুর্বল বলেই, তাঁর অনন্ত প্রেমের দ্বারা ধন্য করছি।"

কে গো অন্তরতর সে?
আমার চেতনা আমার বেদনা
তারি সুগভীর পরশে।

আঁখিতে আমার বুলায় মন্ত্র,
বাজায় হৃদয়বীণার তন্ত্র,
কত আনন্দে জাগায় ছন্দ
কত সুখে দুখে হরষে। [২২]

বস্তুদৃষ্টিতে জীবনে limitation আছে প্রভৃত, কিন্তু ভাবের দৃষ্টিতে, প্রেমের দৃষ্টিতে এতটুকুও নাই, কারণ অন্তরতর অনন্তদেব জীবনের মধ্যে তো আছেন অহরহঃ বিরাজমান। এই যে বিশ্বাস, এই যে উপলব্ধি—ইহাই বৃহৎ জীবনের উপলব্ধি, অখণ্ড জীবনের উপলব্ধি। বস্তুত বৃহতের মধ্যে নিজেকে ন্যস্ত করিয়া ধন্যই শুধু হই না, অপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও পূর্ণ হইয়া যাই। তখন কেবল আনন্দ, আনন্দ, আনন্দ। তখন ভয় কোথায়?

"ভয় তোমার কোথায়? যেখানে আধি-ব্যাধি জরা-মৃত্যু বিচ্ছেদ-মিলন, যেখানে আনাগোনা, যেখানে সুখদুঃখ। আত্মাকে কেবলি যদি সেই বাহিরের সংসারেই দেখো, যদি তাকে কেবলি কার্য থেকে কার্যান্তরে, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরেই উপলব্ধি করতে থাকো, তাকে বিচিত্রের সঙ্গে, চঞ্চলের সঙ্গেই একেবারে জড়িত, মিশ্রিত করে এক করে জানো তাহলেই তাকে মৃত্যুর দ্বারা বেষ্টিত দেখে কেবলি শোক করতে থাকবে, যা সত্য নয় স্থায়ী নয়, তাকেই আত্মার সঙ্গে জড়িত ক'রে সত্য ব'লে, স্থায়ী বলে ভ্রম করবে এবং শেষকালে সে সমস্ত যখন সংসারের নিয়মে খসে পড়তে থাকবে তখন মনে হবে আত্মারই ক্ষয় হচ্ছে, বিনাশ হচ্ছে— এমনি করে বারম্বার শোকে, নৈরাশ্যে দগ্ধ হোতে থাকবে। সংসারকেই তুমি ইচ্ছা ক'রে বড়ো পদ দেওয়াতে সংসারদত্ত সেই জোরে তোমার আত্মাকে পদে পদে অভিভূত, পরাস্ত করে দেবে। কিন্তু আত্মাকে অন্তরধামে নিত্যের মধ্যে, ব্রহ্মের মধ্যে দেখো তাহোলেই হর্ষশোকের সমস্ত জোর চলে যাবে—তাহোলে ক্ষতিতে, নিন্দাতে, পীড়াতে, মৃত্যুতে কিসেই বা ভয়? জয়ী, আত্মা জয়ী। আত্মা ক্ষণিক সংসারের দাসানুদাস নয়। আত্মা অনন্তে অমরতায় প্রতিষ্ঠিত—আত্মায় ব্রহ্মের আনন্দ আবির্ভূত—সেইজন্য আত্মাকে যাঁরা সত্যরূপে জানেন তাঁরা ব্রহ্মের আনন্দকে জানেন এবং ব্রহ্মের আনন্দকে যাঁরা জানেন তাঁরা 'ন বিভেতি কদাচন'।

'পরমে ব্রহ্মণি যোজিতচিত্তঃ
নন্দতি নন্দতি নন্দত্যেব'।" [নিত্যধাম, শান্তিনিকেতন-১]

পরম ব্রহ্মে অর্থাৎ পরম প্রেমে "যোজিতচিত্ত" হইয়া জীবনযাপন করিতে পারিলে নন্দিত হইব, নন্দিত হইব, নন্দিত হইব।

তখন তোমারি সৌন্দর্যছবি,
ওগো কবি,
আমায় পড়বে আঁকা—

তখন বিস্ময়ের রবে না সীমা
ঐ মহিমা
আর যাবে না ঢাকা ॥
তখন তোমারি প্রসন্ন হাসি
পড়বে আসি
নবজীবন 'পরে।
তখন আনন্দ-অমৃতে তব
ধন্য হব
চিরদিনের তরে ॥ [৫১]

রবীন্দ্রনাথের গীতিমাল্যের প্রতিটি গানে এই নন্দিত হওয়ার, 'আনন্দ-অমৃতে ধন্য' হওয়ার প্রেরণা ছন্দে ছন্দে ঝংকৃত হইয়াছে। কিন্তু আবার একবার বলিয়া রাখা ভালো—আনন্দ-অমৃতে ধন্য হইয়া প্রেমে যোজিতচিত্ত হইয়া নিভৃত নৈষ্কর্ম্যের নেশায় বুঁদ হইয়া থাকার বাণী রবীন্দ্রশাস্ত্রে নাই। প্রেম নিত্যকর্ম ও নিত্যগতির প্রেরণানন্দ। প্রেমের মধ্যে আপনাকে যুক্ত করিয়া দেখিলেই মুক্ত হয় মন। বিশেষ হইতে অশেষের অনন্ত বৈচিত্র্যে এবং বৈচিত্র্য হইতে অনন্ত একের মাহাত্ম্যে আত্মদর্শন তখন হয়-ই হয়; তখন জ্ঞানে, কর্মে, সেবায়, শক্তিতে নিত্য প্রস্তুত রহিয়া 'সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা' জীবন-সাধনায় হইতেই হয় অগ্রসর। প্রেমগত জীবাত্মার প্রার্থনা তাই :

নেবো সকল বিশ্ব
দাও সে প্রবল প্রাণ,
করবো আমায় নিঃস্ব
দাও সে প্রেমের দান ॥
যাবো তোমার সাথে
দাও সে দখিন হস্ত,
লড়বো তোমার রণে
দাও সে তোমার অস্ত্র ॥
জাগবো তোমার সত্যে
দাও সেই আহ্বান,
ছাড়বো সুখের দাস্য
দাও দাও কল্যাণ ॥ [৫০]

'সুখ সুখ' করিয়া ব্যক্তিগত সুখলিপ্সাকেই প্রবল করিয়া তুলিব না; তোমার সত্যে যদি জাগিতে চাই, বিশ্বের হইতেই হইবে আমাকে; এই হওয়াতেই কল্যাণ। এই কল্যাণ-বোধের ক্রমবিকাশে প্রেমেরই ক্রমবিকাশ।

কিন্তু এই কল্যাণ কি কেবলমাত্র বিশুষ্ক নীতিকথা নহে ? রবীন্দ্র শাস্ত্রালোচনায় এই প্রশ্নটা, আমি মনে করি, একান্তভাবেই অর্থহীন এবং অপ্রাসঙ্গিক। প্রেমহীন কল্যাণকর্ম বিশুষ্ক নীতিকথা হইতে পারে, কিন্তু বিদগ্ধ রসিকমণ্ডলী অবশ্যই অবগত আছেন যে, রবীন্দ্র-কল্পিত কল্যাণ প্রেমবিহীন কদাচ নহে। প্রেমের স্পর্শে কল্যাণবোধও হইয়া উঠিবে উন্নত রসবোধ, অনন্ত জীবনবোধ। তা' যদি না হইল, তবে কল্যাণ কল্যাণই নয়, তা' এক প্রকার বন্ধন। বন্ধনে আনন্দ নাই, জীবন নাই ; আমাকে এমন কল্যাণ দাও প্রভু, যাহাতে মুক্তির আস্বাদ পাই, জীবনের আস্বাদ পাই।

'দাও, দাও কল্যাণ'। গূঢ়ার্থ এই : আমাকে এমনি করিয়া দাও, যেন আনন্দভরে কল্যাণকর্মে হই নিযুক্ত। জোর করিয়া আমাকে দিয়া যাহা করানো হয়, তাহাতে আমি মুক্তি অনুভব করি না, অনুভব করি বন্ধন—তাই প্রাণ হাঁফাইয়া উঠে ; ফলে কর্ম হইতে মুক্তি পাইবার জন্য একান্তভাবেই ব্যস্ত হইয়া উঠি, কর্মত্যাগের মন্ত্রে অর্থহীনভাবে মন ধাবিত হয়। আনন্দভরে ইচ্ছাভরে, ভালোবাসার আবেগে যে কর্ম করিতে চাই, আমাকে তাহা বদ্ধ করে না, পরন্তু মুক্তই তো করে। "আনন্দ থেকে যা করি সে তো বন্ধন নয়—বস্তুত সেই কর্মই মুক্তি।" [কর্ম, শান্তিনিকেতন-১] সেই আনন্দ-কর্মই কল্যাণকর্ম ; এই কল্যাণকর্মে নিত্য নিয়োজিত থাকাই প্রেমের ধর্ম, ব্যক্তিগত সুখের দাসানুদাস হওয়া তাহার ধর্ম নহে। অতএব প্রেম যখন চাহি, যখন প্রেমের সুরে গাহিতে চাহি গান, শুনিতে চাহি প্রেমের বাণী, করিতে চাহি প্রেমের সেবা, দেখিতে চাহি প্রেমের ভাবমূর্তি, সহিতে চাহি প্রেমেরি আঘাত, বহিতে চাহি প্রেমেরি জয়কেতন,— মোট কথা যাহা করিতে চাহি সমস্তই যখন প্রেমের জন্য এবং প্রেমের আনন্দেই করিতে চাহি, তখন ঘরে বাহিরে অহরহঃ আমাকে এমন কর্ম করিতে হইবে যাহা ব্যক্তি-সুখের অন্ধ মোহে আমাকে বন্দী করিবে না, পরন্তু বিশ্বানন্দের অনন্ত বিভূতির মধ্যে আমাকে দিবে মুক্তি। ইহাই কল্যাণ।

এই কল্যাণের কর্মরূপটি কবিগুরু 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের এক স্থানে বড় চমৎকার ভাবেই চিত্রিত করিয়াছেন। গুরুদেবের কর্মযোগের দর্শনকে যাঁহারা কবি-কল্পনাচ্ছন্ন দুর্বোধ্য বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্যে 'শান্তিনিকেতন' হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি :

"কর্মযোগের একটি লৌকিকরূপ পৃথিবীতে আমরা দেখেছি। সে হচ্ছে পতিব্রতা স্ত্রীর সংসারযাত্রা। সতী স্ত্রীর সমস্ত সংসার-কর্মের মূলে আছে স্বামীর প্রতি প্রেম ; স্বামীর প্রতি আনন্দ। এইজন্য, সংসার কর্মকে তিনি স্বামীর কর্ম জেনেই আনন্দবোধ করেন— কোনো ক্রীতদাসও তাঁর মতো এমন ক'রে কাজ করতে পারে না। এই কাজ যদি একান্ত তাঁর নিজের প্রয়োজনের কাজ হোত তাহোলে এর ভার বহন করা তাঁর পক্ষে

দুঃসাধ্য হোত। কিন্তু এই সংসারকর্ম তাঁর পক্ষে কর্মযোগ। এই কর্মের দ্বারাই তিনি স্বামীর সঙ্গে বিচিত্রভাবে মিলিত হচ্ছেন।

"আমাদের কর্মক্ষেত্র যদি এই কর্মযোগের তপোবন হয় তবে কর্ম আমাদের বন্ধন হয় না। তাহলে, সতী স্ত্রী যেমন কর্মের দ্বারাই কর্মকে উত্তীর্ণ হয়ে প্রেমকে লাভ করেন আমরাও তেমনি কর্মের দ্বারাই সংসারকে উত্তীর্ণ হয়ে—"মৃত্যুং তীর্ত্বা"—অমৃতকে লাভ করি।"

এই মুক্তিময়, কি না আনন্দময়, অমৃতময় কর্মই জীবনে কল্যাণকে করে আনয়ন। পরম শ্রেয় এই কল্যাণ, ইহাকে পাওয়াই পুরুষার্থ। কর্মহীন ভক্ত যোগী ইহাকে পাইবে না, ধর্মহীন কর্মযোগীও ইহাকে পাইবে না, ভক্তিহীন স্বার্থভোগী ইহার আভাসও পাইবে না কোনোদিন। হে প্রেম, কর্মময় ভক্তি ও ধর্মময় কর্ম করিবার নির্দেশ যখন পাইয়াছি, আত্মগত স্বার্থসুখের জন্য আত্ম-বিক্রয় আমি করিব না,

'ছাড়বো সুখের দাস্য
দাও, দাও কল্যাণ ॥'

গীতিমাল্যের আলোচনায় কল্যাণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কর্মযোগের কথা ইচ্ছা করিয়াই উত্থাপন করিয়াছি। গীতিমাল্যের সুর প্রেমের সুর এবং রাবীন্দ্রিক প্রেম বা ভক্তি যে কর্মবিহীন কল্পনা বা চিন্তাবিলাস মাত্র নহে, ইহাই আমার প্রতিপাদ্য। গীতিমাল্যে কর্মের কথা খুব স্পষ্ট করিয়া অবশ্য বলা হয় নাই, কিন্তু রবীন্দ্রকল্পিত প্রেমের ব্যঞ্জনাই যে বৃহতে রতি ও গতি এবং সর্বোপরি মানবিকতার মাহাত্ম্যপূর্ণ মহৎ কর্মপ্রেরণা—ইহা ধারণায় না রাখিলে রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতার রস সম্যক উপলব্ধি হয় বলিয়া আমি মনে করি না। গীতিমাল্যে যে কর্মের কথা আছে, তাহা আনন্দের কর্মলীলা। অমর এই গীতিগ্রন্থের একাধিক গানে আপনি দেখিবেন প্রেমের ভগবান অহরহঃ আনন্দের কর্ম করিতেছেন: প্রকৃতিকে সাজাইতেছেন অভিনব সাজে, বাজাইতেছেন অপরূপ সুরে (৩৯); বীণার সুরে তিনি আঁধার আকাশে ফুটাইতেছেন উজ্জ্বল তারকা [৬৪], বজ্রপাণির রূপে কখনো বা আবার বিদ্যুদ্দীপ্ত খড়্গ লইতেছেন হাতে [৩০], মরুপথ বাহিয়া অনাহূতের মতো আসিতেছেন মানুষের গৃহে [৯১], কখনো দেখা দিতেছেন কোমলকান্ত প্রেমিক-রূপে [৮০, ৮৩], কখনো জাগ্রত হইতেছেন ভৈরবভীষণ কঠোরোদ্ধত রুদ্ররূপে [৪১, ৪৭, ৬৯]। প্রেমাভিভাষণের এবং শাসনানুশাসনের শেষ নাই যেন কোথাও। বিচিত্র এই প্রেমের পুলকে এই যে তাঁহার নিত্য লীলা, ইহাই তো তাঁহার আনন্দকর্ম। প্রেমের এই আনন্দলীলার স্বরূপোপলব্ধি যাঁহার হইয়াছে, প্রেমের মতো তাঁহারও তাই বিশ্রাম নাই। নিত্য তাঁহার গতি, নিত্য তাঁহার নব নব কর্ম, নিত্য তাঁহার আত্মসাধনা, নিত্য প্রার্থনা, নিত্য সোহাগ, নিত্য বিরাগ। প্রেমের ভগবান তাঁহার মধ্যে যতটুকু আলো ফেলিয়াছেন, ততটুকুর ঔজ্জ্বল্যেই আত্মস্বরূপকে দেখিবার, জানিবার, উপলব্ধি করিবার সাধনায় তাঁহার

যেন বিরাম নাই [৮৪], দুঃখ, সুখ, আশা, নৈরাশ্য, মান, অভিমান, দ্বন্দ্ব, সংশয় প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া অহরহঃই তিনি ছুটিয়া চলেন লীলাময়ের আনন্দ অভিসারে :

পরাণ আমার বধূর বেশে চলে
চিরস্বয়ম্বরা। [৫২]

কি—

আমার চিরজীবনেরে
লও গো তুমি লও গো কেড়ে। [৯]

কি—

ভরিয়ে জগৎ লক্ষ ধারায়
"আছ-আছ"র স্রোত বহে যায়
"কই তুমি কই" এই কাঁদনের
নয়ন-জলে গলে। [১৪]

কি—

আজকে জীবন-সমর্পণের গান
গাব নীরব অবসরে। [২০]

প্রভৃতি পংক্তির মধ্যে মানস-গতি ও প্রস্তুতির ব্যঞ্জনা উপলব্ধি করিতেছি। প্রেমে প্রেম হইতে হইলে এই গতির একান্ত প্রয়োজন। ইহা না হইলে জীবনে প্রেম অসার্থক— সেই কারণে বিশ্বকর্মও অসম্ভব। ধ্যানের, জ্ঞানের কর্মের ও ভাবের মধ্য দিয়া পরিপূর্ণভাবে তাঁহাকে জানিতে চাই, তাই এই নিত্য গতি, নিত্য প্রস্তুতি; পরিপূর্ণভাবে তাঁহাকে আবার কিছুতেই জানিতেও পারি না, তাই এই নিত্য গতি, নিত্য প্রস্তুতি।

আপনাকে এই জানা আমার
ফুরাবে না।
এই জানারি সঙ্গে সঙ্গে
তোমায় চেনা।
কত জনম-মরণেতে
তোমারি ঐ চরণেতে
আপনাকে যে দেবো তবু
বাড়বে দেনা॥ [৮৪]

জীবনে জীবনে স্বরূপোপলব্ধির মধ্য দিয়া প্রেমের মহিমা আমি জানিতে চাহিব অর্থাৎ মানবিকতার মাহাত্ম্যবোধে উদ্দীপ্ত হইয়া অহরহঃ করিব জীবন-সাধনা; যতো করিব, ততোই নব নব ভাবের ঐশ্বর্যদানে প্রেম আমাকে করিবেন আনন্দোজ্জ্বল। আনন্দভরে যা' পাইয়াছি অর্থাৎ যা' হইয়াছি, উজাড় করিয়া চাহিব দিতে, কিন্তু দেওয়া শেষ হইতে না

হইতে দেখিব, যতো দিয়াছি পাইয়াছি তাহার কোটিগুণ যেন। আনন্দের দান যতো লইব, আনন্দের ঋণ ততো বাড়িবে, আনন্দভরে ততোই পরিশোধ করিতে চলিব; যতো চলিব ততো 'হইব'—যতো হইব ততোই চলিব, শেষ নাই এই চলার, এই লীলার।

এই লীলা-কথার আনন্দই তো গীতিমাল্যের গানগুলিতে সহজ সরল ছন্দে হইয়াছে ঝংকৃত। দুর্বোধ্য বলিয়া, 'মিস্টিক' বলিয়া অথবা কবিগুরুর রচনাবলীর যথার্থ বৈশিষ্ট্য ইহাতে নাই বলিয়া যাঁহাদের ধারণা হইয়াছে, তাঁহাদের রসবোধে সন্দেহ আমি করিব না, কারণ কবিগুরুর প্রেমদর্শন সম্পর্কে যথার্থভাবে অবহিত হইয়া আবার যখন গীতিমাল্য তাঁহারা পাঠ করিবেন, আমি জানি, মধুর এই আনন্দ-সুন্দর ছন্দোময় গানগুলির মধ্যে রস-স্বরূপের অনন্ত সৌন্দর্য তাঁহারা আস্বাদন করিবেনই। যে কথাগুলিকে তাঁহারা নিতান্ত গতানুগতিক ভাগবত-কথা মাত্র মনে করিয়াছেন, সেই কথাগুলির মধ্যেই শুনিতে থাকিবেন চিরন্তন জীবনবাণীর বসন্তনবীন আনন্দঝংকার। শিল্পী-হৃদয়ের যে অনির্বাণ প্রেমসূর্য লোকায়ত ব্যথাবেদনা ও প্রণয়-বিরহের মেঘাবরণে আত্মগোপন করিয়া আছে, গীতিমাল্যে তাহারি আনন্দচ্ছবি যখন নয়নগোচর অর্থাৎ হৃদয়গোচর হইবে, তখন অকস্মাৎ জ্যোতির্ময় তাহার স্বপ্নসুষমার দিব্য সৌন্দর্য অযুত বসন্তের লাবণ্য বিস্তার করিবে।...গীতিমাল্য উপেক্ষার কাব্য নহে, ইহা অমর কাব্য; দুর্বোধ্য নহে, মিস্টিক নহে, একান্তভাবেই রাবীন্দ্রিক—এবং ঠিক এই কারণেই জীবন-নিরপেক্ষ, বিশুদ্ধ শাস্ত্রসম্মত কোনো প্রাচীন তত্ত্বগর্ভ কথা ইহাতে নাই—রবীন্দ্রনাথ, বলাই বাহুল্য, প্রাচীন তত্ত্বগর্ভ দর্শনানুসারী কোনো কথা, কোনো ভাবে কখনও বলিতে চাহেন নাই। রাবীন্দ্রিক প্রেমের স্বরূপ যথার্থভাবে গ্রহণ করিলেই বুঝা যাইবে, মানসী-চিত্রা অথবা বলাকা-মহুয়ার কবিই গীতিমাল্য-গীতালি রচনা করিয়াছেন; বুঝা যাইবে, কবিকাহিনী হইতে মানসী, মানসী হইতে গীতিমাল্য এবং গীতিমাল্য হইতে শেষ লেখা পর্যন্ত সমস্ত রচনাই মর্মমোহন প্রেমসুন্দরেরই ক্রমপ্রকাশ্য শিল্পচ্ছবি।

রবীন্দ্রনাথের প্রেম, বহুবার বলিয়াছি, কোনো ধর্মসংস্কারে আচ্ছন্ন প্রেম নহে। ড. রাধাকৃষ্ণনও তাঁহার 'রবীন্দ্রদর্শন' নামক গ্রন্থে এই মত সমর্থন করিয়াছেন। বাহ্য দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের প্রেমদর্শন খৃষ্টধর্ম দ্বারা প্রভাবিত বলিয়া মনে হইতে পারে। Rev. Mr. Saunders, Rev. Mr. Urquart, Mr. Edward J. Thompson প্রভৃতি পণ্ডিতগণের ধারণা এই, রবীন্দ্রপ্রেম খৃষ্টধর্ম হইতেই উন্মেষিত হইয়াছে। বিশেষ কোনো দর্শনশাখার সহিত রবীন্দ্রদর্শনকে কোনোমতে মিলাইয়া দিয়া বুঝিবার বা বুঝাইবার চেষ্টা একাধিক দেশীয় পণ্ডিতেও করিয়াছেন। গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য পাঠে অনেকের ধারণা হইয়াছে যে, রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবধর্ম দ্বারাই প্রভাবিত হইয়াছিলেন। এই সমস্ত ধারণার মূলে সত্য নাই। রবীন্দ্রনাথ কোনো বিশেষ ধর্ম বা দর্শন প্রচারে কাব্য লিখেন নাই—বিশেষ কোনো প্রচলিত

তত্ত্বপ্রচার তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ও নীতিবিরুদ্ধই ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার নিজস্ব কোনো তত্ত্ববিশ্বাস ছিল না—এমন কেহ মনে করিবেন না। রাধাকৃষ্ণন্ যে বলিয়াছেন, "We do not find any systematic exposition of his philosophy of life in any of his writings." [*The Philosophy of Rabindranath*, p. 6] তাহা সত্য বটে, তবে এই হিসাবে সত্য যে, তিনি গতানুগতিক দার্শনিকদের মতো বিশেষ কোনো একটি তত্ত্বসত্যকে বা জীবনদর্শনকে প্রচলিত ন্যায়শাস্ত্রের জ্ঞানগ্রাহ্য যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠা দিতে চাহেন নাই। কিন্তু তাঁহার রচনাবলী যাঁহারা সুরু হইতে শেষ পর্যন্ত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই বলিবেন, তাঁহার নিজস্ব একটি তত্ত্বসত্য ছিলই—এবং সেই তত্ত্বসত্যটি, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "some untold mystery of unity in me" [See Introduction, *Creative Unity*] তাঁহারই অজ্ঞাতসারে ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করিয়া আশ্চর্য একটি অখণ্ড প্রেমদর্শনের প্রতিষ্ঠা দিয়াছে। রাবীন্দ্রিক এই প্রেমদর্শন অন্তরে-বাহিরে ভারতীয়ই বটে। ড. কুমারস্বামী যথার্থই বলিয়াছেন—"The work of Rabindranath is essentially Indian in sentiment and form." কিন্তু এই স্থলে একটি কথা অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে যে, রবীন্দ্র-প্রেমদর্শন পুরাতন ভারতীয় কোনো তত্ত্বশাখার পুনরাবৃত্তি মাত্র নহে; তাহা একটি নূতন ধ্যান, নূতন সৃষ্টি, নূতন কল্পনা। তাহা যদি না হইত, তবে তুকারাম, মীরাবাঈ, কবীর, দাদূ, অথবা বাইবেলের সাধু কবিদের মতো বিশুদ্ধ ভাগবত সংগীত রচনা ছাড়া, অন্য কিছু রচনায়, অর্থাৎ মানবিক প্রেম রচনায়, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের মতো তাঁহার সংস্কারে বাধিত। রবীন্দ্রনাথের প্রেম সর্বজীবনগত-সর্বআবেগগত, বিশ্বজগৎগত—অর্থাৎ তাহা বিশ্বলোক ও লোকান্তরের সর্বত্র যেমন বিরাজমান, বিশ্বপ্রকৃতি ও জীবনের সকল কেন্দ্রে যেমন অধিষ্ঠিত, সদা জনানাং হৃদয়ে যেমন সন্নিবিষ্ট; হৃদয়ের বিচিত্র আবেগ ও আনন্দানুভূতিতেও তেমনি বিকীরিত রহিয়াছে। ক্ষুদ্র হৃদয়ের অহং কামনায় তাহা আছে, মহৎ হৃদয়ের বিশুদ্ধা বাসনায় তাহাই আবার ভিন্ন রূপে বিরাজ করিতেছে, সহজস্বভাবের ভোগশক্তিকে অতিক্রম করিয়া সাধনস্বভাবের বৈরাগ্যরতিতে জাগরিত হইতেছে। এইজন্য তাঁহার পক্ষে একদিকে যেমন সংস্কার-বিহীন উন্মুক্ত মনে কামনার বিচিত্র সঙ্গীত গাওয়া সম্ভব হইয়াছে, অপরদিকে তেমনি কামনাতীত মহান প্রেম গাওয়াও অসম্ভব বা অস্বাভাবিক হয় নাই। কিন্তু একথা অবশ্যই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রবীন্দ্রনাথের কামনাময় প্রেমকে যেমন অর্বাচীন কবিবর্গের রূপমোহপ্রভাবিত কামজ প্রেমের সহিত এক করিয়া ফেলা রসসম্মত নহে, তাঁহার কামনাতীত মহান প্রেমকে তেমনি প্রাচীন সাধুসন্তদের শাস্ত্রপ্রভাবিত বিশুদ্ধ একদেশদর্শী প্রেমের সহিত এক করিয়া দেখাও ন্যায়সঙ্গত নহে। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের অতীন্দ্রিয় প্রেমের শিল্পমূর্তিও মানবিক আনন্দ-বাসনার রসসৌন্দর্যে হাস্যোদ্দীপ্ত অর্থাৎ লৌকিক কামনার বোধ দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে তাহা অনুভব করা, আস্বাদন করা,

রসিকের পক্ষে কঠিন নহে—আবার কামনাময় ইন্দ্রিয়প্রেমের মধ্যেও কেমন যেন একটি চির-চঞ্চল গতিপ্রাণ বর্তমান, অহংএর ভোগাসক্তি হইতে অহরহঃ যাহা উত্তীর্ণ হইবার ব্যাকুল প্রয়াসে অস্থির হইয়া রহিয়াছে। এই অস্থিরতাই তো কবিকে 'রাহুর প্রেম' হইতে নানা ভাবের নানা সংশয়ের নানা দ্বন্দ্বের প্রেমপথ ঘুরাইয়া সর্বপ্রেমগত সেই এক প্রেম-প্রার্থনায় টানিয়াছে :

আকাশে ধায় রবি তারা ইন্দুতে,
তোমার বিরামহারা নদীরা ধায় সিন্ধুতে,
তেমনি করে সুধাসাগর সন্ধানে,
আমার জীবনধারা নিত্য কেন ধাওয়াও না।
পাখীর জন্যে আপনি জাগাও আনন্দ,
তুমি ফুলের বক্ষে ভরিয়া দাও সুগন্ধ ;
তেমনি করে আমার হৃদয়ভিক্ষুরে
কেন দ্বারে তোমার নিত্য প্রসাদ পাওয়াও না ? [৪৩]

আবার অন্যত্র :

যে বাঁশিখানি বাজিছে তব ভবনে
সহসা তাহা শুনিব মধু পবনে।
তাকায়ে রব দ্বারের পানে,
সে তানখানি লইয়া কানে
বাজায়ে বীণা বেড়াব গান গাহি রে।
এমনি করে ঘুরিব দূরে বাহিরে ॥ [২৫]

প্রেমের জন্য এই যে গতি, স্বর্গীয় অজিতকুমার তাঁহার 'গীতিমাল্য' নামক প্রবন্ধে, ইহাকেই 'জীবনের গতি' আখ্যা দিয়াছেন। গতানুগতিক শাস্ত্রীয় ধর্মের গতি হইতে ইহা যে পৃথক অজিতকুমার সুস্পষ্ট ভাষায় তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন : "ধর্ম চিরকালই জীবনের অন্যান্য বৈচিত্র্য হইতে সরাইয়া সরাইয়া লইয়া সযত্নে সন্তর্পণে আপনাকে এককোণে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছে। জীবনের গতি একদিকে, ধর্মের গতি অন্যদিকে ; জীবনের গতি প্রবৃত্তির দিকে, ধর্মের গতি নিবৃত্তির দিকে। সেইজন্য কবি ও ভগবদ্ভক্ত—এ দুয়ের সম্মিলন দেখা যায় নাই।......পরিপূর্ণ জীবনের গান যিনি গাহিয়াছেন, তিনি যখন অধ্যাত্ম উপলব্ধির গান গাহেন, তখন এস্রাজের মূল ভাবের ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তাহার পাশাপাশি যে তারগুলি থাকে তাহারা যেমন একই অনুরণনে ঝঙ্কৃত হইতে থাকে এবং মূলতারের সঙ্গীতকে গভীরতর করিয়া দেয়, সেইরূপ অধ্যাত্মোপলব্ধির সুরের সঙ্গে জীবনের অন্যান্য রসোপলব্ধির সুর মিলিত হইয়া এক অপূর্ব অনির্বচনীয়তার সৃষ্টি করে।"

[কাব্য পরিক্রমা, পৃ. ১৫৩-৫৪]

এইজন্য রসজ্ঞ অজিতকুমার কবিগুরুর ধর্ম-সঙ্গীতগুলিকে দেশীয় বা বিদেশীয় ভক্তকবিদের ধর্ম-সঙ্গীতের সমসারে রাখিতে চাহেন নাই। বস্তুতঃ জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ জীবনগত প্রেম-বৈচিত্র্যের আনন্দ-বাণীই কাব্য-কথায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম-সঙ্গীতগুলিও জীবন-বহির্ভূত তত্ত্বসমষ্টির চিন্তাজাল মাত্র নহে, পার্থিব জীবনেরই অন্তর্গত অপার্থিব মহিমা-গৌরবে সেগুলি সুন্দর এবং মনোময়।

আসল কথা, বিশেষ কোনো দার্শনিক 'পথ' বা 'মত' মানার নির্দেশ পাই না রবীন্দ্রনাথে।

জানি নাই গো সাধন তোমার
বলে কারে।

—বলেন রবীন্দ্রনাথ। যে দর্শন রবীন্দ্রনাথে পাওয়া যায়, তাহা অনন্ত জীবন-সমুৎসারিত, অনুভবসিদ্ধ, সহজ-জীবনপ্রজাত।

মলয়কুসুম আপনি ফোটে,
জীবন আমার ভরে ওঠে,
দুয়ার খুলে চেয়ে দেখি
হাতের কাছে সকল পুঁজি। [৭৩]

জীবনের পথ চলিতে চলিতে কিছুই তিনি উপেক্ষা করেন নাই, ইহা যেমন সত্য, কিছুতেই তাঁহার মন ভরে নাই অর্থাৎ কিছুতেই আসক্ত হইয়া পড়িয়া থাকেন নাই, ইহাও তেমনি সত্য। এই সত্য হইতেই তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, কিছুই যেমন মিথ্যা নহে, কিছুই তেমনি আবার ধরিয়া রাখারও নহে। 'চাই' বলিয়া ছুটিয়া আসি, আবার সঙ্গে সঙ্গে 'চাইনে' বলিয়া সম্মুখে ছুটি বোধ করি এইজন্যই। এ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়? রবীন্দ্রনাথের সেই এক উত্তর : প্রেম। প্রেমে হ্যাঁ ও না-কে এক জীবনাধারে ধরিয়া রাখিয়াছে। হ্যাঁ বলার মধ্যে প্রেমের টানে থাকিতে আসা, না বলার মধ্যে এই প্রেমের টানেই (অর্থাৎ বৈরাগ্যের, কি না বৃহৎ অনুরাগের টানে) চলিতে জানা—এই দুইই তিনি জীবন হইতে জানিয়াছেন। জীবনের পথই তাঁহাকে পথ দেখাইয়াছে, এই জন্য জীবনের পথে চলিতে চলিতে যাহা পাওয়া বা হওয়া যায়, তাহাই তাঁহার কাম্য, তাঁহার উপাস্য। তাই চলাই হইতেছে জীবনের মন্ত্র, প্রেমের মন্ত্র—

পথ আমারে পথ দেখাবে,
এই জেনেছি সার। [৬২]

'মানুষের ধর্ম' নামক গ্রন্থে দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ এই পথ চলার মন্ত্রের উপরই বিশেষ জোর দিয়াছেন। তাঁহার অভিমত এই—পশুরাই বাসা পাইয়া থাকে তৃপ্ত, মানুষ পথ চলিয়াই হয় সত্য। আমির ক্ষুদ্র সীমাটুকু ছিন্ন করিয়া—আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া পলে পলে ঘুরিয়া মরার প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া নামিতেই হইবে বিশ্বজীবনের প্রশস্ত পথে, তবেই পাইব প্রেম, তবেই আপনার মধ্যে বিশ্বলোক হইবে আবির্ভূত। গীতালির সুরও তো এই :

গীতালি

আপন হতে বাহির হয়ে
বাইরে দাঁড়া,
বুকের মাঝে বিশ্বলোকের
পাবি সাড়া। (গীতালি-৭০)

এই আত্মার ম.ধ্য 'বিশ্বলোকের সাড়া' পাওয়াই তো আত্মপ্রকাশের সত্য তত্ত্ব। মানুষের স্বরূপ তো এই তত্ত্ব-সত্যে :

"যিনি সর্বভূতকে আপনারি মতো দেখেন এবং আত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দেখেন তিনি প্রচ্ছন্ন থাকেন না। আপনাকে আপনাতেই যে বদ্ধ করে সে থাকে লুপ্ত। আপনাকে সকলের মধ্যে যে উপলব্ধি করে সেই হয় প্রকাশিত।" [শিক্ষার মিলন, কালান্তর]

'সকলের মধ্যে' নিজেকে উপলব্ধি করিতে হইলে ব্যক্তিগত মুক্তির ধর্মসাধন ত্যাগ করিয়া বিশ্বগত প্রেমের কর্মসাধন-পথে জীবনসাধককে আসিতেই হইবে। ব্যক্তিগত মুক্তি-বাসনার মধ্যে কর্মবিহীন আত্মরতির যে আনন্দ আছে, চলমান জীবনের গতিময় স্পন্দন তাহাতে নাই বলিয়া জীবনকে তাহা বাঁধিয়া ফেলিবার অবসর পায়। আত্মসুখের এই মধুর বাঁধন চলার পথের অন্তরায়। কবির তাই ইহা কাম্য নহে অর্থাৎ তিনি মুক্তি চাহেন না, চাহেন গতি :

হবে না তোর স্বর্গসাধন,—
সেখানে যে মধুর বেশে
ফাঁদ পেতে রয় সুখের বাঁধন। [৪৪]

স্বর্গের সাধনা অর্থাৎ অচপল ও অনির্বাণ সুখশান্তির সাধনা জীবনকে করে গতিবিহীন বন্দী, সুতরাং ইহার দ্বারা প্রেমকে জানা সম্ভব নহে। যুগে যুগে প্রেম জাগিয়া থাকেন জীবাত্মাকে নানাত্বের পথে একের ইঙ্গিত প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে। মানুষ যেখানে থামে, প্রেমকে সে সেখানে জানে না ; যেখানে চলে, সেখানেই জানে প্রেমকে। বিশেষের মধ্যে থাকিয়া যাওয়া নহে, বিশেষকে উপেক্ষা না করিয়াও বিশ্ববিশেষে তথা অশেষে নিত্য অগ্রসর হওয়াই প্রেমের স্বরূপ। এই স্বরূপকে চিনিবার পথে কে সাহায্য করে ? রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'মৃত্যু'। মৃত্যু, রবীন্দ্রশাস্ত্রে, অমৃতের মতই মঙ্গলময়। মৃত্যু আছে বলিয়াই জীবনের পক্ষে চলাটা হইয়াছে সহজ, সরল ও স্বাভাবিক।

প্রেম বলে যে, "যুগে যুগে
তোমার লাগি আছি জেগে"।
মরণ বলে, "আমি তোমার
জীবন-তরী বাই"। [৬৫]

জীবন-তরীর মাঝি হইতেছে 'মরণ',—মাঝিটি আছে বলিয়াই কূল হইতে কূলে বহিয়া চলে জীবনের তরী। অর্থাৎ মৃত্যুই জীবনের গতি, বৈচিত্র্যের প্রাণস্পন্দন, নূতনের জন্মদাতা। জীবন চলে এই মৃত্যুর আবেগে। 'বলাকায়' দেখিবেন :

সহস্রধারায় ছোটে দুরন্ত জীবন নির্ঝরিণী
মরণের বাজায়ে কিঙ্কিনী। [বলাকা-৬]

বস্তুতঃ রবীন্দ্রশাস্ত্রে মৃত্যুর অভূতপূর্ব মর্যাদা। [গীতালির ৬৮নং গানটিও দেখুন]। প্রেমের সহিত ইহাকে যুক্ত করিয়াই দেখিতে হয়। রবীন্দ্রশাস্ত্র হইতে মৃত্যুকে বাদ দিলে প্রেম হারাইবে গতি, হারাইবে বৈচিত্র্যের আনন্দ আস্বাদন। বিশেষ কোনো আসক্তিতে মানুষ যখন নিমজ্জিত হইয়া থাকে, মৃত্যু আসিয়া কোনো না কোনো উপায়ে আঘাতে-সংঘাতে, শোকে-দুঃখে আসক্তির তন্দ্রাঘোর দেয় ভাঙিয়া। পলে পলে নানাভাবে, নানারূপে মৃত্যু হানা দেয় মানুষের জীবনে : জীবন তাই পথ চলার মন্ত্রকে জানে, ভাব হইতে ভাবান্তরে, জ্ঞান হইতে জ্ঞানান্তরে বহিয়া চলিবার লাভ করে গৌরব। এক জীবনের সুখমোহে বা আসক্তির অন্ধ আনন্দে বন্দী হইয়া, গতিবিহীন হইয়া মানুষকে যদি থাকিতে হইত, কী দুর্বহ হইত বৈচিত্র্যবিহীন এই নির্বেগ স্থবির জীবন? এক জীবনের আনন্দ কাড়িয়া ভিন্ন জীবনের আনন্দ-অভিজ্ঞতায় নিয়ত যে মানুষকে ঠেলিয়া দেওয়া হইতেছে, নব নব ভাবের আনন্দে বিচিত্র হইয়া উঠিতেছে মানুষের সর্বজগদ্‌গত বিশ্বজীবন, ইহার মূলে আছে মৃত্যুর আনন্দগতির নিত্য লীলা। সংসার সমুদ্রে জীবনতরী বাহিতেছে মৃত্যু—প্রেমের সহকর্মিতা আছে এই মৃত্যুতে। মৃত্যু প্রেমেরি একটি প্রধান বিভূতি।

মরণ বলে আমি তোমার
জীবন-তরী বাই।

প্রেম যেখানে জীবনকে ভর করিয়াছে, সেখানেই জীবনকে নাড়া দিয়াছে অজস্র সহস্র মৃত্যু ; তাইতো সে জীবনের বৈচিত্র্য আছে, গতি আছে, আবার গতি আছে বলিয়াই অন্ধকারের উৎস হইতে উৎসারিত আলোর রহস্যে যাইতে চাহিয়াছে মন, প্রেমের যতটুকু পাওয়া গিয়াছে, ততটুকুতে মন ভরে নাই, 'আরো চাই' বলিয়া নিত্য পথ-চলার বাসনায় উদ্দীপ্ত হইতে হইয়াছে।

যত আশা পথের আশা,
পথে যেতেই ভালোবাসা,

পথে চলার নিত্য রসে
দিনে দিনে জীবন ওঠে মাতি। [৮৩]

এই পথ-চলার মন্ত্রই 'ফাল্গুনীর' বসন্ত-আনন্দে হইয়াছে গুঞ্জরিত, 'বলাকার' দীপ্ত প্রাণের হর্ষে দীপক তানে উঠিয়াছে ধ্বনিয়া।···ইতিপূর্বে 'প্রকৃতি' নামক অধ্যায়ে বসন্ত-সঙ্গীতগুলির আলোচনায় 'ফাল্গুনীর' চলার মন্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছি। তাহাতে আমি এই কথাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, মানুষ চলিতে জানে বলিয়াই নিত্য নূতনকে লাভ করে; বিশ্ববিধ বিচিত্র নূতনের অন্তরে বিরাজ করিতেছেন চির নবীন সেই প্রেম : ইঁহারি আকর্ষণে নূতন হইতে নূতনে নবীনের সন্ধানে চলিতেছে বিশ্বজগতের প্রাণ-যৌবন। 'বলাকার' সুরও তো ইহাই; শুধু আঙ্গিকের অভিনবত্বে ও রচনারীতির নূতনতায় বলাকাকে স্বতন্ত্র সুরের কাব্য বলিয়া অনেকের মনে হইতেছে। গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালির মর্মকথা, দর্শন-তত্ত্বের দৃষ্টিতে ফাল্গুনী ও বলাকার মর্মকথা হইতে পৃথক নহে। কবিগুরুর যে সমস্ত কাব্য ও গানের মধ্যে মনীষী সমালোচকবৃন্দ ভগবদ্ভক্তির আতিশয্য লক্ষ্য করিয়াছেন, সেই সমস্ত কাব্যের অন্তরে কবি-মানসের যে দর্শন আমি অনুধাবন করিয়াছি, তাহা আধ্যাত্মিক ভাবানন্দের অমিতাবেগে উদ্বেল, তাহাতে অবশ্যই কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু কবির এই আধ্যাত্মিকতা তো জীবন হইতে, সংসার হইতে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিবার আধ্যাত্মিকতা নহে। সর্বব্যাপীকে সকল দিক হইতে লাভ করিয়া সর্বত্র প্রবেশ করার আনন্দ-চেতনাই কি রাবীন্দ্রিক আধ্যাত্মিকতা নহে? এই আধ্যাত্মিকতা কি 'বলাকায়' নাই?

"তৃণ থেকে মানুষ পর্যন্ত"—রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, "জগতে যেখানেই আমার চিত্ত উদাসীন সেইখানেই আমাদের আধ্যাত্মিকতা সীমাবদ্ধ হয়েছে, এটি জানতে হবে। আমাদের চেতনা আমাদের আত্মা যখন সর্বত্র প্রসারিত হয় তখন জগতের সমস্ত সত্তাকে আমাদের সত্তা দ্বারাই অনুভব করি, ইন্দ্রিয় দ্বারা নয়, বুদ্ধি দ্বারা নয়, বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারা নয়। সেই পরিপূর্ণ অনুভূতি একটি আশ্চর্য ব্যাপার। এই সমুখের গাছটিকেও যদি সেই সত্তারূপে গভীররূপে অনুভব করি তবে যে আমার সমস্ত সত্তা আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাই দেখিনে বলে একে চোখ দিয়ে দেখবামাত্র এতে আমার কোনো প্রয়োজন নেই বলে এর সম্মুখ দিয়ে চলে যাই, এই গাছের সত্যে আমার সত্যকে জাগিয়ে তুলে আমাকে আনন্দের অধিকারী করে না। মানুষকেও আমরা আত্মা দিয়ে দেখিনে, ইন্দ্রিয় দিয়ে, যুক্তি দিয়ে, স্বার্থ দিয়ে, সংসার দিয়ে সংস্কার দিয়ে দেখি, তাকে পরিবারের মানুষ বা প্রয়োজনের মানুষ বা নিঃসম্পর্ক মানুষ বা কোনো বিশেষ শ্রেণীভুক্ত মানুষ বলেই দেখি—সুতরাং সেই সীমাতেই গিয়ে আমার পরিচয় ঠেকে যায়—সেইখানেই দরজা রুদ্ধ—তার ভিতরে আর প্রবেশ করতে পারিনে—তাকেও আত্মা বলে আমার আত্মা প্রত্যক্ষভাবে সম্ভাষণ করতে পারে না।···ধীর ব্যক্তিরা সর্বব্যাপীকে সকল দিক থেকে পেয়ে যুক্তাত্মা হয়ে সর্বত্রই প্রবেশ

করেন। এই সর্বত্র প্রবেশ করবার ক্ষমতাই শেষ ক্ষমতা। প্রবেশ করার মানেই হচ্ছে যুক্তাত্মা হওয়া।" [আত্মার দৃষ্টি, শান্তিনিকেতন-১]

এই 'যুক্তাত্মা' হওয়ার বাণী—'যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে', এই—বাণী রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক বাণী। জীবন-নিরপেক্ষ বা বা মানব-নিরপেক্ষ ইহা নহে। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতাও একপ্রকার মানবিকতা—তবে তাহা বৃহত্তর জীবনগত অর্থাৎ প্রেমগত মহত্তর মানবিকতা। এই সহজ কথাটি সহজ ভাবে আমরা গ্রহণ করিতেছি না বলিয়াই খেয়া হইতে গীতালির যুগকে বলাকা-পূরবীর যুগ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করিতেছি। রচনারীতি, পদ্ধতি ও আঙ্গিকের আলোচনা প্রসঙ্গে বলাকা-পূরবী-মহুয়াকে সম্পূর্ণ এক নূতন রবীন্দ্রনাথের রচনা বলিয়া পণ্ডিত পাঠক যদি যুক্তি প্রদান করেন, আমি নীরব রহিব ; কিন্তু বলাকার গতিরঙ্গ ও পথপ্রেম এবং সর্বোপরি ধ্রুবসুন্দর প্রেমে অখণ্ড বিশ্বাস—তত্ত্বের দিক দিয়া অর্থাৎ মনোদর্শনের তত্ত্ববিচারে যে নূতন নহে,—পরন্তু তাহা গীতিমাল্য-গীতালির পথিক কবির স্বর্থ-মন বাহিয়াই যে বিকীরিত ও উদ্বেজিত হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিলে, সাধ্যমতো তথ্য ও যুক্তি প্রয়োগে অবশ্যই পাঠককে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। সমালোচকগণ রবীন্দ্রনাথের যে গান বা কবিতাগুলিকে "নিশ্চল, আত্মকেন্দ্রিক, জগৎ ও জীবনবিমুখ" [শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য রচিত রবীন্দ্র-সাহিত্য-পরিক্রমা, ১ম খণ্ড ২য় অধ্যায়, পৃঃ ৫৩ দ্রষ্টব্য] মনের প্রকাশ বলিয়া মনে করিতেছেন—যেগুলিকে রবীন্দ্র-কাব্যশাখার উপশাখা বলিয়া বর্জন করিবার অভিলাষ [শ্রীপ্রমথনাথ বিশী রচিত রবীন্দ্র-কাব্য-প্রবাহ, ভূমিকাংশ দ্রষ্টব্য] প্রকাশ করিয়াছেন, যেগুলিকে আমিত্ব বিলোপের কবিতা বলিয়া করিয়াছেন ধারণা [ড. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত রচিত রবীন্দ্রনাথ, পঞ্চম পরিচ্ছেদ পৃ. ১৩০ দ্রষ্টব্য], সেই সমস্ত গান ও কবিতার মর্মবাণী যথার্থভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি নাই। গীতিমাল্য-গীতালির যুগে সর্বজগদ্‌গত প্রশান্ত ভাবজীবনের বিস্তৃত ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হইয়া চলার যে মন্ত্র কবি জপ করিয়াছেন, ফাল্গুনী-বলাকার যুগে সেই চলার মন্ত্রই যৌবন-চঞ্চল ছন্দ-রঙ্গে অগ্ন্যুদ্দীপ্ত ওজস্বিতায় ঝংকার দিয়া উঠিয়াছে। ধীরভাবে বিচার করিলে পাঠক অবশ্যই লক্ষ্য করিবেন, গীতিমাল্য-গীতালিতে যাহা বলা হইয়াছে, বলাকাতে তাহাই নূতন ঢঙে ও নূতন রঙে নূতন করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে।

কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে আমার বিবৃতির যৌক্তিকতা ও সত্যতা প্রমাণ করিতেছি :

[১]

গীতিমাল্যের একটি গান :

নেবে নিবুক প্রদীপ বাতাসে,
ঝড়ের কেতন উড়ুক আকাশে;—

বুকের কাছে ক্ষণে ক্ষণে
তোমার চরণ পরশনে
অন্ধকারে আমার সাধনা।
তোমার কাছে শান্তি চাবো না ॥ [৬৯]

ইহার সহিত বলাকার একটি কবিতা তুলনা করুন :

তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলেম শুধু লজ্জা,
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে পরাও রণসজ্জা।
ব্যাঘাত আসুক নব নব,
আঘাত খেয়ে অটল রব,
বক্ষে আমার দুঃখে তব বাজবে জয়ডঙ্ক—
দেব সকল শক্তি, লব অভয় তব শঙ্খ। [৪]

[২]

গীতিমাল্য :

হাওয়া লাগে গানের পালে,
মাঝি আমার বসো হালে।
এবার ছাড়া পেলে বাঁচে,
জীবনতরী ঢেউয়ে নাচে
এই বাতাসের তালে তালে।
মাঝি, এবার বসো হালে ॥ [১৬]

বলাকা :

মত্ত সাগর দিল পাড়ি গহন রাত্রিকালে
ঐ যে আমার নেয়ে।
ঝড় বয়েছে, ঝড়ের হাওয়া লাগিয়ে দিয়ে পালে
আসছে তরী বেয়ে।……
উতল ঢেউয়ের দল খেপেছে, না পায় তারা দিশে
উধাও চলে ধেয়ে। [৫]

[৩]

গীতিমাল্য :

পথ দেখাবার তরে
যাবো তাহার ঘরে,

যেমনি আমি চলি, তোমার
প্রদীপ চলে আগে ॥ [১৯]

বলাকা : যখনি চলিয়া যাই, সে চলার বেগে
বিশ্বের আঘাত লেগে
আবরণ আপনি যে ছিন্ন হয়,
বেদনার বিচিত্র সঞ্চয়
হতে থাকে ক্ষয়।
পুণ্য হই সে চলার স্নানে,
চলার অমৃতপানে
নবীন যৌবন
বিকশিয়া ওঠে প্রতিক্ষণ ॥ [১৮]

[৪]

গীতিমাল্য : উদাস হিয়া চায় রে যেতে বাসা ছাড়ি ॥ [৭৩]

বলাকা : বাসার আশা গিয়াছে মোর ঘুরে,
ঝাঁপ দিয়েছি আকাশ রাশিতে। [২০]

[৫]

গীতালি : আমি পথিক, পথ আমারি সাথী ॥ [৮৩]

বলাকা : ওগো, আমি যাত্রী তাই—
চিরদিন সম্মুখের পানে চাই,
কেন মিছে
আমারে ডাকিস্ পিছে। [১৮]

[৬]

গীতালি : হবে না তোর স্বর্গ সাধন। [৪৪]

বলাকা : স্বর্গ কোথায় জানিস্ কি তা, ভাই,
তার ঠিক ঠিকানা নাই। [২৪]

[৭]

গীতালি : বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় যে ভূমি
সেই তো স্বর্গভূমি।
সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি
সেই তো আমার তুমি। [৯৯]

বলাকা : কত যে যুগ যুগান্তরের পুণ্যে
জন্মেছি আজ মাটির পরে ধূলামাটির মানুষ।······
স্বর্গ আমার জন্ম নিল মাটি মায়ের কোলে,
বাতাসে সেই খবর ছোটে আনন্দ কল্লোলে॥ [২৪]

[৮]

গীতিমাল্য : তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
আলোয় আকাশ ভরা,
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
ফুল্ল শ্যামল ধরা।
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
রাত্রি জাগে জগৎ লয়ে কোলে,
উষা এসে পূর্ব দুয়ার খোলে
কলকণ্ঠস্বরা॥ [৫২]

বলাকা : আমি এলেম ভাঙল তোমার ঘুম,
শূন্যে শূন্যে ফুটল আলোর আনন্দ-কুসুম।
আমায় তুমি ফুলে ফুলে
ফুটিয়ে তুলে
দুলিয়ে দিলে নানা রূপের দোলে।
আমায় তুমি তারায় তারায় ছড়িয়ে দিয়ে কুড়িয়ে নিলে কোলে।
আমায় দেখবে বলে তোমার অসীম কৌতূহল—
নইলে তো এই সূর্যতারা সকলই নিষ্ফল॥ [২৯]

[৯]

গীতিমাল্য :

তুমি যে	চেয়ে আছ	আকাশ ভরে
নিশিদিন	অনিমেষে	দেখচো মোরে।
আমি চোখ	এই আলোকে	মেল্‌বো যবে
তোমার ওই	চেয়ে-দেখা	সফল হবে।
এ আকাশ	দিন গুণিছে	তারি তরে॥ [৮০]

বলাকা :

এমনি করে দিনে দিনে
আমার চোখে লও যে কিনে
তোমার সূর্যোদয়।
এমনি করেই দিনে দিনে
আপন প্রেমের পরশমণি আপনি যে লও চিনে
আমার পরান করি হিরণ্ময়॥ [৩১]

[১০]

গীতালি :

কাঁটার পথে আঁধার রাতে
আবার যাত্রা করি—
আঘাত খেয়ে বাঁচি, কিংবা
আঘাত খেয়ে মরি। [৮৬]

বলাকা :

ছিঁড়ব বাধা রক্ত পায়ে,
চলব ছুটে রৌদ্রে ছায়ে,
জড়িয়ে ওরা আপন গায়ে
কেবলি ফাঁদ ফাঁদবে। [৩]

অন্যত্র আবার :

ওরে যাত্রী,
ধূসর পথের ধুলা সেই তোর ধাত্রী :
পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা,
পথে পথে গুপ্তসর্প গূঢ়ফণা।
নিন্দা দিবে জয় শঙ্খনাদ
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ॥ [৪৫]

এইরূপ উদাহরণ আরো অনেক উদ্ধৃত করা যায়। শুধু গীতিমাল্য ও গীতালি হইতে নহে—রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী বহু কবিতা ও গান হইতেও এইরূপ উদাহরণ সংগ্রহ করা অসম্ভব নহে। কিন্তু উদাহরণ আর বাড়াইতে চাহি না। প্রেমে বিশ্বাস, মানুষে প্রেম, প্রকৃতিতে আনন্দ, আনন্দাবেগে গতি এবং সর্বোপরি গতির অন্তরে যতির তত্ত্ববোধ—এই কয়টি প্রধান ভাব গীতাঞ্জলি-গীতালির মধ্যে আছে বলিয়া যদি পাঠকের ধারণা হয়, তবে বলাকা হইতে এই গীতিকাব্যগুলিকে ভাবের ও তত্ত্বের দিক হইতে একেবারে নূতন ও স্বতন্ত্র তিনি ভাবিতে চাহিবেন না। প্রসঙ্গক্রমে আরো একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। বলাকায় দেখিবেন, বহুস্থলে 'মৃত্যুর' কথা আছে কিন্তু এই মৃত্যু. মৃত্যু নহে, ইহা মৃত্যুরি মৃত্যু, অমৃতেরি উপমা, জীবনেরি গতি ও প্রাণস্পন্দন। মৃত্যু সম্বন্ধে এই কল্পনা কিন্তু বলাকায় হঠাৎ আসে নাই, রবীন্দ্র জীবনতত্ত্বে ও দর্শনে ইহা 'অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ'। তরুণ বয়সের রচনাকাল হইতে এই কল্পনা ক্রমশঃ নব নব ভাবে ও রঙে, রসে ও আনন্দে নূতন নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে। রবীন্দ্র-কল্পিত এই মৃত্যুর বিষয়টি সম্যক্‌ভাবে না বুঝিলে শুধু যে বলাকার গতি-রহস্যই বুঝা হয় না, তাহা নহে, রবীন্দ্রনাথের প্রেমের মহিমা ও তাৎপর্যও বুঝা সহজ হয় না। এই মৃত্যুর উল্লেখ রবীন্দ্রনাথের বহু কাব্যে পাইবেন, রবীন্দ্রনাথের তথাকথিত 'জীবনবিমুখ' গানগুলিতেও পাইবেন। আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস এই, রবীন্দ্রনাথের 'মৃত্যু'কে যাঁহারা বুঝিয়াছেন, রবীন্দ্রকাব্য বা সঙ্গীতকে তাঁহারা কোনো ক্ষেত্রে, কোনো ভাবে 'জীবনবিমুখ' অথবা 'আমিত্ব বিলোপকারী' কহিতে চাহিবেন না।

কিন্তু তর্কের কথা থাক। গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমি যাহা বলিয়াছি, অনুগ্রহ করিয়া স্পষ্ট ভাবে তাহা আর একবার বিচার ও বিবেচনা করুন। কবির লোকায়ত জীবনদর্শন এই গ্রন্থত্রয়ে স্পষ্টভাবে ফুটিয়াছে কি না বলাকা আলোচনার পূর্বেই একবার স্থির করিয়া লউন। যদি মনে করেন, গীতাঞ্জলি, গীতালি প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে জীবন-নিরপেক্ষ প্রাচীন আধ্যাত্মিকতাই মাত্র ব্যঞ্জিত হইয়াছে, তবে সেগুলি মানুষের কবি রবীন্দ্রনাথের রচনা নহে বলিয়া অবশ্যই বর্জন করিবেন। কিন্তু যদি মনে করেন—রবীন্দ্র-প্রেমতত্ত্বেরই ওগুলি স্বচ্ছন্দ ও সুন্দর প্রকাশ, চলার বাণীই ওগুলির ব্যঞ্জনা, আত্মপ্রেম হইতে বিশ্বপ্রেমের অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার আনন্দ-চেতনাই ওগুলির প্রাণ, তবে বলাকাকে গীতিমাল্য-গীতালিরই স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ বলিয়াই আপনাকে স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলেই ক্রমশঃ দেখা যাইবে, বিভিন্ন রচনার বাহ্য বৈচিত্র্যের অন্তরালে রাবীন্দ্রিক প্রেমতত্ত্বের ঐক্য-সত্যটি অজস্র 'ঘূর্ণার পাকে' কেমন করিয়া 'স্থির' ও 'ধ্রুবসুন্দর' হইয়া বিরাজ করিতেছে।

পূর্ববর্তী আলোচনায় যে কয়েকটি পংক্তি বলাকা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি, সেই কয়টি পংক্তি হইতেই বলাকার মর্মবাণী উপলব্ধি করা অসম্ভব নহে। শান্তি নহে,—গতিই জীবনের সত্য : গতিবিহীন শান্তি-কামনা বা স্বর্গ-সাধনা রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম সঙ্গীতনিচয়ের বাণী নহে, বলাকার তো নহে-ই। গীতিমাল্য-গীতালিতে চলার বাণী শুনিয়াছি, বলাকাতেও বলা হইয়াছে—চলার স্নানে পুণ্য হয় জীবন, নবীন যৌবন বিকশিত হয় চলার অমৃত পানে। পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া ধন্য আমি, পুণ্য আমি এই কারণে, যে, দুঃখ-ভয়-নিন্দা-শোক প্রভৃতি নানা বিপর্যয় অতিক্রম করিতে করিতে ছুটিয়া চলি সেই 'চিরন্তন একের' সত্যে, একের মাহাত্ম্যে। বিচিত্রের মধ্যে তাঁহার প্রকাশ—তাই বুঝি এক চিত্রে মুগ্ধ রহিয়া, আসক্ত রহিয়া স্থবিরবৎ আমার থাকা চলে না—নব নব গতির আবেগে আমাকে সবেগে বাহির হইতে হয় অন্ধগৃহ হইতে জ্যোতির্ময় বিশ্ববৈচিত্র্যে—'মৃত্যুর গুপ্ত প্রেম' হইতে মৃত্যুহীন 'মৃত্যুর' প্রাণচাঞ্চল্যে।

বলাকা

জীবন এবার মাতল মরণবিহারে।
এই বেলা নে বরণ করে
সব দিয়ে তোর ইহারে। [২]

জীবন যখন মরণকে করে লীলাসহচর, তখন ঘরে বসিয়া নিশ্চুপ নিশ্চল থাকা আর সম্ভব হয় না। তখন আপদ মানি না, আঘাত মানি না, আগুপিছু চাহি না, ব্যক্তিগত সুখে আসক্ত হইয়া অন্ধকারে চাহি না পড়িয়া রহিতে। প্রবীণ যাহারা, পরম পাকা যাহারা, 'অন্ধকারে বন্ধ করা খাঁচায়' রহিয়াই যাহাদের সুখ, তাহারা এই 'মরণ বিহারের' আনন্দ বা তাৎপর্য বুঝিবে না। কিন্তু প্রেম যদি কাম্য হয়, পূর্ণ যদি হয় উপাস্য, স্থবিরত্ব ত্যাগ করিয়া মাতিতেই হইবে চলার চাঞ্চল্যে 'মরণ বিহারে'।

রবীন্দ্রকাব্যে, পূর্বেই বলিয়াছি, মরণ বা মৃত্যু শব্দটির তাৎপর্য বড় গভীর। 'গীতালি' কাব্যে, এই মরণকে দেখিয়াছি 'মাঝি' রূপে। সংসার-সমুদ্রের সহস্র বিপদ বিপ্লবের অজস্র তরঙ্গাঘাতের মধ্য দিয়া জীবন-তরী বহে মরণ—জীবন তাই কূল হইতে কূলে, রূপ হইতে রূপে করে গতায়াত। জীবনের চালক যেন এই মরণ, এ যেন যৌবনের উদ্দেজনা, চেতনার প্রেরণা। দুঃখের আঘাতে ইহাকে দর্শন করি, শোকের শেলাঘাতে ইহাকে আস্বাদন করি, বিচ্ছেদের বহ্নিময় যন্ত্রণায় ইহাকে উপলব্ধি করি, নব নব বেশে ইহার আবির্ভাব—চেতনার মধ্যে বিচিত্র জীবনবোধ সঞ্চার করাই ইহার আবির্ভাবের যেন উদ্দেশ্য। বিচিত্রকে যদি চাহিতে হয়, বিচিত্রের অন্তরে চিরন্তন সেই 'এক'-কে যদি চাহিতে হয়, তবে মাতিতেই হইবে 'মরণ বিহারে'।

জীবনের লীলা-সহচর মৃত্যুর এই অভিনব রসমূর্তি দেখিয়া ভয় পাইবে কে? ভয় তাহাদের, চলার মন্ত্র যাহারা জানে না। দুঃখে সুখে রাত্রিদিন যাহারা সম্মুখ

পথে চলিতে জানে, মাতিতে জানে 'পথের প্রেমে'—তাহারাই জানে মরণ ভিন্ন জীবনের গতি নাই।

চলেছে জোয়ার ভাঁটা আলোকে আঁধারে
আকাশ পাথারে;
পথের দুধারে
চলেছে ফুলের দল নীরব চরণে
বরণে বরণে;
সহস্র ধারায় ছোটে দুরন্ত জীবন নির্ঝরিণী
মরণের বাজায়ে কিঙ্কিণী। [৬]

ধরিত্রীর সর্বত্রই গতির তরঙ্গ-রঙ্গ অহরহঃ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। এই গতির বিরাম নাই, নাই বিশ্রাম। 'অন্তহীন দূর' নিরন্তর যেন তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে : দূরের সেই সর্বনাশা প্রেমে ঘরছাড়া হইয়াছে জীবন নির্ঝরিণীর দুর্বার এই গতি। কিছুতেই তাহার মন বসে না, দৃষ্টি নাই তাহার পশ্চাতে, আসক্তির কোনো উপলাঘাতে কখনও সে হয় না বন্দিনী, পাথেয় সঞ্চয় করে না কিছুই,

নাহি শোক, নাহি ভয়,
পথের আনন্দভরে অবাধে পাথেয় করে ক্ষয়॥ [৮]

বস্তুতঃ পাথেয় লইয়া যখন ব্যস্ত থাকি, পাছে তাহা নষ্ট হয় ঐ চিন্তায় যখন সঞ্চয়শীল চিত্ত থাকে চিন্তামগ্ন, তখন তুচ্ছ সেই পাথেয়র টানেই হই সীমাবদ্ধ, হই অপূর্ণ। কৃপণের সেই ধনটুকু যক্ষের মত রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে 'পরম পাকার' মত গৃহবন্দী, বাসনা-বন্দী থাকিতেই তখন ভালোবাসি। তামসিকতার মৃত্যু তখন জড়াইয়া ধরে জীবনকে, জীবন তখন আর নড়িতেই চাহে না, না-চলার চতুর বিজ্ঞতায় রচনা করে 'অচলায়তন' [১৮নং কবিতার প্রথমাংশ দ্রষ্টব্য]। কিন্তু গতিরূপী রাজসিক মৃত্যু যখন জীবনকে করে স্পর্শ, তখন ডাক পড়ে 'নিরুদ্দেশের দেশে', তখন 'কুড়ায়ে লই না কিছু, করি না সঞ্চয়', তখন 'কিছু নাই' বলিয়াই আস্বাদন করি পূর্ণের অনন্ত মহিমা, বিচিত্রের অভিসারে নিত্য সমুদ্যত চেতনায় তখনই আবির্ভাব ঘটে নিত্য-গতিশীল জীবনদেবতার। তাহারই স্পর্শে—

বিশ্বধূলি
মলিনতা যায় ভুলি ;
পলকে পলকে,—
মৃত্যু ওঠে প্রাণ হয়ে ঝলকে ঝলকে। [৮]

বলাকার গতিতত্ত্বে প্রাণময় এই মৃত্যুর মহিমাদর্শনটি মনের মধ্যে উজ্জ্বল করিয়া রাখিতে হইবে। রাজসিক এই মৃত্যুর স্পর্শ-প্রভাবেই সংসার সরিতে জানে, জগৎ

অনুভব করে গতির চাঞ্চল্য, নতুবা তাহারা মুক্তিই পাইত না বস্তুর অত্যাচার হইতে, আসক্তির মোহ হইতে, কলুষের কবল হইতে, 'সঞ্চয়ের অচল বিকার' হইতে। পলে পলে কত পাপ, কত বন্ধন, কত মোহ, কত তামসিক সুখস্পৃহা প্রলুব্ধ করে সংসারের বস্তু-জীবনকে : মৃত্যু যদি জীবনকে আসিয়া নাড়া না দিত, দুঃখের আঘাতে, শোকের আঘাতে, বিচ্ছেদের আঘাতে জড়বৎ আসক্ত জীবনকে আন্দোলিত করিয়া, উদ্বেজিত করিয়া, উদ্বেলিত, উত্তেজিত করিয়া নবতর জীবনে 'অন্য কোথা অন্য কোনোখানে' যদি পরিচালিত না করিত, স্থূলতনু স্থবির এই সংসার-জীবনের নিত্য বর্তমান অনন্ত বস্তুভারের বিকারে কী ঘৃণ্য, কী দুর্বহ অস্তিত্বই না মানুষকে বহন করিতে হইত। কিন্তু 'মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবন' অহরহঃ অভিস্নাত হইতেছে বলিয়া অর্থাৎ গতির বিদ্যুৎ-বেগে আসক্তির বস্তুভার জীবন হইতে না খসিয়া পারে না বলিয়া—

আবরণ আপনি যে ছিন্ন হয়,
বেদনার বিচিত্র সঞ্চয়
হতে থাকে ক্ষয়। [১৮]

এই যে সঞ্চয় ক্ষয়ের বাণী, ইহাই জীবনবাণী, বৃহৎ জীবনের বাণী। ক্ষয় না হইলে গতি নাই, গতি না থাকিলে শ্রেয়োবোধ নাই, শ্রেয়োবোধ না জাগিলে আধ্যাত্মিকতা নাই, আধ্যাত্মিকতা না হইলে প্রেম নাই, প্রেম না জাগিলে বৃহতে অনুরাগ অর্থাৎ বৈরাগ্য নাই, বৈরাগ্য না হইলে সর্বজগদ্‌গত প্রেমে অধিকার নাই। রবীন্দ্রনাথের গতিতত্ত্বে ভাবের এই ক্রমবিকাশের পর্যায়গুলি ধীরভাবে বিবেচনা করিলেই বুঝা যায়, মৃত্যু শুধু স্মরণীয় নহে, মৃত্যু বরণীয়। মৃত্যুর অন্তরে প্রবেশ করিয়া অমৃত লাভ করিবার আনন্দ-বিশ্বাস বলাকার একাধিক কবিতায় যে গুঞ্জরিত হইয়াছে, তাহা শুধু কল্পনা-বিলাসোদ্দীপ্ত শূন্যগর্ভ কাব্যকথা নহে—তাহা জীবনগত বাস্তব সত্য। 'জীবনস্মৃতি'তে এই বাস্তব সত্যের কথাই কবিগুরু অনাড়ম্বর ভঙ্গীতে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। সংসারে মৃত্যুর আবির্ভাবে তাঁহার সহজ মন কেমন করিয়া অমৃত সত্যের সন্ধান পাইল, কবির রচনা হইতেই তাহা বুঝা যাইবে। কবি লিখিতেছেন :

জীবনের মধ্যে কোথাও যে কিছুমাত্র ফাঁক আছে তাহা তখন (তরুণ বয়সে) জানিতাম না : সমস্তই হাসিকান্নায় একেবারে নিরেট করিয়া বোনা। তাহাকে অতিক্রম করিয়া আর কিছুই দেখা যাইত না, তাই তাহাকে একেবারে চরম করিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলাম। এমন সময় কোথা হইতে মৃত্যু আসিয়া এই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ জীবনটার একটা প্রান্ত যখন এক মুহূর্তের মধ্যে ফাঁক করিয়া দিল তখন মনটার মধ্যে সে কী ধাঁধাই লাগিয়া গেল। চারিদিকে গাছপালা মাটি জল চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা তেমনি নিশ্চিত সত্যেরই মতো বিরাজ করিতেছে অথচ তাহাদেরি মাঝখানে তাহাদেরি মধ্যে যাহা নিশ্চিত সত্য ছিল, এমন কি দেহ-প্রাণ-হৃদয়-মনের সহস্রবিধ স্পর্শের দ্বারা যাহাকে তাহাদের সকলের

চেয়েই বেশি সত্য করিয়াই অনুভব করিতাম সেই নিকটের মানুষ যখন এত সহজে এক নিমেষে স্বপ্নের মতো মিলাইয়া গেল তখন সমস্ত জগতের দিকে চাহিয়া মনে হইতে লাগিল এ কী অদ্ভুত আত্মখণ্ডন। যাহা আছে এবং যাহা রহিল না. এই উভয়ের মধ্যে কোনোমতে মিল করিব কেমন করিয়া।······মৃত্যু যখন মনের চারিদিকে হঠাৎ একটা "নাই"-অন্ধকারের বেড়া গড়িয়া দিল, তখন সমস্ত মনপ্রাণ অহোরাত্র দুঃসাধ্য চেষ্টায় তাহারই ভিতর দিয়া কেবলি "আছে"-আলোকের মধ্যে বাহির হইতে চাহিল। কিন্তু সেই অন্ধকারকে অতিক্রম করিবার পথ অন্ধকারের মধ্যে যখন দেখা যায় না তখন তাহার মতো দুঃখ আর কী আছে।

"তবু এই দুঃসহ দুঃখের ভিতর দিয়া আমার মনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে একটা আকস্মিক আনন্দের হাওয়া বহিতে লাগিল, তাহাতে আমি নিজেই আশ্চর্য হইতাম। জীবন যে একেবারে অবিচলিত নিশ্চিত নহে এই দুঃখের সংবাদেই মনের ভার লঘু হইয়া গেল। আমরা যে নিশ্চল সত্যের পাথরে গাঁথা দেওয়ালের মধ্যে চিরদিনের কয়েদী নহি, এই চিন্তায় আমি ভিতরে ভিতরে উল্লাস বোধ করিতে লাগিলাম। যাহাকে ধরিয়াছিলাম তাহাকে ছাড়িতেই হইল—এইটাকে ক্ষতির দিক দিয়া দেখিয়া যেমন বেদনা পাইলাম, তেমনি সেইক্ষণেই ইহাকে মুক্তির দিক দিয়া দেখিয়া একটা উদার শান্তি বোধ করিলাম। সংসারের বিশ্বব্যাপী অতি বিপুল ভার জীবন-মৃত্যুর হরণ-পূরণে আপনাকে আপনিই সহজে নিয়মিত করিয়া চারিদিকে কেবলি প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, সে ভার বদ্ধ হইয়া কাহাকেও কোনোখান চাপিয়া রাখিয়া দিবে না, একেশ্বর জীবনের দৌরাত্ম্য কাহাকেও বহন করিতে হইবে না এই কথাটা একটা আশ্চর্য নূতন সত্যের মতো আমি সেদিন প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলাম।

"সেই বৈরাগ্যের ভিতর দিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য আরও গভীররূপে রমণীয় হইয়া উঠিয়াছিল।······জগৎকে সম্পূর্ণ করিয়া এবং সুন্দর করিয়া দেখিবার জন্য যে দূরত্বের প্রয়োজন মৃত্যু সেই দূরত্ব ঘটাইয়া দিয়াছিল। আমি নির্লিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপর সংসারের ছবিটি দেখিলাম এবং জানিলাম তাহা বড়ো মনোহর।"

[জীবনস্মৃতি]

বস্তুতঃ মৃত্যু আসিয়া, চলার বেগ আসিয়া, মানুষকে যখন 'এক' হইতে 'আরে' ঠেলিয়া দেয়, তখন আপাতঃসুন্দর সুখের স্বর্গ ভাঙিয়া যাইতেছে ভাবিয়া মানুষ হয় ভীত, ত্রস্ত। কিন্তু অব্যবহিত পরবর্তী জীবনেই মৃত্যুভীত সেই মানুষটি যখন বুঝিতে পারে কত মোহ, কত পাপ, কত অন্ধতা হইতে মৃত্যু তাহাকে রক্ষা করিয়া বাহিরের পথে দিয়াছে আনিয়া, তখন সে মৃত্যু-মহিমার অমৃত-সত্যকে স্বীকার না করিয়া পারে না। এই যে মৃত্যু-মহিমা, চেতনার দ্বারা যখন ইহা উপলব্ধি করি, তখন মৃত্যুর সাধনা করি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় [এই স্থলে ২ নং কবিতাটি একবার স্মরণ করুন।]। তখন মৃত্যু-সাগরের মধ্যেই যে বিরাজ করে

অমৃত, এই বিশ্বাসে সাহস পাই। অকুতোভয়ে অবগাহন করি মৃত্যুর অতলে, আহরণ করি জীবনের পরমামৃত। অমৃত আর কী? গতি হইতে প্রেম পর্যন্ত নিত্য চলার আনন্দবেগই তো অমৃত! নিত্য চলার আনন্দে সত্যকে লাভ করিব, পাপকে দমন করিব, অহংকারকে চূর্ণ করিব, মহত্ত্বের সাধনায় পূর্ণ করিব 'নিজ মত্যসীমা'—চিরন্তন সেই এক শান্তিময় শিবপ্রেমকে লক্ষ্যপথে স্থির রাখিয়া অগ্রসর হইব 'রূপ হতে রূপে, প্রাণ হতে প্রাণে' —এই আশ্বাসেই তো বিশ্বচরাচর অনাগত সুন্দর প্রভাতের পথে রাত্রি ভেদ করিয়া মৃত্যুর আনন্দে ছুটিতেছে :

মৃত্যুর অন্তরে পশি অমৃত না পাই যদি খুঁজে,
সত্য যদি নাহি মেলে দুঃখ সাথে যুঝে,
পাপ যদি নাহি মরে যায়
আপনার প্রকাশ লজ্জায়,
অহংকার ভেঙে নাহি পড়ে আপনার অসহ্য সজ্জায়,
তবে ঘরছাড়া সবে
অন্তরের কী আশ্বাস রবে
মরিতে ছুটিছে শত শত
প্রভাত আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মতো। [৩৭]

প্রভাত আলোকে প্রবেশ করিয়াই নক্ষত্র যায় মরিয়া, জাগিয়া উঠে জ্যোতির্ময় সূর্য-সুন্দর। নক্ষত্রের মৃত্যু না হইলে কি সূর্য জাগে? দিনের আলোকে নক্ষত্রের মরণ আর সূর্যদর্শন তো একই কথা! রাত্রির তপস্যা যে দিনটিকে জাগ্রত করিবার আনন্দে রহে নিত্য তৎপরা, সেই দিনটির আলোর দিকে সূর্য-প্রকাশের আনন্দে লক্ষ নক্ষত্র যে 'মরিতে ছুটিছে' তাহা কি ব্যর্থ হয়? প্রভাতে (অর্থাৎ আত্মপ্রকাশের আনন্দিত আলোকে) মৃত্যু হয় নক্ষত্রের দৃশ্য জীবনের, বস্তু জীবনের—কিন্তু সে মৃত্যু কি সূর্য-প্রকাশের গৌরবে দীপ্যমান বলিয়া মৃত্যুর মৃত্যু নহে? নক্ষত্রের মৃত্যু আনিয়া দিল সূর্যজ্যোতির আনন্দ-অমৃত, রাত্রির তপস্যা আনিয়া দিল দিন। ঠিক এইরূপেই তো মানুষের সাধন-স্বভাবের উচ্চতর জীবন মৃত্যুর মহিমার উপরেই রচনা করে অমৃতময় চিরন্তনের লীলাচ্ছবি। সোক্রেটিসের মৃত্যুই তো আত্মার অমরত্ব, যীশুর মৃত্যু-মোহন মার্জনাই অমৃত জীবনের মাহাত্ম্য। মহাত্মার তিরোভাবই অমরের প্রেমপ্রদীপ্ত আবির্ভাব।

মৃত্যুর অন্তরে যে জীবন প্রবেশ করিতেছে তাহা তো এই আশ্বাসেই। মৃত্যুর অগ্নিদাহে জীবন হইবে পবিত্র, তাহার বন্ধনগুলি, পাপগুলি, মোহগুলি যাইবে ভস্মীভূত হইয়া, রাখিতে হইবে এই বিশ্বাস। মৃত্যুকে ভয় করে যাহারা, গতিবিহীন বিলাসী জীবনকে মোহভরে আঁকড়াইয়া ধরিয়া 'মরণসাধন' সাধে যাহারা, মৃত্যু তাহাদের পক্ষে মৃত্যুই বটে, অমৃত নহে। অমৃত যে সহজে মিলার বস্তু নয় : অমৃত আহরণ করিতে হইলে মৃত্যুর

মধ্য দিয়া অকুতোভয়ে জীবনের সাধনা, প্রেমের সাধনা করিতেই হইবে। মৃত্যুঘাতে আয়ু নিঃশেষিত হইবে, এই যে ভয়, ইহা 'প্রবীণের' ভয়, 'পরম পাকার' ভয়: 'যৌবনেরি পরশমণি' যাহাদের স্পর্শ করিয়াছে, 'প্রাণ অফুরান দেদার' যাহারা ছড়াইয়া চলে, প্রবীণের এই মৃত্যুভয়কে তাহারা মানে না। মৃত্যুর অন্ধকারে ভয়হীন তাহারা শিকারির মত চির-ঈপ্সিতকে ফেরে খুঁজিয়া: 'গহন কাঁটা পথ' করে অতিক্রম, এ জীবন, আর-জীবন, একজীবন, বিশ্বজীবন—সমগ্র জীবন ব্যাপিয়াই তাহারা দুর্বার গতিরঙ্গে অগ্রসর হয় ঈপ্সিতের অভিসারে। কবির বিশ্বাস এই: অন্ধকার বিদূরিত হইলেই, মরণের আবরণ উন্মোচন করিয়া যৌবন দেখিতে পাইবে তাহার অমৃতময় চিরন্তন প্রেম। কবি তাই গাহিলেন:

যৌবন রে, তুই কি কাঙাল, আয়ুর ভিখারি।
মরণবনের অন্ধকারে গহন কাঁটাপথে
তুই যে শিকারি।
মৃত্যু যে তার পাত্রে বহন করে
অমৃতরস নিত্য তোমার তরে:
বসে আছে মানিনী তোর প্রিয়া
মরণ ঘোমটা টানি।
সেই আবরণ দেখ্‌ রে উতারিয়া
মুগ্ধ সে মুখখানি॥ [৪৪]

মৃত্যুর আবরণটি উন্মোচন করিয়া দেখো, কবি কহিতেছেন, ভয় যাহাকে করিয়াছ সে তোমার প্রেম পাইবারই যোগ্য, সে তোমার প্রিয়া, তোমার প্রেম। ভয় দেখাইয়া মানুষকে সে পরীক্ষা করে, ভয় তাহার ছলনা, তাহার অভিনয়, তাহার 'নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে।' এই শিল্প হইতে যে রসাস্বাদন করিতে না জানে, রস হইতে গভীর তত্ত্বের অতল তাৎপর্যে অবগাহন করিতে না জানে, দূর হইতে সেই 'ভয়ের মুখোসটাকে' দেখিয়া ওঠে আঁতকাইয়া, 'অনর্থ পরাজয়ের' পঙ্কে তিলক আঁকে ললাটে। 'সৃষ্টির পথ' 'বিচিত্র ছলনাজালে' তো আকীর্ণ বটেই, কিন্তু অনায়াসে, সহজ বিশ্বাসে এই সমস্ত ছলনা যে সহিতে জানে, সৃষ্টি তাহার নিকট সত্য, কারণ

সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।
[সঞ্চয়িতা, ৪র্থ সং পৃ. ৭৯৭]

বলাকা আলোচনা করিতে করিতে স্বেচ্ছায় একবার 'শেষ লেখার' শেষ দুটি কবিতার কথায় উপনীত হইয়াছি। মৃত্যু সম্বন্ধে কবির ধারণা ও বিশ্বাসটি 'শেষ লেখার' শেষ কবিতায় অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। বলাকার মৃত্যু সম্পর্কিত প্রসঙ্গের

আলোচনাকালে এই দুটি কবিতা স্মরণ রাখিলে কবিকল্পিত মৃত্যুতত্ত্বের অনেক জটিলতার নিরসন হয় বলিয়াই আমি মনে করিয়াছি। কিন্তু মৃত্যু সম্বন্ধে এত কথা বলিতেছি কেন, কেহ কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। বলিবার কারণ প্রধানতঃ এই যে, রবীন্দ্রশাস্ত্রে প্রেমের মত মৃত্যুও (এবং সেই সঙ্গে জীবন ও সৃষ্টি) কেবল মাত্র সাময়িক কবিত্ব-প্রেরণার উৎস নহে, তাহা সুগভীর দর্শন-মানসের অটল তত্ত্ব-বিশ্বাসও বটে। রবীন্দ্রনাথের প্রেম ও মৃত্যু সম্পর্কে ধারণা যাঁহার খুব স্পষ্ট ও স্বচ্ছ নয়, রবীন্দ্র-কাব্যদর্শনের ঐক্যতত্ত্ব তাঁহাকে বুঝাইতে যাওয়া অরণ্যে রোদন মাত্র। এইজন্য 'বলাকা' আলোচনায় মৃত্যু সম্পর্কিত প্রসঙ্গকেই আমি প্রাধান্য দিতেছি। আমার বিশ্বাস এই, রবীন্দ্র-দর্শনের ঐক্যতত্ত্ব বুঝিতে হইলে প্রেম, এবং প্রেম বুঝিতে হইলে মৃত্যুতত্ত্ব সম্যক্‌ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়; মনে রাখিতে হয় যে, প্রেমের অন্তর্নিহিত বৈরাগ্য ও গতির সহিত রবীন্দ্রকল্পিত মৃত্যুর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। 'কড়ি ও কোমলের' মন্তব্য অংশে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং লিখিয়াছেন: 'যৌবনের রসোচ্ছ্বাসের সঙ্গে আর একটি প্রবল প্রবর্তনা প্রথম আমার কাব্যকে অধিকার করেছে, সে জীবনের পথে মৃত্যুর আবির্ভাব। যাঁরা আমার কাব্য মন দিয়ে পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন এই মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি, আমার কাব্যের এমন একটি বিশেষ ধারা, নানা বাণীতে যার প্রকাশ'। [রবীন্দ্র-রচনাবলী-২য়, কবির মন্তব্য]। বলাকার বীর্যপ্রধান বহু বাণীতে এই মৃত্যুর আনন্দই বিশেষ ভাবে প্রাধান্য পাইয়াছে। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের এই মৃত্যুর তত্ত্বটি যখনই স্পষ্টভাবে ধারণা করিতে পারিয়াছি, তখনই রবীন্দ্রকাব্য শুধু যে অত্যন্ত সরল হইয়া গেছে, তাহা নহে, রবীন্দ্রকাব্যসমূহের সমগ্রতার রূপটি আমার নিকট ধরা পড়িয়াছে এবং সর্বোপরি কবির প্রেমতত্ত্বটি স্বচ্ছদর্পণের মতো আলোকময় হইয়া উঠিয়াছে। আজ আমার একান্ত বিশ্বাস এই যে, বিশ্ববৈচিত্র্যের রসোপলব্ধির অন্তরে অপরিবর্তনীয় এই প্রেমের তত্ত্ববিশ্বাসটি তাঁহার ছিল বলিয়াই জীবনগত মূল সত্যটি কোনো ক্ষেত্রেই তিনি হারাইয়া ফেলেন নাই। দুঃখের দুর্দিনে, সুখের মোহান্ধকারে, শোকের বিষাদ কুজ্ঝটিকায়, বিচ্ছেদের অগ্ন্যুদ্দীপ্ত আত্মযন্ত্রণায়, আবার ভক্তির প্রসন্ন-গম্ভীর অবারিত আত্মবিশ্বাসে অহরহঃ তিনি অনুভব করিয়াছেন মৃত্যুর মধ্য দিয়া অমৃতে অর্থাৎ প্রেমাভিমুখে চলার অনির্বাণ উদ্দীপনা। চলার লক্ষ্য প্রেম, জীবনের উপাস্য প্রেম। অন্তরের প্রেম ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া সর্বজগদ্‌গত প্রেম 'হইবার' পথে অহরহঃ চলিয়াছে। অহং-এর অতিকৃতি, মৃত্যুর পরীক্ষা, সৃষ্টির বিচিত্র ছলনা প্রেমজীবনকে বিড়ম্বিত করে বারংবার, তথাপি দমিত হয় না প্রেম, লক্ষ মৃত্যুর মধ্য দিয়া আনন্দরঙ্গে ছুটিয়া চলে আপনারি ব্যাপকতর আত্মবিস্তৃতির মুক্তি-মন্দিরে। সূচনা হইতেই বলিয়া আসিতেছি, রবীন্দ্রকাব্যে ইহারি প্রকাশ দেখি বিচিত্র রূপে, রঙে, ছন্দে, অলংকারে। বলাকায় এই ব্যাপকতর আত্মবিস্তৃতির আনন্দ অত্যন্ত স্পষ্ট ও উদগ্র হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া আমাদের মধ্যে কেহ কেহ ইহাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কাব্য বলিয়া

ধারণা করিয়াছেন। রূপের দিক দিয়া ইহা স্বতন্ত্র কাব্য বলিতে পারেন, কিন্তু ভাবের ও তত্ত্বের দিক দিয়া কদাচ নহে। বলাকায় যাহা বলা হইয়াছে, কবির বালক বয়সের রচনাগুলিতেও তাহার অস্ফুট ধ্বনি শুনিয়াছি, বলাকার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী রচনাসমূহেও তাহার ব্যঞ্জনা অনুভব করিয়াছি। মৃত্যুর যে মহিমা-বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথকে অনুপম প্রেমের অমর কবি করিয়া তুলিয়াছে, সেই বিশ্বাস, পূর্বেই বলিয়াছি, উন্মেষিত হইয়াছে কবির নিতান্ত তরুণ বয়সের রচনাতেই। প্রভাতসঙ্গীতে 'কবির ভনিতায়' বলা হইয়াছে: 'নিজের অন্তরের দিকে চেয়ে একটা ধারণা আমার মধ্যে জেগে উঠেছিল যে আমার প্রতি-মুহূর্তের সমস্ত ভালোমন্দ আমার প্রতিদিনের সুখদুঃখের সমস্ত অভিজ্ঞতা চিরকালের মতো অনবরত একটা সৃষ্টিরূপ ধরছে, প্রকাশ-অপ্রকাশের নিত্য ওঠাপড়া নিয়ে যে সৃষ্টির স্বরূপ। এই কথাটা ভাবতেই মনে হল মৃত্যু তাহলে কী? এক রকম করে তার উত্তর এসেছিল এই যে, জীবন সব কিছুকে রাখে আর মৃত্যু সব কিছুকে চালায়। প্রতি মুহূর্তেই মরছি আমি, আর সেই মরার ভিতর দিয়েই আমি বাঁচার রাস্তায় এগোচ্ছি, যেন আমার মধ্যে সেলাইয়ের কাজ চলছে, গাঁথা পড়ছে অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান। মুহূর্তকালীন মৃত্যুপরম্পরা দিয়ে মর্ত্যজীবন এই যেমন বেড়ে চলেছে প্রবাল দ্বীপের মতো, তেমনি মৃত্যুর পর মৃত্যু আমাকে দিয়ে লোক-লোকান্তরের অভিজ্ঞতার জাল বিস্তার করে চলবে—আমার চেতনার সূত্রটিকে নিয়ে মৃত্যু এক-এক ফোঁড়ে এক-এক লোককে সম্বন্ধ-সূত্রে গাঁথবে [রবীন্দ্ররচনাবলী-১]।

এই যে মৃত্যুর দ্বারা মৃত্যুহীন অখণ্ড জীবন-চেতনার উপলব্ধি—ইহাই ক্রমশঃ বিকশিত হইতে হইতে বলাকায় চলার গতিবেগে রূপান্তরিত হইয়াছে। মৃত্যু যে মৃত্যু নহে, পরন্তু জীবনদায়িনী শক্তির মহান মহিমা, বিচ্ছেদের ইহা যে হেতু মাত্র নহে, পরন্তু লোকে-লোকে প্রেমমিলনের ইহা সেতু—এ-তত্ত্ব শুধু বলাকায় পাই না, এ-তত্ত্ব কবি রবীন্দ্রনাথেই পাই।

ড. সুশীলকুমার মৈত্র মহোদয় রবীন্দ্রনাথের এই মৃত্যুতত্ত্বটি তাঁহার একটি বিখ্যাত রচনায় (Tagore as Seer and Prophet of Arya Dharma) অতি সংক্ষেপে অথচ অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন:

> "Death is nothing but a compulsory way of making us give up everything, for it is a sundering of all the ties that bind us to this world. If we are to be reborn in God, we must tear ourselves away from everything that we have in this world. That is why death is a necessary condition of rebirth. The poet therefore says, 'Once we have to die completely. It is only then we can be reborn in God. We have to die wholly and completely. We must know this very clearly that, so far as

the life I had is concerned, I am dead. I am not the man—I have not a particle of that which I had in that life. I am dead, so far as my wealth, my name, my comfort is concerned. I am only living in God.' Death, therefore, with the poet is re-birth in God." [See *Tagore Birthday Number*, p. 82.]

সুতরাং 'মৃত্যু তোরে দিবে হানা' এই বাণীর মর্ম যদি যথার্থভাবে ধরিয়া থাকি, তবে নিশ্চয়ই বুঝিব, ইহা অভিশাপ নহে, যাত্রাপথে ইহাই কবির মুখ দিয়া জীবন বিধাতার পরম আশীর্বাদ—

'এই তোর রুদ্রের প্রসাদ'।

মৃত্যুকে, মৃত্যুর দুঃখকে রবীন্দ্রনাথ 'রুদ্রের প্রসাদ' বলিয়াছেন। স্নেহময় পিতার কঠোর শাসনের মতো এই মৃত্যু, প্রত্যক্ষতঃ ইহাকে মৃত্যু বলিয়া, শেষ বলিয়া যতই আতঙ্কিত হই না কেন, অন্তরতঃ ইহা জীবন, ইহা অশেষ, ইহা অমৃত, ইহা বজ্রাদপি কঠোর হইলেও কুসুমাদপি মৃদুর প্রেম মহিমা। কর্মবিমুখ অলস সন্তানকে পিতা যখন কঠোর তিরস্কারে কর্মক্ষেত্রে জোর করিয়া লইয়া চলেন, সন্তানের বিচারে পিতা তখন নির্দয় ও কঠোরহৃদয় বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে; কিন্তু কর্মক্ষেত্রে নব নব জয় ও পরাজয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করার পর বিগত দিনের সেই কর্মবিমুখ আলস্যের প্রতিবাদে পিতার তিরস্কারবাণী যদি সে একবার স্মরণ করে, তখনই বুঝিতে পারে যে, শাসনের ছদ্মবেশে মঙ্গলময় প্রেমই তাহাকে পরিচালনা করিয়াছে। মৃত্যু রুদ্রের প্রসাদ এই অর্থে। বলাকায় রবীন্দ্রনাথ গতির অন্তরে যে মৃত্যুর কল্পনা করিয়াছেন, তাহা ঠিক এই বিশেষ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা প্রেমের একটি দিক।

কথাটি কি স্পষ্ট হইল না? আরো একটু স্পষ্ট করিয়া দিই। আমার পূর্ববর্তী মনস্বী সমালোচকবৃন্দ সকলেই স্বীকার করিয়াছেন, বলাকা গতির কাব্য, চলার মন্ত্র ইহার বাণী। সাহস করিয়া মৃত্যুর অন্তরে যে চলিতে জানে, সেই পারে অমৃত আহরণ করিতে। বিশ্বপ্রকৃতি অহরহঃ চলিয়াছে। ফুল ফুটাইয়া, ফুল ঝরাইয়া, ফল ফলাইয়া, ফল পাকাইয়া, বীজ জাগাইয়া, অঙ্কুর হাসাইয়া অহরহঃ চলিয়াছে; তাই সে অমৃতময়ী, তাই সে সত্যস্বরূপা। ফুল ফুটাইয়া হাসে, ফুলের মরণ আনিয়াও হাসে—কারণ ফুলের মরণে জাগে ফল; এমনি করিয়া মরণে-মরণে নবজীবন, জীবনে-জীবনে নব মরণ, জীবনে-মরণে নিত্য চলন তাহার চলিয়াছে। [বলাকা-৮-১৮-৩৬-৩৭] পায়ের তলায় এই যে তুচ্ছতম তৃণগুচ্ছ, চলিতে জানে বলিয়া ইহারাও তাই বুঝি অসত্য নহে:

এই তৃণ
বিশ্বের চরণতলে লীন
এরা যে অস্থির, তাই এরা সত্য সবি।

অস্থির বলিয়াই, চলিতে জানে বলিয়াই, ইহারা সত্য। স্থির যদি রহিত, নবজীবন লাভে তো সমর্থ হইত না! অঙ্কুর অঙ্কুরই রহিত, দূর্বা দূর্বাই রহিত, তৃণ যেমনটি আছে তেমনটিই রহিত! হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই, মৃত্যু নাই সুতরাং জীবন নাই—অচল, স্থবির এই গতিবিহীন ছবি তো জগৎ ধর্মেরই বিপরীত, অতএব মিথ্যা নয় তো কী!

এই অস্থিরের আনন্দ, চলার আনন্দ, সংসারে সন্নার আনন্দ, বৈরাগ্যের আনন্দ আছে বলিয়াই প্রকৃতি সত্য—

মরি মরি সে আনন্দ থেমে যেত যদি
এই নদী
হারাত তরঙ্গবেগ,
এই মেঘ
মুছিয়া ফেলিত তার সোনার লিখন। [৬]

কিন্তু নদী তাহার 'তরঙ্গবেগ' হারায় নাই, মেঘ মুছিয়া ফেলে নাই 'সোনার লিখন'। প্রকৃতি যে গতির রঙ্গ-রহস্য জানে। প্রকৃতির বিচিত্র রূপলীলার অন্তরে কালের এই গতি-রহস্য। এই গতি রূপে রূপে নবরতি, তরঙ্গে তরঙ্গে নবীনানন্দের প্রাণচাঞ্চল্য। কিন্তু 'মুহূর্তের তরে' এই গতি যদি স্তব্ধ হয়, তা হইলে কি হয়? সৃষ্টিই স্তব্ধ হইয়া যায়।

যদি তুমি মুহূর্তের তরে
ক্লান্তি ভরে
দাঁড়াও থমকি,
তখনি চমকি
উচ্ছি য়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে ;
পঙ্গু মূক কবন্ধ বধির আঁধা
স্থূলতনু ভয়ংকরী বাধা
সবারে ঠেকায়ে দিয়ে দাঁড়াইবে পথে ,
অণুতম পরমাণু আপনার ভারে
সঞ্চয়ের অচল বিকারে
বিদ্ধ হবে আকাশের মর্মমূলে
কলুষের বেদনার শূলে। [৮]

এমনতর মহাপাপ, মহাতামসিকতা জগৎপ্রকৃতিতে যে নামে নাই তাহার কারণ কালের এই সৃষ্টি নৃত্যবেগে চলিতেই জানে, থামিতে জানে না। কবি পুলকিত হইয়া গাহিতেছেন :

ওগো নটী, চঞ্চলা অপ্সরী,
অলক্ষ্য সুন্দরী,
তব নৃত্য মন্দাকিনী নিত্য ঝরি ঝরি
তুলিতেছে শুচি করি
মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবন।
নিঃশেষ নির্মল নীলে বিকাশিছে নিখিল গগন। [৮]

'মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবন' হয় অভিস্নাত, হয় পবিত্র; পুরাতন জীর্ণ বাস পরিত্যাগ করিয়া নূতনের বস্ত্র করে পরিধান,—তাহার পর আবার চলে নূতন হইতে নূতনতরের লক্ষ্য পথে। ইহাই প্রকৃতির গতি ও বৈচিত্র্যের রহস্য।

বুঝিলাম। কিন্তু মানুষ-জীবনের চলা কেমন? মানুষ-জীবন তো বিশ্ব-জীবন হইতে পৃথক নহে। তাহার চলাও এইরূপ চলা, এই মৃত্যুর মধ্য দিয়া চলা। সে কেমন? দুঃখের অগ্নিদাহ বীরের মত উপেক্ষা করিয়া, পাপের মধুর প্রলোভন মনুষ্যত্ব বিকাশে অতিক্রম করিয়া, বিচ্ছেদের দুঃসহ বেদনা হাস্যমুখে সহ্য করিয়া, অহং-এর লক্ষ অতিকৃতিকে আত্মার অগ্নিদাহনে শুদ্ধ ও রূপান্তরিত করিয়া—উঠা-পড়া, ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়া বীর সাধকের বিক্রমে যে চলা, সেই চলাকেই বলি মৃত্যুর মধ্য দিয়া অমৃত প্রেমের পথে চলা। এই চলার স্নানে অভিস্নাত পুণ্য মানুষই মানবিকতার মাহাত্ম্য প্রদর্শনে হয় সমর্থ, 'দেবতার অমর মহিমা' এই মানুষই বিকাশ করে আপন কর্মে ও চরিত্রে।

বুঝা গেল, মৃত্যু জীবনকে চালায়, চালায় প্রেমের পথে। কিন্তু প্রেম কি তবে জীবন হইতে বহুদূরে আছে?

দূরে আছে, আবার নিকটে আছে। মরণের সাধনায়, হৃদয়ের কাঁদনায়, চেতনার বেদনায় যতটুকু অধিকার জন্মিয়াছে, ততটুকু প্রেম নিকটে আছে অর্থাৎ যতটুকু 'হইয়াছি' ততটুকু নিকটে, যতটুকু হইতে বাকি আছে ততটুকু দূরে। শত মরণের পথ বাহিয়া আহরণ করিতে হইবে সেই দূরের প্রেম—সেই আমার অনন্ত সর্বজগদ্‌গত সর্বানুভূ প্রেম। তাহার যতটুকু রশ্মি আসিয়া আত্মায় পৌঁছিয়াছে তাহাতেই চঞ্চল পুলকে ঘরছাড়া হইয়াছি। না-পাওয়াকে পাইবার জন্য তাই দুর্বার গতি, সহস্র মৃত্যু। পূর্ণ সেই প্রেমকে পাইয়া গেলে মৃত্যুর কাজ অবশ্য শেষ হইবে। কিন্তু বিশ্ব-জীবনে পূর্ণের অভীপ্সাই আনন্দময়, চলাই নিত্য ও সত্য, পূর্ণকে পাইয়া গিয়া নির্বিকার নিষ্ক্রিয় হওয়া বিশ্বজীবনের অভিপ্রায় নহে। রবীন্দ্রদর্শনের অন্তরে সত্য এই। রবীন্দ্রদর্শনে চলার শেষ নাই। সেই কারণে মৃত্যুর আবির্ভাবেরও অন্ত নাই। এই জন্য শত মৃত্যুর মধ্য দিয়া 'অল্পে সুখ নাই' বলিয়া রবীন্দ্র-মানব কেবলি ছুটিতে থাকে। যত ছুটে, জীবনের ততই বিকাশ

ঘটে বৈচিত্র্যের অজস্র ঝলকে। জীবনের যত বিকাশ ঘটে, প্রেমকে ততই সে বৃহৎরূপে দেখিতে পায়। যত বৃহৎ দেখে, ততই তাহার চলার বেগ বাড়ে। মৃত্যুও নানাভাবে, নানারূপে আসিয়া সেই বেগ দেয় বাড়াইয়া। 'তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলেম শুধু লজ্জা' এই বলিয়া অপ্রতিহত গতিবেগে আঘাতের মধ্য দিয়া, অশান্তির মধ্য দিয়া, বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া সে ছুটিয়া চলে প্রেমের পূর্ণরূপটি আত্মায় প্রতিভাত করিবার উদ্দেশ্যে।

জীবন, গতি, মৃত্যু ও প্রেম—এই ভাবচতুষ্টয়ের সম্বন্ধ এইবার কল্পনা করুন। জীবনে গতি আছে, জীবন তাই নবজীবন লাভ করে। নবজীবনের মোহে আসক্ত হইয়া বিলাস সুখে হইতে চাহি গতিহীন আরামপ্রিয়, মৃত্যু আসিয়া দেয় নাড়া: উদ্বেজিত হইয়া মাতিয়া উঠি 'মরণবিহারে', আরামের থলিথালি ফেলিয়া অগ্রসর হই ত্যাগের পথে, আবির্ভূত হয় প্রেম। রূপে রূপে প্রতিরূপে লক্ষ্য করি প্রেমের মহিমা, 'এসো, এসো' শুনি আহ্বান; পূর্ণভাবে তাহাকে পাই না, আহ্বান শুনার তাই হয় না শেষ। প্রেমের এই যে আহ্বান, এই যে আকর্ষণ, শেষ নাই, ইহার শেষ নাই। জীবন যে জীবন, তা ইহারি জন্য: জগৎ যে জগৎ, তা ইহারি প্রভাবে।

ধ্রুবসুন্দর সেই পূর্ণ প্রেম জীবনের ক্ষেত্রে এমনি করিয়া করেন গতির লীলা, বৈচিত্র্যের লীলা, ইচ্ছা হয় তো বলুন, মৃত্যুর লীলা। প্রেমের আহ্বান যে শুনিয়াছে, ঘরছাড়া তাহাকে হইতেই হয়। প্রেম, বলাই বাহুল্য, চলিতে চাহে, চলিতে বলে। পথের পারে রাজকীয় সিংহাসনে বসাইয়া তাহাকে পূজা দিতে যান, সে আপনার পূজা লইবে না। আপনার আঁকড়াইয়া ধরা স্বভাবকে, সহজস্বভাবকে গ্রাহ্য করিবে না সেই প্রেম:

যে প্রেম সম্মুখ পানে
চলিতে চালাতে নাহি জানে,
যে প্রেম পথের মধ্যে পেতেছিল নিজ সিংহাসন,
তার বিলাসের সম্ভাষণ
পথের ধুলার মতো জড়ায়ে ধরেছে তব পায়ে,
দিয়েছ তা ধূলিরে ফিরায়ে। [৭]

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের মর্মকথা ইতিপূর্বে বহুবার, বহুক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করিয়াছি। বলিয়াছি, প্রেমে বৈরাগ্য এবং বৈরাগ্যে প্রেম—ইহাই রবীন্দ্র-প্রেমদর্শনের মূলতত্ত্ব। যে প্রেমে বৈরাগ্য নাই, যাহা 'চলিতে চালাতে নাহি জানে', তাহা প্রেমই নহে, কেননা

তাহা বিশেষে আসক্ত, তাহা বিলাসলুব্ধ, তাহা মলিন বাসনায় বন্দী ও অন্ধ। এমন প্রেম রবীন্দ্র কবিতায় যে কোথাও নাই, তাহা আমি বলি না ; এবং ইহাই বলি যে, এমন প্রেম হইতেই রবীন্দ্রকাব্য-জীবনের আরম্ভ হইয়াছে। তবে এ কথা রবীন্দ্রনাথের সমালোচক-বর্গকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, বাসনাবন্দী মলিন প্রেম হইতে রবীন্দ্রনাথের মন ক্রমশঃ উত্তীর্ণ হইয়াছে, আরো, আরো উত্তীর্ণ হইবার স্বপ্ন দেখিয়াছে। এই উত্তীর্ণ হওয়ার ধারাটি বর্তমান অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতেছি মাত্র। ব্যক্তিগত অহং প্রেম কেমন করিয়া বিশ্বগত আত্মার প্রেমে অগ্রসর হইতেছে, এক প্রেমই রূপে রূপে প্রকাশ পাইয়া কেমন করিয়া বৈচিত্র্যের মায়াজাল বিস্তার করিতেছে, আবার মনের বিচিত্র আবেগানুভূতি ভেদ করিয়া কবির দার্শনিক মনটি কেমন করিয়া সেই এক প্রেমেরই উদ্দেশ করিতেছে—বর্তমান অধ্যায়ে তাহার ব্যাখ্যাই আমি করিতেছি। এই 'এক প্রেম' বলিতে আমি সাধু সন্ন্যাসীদের প্রেম যে বুঝিতেছি না, তাহা পাঠক মহাশয় নিশ্চয়ই অনুমান করিয়াছেন। রবীন্দ্র-কল্পিত প্রেম, পূর্বেই বলিয়াছি, কোনো বিষয়েই আসক্ত নহে, শাস্ত্রসংস্কারে তো নহেই। এইজন্য তাঁহার প্রেমতত্ত্বে 'ঠিক পাইয়া গেছি' এই বাণীর প্রাধান্য নাই। পাঠক জানেন, রবীন্দ্রনাথ বন্ধনমুক্ত ও সংস্কারশূন্য হৃদয়েই নারী চিত্র আঁকেন, নারীর প্রেমের জয়গান গাহেন, যৌবনবোধের বিচিত্র অনুভূতিও তাঁহার রুচিশোভন ভব্য মনের আলোকে শুভ্রকুসুমের পবিত্রতার মতো বিকশিত হইয়া উঠে, কিন্তু মাত্র এইগুলিতেই স্থির থাকেন না ; তাঁহার পার্থিব প্রেমসম্পর্কিত রচনাগুলি যথাযথভাবে অনুসরণ করিলেই বুঝা যায়, নারীকে দেখিয়া যথাযথ পৃথিবীর নারী তিনি আঁকেন না, পরন্তু আপন মনের মাধুরী দিয়া আপন প্রেমমূর্তিরই আভাস আঁকিতে থাকেন। এই কথাটি এইভাবে বলিলে সম্ভবতঃ আমার বক্তব্যটি স্পষ্ট হয় যে, বস্তু-নারীর চিত্র হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অবস্তু, অলক্ষ্য সুন্দরীর ধ্যানেই তিনি বসিতে জানেন। নারী যা আছে তাহা নহে, নারী যাহা হইলে শ্রেয় হয়, প্রেয় হয়, তাহারই প্রেমে তিনি পড়িতে জানেন। বলা বাহুল্য, ইহাই রবীন্দ্রনাথের পার্থিব প্রেমের রহস্য। এই পার্থিব প্রেম রবীন্দ্রকল্পিত মহাপ্রেমের প্রতিকূল নহে। ইহাতেও মন গতি পায়, এ প্রেম চলিতে জানে, চালাইতে জানে ; রূপ হইতে অরূপে, বস্তু হইতে শিল্পে, শিল্প হইতে দর্শনে, তনু হইতে 'তনুর অতীতে' চলিতে ও চালাইতে জানে। যে প্রেম চলিতে-না চাহিয়া বস্তু-কামনাতেই সুখ চাহে আর কিছুতেই নহে, সে প্রেমের পদে পদে বিড়ম্বনা। এমন প্রেমই মৃত্যুকে ভয় করে, সর্বজগদ্‌গত প্রেমকে অস্বীকার করে, স্বার্থের অন্ধতায় রচনা করে মোহ-সংস্কারের গুপ্তধন, যাহা পাইয়া গেছে তাহাতেই তুষ্ট রহিয়া রুষ্ট করে জীবন-বিধাতাকে। এমন প্রেম রবীন্দ্রপ্রেম নহে। রবীন্দ্র-কল্পিত প্রেমে আছে নিত্য গতি, বৃহতে রতি, বৈরাগ্য, চলার মন্ত্র। রবীন্দ্রকাব্যসমূহের ইহাই ভাবব্যঞ্জনা। বলাকার সাত সংখ্যক কবিতাটির (শাজাহান) শেষাংশে এই ভাবটি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। রবীন্দ্রপ্রেম, সকলেই জানেন, জগৎকে অস্বীকার করে না,

রূপকে যথার্থই মর্যাদা দান করে, সৌন্দর্যের জয়গান গাহে অবারিত আনন্দে, কিন্তু জগৎ বা জগৎ-রূপ অথবা প্রকৃতি-সৌন্দর্য 'বিলাসের সম্ভাষণ' জানাইয়া তাহাকে বন্দী করিতে চাহিলে অবশ্যই নিরাশ হইবে; কারণ ধূলার জিনিস 'ধূলিরে ফিরাইয়া' দিয়া নিত্যযাত্রী সেই বৈরাগী প্রেম অন্তহীন সম্মুখের দিকে যাইবে চলিয়া।

'শাজাহান' কবিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, এই স্থলে তাহার উদ্ধৃতির প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন:

"শাজাহানকে যদি মানবাত্মার বৃহৎ ভূমিকার মধ্যে দেখা যায় তাহলে দেখতে পাই, সম্রাটের সিংহাসনটুকুতে তাঁর আত্মপ্রকাশের পরিধি নিঃশেষ হয় না—ওর মধ্যে তাঁকে কুলোয় না বলেই এত বড়ো সীমাকেও ভেঙে তাঁর চলে যেতে হয়—পৃথিবীতে এমন বিরাট কিছুই নেই যার মধ্যে চিরকালের মতো তাঁকে ধরে রাখলে তাঁকে খর্ব করা হয় না। আত্মাকে মৃত্যু নিয়ে চলে কেবলি সীমা ভেঙে ভেঙে। তাজমহলের সঙ্গে শাজাহানের যে সম্বন্ধ সে কখনোই চিরকালের নয়—তাঁর সঙ্গে তাঁর সাম্রাজ্যের সম্বন্ধও সেইরকম। সে সম্বন্ধ জীর্ণ পত্রের মতো খসে পড়েছে, তাতে চিরসত্যরূপী শাজাহানের লেশমাত্র ক্ষতি হয় না।

"তাজমহলের শেষ দুটি পংক্তির সর্বনাম 'আমি' ও 'সে'—যে চলে যায় সেই হচ্ছে 'সে', তার স্মৃতিবন্ধন নেই; আর, যে অহং কাঁদছে সেই তো ভার-বওয়া পদার্থ। এখানে 'আমি' বলতে কবি নয়, 'আমি-আমার' ক'রে যেটা কান্নাকাটি করে সেই সাধারণ পদার্থটা। 'আমার বিরহ, আমার স্মৃতি, আমার তাজমহল' যে মানুষটা বলে তারই প্রতীক ওই গোরস্থানে; আর মুক্ত হয়েছে যে, সে লোক-লোকান্তরের যাত্রী—তাকে কোনো একখানে ধরে না; না তাজমহলে, না ভারত সাম্রাজ্যে, না শাজাহান নামরূপধারী বিশেষ ইতিহাসের ক্ষণকালীন অস্তিত্বে।"

অন্যত্র আবার—

"বেগমমণ্ডলী পরিবৃত বাদশার যে প্রেম, কালিদাস হংসপদিকার মুখ থেকে তাকে লাঞ্ছিত করেছেন। সে প্রেম চলিত পথের। ধূলোর উপরে তার খেলাঘর। মমতাজ যথাসময়ে মারা গিয়েছিল বলেই বিরহের একটি সজীব বীজ সেই খেলাঘরের ধূলির উপরে পড়ে ধূলি হয়ে যায়নি, ক্লান্তিপ্রবণ বিলাসের ক্ষণভঙ্গুরতা অতিক্রম করে অঙ্কুরিত হয়েছিল। তার ভিতরকার অমরতা ক্ষণকালের পরমা স্মৃতিকে বহন করে রয়ে গেল। যে বেদনাকে সেই স্মৃতি ঘোষণা করেছে, তারই সঙ্গে সঙ্গে তার আর একটি ঘোষণা আছে; তার বাণী হচ্ছে এই যে, সেই শাজাহানও নেই, সেই মমতাজও নেই, কেবল যাত্রা-পথের এক অংশের ধূলির উপরে জীবনের ক্রন্দনধ্বনি বহন করে রয়ে গেছে তাজমহল। দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রেমের মধ্যে একটা মহিমা আছে, দুই তপোবনের মাঝখান দিয়ে সে গেছে অমরাবতীর দিকে—তার সংকীর্ণ খেলাঘরের বেড়া ভেঙে গিয়েছিল, তাই প্রথম

বিলাসবিভ্রমের বিস্মৃতিকে উত্তীর্ণ হয়ে সে তপঃপূত চির-স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে বিরাজ করছে ; সে প্রেম দুঃখবন্ধুর পথে অন্তহীন সম্মুখের দিকে চলে গিয়েছে, সম্ভোগের মধ্যে তার সমাপ্তি নয়।" [বলাকা, নূতন সং, পৃ. ১০৮-৯]।

যে প্রেম দুঃখবন্ধুর পথে অন্তহীন সম্মুখের দিকে চলিতে জানে, আমার বক্তব্য এই যে, তাহাই রবীন্দ্রপ্রেম ; আবার সম্মুখের দিকে, বৃহতের দিকে যে প্রেমের নিত্য আকর্ষণ, বৈরাগ্যই তাহার অপর নাম। এই বৈরাগ্য-প্রেমই রবীন্দ্রকাব্য প্রতিভার dynamic force. রবীন্দ্র-দর্শনজীবনের 'Summun bonum'। বৈরাগ্য-প্রেমের যথার্থ স্বরূপটি জানা হইলে 'শাজাহান' কেন, রবীন্দ্রনাথের কোনো কবিতাই আর দুর্বোধ্য বোধ হয় না। পৃথিবীকে ভালোবাসি আবার পৃথিবীকে ছাড়িতে চাই—এই 'একান্ত করে চাওয়া' আবার 'একান্ত ছেড়ে যাওয়া'—এই দুই মনোভাব পরস্পরবিরোধী মনোভাব নহে। 'চাই' এবং 'চাইনে'র মধ্যপথে অবস্থিত প্রেম, বেদান্তের ভাষায় তৃতীয় ও চতুর্থের মধ্যবর্তী মন—'চাই' বলিয়া বস্তুজগতের টানে আসে, বস্তুজীবনের গান করিতে চায়, আবার 'চাইনে' বলিয়া 'পথের প্রেমে' মাতে, 'পেরিয়ে চলার' 'এগিয়ে চলার' গাহে গান। ব্যক্তিগত প্রেম ঘরের মোহে আনে টানিয়া, বিশ্বগত প্রেম বাহিরের পথে দেয় ঠেলিয়া। টানিয়া-আনা আর ঠেলিয়া-দেওয়া—এই দুই-ই প্রেমের কাজ, ঐ বৈরাগ্য-প্রেমের, সর্বজগদ্‌গত মহাপ্রেমের কাজ। এই প্রেমই ইতি-নেতির সমন্বয়, জীবন-মরণের সমন্বয়, রূপারূপের সমন্বয়, ভোগ-যোগের সমন্বয়। এই প্রেম আছে বলিয়াই বিশ্ব-প্রকৃতি মায়া নহে, জগৎ-ব্যাপার ঈশ্বরের প্রবঞ্চনা মাত্র নহে :

এমন একান্ত করে চাওয়া
এও সত্য যত,
এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া
সেও সেই মতো।
এ-দুয়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোনো মিল ;
নহিলে নিখিল
এত বড় নিদারুণ প্রবঞ্চনা
হাসিমুখে এতকাল কিছুতে বহিতে পারিত না।
সব তার আলো
কীটে-কাটা পুষ্প সম এতদিনে হয়ে যেত কালো॥ [১৯]

কিন্তু জগতের আলো প্রেমাশ্রিত বলিয়া 'কীটে কাটা পুষ্পের' মত কালো হইয়া যায় নাই—চিরদিন 'আলোয় আলোকময়' হইয়াই আছে। প্রেমাশ্রিত হইয়া, প্রেমাশ্রিত জগৎপ্রকৃতিকে দেখিলে জগৎপ্রকৃতি সত্য ও সুন্দর। প্রেমের দৃষ্টিই যাহার নাই,

জগৎকে সে ভালোবাসে না, বিশ্বজগৎ তাহার কাছে মিথ্যাই মনে হয়। বলাকার ১৭নং কবিতাটিতে এই সত্যটি কবিগুরু ইঙ্গিতে বুঝাইয়াছেন :

হে ভুবন,
আমি যতক্ষণ
তোমারে না বেসেছিনু ভালো
ততক্ষণ তব আলো
খুঁজে খুঁজে পায় নাই তার সব ধন।
ততক্ষণ
নিখিল গগন
হাতে নিয়ে দীপ তার শূন্যে শূন্যে ছিল পথ চেয়ে॥

জগৎপ্রকৃতির অন্তহীন ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও সে যেন পূর্ণা নহে, কী যেন অহরহঃ সে খুঁজিতেছে। প্রেমের দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিব, তবেই না সে পূর্ণা হইবে, তাহার "সব ধন" সে খুঁজিয়া পাইবে, আলোর মধ্যে জাগাইবে নূতনতর রূপ, রূপ হইতে অরূপের মহিমা? তাই যখনি তাহাকে ভালোবাসিলাম, অর্থাৎ যখনি প্রেম আসিল, 'সব ধন' তাহার তখন মিলিয়া গেল, আর কি সে তখন অপূর্ণা রহিল?

মোর প্রেম এল গান গেয়ে ;
কী যে হল কানাকানি,
দিল সে তোমার গলে আপন গলার মাল্যখানি।
মুগ্ধ চক্ষে হেসে
তোমারে সে
গোপনে দিয়েছে কিছু যা তোমার গোপন হৃদয়ে
তারার মালার মাঝে চিরদিন রবে গাঁথা হয়ে॥

প্রেমের সহিত মিলনে ও মালাবদলের ফলে প্রকৃতিরূপের ব্যঞ্জনা হইল গভীরতর। প্রেম প্রকৃতিকে দিল প্রেম, প্রেমের দৃষ্টিতে দেখিল প্রকৃতিকে, তাইতো তারার মালায়, চন্দ্রের জ্যোৎস্নায়, সূর্যের প্রভাতে, আকাশের নীলিমায় এত ঐশ্বর্য, এত আনন্দ, এত মহিমা। প্রেম আছে বলিয়াই তো আকাশে এত আলো, নক্ষত্রে এত ইঙ্গিত।

কিন্তু থামি। কথাটা কোথায় যেন একটু জটিল হইয়াছে ; কেহ কেহ হয়তো দুর্বোধ্যও মনে করিতেছেন। প্রশ্ন এই : এ প্রেম কাহার প্রেম? কবির? মানুষের? ঈশ্বরের?

বলা বাহুল্য, সব প্রেমই ঈশ্বরের প্রেম, প্রেমই তো ঈশ্বর! তবে জীবাত্মার উপরেই আছে এই প্রেম প্রকাশের অধিকার। ঈশ্বরের প্রেমের ক্ষেত্র হইতেছে জীবাত্মা, এই মানুষ। মানুষই প্রেম সাধনা করিয়া, সাধন-স্বভাবকে অন্তরে জাগাইয়া, দুঃখের, শোকের,

বিচ্ছেদের, বৈরাগ্যের মধ্য দিয়া মানবিকতার মাহাত্ম্য জাগাইতে জাগাইতে—"একে একে ফেলে ভার মরণে মরণে" 'মাটির ধরণীতে' স্বর্গ রচিতে চলিয়াছে।

তুমি তো গড়েছ শুধু এ মাটির ধরণী তোমার
মিলাইয়া আলোকে আঁধার।
শূন্য হাতে সেথা মোরে রেখে
হাসিছ আপনি সেই শূন্যের আড়ালে গুপ্ত থেকে।
দিয়েছ আমার 'পরে ভার
তোমার স্বর্গ টি রচিবার॥ [২৮]

এই স্বর্গ-রচার ইঙ্গিতার্থ হইতেছে প্রেম। দুঃখ-শুদ্ধ, বৈরাগ্য-শুভ্র, মৃত্যু-মধুর নবীন এই প্রেম,—মানুষের দ্বারে এই প্রেমই প্রার্থনা করেন প্রেমেশ্বর।

আর সকলেরে তুমি দাও
শুধু মোর কাছে তুমি চাও।
আমি যাহা দিতে পারি আপনার প্রেমে,
সিংহাসন হতে নেমে
হাসিমুখে বক্ষে তুলে নাও।
মোর হাতে যাহা দাও
তোমার আপন হাতে তার বেশি ফিরে তুমি পাও॥ [২৮]

আমাকে তুমি দান করিয়াছ প্রেম। সেই প্রেম 'আগুনের পরশমণির' মতো দহন-দানে দগ্ধ করিয়াছে আমার অন্তর। শুদ্ধ হইয়াছি, নবীনজীবনে উদ্বুদ্ধ হইয়াছি, লক্ষ মরণে অমর জীবন লাভ করিয়াছি, তাহার পর সেই মরণদিব্য অগ্নিকল্প মহান জীবন-প্রেম দান করিয়াছি তোমাকে। যাহা তুমি দিয়াছ, মানুষ হইয়া এই আমার গৌরব, তাহার বেশি তোমাকে দিয়াছি ফিরাইয়া। তাইতো আমার এই প্রেমকে—

সিংহাসন হতে নেমে হাসিমুখে বক্ষে তুলে নাও।

গূঢ়ার্থ এই, এ প্রেম মানুষ যত প্রকাশ করিবে, মর্ত্যধরণী ততই স্বর্গ হইতে থাকিবে। ধরণীকে স্বর্গ করার, প্রিয়কে দেবতা করার এবং হে দেবতা, তোমাকে প্রেমের টানে প্রিয়-রূপে নামাইয়া আনিয়া এই প্রেমোপহার প্রদান করার ভার দিয়াছ আমাকে।

দিয়েছ আমার 'পরে ভার।
তোমার স্বর্গ টি রচিবার॥

✓বলাকা বাহ্যতঃ গতির কাব্য হইলেও অন্তরতঃ ইহা প্রেমেরি কাব্য। ড. সুবোধচন্দ্র ইহাকে 'গীতিকাব্য' বলিয়া গভীর রসজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন বলিয়া আমি মনে করি। [রবীন্দ্রনাথ, পৃ. ১৬৩ দ্রষ্টব্য]। ইহা গীতিকাব্য, প্রেম ইহার বক্তব্য বিষয়। 'যে প্রেম সম্মুখ পানে' চলিতে ও চালাইতে জানে, সেই প্রেমই বলাকার ব্যঞ্জনা। 'বলাকা' নামের

যে ব্যাখ্যা কবি স্বয়ং দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে পাঠকের এই ধারণা আরো বদ্ধমূল হইবে। কবি বলিয়াছেন :

"বলাকা নামের মধ্যে এই ভাবটা আছে যে, বুনো হাঁসের দল নীড় বেঁধেছে, ডিম পেড়েছে, তাদের ছানা হয়েছে, সংসার পাতা হয়েছে, এমন সময়ে তারা কিসের আবেগে অভিভূত হয়ে পরিচিত বাসা ছেড়ে পথহীন সমুদ্রের উপর দিয়ে কোন্ সিন্ধুতীরে আর এক বাসার দিকে উড়ে চলেছে।

"সেদিন সন্ধ্যায় আকাশপথে যাত্রী হংসবলাকা আমার মনে এই ভাব জাগিয়ে দিল—এই নদী, বন, পৃথিবী, বসুন্ধরার মানুষ, সকলে এক জায়গায় চলেছে; তাদের কোথা থেকে শুরু, কোথায় শেষ, তা জানি নে। আকাশের তারার প্রবাহের মতো, সৌরজগতের গ্রহ উপগ্রহের ছুটে চলার মতো, এই বিশ্ব কোন্ নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে প্রতি মুহূর্তে কত মাইল বেগে ছুটে চলেছে। কেন তাদের ছুটাছুটি তা জানি নে, কিন্তু ধাবমান নক্ষত্রের মতো তাদের একমাত্র এই বাণী—এখানে নয় এখানে নয়।" [বলাকা, নূতন সং, পৃ. ১১৩]

উদ্ধৃত অংশে "কিসের আবেগে" এবং "কোন্ নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে" এই দুইটি ইঙ্গিতের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। কবি যে ভাবটিকে শুদ্ধমাত্র ইঙ্গিতের দ্বারা আচ্ছন্ন ও অস্পষ্ট রাখিতে চাহিয়াছেন—বলাকা যিনি ধীরভাবে পাঠ করিয়াছেন তাঁহার কাছে সেই ভাবটি মোটেই দুর্বোধ্য, রহস্যময় বা হেঁয়ালী বলিয়া মনে হইবে না। প্রেমের আবেগে সর্বজগদ্গত প্রেমেরি উদ্দেশ্যে লক্ষ মরণ অতিক্রম করিয়া নিত্য অগ্রগতির যে আনন্দ, সেই আনন্দই এই ইঙ্গিতের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। এই আনন্দ, অনাগতের আনন্দ, নূতনকে পাইবার সাধনায় পুরাতনের মধ্যে মরিবার আনন্দ, পরিচিত বাসা ছাড়িয়া অজানা কোন্ সিন্ধুতীরে উড়িয়া চলার আনন্দ, যা-আছি তা নহে, শ্রেয়ের স্বপ্নানন্দ,—গীতাঞ্জলির ভাষায়, 'ফেলে দেবার, ছেড়ে দেবার মরবারই আনন্দ' [৩৬]। ইহাই কি রবীন্দ্রকল্পিত প্রেমের স্বরূপ নহে? বলাকাতে কি এই প্রেমই ব্যঞ্জিত হয় নাই? এই প্রেমকে বাদ দিয়া রবীন্দ্রমানসের গতিতত্ত্ব তথা প্রেমতত্ত্বের ব্যাখ্যা কি আপনি করিতে পারেন? রবীন্দ্রনাথের সাধারণ পার্থিব প্রেম-কবিতাগুলির মধ্যেও কি এই প্রেমের অঙ্কুর দেখেন নাই? তাঁহার ভাগবত সঙ্গীতগুলির মধ্যেও যে অধ্যাত্মসৌন্দর্যের প্রকাশ আপনি দেখিয়াছেন, তাহা কি এই প্রেমের আশ্রয়েই প্রমুদিত হইয়া উঠে নাই? রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মবাদ কি এই প্রেমের পরিপন্থী?

রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মবাদ, পূর্বেই দেখাইয়াছি, জীবনবিমুখ, কর্মবিমুখ অধ্যাত্মবাদ নহে। তাঁহার 'তুমি-আমি' বিষয়ক কবিতাগুলিতে আত্মপ্রস্তুতির সংকল্প ও সাধনার ধ্বনিই আস্বাদন করিয়াছি। এই আত্মপ্রস্তুতির সাধনা মানুষ ছাড়িয়া জীবন ছাড়িয়া কর্মবিহীন 'স্বর্গ সাধনা' নহে—পরন্তু কর্মের দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা, আত্মত্যাগের দ্বারা,

মাটির পৃথিবীতে স্বর্গ রচনার সাধনা। এই সাধনা পৃথিবী প্রেম ও মানবপ্রেমই ব্যঞ্জিত করে।

গীতালিতে যে কবি বলিয়াছেন, 'মোর মরণে তোমার হবে জয়', অথবা 'মোর প্রেমে যে তোমার পরিচয়' তাহা কি আমরা যথার্থ রাবীন্দ্রিকভাবে ব্যাখ্যা করিয়া লইয়াছি? নব নব মরণের ফলেই আমার অগ্রগতি, ইহাই তো জীবনের বিস্তৃতি! এমনতর বিস্তৃতির সাধনায় আয়াস আছে, দুঃখ আছে, বেদনা আছে, অশান্তি আছে। ইহা সাধারণতঃ আমরা চাহি না—অর্থাৎ মরণকে ভয় করি, বিলাস লইয়া, মোহ লইয়া, অহং লইয়াই বাঁচিতে চাহি; তাই তো আমার জীবনে তোমার প্রকাশ হয় না, জয় হয় না। তোমাকে পাইবার আশায় যত মরিব, ততই তো হৃদয়ের নিকট তুমি স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইবে। যত মরি, ততই হইতে থাকি; যত হইব, দিশি দিশি দেশে দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িব, প্রেমে গানে গন্ধে বসন্তের আনন্দের মতো প্রকাশ পাইব পথে-পথে, লোকে লোকে—ততই আমার জীবনে তোমার মহিমা প্রকাশ পাইবে। তখন মানুষ আমার কর্মে, আমার ধর্মে, আমার ভাবে, আমার মহত্বে তোমার পরিচয় পাইবে। অনুভব করিবে 'মোর প্রেমে যে তোমার পরিচয়'।

এই প্রেম মানবিকতার পরিপন্থী নহে। বলাকা এই প্রেমেরই আনন্দোদ্বেজিত অভূতপূর্ব গীতিকাব্য।

আপনাকে তো দিলেম তারে, তবু হাজার বার
নূতন করে দিই যে উপহার।
চোখের কালোয় নূতন আলো ঝলক দিয়ে ওঠে,
নূতন হাসি ফোটে,
তারি সঙ্গে যতনভরা নূতন বসনখানি
অঙ্গ আমার নূতন করে দেয় যে তারে আনি॥ [৩৮]

/বলাকা প্রেমের কাব্য, অন্তহীন দূরের প্রেমব্যঞ্জনা আছে এই কাব্যে। ঘর হইতে বাহির হইয়া অজানা কোন্ সিন্ধুতীরে আর কোনো নূতন বাসার প্রেমে মানুষ চলিয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন এই: পথ চলিতে চলিতে পথের দুধারে সে যা দেখিয়া যায়, শিখিয়া যায়, অনুভব করিয়া যায়, তাহার মূল্য কি কিছুই নাই? জীবনে একদা যাহা ছিল, যাহা হইতে 'ভারমুক্ত' হইয়া মৃত্যুর টানে, চলার টানে বাহির হইয়া আসিয়াছি, যাহা পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে শাজাহানের 'তাজমহলের' মতো, কিংবা যাহা অতিদূর বনান্ধকারের কুঞ্জকেশ খদ্যোতশিখার মতো টিপিটিপি করিয়া আজ জ্বলিতেছে, জীবন বিধাতার প্রেমের রাজ্যে

সত্য সত্যই তাহা কি উপেক্ষিত, তাহা নগণ্য? "একান্ত ছেড়ে যাওয়াই" সত্য, "একান্ত করে চাওয়া" সত্য নহে?

জীবন-নিরপেক্ষ প্রেম বা ভক্তির নিকট অবশ্যই সত্য নহে। পণ্ডিতগণ নিশ্চয়ই অনুভব করেন, জীবন-নিরপেক্ষ প্রেমের নিকট অতীত নাই, ভবিষ্যৎ নাই; ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান এক হইয়া নিশ্চুপ নির্বাণের মতো নির্বিকার আনন্দে তাহা নিশ্চল ও নিষ্ক্রিয়। আমি বৈদান্তিক নৈষ্ঠিকী শান্তির আনন্দ-প্রেমের কথা বলিতেছি।

কিন্তু জীবনগত প্রেম, বলা বাহুল্য, এমন নহে। তাহার অতীত আছে, বর্তমান আছে, ভবিষ্যৎ আছে। তাহার নিকট অতীতের অহংমত্ত প্রেম অসত্য নহে, বর্তমানের দ্বন্দ্ব-চঞ্চল প্রেম অসত্য নহে, ভবিষ্যতের আনন্দ-প্রসন্ন প্রেম অসত্য নহে। অতীত বর্তমানকে আনিয়াছে, বর্তমান অতীতকে স্মরণ করিতেছে, স্মরণের মরণাবেগে ফুলিয়া ফুলিয়া অন্তহীন অজানায় ঝাঁপাইতেছে। বর্তমান জীবনের, মনোজীবনের, রহস্যই এই: ইহার একদিকে অতীত, অতীতজীবনের বেদনায় স্মৃতি, মধুময় আবেগ, সুখময় প্রেম, 'একান্ত করে চাওয়ার' আনন্দ। অপরদিকে ভবিষ্যৎ, ভবিষ্যজীবনের সূর্যোদ্দীপ্ত উদার আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বগত চেতনার সর্বব্যাপী নির্মুক্তি, পরমা নির্বৃতির স্বপ্ন, 'একান্ত ছেড়ে যাওয়ার' আনন্দ। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান এই তিন কালের অখণ্ড মূর্তি হইতেছে মনোময় মহাকাল। মনের অতীতে অবশ্য কালের চিহ্ন নাই, কিন্তু মন যাঁহার আছে কাল তাঁহার অবশ্যই আছে। এই কালের লীলা এই, একদিকে যেমন 'জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা' এই বলিয়া পৃথিবীর কিছুকেই সে উপেক্ষা দেয় না, অপর দিকে তেমনি 'অন্য কোথা অন্য কোনোখানে' বলিয়া কিছুকেই আবার ধরিয়া রাখিতে চাহে না। দুর্বার গতিরঙ্গে ইহা চলিয়া যায়—চলার পথে ফুটাইয়া চলে লক্ষবিধ গন্ধকুসুম, লক্ষবিধ বৃক্ষপত্রলতাপল্লব, লক্ষ সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র। মুহূর্তের জন্য থামে না, ইহা যেমন সত্য, চলার বেগে বিশ্বপ্রকাশ করে, ইহাও তেমনি সত্য। কিন্তু বলার কথা এই: বিশ্বপ্রকাশের কোনো স্মৃতি তাহার মধ্যে কি থাকে না?

মনোজীবনের, তথা মনোগত প্রেমজীবনের, রহস্য এই, চলার মন্ত্রের ফাঁকে ফাঁকে গুঞ্জরিতে থাকে থামার কলধ্বনি। পথ-চলা সত্য, কিন্তু পথ-চলার সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যতঃ না থামিয়াও অন্তরতঃ থামিয়া থাকার কথা সত্য। লোকে দেখিতেছে: পথিক চলিতেছে। লক্ষ মরণের টানে পথিক চলিতেছেই বটে, কিন্তু মরণ তাহার মধ্যে নব নব জীবনের যে প্রকাশ-ছবি রাখিয়া যায়, মন কি তাহার স্পর্শানুভূতি নিশ্চিহ্ন ভাবেই ফেলে মুছিয়া? তাহা কি মর্মের কোণে মাঝে মাঝে উদিত হইয়া উদ্বেজিত বেদনায়, উল্লসিত আবেগে, রোমাঞ্চিত চেতনানন্দে তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলে না? অতীতের সেই বেদনাময়, চেতনাময় জীবনটিকে আঁকড়াইয়া ধরিতে সে চাহে না বটে, কিন্তু তাহা নাই, এমন কথা সে কেমন করিয়া বলিবে? তাহা যে তাহার মরণ হইয়া নূতন জীবনরস তাহাকে পান করাইতেছে।

প্রেমের রহস্যই এই। ইহার উত্তরে বলাকা, দক্ষিণে পলাতকা। মনোময় প্রেম-ব্রহ্মের নিকট দুইই সত্য : বলাকা সত্য, পলাতকা সত্য। সংসার হইতে সরা সত্য, সংসারের মধ্যে ফেরা সত্য। সরিতে সরিতে ফেরা সত্য, ফিরিতে ফিরিতে সরা সত্য। 'চাইনে' বলিয়া চাই সত্য, 'চাই' বলিয়া চাইনে সত্য। বৈরাগ্য সত্য, প্রেম সত্য। বৈরাগ্য ও প্রেমকে এক করিয়া অখণ্ড সেই বিশ্বপ্রেম সত্য। সেই সত্যের আলোকে বিশ্ববিধাতার রাজ্যে ক্ষয় নাই, লয় নাই কিছুরই।

জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা,
ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা
পূর্ণের পদপরশ তাদের 'পরে। [গীতালি-১০৭]

আজ যাহা পলাতকা, যাহা পলাইয়াছে, তাহা কী-ভাবে, কী-রূপে রহিয়া গেছে তাহা কি জানিতে চাহিয়াছি? সংসার সরিতেছে, জগৎ চলিতেছে, আমি চলিতেছি, বিশ্বলোক চলিতেছে, কিন্তু পশ্চাতে যাহা ফেলিয়া গেছি মনে করিতেছি—তাহাও যে আমার মধ্যে চলমান শক্তি হইয়া অহরহঃ চলিতেছে! যে 'ছবি'টিকে 'শুধু পটে আঁকা' নিশ্চল ছবি মনে করিয়াছি, 'কবির অন্তরে কবি'-রূপে, প্রেরণাদায়িনী শক্তি ও গতিরূপে সেও যে চঞ্চল হইয়া চলিয়াছে!

পলাতকা

অতীতের পানে চাহিয়া জীবনগতির পলাতকাস্মৃতির ছবিগুলি একবার দেখুন, দেখিবেন আপনারও জীবনগতির তরঙ্গে তরঙ্গ মিলাইয়া দুল্‌কি চালে কেমন তাহারা চলিয়াছে। এই যে জীবনের পলাতকার স্মৃতি, প্রেম ইহাকে অসার্থক বলে নাই, চলার পথে ইহা অন্তরায়ও নহে। জীবনের পথে চলিতে চলিতে কবে কাহাকে ভুলিয়া গিয়াছি, কবে কাহাকে ফাঁকি দিয়াছি, কে কোথায় হিসাবের খাতার মধ্যে এতটুকু 'শিশুহাতের হিজিবিজি আঁচড়' কাটিয়া সরিয়া গেছে, কোথায় কে যাপন করিয়াছে 'দশের-ইচ্ছা-বোঝাই করা' বন্দী জীবন, তাহার পর অকালেই পৃথিবী হইতে গেছে ঝরিয়া, মনে রাখিবার কথা এ সব নয় বোধ হয়, কিন্তু প্রেমজীবনে 'কিছুই যাবে না ফেলা'। প্রেম ইহাদের লইয়া স্থবির হইয়া পড়িয়া থাকে না—বরং এই কথাই সত্য যে, ইহাদের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াই চলিতে চায়, কিন্তু ইহাদের সচকিত উদ্বেজিত স্মৃতির শিহরণ তাহাকে যে দোলা দেয়, নাড়া দেয়, তাহা তো মিথ্যা নহে। জীবন্ত জীবনের মধ্যে সঞ্চারিত থাকিয়া ইহারাও চলে, রসানন্দ আনিয়া দেয় জীবনে, চলার বেগ দেয় বাড়াইয়া।

'পলাতকার' মধ্যে যে দুঃখ ও মৃত্যুর কাহিনী আছে—পড়িতে পড়িতে বুক গুর গুর করিয়া উঠে, অননুভূত ট্র্যাজেডির রসানন্দে হৃদয় পূর্ণ হইয়া যায়। নিতান্ত বস্তুজীবনে যা ঘটে, বাঙালীজীবনে শতকরা অষ্টনব্বুই জন নারীর জীবনে যা হয়, একাধিক কবিতায় তাহার বাস্তব চিত্র পলাতকায় অংকিত হইয়াছে। অকৃতার্থ জীবনের মর্মন্তুদ কাহিনীগুলির মধ্যে রবীন্দ্র-প্রেমমানসের যে বিশেষরূপটি প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা বাদ দিলে রবীন্দ্র-প্রেমের অখণ্ড দর্শন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা হয় না। হৃদয়বান প্রেমিকের নিকট, প্রেমের নিকট, অকৃতার্থ জীবনের তুচ্ছতম ঘটনাগুলিও মৃত্যুর মত মধুর ও প্রেরণাময়। তুচ্ছতম ঘটনা হইতেও জীবন যে নাড়া পায়, ছাড়া পায়, পলাতকার কবিতায় তাহাই গুঞ্জরিত হইয়াছে। অসাড় মনে যাহার দিন কাটিল, জীবনে বসন্ত যাহার একবারও আসিল না, শুধু মরণক্ষণে একবার মাত্র দেখা দিয়া গেল করুণকান্ত বেদনার মূর্তিতে, সংসারে কে-ই বা তাহাকে মনে রাখে? তবু এ কথা কি সত্য নয় যে, তাহার স্মৃতিও চকিত চমকে প্রাণের মধ্যে বেদনার তরঙ্গ তোলে? সেই অসহায়া স্বর্গতা পলাতকার দুই একটা টুকরা কথার বসন্ত-গন্ধ অতীতের বাতাস হইতে ভাসিয়া আসে, হৃদয়কে বেদনাতুর করে, যৌবনকে উদ্বেল করে, মৃত্যুর ক্ষণিক তীব্রানন্দে?

মুক্তি লইবার অব্যবহিত পূর্বে বন্দিনী বলিয়া গেল :

প্রথম আমার জীবনে এই বাইশ বছর পরে
বসন্তকাল এসেছে মোর ঘরে।
জানলা দিয়ে চেয়ে আকাশ পানে
আনন্দ আজ ক্ষণে-ক্ষণে জেগে উঠছে প্রাণে—
আমি নারী, আমি মহিয়সী,
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্না-বীণায় নিদ্রাবিহীন শশী।
আমি নইলে মিথ্যা হ'ত সন্ধ্যাতারা-ওঠা,
মিথ্যা হ'ত কাননে ফুল ফোটা॥ [মুক্তি, পলাতকা]

দিবারাত্রি 'এক চাকাতেই বাঁধা' থাকিয়া এই মহিয়সীই যখন 'পাকের ঘোরে আঁধা' থাকিত, কে তাহার এই মনের খবর লইত? কে জানিতে চাহিত, 'তাহার' মাঝে গভীর গোপন 'কী' সুধারস আছে?

যেখানে যত জ্ঞাতি
লক্ষ্মী ব'লে করে আমার খ্যাতি;
এই জীবনে সেই যেন মোর পরম সার্থকতা
ঘরের কোণে পাঁচের মুখের কথা।

বর্তমান জীবনেও এইরূপ কত ঘটনা, কত কথা, কত চরিত হয়তো আমাদের ঘেরিয়া আছে, হয়তো অসাড় মনে তাহাদের দিকে ফিরিয়াও আমরা চাহি না। কিন্তু যেই তাহারা

পলাতকা হইয়া যায়, দূর হইতে নিষ্প্রভ প্রদীপটির শিখার মতো একটুকু আলো হইয়া ইশারা দেয় উদাসীন জীবনে, ইহাদের জ্যোতি তখন আর সামান্য নহে, নগণ্য নহে; জীবনের দোলা দেয় বলিয়া ইহাদের সৌন্দর্য তখন অন্তহীন; তখন ইহাদের জীবনের ব্যঞ্জনা অতলান্তিক বিরহের মৃত্যু-মাধুর্য বহন করিয়া আনে; জীবনকে চালায় বলিয়া, নাড়ায় বলিয়া ইহাদের তখন মৃত্যুর সম্মানই দিতে হয়।

স্মৃতির পথ বাহিয়া পলাতকা ফিরিয়া আসে, শুধু ফিরিয়া আসে না, জীবনে পথপ্রদর্শকের মত আলো হাতে যেন আগাইয়াই চলে। বর্তমানে নানা কর্মে, নানা চাতুর্যে, নানা ব্যস্ততায় যে ভুলগুলি করিয়া থাকি, সেই ভুলগুলি তাহারাই আসিয়া যেন ধরাইয়া দেয়, জীবনের সম্মুখ পথ তাই অনেক ক্ষেত্রে তাহাদেরই আলোকে আলোকময় হইয়া উঠে।

'ফাঁকি' নামক কবিতাটির গল্পাংশটুকু এই প্রসঙ্গে স্মরণ করুন।

'হাওয়া বদল' করিলে রোগ সারিতে পারে এই আশায় রুগ্না 'বিনু'কে লইয়া বিনুর স্বামী কোনো একটি স্বাস্থ্যকর স্থানে চলিলেন। বিলাসপুরে গাড়ী বদল করিতে হইবে, তাই ট্রেন যখন বিলাসপুরে থামিল বিনুকে লইয়া তিনি যাত্রিশালায় আশ্রয় লইলেন। দীর্ঘ ছয় ঘণ্টা এখানে অপেক্ষা করিতে হইবে। বিনুর কিন্তু তাহাতে এতটুকু কষ্ট বা অস্বস্তি নাই। তেইশ বছরে জীবনে এই সে প্রথম এমনতর মুক্তির আস্বাদ পাইয়াছে; যাহা সে দেখিতেছে, তাহাই তাহার ভালো লাগিতেছে। বিশ্ব-ভালো-লাগার এই উদার মুহূর্তে একজন গরীব কুলী মেয়ে আসিয়া তাহাকে ধরিল। তাহার মেয়ের বিবাহ হইবে, অন্ততঃ পঁচিশটি টাকা তাহাকে সাহায্য করিতে হইবে। বিনু সহজেই সম্মত হইয়া গেল, স্বামীকে আবদারের সুরে অনুরোধ করিল—

পঁচিশ টাকা দিতেই হবে ওকে।

বিনুর জেদ দেখিয়া স্বামী কহিলেন: "আচ্ছা, দেব তবে।" কিন্তু প্রকৃত কথা এই, কুলী মেয়েকে তিনি টাকা দিবেন না। আড়ালে তাহাকে লইয়া গিয়া আচ্ছা করিয়া ধমক দিলেন। ভয় দেখাইলেন:

কেমন তোমার নোকরি থাকে দেখব আমি!
প্যাসেঞ্জারকে ঠকিয়ে বেড়াও! ঘোচাব নষ্টামি।

তাহার পর কুলী মেয়েটা ভয় পাইয়া গেছে দেখিয়া দুটো টাকা তাহাকে দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, বিনু কিন্তু জানিয়া রহিল, স্বামী তাহার আবদার রক্ষা করিয়াছেন।

ইহার পর মাস দুই কাটিয়া গেল। স্বামী যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন, সেবা শুশ্রূষার কোনো ত্রুটিই করিলেন না, বিনুও স্বামীর যত্নে, সেবায় ও প্রেমে স্বর্গের আনন্দই অনুভব করিল,

কিন্তু স্বামীর কাছে সে থাকিতে পারিল না। 'শেষ নিমেষে' স্বামীর পদধূলি লইয়া সে কহিল :

"এ জীবনের যা কিছু আর ভুলি
শেষ দুটি মাস অনন্তকাল মাথায় রবে মম
বৈকুণ্ঠেতে নারায়ণীর সিঁথের 'পরে নিত্য-সিঁদুর সম।
এই দুটি মাস সুধায় দিলে ভরে,
বিদায় নিলেম সেই কথাটি স্মরণ করে।"

কিন্তু সত্যই কি তাহার স্বামী দুটি মাস সুধাতেই দিয়াছেন ভরিয়া? কোনো ফাঁকি তাহাতে নাই!

ওগো অন্তর্যামী,
বিনুরে আজ জানাতে চাই আমি
সেই দু-মাসের অর্ঘ্যে আমার বিষম বাকি,
পঁচিশ টাকার ফাঁকি।
· ·বিনু যে সেই দুমাসটিরে নিয়ে গেছে আপন সাথে,
জানল না তো ফাঁকি সুদ্ধ দিলেম তারি হাতে।

তুচ্ছতম একটি মিথ্যা বা ফাঁকির জন্য এই যে অন্তর্লীন গভীর বেদনাবোধ, বিনু বাঁচিয়া থাকিলে ইহা অবশ্যই নগণ্য ও উপেক্ষার ব্যাপার হইয়া থাকিত। বিনু পলাতকা, তাই প্রেমের দৃষ্টিতে এতটুকু মিথ্যা ফাঁকি আজ অসীম হইয়া, দুঃসহ হইয়া জীবনকে নাড়া দিতেছে, ছাড়া দিতেছে। ছাড়া দিতেছে? হ্যাঁ, ছাড়াই তো দিতেছে! বস্তু হইতে উত্তীর্ণ হইয়া প্রেমের মধ্যে নিত্যই তো চিত্ত মার্জনা ভিক্ষা করিতেছে। বস্তুজীবনে পত্নীকে প্রতারণা স্বামিকুলের দৈনন্দিন চাতুর্য হইতে পারে, ধর্তব্যের মধ্যে নহে বলিয়া উপেক্ষার বিষয়ও হইতে পারে, কিন্তু প্রেমজীবনে প্রেয়সীকে প্রতারণা প্রাণ কখনও সহিতে পারে না। ধূলিলিপ্ত সংসার সমাজে কে এই সত্য স্বীকার করে? বিনুর স্বামী কি ইহাকে ফাঁকি বা প্রতারণা বলিয়া ভাবিতেই পারিয়াছিল? পলাতকার আলোয় সত্য যখন ধরা পড়িল, প্রেম যখন আবির্ভূত হইল উচ্ছ্বসিত আলোকের বন্যায়, স্বামী প্রেমে পরিতৃপ্তা বিনুর হাস্যোজ্জ্বল সুখ-মৃত্যুই তখন স্বামিচিত্তে আনিয়া দিল মৃত্যুময় নবজীবনের উদ্বেজিত হৃদয়াবেগ।

'ছিন্নপত্র' কবিতাটির ব্যঞ্জনা ইহাই। নায়ক 'ইলেকসন' ব্যাপারে উন্মত্ত হইয়া আহার-বিহার, সমাজ-সংসার, প্রেম-প্রীতি সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছিল। যেনতেনপ্রকারেণ জয়লাভ করাই ছিল তাহার সংকল্প, তাহার উচ্চাশা। কিন্তু ইলেকসনে, দুঃখের বিষয়, তাহার হার হইল, পরাজয়ের গ্লানি বক্ষে বহন করিয়া সে নির্জন কক্ষে আসিয়া বসিল। এমন সময়

কোথা হইতে হঠাৎ উড়িয়া আসিল একখানি পত্রের একটু টুকরা অংশ, তাহাতে এই কটি কথা মাত্র আছে লেখা : 'মনুরে কি গেছ ভুলে' ?

হৃদয়হীন কর্মোন্মত্ততায়, সত্যই তো সে ভুলিয়াছিল মনুকে, তাহার শৈশব সঙ্গিনীকে, তাহার প্রথম জীবনের প্রথম প্রেমের প্রেরণাটিকে! যাহাকে ভোলাই যায় না, বৈষয়িকতার বিপর্যয়ে, তাহাকেই সে ছিল ভুলিয়া! ভোর গগনের তারার মত স্বচ্ছ সুন্দর সেই শৈশব স্বপ্ন, অসীমেই যাহার আবাস ভুমি, শুধু পথ ভুলিয়া যে নামিয়াছিল সীমার মন্দিরে, তাহাকেও তাহা হইলে মানুষে ভুলিতে পারে ? শিউলিকোলে সূর্যোজ্জল শুভ্র শিশিরটির মতো শিশুকালের সেই স্বপ্নসোহাগ, আবেগ অনুরাগ, কী বিচিত্র, তাহাকেই সে ছিল ভুলিয়া ?

সেই ত আমার এই জনমের ভোর গগনের তারা
অসীম হতে এসেছ পথহারা ;
সেই ত আমার শিশুকালের শিউলি ফুলের কোলে
শুভ্র শিশির দোলে ;
সেই ত আমার মুগ্ধ চোখের প্রথম আলো,
এই ভুবনের সকল ভালোর প্রথম ভালো।

ব্যাখ্যা না করিলে চলে, পরাজয়ের গ্লানিময় জীবনে উপেক্ষিত সেই 'ছিন্নপত্র'ই আনিয়া দিল নবীন হৃদয়াবেগ। জীবনের চলতি পথে এমনিতর কত নগণ্য ব্যাপারই অন্তহীন বেদনার মাধুর্য দান করিয়া যায়! এই সব বেদনার মাধুর্যাবেগের দুর্বার তরঙ্গে ভাসিয়া আসে, যা ভাসিয়া গেছে। জীবননদীর কূল ছাপাইয়া তখন গান উঠে—ফিরিয়া পাওয়ার গান। কিন্তু এ কেমনতর ফিরিয়া পাওয়া ? অভিনবের মধ্যে ফিরিয়া পাওয়া। নূতন-ভাবে প্রেমোপলব্ধির স্বপ্ন-প্রেরণায় ফিরিয়া পাওয়া। এ পাওয়ার মধ্যে না পাওয়ার আনন্দবেদনা মিশিয়া আছে বলিয়া শিল্প-ব্যাকুলতার অসীম সৃষ্টিশক্তির সম্ভাবনা আছে এই পাওয়ায়। অতএব এই পাওয়ার অপর নাম নবজীবনের উত্তেজনা, রবীন্দ্রদর্শনানুসারে ইহাকে বলা যায় মৃত্যুশক্তি, চলমান শক্তি!

'চিরদিনের দাগা' নামক কবিতাটিতেও এই শক্তির প্রকাশ।

গরীব বাঙালী ঘরের মেয়ে শৈল, চির অনাদৃতা ও অবাঞ্ছিতা শৈল, বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ী যাইবার পথে জাহাজডুবি হইয়া গেল মারা।···কাহিনী অংশে এইটিই কিন্তু বড় কথা নয়। তুচ্ছ একটি নগণ্য ব্যাপারই এই কবিতার বড় কথা। নগণ্য ব্যাপারটি এই : শিশুকালে এই শৈল তাহার বাবার দরকারী হিসাবের খাতায় হিজিবিজি আঁচড় কাটিয়াছিল। সেই 'আঁচড়'গুলি, শৈলর মৃত্যুর পর, হঠাৎ একদা তাহার বাবার চোখে যখন পড়িল, আঁচড়গুলি তখন অভিনব বেদনার দাগা হইয়া দেখা দিল। বাবার কাছে এই

কটি আঁচড়ই শৈলর দুঃখময় স্মৃতি বহন করিয়া আনিল, পিতৃহৃদয়ে 'চিরদিনের দাগা' হইয়া রহিল।

যে মেয়েটা সংসারে কেবলি অনাদর পাইয়াছে, কোনো রকমে চেষ্টা চরিত্র করিয়া যাহার বিবাহটা দেয়া গেল, হতভাগা সেই মেয়েটা একদিনের জন্যও তো সুখের মুখ দেখিল না। দারিদ্র্যের জন্য বাবা তাহার প্রতি কোনোদিন দৃষ্টি দিতে পারেন নাই—উপর্যুপরি তিন মেয়ের পর নিত্য অভাবের ঘরে সে চতুর্থ মেয়ে হইয়া আসিয়াছিল, সংসারে তাই এক রকম অবাঞ্ছিত ছিল সে। যাই হক, বিবাহটা যখন হইয়া গেল, তখন কে না ভাবিয়াছে, হতভাগা মেয়েটা, আহা, এইবার একটু যত্ন আদর পাক.? কিন্তু সুখ সে তো পাইল না, "ভাগ্য নেয়ে" তাহাকে অনাদর দিবার জন্যই যেন জীবন-কূলে ঠেলিয়া দিয়াছিল, আবার "নৌকা বেয়ে" কোথায় যে লইয়া গেল, কেন গেল, কেনই বা লইয়া আসিয়াছিল, "কেই বা তাহা জানে"।

এই একটি ঘটনা। কিন্তু ভুল বুঝিবেন না, 'দাগা' কবিতাটিতে শুধু দাগা কেন, পলাতকা কাব্যের দুই একটি কবিতা ছাড়া প্রায় সব কবিতাতেই, ঘটনা বড় নহে, ঘটনা হইতে সমুত্থিত যে প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ যে শোকগভীর, বেদনা-চঞ্চল হৃদয়ান্দোলন, তাহাই কবির প্রতিপাদ্য। আলোচ্য কবিতায় শৈলর অসহায় জীবন ও আকস্মিক মৃত্যু অত্যন্ত মর্মান্তিক হইলেও বড় কথা নহে, বড় কথা ওই সামান্য ব্যাপারটি, ওই শিশুকালের আঁচড়কাটার নগণ্য ঘটনা, কারণ ইহাকেই উপলক্ষ্য করিয়া পলাতকা শৈল পিতৃহৃদয়ের নবোদ্বেজিত স্নেহ-বেদনার চিরন্তন মৃত্যু-মূর্তি গ্রহণ করিতেছে। শৈল-জীবনের অকারণ ও অসহায় বিয়োগান্ত পরিণতি স্মরণ করিয়া পিতৃহৃদয়ের অন্তহীন যে বেদনার ফল্গুপ্রবাহ, এবং সেই বেদনার ধারাপ্রবাহে চির অনাদৃতা পলাতকাকে স্মৃতির শ্মশানমৌন ধূসর উপকূলে অহরহঃ ফিরিয়া পাওয়ার যে অন্তহীন দুঃসহ যন্ত্রণা, "চিরদিনের দাগা" ইহারি নাম।

আঁচড়-কাটা সেই হিসাবের খাতা,
সেই কখানা পাতা,
আজকে আমার মুখের পানে চেয়ে আছে তারি চোখের মতো।

এই যে আঁচড়কাটার ক্ষুদ্র ও নগণ্য ব্যাপারটি, ড. সুবোধচন্দ্র বলিয়াছেন, "ইহা করুণ-রসাত্মক, কিন্তু মৃত্যুর সুগভীর ট্র্যাজেডির পরে আসায় ইহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়, এবং ইহার অবতারণা করিয়া কবি কাব্যের রসকে লঘু করিয়া দিয়াছেন [রবীন্দ্রনাথ, পৃ. ১৭৩]। বলা বাহুল্য, সুবোধবাবুর এই মত আমি সমর্থন করিতে পারি নাই। আমি মনে করি, এই ক্ষুদ্র ঘটনাটিই সমগ্র কবিতাকে রসোত্তীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে এবং এই ক্ষুদ্র ঘটনাই আসল এবং প্রধান। অকিঞ্চিৎকর এই আঁচড়কাটার ছবিটিকে রসমূর্তি দান করিবার উদ্দেশ্যেই শৈল-জীবনের বিয়োগান্ত পরিণতির অবতারণা। পলাতকার সুর যাহারা স্পষ্ট করিয়া ধরিবেন, সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন ও প্রেমদর্শনের তাৎপর্য

যাঁহারা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিবেন, তাঁহারাই বলিবেন—শৈল-জীবনের বাস্তব দুঃখ ও অসহায়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয় পলাতকা শৈলকে স্মরণ করিয়াই। শৈল সংসারে থাকিতে যে অনাদর পাইয়াছে, যে শাস্তি অসহায় ভাবে সহ্য করিয়াছে তাহাতে চিত্ত উদাসীন থাকিতে পারে, কিন্তু যখন সে চলিয়া যায় তখন তাহার সেই অনাদরগুলি তুচ্ছ কোনো উপলক্ষ্য বাহিয়া ফিরিয়া আসে, যন্ত্রণা দেয়, মৃত্যুদহন করে অতর্কিতে।

আঁচড়কাটাগুলি, কবি লিখিলেন : "চেয়ে আছে তারি চোখের মতো"। উপমাটি ব্যাখ্যা করিয়া লউন, কবিতাটির সুর অবশ্যই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

আঁচড়গুলি কেমনতর? তাহার চোখের চাওয়ার মতো। তাহার চোখের চাওয়াটা তা হইলে কেমনতর বলিয়া কল্পনা করিতেছি? আঁচড়গুলির মতো অসহায় এবং অর্থহীন কিংবা দুর্বোধ এবং নির্বোধ।...হিজিবিজি আঁচড়গুলির অর্থ কি? কী সে বলিতে চায়? কোন্ হৃদয়ের কোন্ গোপন বেদনা? কিছুই বুঝি না। শৈলর চোখ দেখিয়াও কি কিছু বোঝা যাইত? কারণে অকারণে শাস্তি ও অনাদর পাইয়া সে যে কেমনতর হইয়াছিল কোনো চাওয়া বা কোনো পাওয়া, কোনো কিছুরই অর্থ ছিল না হতভাগা মেয়েটার চোখে। সে কি এতটুকু স্নেহ প্রার্থনা করিত? তাহার চোখে তো কোনো দিন এমন প্রার্থনার আলো দেখি নাই! সে কি উপেক্ষার ও অনাদরের প্রতিবাদ করিত? পিতা ভাবিতেছেন, তাহার চোখে তো কোনোদিন কোনো প্রতিবাদ ফুটিতে দেখি নাই। স্নেহ যে পাওয়া যায়, দাবী যে জানানো যায়, প্রতিবাদ যে করা যায়—এ ধারণার আলো তো মেয়েটার চোখে কোনো দিন পাঠ করি নাই। হিজিবিজি আঁচড়ের মতো মূক, অসহায় নির্বোধ তাহার চাহনি—অর্থ নাই, স্বপ্ন নাই, ব্যঞ্জনা নাই, অনাদরের অভিমান নাই, পাওয়ার তৃষ্ণা নাই, অবহেলার প্রতিবাদ নাই। বুক গুর গুর করিয়া উঠে এমনতর 'আঁচড় কাটা' দেখিতে,—বিশেষ করিয়া তখন, সে যখন আর কাছে নাই, এ সংসারেই নাই। এই বুক গুরগুরুনির সুরটুকুই 'চিরদিনের দাগার' সুর। ইহাকে বাদ দিলে পলাতকার সুরই ব্যাহত হয়। পলাতকার সুর কী? যাহাতে মন অসাড় হইয়া আছে বা ছিল, তাহা হইতে আচম্বিতে সাড়া পাওয়ার সুরই তো পলাতকার সুর। মন যে ক্ষেত্রে বা যে বিষয়ে একান্ত ভাবেই অসাড়ের মত ব্যবহার করে, সেই ক্ষেত্রে বা সেই বিষয়ে আচম্বিতে সচেতন হওয়ার আনন্দ-বিষাদই তো পলাতকার সুর। শাস্ত্রীয় ধর্মরক্ষার অভ্যস্ত অহংকারে মানুষ যখন অন্ধ থাকে, মন থাকে নিস্পন্দ উদাসীন, আপনার অজ্ঞাতসারেই সে তখন কত পাপই না করিয়া যায়, কত অন্যায়েরই না প্রশ্রয় দেয় ধর্মপালনের নির্লজ্জ আতিশয্যে! যে পাপ সে নিজে করিতে দ্বিধা করে না, অপরকে সে সেই পাপ হইতেই দূরে থাকিবার দেয় বিধান। বিধান দিতে দিতে সে আপনার মনে আপনিই হইয়া দাঁড়ায় সমাজের ভাগ্যবান ভাগ্যবিধাতা। বিধাতৃ-বিজ্ঞানের লক্ষ

অনুশাসন সে তখন মুখে আউড়াইতে থাকে, মনে করিতে থাকে পুণ্যবান বুঝি তাহার চেয়ে আর কেহ নাই। এই সমস্ত পুণ্যবানের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত সহস্র অত্যাচারের নিষ্পেষণে মানুষের হৃদয় হয় নিষ্পিষ্ট,—যৌবনের বসন্ত-বাসনা হয় পলাতকা। কিন্তু সত্যিই কি পলাতকা হয়? বসন্তের যৌবনবাসনা কি পলাতকা হইতে পারে শংকরের শাসনে কিংবা মনুর অনুশাসনে? আপনার অজ্ঞ-সংস্কারে মনে করি সন্ন্যাসদৃপ্ত জ্ঞান-বিক্রমের কঠোর তপশ্চরণে পলাইয়া গেছে যৌবনের আদিম বসন্ত, পলাইয়া গেছে রতিসুন্দরীর জ্যোৎস্নাশুভ্র প্রেমবাসনার ললিতস্বপ্নের সোহাগসৌন্দর্য। মানুষের হৃদয়ের প্রতি অসাড় থাকে যে মন, তাহারি এই ভাব, এই বিশ্বাস। এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের মোহ-দুর্গ হইতে মনকে একবার নিষ্কৃতি দিয়া সহজ দৃষ্টিতে যদি জগতের ছবি দেখিতে শিখি, দেখিব যাহা পলাইবার নহে, যাইবার নহে, তাহাকে তাড়াইবার চেষ্টার মধ্যে দেবতার ছদ্মবেশে পশুত্বই লীলা করে প্রায়শঃই। পুরুষপ্রভাবিত এই হিন্দুসমাজে নারীজীবন সম্পর্কে এইরূপ পশুত্বই প্রকটিত হয় নানা বাক্যে, নানা শাসনে, নানা ব্যবহারে। 'ধর্ম ধর্ম' করিয়া ধর্মের লক্ষ কোটি বিধিনিষেধ নারীর জীবনে দেই চাপাইয়া, কিন্তু নিজেদের সম্পর্কে আমরা স্বভাবতঃই স্বাধীন, অন্ততঃ সমাজজীবনের বস্তুগত বহির্জগতে আমরা সকল বিষয়ে মুক্ত থাকিতে পাইলেই পাই স্বস্তি, পাই শান্তি। আমাদের সমাজে ধর্মরক্ষা করে নারীর দল এবং আমরা ধর্মরক্ষার ভার নারীর দেহ ও মনের উপর অর্পণ করিয়া অহংকার করিতে থাকি নিশ্চিন্ত আরামে। সতীধর্মের মহিমা অকৃত্রিম আনন্দেই গাহিতে চাহি কিন্তু নিজে সৎ হইতে চাহি না প্রায়শঃই। বিস্ময়ের ব্যাপার এই, সৎ যে হইতে চাহি না, তাহা আমাদের মনে থাকে না সুতরাং এ কথাটা স্বীকার করিবার কোনো কথাই উঠে না। এই অসাড় মন, বলা বাহুল্য, সমাজের রীতি-নীতি, আচার-বিচার, বিধি-ব্যবস্থা ও পদ্ধতি সম্পর্কে নিতান্ত গতানুগতিক ও সনাতনপন্থী না হইয়া পারে না। এই সনাতন-পন্থী অসাড় মনের অজ্ঞ ধর্ম-পাপের নিষ্পেষণ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার সুর আছে পলাতকার 'নিষ্কৃতি'তে। কবিতাটিতে উপদেশ আছে যথেষ্ট, কিন্তু তাই বলিয়া ইহা 'প্রচার-কবিতা' নহে; উপদেশগুলি মঞ্জুলিকার ধর্মনিষ্ঠ অন্ধ পিতার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে বলিয়া, বাহুল্য হইলেও, বলিতে হইবে যে, ওগুলি উপদেশ নহে, মঞ্জুলিকার কঠোর-হৃদয় পিতার তথা বঙ্গ সমাজের, ওগুলি অন্তর্লীন গোপন চরিত। আরিস্ততলের "dialogue is our character" এই শিল্পনীতিটুকু এই প্রসঙ্গে একবার স্মরণ করুন। 'নিষ্কৃতি' কবিতায় কবির প্রত্যক্ষ উপদেশ কোথাও নাই—কবিতাগত নায়কের চরিত্রে প্রকাশের সহায়তার জন্যই পিতৃমুখে কতকগুলি কঠোর উপদেশের অবতারণা করা হইয়াছে। কবিতার উপসংহারে রসজ্ঞ পাঠক অবশ্যই দেখিবেন মঞ্জুলিকার বৃদ্ধ পিতার দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে নীরস এই উপদেশগুলি অপরোক্ষভাবে সরস শ্লেষ ব্যঞ্জনায় রূপান্তরিত হইয়া গেছে। 'নিষ্কৃতি' কবিতাটিকে কেহ স্পষ্ট করিয়া প্রচার কবিতা বলেন নাই বটে,

কিন্তু একাধিক সমালোচকের ধারণা এই—ইহা প্রচার-ঘেঁষা কবিতারই সমতুল্য। পলাতকার সুরটি ধরিতে পারিলে এ ধারণা ভ্রান্ত বলিয়াই মনে হইবে।

পলাতকায় আরো কয়েকটি কবিতা আছে—কিন্তু সবকটি লইয়া আলোচনার আর প্রয়োজন দেখি না। মনোদর্শনের দিক দিয়া পলাতকা সম্বন্ধে আমার যা বলার ছিল, বলা হইয়াছে। স্পষ্ট করিয়া না হউক, ইঙ্গিতে বলা হইয়াছে—পলাতকা নৈরাশ্যবিধুর দুঃখময় গীতি নহে—মৃত্যুর মধ্য দিয়া, দুঃখের মধ্য দিয়া, অত্যাচার অবিচারের মধ্য দিয়া অপরোক্ষ প্রেমানন্দের আলোকচ্ছটাই বিকীরিত হইয়াছে পলাতকায়। তাহার বাণী এই : সাধারণ বস্তুঘন ধূলিলিপ্ত জীবনের নিতান্ত তুচ্ছ ঘটনার মধ্যেও আছে অতলস্পর্শী হৃদয়াবেগ, আছে অনন্ত প্রেমজীবনের বেদনাময় গভীর উদ্বেজনা। সামান্য এতটুকু কথা, এতটুকু আঁচড়, এতটুকু চিঠির টুকরো, অর্থাৎ সংসারের সামান্যতম তুচ্ছ ব্যাপারও প্রেমের দৃষ্টিতে অসীমালোকের দ্যোতনা জাগায়, মন তখন বস্তুর বন্ধন হইতে ভাবের স্বর্গে হয় পলাতক। প্রেম বিহীন উদাসীন অসাড় অন্তরে অথবা তামসিক মোহের আতিশয্যে যাহা আর নাই বলিয়া মনে করি,—অতীতের কোলে কোনোদিন নিশ্চিহ্ন হইয়া গেছে বলিয়া নিশ্চিন্ত রহি, তাহাও যে হারা হয় নাই, এই বিশ্বাসই পলাতকার বাস্তবচিত্রগুলির মধ্য দিয়া প্রভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। সমালোচকগণ পলাতকাকে এইভাবে বিচার করেন নাই বলিয়া কেহ কেহ "হারিয়ে যাওয়া" কবিতাটির মধ্যে "কবির প্রয়াস অন্য রকমের" দেখিয়াছেন অর্থাৎ পলাতকার সুর হইতে ঐ কবিতাটির সুর স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করিয়াছেন। [ড. সুবোধচন্দ্রের 'রবীন্দ্রনাথ']।

'হারিয়ে যাওয়া' নামক কবিতাটির ভাব সংক্ষেপে এই :

কচি মেয়ে বামী অন্ধকারে সিঁড়ি দিয়া প্রদীপ হাতে নামিতেছিল। পাছে প্রদীপটি নিভিয়া যায় সেই ভয়ে আঁচলে সেটিকে আড়াল করিয়া অত্যন্ত সন্তর্পণেই সে নামিতেছিল, কিন্তু বাতাসে সেটি হঠাৎ গেল নিভিয়া। বামী ভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিল। কবি তখন ছিলেন ছাতে, তারায় ভরা চৈত্র মাসের রাতে। তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :

…"কী হয়েছে, বামী",
সে কেঁদে কয় নিচে থেকে, "হারিয়ে গেছি আমি"।

ঘটনাটি এই। অত্যন্ত সাধারণ, উপেক্ষণীয় ঘটনা। কিন্তু ঘটনা হইতে কবিচিত্তে যে প্রতিক্রিয়া উঠিল, কবিতার দিক হইতে তাহাই আসল, তাহাই বিবেচ্য। "তারায় ভরা চৈত্র মাসের আকাশ পানে" চাহিয়া কবির মনে হইল যে, তাঁহার 'বামীর' মতোই

অমনি কে এক মেয়ে
নীলাম্বরের আঁচলখানি ঘিরে
দীপশিখাটি বাঁচিয়ে একা চলছে ধীরে ধীরে।

নিবত যদি আলো, যদি হঠাৎ যেত থামি,
আকাশ ভরে উঠত কেঁদে, "হারিয়ে গেছি আমি"।

ড. সুবোধচন্দ্র ইহার ব্যাখ্যা দিয়াছেন এইরূপ : "শিশু মেয়ে বামী অন্ধকারের মধ্যে পড়িয়া মনে করিয়াছে সে হারাইয়া গিয়াছে, তাহার আত্মনির্ভর এত কম যে একটি ক্ষুদ্র দীপবর্তিকার অভাবেই তাহা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়। এমনি অজ্ঞ সে। নিখিল বিশ্বের আয়তন বিরাট, তাহার দণ্ড অনন্যসাধারণ, কিন্তু তাহারও অন্তরে রহিয়াছে শিশুর অজ্ঞতা, তাহার আত্মবিশ্বাসেরও কোন সত্যিকার ভিত্তি নাই। যদি মনে করা যায় তাহার আলোকবর্তিকা—সূর্য-চন্দ্র-তারা একদিন নিবিয়া গিয়াছে, তাহা হইলে শিশুর মতই সে ব্যাকুল হইয়া উঠিবে—"হারিয়ে গেছি আমি"। এমনি করিয়া অতি অনায়াসে কবি বিশ্বের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছেন এবং সেখানে বেদনায় বিধুর, অজ্ঞতায় সরল, আশঙ্কায় চঞ্চল সহজ বিশ্বাসে সুস্থির যে সত্তা বিরাজ করিতেছে তাহাকে প্রকাশ করিয়াছেন" [রবীন্দ্রনাথ, ৭ম পরিচ্ছেদ, পলাতকার আলোচনা]।

আবার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ইহার ব্যাখ্যা দিতেছেন : "এই পলায়নপর অনিশ্চিত জীবনের স্বরূপ সম্বন্ধে মানুষ অজ্ঞ। সে সরল বিশ্বাসে ধরিয়া লইয়াছে যে তাহার অস্তিত্বের সকল আবেষ্টনী চিরকাল বর্তমান থাকিবে। পরম নির্ভরতা ও সরল বিশ্বাসে সে জীবনের এই নির্মম ধ্বংসকারী সত্যকে ভুলিয়া গিয়াছে। প্রকৃতিও তাহার গভীর আত্মবিশ্বাসে মনে করিয়াছে যে সে চিরকাল স্বপ্রকাশ থাকিবে, কিন্তু সে নিতান্ত অজ্ঞ, তাহার সরল বিশ্বাস ভ্রান্তিময়। মানুষের তুলনায় সে বৃহৎ, অতি অধিককাল স্থায়ী বটে, কিন্তু যদি তাহার চন্দ্রসূর্য নিভিয়া যায়, তখন দেখা যাইবে যে, সে মানুষের মতই ভ্রান্ত বিশ্বাসে নির্ভর করিয়াছিল"। [রবীন্দ্র-সাহিত্য-পরিক্রমা, ২য় খণ্ড]।

মনস্বী সমালোচকদ্বয়কে যথোচিত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াই বলি, তাঁহাদের ব্যাখ্যা দুইটি আমি সমর্থন করিতে পারি নাই। পলাতকার মূল সুর তথা রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও দর্শন-বাণীর মূলকথা ব্যাখ্যার মধ্যে সুস্পষ্ট হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি না। সুবোধবাবু তো 'হারিয়ে যাওয়া' কবিতাটিকে পলাতকা হইতে ভিন্ন সুরের কবিতা বলিয়াই মনে করিয়াছেন,—উপেন্দ্রবাবু এতটা মনে করেন নাই বটে, কিন্তু এমনভাবে কবিতাটির ব্যাখ্যা দিয়াছেন, যাহাতে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ "হারিয়ে যাওয়া" নামক কবিতাটিতে বুঝিবা নৈরাশ্যধর্মীই হইয়া পড়িয়াছেন। প্রকৃতি মানুষের মতই অসহায়, তাহার সরল বিশ্বাস ভ্রান্তিময়—অধিককাল সে স্থায়ী বটে কিন্তু কিছুরই স্থিরতা, নিশ্চয়তা নাই, সমালোচক উপেন্দ্রনাথ 'হারিয়ে যাওয়া' হইতে প্রচ্ছন্ন এই বৌদ্ধভাব গ্রহণ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ এই ভাব কখনই ভাবিতে পারেন না। সুবোধবাবু অবশ্য কবিতাটির মধ্য হইতে 'সুস্থির একটি সত্তার' ব্যঞ্জনা অনুভব করিয়াছেন, তবু তাঁহার ব্যাখ্যা পড়িয়াও মনে হয়

পলাতকা লিখিতে লিখিতে রবীন্দ্রনাথ বুঝিবা তাঁহার আনন্দবাদ বিস্মৃত হইয়া নৈরাশ্য-ধর্মের দিকে ঝুঁকিয়াছেন। "নিখিল বিশ্বের···আত্মবিশ্বাসেরও কোন সত্যিকারের ভিত্তি নাই"—চিত্রিত এই নৈরাশ্যতন্ত্র যদি রবীন্দ্রমন্ত্রের ধ্বনি বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়, তবে অবশ্য রবীন্দ্রকাব্যে নানা বিরোধী বাণীর বৈচিত্র্যই শুধু আছে, ঐক্যতত্ত্ব কিছু নাই!

আমি অবশ্য রবীন্দ্রকাব্যের ঐক্যতত্ত্বই প্রমাণ করিতে বসিয়াছি। আমি দেখিয়াছি রবীন্দ্রনাথ সর্বত্রই প্রেমের ইঙ্গিত করিয়াছেন, প্রেমবিহীন জীব, জীবন ও জগৎকে মিথ্যা বা অন্ধকারাচ্ছন্ন ভাবিয়াছেন। বস্তুতঃ, মন যতক্ষণ প্রেমবিহীন ও অন্ধকারাচ্ছন্ন, জগৎ ততক্ষণ মিথ্যা—হারিয়ে যাওয়ার কথা, ফুরাইয়া যাওয়ার কথা ততক্ষণই সত্য। পলাতকার দল হারাইয়া গিয়াছে, প্রেমবিহীন অসাড় মন লইয়া এ-কথা বিশ্বাসও করিতে পারি, কিন্তু ওই যে কালির আঁচড়। ওই ছেঁড়া চিঠি অসাড় মনে জাগাইল সাড়া, অপরূপ আলোর বন্যায় হৃদয় দিল ভাসাইয়া, জাগাইল জীবনবেগ, কহিল হারাইয়া যায় নাই!!

'হারিয়ে যাওয়া' কবিতায় এই ভাবটি কোথা হইতে পাইলাম? পাইলাম শেষের স্তবক হইতে। শেষের স্তবকটি আর একবার পড়ুন।

কবির মনে হইল—নীলাম্বরের আঁচলে দীপশিখাটি বাঁচাইয়া তাঁহার বামীর মতই কে এক মেয়ে আকাশ পথে একাকিনী চলিতেছে।

> নিবত যদি আলো, যদি হঠাৎ যেত থামি,
> আকাশ ভরে উঠত কেঁদে 'হারিয়ে গেছি আমি'।

আলো নিভিলেই 'হারিয়ে যাওয়ার' কথা, আলো জ্বলিতে থাকিলে নয়। প্রিয়জন যখন চলিয়া যায়, নামে তামসদৃষ্টি, নামে শোকের অন্ধকার। আলো নেভে 'আকাশভরে' তাই কান্নারোল ওঠে, মনে হয় হারাইয়া গেল, ফুরাইয়া গেল, পলাতকা হইল। কিন্তু কেন তবে 'চিরদিনের দাগার' মধ্য দিয়া পলাতকা শৈল আসে ফিরিয়া, 'ছিন্নপত্রের' বাঁকা অক্ষরে ফিরিয়া আসে 'ভোর গগনের তারা'? পলাতকা পলাতকা নহে, অসাড় মনের অন্ধকারে যে পলাতকা, প্রেমাশ্রিত মনের আলোক শিখায় সেই আবার দীপ্তিময়ী পুনরাগতা। প্রেম নিভিলেই পলাতকা, প্রেম জ্বলিতে থাকিলে পলাতকার তখন নূতন ব্যঞ্জনা। আলোর দৃষ্টিতে 'হারিয়ে যাওয়ার' কথা নাই, আলো নিভিলেই 'হারিয়ে গেছি আমি' কিংবা হারাইয়া গিয়াছে কেহ—এই কান্নাভাব সত্য। বামীর মতো শিশু-মনগুলি 'হারিয়ে গেছি আমি' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেও, মাথায় যাঁহার তারাভরা আকাশের আলো, তিনি জানেন শিশুর ওটি অজ্ঞতা মাত্র। তিনি জানেন, বামী সত্য-সত্যই হারাইয়া যায় নাই, আলোর দৃষ্টিতে তাহাকে দেখা হইতেছে না বলিয়াই 'হারা' বলিয়া জ্ঞান হইতেছে মাত্র।

সুধীগণ জানেন, রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে কখনও মায়া, মিথ্যা বা ভ্রান্তি বলেন নাই। প্রকৃতি সত্য, কিন্তু সত্য এইজন্য যে, সে প্রেমাশ্রিতা। প্রেমের আলোটি আছে বলিয়াই

তাহার রূপ, তাহার ঐশ্বর্য, তারায় তারায় এত ইঙ্গিত, সূর্যে চন্দ্রে এত দীপ্তির উচ্ছ্বাস। এই প্রেম যখন উন্মেষিত হয় মানব হৃদয়ে, তখনই সে প্রেমের দৃষ্টিতে প্রকৃতির চিরন্তন রূপ দেখিতে পায়। প্রেমের আলোটি বাদ দিয়া প্রকৃতিকে দেখুন, দেখিবেন প্রকৃতি মিথ্যা, প্রকৃতি মায়া, তখন

আকাশভরে উঠবে কেঁদে
'হারিয়ে গেছি আমি।'

শিশুমেয়ে বামী আলোর দৃষ্টিতে দেখিতেছিল সিঁড়ির পথ, আপনিও তাহাকে দেখিতেছিলেন: 'আঁচল দিয়ে আড়াল করে চলছিল সাবধানী'। আলোটি বাদ দিয়া তাহাকে দেখুন, আর তাহাকে দেখিতে পাইবেন না, তখন সে যেন যাইবে হারাইয়া। সংসারে বস্তুজগতে আমরা আলোটি বাদ দিয়াই অনেককে দেখি, তাই তাহারা থাকিয়াও থাকে না, আসিয়াও আসে না। তাহার পর চকিতে যদি কোনোদিন আলো আসিয়া পড়ে তাহাদের চক্ষে, বক্ষে, অমনি উদ্বেজিত আনন্দে দেখিয়া লই নূতন জীবন রহস্যের আনন্দ-মহিমা। তখন একটু আগে যাহাদের 'নাই' বলিয়া ভাবিয়াছি, তাহাদেরই 'আছে'র মধ্যে দেখিয়া আনন্দ পাই! আসল কথা, বৃহত্তর জীবনবোধে, প্রেমবোধে ইতি-নেতি উভয়েরই মর্যাদা। খণ্ডদৃষ্টিতে অর্থাৎ অন্ধদৃষ্টিতে 'নাই' দেখি, কিন্তু প্রেমের দৃষ্টিতে নাই আছে 'আছে'-র সহিত মিশিয়া। পলাতকা কাব্যের 'শেষ-প্রতিষ্ঠা' নামক কবিতা-টিতে এই সত্যটি বিবৃত করিয়া ইঙ্গিতে কবিগুরু পলাতকা কাব্যখানিই যেন ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন:

মানুষের কাছে
যাওয়া-আসা ভাগ হয়ে আছে।
তাই তার ভাষা
বহে শুধু আধখানা আশা।
আমি চাই সেইখানে মিলাইতে প্রাণ
যে সমুদ্রে 'আছে' 'নাই' পূর্ণ হয়ে রয়েছে সমান।

'যে সমুদ্রে'—কোন্ সমুদ্রে? প্রেম-সমুদ্রে। এই সমুদ্রে 'আছে', 'নাই',—'জোয়ার', 'ভাঁটা', দুইই সমান ভাবে সত্য: দুইই আছে সমুদ্র গর্ভে—দুই-এরই প্রকাশ সমুদ্র হইতেই। তরঙ্গ হইতেই তরঙ্গ উঠে, তরঙ্গেই তরঙ্গ মিলাইয়া যায়। মিলাইয়া যায় বলিয়াই নূতন করিয়া আবার আসে, অজস্র ফেনার বিচিত্র উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিয়া উদ্বেজিয়া ওঠে—আবার প্রকাশ পায় বলিয়াই লুকাইবার আনন্দে মাতিয়া যায়। 'আছে'র তরঙ্গ আর 'নাই'-এর তরঙ্গ—দুই তরঙ্গের আকর্ষণ-বিকর্ষণে প্রাণোচ্ছ্বাস জাগে প্রেম-সমুদ্রের। দুই-এর কোনোটিকেই বাদ দেওয়া চলে না, কারণ বাদ দিলে সৃষ্টি লীলাই ব্যাহত হইয়া যায়। প্রেমের এই রহস্য-জ্ঞান যাঁহার হইয়াছে, তিনি প্রকৃতির মধ্যে সৃষ্টি দেখিয়া যেমন প্রেমের

আবেগ অনুভব করেন, ভাঙন দেখিয়াও তেমনি প্রেমের লীলারস করেন আস্বাদন। জীবন তাঁহার নিকট যেমন প্রেমাবেগের উৎস, মৃত্যু তেমনি তাঁহার নিকট নবজীবনাভিমুখী বৈরাগ্যাবেগের উৎস। বিশেষে অর্থাৎ জীবনবিশেষে, রূপবিশেষে জাগেন বলিয়া সৃষ্টি করেন, অশেষে চলেন বলিয়া ভাঙনের লীলায় মাতেন। বিশেষ ও অশেষ, সৃষ্টি ও প্রলয়, এই দুই মিলিয়া প্রেমের স্বরূপ—'এ দুয়ের মাঝে' মিল হইতে এই প্রেম।

এই প্রেমের দৃষ্টিতে অখণ্ডের দৃষ্টিতে, অর্থাৎ প্রেম ও বৈরাগের দৃষ্টিতে, জীবন ও মৃত্যুর দৃষ্টিতে, সৃষ্টি ও প্রলয়ের দৃষ্টিতে, বিশেষ ও অশেষের দৃষ্টিতে, 'আছে' ও 'নাই'-এর দৃষ্টিতে 'পূরবী' কাব্যের রূপ-লেখাগুলিও পর্যবেক্ষণ করুন, পূরবী-কাব্য আপনার বড়ই ভালো লাগিবে। শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ একাধিক আধুনিক সমালোচক 'পূরবী'কে কাব্য বলিয়া স্বীকার করিতে দ্বিধা করিয়াছেন, কিন্তু পূরবীর সুরটি আত্মস্থ করিয়া আর একবার কাব্যখানি ধীরভাবে আপনি আবৃত্তি করুন, দেখিবেন রবীন্দ্রকাব্য-দর্শনের মর্মবাণী কাব্যখানিতে কাব্যময় কী পুলকিত সৌন্দর্যেই না প্রভাসিত হইয়াছে।

পূরবী

'পূরবী' সন্ধ্যার সুর। সন্ধ্যা দিন-জীবনের অবসান বটে কিন্তু নূতন প্রভাত-জীবনের সূচনাও কি নহে? 'উদয়াস্ত দুই তটে অবিচ্ছিন্ন আসন' যে সন্ধ্যার, সেই সন্ধ্যার সুর পূরবীর। পূরবীতে তাই দূরের ইঙ্গিতে চলিয়া যাওয়ার গান আছে, কাছের ইঙ্গিতে ফিরিয়া চাওয়ার গানও আছে। দিন-জীবনে যাহারা ছিল, প্রত্যক্ষ-জীবনে আর যাহাদের নাগাল পাইনে, সন্ধ্যার স্মৃতিমন্দিরে [পলাতকাদর্শনে তো অনুভূত হইয়াছে] তাহারাও বিরাজ করিতেছে নূতন রূপে।

> অতীত কালের আনন্দরূপ বর্তমানের বৃন্ত-দোলায় দোলে,
> গর্ভ হতে মুক্ত শিশু তবুও যেন মায়ের বক্ষে কোলে
> বন্দী থাকে নিবিড় প্রেমের বাঁধন দিয়ে।

আবার জীবনসন্ধ্যার অস্ফুট আলোকে আজও যাহারা রহিয়াছে দৃষ্টির চারি পাশে, প্রত্যক্ষ হইতে অপ্রত্যক্ষে একদা তাহারাও চলিয়া যাইবে, কিন্তু তাই বলিয়া অর্থহীন নির্বোধ প্রণয়মোহে নৈরাশ্যবিধুরতা যেমন সমীচীন নহে, অর্থহীন বিশুষ্ক বৈরাগ্যে মানুষের প্রতি এবং বর্তমান জীবনের প্রতি ঔদাসীন্যও তেমনি যুক্তিযুক্ত নহে। মোহগ্রস্ত প্রেমিকতা নহে, সর্বস্বান্ত সন্ন্যাসিতাও নহে, সহজ ভাবে সংসারে থাকা, সহজ ভাবে সংসার হইতে সরা—ইহাই তো সহজ প্রেমজীবনের বৈরাগ্যকান্ত সহজ সুর। সুরটার তাৎপর্য

সাধারণ পাঠককে বুঝাইতে চাহিলে সহজ ভাবেই তাই বলা ভালো : যাইবে যাও, কিন্তু নূতন করিয়া আবার যখন ফিরিতেই হইবে, তখন যাইবে বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিব না, নৈরাশ্য প্রকাশ করিব না। সংসার সরে ইহা তো জানি, এবং সরে বলিয়াই তো নূতনকে পাই। সরার আনন্দ, মৃত্যুর আনন্দ জীবনকে নূতনকে যখন আনিয়া দেয়, তখন তাহার কথা ভাবিয়া নৈরাশ্য বা ভয় তো কোনো কাজের কথা নহে। বরং যাহা বা যাহাদের আজও পাইয়া আছি, তাহাদের লইয়া আনন্দই করিব। তাহারা যখন চলিয়া যাইবে কিংবা তাহাদের কাছ হইতে আমি যখন চলিয়া যাইব তখনও 'নূতন প্রাতের আশায়' নূতনতর আনন্দে মাতিব।

তাই যারা আজ রইল পাশে এই জীবনের অপরাহ্ণ বেলায়
তাদের হাতে হাত দিয়ে তুই গান গেয়ে নে থাকতে দিনের আলো,
বলে নে ভাই, 'এই যা দেখা, এই যা ছোঁয়া, এই ভালো, এই ভালো।
এই ভালো আজ এ সংগমে কান্নাহাসির গঙ্গা-যমুনায়
ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।
এই ভালো রে প্রাণের রঙ্গে এই আসঙ্গ সকল অঙ্গে মনে
পুণ্য ধরার ধুলোমাটি ফল হাওয়া জল তৃণ তরুর সনে।
এই ভালো রে ফুলের সঙ্গে আলোয় জাগা, গান গাওয়া এই ভাষায়,
তারার সাথে নিশীথ রাতে ঘুমিয়ে পড়া নূতন প্রাতের আশায়।'

এই 'নূতন প্রাতের আশায়' নিশীথ রাতে ঘুমাইয়া পড়াও রাবীন্দ্রিক আনন্দবাদের একটি দিক। দুঃখে নহে, নৈরাশ্যে নহে, ভয়ে নহে, আনন্দভরে নূতন আশায় ঘুমাইয়া পড়া, অন্য ভাষায়, আনন্দভরে লৌকিক সঞ্চয়ের বস্তুস্তূপ হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া সহজ বৈরাগ্যাবেগে বহির্বিশ্বে বৃহতের আশায় জাগিয়া উঠাই রাবীন্দ্রিক গতিবাদ, আনন্দবাদ। নটরাজ প্রলয়নৃত্য নাচেন নূতন সুরছন্দের জন্ম দিবার আনন্দে। প্রলয়নৃত্যকে যদি বর্তমানের আনন্দ বলিয়া জ্ঞান করা যায়, তবে ভবিষ্যতের আনন্দ হইতেছে নূতন সুরসৃষ্টির জীবনানন্দ। ভাবটা এই : যা আছে তাহা লইয়া আমরা খেলা করি, আনন্দে মাতি, কিন্তু তা যখন ভাঙিয়া যায়, ঝরিয়া যায়, পড়িয়া যায়, ভাঙার আনন্দে, করার আনন্দে, পড়ার আনন্দে তখন নূতন হইয়া নবজীবনের বেগ করি অনুভব। 'শিশু ভোলানাথ' কবিতার 'তাণ্ডবের দলে' 'খেলনা ভাঙার' খেলাটির প্রতি কবির অনুরাগের কথা এই স্থলে স্মরণ করুন। পূরবীর 'পদধ্বনি' কবিতাটিতেও দেখুন এই ভাব :

জানি জানি, ভাঙিয়া নূতন করে তোলা ;
ভুলায়ে পূর্বের পথ অপূর্বের পথে দ্বার খোলা ;

অন্যত্র আবার

আবেশের রসে মত্ত
আরাম শয্যায়
বিজড়িত যে জড়ত্ব
মজ্জায় মজ্জায়,
কার্পণ্যের বদ্ধ দ্বারে,
সংগ্রহের অন্ধকারে
যে আত্মসংকোচ নিত্য গুপ্ত হয়ে রয়,
হানো তারে হে নিঃশঙ্ক
ঘোষুক তোমার শঙ্খ—
'নয়, নয়, নয়'।

[ঝড়

সুতরাং

গাহে "পশ্চাতের কীর্তি,
সম্মুখের আশা,
তার মধ্যে ফেঁদে ভিত্তি
বাঁধিস্ নে বাসা।
নে তোর মৃদঙ্গে শিখে
তরঙ্গের ছন্দটিকে,
বৈরাগীর নৃত্যভঙ্গী চঞ্চল সিন্ধুর।
যত লোভ, যত শঙ্কা,
দাসত্বের জয়ডঙ্কা,
দূর, দূর, দূর"। [ঝড়]

ভাঙনের মধ্যে এই যে নবপ্রাণের চেতনা, রবীন্দ্রনাথের বৈরাগ্যবাদে এই চেতনার আনন্দ আছে বলিয়াই পূরবীর সুরে তিনি আশার ঝংকার তুলিতে পারিয়াছেন। সংসারের কোনো কিছুতেই চিরদিন আসক্ত হইয়া পড়িয়া থাকা সত্য নহে জানিয়া সংসারের সবার সহিত জীবনকে তিনি থাপ খাওয়াইয়া লইয়াছেন। 'মুক্তি' কবিতায় তাই বলিয়াছেন :

সৃষ্টি মোর সৃষ্টি-সাথে মেলে যেথা, সেথা পাই ছাড়া,
মুক্তি যে আমারে তাই সংগীতের মাঝে দেয় সাড়া,
সেথা আমি খেলাখেপা বালকের মতো লক্ষ্মীছাড়া
লক্ষ্যহীন নগ্ন নিরুদ্দেশ।

এই 'খেলাখেপা বালকের লক্ষ্যহীন নিরুদ্দেশ' যাত্রার আবেগে জীবন জগতের মতোই চলে। এই চলমান শক্তিই রাবীন্দ্রিক বৈরাগ্য। পূর্ব অধ্যায়ে বৈরাগ্য-বিষয়ক আলোচনায় স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছি যে, এই বৈরাগ্য সন্ন্যাসীর জীবন নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ তত্ত্ববৈরাগ্য নহে। এই বৈরাগ্যের বাণী এই: সরিতে হইবে, চলিতে হইবে, আবার চলিতে চলিতে প্রিয়জনে 'হাতে হাত' দিয়া তাহাদের স্বীকার করিয়াও যাইতে হইবে। প্রিয়জনের হাতে হাত দিব, কিন্তু একান্ত করিয়া তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া চিরদিন কাছে রাখিবার জোর ফলাইব না; আবার অপর পক্ষে একদিন না একদিন চলিয়া যাইতে হইবে বলিয়া আজই সন্ন্যাস-বৈরাগ্যের প্রভাবে বর্তমানকে জীবন হইতে নিশ্চিহ্ন করিতেও চাহিব না।

কিন্তু কথাটা বোধ হয় ঠিক হইল না। মনোধর্মে ও মনোদর্শনে নিশ্চিহ্ন করিবার কোনো কথাই থাকিতে পারে না। নিশ্চিহ্ন হয় না কিছুই এইটাই কথার মত কথা। মনোদর্শনের সত্য এই: কিছুই হারায় না, কিছুতেই আসক্ত থাকি না, ত্যাগ না করিয়া পারি না, আবার ত্যাগ করিবার পরও ত্যক্ত বিষয়কে নবরূপে না পাইয়াও থাকি না। যে অতীত আমা হইতে আজ দূরে সরিয়া গেছে, নানাভাবে নানারূপে যে উদিত হয় জীবনের আকাশে, সরার মন্ত্র যখন কানে বাজে তখনও আসে 'মাটির ডাক' আহ্বান আসে 'লীলাসঙ্গিনীর' 'চঞ্চল' মন জীবনের নানা 'পথ' বাহিয়া 'মুক্তি'র আনন্দে যখন 'যাত্রা' করে, 'শেষে'র গান গাহিয়া শুনিতে চাহে 'মৃত্যুর আহ্বান' তখনও নূতনসুরে ঝংকার দিয়া উঠে 'মিলনের' মন্ত্রবাণী, 'কৃতজ্ঞ' হৃদয়ে গুঞ্জরিয়া উঠে 'তপোভঙ্গের' যৌবন উদ্বেজনা। পূর্বেই বলিয়াছি, মনোদর্শনের স্বরূপ বুঝিতে পারিলেই প্রেম সাধনার এই অন্তর্দ্বন্দ্ব,—এই আসা যাওয়ার গোপন তত্ত্ব, কোনোক্রমেই আর দুর্বোধ্য অথবা পরস্পর-বিরোধী বলিয়া মনে হইবে না,—বরং সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, আসা ও যাওয়া, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, জন্ম ও মৃত্যু এই তত্ত্বদ্বয় পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক মাত্র।

ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য কাব্যাবলীর আলোচনা প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছি সুধী পাঠক অবশ্যই লক্ষ্য করিতেছেন, তাহারই পুনরুক্তি আমাকে করিতে হইতেছে। রচনার দিক হইতে আমার ভাষণে যে পুনরুক্তিদোষ ঘটিতেছে, সে-বিষয়ে আমি সচেতন আছি। কিন্তু একটি বিষয়ে আমি এই পুনরুক্তির দ্বারাই লাভবান হইতেছি—পাঠক সেদিকে যদি লক্ষ্য রাখেন তবে আমার রচনাগুলির উপর সুবিচার করা হইবে। বিষয়টি এই, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বাহ্যতঃ অজস্র বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও তাহাদের মধ্যে ভাবের ও তত্ত্বের যে ঐক্য আছে, আমার ব্যাখ্যাগুলির পুনরুক্তির মধ্য দিয়াই তাহা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। বলা বাহুল্য বর্তমান অধ্যায়ে ইহাই, অর্থাৎ এই ঐকাতত্ত্ব প্রদর্শনই, আমার অভিপ্রায় ও লক্ষ্য।

পূরবী, বলিয়াছি, সন্ধ্যার সুর; কিন্তু সন্ধ্যা অর্থে অবশ্যই জীবনের অবসান আপনি মনে করেন নাই। ইহাও একপ্রকারের শুরু—নূতন প্রাতের আশায় তারাভরা রাত্রে ঘুমাইয়া পড়ার আনন্দ ইহার মর্মবাণী। সন্ধ্যা নামিয়াছে, আকাশে জাগিয়াছে তারকা, 'নিগূঢ় সুন্দর অন্ধকার' ব্যাপ্ত হইতেছে দিশি দিশি। পূরবী সুরে এইবার 'অন্ধকার'-এর বন্দনা গাওয়া হউক শুরু :

দিনের সংগ্রহ হতে আজি কোন্ অর্ঘ্য নিয়ে যাই
তোমার মন্দিরে ভাবি তাই।
কত না শ্রেষ্ঠীর হাতে পেয়েছি কীর্তির পুরস্কার,
সযত্নে এনেছি বহে সেই সব রত্ন-অলংকার,
ফিরিয়াছি দেশ হতে দেশে।
শেষে আজ চেয়ে দেখি, যবে মোর যাত্রা হল সারা
দিনের আলোর সাথে ম্লান হয়ে এসেছে তাহারা
তব দ্বারে এসে।

ইচ্ছা করিয়াই এমন একটি স্তবক আমি পূরবী হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি যাহার মধ্য হইতে নৈরাশ্যের মন্ত্রধ্বনি অতি সহজেই আপনি আবিষ্কার করিতে পারেন। বলিতে পারেন, কবি বৃদ্ধ হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার মনের তেজ কমিয়াছে, আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় প্রস্তুত হইতেছেন, তাই তাঁহার ভাষায় নামিয়াছে স্নিগ্ধসজল অভিমানী বৈরাগ্য, ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বৈরাগ্যতত্ত্বটি যাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, তাঁহারা এই স্তবকটির মধ্য হইতেই নবজীবনের নূতন চেতনা আস্বাদন করিবেন। তাঁহারা অবশ্যই বুঝিবেন, 'দিনের সংগ্রহ' হইতে ধূলিলিপ্ত কিছুই লইয়া যাইবার উপায় নাই 'আঁধারের আলোক ভাণ্ডারে'। তবু দিনের সংগ্রহ লইয়াই সাধারণ আমরা মাতিয়া থাকি, অহংকার করি, মনে করি ইহার দ্বারাই বুঝি বাঁচিব চিরকাল। তাই 'ব্যাঙের আধুলির' মতো, যক্ষের ধনের মতো সংগ্রহে ও সঞ্চয়ে আমাদের এত আসক্তি। যাহা লইয়া আছি, তা যে পড়িয়া যাইবে, ঝরিয়া যাইবে এবং সর্বোপরি তাহা অপেক্ষা ঢের বড় যে এই জীবন, এই জীবন-দেবতা, তাহা বুঝি না বলিয়াই জীবনকে সংগ্রহের পায়ে দেই লুটাইয়া, সংগ্রহের পাহারাতেই হই বন্দী, সংগ্রহ বাড়াইতেই হই প্রমত্ত। সংগ্রহ ও সঞ্চয়ের বস্তুস্তূপে কৃপণের মতো 'মৃত্যুর গুপ্ত প্রেমে' পড়িয়া থাকার এই যে মনোবৃত্তি, সঞ্চয় হারানোর আতঙ্কে ইহাই থাকে অহরহঃ অস্থির হইয়া। কিন্তু আবার কি বলিতে হইবে যে, সঞ্চয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বৃহতে অনুরাগ জাগানোর বাণীই রবীন্দ্রনাথের বৈরাগ্য-বাণী? পূরবীর দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় মুদ্রিত 'বিজয়ী' নামক কবিতাটি না হয় আর একবার পাঠ করুন।

সাংসারিক দিক হইতে ধনবল, জনবল, খ্যাতিবল সংগ্রহ করিতে 'দৃপ্তবেগের বিজয়

রথে' ছুটিয়া চলিল বীরের দল। ধনজন ও ঐশ্বর্যের শক্তি ক্রমশঃ মশালের মতো উঠিল জ্বলিয়া,—আলোকিত করিল অন্ধকার আকাশ:

মশাল তাদের রুদ্রজ্বালায় উঠল জ্বলে
অন্ধকারের ঊর্ধ্বতলে
বহ্নিদলের রক্তকমল ফুটল প্রবল দম্ভভরে।

এই যে মশাল, ইহা কি মুহূর্তের অহংকার মাত্র? 'কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল' ইহা কি রহিবে না?

ভাবল পথিক, এই যে তাদের মশালশিখা
নয় সে কেবল দণ্ডপলের মরীচিকা।

অতুল ঐশ্বর্য, অযুত সাফল্য, অপরিসীম বীরত্ব, অবর্ণনীয় আতিশয্য—ইহাদের দীপ্তি বুঝিবা অনির্বাণ।

ভাবল তারা, এই শিখাটাই ধ্রুবজ্যোতির তারার সাথে
মৃত্যুহীনের দখিন হাতে
জ্বলবে বিপুল বিশ্বতলে।
ভাবল তারা, এই শিখারই ভীষণ বলে
রাত্রি-রাণীর দুর্গপ্রাচীর দগ্ধ হবে,
অন্ধকারের রুদ্ধ কপাট দীর্ণ করে ছিনিয়ে লবে
নিত্যকালের বিত্তরাশি;
ধরিত্রীকে করবে আপন ভোগের দাসী।

কিন্তু তাহাদের ভুল ভাঙিল। যাবার ঘণ্টা বাজিলে, তাহাদের চমক ভাঙিল, বুঝিল সংসারে সকলি সরে, থামিয়া থাকে না কিছুই। প্রকৃতির নিয়মই এই: গতির চেতনায়, মৃত্যুর আঘাতে সে সকলকেই 'এক' হইতে 'অপরে' টানিয়া লইয়া চলিবে, স্থবিরের মতো বসিয়া থাকিতে দিবে না। স্বভাবের সত্য তাই ত্যাগ, ত্যাগের বিরোধিতা করিতে গেলেই শোক, দুঃখ, অশান্তি। ত্যাগের দ্বারা, চলার দ্বারা যে আনন্দ সেই আনন্দই স্বভাবের সত্য; এই সত্যোপলব্ধি যাহার হইয়াছে সংসারে সরিতে সরিতে সে-ই থাকিতে পায়, স্বভাবের সত্যের সহিত জীবনের সত্যের সামঞ্জস্য ঘটে বলিয়া জীবনযুদ্ধে সে-ই হয় বিজয়ী, 'তিমিরমগন শুভ্ররাগে' ললাট তাহার হয় মার্জিত। অহংদৃপ্ত ভোগের দম্ভে ও কামনায় যে মোহগ্রস্ত, দম্ভ তাহার একদিন না একদিন ভাঙেই. সুতরাং সে পরাজিতই হয় জীবন সংগ্রামে। অহং-এর সমস্ত ভোগবাসনা স্বেচ্ছায় সহজভাবে মহাকাল মহেশ্বরের হাতে তুলিয়া দিয়া আত্মদীপ্ত বৈরাগ্যের প্রসন্নতায় যে গতি-সাধক, জীবন সংগ্রামে বিজয়ী হইতে পারে সে-ই, আনন্দলোক দ্বার খুলে তাহারই সম্মুখে।

শূন্যে নবীন সূর্য জাগে।
ঐ যে তাহার বিশ্বচেতন কেতন-আগে
জ্বলছে নূতন দীপ্তিরতন তিমিরমথন শুভ্ররাগে;
মশাল-ভস্ম লুপ্তি-ধূলায় নিত্যদিনের স্মৃপ্তি মাগে।
আনন্দলোক দ্বার খুলেছে, আকাশ পুলকময়,
জয় ভূলোকের, জয় দ্যুলোকের, জয় আলোকের জয়।

জগৎ সংসার তুচ্ছতায় নিত্যলিপ্ততাকে অধিক কাল সহ্য করে না, ভাঙনের মধ্য দিয়া নূতনকে টানিয়া আনে, এই জন্যই তো আকাশে এত পুলক, আলোকে জয় নৃত্য, ভূলোকে রূপোল্লাস, দ্যুলোকে আনন্দ! তাহইলে জীবনের সত্য কি? ত্যাগ, বৈরাগ্য। ত্যাগ করিলেই আনন্দ হয়, প্রেম হয়. 'দ্বিজত্ব' হয়, মৃত্যু হইতে অমৃতে জন্মলাভ হয়। ত্যাগ করি কখন? বৃহতের ইশারা পাইলে তুচ্ছে আর যখন মন থাকে না তখন ত্যাগ করি। তখন কী হয়? জীবন বিস্তৃত হয়, জীবনবোধ ভূমাময় হয়। সর্বজগদ্‌গত প্রেমে মতি হয়, রতি হয়। তখন প্রকৃতির সৌন্দর্য আরও গভীররূপে রমণীয় মনে হয়। ইহাই জীবনের জয়। ইহাই আনন্দ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'বিশুদ্ধ স্বভাবিকতার' আনন্দ। এই আনন্দ যে পাইয়াছে, সেই বিজয়ী। এই বিজয়ের ঘোষণাবাণীই কি পূরবীর সন্ধ্যাস্বরে শুনেন নাই?

দিন শেষ হইয়া আসিতেছে, দিনের সংগ্রহ দিনকে ফিরাইয়া দিয়া কবি প্রবেশ করিতেছেন 'আঁধারের আলোকভাণ্ডারে'। সেই ভাণ্ডারে যে সৌন্দর্য দেখিতেছেন, তাহার তুলনায় দিনের সৌন্দর্যও যেন ম্লান হইয়া গেছে। যাহা রূপ, যাহা প্রকাশ—অরূপ ও অপ্রকাশের তুলনায় তাহা তো কিছুই নহে। রূপ লইয়া আমরা মাতামাতি করি, কিন্তু সর্বকালগত মহাকাল সেই অরূপের নিকষে কত রূপের সোনাই তো মিথ্যা হইয়া যায়। বস্তুতঃ সোনা মনে করিয়া, যত্ন করিয়া যাহা সঞ্চয় করি, সঞ্চয় করিতে পারিয়াছি বলিয়া অহংকারে ফাটিয়া পড়ি, বৃহৎদৃষ্টির নিকষে তাহার নকলত্ব যখন ধরা পড়ে, তখন কোন্ জীবনজহুরী তার সেই নকল সোনায় আসক্ত রহে?

রাত্রির নিকষে হায় কত সোনা হয়ে যায় মিছে,
সে-বোঝা ফেলিয়া যাব পিছে। [অন্ধকার]

তবে এ-কথা সত্য, জীবনে এমন রূপের, এমন মহিমার প্রকাশও ঘটে, রাত্রির নিকষে যাহা সোনা বলিয়াই প্রমাণিত হইতে পারে; অনির্বচনীয়া রাত্রির সর্বজগদ্‌গত মহারূপের মতোই তাহা হয়তো ব্যঞ্জনাময়; রূপে তাহার অরূপের ইঙ্গিত, নিত্য নবীনের লাবণ্য তাহার সর্ব অঙ্গে। এই যে মৃত্যুহীন অরূপ রূপমহিমা, জীবনে যদি ইহার কিছু কিছু প্রকাশ ঘটিয়া থাকে—

এ জন্মের সেই দান রেখে দেব তোমার থালায়
নক্ষত্রের মাঝে।

কারণ—

দিবসের ধূলা এরে কিছুতে পারেনি কাড়িবারে,
সেই তব নিজ দান বহিয়া আনিনু তব দ্বারে—
তুমি লও চিনে।

পূরবীর এই যে সুর, বলা বাহুল্য, ইহা নৈরাশ্যের সুর নহে, ইহা গভীর আত্মবিশ্বাস ও আত্মোপলব্ধির সুর। 'অন্ধকার'-এর অর্থাৎ 'নিগূঢ় সুন্দরের' ও 'চরম' সত্যের দৃষ্টিতে তিনি মানবজীবনের সত্যাসত্য বিচার করিতেছেন। অল্পের অহংকারে সত্য নাই, অমৃত নাই, ভূমার প্রসন্নতাতেই আছে সত্য, আছে অমৃত। যা অল্প, যা তুচ্ছ—লজ্জাকর তাহার আসক্তি ও বন্ধন হইতে মানুষকে তাই মুক্ত হইতেই হইবে—সাধন-জীবনের মহিমা বুঝিয়া অগ্রসর হইতে হইবে বৈরাগ্যের আনন্দে। তুচ্ছ সাংসারিকতার ধূলিলিপ্ত লাভ-ক্ষতি, মায়া-মোহ, হাসি-কান্না, ভাবনা-বেদনা—জীবনে ইহারা আছে জানি, ইহাদের প্রভাবও মানি, কিন্তু ইহাদের সংস্কার হইতে ক্রমশঃই মানুষকে সরিতে হইবে। সূর্যের রশ্মি-দূতীরা 'ভুবন অঙ্গনে' যেমন রূপের 'আলিম্পনা' আঁকে আবার মুহূর্তেই মুছিয়া ফেলে, হৃদয়-অঙ্গনে তেমনি হাসিকান্নার, ভাবনাবেদনার রূপলেখা আঁকা হক ক্ষতি নাই, কিন্তু মুহূর্তেই তাহা মুছিয়া ফেলার বৈরাগ্য-সাধন করিতেই হইবে জীবনশিল্পীকে।

তোমার দূতীরা আঁকে ভুবন-অঙ্গনে আলিম্পনা,
মুহূর্তে সে ইন্দ্রজাল অপরূপ-রূপেব কল্পনা
মুছে যায় সরে।
তেমনি সহজ হোক হাসিকান্না ভাবনাবেদনা,
না বাঁধুক মোরে। [সাবিত্রী]

জ্যোতির লীলাময়ী দূতীর দল যত আগ্রহে রূপের কল্পনা করে, তত আগ্রহেই মুছিয়া যায় সরিয়া। রূপ তাহারা উপেক্ষা করে না, কিন্তু রূপ হইতে অরূপে যাওয়ার আনন্দও করে না পরিহার। ইঙ্গিতে কবি জানাইতেছেন মানুষের জীবনও তো এই। তাহার হাসি-কান্না ভাবনাবেদনা অপরূপ রূপের আলিম্পনার মতোই সত্য। জীবন-সাধক হাসিকান্নার রূপগুলি আঁকে কিন্তু মুছিতেও জানে বলিয়া বন্দী রহে না কোনো বিশেষের বন্ধনে! বস্তুতঃ মনোধর্মে হাসিকান্না ভাবনাবেদনা কখনই উপেক্ষণীয় নহে, আবার জীবনে ইহারাই যে এক মাত্র সত্য, এ কথাও যথার্থ নহে। যতক্ষণ থাকিবার ইহারা থাকুক, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে ইহাদেরও ঊর্ধ্বে আছে অন্যতর নবীন জীবন, যে জীবনে 'আছে' 'নাই' পূর্ণ হয়ে রয়েছে সমান।

কবি বলে, 'যাত্রী আমি, চলিব রাত্রির নিমন্ত্রণে
যেখানে সে চিরন্তন দেয়ালির উৎসব-প্রাঙ্গণে
মৃত্যুদূত নিয়ে গেছে আমার আনন্দদীপগুলি,
যেথা মোর জীবনের প্রত্যুষের সুগন্ধি শিউলি
মাল্য হয়ে গাঁথা আছে অনন্তের অঙ্গদে কুণ্ডলে
ইন্দ্রাণীর স্বয়ম্বর বরমাল্য সাথে ; দলে দলে
যেথা মোর অকৃতার্থ আশাগুলি, অসিদ্ধ সাধনা,
মন্দির অঙ্গনদ্বারে প্রতিহত কত আরাধনা
নন্দনমন্দারগন্ধ-লুব্ধ যেন মধুকরপাতি
গেছে উড়ি মর্ত্যের দুর্ভিক্ষ ছাড়ি। [যাত্রা]

জীবনে সারা হয় নাই যতো পূজা, যতো আরাধনা, দুঃখ যে তাহার জন্য করি না, তাহা নয়, জীবজীবনে তাহার জন্য যে ভাবনা-বেদনা জাগে না তাহা নহে ; কিন্তু জগতের অকৃতার্থতার বন্দিত্বে প্রেমজীবনের তো মতি নাই, সর্বজগদ্‌গত চরম চরিতার্থতার মুক্তি-পথেই তো তাহার গতি ! প্রেমের দিগন্তপ্রসারী দৃষ্টির সম্মুখে অপূর্ণও পূর্ণের অন্তরে জাজ্বল্যমান, অসিদ্ধ সাধনাও সিদ্ধির সৌন্দর্যে শুভ্রসুন্দর। অকৃতার্থ আশাগুলির জন্য, অকালে নির্বাপিত আনন্দদীপগুলির জন্য যে বেদনা বা ক্রন্দন, তাহাতেই তাই বন্দী থাকা চলে না, বাহির হইতে হয় রাত্রির নিমন্ত্রণে, চিরন্তন দেয়ালির উৎসব-প্রাঙ্গণে। এই বাহির হইবার আনন্দ যে না জানে, হাসি-কান্না ভাবনা-বেদনা বাঁধে তাহাকেই। কবি বলিতেছেন, এ বাঁধন মানিব না, আমি চলিব ; কারণ চলাটাই সৃষ্টির স্বভাব। সৃষ্টির বিরোধিতা না করিয়া অর্থাৎ সুখ দুঃখের ভারে স্থবিরবৎ পড়িয়া না থাকিয়া সহজভাবে চলিতে জানিলেই সৃষ্টির সুরে আপনার সুর যাইবে মিলিয়া। তখন 'বস্তুর বন্ধন' নাই সুতরাং 'অকৃতার্থ আশার' জন্য ক্রন্দন নাই—'হাসিকান্না ভাবনাবেদনা' নাই। তখন আনন্দ,—সামঞ্জস্যের আনন্দ, সুরের আনন্দ, অখণ্ডের সহিত মিলিত হইয়া অখণ্ডোপলব্ধির অমৃত আনন্দ। কবি গাহিতেছেন :

যেদিন আমার গান মিলে যাবে তোমার গানের
সুরের ভঙ্গীতে,
মুক্তির সংগমতীর্থ পাব আমি আমারি প্রাণের
আপন সংগীতে।
সেদিন বুঝিব মনে, নাই নাই বস্তুর বন্ধন,
শূন্যে শূন্যে রূপ ধরে তোমারি এ বীণার স্পন্দন ;

নেমে যাবে সব বোঝা, থেমে যাবে সকল ক্রন্দন,
ছন্দে তালে ভুলিব আপনা—
বিশ্বগীতপদ্মদলে স্তব্ধ হবে অশান্ত ভাবনা। [মুক্তি]

মানুষের প্রাণের সুরের সহিত প্রকৃতির সুর কোথায় ও কেমন করিয়া মিলিতেছে, এবং সর্বোপরি সেই মিলনের মধ্য দিয়া 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় মুক্তির স্বাদ' কী ভাবে আস্বাদন করিতেছে, তাহার তত্ত্বকথা ধীর চেতনায় উপলব্ধি করিতে হইবে। প্রকৃতি মায়া, প্রকৃতি নিষ্ঠুরা ও ধ্বংসকারিণী বলিয়া অনেক সময় আমরা আতঙ্কিত হই, ঈশ্বরের সৃষ্টির বিরুদ্ধে, অশান্তবিক্রমে বিদ্রোহ প্রকাশ করি, কিন্তু মুহূর্তেও জানিতে চাহি না যে, প্রকৃতির নিয়মের সহিত নিজেদের খাপ খাওয়াইতে পারি না বলিয়াই এত দুঃখ, এত ক্ষোভ, এত অশান্তি। আমাদের আসক্তি ও মোহ অনেকক্ষেত্রে আমাদের কূপমণ্ডূক করিয়া রাখে। যে বিষয়ে আমরা আসক্ত সেই বিষয় বা বস্তুটি যদি চিরদিন অক্ষত ও অব্যয় থাকে, তবে অবশ্য আমাদের কোনো বিচ্ছেদ সহিতে হয় না, সুতরাং দুঃখও পাইতে হয় না, কিন্তু জগতে সকলই তো চলমান, রূপান্তরের জীবনলীলায় সমস্ত কিছুই তো আনন্দ-চঞ্চল। আসক্ত হইয়া 'মৃত্যুর গুপ্ত প্রেমে' 'বদ্ধ করা খাঁচায়' আমি থাকিতে চাহি বলিয়া জগৎ থাকিতে চাহিবে কেন? আজ যাহাকে আপন বলিয়া, চিরদিন এক ভাবে থাকিবে বলিয়া ধরিয়া রাখিতে চাহি, কাল তাহা তো রূপান্তরিত হইয়া আমাদের নাগাল ছাড়ায়। এই যে নাগাল ছাড়ানোর ব্যাপারটি প্রকৃতিতে নিত্যই সংঘটিত হইতেছে, ইহার সহিত জীবনের সামঞ্জস্য সাধন কবি কী প্রকারে? কবি শিখাইয়াছেন, মানুষও যদি নাগাল ছাড়াইবার স্বভাবটি চরিত্রে প্রতিভাত করিতে পারে, তবে প্রকৃতির গতির সহিত অবশ্যই তাহার গতির সুর মিলিয়া যায়। অর্থাৎ প্রকৃতি যখন সরিতে চায়, তখন সেও সরিতে যায় বলিয়া, সোজা কথায়, প্রকৃতির ইচ্ছার সহিত তাহার ইচ্ছার মিলন ঘটে বলিয়া প্রকৃতিকে সে নিষ্ঠুরা দেখে না, বরং জীবনসঙ্গিনী, লীলাসঙ্গিনী বলিয়া জ্ঞান করিতে থাকে। এই জ্ঞান যাহার জাগিয়াছে, চলার মন্ত্রে প্রাণ তাহার চঞ্চল; বলা বাহুল্য, চলিতে জানে বলিয়াই সে বদ্ধ হয় না। ইহাই তো মুক্তি। রবীন্দ্রনাথ একদা যে বলিয়াছিলেন 'প্রকৃতি আমাকে বদ্ধ করিতেছে না, বরং মুক্তই করিতেছে', এই হিসাবেই বলিয়াছিলেন। তিনি যে 'মাটির ডাকে' ফিরেন, 'লীলাসঙ্গিনীর' প্রেমে আনন্দ বোধ করেন, তাহা অবশ্যই এই সাহসে যে, ইহাতে তিনি বদ্ধ হইবেন না, বরঞ্চ নূতনতর জীবনপ্রেরণায় উচ্ছলিত হইয়া নূতনতর জীবনবেগে জাগরিত হইবেন নূতনতর চেতনায়। রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তির' এই ধারণাটি না বুঝা হইলে 'পূরবী' কবিতা উপলব্ধি করা সহজসাধ্য নহে।

পদে পদে চিরদিন
উদাসীন
পিছনের পথ মুছে চলে ?
এ কি সেই নিত্য শিশু, কিছু নাহি চাহে,
নিজের খেলনা-চূর্ণ
ভাসাইলে অসম্পূর্ণ
খেলার প্রবাহে ? [পদধ্বনি]

'পূরবী' বুঝিতে হইলে এই 'খেলার প্রবাহে'র মর্মগত তাৎপর্য গভীর ধ্যানের আরামে উপলব্ধি করিতে হইবে। শিশু যেমন পথের ধূলি লইয়া অবারিত আনন্দে অর্থহীন কত খেলা খেলে, গৃহ তৈয়ারীর খেলা খেলে, গৃহ ভাঙিয়া ফেলার খেলা খেলে, তেমনি মানুষের জীবনেও ভাঙাগড়ার নিত্যখেলায় শিশুর মতো অবারিত আনন্দই সহজ সত্য। ইহার বিরুদ্ধে যে যায়, দুঃখ তাহার।

বিলুপ্তির ধূলি দিয়ে যাহা খুশি সৃষ্টি করে তাই,
এই আছে এই তারা নাই।
ভিত্তিহীন ঘর বেঁধে আনন্দে কাটায়ে দেয় বেলা,
মূল্য যার কিছু নাই তাই দিয়ে মূল্যহীন খেলা,
ভাঙাগড়া দুই নিয়ে নৃত্য তার অখণ্ড উল্লাসে —
মোরে ভালোবাসে। [পথ]

রবীন্দ্রদর্শনের দিক দিয়া বিচার না করিয়া যাঁহারা 'পূরবী'র কবিতাগুলিকে কবির শেষ বয়সের রচনা হিসাবে বিচার করিয়াছেন, তাঁহারা কবিতাগুলির মধ্যে বার্ধক্যের অবসন্নতা ও 'আসন্ন মৃত্যুর পটভূমিকায় জীবন উপভোগের করুণ ব্যর্থতা' লক্ষ্য করিয়াছেন। একজন সমালোচক বলিয়াছেন : 'বার্ধক্যে যখন যৌবনের স্বর্গ আর রচনা করা হইল না, তখন স্মৃতিতে সেই মধুময় বিগত দিনগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া, তাহার যতখানি মাধুর্য সম্ভব কবি আহরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু অতীত ও বর্তমানের পার্থক্যের দীর্ঘ-নিঃশ্বাসে এবং আসন্ন চিরবিদায়ের চিন্তায় কবির সে স্মৃতির আনন্দও ম্লান ও করুণ হইয়া উঠিয়াছে।' [রবীন্দ্র-সাহিত্য-পরিক্রমা, ২য় খণ্ড] রবীন্দ্রনাথের দর্শন ও তাঁহার মনের সুর ও স্বরূপ সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান না থাকিলে সমালোচক মহোদয়ের উপরিউক্ত অভিমত অনেকেই বোধ করি বিনা দ্বিধায় সমর্থন করিবেন। কিন্তু কবির দর্শন-অভিমত ও কবিতাবলী যাঁহারা পাশাপাশি রাখিয়া গবেষণার আনন্দে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, পূরবীতে যাহা বলা হইয়াছে, রবীন্দ্রদর্শন ও বাণীরই তাহা স্পষ্ট প্রকাশ। আসন্ন মৃত্যু বা বার্ধক্যের প্রভাবে গতানুগতিক দীর্ঘনিঃশ্বাসের কারুণ্য পূরবী কবিতার

ব্যঞ্জনা নহে। পূরবীতে যে বৈরাগ্যের কথা বলা হইয়াছে, মৃত্যুর আহ্বানের যে ধ্বনি গুঞ্জরিত হইয়াছে, তাহা যদি রবীন্দ্রবাণী ও দর্শনের প্রাণস্পন্দন না হইত, কিংবা যদি বিপরীত কোনো তত্ত্বধর্মের ইঙ্গিত অর্থাৎ আশার পরিবর্তে নৈরাশ্য, আনন্দের পরিবর্তে দুঃখের কথা প্রকাশিত হইত, তা' হইলে অন্তভাবেও পূরবীর ব্যাখ্যা করা অযৌক্তিক বলিয়া মনে করিতাম না। যখন দেখিতেছি রবীন্দ্রবাণীর মর্মকথা পূরবীর ছন্দে ঝংকৃত হইতেছে, তখন বয়স বা বার্ধক্যের কথা তুলিয়া পাঠকের চিত্তে আচম্বিতে একটি গতানুগতিক সংস্কারের ভার চাপাইয়া দেওয়া রসিকের কাজ হইবে বলিয়া মনে করি না। আমি তো দেখিতেছি—কবির বয়স যত বাড়িতেছে, জীবন সম্পর্কে তাঁহার বিশ্বাস ততই ঘনীভূত হইতেছে, অখণ্ডেব আনন্দে হৃদয় আরও পূর্ণ হইতেছে, বৈরাগ্যের আনন্দছন্দে জীবন যৌবনময় দীপ্তিতে ঝলমল করিয়া উঠিতেছে। 'কঙ্কাল' নামক কবিতাটিতে অমর জীবন সম্পর্কে যে পূর্ণ বিশ্বাস প্রকটিত হইয়াছে তাহা হইতেই তো পূরবীর মূল সুরটি উপলব্ধি করা যায়। জীবন শেষ হইয়া আসিতেছে, রবীন্দ্রভঙ্গী অনুসরণ করিয়া বলাই ভালো যে, সীমাময় এই খণ্ড জীবনেব রূপ পবিবর্তনের সময় আসিতেছে, জীর্ণ বাস ত্যাগ করিয়া এখনি নূতন বাস পরিধান করিতে হইবে, এমন সময় কবি দেখিলেন 'মাঠের পথের এক পাশে' পশুর 'কঙ্কাল' রহিয়াছে পড়িয়া। দেখিযা তিনি কি শিহবিয়া উঠিলেন? তিনি কি ভাবিলেন, একদিন কঙ্কালসার হইয়া তাঁহাকেও পড়িয়া থাকিতে হইবে শ্মশানক্ষেত্রে?

'কালের নীরস অট্টহাসি' মানুষকে ভয় দেখায সত্য, কিন্তু 'কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল রহিবার' সাধনজীবনও আছে মানুষেব প্রতিভায়। সে শুধুমাত্র প্রাণ নহে, প্রাণের উর্ধ্বলোকে সে মন, প্রকাশ তাহার সর্বদেশে ও সর্বকালে, সর্বজগদ্গত অখণ্ড তাহার বিস্তৃতি, অপূর্ব তাহার সৃষ্টিপ্রতিভা, 'ক্ষণিককে সে অমর কবিযা তোলে, খণ্ডকে সে সম্পূর্ণতা দান করে', [সাহিত্য সমালোচনা, সমালোচনা সংগ্রহ] রূপেই সে শুধু বন্দী নহে, অরূপে সে মুক্তও বটে, সীমায সে নহে আধৃত, অসীমের সে আনন্দময় অভিযাত্রী।

আমাব মনের নৃত্য কতবার জীবন-মৃত্যুরে
লঙ্ঘিয়া চলিয়া গেছে চিরসুন্দরের সুরপুরে।
আমি যে রূপের পদ্মে করেছি অরূপমধু পান,
দুঃখেব বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান,
অনন্ত মৌনের বাণী শুনেছি অন্তবে,
দেখেছি জ্যোতির পথ শূন্যময় আঁধার প্রান্তরে।
নহি আমি বিধির বৃহৎ পরিহাস—
অসীম ঐশ্বর্য দিয়ে রচিত মহৎ সর্বনাশ। [কঙ্কাল]

বস্তুবিশ্বে কিছুই থাকে না—এ-কথা সত্য; কিন্তু চলিতে যে জানে, অহং হইতে যে জানে উত্তীর্ণ হইতে, সহজস্বভাব হইতে সাধনস্বভাবে উত্তীর্ণ হইয়া জীবনে যে প্রকাশ করিতে জানে

আনন্দ-প্রেম, যুগ যুগ ধরিয়া সে জাগ্রত থাকে, উন্মত থাকে চলার বাণী লইয়া। ইহাই অমরত্ব। চলার বাণী যাহার ফুরাইয়াছে, জগতের চলার তালে আর তাল রাখিতে পারে না বলিয়াই হয় বিস্মৃত, হয় বিলুপ্ত। ইহাই কঙ্কালত্ব। মানুষের সৌভাগ্য এই, সে কঙ্কাল নহে, সে অমর। কেন না চিরসুন্দরের সুরপুরে অগ্রসর হইবার বাণী আছে তাহার সাধনায়, যুগ হইতে যুগে, কাল হইতে কালে 'চরৈবেতি' বলিয়া সে অহরহঃ চলিতে জানে তমসা হইতে জ্যোতির দিব্যতায়। এই তমসা হইতে জ্যোতির মহিমায় রূপ হইতে অরূপের সৌন্দর্যে, দুঃখ হইতে আনন্দের অমৃতে নিত্য অগ্রসর হওয়ার প্রবণতা ও সাধনা তাহার আছে বলিয়া বিধাতার কাছ হইতে সে যাহা গ্রহণ করে, তাহার দ্বিগুণ দান করিবার অধিকার সে লাভ করে। বিধাতা তাহাকে দান করিয়াছেন রূপের জগৎ, মানুষ সেই রূপের জগৎ হইতে অরূপের আনন্দ ছানিয়া লইয়া পূজোপচারের মতো দেয় ফিরাইয়া: বিধাতা যদি তাহাকে দান করেন দুঃখবিরহ, তা' হইলে সেই দুঃখবিরহের মধ্য হইতেই আনন্দের আয়োজন রচনা করিয়া বিধাতৃমন্দিরে দেয় ফিরাইয়া। এই ফিরাইয়া দেওয়ার প্রতিভাও চলার প্রতিভা, গতির প্রতিভা। আপনাতে আপনি বদ্ধ না থাকিয়া ফিরাইয়া দিতে দিতে এই যে চলা, ইহাও মানবিকতার মাহাত্ম্য, পরম মনুষ্যত্ব, কালের উপরে কালঞ্জয় কর্তৃত্ব। 'সৃষ্টিকর্তা' নামক কবিতায় কবি বলিতেছেন: বিধি আমাকে যে-নিধি দিয়াছেন, দ্বিগুণ তাহার পাইয়াছেন ফিরিয়া। বসন্তের পুষ্পোপহার আমাকে তিনি দিয়াছেন বটে, কিন্তু দক্ষিণ সমীরের কানে বসন্ত কুসুমের কী বাণী, আমার গানের মন্ত্রেই তো তিনি জানিয়া লইয়াছেন। শ্রাবণ রাত্রির বৃষ্টিধারা কী অনাদি বিচ্ছেদের সঙ্গীত গাহিয়া থাকে আমার কণ্ঠ হইতেই তো তাহার সুললিত ভাষ্য স্বর হইয়া পাইয়াছে প্রকাশ। আমিই তাঁহার প্রেমের ক্ষেত্র, আমি না হইলে তাঁহার সৃষ্টি নিষ্ফল, লীলা অসার্থক।

> জানি আমি, মোর কাব্য ভালোবেসেছেন মোর বিধি—
> ফিরে যে পেলেন তিনি দ্বিগুণ আপন-দেওয়া নিধি।
> তাঁর বসন্তের ফুল বাতাসে কেমন বলে বাণী,
> সে যে তিনি মোর গানে বারম্বার নিয়েছেন জানি।
> আমি শুনায়েছি তাঁরে শ্রাবণরাত্রির বৃষ্টিধারা
> কী অনাদি বিচ্ছেদের জাগায় বেদন সঙ্গীহারা। [সৃষ্টিকর্তা]

এমন-যে আমি, লীলা-প্রকাশের জন্য এই আমির নিত্য প্রয়োজন। এই আমি তাই মিথ্যা নহে। বিশেষে থামিয়া থাকা ইহার স্বভাব নহে, কারণ লীলাময় ঈশ্বরের ইহা বিভূতি, নব নব রূপে ইহারি আত্মান্বেষ: মৃত্যুর মধ্য দিয়া রূপ হইতে রূপান্তরে অহরহঃ অভিযাত্রা এই আমির, এই 'বড়ো-আমির',—ইহা 'কঙ্কাল' নহে, 'ছোট-আমি' নহে, বস্তুসর্বস্ব 'self' নহে, মৃত্যুঞ্জয় ইহার প্রতিভা। পূরবীতে এই মৃত্যুঞ্জয় প্রতিভার সুর কি

শুনেন নাই ? মৃত্যুর আহ্বানবাণী পূরবীতে অজস্র ভঙ্গীতে প্রকাশিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু বলাকার মৃত্যুদর্শনে যে সত্য অনুভব করিয়াছেন, পূরবীর মৃত্যুদর্শনে সেই সত্যই কি অনুভব করিতেছেন না ?

পূরবীর বিভিন্ন কবিতা হইতে মৃত্যু সম্পর্কিত কয়েকটি পংক্তি পর পর সাজাইয়া দিতেছি। ধীরভাবে লক্ষ্য করিলেই বুঝিবেন, পূরবীর মৃত্যুকল্পনা বলাকার 'মৃত্যু'র মতই নবচেতনার প্রেমানুরাগে এবং নবীন জীবনোৎসবের অভিসারে সমুজ্জ্বল।

১

আশ্বিনের রাত্রিশেষে ঝরে পড়া শিউলিফুলের
আগ্রহে আকুল বনতল ; তারা মরণকূলের
উৎসবে ছুটেছে দলে দলে ; শুধু বলে, "চলো চলো"। [যাত্রা]

২

একদা তব মনে না রবে
স্বপনে এরা মিলাবে কবে,
তাহারি আগে ঝরুক তবে
অমৃতময় মরণে
ফাগুনে তোরে বরণ করে
সকল-শেষ বরণে। [গানের সাজি]

৩

রচিয়া রাখেনি মোর প্রেয়সী কি বরণের ডালি
মরণের কূলে ? [আহ্বান]

৪

যুগে যুগে মুছে যায় লক্ষ লক্ষ রাগরক্ত ছবি,
তুই হেথা, কবি,
এ বিশ্বের মৃত্যুর নিশ্বাস
আপন বাঁশিতে ভরি গানে তারে বাঁচাইতে চাস। [ছবি]

৫

অমৃত যে হয়নি মথন
তাই তোমাকে এই অযতন ;
তাই তোমারে ঘিরে আছে ছলন-ছায়া কুহেলিকা
নিত্যকালের আপন তোমার লুকিয়ে বেড়ায় মিথ্যা সাজে,
ক্ষণে ক্ষণে ধরা পড়ে শুধু আমার স্বপন-মাঝে।

আমি জানি, সত্য তাই —
মরণদুঃখে অমর জাগে অমৃতেরই তত্ত্ব তাই 	[স্বপ্ন]

৬

জ্যোতির্হীন সীমা
মৃত্যুর অগ্নিতে জ্বলি
যায় গলি,
গড়ে তোলে অসীমের অলংকার। 	[শেষ]

৭

দুয়ার রহিবে খোলা ; ধরিত্রীর সমুদ্র-পর্বত
কেহ ডাকিবে না কাছে, সকলেই দেখাইবে পথ।
শিয়রে নিশীথরাত্রি রহিবে নির্বাক,
মৃত্যু সে যে পথিকের ডাক। 	[মৃত্যুর আহ্বান]

৮

অতীতের সূর্যাস্তের কাল
আপনার সকরুণ বর্ণচ্ছটা মেলে
মৃত্যুর ঐশ্বর্য দেয় ঢেলে,
নিমেষের বেদনারে করে সুবিপুল। 	[অতীত কাল]

৯

ধূলি উৎস হতে
প্রকাশের অক্লান্ত উৎসাহ
জন্মমৃত্যুতরঙ্গিত রূপের প্রবাহ
স্পন্দিত করিছে মোর বক্ষস্থল আজি। 	[প্রভাত]

১০

জানে যারা চলার ধারা
নিত্য থাকে নূতন তারা,
হারায় যারা রয়ে রয়ে।
ভালোবাসা, তোমারে তাই
মরণ দিয়ে বরিতে চাই,
চঞ্চলতার লীলা তোমার
রইব সয়ে। 	[চঞ্চল]

সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার শিল্প ও দর্শন, প্রেম ও বৈরাগ্য সম্পর্কে বিশেষ ভাবেই প্রযোজ্য বলিয়া মনে করি :

'যে আত্মসংবৃত প্রেম সমস্ত সংসারের অনুকূল, যাহা আপনার চারিদিকে ছোট এবং বড়, আত্মীয় এবং পর কাহাকেও ভোলে না, যাহা প্রিয়জনকে কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া বিশ্ব-পরিধির মধ্যে নিজের মঙ্গলমাধুর্য বিকীর্ণ করে, তাহার ধ্রুবত্বে দেবে-মানবে কেহ আঘাত করে না; আঘাত করিলেও সে তাহাতে বিচলিত হয় না। কিন্তু যাহা যতির তপোবনে তপোভঙ্গরূপে, গৃহীর গৃহপ্রাঙ্গণে সংসার ধর্মের অকস্মাৎ পরাভবস্বরূপে আবির্ভূত হয়, তাহা ঝঞ্ঝার মতো অন্যকে নষ্ট করে বটে, কিন্তু নিজের বিনাশকেও নিজেই বহন করিয়া আনে।' [প্রাচীন সাহিত্য]

বক্তব্যটি সহজ ভাষায় এই : প্রেম অসংযম নহে, উচ্ছৃঙ্খলতা নহে, দুরন্ত কামযন্ত্রণার ধর্মহীন মানসবিকার নহে, তাহা তপস্যা, তাহা বৈরাগ্য, মানবজীবনে তাহা প্রত্যক্ষ দেবত্বের প্রসন্ন মহিমা। প্রেমের এই যে আদর্শ, এই যে ভাব, এইটি রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতায় আরোপ করিয়া বিচার করিতে হইবে, নতুবা প্রেমের রূপ হইতে অরূপে অথবা তনু হইতে অতনুতে গতাগতির তত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম হইবে না। পূরবীর 'তপোভঙ্গ' কবিতাটিও এইভাবে বিচার করিয়া একবার দেখিতে পারেন।

'তপোভঙ্গ' কবিতাটি আকস্মিক উদ্বেল উচ্ছৃঙ্খলতার সঙ্গীত নহে, তপস্যাশেষে বসন্তের বিজয় সঙ্গীত এই তপোভঙ্গ। তত্ত্বসর্বস্ব সন্ন্যাস-তপস্যার অহংকার যেখানে উদগ্র, শ্মশানের বৈরাগ্যবিলাসী যেখানে 'দারিদ্র্যের উগ্রদর্পে' সংসারকে তুচ্ছ করিয়া, জগৎকে মায়া কহিয়া মানুষ হইতে দূরে থাকার সত্যে সাধনতৎপর, সেইখানে অর্থাৎ সেই জগৎ-নিরপেক্ষ হৃদয়হীন তপোবনে তপোভঙ্গের সুর ধরিবেন 'বিদ্রোহী নবীন বীর, স্থবিরের শাসননাশন।' গাহিবেন :

> তপোভঙ্গ দূত আমি মহেন্দ্রের, হে রুদ্র সন্ন্যাসী,
> স্বর্গের চক্রান্ত আমি। আমি কবি যুগে যুগে আসি
> তব তপোবনে।

বৈরাগ্যের তপস্যাকে রবীন্দ্রনাথ জীবনের গতিস্বরূপ মনে করেন, কিন্তু একথা তো সকলেই জানেন যে, শাংকর তপস্যাকে তিনি কদাচ সমর্থন করেন না। যে তপস্যা জীবনকে বা জগৎকে মায়া বা মিথ্যা বলিয়া মনে করায়, রবীন্দ্রনাথের 'তপোভঙ্গ' সেই সন্ন্যাস-তপস্যারই জলন্ত প্রতিবাদ। রবীন্দ্রনাথের বৈরাগ্য-তপস্যা সৃষ্টিকে অস্বীকার করিবার তপস্যা নহে, সৃষ্টিকে সুন্দর করিবার, স্বর্গকল্প করিবার, দেবত্বগৌরবে উদ্দীপ্ত করিবার প্রেম-তপস্যা। 'তপোভঙ্গ দূত আমি' কিংবা 'স্বর্গের চক্রান্ত আমি', এই দুটি

বাণীর দ্বারা শাংকর তপস্তার বিরুদ্ধেই তিনি প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন, আপনার আদর্শগত প্রেমতপস্তার বিরুদ্ধে কদাচ নহে।

শ্মশানের বৈরাগ্যবিলাসীর দল, বলাই বাহুল্য, এই প্রেম-তপস্তার মাহাত্ম্য বুঝে না। ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তত্ত্বসর্বস্ব ব্রহ্ম-বৈরাগ্যের তপস্তায় যাহারা নিত্য তৎপর, কবির প্রেমতপস্তাকে তাহারা পরিহাসই করে, কিন্তু জগৎপ্রকৃতির লীলাময় ভগবান অস্বীকার করেন না প্রেমের তপস্তামহিমা।

আমারে চেনে না তব শ্মশানের বৈরাগ্যবিলাসী,
দারিদ্র্যের উগ্র দর্পে খল খল ওঠে অট্টহাসি
দেখে মোর সাজ।
হেনকালে মধুমাসে
মিলনের লগ্ন আসে,
উমার কপোলে লাগে স্মিতহাস্যবিকশিত লাজ।
সেদিন কবিরে ডাক বিবাহের যাত্রাপথতলে,
পুষ্পমাল্যমাঙ্গল্যের সাজি লয়ে সপ্তর্ষির দলে
কবি সঙ্গে চলে।

শাংকর বৈরাগ্যের ব্রহ্মদর্শন এবং রবীন্দ্র বৈরাগ্যের প্রেমদর্শন এই দুই দর্শনবোধের পার্থক্য রবীন্দ্রকাব্য সমালোচকদের অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়াই জানিতে হয়; তা' জানা হয় না বলিয়াই রবীন্দ্রনাথের বৈরাগ্য ও প্রেমসূচক উক্তিগুলির মধ্যে পরস্পরবিরোধিতার দোষ আছে মনে করিয়া সমালোচকগণ কবিমানসের খেয়াল ও বৈচিত্র্য-প্রীতির কথাই ব্যাখ্যা করিয়া আনন্দ পান; কিন্তু তাঁহাদেরি অজ্ঞাতসারে রবীন্দ্রনাথের উপর কত যে অবিচার তাঁহারা করিয়া বসেন, তাহা তাঁহারা বিবেচনাই করেন না। আসল কথা, সন্ন্যাসীদের বৈরাগ্যের প্রতিবাদে 'পুষ্পমাল্যমাঙ্গল্যের সাজি' লইয়া তিনি গৃহে ফেরেন, মাটির ডাকে সাড়া দেন, 'তপোভঙ্গ দূত আমি মহেন্দ্রের' বলিয়া 'ছন্দের ক্রন্দনে' উদ্দামের আনন্দসংগীত দেন বাজাইয়া; আবার সংসারীদের বিষয়াসক্তির প্রতিবাদে 'নে তোর মৃদঙ্গে শিখে তরঙ্গের ছন্দটিকে' বলিয়া 'অন্তহীন দূরের' ইঙ্গিতে সুর দেন গৃহ-ছাড়ার গানে। পশু, সংসারী, মানব ও সন্ন্যাসী, পৃথিবীকে যদি এই দলচতুষ্টয়ের আবাসভূমি বলা যায়, অথবা অন্য ভাষায়, পশুত্ব, সংসারিত্ব, মানবত্ব ও সন্ন্যাসিত্ব এই গুণচতুষ্টয়ের আধার যদি বলা যায় পৃথিবীকে, তবে রবীন্দ্রদর্শনের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য বলিতে পারি যে, রবীন্দ্রনাথ ঐ তৃতীয়গুণের অর্থাৎ মানবত্বগুণের পরম উপাসক। সংসারিত্ব নহে, মানবত্বের মহিমা আছে তাঁহার তপস্তায়। এই তপস্তা সংসারীর বিষয়াসক্তির প্রতি

বৈরাগ্য প্রকাশ করে, 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনো খানে' বলিয়া স্বপ্ন-সংসারের সাধন পথে ধাবিত হয়, স্বপ্ন-সংসারের দৃষ্টিতে জগৎ-রূপে দেখে অরূপের আনন্দ-মহিমা, গান গাহে যৌবনের আবেগে, কিন্তু সন্ন্যাসিত্বে লীন হইয়া মানবত্ব গুণটির নির্বাণ চাহে না কখনও। মানবত্বের পরম প্রকাশই কবিগুরুর সাধনা। এই সাধনার পথে বৈষয়িকতা হইতেছে পরম বিঘ্ন, তাই .

নে তোর মৃদঙ্গে শিখে
তরঙ্গের ছন্দটিকে
বৈরাগীর নৃত্যভঙ্গী চঞ্চল সিন্ধুর।

আবার সন্ন্যাসিতাও এই সাধনার পথে বিশেষ অন্তরায়। তাই ·

তপোভঙ্গদূত আমি মহেন্দ্রের, হে রুদ্র সন্ন্যাসী,
স্বর্গের চক্রান্ত আমি।

রবীন্দ্রমানসের তথা মানসদর্শনের এই স্বরূপটি স্পষ্টভাবে জানা হইলেই রবীন্দ্রকাব্যের কোথাও আর পরস্পরবিরোধী ভাব লক্ষিত হইবে না। তখন বুঝা যাইবে, রবীন্দ্রনাথের প্রেম ও বৈরাগ্য আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী তত্ত্ব বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তা এক অদ্বিতীয় জীবনতত্ত্বেরই প্রকাশ। এই তত্ত্বজ্ঞান হইলে প্রেমের দৃষ্টিতে তখন বৈরাগ্য পাঠ করিতে হইবে, বৈরাগ্যের দৃষ্টিতে প্রেম পাঠ করিতে হইবে। ইহা হইলেই বুঝা যাইবে রবীন্দ্রনাথের কবিতা তাঁহার দর্শনবিরোধী নহে, রবীন্দ্রনাথের দর্শন তাঁহার কবিতাবিরোধী নহে।

'মহুয়া' কাব্য সম্পর্কেও ঐ কথা প্রযোজ্য। 'বাসন্তিক স্পর্শ'-রঞ্জিত প্রেমের মহুয়া-কাব্যও কবির বৈরাগ্য দর্শনের বিরোধিতা করে নাই। সেই কথাই এবার আলোচনা করিতেছি।

মহুয়া

সংযমে যে সুস্থিরা, সাধনায় সুগম্ভীরা, বিলাসবিহীনা যে তপস্বিনী কল্যাণী, অসহায় শংকিতের যে আশ্রয়দাত্রী, দুর্ভিক্ষপীড়িত বুভুক্ষুর সম্মুখে সদাব্রতা যে অন্নপূর্ণা, আবার ফাল্গুনের ফুলোৎসবে যৌবনের পুষ্পপুটে যে জাগায় 'মদিরা', মাতায় মৌমাছি, জাগায় ভ্রমর, চঞ্চলিয়া তোলে অন্তরের অজস্র বসন্তস্বপ্ন—নাম তাহার 'মহুয়া'। নামখানি গ্রাম্য

বটে, 'লঘুধ্বনি তার' এ কথাও সত্য, কিন্তু চরিত্রে তাহার বৈরাগ্যতপস্যার অটল শক্তি-প্রতিভা, হৃদয়ে তাহার প্রেমানুরাগের 'তরল যৌবনবহ্নি।'*

রে অটল, রে কঠিন,
কেমনে গোপনে রাত্রিদিন
তরল যৌবনবহ্নি মজ্জায় রাখিয়াছিলি ভরে?

এই 'কেমনে' বলিয়া কবি বিস্ময়ভরে যে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার সদুত্তর অবশ্য রবীন্দ্রনাথের প্রেমদর্শনে মেলে। দার্শনিক বলিয়াছেন, যেখানে সংযম, যেখানে তপস্যা, প্রেমের অধিষ্ঠান সেইখানেই। লজ্জাহীন কাঙালপনায়, অর্থহীন অপব্যয়ে রুদ্ধ হয় প্রেমের পথ, সত্যকার প্রেম তাই সেখানে নাই। জীবনকে পূর্ণপ্রেমের অভিমুখী করিতে হইলে শুধু সম্ভোগের পিপাসা নয়, ত্যাগের দীক্ষারও প্রয়োজন।

'প্রেমরসের মধ্যে যে দিকটি সম্ভোগের দিক কেবল সেইটিকেই একান্ত করে তুললে দুর্বলতা এবং বিকার ঘটে। ওর মধ্যে একটি শক্তির দিক আছে সেটি না থাকলে রসের দ্বারা মনুষ্যত্ব দুর্গতি প্রাপ্ত হয়।' [শান্তিনিকেতন-২]

'আমরা যে প্রেমের সাধনা করব সে সতী স্ত্রীর সাধনা। তাতে সতীর তিন লক্ষণই থাকবে। তাতে হ্রী থাকবে, ধী থাকবে, এবং শ্রী থাকবে। তাতে সংযম থাকবে, সুবিবেচনা থাকবে, এবং সৌন্দর্য থাকবে।' [শান্তিনিকেতন-১]

মহুয়ার প্রেমে এই হ্রী, ধী ও শ্রীর ঐশ্বর্য আছে, আছে সংযম, সুবিবেচনা ও সৌন্দর্যের তপস্যা। এই তপস্যা-উদ্দীপ্ত বলিষ্ঠ প্রেমের অপরূপ অরূপকে কবি মহুয়ার রূপে দেখিয়াছেন :

আমি তো দেখেছি তোরে
বনস্পতি গোষ্ঠীমাঝে অরণ্যসভায়
অকুণ্ঠিত মর্যাদায়
আছিস্ দাঁড়ায়ে।
শাখা যতো আকাশে বাড়ায়ে
শালতাল সপ্তপর্ণ অশ্বত্থের সাথে
প্রথম প্রভাতে
সূর্য-অভিনন্দনের তুলেছিস গম্ভীর বন্দন।

[মহুয়া]

আকাশে যখন জাগে কালবৈশাখী, ঝড়ের ঝাপটে উদ্বিগ্ন হয় অরণ্য, শংকিত অসহায় বিহঙ্গদল যখন আশ্রয় চাহিয়া ফিরে দিশি দিশি, তখন

* [রবীন্দ্ররচনাবলীর ১৫শ খণ্ডের ৫২১ পৃষ্ঠায় 'মহুয়া'র আর একটি পাঠ মুদ্রিত আছে দেখুন। 'রে মহুয়া, নামখানি গ্রাম্য তোর, লঘুধ্বনি তার, প্রাণ তোর উচ্চশির রহে রাজকুলবনিতার মর্যাদা বহিয়া।']

শাখাব্যূহে ঘিরে
আশ্বাস করিস দান শংকিত বিহঙ্গ অতিথিরে।

আবার 'অনাবৃষ্টি ক্লিষ্ট দিনে' দুর্ভিক্ষপীড়িত 'বন্য বুভুক্ষুর দল' 'রিক্তপথে' যখন ফিরে ব্যাকুল হইয়া, তখন

দুর্ভিক্ষের ভিক্ষাঞ্জলি ভরে তারা তোর সদাব্রতে।

এই যে হ্রী-যুক্তা সূর্যোপাসিকা বরাভয়দাত্রী বৈরাগিণী, ধী-যুক্তা অন্নপূর্ণাস্বরূপা সদাব্রতা কল্যাণী, ফাল্গুনের ফুলোৎসবে ইহাকেই তো দেখিবেন যৌবনবিভবসম্পন্না পুষ্পাভরণা শ্রী-মতী বসন্তলক্ষ্মী।

কবি বলিতেছেন :

বহুদীর্ঘ সাধনায় সুদৃঢ় উন্নত
তপস্বীর মতো
বিলাসের চাঞ্চল্যবিহীন
সুগম্ভীর সেই তোরে দেখিয়াছি অন্যদিন
অন্তরে অধীরা
ফাল্গুনের ফুলদোলে কোথা হতে জোগাস্ মদিরা
পুষ্পপুটে ;
বনে বনে মৌমাছিরা চঞ্চলিয়া উঠে।
তোর সুরাপাত্র হতে বন্যনারী
সম্বল সংগ্রহ করে পূর্ণিমার নৃত্য-মত্ততারি।

প্রেমের এই দুই রূপের প্রকাশ, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "দুই ধারার পরিচয়"ই আছে মহুয়ায়। একদিকে হ্রী-ধী অর্থাৎ পর্বতকঠিন ধৈর্য, ত্যাগ ও তপস্যা, অপরদিকে শ্রী অর্থাৎ বসন্তসুন্দর পুষ্পচাপল্য ও যৌবনবিলাসানন্দ। ইহাই তো রবীন্দ্রকল্পিত প্রেমের আদর্শ। 'দুই বোন' নামক বিখ্যাত গল্পের একটি উপমা দ্বারা প্রেমের এই দুই রূপের চিত্র আরও স্পষ্ট করা যায়। প্রেম একদিকে যেন বর্ষা ঋতু, অপরদিকে বসন্ত। যেদিকে বর্ষাঋতু, সে দিকে প্রেম' "জলদান করেন, ফলদান করেন, নিবারণ করেন তাপ, ঊর্ধ্বলোক থেকে আপনাকে দেন বিগলিত করে, দূর করেন শুষ্কতা, ভরিয়ে দেন অভাব"। যে দিকে বসন্ত, সেদিকে "গভীরতার রহস্য, মধুরতার মায়ামন্ত্র, তার চাঞ্চল্য রক্তে তোলে তরঙ্গ, পৌঁছয় চিত্তের সেই মণিকোঠায়, যেখানে সোনার বীণায় একটি নিভৃত তার রয়েছে নীরবে, ঝংকারের অপেক্ষায়, যে ঝংকারে বেজে বেজে ওঠে সর্বদেহে মনে অনির্বচনীয়ের বাণী।"

'বলাকায়' রবীন্দ্রনাথ 'দুই নারী'র যে কল্পনা করিয়াছেন,—লক্ষ্মী ও উর্বসী—প্রেম এই দুই নারীর দ্বিবিধ গুণের সম্মেলনে এক আনন্দময় পূর্ণসত্তা। লক্ষ্মীত্ব ত্যাগ করিলে উর্বসী স্বর্গগণিকামাত্র, উর্বসীত্ব ত্যাগ করিলে লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠবিহীনা বিশুষ্ক বৈরাগিণী মাত্র।

"যদি হ্রীর অভাব ঘটে, যদি ধীর বিকার ঘটে, তবে শ্রীও নষ্ট হয়ে যায়। [বিকারশঙ্কা, শান্তিনিকেতন-১]

মহুয়ার কবিতায় দেখিবেন প্রেমের 'দুই ধারার' আশ্চর্য সমন্বয় ঘটিয়াছে। ইহার প্রেমের চিত্রে দেখিবেন ত্যাগের ঔজ্জ্বল্য, ত্যাগের মন্ত্রে শুনিবেন প্রেমের রহস্য-গুঞ্জন। শুধু শিব নহে, শুধু সুন্দর নহে, শিব, সুন্দর—এই দুই-এর সম্মেলনেই সত্যদর্শনের আনন্দ। এই আনন্দই প্রেম। রবীন্দ্রনাথ এই প্রেমের সাধনাতেই সারা জীবন মৃত্যুপাসক অর্থাৎ গতি-চঞ্চল। এই ভাবটি অন্তরে আসিয়া পৌঁছিলেই মহুয়ার প্রেম সূর্যের আলোর মতো স্পষ্ট হইয়া যায়। তখন সহজেই বুঝা যায়, মহুয়াকে সম্বোধন করিয়া কেন কবি বলিতেছেন :

কানে কানে কহি তোরে

বধূরে যেদিন পাব ডাকিব মহুয়া নাম ধরে।

শুধু কাব্যরসের উদ্বোধনের জন্যই এই পংক্তিদ্বয়ের মূল্য, দর্শনভাবের সূক্ষ্ম বোধোদ্বোধনের জন্য নহে? আচ্ছা, বধূর রূপটি কেমনতর? মহুয়া নামেই তো তাহার প্রকাশ। বধূকে এখনো পাই নাই, আজও যে "রমণী-মূরতি অবগুণ্ঠনে ঢাকা" [সিন্ধুপারে, চিত্রা] ইঙ্গিতে-আমাকে ইশারা করে, আজও "সে নারী বিচিত্র বেশে মৃদু হেসে" দ্বার খোলে "থাকিয়া থাকিয়া" [আহ্বান, পূরবী]; আজও সে আছে স্বপ্নে, মাঝে মাঝে শুধু দেখা দেয় চকিত বিদ্যুৎ আলোকে, তাইতো চলা আমার থামে নাই। কিন্তু যেদিন থামিবে, অর্থাৎ মনের মতো বধূকে, বধূর মতো বধূকে যখন পাইব, ডাকিব তাহাকে 'মহুয়া' বলিয়া। কহিব: তৃপ্ত আমি এইজন্য, বধূর মতো তুমি বধূ: একাধারে তুমি লক্ষ্মী এবং উর্বশী, তুমি বৈরাগ্য, তুমি প্রেম, তুমি হ্রী-ধী, তুমিই শ্রী, তুমি প্রেমের পূর্ণরূপ—তুমি 'মহুয়া'।

রে অটল, রে কঠিন,

কেমনে গোপনে রাত্রিদিন,

তরল যৌবনবহ্নি মজ্জায় রাখিয়াছিলি ভরে।

কানে কানে কহি তোরে

বধূরে যেদিন পাব, ডাকিব মহুয়া নাম ধরে। [মহুয়া]

ত্যাগোদ্দীপ্ত বীর্যপ্রধান প্রেমের অপর নাম মহুয়া,—শব্দটি নূতন নয়, পুরাতন বাঙলা সাহিত্যেও ইহার প্রয়োগ আছে অজস্র, কিন্তু ইহার অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্য একান্তভাবেই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব। ইহা সৃষ্টি। ইহা আবিষ্কার। লক্ষণীয় বিষয় এই, রবীন্দ্রনাথ মহুয়া-কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় প্রেমের এই আবিষ্কারের মাহাত্ম্যটি একাধিক ক্ষেত্রে ব্যক্তও করিয়াছেন। অবশ্য রবীন্দ্রপ্রেমের মর্মবাণী যাঁহারা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা ইহাতে বিস্মিত হইবেন না; তাঁহারা জানেন, রবীন্দ্রনাথের প্রেম রূপে আবিষ্কার করে অরূপ, বস্তুতে স্বর্গ, ধূলিতে অমরার ঐশ্বর্য। 'মহুয়া' কাব্যে এই ভাবটি স্থানে স্থানে অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। যেমন—

আপন মনে রচব ভুবন
ভাবের মোহে।
রূপের রেখায় মিলবে রসের রেখা,
মায়ার চিত্রলেখা—
বস্তু হতে সেই মায়া তো
সত্যতর,
তুমি আমায় আপনি র'চে
আপন করো॥ [মায়া]

আবার –

তোমার মাঝারে
বিধির স্বতন্ত্র সৃষ্টি জানিব আমারে।
প্রেম তব ঘোষিবে তখন
অসংখ্য যুগের আমি একান্ত সাধন।
তুমি মোরে করো আবিষ্কার,
পূর্ণ ফল দেহ মোরে আমার আজন্ম প্রতীক্ষার। [প্রকাশ]

চলার মন্ত্র জানে যে প্রেম, বৈরাগী প্রেম, শিল্পীর প্রেম, সেই প্রেমই সত্যকার প্রেম —আবিষ্কার করিতে জানে সেই প্রেমই। সুন্দরকে সেই আবিষ্কার করে, শূন্যকে করে পূর্ণ, বাহ্য দৃষ্টিতে যাহা অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিত, অন্তর্দৃষ্টিবলে তাহারই মধ্যে দেখিয়া লয় চিরবরেণ্যকে। 'মহুয়া' নামটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে অপূর্ব ঐশ্বর্য ও মাধুর্য অনুভব করিয়াছেন, তাহা একদিকে যেমন কবির প্রেমমানসের স্বরূপ নির্ণয়ে অজস্র আলোকপাত করিতেছে, অপরদিকে তেমনি 'মহুয়া' কাব্যের বীর্যপ্রধান বলিষ্ঠ প্রেমের অন্তর্লীন গভীর দার্শনিকতার প্রতিও অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে। কাব্যখানির 'মহুয়া' নাম লইয়া অনেক রবীন্দ্রানুরাগীর মনেও একদা দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছিল, আজ কিন্তু ক্রমশঃই মনে হইতেছে, দ্বিধা হওয়া উচিতই ছিল না। আমাদের এই বোধবিহীন অজ্ঞ দ্বিধার প্রতিবাদ কবি করেন নাই বরং কোনোমতে সেদিন আমাদের বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, কাব্যের বা কাব্য-সংকলন গ্রন্থের নামটাকে ব্যাখ্যামূলক করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় না। তিনি বলিয়াছেন :

"নামের দ্বারা আগে-ভাগে কবিতার পরিচয়কে সম্পূর্ণ বেঁধে দেওয়াকে আমি অত্যাচার মনে করি। কবিতার অতি নির্দিষ্ট সংজ্ঞা প্রায়ই দেওয়া চলে না। আমি ইচ্ছা করেই মহুয়া নামটি দিয়েছি, নাম পাছে ভাষ্যরূপে কর্তৃত্ব করে এই ভয়ে। অথচ কবিতাগুলির সঙ্গে মহুয়া নামের একটুখানি সংগতি আছেই—মহুয়া বসন্তেরই অনুচর, আর ওর রসের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে উন্মাদনা। যাই হোক অর্থের অত্যন্ত বেশি সুসংগতি নেই বলেই

কাব্যগ্রন্থের পক্ষে ও নামটি উপযুক্ত বলে আমি বিশ্বাস করি।" ['মহুয়ার' পাঠ পরিচয় দ্রষ্টব্য]।

কিন্তু সত্যসত্যই কি "অর্থের অত্যন্ত বেশি সংগতি" নাই? মহুয়া নামটি কি মহুয়া-কাব্যের ব্যাখ্যারূপে, ভাষ্যরূপে গ্রহণ করা যায়ই না? মহুয়া নামক কবিতাটি পাঠ করিবার পর আপনার কি মনে হইল না, "মহুয়া বসন্তের অনুচর, ওর রসের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে উন্মাদনা", কিন্তু উন্মাদনা এই ত্যাগের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, দানের দ্বারা, আনন্দের দ্বারা পরিশুদ্ধ, 'জলদর্চি তনু'?

মহুয়া কবিতাটি মহুয়া-কাব্যের প্রথম কবিতা নহে, তথাপি এই কবিতাটি লইয়াই আলোচনা কেন সুরু করিয়াছি, তাহা আর ব্যাখ্যা করিব না, পাঠক বুঝিয়া লইবেন। মহুয়ায় রবীন্দ্রপ্রেমের যে ভাবটি ব্যাখ্যাত হইয়াছে, মহুয়া-কাব্যের প্রথম কবিতা 'উজ্জীবনে' তাহাই ভিন্নভাবে প্রকাশ পাইয়াছে কি না, বিচার করিব।

'উজ্জীবন' কবিতায় কবি পুষ্পধনুকে পুনরুজ্জীবিত করিতেছেন; পুষ্পধনু ভস্মীভূত হইয়াছিল শাংকর বৈরাগ্যের অগ্নিতাপে। শাংকর বৈরাগ্যের বিচারে, পুষ্পধনুকে ভস্মীভূত করাই পুরুষার্থ। সংসার মায়ামোহের আগার, পুষ্পধনু সেই মায়ামোহের দুষ্ট দেবতা, চিত্তবৃত্তি নিরোধের অগ্নিদাহনে তাহাকে দগ্ধ করাই হইল নৈষ্ঠিকী শান্তি লাভের উপায় ও পন্থা। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের বৈরাগ্য এই সমস্ত সন্ন্যাস-সত্যে কদাচ বিশ্বাস করে না। আসল কথা রবীন্দ্রনাথের অভিমতই এই, পুষ্পধনুকে ভস্মীভূত করার আদর্শ জীবনবহির্ভূত একটা ভ্রান্ত আদর্শ; জীবন্মুক্তের ইহা আদর্শ হইতে পারে কিন্তু জীবন থাকিতে পুষ্পধনুকে ভস্ম করার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। একটি বিখ্যাত কবিতায় কবি ইঙ্গিতময় ভাষায় এই কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন যে, পঞ্চশরকে সন্ন্যাসিতার আগুনে দগ্ধ করিতে গেলে হিতে বিপরীতই হইয়া যায়। বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িয়া ধ্যানমূর্তি ধরে দিশি দিশি।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরাও বলেন, Repression নহে Transformation-ই আসল পথ। Repression বহুক্ষেত্রে কুফল আনিয়াছে,—দিগ্‌বিদিকে যত্র-তত্র কামভাবের প্রতিক্রিয়ার বিদ্রোহে Repression-এর সাধক বিড়ম্বিত হইয়াছে বলিয়া শুনা গিয়াছে। কামভাবকে রূপান্তরিত করিয়া উচ্চ কোনো মহান আদর্শে নিয়োজিত করিতে পারিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যায় বলিয়া আধুনিক পণ্ডিতদের অভিমত। রবীন্দ্রনাথ, পাঠক অবশ্যই জানেন, কামকে নিশ্চিহ্ন করার পন্থায় বা আদর্শে আদৌ বিশ্বাসী নহেন। তবে কামের মধ্যে যাহা স্থূল, যাহা দেহসর্বস্ব লোলুপতা, যাহা পশুত্ব, তাহার দমন, এমন কি উচ্ছেদ, তিনি অহরহঃই চাহিতেন।

যাহা মরণীয় যাক মরে,
জাগো অবিস্মরণীয় ধ্যানমূর্তি ধরে।

যাহা মরণীয়, যাহা বুভুক্ষুবাসনার কাঙালবৃত্তি, যাহা 'মৃত্যুর গুপ্ত প্রেম,' যাহা অহং-এর অতিকৃতি, যাহা ছোট আমি-র অনাচার, তাহা চিরতরে যাউক ভস্মীভূত হইয়া। যাহা অবিস্মরণীয়, যাহা ধ্যানমূর্তি, যাহা 'অতনুর অতনু তনু,' যাহা চলার আবেগ, যা' জীবনবেগ, যাহা রূপ হইতে অরূপ যাহা পাওয়ার ভিতরেও না-পাওয়া, না-পাওয়ার মধ্যে পাওয়া—মৃত্যু নাই সেই মহান সত্তার। সহস্র মৃত্যুর মধ্য দিয়া যুগে যুগে অমৃত আহরণ করিতে করিতে চলে সেই সত্তা, সেই শক্তি।

মৃত্যুঞ্জয় তব শিরে মৃত্যু দিলা হানি;
অমৃত সে-মৃত্যু হতে দাও তুমি আনি।
সেই দিব্য দীপ্যমান দাহ
উন্মুক্ত করুক অগ্নি-উৎসের প্রবাহ।
মিলনেরে করুক প্রখর,
বিচ্ছেদেরে ক'রে দিক দুঃসহ সুন্দর।
মৃত্যু হতে জাগো পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু।

মোহের মৃত্যু হইতে জাগো প্রেম। 'মোহ তব প্রেমরূপে উঠুক জ্বলিয়া।' বীর যে, বীরসাধক যে, রূঢ়তায়, মূঢ়তায়, স্থূলতায় নাই যাহার মন, কামনার জৈবলোলুপতার নির্ঘৃণ সরীসৃপবৃত্তি নাই যাহাতে, হে প্রেম, আবির্ভূত হও তাহার কর্মে, মর্মে, বাক্যে, ব্যবহারে; তাহার স্বপ্নে, সংকল্পে, মিলনের আনন্দে; তাহার বিচ্ছেদের জীবনবেগে, দুঃখবরণের মাহাত্ম্যে।

দুঃখে সুখে বেদনায় বন্ধুর যে-পথ
সে-দুর্গমে চলুক প্রেমের জয়রথ।

প্রেম জাগিলেই চলার মন্ত্র, দুঃখে সুখে বেদনায় বন্ধুর পথে তখন চলার মন্ত্র। পুষ্পধনুর অন্তরে এই যে চলার মন্ত্র, এই জীবনবেগ, ইহা অবিস্মরণীয়, ইহা মৃত্যুহীন। এই মৃত্যুহীন পুষ্পধনুর বন্দনাই 'উজ্জীবনের' বাণী—তথা রবীন্দ্র-প্রেমকাব্যের বাণী। ধীরভাবে এই প্রেমবাণীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখুন—এই প্রেমে আছে রাবীন্দ্রিক বৈরাগ্য। প্রেমের অন্তরে চলার উদ্বেলতাই তো রাবীন্দ্রিক বৈরাগ্য। দুঃখবরণে ইহার আবির্ভাব, বেদনাসহনে ইহার আবির্ভাব, বিচ্ছেদদহনে ইহার আবির্ভাব। দুর্গম পথে চলার বেগ এই বৈরাগ্য, ত্যাগের ছন্দ এই বৈরাগ্য, মহত্ত্বের সৌন্দর্য এই বৈরাগ্য, বৃহতের ইশারা এই বৈরাগ্য। এই বৈরাগ্য না থাকিলেই প্রেম মূঢ়, রূঢ়, স্থূল এবং মরণীয়।

যাহা মরণীয় যাক মরে—

কিংবা,

সে দুর্গমে চলুক প্রেমের জয়রথ—

ইহাই রবীন্দ্রপ্রেমের তত্ত্ববাণী; সন্ন্যাস-তত্ত্ব নহে, শিল্প-তত্ত্ব, রবীন্দ্র-তত্ত্ব। রবীন্দ্রনাথ 'কোনো তত্ত্ব' মানেন না, কিন্তু এই বাণীর 'তত্ত্ব' করেন। বৃথা তর্ক না করিয়া এই তত্ত্বে একবার প্রবেশ করিয়া মনন ও নিদিধ্যাসন করুন, দর্শনবোধের সঙ্গে সঙ্গে রসবোধ বিশুদ্ধ হইবে, রবীন্দ্রকাব্য দিনের আলোর ন্যায় স্বচ্ছ ও সুন্দর হইয়া দেখা দিবে।

মহুয়ার কবিতাগুলি অবশ্য প্রেমেরই কবিতা, বসন্তের কবিতা। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, ইহা রবীন্দ্রনাথের প্রেম, রবীন্দ্রনাথের বসন্ত। অর্থাৎ বসন্তকে বুঝিতে হইবে শীতের তপস্যালব্ধ ধন হিসাবে, আবার প্রেমকে গ্রহণ করিতে হইবে দুঃখতপস্যার আনন্দমণি হিসাবে।

মহুয়ার 'বোধন' ও 'বিজয়ী'—এই কবিতাদুটি পাশাপাশি রাখিয়া একবার পাঠ করুন। এই দুটি কবিতা মহুয়ার প্রকৃতি ও প্রেমের স্বরূপ নির্ণয়ে বিশেষ ভাবে পাঠককে সাহায্য করিবে।

'বোধন' কবিতায় দেখুন, শীত আসিয়া বসন্তের পথ দিল পরিষ্কার করিয়া, প্রস্তুত করিয়া।

মাজিয়া দিল শ্রান্তি ক্লান্তি,
মার্জনা নাহি কারে।

অর্থাৎ শুষ্ক যাহা, বিমর্ষ যাহা, জীর্ণ যাহা—যাহা "পান্থের পথে বিঘ্ন" ঘটায়,

নবযৌবনদূতরূপী শীত
দূর করি দিল তারে।

ঠিক এইভাবেই দুঃখতপস্যা, বিরহ-তপস্যা প্রস্তুত করিয়া তোলে মানুষের হৃদয়। তপস্যাতাপে বিশুষ্ক, বিমর্ষ মন দেখিয়া ভয় পাইবার কারণ তো নাই, কেন না শীতের অন্তে বসন্তের মতো প্রেম যখনি আবির্ভূত হইবে জীবনে, নূতন জীবনের বেগ হইবে শুরু। 'বিজয়ী' কবিতায় দেখুন—

বিবশ দিন, বিরস কাজ,
কে কোথা ছিনু দোঁহে,
সহসা প্রেম আসিলে আজ
কী মহা সমারোহে।

তখন

কানন 'পর ছায়া বুলায়
ঘনায় ঘনঘটা।
গঙ্গা যেন হেসে দুলায়
ধূর্জটির জটা।

যে যেথা রয় ছাড়িল পথ
ছুটালে ঐ বিজয়-রথ,
আঁখি তোমার তড়িৎবৎ
ঘন ঘুমের মোহে।
সহসা প্রেম আসিলে আজ
বেদনাদান ব'হে ॥

শেষ পংক্তির "বেদনা দান ব'হে" কথা কয়টি একান্তভাবেই রাবীন্দ্রিক—সুতরাং ব্যাখ্যার প্রয়োজন। রসজ্ঞ পাঠক জানেন, রাবীন্দ্রিক প্রেমের স্বরূপ এই কথা কয়টির মধ্যে আছে প্রচ্ছন্ন। ব্যাখ্যাটি সম্ভবতঃ এই: "অলস মনে আঁধারময় ভবনকোণে" ছিলাম, প্রেম আসিল, জাগাইল জীবন, ছুটাইল রথ, "আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে" দিল না জানিতে। তবু তো চলিলাম। যত চলিলাম, পথের দুপাশে পাইলাম কত কী! তবু কি তৃষ্ণা মিটিল, বেদনা কমিল? প্রেমের আবেগে যা পাই, তাহারই মধ্যে যে লুকাইয়া থাকে না-পাওয়ার টান। এই টানের জন্যই তো বেদনা। এই বেদনাই তো প্রেমের দান। প্রেম আসেন এই 'দান' বহিয়া। 'বিপুল বিদ্রোহে' দান করেন এই 'দান', 'বেদনা' দান; তাই তো প্রেম-জীবনে এত দুঃখ, দুঃখবরণের এত তপস্যা, জীবনকে নানাভাবে প্রকাশ করার এত সাধনা, দুঃখসাধনার এত মাহাত্ম্য।

কবিতাটির 'বিজয়ী' নাম কত ভাবগর্ভ হইয়াছে পাঠক ভাবিয়া দেখুন।

'বাসন্তিক স্পর্শ' রঞ্জিত মনোহর মহুয়া-কবিতাগুলির এমনতর ব্যাখ্যা পাঠক মহোদয়ের মনঃপূত হইতেছে কিনা আমি জানি না। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বৈচিত্র্য দেখিতেই যাঁহারা অভ্যস্ত, তাঁহারা এমনতর ব্যাখ্যার জন্য সম্ভবতঃ প্রস্তুত নহেন। সবার উপরে, রবীন্দ্রনাথের প্রেমতত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করার যৌক্তিকতায় যাঁহারা বিশ্বাসী নহেন, অথবা যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের দর্শনমূলক প্রবন্ধাবলীর সাহায্যে রবীন্দ্রকাব্যের ভাষ্য রচনার সমীচীনতা স্বীকার করেন না, তাঁহারা অবশ্যই মনে করিবেন—রবীন্দ্রকাব্যনিচয়ের ঐক্যতত্ত্ব দেখাইবার অভিপ্রায়ে নিতান্ত মনগড়া ব্যাখ্যারই আমি আশ্রয় লইতেছি। এ-পর্যন্ত মহুয়া-কাব্যের যতগুলি আলোচনা আমার চোখে পড়িয়াছে, তাহার মধ্যে এমন একটিও দেখি নাই, যাহাতে রবীন্দ্রনাথের বৈরাগ্যবাণীর ইঙ্গিত করা হইয়াছে। মহুয়া প্রেমের কবিতা, এ-কথায় আপত্তির কিছুই নাই, কিন্তু যেহেতু প্রেমের কবিতা সেই হেতুই ইহা বৈরাগ্যের কবিতা একথা বলিলে বিশ্বশুদ্ধ রসিকই সম্ভবতঃ চমকিয়া উঠিবেন। কিন্তু রবীন্দ্র-বৈরাগ্যের তত্ত্ব যাঁহার জানা হইয়াছে, তিনি হয়তো কথাটায় বিশেষ বিস্ময় প্রকাশ করিবেন না। অনেকেই অবশ্য মহুয়ার মধ্যে, বৈরাগ্য না হউক, "দেহমনের ঊর্ধ্বস্তরের" প্রেম আস্বাদন

করিয়াছেন, কিন্তু "বার্ধক্যে আধ্যাত্মিক এবং নানা তাত্ত্বিক ও দার্শনিক ভাবচিন্তার" ফলেই যে মহুয়ার প্রেম এমনতর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে এইরূপ ইঙ্গিতও কেহ কেহ করিয়াছেন [রবীন্দ্রসাহিত্য পরিক্রমা, ২য় খণ্ড]। পূরবীর বৈরাগ্য ও মৃত্যুর বাণীর মধ্যে সমালোচকেরা দেখিয়াছেন বার্ধক্যের অবসন্নতা, মহুয়ার 'ঊর্ধ্বস্থরের প্রেমের' মধ্যে দেখিতেছেন বার্ধক্যের অভিজ্ঞতা !! সমগ্রতার দিক হইতে রবীন্দ্রকাব্য ও কাব্যদর্শন বিচার করিতে না গেলে অতি বড় রসজ্ঞ ব্যক্তিকেও বিচার বিভ্রমে পড়িতে হয়। রবীন্দ্রনাথের মনোদর্শন সম্পর্কে, সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের প্রেমের স্বরূপদর্শন সম্বন্ধে, সুস্পষ্ট জ্ঞান ও ধারণা থাকিলে কাব্যা-লোচনার প্রসঙ্গে আকস্মিকভাবে কখনও বা আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষা, কখনও বার্ধক্যের নৈরাশ্য, কখনও আবার বার্ধক্যের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দোহাই দিতেই হয় না। মহৎ কবির বাণীর মধ্যে জীবন সম্পর্কিত একটি আদর্শ থাকেই থাকে। এই আদর্শভাব হঠাৎ কখনও আসে না, তাহার ক্রমবিকাশের ধারবাহিকতা আছে, সমগ্রতার স্বচ্ছন্দ অখণ্ড একটি রূপ আছে। যিনি দেখিতে জানেন, তিনিই দেখেন, কবির অদ্বিতীয় সেই মহতী আদর্শ বাণীর সমগ্রতার বৃহৎ রূপ। এই সমগ্রতার রূপের প্রতি উদাসীন থাকিলেই ভ্রম জন্মে; তখন বহুধাবিভক্ত বিচিত্র কথানিচয়ের অন্তর্বর্তী সেই বাণীরূপ আর চোখে পড়ে না। আভাসে ইঙ্গিতে যদি কখনও সেই বাণীর ইঙ্গিত পাই, তখন তাহার তাৎপর্য-তত্ত্বের কারণ খুঁজি আকস্মিক কোনো বাহিরের ঘটনায়,—ব্যাখ্যার জন্য উপকরণ সংগ্রহ করি বাহিরের জগৎ হইতে। তখন ফাল্গুন মাসে কবির 'শ্রাবণ গগনের' গান শুনিয়া তর্ক করি, ঐতিহাসিক বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় কাব্য বুঝিতে তৎপর হই; কবির বার্ধক্যের পরিপ্রেক্ষিতে কাব্য সৌন্দর্যের স্বর্গধামটিকে নামাইয়া আনি, বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে কোন্ কবিতা লেখা হইয়াছে, আত্মীয়জনের মৃত্যুতে কোন্ কবিতা লেখা হইল, বৃদ্ধবয়সে কোন্ কোন্ কবিতায় বার্ধক্যের মনোভাব কবি সঞ্চয় করিলেন—কাব্য বুঝিবার বসন্তাবসরে, বাহিরের এই বিশুদ্ধ গন্ধ জ্ঞানকেই তখন প্রাধান্য দিবার কথা উঠে। অবশ্য বাহিরের ঘটনার কোনো প্রভাব যে কবির কাব্যে প্রতিফলিত হয় না, ইহা আমি বলি না; তবে রবীন্দ্রনাথের কাব্য যাঁহারা চিনিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই বলিবেন, বহির্জগতের সর্ববিধ বিপরীত ঘটনাকেও কবি অন্তরের জারকরসে সঞ্জীবিত করিয়া একান্তভাবে আপনার অর্থাৎ রাবীন্দ্রিক করিয়া লন। এই রাবীন্দ্রিকতার মর্মমূলে প্রবেশ করিলেই বুঝা যায়, কোন্ তাগিদে মহুয়া কবিতাগ্রন্থ কেমন করিয়া গ্রহণ করিল রবীন্দ্র 'প্রেমের তত্ত্ব ও দর্শনের অপূর্ব কাব্যরূপ'। মহুয়াতে প্রেমের যে ভাবকল্পনা আছে, একটু ধীর ভাবে লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়, তাহা সেই নিত্য গতিশীল সৃষ্টিক্ষম রাবীন্দ্রিক প্রেমেরই গীতচ্ছবি।

পাঠক জানেন, রবীন্দ্রনাথ প্রেমের মধ্যে রুচিবিহীন লালসার ছবি কখনও আঁকিতে পারেন নাই। লালসা হইতে উত্তীর্ণ হওয়ার বাণীই তাঁহার প্রেমের বাণী। তর্কের

খাতিরে সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র একবার রবীন্দ্রনাথের তরুণ বয়সের জৈবপ্রেমের কবিতাবলীর মধ্যে অশ্লীলতার ইঙ্গিত দেখিয়াছিলেন; আজ কিন্তু সকল শ্রেণীর মর্মজ্ঞ ও রসজ্ঞ ব্যক্তিই স্বীকার করিতেছেন যে, তাঁহার লৌকিক প্রেমের মধ্যেও 'প্রাণস্বরূপ নব চৈতন্যের উন্মেষ আমাদের চোখে পড়ে [ড. দাশগুপ্তের রবিদীপিতা], নারীর 'দৈহিকসৌন্দর্যকে' কখনও তিনি 'লালসার সামগ্রী হিসাবে দেখেন নাই' [ড. সেনগুপ্তের রবীন্দ্রনাথ], রবীন্দ্রকাব্যে 'Passion-এর তীব্রতা কোনোকালেই ছিল না।' [শ্রীবুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, জয়ন্তী উৎসর্গ]। বস্তুতঃ অহং হইতে উত্তীর্ণ হওয়ার সাধনাই রবীন্দ্রনাথের গতির সাধনা, বৈরাগ্যের সাধনা। ইহাই 'কবিকাহিনী' হইতে 'মহুয়া' পর্যন্ত লক্ষ্য করিতেছি। মহুয়ার প্রেম যে পূজা তপস্যার ন্যায় সুন্দর হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে, বৃদ্ধবয়স বা বার্ধক্যের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ইহার কারণ নহে,—রাবীন্দ্রিকতা অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ক্রমবিকাশ-প্রাপ্ত প্রেমবৈরাগ্যই ইহার কারণ। এই সামান্য কথাটি ধরিতে না পারার ফলে রবীন্দ্রকাব্য বিচারে প্রভূত ভ্রমপ্রমাদের প্রশ্রয় আমরা দিয়াছি। এপর্যন্ত আমরা কেহই কবির প্রেমের দর্শন লইয়া স্পষ্টভাবে বিচার করি নাই বলিয়াই প্রেমের অপর পিঠ বৈরাগ্যের কথা আলোচনার আসরে স্থানলাভ করে নাই; এই কারণে রবীন্দ্রপ্রেমের আংশিক রূপই আমাদের চোখে পড়িয়াছে, সর্বজগদ্‌গত পূর্ণরূপটি চোখে পড়ে নাই। প্রাচীন বৈরাগ্যের মতো রবীন্দ্র-বৈরাগ্যও আধুনিক রসিক সমাজে এই কারণেই উপেক্ষিত হইয়া রহিয়াছে।

প্রশ্ন জাগিতে পারে, তাহাতে দোষই বা এমন কী হইয়াছে? দোষ হইয়াছে এই, রবীন্দ্রনাথের প্রেমের নিত্যচলমানত্বটি—সর্বজগদ্‌গত প্রেমের রূপরহস্যটি কাব্যালোচনায় ধরা পড়ে নাই। অথচ এইটিই রবীন্দ্রপ্রেমের প্রাণ ও আত্মা। প্রেমের সহিত বৈরাগ্যটি যোগ না করিলে একদিকে যেমন রবীন্দ্রকাব্যের বৈচিত্র্যের (প্রেমের চলমানত্ব, নিত্য গতি) কারণ ধরা পড়ে না, অপর দিকে তেমনি অন্তর্নিহিত ঐক্যও (সর্বজগদ্‌গত প্রেম, নিত্য স্থিতি) ঢাকা পড়িয়া থাকে।

অবশ্য একথা সত্য, মহুয়ার প্রেমে বৈরাগ্য কোথায়, তাহা দেখানো চাই। ম্রিয়মাণকে প্রেম যেখানে দান করিয়াছে নূতন জীবনবেগ (বিজয়ী, শুভ-যোগ), যেখানে প্রেম সৃষ্টির আবেগে ছুটিয়াছে উধাও গতির আনন্দে (বিদায়), দুর্দম বেগে লাগিতে চাহিয়াছে 'দুঃসহতম কাজে' (নির্ভয়), 'সঞ্চিত ধনরত্নে' অথবা 'লালন-ললিত যত্নে' মোহবন্দী হয় নাই যেখানে (পথের বাঁধন), যেখানে প্রেম আবিষ্কার করিতেছে নূতন ভাবজগৎ, অমর রূপজগৎ (মায়া, প্রকাশ), বন্দীকে দান করিতেছে মুক্তি, (দায়মোচন, মুক্তরূপ) বিচ্ছেদকে গ্রহণ করিতেছে সহজ আনন্দে (দূত, একাকী), প্রেমের বৈরাগ্য, প্রেমের গতিবেগ তো সেখানেই বিদ্যমান আছে বলিয়া জানি। যেখানে প্রেম প্রকাশ পাইয়াছে স্বর্গোপম হৃদয়-মহত্ত্বে, স্থূলতায় নহে, মূঢ়তায় নহে, মোহে নহে, আসক্তিতে নহে, উচ্চতম

ভাবের আনন্দে (উপহার, সবলা, প্রতীক্ষা), কামনায় নহে, তপস্যায় (আহ্বান, প্রণতি)—প্রেমের বৈরাগ্য, প্রেমের চলমানত্ব সেইখানেই তো প্রকটিত হইয়াছে বলিয়া জানি। কবি তো নিজেও বলিয়াছেন, শুধু 'প্রসাধনকলা' নহে, প্রেমের 'সাধনবেগও' আছে মহুয়ায়। এই সাধনবেগই তো প্রেমের বৈরাগ্য।

এই পণ মোর,
সমস্ত জীবন-ভোর
দিনে দিনে দিব তার হাতে তুলি
স্বর্গের দাক্ষিণ্য হতে আসিবে যে শ্রেষ্ঠ ক্ষণগুলি। [উপহার]

—প্রণয়ের এই সাধনবেগ। বাহিরের কোনো ঐশ্বর্য দিয়া প্রেমকে ভুলাইতে চাহিব না, হীরা দিয়া হৃদয় চাহিব না কিনিতে। দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে সাধনা করিব গানের, ধ্যানের, ত্যাগের, নিষ্ঠার, সতীত্বের, মহত্ত্বের। তপস্যা করিতে করিতে যদি কোনোক্ষণে চকিত বিদ্যুদ্বিকাশের মতো কোনো দেবভাব প্রকাশ পায় আমার চরিত্রে, স্বর্গীয়তার প্রসন্ন জ্যোতিতে প্রভাসিয়া উঠে আমার জীবন, তবে সেই যে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ক্ষণ—তাহাই পূজার মতো, অর্ঘ্যের মতো দান করিব প্রেমের মন্দিরে।

গূঢ়ার্থ এই : যাহাকে ভালোবাসি, যাহাকে পাইলে, মনে করি, জীবন হইবে পূর্ণ, তাহাকে তো ধূলিলিপ্ত সংসারের মত্ততা বা মালিন্য দান করিব না, দান করিব যাহা শ্রেয়, যাহা সুন্দর, যাহা স্বর্গ হইতে পাওয়া ধ্যানের ধন। কিন্তু শ্রেয় বা সুন্দর কি অনায়াসলভ্য? সাধনার দ্বারা তাহা কি পাইতে হইবে না? ভালোবাসাকে যাহা দিতে চাই তাহা সহজস্বভাবে যত আছে, তারো চেয়ে কোটি গুণ যে আছে সাধনস্বভাবে। আমাকে তাহা যে মনুষ্যত্বের সাধনায় অর্জন করিতে হইবে ক্ষণে ক্ষণে। দিনে দিনে তাই অর্জন করিবার আগ্রহে করিব তপস্যা। যা' আছি তাহা নহে, ধ্যান আমাকে যাহা হইবার নির্দেশ দিতেছে, তাহারই তপস্যা করিব। প্রেম এই তপস্যা করায়, টান দেয় অর্থাৎ মোহ হইতে প্রেমে, বস্তু হইতে স্বর্গে টান দেয়। তখন 'স্বর্গের দাক্ষিণ্য হতে' অমর যে ক্ষণগুলি পাই, গানে তাহা গাহিবার মতো, কাব্যে তাহা লিখিবার মতো, চিত্রে তাহা আঁকিবার মতো, হৃদয়ে তাহা রাখিবার মতো। এমন যে অমর জীবনক্ষণ, এই তো প্রেমের শ্রেষ্ঠ উপহার।

প্রেমকে মানুষ এই 'উপহারই' তো দিতে চাহে। এইজন্যই তাহাতে 'হইতে' হয়, চলিতে হয়। অপূর্ণ যে আছি, উপহার দেওয়ার যোগ্য যে আজও হই নাই, অসমাপ্ত রহিয়াছে প্রেমের উপলব্ধি, ইহাতে লজ্জা পাই বটে, কিন্তু মনে মনে জানি, একটু একটু করিয়া আমি বিকশিত হইব। প্রেমের ইঙ্গিত যখন পাইয়াছি তখন বিকশিত আমাকে হইতেই হইবে। বস্তু-আমির মধ্যে 'অমা' আছে, কিন্তু ধ্যানের আমির মধ্যে আছে পূর্ণিমার কল্পনা। বস্তুতে সেই ধ্যান জাগাইব।

আমার বক্ষের কাছে
পূর্ণিমা লুকানো আছে,
সেদিন দেখেছ শুধু অমা।
দিনে দিনে অর্ঘ্য মম
পূর্ণ হবে, প্রিয়তম,
আজি মোর দৈন্য করো ক্ষমা॥ [অসমাপ্ত]

প্রেমজীবনে হৃদয়ের ক্রমবিকাশের কারণ-সত্তাই হইতেছে বৈরাগ্য। ইহা শুধু দার্শনিকতা নহে, কবিকল্পনা নহে, ঘরোয়া জীবনেও বস্তুগতভাবে সত্য। প্রেম যেখানে হৃদয়ের ক্রমবিকাশ ঘটায় নাই, শুদ্ধমাত্র দেহরতির স্ফূর্তি লইয়াই রহে ব্যাপৃত, প্রেম সেখানে প্রেমই নহে। প্রেমের কথাই এই :

দিনে দিনে অর্ঘ্য মম
পূর্ণ হবে।

রবীন্দ্রনাথের প্রেমদর্শনের কথাও তো এই। দিনে দিনে, ক্ষণে ক্ষণে অহং হইতে আত্মায়, অমা হইতে পূর্ণিমায় প্রেমজীবনের উদ্বোধন। সুরু হইতে শেষ লেখায় ইহাই তো দেখিতেছি নানা ভাবে, নানা ভঙ্গীতে, নানা সাজে, নানা সজ্জায়। সহজস্বভাবের বাসনাকে অনির্বচনীয়ের নানা ছন্দে ও ব্যঞ্জনায় সাধনস্বভাবে রূপান্তরিত করাই তো রবীন্দ্র-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। মহুয়ার, বলা বাহুল্য, বৈশিষ্ট্য ইহাই। 'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়রে দেবতা'—এই পুরাতন বাণীই মহুয়ার পাঠ পরিচয়।

"প্রেম সাধারণ মানুষকে অসাধারণ ক'রে রচনা করে—নিজের ভিতরকার বর্ণে রসে রূপে। তার সঙ্গে যোগ দেয় বাইরের প্রকৃতি থেকে নানা গান গন্ধ, নানা আভাস। এমনি করে অন্তরে বাহিরের মিলনে চিত্তের নিভৃতলোকে প্রেমের অপরূপ প্রসাধন নির্মিত হোতে থাকে—সেখানে ভাবে ভঙ্গীতে, সাজে সজ্জায়, নূতন নূতন প্রকাশের জন্য ব্যাকুলতা, সেখানে অনির্বচনীয়ের নানা ছন্দ, নানা ব্যঞ্জনা। একদিকে এই প্রসাধনের বৈচিত্র্য, আর একদিকে এই উপলব্ধির নিবিড়তা ও বিশেষত্ব। মহুয়ার কবিতা চিত্তের সেই মায়ালোকের কাব্য ; তার কোনো অংশে ছন্দে ভাষায় ভঙ্গীতে এই প্রসাধনের আয়োজন, কোনো অংশে উপলব্ধির প্রকাশ।" [মহুয়ার 'পাঠ পরিচয়' দ্রষ্টব্য]।

মহুয়ার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কবি যা লিখিয়াছেন, কবির অন্যান্য প্রেমের কাব্য সম্পর্কেও তাহা প্রযোজ্য কি না পাঠক বিচার করিবেন। কবির মতো কবি, কবির মধ্যে কবি রবীন্দ্রনাথ বটেন, কিন্তু উপলব্ধির অংশ বাদ দিয়া তাঁহাকে এবং তাঁহার প্রেম-কল্পনাকে চিন্তার মধ্যেই আমি আনিতে পারি না। কাব্যশিল্পে 'প্রসাধনকলা' অপরিহার্য কিন্তু

রবীন্দ্রকাব্যশিল্পে 'সাধনবেগ'কেও কদাচ পরিহার করার উপায় নাই। পরিহার করিয়া দেখুন, হয় আপনি রবীন্দ্রনাথকে বুঝিবেন না, নয় রবীন্দ্রনাথের রবীন্দ্রত্বই যাইবে চলিয়া।

এই সাধনবেগের লক্ষ্য কী? রবীন্দ্রনাথই বলিয়া দিয়াছেন: 'বৃহতে রতি'। এই বৃহতে রতিই মহুয়া-প্রেমের চরিত্র।

আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা
গড়িব না ধরণীতে,
মুগ্ধ-ললিত অশ্রু-গলিত গীতে।
পঞ্চ শরের বেদনামাধুরী দিয়ে
বাসররাত্রি রচিব না মোরা প্রিয়ে;
ভাগ্যের পায় দুর্বল প্রাণে
ভিক্ষা না যেন যাচি।
কিছু নাই ভয়, জানি নিশ্চয়
তুমি আছ, আমি আছি। [নির্ভয়]

আমি আছি তোমার জন্য, তুমি আছ আমার জন্য, আমরা দুজনে আছি প্রেমের জন্য—এই কথা যদি সত্য হয়, তবে গতানুগতিক গার্হস্থ্য প্রেমের সংস্কার ও সামাজিক রীতিনীতি মান্য করিয়াই কর্তব্য সম্পাদন করিব না, পরন্তু তপস্যা করিব উভয়ের নিকট উভয়ে সত্য হইবার, সুন্দর হইবার। তোমার জন্য 'দিনে দিনে অর্ঘ্য মম পূর্ণ হবে'। এবং আমারও জন্য তোমার যা শ্রেষ্ঠ উপহার, যা সুন্দর, যা ত্যাগ বা মহত্ত্ব, যা মঙ্গল—দিনে দিনে প্রভাসিত হইবে তোমার জীবনে। এমনি করিয়া আমরা সাধনবেগে চলিব পূর্ণের পথে, মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাইব আপন ব্যক্তিত্বে। তুমি ভাবিবে আমার তুলনা নাই; আমি ভাবিব, অদ্বিতীয় তুমি অনুপম। এমনি করিয়াই প্রেমের সাধনায় রচনা করিব স্বর্গ, রচনা করিব স্বর্গের আনন্দ। গার্হস্থ্যজীবনের গতানুগতিক প্রেমবোধে এতদিন ধরিয়া আমরা শুনিয়াছি মোহের কলগুঞ্জন, মানাভিমানের কথাকাকলী; রাত্রি কাটাইয়াছি দেহরতির বিহ্বল আবেগে, দিন যাপন করিয়াছি সাংসারিকতার কর্তব্যনিষ্ঠায়। ইহা যে সুন্দর নহে, তাহা বলি না; বস্তুতঃ ইহাও সুন্দর, 'স্বর্গ-খেলনার' মত সুন্দর, কিন্তু স্বর্গের মত নয়। তাই—

আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা
গড়িব না ধরণীতে
মুগ্ধ-ললিত অশ্রু-গলিত গীতে।

প্রেমে আমরা এমন কিছু গড়িব না, যা 'ভঙ্গুর, যা 'ক্ষণিক'। 'স্বর্গ-খেলনা' আমরা গড়িব না, গড়িব স্বর্গ, দেবতা নামিবেন আমাদের স্বর্গাবাসে। 'সুখ সুখ' করিয়া, 'শান্তি শান্তি' করিয়া নিয়তির নিকট কাঙালপনা করিব না কোনোদিন; প্রেমের সাধনায় তুমি

আমি রচনা করিব স্বর্গের আনন্দ, তুমি যখন আছ, এ আনন্দ আমার কে কাড়িবে, আমি যখন আছি, কোন্ নিয়তি হরণ করিবে তোমার আনন্দ ?

কিছু নাই ভয়, জানি নিশ্চয়
তুমি আছ, আমি আছি।

এই 'আছ' বা 'আছির'র ব্যঞ্জনা অত্যন্ত গভীর। বস্তুগত স্থূল সহজ স্বভাবের চোখে ইহার সৌন্দর্য যতটুকু ধরা পড়ে, তা' যে কত অকিঞ্চিৎকর, সাধনস্বভাবের মন দিয়া ইহার সৌন্দর্য দেখিতে পাইলেই তাহা বুঝা যায়। তুমি আছ আমার বিকাশের জন্য। আমার আত্মার গভীরে তোমার অস্তিত্ব-গৌরবের রসানন্দ যত আস্বাদন করি, ততই আমি 'প্রাণে প্রেমে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে' উন্মেষিত হইয়া উঠি। সেই আমার উন্মেষিত নূতন রূপ লইয়া তোমার জন্য আমিও আছি; তাই তো আমার গৌরবে তোমার চোখে অলকার আলো, বাক্যে অমৃতের নির্ঝরিণী, হৃদয়ে অন্তহীন সাহস, কল্পনায় মৃত্যুহীন সুন্দর। তুমি আছ এই সত্যে পরম মানবত্বের স্বর্ণরাগে আমি দীপ্যমান, আমি আছি এই সত্যে মানবিকতার মাহাত্ম্যবোধের রসানন্দে তুমি অভিস্নাত। তুমি আছ ও আমি আছি এই বাণী তাই গৃহগত প্রেমের সাময়িক কলকূজন মাত্র নহে, অনন্ত ইহার মাহাত্ম্য, বিচিত্র ইহার ব্যঞ্জনা। তাই—

এ-বাণী প্রেয়সী, হোক মহীয়সী
তুমি আছ, আমি আছি।

'তুমি আছ' বা 'আমি আছি' এই মহীয়সী বাণীর ছন্দস্পন্দন সাধারণ গৃহগত প্রেম-জীবনেও মন্ত্রের ন্যায় কাজ করে বলিয়া আমার বিশ্বাস। প্রত্যক্ষ দাম্পত্যজীবনের প্রেমের মধ্যেও বৃহতে রতি জাগিতে পারে, জাগিয়াও থাকে এ কথায় যাঁহারা বিশ্বাস করেন, অর্থাৎ প্রেমের প্রভাবে মানুষ অন্তরে অন্তরে মহৎ, পবিত্র, ত্যাগনিষ্ঠ ও সদাব্রত হইতে থাকে, আরো হইতে চাহে, হইতে হইতে চারিপাশের মানুষকে করিতেও থাকে—এই সত্যে যাঁহারা বিশ্বাস রাখেন, রবীন্দ্রকল্পিত প্রেমকে তাঁহারা নিতান্ত কবিত্ব, আদর্শবাদিতার কল্পকথা অথবা কঠিন দার্শনিকতা বলিয়া অবশ্যই উড়াইয়া দিবেন না। কথাটিকে আরো স্পষ্টভাবে বুঝাইবার জন্য একটু নীতিবাগীশ অরসিক হইয়াই বলিতে ইচ্ছা করে, (রসিকেরা ক্ষমা করিবেন!) যে, সাংসারিতার মোহ ও চাতুর্য এবং দেহরতির দুষ্কৃতি ও লালসা হইতে মুক্তি পাইবার একটুকু চেষ্টা যদি মানুষ করে তবে তাহার সংসার জীবনেও প্রভাসিত হইতে পারে বৃহৎস্বপ্নাশ্রয় মহৎ প্রেম। গতানুগতিক গৃহজীবনে মোহময় যে গার্হস্থ্যপ্রেম আমরা দেখি, খাওয়া-পরা এবং সন্তান-সন্ততি পালন করার একটানা জীব-প্রবাহে যে প্রেমাসক্তি আমরা লক্ষ্য করি তাহার মধ্যেও প্রকাশ পাইতে পারে এই স্বপ্নময়, কর্মময়, বৃহৎ কল্পময় মহৎ প্রেম। প্রেম দর্শনে এই 'প্রকাশ পাওয়ার' দিকটি চিন্তা করিলেই রবীন্দ্রপ্রেমের 'রিয়ালিজ্‌ম্' ও 'প্র্যাগ ম্যাটিজ্‌ম' স্পষ্ট ধরা পড়ে। রবীন্দ্রনাথকে

যে আমরা 'আইডিয়ালিস্ট' কবি বলি, অথবা বস্তুজীবনে তাঁহার স্বপ্নপ্রেমের কোনো 'ভ্যালু' নাই বলিয়া যে বিজ্ঞ অভিমত প্রকাশ করি, তাহা আমার বিশ্বাস, নিতান্ত নিম্নস্তরের বস্তুতান্ত্রিক মনোভাবেরই পরিচায়ক। বস্তুতঃ আজও আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রেমস্বপ্নকে চরিত্রে প্রতিভাত করিতে পারি নাই বলিয়া এবং সর্বোপরি জগতে তাঁহার প্রেমাদর্শের ঠিক বিপরীত ব্যাপারই নিত্য সংঘটিত হইতে দেখিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রেমাদর্শটি অনেক দূরের, একেবারে নাগালের বাইরের, আদর্শ বলিয়া বোধ হইয়াছে। আসক্তির পর আসক্তি আনিয়া, বিষয়বুদ্ধির উপর আরো বুদ্ধি বাড়াইয়া, ভোগের উপকরণে আরো উপকরণ চড়াইয়া বন্দী থাকি অহং-এর অন্ধবিবরে, তাই সংসারী জীবনের বস্তুগত প্রেমের মধ্যেও যে বৃহতে-রতির ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য আছে তাহা বিশ্বাসে আসে না। আসল কথা, প্রেম যে আমরা চাই-ই না, তাই তো এই অবিশ্বাস, এই পণ্ডিতের মূর্খতা, এই মনুষ্যত্বের অবমাননা। প্রেম যখন চাই না, এবং পাই না, তখন যে—

কুৎসায় বিস্তারি দেয় পঙ্কে ক্লিন্ন গ্লানি,
কলহেরে শৌর্য ব'লে জানি,
ভাবি, দুর্যোগের সিন্ধু তরিব হেলায়
বঞ্চনার ভঙ্গুর ভেলায়।
বাহিরে মুক্তিরে ব্যর্থ খুঁজি,
অন্তরে বন্ধন করি পুঁজি,
আসক্তি মজ্জায় রক্তে, শক্তি বলি জানি ছলনাকে,
মর্মগত খর্বতায় সর্বকালে খর্ব করি রাখে॥ [প্রতীক্ষা]

সংসারে এই 'মর্মগত খর্বতা'ই মানুষের সত্যকার স্বভাবকে, প্রেম-স্বভাবকে ঢাকিয়া রাখে। তাই বস্তুজীবনে প্রেম এখনও তেমন প্রত্যক্ষ নহে,—আদর্শবাদীর কল্পনা বলিয়া প্রেম আজও তাই বস্তুজীবনে উপেক্ষিত হইতেছে। প্রেমসূর্য 'রিয়াল' নয়, রিয়াল হইল মোহের কুজ্ঝটিকা!! এইজন্য প্রেমের কোনো সূক্ষ্ম মহত্ত্বের, সৌন্দর্যের অথবা বৈরাগ্যের কথা উত্থাপিত হইলেই আমরা তাহা 'মিস্‌টিক্‌' ভাবিয়া বসি, জীবনবহির্ভূত কোনো কবিত্ব-স্বপ্ন বলিয়া ব্যাখ্যা করি। চিত্ত আমাদের এত নিম্নস্তরে থাকেযে, একধাপ উঁচুর কথা হইলেই তাহা বস্তুবহির্ভূত বলিয়া বোধ হয়। এই যে আমরা, এই আমাদের দাম্পত্যজীবনে, সমাজজীবনে ও ভাবজীবনে 'স্পর্ধিত কুশ্রীতা' যে নিত্য 'সিংহনাদ' করিবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি! কিন্তু তাই বলিয়া কি প্রেম নাই অর্থাৎ প্রেম 'রিয়াল' নহে? বস্তুজগতে আজও

যে বীর্য বাহিরে ব্যর্থ, যে ঐশ্বর্য ফিরে অবাঞ্ছিত,
চাটুলুব্ধ জনতায় যে-তপস্যা নির্মমলাঞ্ছিত।

প্রেমের সেই বীর্য, সেই ঐশ্বর্য, সেই তপস্যা রিয়াল জীবনে কখনো কি প্রত্যক্ষ করি নাই? কুশ্রীতার কুজ্ঝটিকায় অন্ধকারাচ্ছন্ন সাম্প্রতিক জীবনের আকাশ, তথাপি কহিব, তুমি যখন আছ তখন সূর্যই সত্য, 'কুজ্ঝটিকা চিরসত্য নয়'।

হে বাণীরূপিণী, বাণী জাগাও অভয়,
কুজ্ঝটিকা চিরসত্য নয়।
চিত্তেরে তুলুক ঊর্ধ্বে মহত্ত্বের পানে
উদাত্ত তোমার আত্মদানে।
হে নারী, হে আত্মার সঙ্গিনী,
অবসাদ হতে লহ জিনি'—
স্পর্ধিত কুশ্রীতা নিত্য যতই করুক সিংহনাদ,
হে সতী সুন্দরী, আনো তাহার নিঃশব্দ প্রতিবাদ॥ [প্রতীক্ষা]

উদ্ধৃত স্তবকে 'আত্মার সঙ্গিনী' কথাটি লক্ষ্য করিবার মতো। আধুনিক পণ্ডিতেরা ইহার মধ্যে মিস্‌টিক্ ভাবের ব্যঞ্জনা অনুভব করেন কি না জানি না। করিলেই হইল, কেন না 'দেহের সঙ্গিনী', 'শয্যার সঙ্গিনী', এমন কি 'কর্মের সঙ্গিনীও' বুঝা যায়, 'ধর্মের সঙ্গিনী'ও অস্পষ্টভাবে বোধে আসিয়া যেন পৌঁছায় কিন্তু 'আত্মার সঙ্গিনী' তো সহজে বুঝি না, কেমন যেন অস্পষ্ট ধোঁয়াটে ভাব আছে বলিয়া বোধ হয়। অতএব ইহা 'মিস্‌টিক্'; বোধ হয় কোনো মিস্‌টিক্ ভাবে আক্রান্ত হইয়া মিস্‌টিক্ কবি রবীন্দ্রনাথ নারীর কল্পনা লইয়া কাব্যময় 'মিসটিসিজম্' বিস্তার করিয়াছেন!! যাঁহারা আবার এতদূর অগ্রসর হইতে চাহেন না, তাঁহারা হয়তো কহিবেন, আত্মার সঙ্গিনীতে মিস্‌টিসিজ্‌ম্ নাই বটে, কিন্তু ইহার স্বপ্নটি বাপ্ ঘোরতম আইডিয়ালিজ্‌ম্-এ পূর্ণ; ইহার দ্বারা কাব্য হয়, 'মেটাফিজিক্যাল ইমেজ্' রচনাও সম্ভব হয়, কিন্তু বস্তুজগতে ইহার কোনো মূল্য, মান বা মর্যাদা নাই। পণ্ডিতদের মধ্যে যাঁহারা ধর্মতাত্ত্বিক, ধর্ম করেন, বিশেষ কোনো ধর্মদর্শন মানেন, গতানুগতিক সনাতন পন্থায় জীবনযাপন করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়তো 'আত্মার সঙ্গিনী'কে এক হিসাবে সত্য মনে করিয়া মানসিক একটুকু রসচেতনা আস্বাদন করিবেন; ভাবিবেন, আত্মাই তো ধর্মের ধর্ম, আত্মার সঙ্গিনী তো ধর্মের অর্থাৎ পরমার্থের সঙ্গিনী। ইহলোক ও পরলোকের যিনি সহধর্মিণী, পরমার্থ সঙ্গিনী, তিনিই তো আত্মার সঙ্গিনী।

ধর্মতাত্ত্বিক এই ব্যাখ্যা স্পষ্ট হইল কি না পাঠকই বিচার করিবেন। রবীন্দ্রকল্পনায় আত্মার সঙ্গিনীর রূপ অত্যন্ত স্পষ্ট, দিনের আলোর মতো স্পষ্ট, এতটুকু রহস্য তাহাতে নাই। জীবনে এই সঙ্গিনীর বিশেষ 'ভ্যালু' আছে, প্র্যাগ্‌ম্যাটিক ও পজিটিভ্ ভ্যালু, জীবননিরপেক্ষ 'মিস্‌টিক', 'আইডিয়ালিস্টিক্' অথবা 'ফিলসফিক্যাল' চিত্র বা স্বপ্ন মাত্র

ইহা নহে। রবীন্দ্রকল্পনানুসারে ইহার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিলেই বুঝা যাইবে, বস্তুগত সমাজজীবনে ইহার মূল্য ও মর্যাদা কতখানি

'মুক্তরূপ' নামক কবিতায় ইহার স্বরূপ চিত্রিত হইয়াছে।

আত্মার যিনি সঙ্গিনী, তিনি যে দেহের বা শয্যার সঙ্গিনী নহেন, তাহা নয়, আবার কর্মের সঙ্গিনী ও ধর্মেরও সঙ্গিনী তিনি বটেন, কিন্তু সবার উপরে তিনি উচ্চতম ত্যাগ ও বৈরাগ্যের উত্তরসাধিকা। প্রেমিকের কল্যাণে প্রেমিককেও ত্যাগ করিতে অর্থাৎ তাহাকে মুক্তি দিতে, বৃহত্তর জীবনের কর্মপথে প্রেমিককে প্রেরণ করিয়া একাকিনী বিরহ ও বিচ্ছেদের বৃশ্চিকদাহন সহ্য করিতে তিনি প্রস্তুত। প্রেম যেখানে প্রেমাস্পদকে বদ্ধ করে, ভোগের ব্যক্তি-বাসনায় কেবল বাঁধিয়া রাখে, প্রেম সেখানে মোহের খোলস ত্যাগ করিতে পারে না। মোহবন্দী প্রেমিকের রূপ প্রেমের পূর্ণরূপ নহে, প্রেমিককে মুক্তি দিয়া অর্থাৎ উচ্চ কর্মে, উচ্চতর জীবন-ধ্যানে, উচ্চতম মহত্ত্ব ও পৌরুষ প্রকাশে প্রেরণান্বিত করিয়া প্রেমিকের মধ্যে তিনি প্রেমের মুক্তরূপ, কি না পূর্ণরূপ দেখিতে চান। কবির ভাষায় তাঁহার বাণী এই :

তোমারে আপন কোণে স্তব্ধ করি যবে
পূর্ণরূপে দেখি না তোমায়,
মোর রক্ততরঙ্গের মত্ত কলরবে
বাণী তব মিশে ভেসে যায়।...
আত্মা যেথা লুপ্ত থাকে সেথা উপচ্ছায়া
মুগ্ধ চেতনার 'পরে রচে তার মায়া,
তাই নিয়ে ভুলাব কি আমার জীবন।
গাঁথিব কি বুদ্‌বুদের হার।
তোমারে আড়াল করে তোমার স্বপন
মিটাবে কি আকাঙ্ক্ষা আমার।

অহং-বাসনার মোহময় সাংসারিকতায় বৈষয়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অনুসরণে যেখানে জীবন কাটে, কোথায় সেখানে মনুষ্যত্বের পূর্ণ প্রকাশ ? দেহের ও গৃহের সঙ্গিনীরূপে নারী যখন পুরুষকে গৃহ-জীবনের কামনাতেই আচ্ছন্ন দেখিয়া তৃপ্তি পায়, তখন পুরুষের পূর্ণ ব্যক্তিত্বের স্বরূপটি সে তো দেখিতে পায় না। 'সঞ্চিত ধনরত্নে' এবং 'লালন-ললিত যত্নে' পুরুষকে মোহাবিষ্টই কেবল থাকিতে হয়, বৃহতে রতি তখন কথার কথা মাত্র। 'আত্মার সঙ্গিনী'কে তাই বলিতেছেন যে, নারীর কামনাতরঙ্গের মত্ত কলরবে পুরুষের পৌরুষ-প্রকাশের বাণী আর যাহাতে ভাসিয়া না যায়, তাহার সাধনাই তিনি করিবেন। প্রেমকে আড়াল করিয়া শুধু মাত্র মোহ-কামনার সম্মোহনে নারীর প্রেম কখনও সার্থক হইতে পারে না। নারীর প্রেম তখনই সার্থক যখন তা পুরুষকে আত্মশক্তির সর্বপ্রকাশে সাহায্য

করে, পরিচালিত করে মৃত্যু হইতে অমৃতের প্রকাশলোকে। আত্মশক্তির এই প্রকাশেই তো প্রেমের গৌরব, প্রেমের সাফল্য। নারী যাহাকে ভালবাসিয়াছে, তাহার আত্মার, তাহার মহত্তর জীবনের, পূর্ণ প্রকাশই নারী দেখিতে চাহে। পুরুষের শৌর্যে আছে সূর্যমহিমা, অন্ধকার হইতে আলোকে আসার উদ্দীপ্ত প্রতিভা, নারীর প্রেমে পুরুষের এই প্রতিভা আরো বিকশিত হইবে, দিগ্‌দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হইয়া অর্জন করিবে অনন্ত গৌরব অনন্ত সম্মান—ইহাই তো নারীর আকাঙ্ক্ষা, প্রেমের ধর্ম।

বিরাজে মানব-শৌর্যে সূর্যের মহিমা,
মর্ত্যে সে তিমিরজয়ী প্রভু,
অজেয় আত্মার রশ্মি, তারে দিবে সীমা
প্রেমের সে ধর্ম নহে কভু।

প্রেমের ধর্ম অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে এই কয়েকটি পংক্তিতে। আত্মার রশ্মিকে আচ্ছাদন করা প্রেমের ধর্ম নয়। আমি যখন তোমাকে প্রেম দিয়াছি তখন তোমার জীবনে অমৃতেরই প্রকাশ ঘটাইব, কামনার কুঞ্জবনে বন্দী রাখিয়া 'মৃত্যুর গুপ্ত প্রেমে' তোমাকে মাতাইব না। মৃত্যুসাগর মন্থন করিয়া, হে বীর সাধক, অমৃতরস আনো জীবনে, ইহাই আমার প্রেমের জয়, প্রেমের গৌরব।

যাও চলি রণক্ষেত্রে, লও শঙ্খ তুলি,
পশ্চাতে উড়ুক তব রথচক্র ধূলি,
নির্দয় সংগ্রাম অন্তে মৃত্যু যদি আসি
দেয় ভালে অমৃতের টীকা,
জানি যেন সে তিলকে উঠিল প্রকাশি
আমারো জীবন-জয়লিখা॥

এই আত্মার সঙ্গিনী। রবীন্দ্রনাথের মহুয়া-প্রেমের ইনিই আত্মা। তাই বলিয়া ইনি অশরীরী আত্মা নহেন: রক্তমাংসের শরীর লইয়া, রূপ লইয়া গৃহ-সংসারেই ইনি আছেন,—শুধু আছেন যে, মোহাবিষ্ট রহি বলিয়াই তাহা আমরা জানিতে পারি না। 'মহুয়া' নামক কবিতায় ইহারি স্পষ্টরূপ আপনি দেখিয়াছেন। সংযমে ইনি সুধীরা, প্রেমতপস্যায় ইনি একনিষ্ঠা, আবার ফাল্গুনের 'রাখীপূর্ণিমায়' প্রতীক্ষমাণা ইনি প্রিয়পুরুষের। কামনাকে ইনি উপেক্ষা করেন না, কিন্তু কামনাই ইঁহার একমাত্র সম্বল নহে। অল্প হইতে ভূমায় অগ্রগমনের বাণী আছে ইহার আত্মায়, অমৃতের বার্তা ইহার চরিত্রের ঔদার্যে। ইহারি আলোকে মহুয়া-প্রেম পাঠ করুন, কবিতাপাঠের ফলশ্রুতি নূতন করিয়া উপলব্ধি হইবে।

আত্মার সঙ্গিনী মারফৎ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রেমের স্বরূপটিই যে শিল্পকৌশলে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে আর বোধ হয় কষ্ট হয় না। গৃহ-প্রেমকে বাদ দেওয়ার কথা রবীন্দ্রনাথে নাই: গৃহ-প্রেমকে বিশ্ব প্রেমের, বৃহৎ প্রেমের আদর্শে উজ্জ্বলতর, সুন্দরতর

মহত্তর করার নির্দেশই আছে রবীন্দ্রনাথের প্রেমদর্শনে। যে বৃহৎ প্রেমের আদর্শ তিনি আমাদের চোখের সম্মুখে ধরিয়াছেন, জীবন হইতে উৎসারিত সেই আদর্শ গৃহজীবনে তথা বিশ্বজীবনে প্রতিভাত করাই তাঁহার লক্ষ্য, তাঁহার কল্যাভিলাষ। মানুষের তিনি প্রিয় কবি, মানুষের মহত্ত্ব প্রকাশেই তাঁহার সার্থকতা। এই মহত্ত্ব তিনি মানবনিরপেক্ষ কোনো তত্ত্বদর্শন হইতে আহরণ করেন নাই, পরন্তু মানুষজীবন হইতেই আহরণ করিয়াছেন, মানুষের গৃহেই গিয়াছেন রাখিয়া। তাঁহার বলার কথাটি এই : গৃহপ্রেম যদি সত্যকার প্রেম হয়, তবে তাহা কাহাকেও আচ্ছন্ন করিবে না, পরন্তু গৃহে থাকিয়াই তাহা বিশ্বের ও বৃহতের আভাস দিবে আনিয়া। 'বলাকায়' যে গতির কথা, ঘরছাড়ার কথা শুনিয়াছেন, তাহাও, বলাই বাহুল্য, সন্ন্যাসীর মতো সংসার ত্যাগের বাণী নহে। সংসারে থাকিয়াও সংসার হইতে সরার বাণী অর্থাৎ তুচ্ছ বৈষয়িকতায় মোহাবিষ্ট না হইয়া উচ্চ মহৎ জীবন সন্ধানের বৈরাগ্য-বাণীই বলাকার বাণী। ইহা সংসার ত্যাগের কথা নহে, ত্যাগের ঐশ্বর্যে, শৌর্যের আনন্দে, প্রেমের সৌন্দর্যে সংসারকে স্বর্গ করার আনন্দবাণী। বস্তুতঃ, জগতের তুচ্ছতা ত্যাগ করিতে হয়, জগৎকে পূর্ণভাবে পাইবার জন্যই ; বৃহত্তর জীবনের দৃষ্টিতে জীবনকে দেখিতে হয়, জীবনকে মহিমময় রূপে প্রকাশ করিবার জন্যই ; 'সুদূরের পথে' গতিলাভ করিতে হয় 'সুদূরের পথ দিয়ে নিকটেরে লাভ করিবার' [প্রত্যাগত] জন্যই। ইহাই প্রেমের আদর্শ। এই আদর্শটি চরিত্রে প্রতিভাত করার উপরেই গৃহ-সংসারের বৃহৎ মঙ্গল নির্ভর করিতেছে। সংসারে এই প্রেমাদর্শ যত প্রমুদিত হইবে, ততই সংসারের মঙ্গল। সংসার যে সরিতে সরিতে এখনও টিকিয়া আছে, তাহা এই কারণে যে, এখানে কেহ-না-কেহ বাস্তব জীবনেই এই প্রেমাদর্শটি কর্মে ও স্বপ্নে, বাক্যে ও ব্যবহারে, বাস্তবে ও কল্পনায় প্রতিভাত করিয়াছেন বা করিতেছেন। মহুয়ায় আত্মার সঙ্গিনীর যে কল্পনা কবি করিয়াছেন, সঙ্গিনীর প্রেমাভিভাষণের মধ্য দিয়া পুরুষের যে মুক্তরূপ অঙ্কন করিয়াছেন, বাস্তব জীবনে তাহা যদি সত্য বলিয়া স্বীকৃত ও গৃহীত না হয়, তবে বাস্তব-জীবনেরই তাহা দুর্ভাগ্য। বাস্তবজীবন যদি শুধু এই হয় যে পুরুষ নারীর কামনার সহচর এবং নারী পুরুষের কাম-বিলাসের ক্রীড়নক মাত্র, তবে সেই বাস্তব হইতে মনুষ্যত্ব যে অবমাননা লাভ করিবে, তাহা দ্বারাই সৃষ্টিকর্তার মুখ মসীলিপ্ত হইয়া যাইবে। সৌভাগ্য এই, এতটা নিচে মানুষ নামে নাই এবং অদৃষ্টকে ধন্যবাদ, রবীন্দ্রনাথের প্রেমের সহিত ধ্যানে ও অনুভবে আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছে। আর্নস্ট রীজ ঠিকই বলিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথের প্রেম আমাদের যে পথ ও আদর্শ দেখাইয়াছে, চেষ্টা করিলে তাহা সকল মানুষই চরিত্রে প্রতিভাত করিতে পারে। তাঁহার প্রদর্শিত পথ 'Not for the sannyasi and the ascetic but one which every man may tread on his way to the first gate of mortality' [*Rabindranath* Ch. X p. 138]

বস্তুতঃ আজ আমরা কেহ না কেহ সংসারকে, জীবনকে, ভিন্নরূপেই দেখিতে

শিখিতেছি—স্থূল বস্তুবাদের নিঃশব্দ প্রতিবাদে বৃহৎ বস্তুসত্যের তপস্যাও করিতেছি, জানিতেছি যে, আজও সংসারলোকে বস্তু-বুদ্ধির নিকট যাহা প্রত্যক্ষ নহে, তাহাও অবাস্তব বা কল্পনাচ্ছন্ন মূঢ় আদর্শ-প্রেমিকতা নয়। আজ 'কোটিতে গোটিকের' অন্ততঃ মোহঘোর কাটিয়াছে ; ব্রহ্ম যে জীবননিরপেক্ষ তত্ত্বমাত্র নয়, পরন্তু জীবনময়রূপে সত্য, প্রকৃতি যে নিষ্প্রাণ জড় পিণ্ডমাত্র নয়, পরন্তু গানে ও প্রেমে প্রাণময়ী, জগৎ যে মর্মহীন নিষ্প্রেম কারাগার মাত্র নয়, পরন্তু আনন্দের কর্মায়তন, এবং জীবন যে দেহসর্বস্ব বস্তু-অস্তিত্বের ভারবাহী মাত্র নয়, পরন্তু বৃহতের নিত্য অনুরাগে সুন্দর ও মহিমময়, একথা জানিবার ও মানিবার মানুষ ও মন এ-যুগেও আছে। ইহাদেরি নিঃশব্দ তপস্যার ও প্রেম পূজার আধ্যাত্মিক শক্তি প্রভাবে স্বদেশ আজ বিশ্বময়রূপে, বিশ্ব মাতৃভূমিরূপে, জীবনসঙ্গিনী আত্মার সঙ্গিনীরূপে এবং নারী 'মহেন্দ্রের দান' স্বরূপে ক্রমশঃ প্রতিভাত হইতেছে। ইহা মিথ্যা নহে, অবাস্তব নহে। কাল যাহা আদর্শবাদী অবাস্তব কল্পনা বলিয়া মনে করিয়াছি, আজ তাহাই তো বস্তুগতভাবে প্রত্যক্ষ সত্য বলিয়া ধারণা হইতেছে। আজও যাহা নিগূঢ় আদর্শতত্ত্ব বলিয়া মনে করিতেছি, প্রত্যক্ষ সত্য বলিয়া ধরিতে পারিতেছি না, কাল নিশ্চয়ই তাহা ধরিতে পারিব, কেন না জীবন চলিতেছে, মন বলিতেছে 'ইহ বাহ্য, আরো কহ'। জীবনের এই যে চলা, মনের এই যে বলা—রবীন্দ্রদর্শনে ইহাই তো গতি, ইহাই তো তুচ্ছে বৈরাগ্য, উচ্চে রতি। এই বৈরাগ্য বা রতিই চিত্তকে ক্রমশঃ মুক্তির বৃহৎ ভূমিকায় আনিতেছে, যা মহৎ, যা শ্রেয়, যা সুন্দর, যা মৃত্যুঞ্জয় তাহার অভিমুখে জীবনকে টানিতেছে। রবীন্দ্রনাথের জীবন, জগৎ, পুরুষ, নারী প্রভৃতি কল্পনায়, বেশ লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়, এই বৈরাগ্য ও রতিই বিশেষভাবে প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে। বস্তুতঃ তুচ্ছে বৈরাগ্য আছে বলিয়াই লালসার দৃষ্টিতে নারীকে তিনি দেখিতে চাহেন নাই, উচ্চে রতি আছে বলিয়াই নারীকে 'পূজামূর্তি' রূপে, 'আত্মার সঙ্গিনী' রূপে দেখিয়াছেন। রাবীন্দ্রিক এই দৃষ্টির আলোকে নারীকে দেখিলে স্থূল কামনার সংস্কার মন হইতে খসিয়া যায় ; তখন মহুয়ার নারীরূপই যে কেবল বাস্তব সত্যের ন্যায় প্রত্যক্ষগোচরীভূত হয় তাহা নহে, রবীন্দ্রনাথের প্রেমরূপও বাস্তব সত্যের মতো প্রতীয়মান হইতে থাকে। চিত্তের প্রসার হয় বলিয়া রস গ্রহণেও তখন শক্তি জাগ্রত হয়। বৃহতের মনোদর্শন প্রভাবে ক্ষুদ্রের মনও বৃহতের জ্যোতিঃসমুদ্রে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। এমনি করিয়াই অহং আত্মার পথে চলে, বস্তু ভাবের ইশারা পায়, রূপ অরূপের ঔজ্জ্বল্যে অপরূপ হইয়া প্রকাশ পায়। 'মহুয়ার' কবিতার তত্ত্ব-রূপে এইভাবেই আমি অপরূপের অভিসার দেখিতে পাইয়াছি। 'গীতিমাল্য' প্রভৃতি অধ্যাত্ম-গীতিগ্রন্থে গভীর যে প্রেম কবির মধ্যে আত্মপ্রস্তুতির মন্ত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছিল, 'বলাকা' প্রভৃতি গতিধর্মী কাব্যগ্রন্থে দুর্বার যে প্রেম দুর্মদ গতির যৌবনানন্দে বিশ্বের সর্বত্র সঞ্চারিত হইবার আত্মসাধনায় ছিল নিত্য তৎপর, 'মহুয়ার' প্রণয়কুঞ্জে প্রত্যাগত হইয়াছে সেই অপরূপ প্রেম, সেই 'অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ'

প্রেম। ইহার ললাটে সেই আত্মপ্রস্তুতির সূর্যদীপ্তি, হৃদয়ে সেই গতিপ্রাণতার বৈরাগ্য-সাধনা। 'মুক্তরূপের' প্রকাশ-আনন্দই ইহার লীলাবিলাস, 'শ্লথপ্রাণ দুর্বলের' লজ্জাহীন রূপলালসার স্পর্ধায় ইহার বিরুষ্ট বিদ্রোহিতা। নারীর নিকট ইহার বাণী এই :

নারীর আপন ভাগ্য জয় করিবার
… … 'দিব' অধিকার।

ইহারি মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া নারী বলে :

বীর হস্তে বরমাল্য লব একদিন
সে-লগ্ন কি একান্তে বিলীন
ক্ষীণদীপ্তি গোধূলিতে ? [সবলা]

অন্যত্র :

শ্লথপ্রাণ দুর্বলের স্পর্ধা আমি কভু সহিব না।
লোলুপ যে লালায়িত, প্রেমেরে যে করে বিড়ম্বনা
ক্লেদঘন চাটুবাক্যে, বাষ্পে বিজড়িত দৃষ্টি তার
কলুষ-কুণ্ঠিত অঙ্গে লিপ্ত করে গ্লানি লালসার,
আবেশে মন্থর কণ্ঠে গদগদ সে প্রার্থনা জানায়,
আলোকবঞ্চিত তার অন্তরের কানায় কানায়
দুষ্ট ফেন উঠে বুদ্বুদিয়া, ফেটে যায়, দেয় খুলি'
রুদ্ধ বিষবায়ু। গলিত মাংসের যেন ক্রিমিগুলি
কল্পনা বিকার তার, শিথিল চিন্তার তলে তলে
আকুলিতে থাকে কিলিবিলি। যেন প্রাণপণ বলে
মন তারে করে কশাঘাত। [স্পর্ধা]

মহুয়ার এই বীর্যপ্রধান বলিষ্ঠ প্রেম 'শ্লথপাণ দুর্বলের' জন্য নহে, কেন না 'লোলুপ সে লালায়িত, প্রেমেরে সে করে বিড়ম্বনা'। পুরুষের জন্যই এই প্রেম, কাপুরুষের জন্য নহে। সুতরাং এই স্থলে সাধনার কথা, 'হওয়ার' কথা আসিয়া পড়ে। সকল মানুষ পুরুষ নয়, যেমন সকল মানুষই রসিক হইতে পারে না। সাধনা ব্যতিরেকে রসিক হওয়া বা পুরুষ হওয়া নিতান্তই কথার কথা মাত্র। মহুয়ার প্রেমপাঠে পাঠক অবশ্যই অনুভব করিবেন যে, নর-কে হইতে হয় পুরুষ, নারীকে আত্মার সঙ্গিনী, নতুবা সত্যকার প্রেমদর্শন প্রতিভাত হয় না চরিত্রে। চরিত্রে বা জীবনে যা' প্রতিভাত নয়, অন্যত্র তাহার যাহাই মূল্য থাকুক না কেন, জগৎসংসারে ও গৃহ-সংসারে তাহার মান বা মূল্য কিছুই নাই। বাস্তবে যদি প্রেমকে প্রত্যক্ষ করিতে হয়, গৃহ সংসারকে যদি প্রেমসুন্দর করিবার বাসনা জাগে, তবে গৃহীকে তাহার জন্য অবশ্যই সাধনা করিতে হইবে। এই সাধনা, বলা বাহুল্য, পুরুষের সাধনা, শুদ্ধমাত্র রসিকের সাধনা নহে। কাপুরুষও কোনো কোনো ক্ষেত্রে রসিক হইতে পারে, কিন্তু পুরুষ যিনি, তিনি রসিক তো বটেনই, তাহার উপর তিনি পৌরুষের সাধক। প্রেমের

সাধনা শুধু রসের সাধনা নয়, পৌরুষের সাধনাও বটে। মহুয়ার প্রেমপাঠে পাঠক যতই রসোদ্বেজিত হইবেন, ততই এই নীরস পৌরুষতত্ত্বটি সরল প্রেমপদ্মের মায়ারূপ বিস্তার করিয়া তাঁহাকে ভুলাইবে। যেমন—

কোথা আছ? ডাকি আমি। শোনো শোনো আছে প্রয়োজন
একান্ত আমারে তব। আমি নহি তোমার বন্ধন;
পথের সম্বল মোর প্রাণে। দুর্গমে চলেছ তুমি
নীরস নিষ্ঠুর পথে,—উপবাস-হিংস্র সেই ভূমি
আতিথ্যবিহীন; উদ্ধত নিষেধ দণ্ড রাত্রিদিন
উদ্যত করিয়া আছে উর্ধ্বপানে। আমি ক্লান্তিহীন
সেই সঙ্গ দিতে পারি, প্রাণবেগে বহন যে করে
শুশ্রূষার পূর্ণশক্তি আপনার নিঃশঙ্ক অন্তরে,—
যথা রুক্ষ রিক্ত বৃক্ষ শৈলবক্ষ ভেদি অহরহ
দুর্দাম নির্ঝর ঢালে দুর্নিবার সেবার আগ্রহ,
শুকায় না রসবিন্দু প্রখর নির্দয় সূর্যতেজে,
নীরস প্রস্তরমুষ্টিতলে দৃঢ়বলে রেখে দেয় সে যে
অক্ষয় সম্পদরাশি। সহাস্য উজ্জ্বল গতি তার
দুর্যোগে অপরাজিত, অবিচল বীর্যের আধার॥ [আহ্বান]

এই 'দুর্যোগে অপরাজিত' প্রেমই, এই 'অবিচল বীর্যের আধার' প্রেমশক্তিই মহুয়া-প্রেমের তথা রবীন্দ্রপ্রেমের পৌরুষ। বৃহতে রতি ইহার ধর্ম। অল্পে ইহার সুখ নাই বলিয়া শুদ্ধমাত্র মোহের চরিতার্থতাই ইহার আদর্শ নহে। মোহ যে প্রেমের একান্ত বিপরীত তা' ইহা কখনই বলে না, বরং মোহ হইতেই প্রেম যে উন্মেষিত হয়, তাহার পর ক্রমবিকাশের পথে 'সহাস্য উজ্জ্বল গতি' লাভ করিয়া পূর্ণতার সাধনবেগে বিশ্বরূপ দর্শন করিতে চায় ইহাই রবীন্দ্রপ্রেমের তত্ত্বসত্য ও বক্তব্য বিষয়। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ জীবনের কাব্য সাধনার মানস-দর্শন পর্যালোচনা করিয়া অহং-মোহ হইতে বৃহৎ প্রেমের পথে নিরলস অভিযানের মন্ত্র ও তত্ত্বসত্যই আমি আহরণ করিয়াছি। সমগ্র অখণ্ড সৃষ্টির দিক হইতে ইহা সত্য আবার আংশিক সৃষ্টির দিক হইতেও ইহা উপেক্ষণীয় নয়। রবীন্দ্রনাথের যে কোনো উল্লেখযোগ্য কবিতা পাঠ করুন, দেখিবেন, অস্পষ্টভাবে তাহাতে মোহের মানসাবেগ আছে, সঙ্গে সঙ্গে আছে তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বৃহৎভাবে যাইবার আনন্দধ্বনি। তাঁহার যে কোনো উচ্চাঙ্গের অধ্যাত্ম সঙ্গীতেও মানবিকতার অস্পষ্ট বসন্তাভাস আপনি অনুভব করিবেন, আবার যে কোনো উচ্চাঙ্গের প্রণয় কবিতা পাঠের বেলায় শুদ্ধমাত্র ফাল্গুন-বিহ্বলতাই পাইবেন না, তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া কোনো একটি উচ্চতম সূক্ষ্ম ভাব-বেদনার ইঙ্গিত তাহাতে লক্ষ্য করিবেন। স্বর্গের সঙ্গীতে তিনি

মানবিকতা আনেন, মানবের প্রণয়-সঙ্গীতে আনেন স্বর্গীয়তা। বেদান্তের ভাষায় 'বিজ্ঞানের' জ্যোতিকে তিনি 'মনে'র রঙে রঞ্জিত করেন, মনের রঙকে তিনি বিজ্ঞানের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করিয়া তুলেন। তাঁহার মানসত্তত্বের এই মধ্যগ রূপটি মহুয়ার আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতেছি বটে, কিন্তু ইহাই তাঁহার কাব্য ও দর্শনের বিশিষ্টতা। কবিতার সৌন্দর্য সম্পর্কে তিনি নিজে যা বলিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহার মনোদর্শনের ও কাব্যদর্শনের স্বরূপ নির্ণয় করা কঠিন নহে। বলিয়াছেন তিনি :

"অসম্পূর্ণ real এবং পরিপূর্ণ ideal এর মিলনেই কবিতার সৌন্দর্য। কল্পনার centrifugal force, ideal-এর দিকে real-কে নিয়ে যায়, এবং অনুরাগের centripetal force-এর দিকে ideal-কে আকর্ষণ করে—কাব্যসৃষ্টি নিতান্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে বাষ্প হয়ে যায় না এবং নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হয়ে কঠিন সংকীর্ণতা প্রাপ্ত হয় না।" [রবীন্দ্রজীবনী ১ম, পৃ. ১৪৯]

কবিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি তাঁহার দর্শন ও জীবন সম্পর্কেও প্রযোজ্য। বস্তুকে তিনি পরিহার করিবেন না, বস্তুনিরপেক্ষ শূন্য জীবন তাঁহার কাম্য নহে। আবার বস্তুসর্বস্ব জড়জীবনও তাঁহার কাম্য নহে, বস্তুকে ভাবের গৌরবে তিনি উজ্জ্বল করিয়া লইবেন। মোহকে তিনি মিথ্যা কহিবেন না—কবিতায় যেমন অসম্পূর্ণ real-এর প্রয়োজন, জীবনে তেমনি মোহের ঈষৎ কাঞ্চন স্পর্শের প্রয়োজন, তা' না হইলে জীবন বস্তুনিরপেক্ষ উগ্র সন্ন্যাসিতায় আচ্ছন্ন হইয়া যাইবে। পরিপূর্ণ ideal অর্থাৎ পূর্ণ সেই ভূমাই, জীবনের লক্ষ্য বটে, কিন্তু real-এর পথ বাহিয়া, অল্পের পথ বাহিয়া ক্রমশঃ তা' পাইতে হইবে, real-কে অবস্তু বলিয়া, মায়া বলিয়া, মিথ্যা বলিয়া পাশ কাটাইলে চলিবে না। পরিপূর্ণ ideal-কে হয়তো কোনোদিনই পাইব না, তাই দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম, গতি ও বৃহতে রতি কোনোদিনই নির্বাপিত হইবে না, কিন্তু সেইজন্যই তো থামিয়া থাকা জীবনের কথা নহে। মোহ হইতে জন্মলাভ করিয়া প্রেমের মধ্যে দ্বিজত্ব লাভ করার বাণী যুগে যুগে তাই গুঞ্জরিত হইবেই। অসম্পূর্ণ real-এর স্পর্শ এবং পরিপূর্ণ ideal-এর স্বপ্ন, এই দুয়ের মিলনেই তো বাস্তব জীবনের সৌন্দর্য। এই সৌন্দর্যের সাধনাই রবীন্দ্রপ্রেম-জীবনের পুরুষার্থ বা পৌরুষ। রূপের আনন্দ আস্বাদনে সহায়তা করে মোহ—মোহকে কবি উত্তীর্ণ হইয়া চলেন বটে, কিন্তু একেবারে ইহাকে ত্যাগ করেন না, অসম্পূর্ণভাবে ইহা মনে জাগিয়াই থাকে, ফলে আনন্দ আস্বাদনের সহজ পথ বাহিয়া অরূপ আনন্দের সাধন-পথে যখন অগ্রসর হন, তখন সেই পরিপূর্ণ স্বপ্নও মানসবহির্ভূত নির্বাণাবস্থা প্রাপ্ত হয় না, বরং অসম্পূর্ণ মোহের স্পর্শে আস্বাদ্য বিষয়ই থাকিয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের অরূপেরও তাই রূপ আছে, মানবিক মানসাবেগের সুসহ উত্তাপের কিছু না কিছু আনন্দ-স্পর্শ তাহাতে আছে। ঠিক এই কারণে ধারণাতীত জীবনবহির্ভূত কোনো অরূপ ব্রহ্মে তাঁহার মন

ভরে না, তাঁহার ব্রহ্ম হইতেছেন প্রেমময় পরমমানব, যেমন তাঁহার মানব হইতেছে অসীম ব্রহ্মের সীমাময় সম্ভূত প্রেমের লীলাপ্রকাশ। মানব চলিয়াছে পরমমানব হইতে, অর্থাৎ প্রেমের সকল গুণ চরিত্রে পূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে। কিন্তু পথে নানা কামনার 'গুপ্ত সর্প গূঢ় ফণা' দেয় দেখা, তবু মানব থামে না, একান্তভাবে কামনাতেই, মোহেতেই থাকে না আবদ্ধ। রতি তাহার প্রেমে অর্থাৎ বৃহতে তাহার রতি, তাই বৈরাগ্য পুলকে তাহাকে অগ্রসর হইতেই হয়। এই বৈরাগ্য পুলক, এই পৌরুষ, প্রেমমানসের এই 'সহাস্য উজ্জ্বল গতি' রবীন্দ্র-গীতিকবিতার প্রাণস্পন্দন। মহুয়ার কথায় ইহারই মন্ত্রধ্বনি শুনিয়াছি। ড. সুবোধচন্দ্র যথার্থই বলিয়াছেন: "কবির কাব্যে বীররসের অভাব আছে, এই অনুযোগ অনেকদিন ধরিয়া করা হইয়াছে; কিন্তু 'মহুয়া'য় অনেকগুলি কবিতায় যে প্রেমের পরিচয় পাই, তাহা বীরের প্রেম, তাহা শৌর্যের দ্বারা মহিমান্বিত। এই যে প্রেম, ইহা তপস্যারই অঙ্গ; ইহাতে কঠোর ও কোমলের সংমিশ্রণ হইয়াছে।" [রবীন্দ্রনাথ] সুবোধবাবু 'কঠোর' বলিতে তপস্যা বা বৈরাগ্যের ভাব এবং 'কোমল' বলিতে গার্হস্থ্য সুখানন্দাশ্রয়ী প্রণয় ভাব বুঝাইতে চাহিয়াছেন কি না জানি না। কিন্তু কথায় কিছু আসে যায় না। রবীন্দ্রনাথের প্রেমে এবং মহুয়া প্রেমে দুই সুরের সংমিশ্রণ আছে, ইহাই কথা। এই দুই সুরের তত্ত্বগত মাহাত্ম্য উপলব্ধি হইলেই রবীন্দ্রকাব্য সহজ হইয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, রবীন্দ্রপ্রেমে বৈরাগ্য, তপস্যা বা পৌরুষ বলিতে আমি কী বুঝাইতে চাহি, তা-ও সহজ হয়। পৌরুষ অর্থে কেবল বীরত্বের আস্ফালন নহে, পর্জন্যকণ্ঠে চিৎকার নহে অথবা দৈহিক শক্তির অত্যাশ্চর্য বিকাশের উদ্দীপ্ত অহংকারও নহে, ধীরোদাত্ত চরিত্রের ধীরললিত প্রীতি-সৌজন্যও পৌরুষ, রুচিসুন্দর রসিকতার বুদ্ধিদীপ্ত হৃদয়বত্তাও পৌরুষ, বৈরাগ্য সংযমের মননজাত প্রেম প্রকাশের আনন্দ-আগ্রহও পৌরুষ; দুর্যোগে অপরাজিত, সুযোগে সংযত, মিলনে বসন্তদীপ্ত, বিচ্ছেদে ধ্যানগম্ভীর ,এই ভাবও তো পৌরুষের ভাব। এই পৌরুষের পর্বত-গাত্র ভেদ করিয়া প্রেমের যে নির্ঝরিণী প্রবাহিত হয়, তাহারি কাব্যরূপ আছে 'মহুয়া'য়।

প্রেম যেখানে পৌরুষকে জানে অর্থাৎ যেখানে জড়তা বা দীনতা, ক্ষুদ্রতা বা জৈবাসক্তিকে সহজ আনন্দেই পরিত্যাগ করিতে জানে, কবি কল্পনা করিয়াছেন, প্রেমের সেখানে যোদ্ধবেশ, প্রেম সেখানে জীর্ণতার সহিত, শীর্ণতার সহিত, গতানুগতিকতার আসক্তি-অন্ধ মত্ততার সহিত সংগ্রাম না করিয়া পারে না। বিশ্বপ্রকৃতিতে প্রেমের এই সংগ্রামলীলা অহরহঃ সংঘটিত হইয়াছে। যা' পঙ্গু, যা' হীনবীর্য, যা' শ্লথপ্রাণ দুর্বল, যা অক্ষম, প্রকৃতি যেন তা' সমস্ত সহ্য করিতেই পারে না। বিচিত্র নূতনের লীলা-নিকেতন এই প্রকৃতি, রূপে রূপে, প্রতিরূপে, নানাফুলে, নানাফলে, নানারঙ্গে, নানাবর্ণে, অহরহঃ নূতন হইয়া, নূতনকে লইয়া প্রকাশ পাইতেছে এই বিশ্বপ্রকৃতি। এই প্রকাশের মধ্যেই প্রকৃতির মুক্তি। নিত্য নূতন প্রকাশের বেদনা যদি তাহার না থাকিত, যদি পুরাতন

কোনো বিশেষ রূপের আসক্তিতেই সে চাহিত বদ্ধ রহিতে, তবে সেই আসক্তির পঙ্কস্তূপে মৃতবৎ স্থবির হওয়া ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর তাহার থাকিত না। প্রকৃতির নিকট 'আনন্দময় সুগভীর বৈরাগ্যই হইতেছে প্রেমসুন্দরের চরম দান'; প্রেমের এই দান-মাহাত্ম্যেই, কি না বৈরাগ্য-মাহাত্ম্যেই, প্রকৃতি নিত্য নূতন প্রকাশ চাহে, জড়দৈত্যের সহিত সংগ্রাম ঘোষণা করে, মরুর আক্রমণ হইতে ধরিত্রীকে রক্ষা করার গুরুদায়িত্ব আনন্দ-বৈরাগ্যেই বহন করিয়া চলে। সে পুষ্প ফুটাইয়া যায় প্রেমের আনন্দে, পুষ্প ঝরাইয়া যায় প্রেমের বৈরাগ্যে, মরুর সহিত সমরলিপ্ত রহে প্রেমের পৌরুষে। 'মহুয়ার' প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতাগুলিতে এই ভাব অবশ্যই পাইয়াছেন, বসন্তকে অবশ্যই দেখিয়াছেন সংগ্রামীর বীরমূর্তিতে। জড়দৈত্যের সহিত অহরহঃ সংগ্রাম করিতেছে বসন্ত প্রকৃতি। দৈত্যটা চাহে ধরিত্রীকে মরুকল্প করিয়া রাখিতে। যে সমস্ত মুকুল আজও প্রস্ফুটিত হয় নাই, চিরকাল তাহাদের অপ্রকাশের অন্ধকার পাতালতলে বন্দী রাখাই বুঝি তাহার অভিলাষ। কিন্তু ভুবনজয়ী বীর বসন্ত যেই আসিল—

বন্দীরা পেল ছাড়া।
জীবনের রণে নব অভিযানে
ছুটিতে হবে-যে নবীনেরা জানে,
দলে দলে আসে আমের মুকুল
বনে বনে দেয় সাড়া ॥
মরু-যাত্রার পাথেয় অমৃতে
পাত্র ভরিয়া আসে চারিভিতে
অগণিত ফুল, গুঞ্জন-গীতে
জাগে মৌমাছি-পাড়া ॥ [বসন্ত]

বসন্তের আগমনে দিশি দিশি জাগিল প্রাণের উচ্ছ্বাস; দাড়িম্ববন প্রচুর পরাগে রক্তিমরাগে হইল প্রগলভ, নবজীবনের বিপুল ব্যথায় জাগিয়া উঠিল ধরিত্রী।

দেখিতে দেখিতে কী হতে কী হলো।
শূন্য কে দিল ভরি।
প্রাণবন্যায় উঠিল ফেনায়ে
মাধুরীর মঞ্জরী। [বোধন]

জড়দৈত্য প্রাণভয়ে কোথায় পলাইল কে জানে। যুদ্ধশেষে এখন যেন তাই শক্র-বিজয়ীর উৎসবের পালা। কী যেন 'মায়ামন্ত্রে' বসন্ত তাহার 'মৃত্যুদমনশৌর্য' করিল গোপন, ধরিল 'সুকুমার বেশ'। তবু—

বর্ম 'তাহার' পল্লবদলে,
আগ্নেয় বাণ বনশাখাতলে
জ্বলিছে শ্যামল শীতল অনলে
সকল তেজের বাড়া॥ [বসন্ত]

জড়দৈত্যের সহিত বসন্তপ্রকৃতির এই যে চিরসংগ্রামের কল্পনা, ইহা শুধু কবিত্ব নহে, দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ এই কল্পনাকে একান্ত সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। প্রকৃতি নামক অধ্যায়ে ইতিপূর্বে আমি বলিয়াছি প্রকৃতিকে কবি ঈশ্বরের শক্তির ক্ষেত্র বলিয়া মনে করেন। ঈশ্বরের শক্তি অনাদ্যন্তকাল হইতে প্রকৃতির জড়তার ও পঙ্গুতার সহিত সংগ্রাম করিয়া প্রাণের ও যৌবনের জয় ঘোষণা করিতেছে। আধুনিক বিজ্ঞানও তো প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, জড় শুধু জড়মাত্র নহে, তাহার অন্তরে প্রাণশক্তি গুপ্ত থাকিয়া অহরহঃ তাহাকে নাচাইতেছে, মাতাইতেছে। প্রত্যক্ষে যাহা জড় বলিয়া প্রতীয়মান, পরোক্ষে তাহাই প্রাণশক্তির উদ্বেল আতিশয্যে চঞ্চল। এই প্রাণশক্তির বাণীই রবীন্দ্রনাথের বসন্তবাণী। বসন্ত যেন ঈশ্বরের দূত, জগতে সে আবির্ভূত হয় প্রেমময় ঈশ্বরের সৃষ্টি রক্ষার মহৎ কায সম্পাদনে। Struggle for existence-এর অধিদেবতা যেন বসন্ত, Survival of the fittest-এর আদিদেবতা যেন বসন্ত। ইহার বাণী এই: জাগিতে হইবে, চলিতে হইবে, চালাইতে হইবে। ইহাই সংগ্রামবাণী, ইহাই পৌরুষধর্ম। বসন্তের এই ধর্ম। পাঠক অবশ্য বুঝিতেছেন রবীন্দ্রপ্রেমের একটা অপরূপ প্রকাশ এই বসন্ত।

বিজয়ী বসন্তকে সম্ভাষণ জানাইয়া কবি কহিতেছেন:

হে অজেয়, তব রণভূমি 'পরে
সুন্দর তার উৎসব করে,
দক্ষিণবায়ু মর্মরস্বরে
বাজায় কাড়া-নাকাড়া॥

সংগ্রামী জীবনেই বিজয়োৎসব, পরাজয় নাই, মৃত্যু নাই সংগ্রামী জীবনে। মৃত্যু যদি কোথাও থাকে, তবে তা আছে সংগ্রামবিমুখ আসক্ত বদ্ধ জীবনেই। সেই আসক্ত জীবন কিন্তু জীবনই নয়, তা 'মৃত্যুর গুপ্ত প্রেমে' অন্ধ. মৃত্যুর কবলে তাহার দাসত্ব। 'দাসত্বের পঙ্ক তিলক' মুছিয়া ফেলিয়া জাগিতে হইবে জীবনের রণভূমে, সংগ্রাম করিতে হইবে আনন্দে, কেন না জীবনের জয়বাণীই তো এই সংগ্রাম, এই সংগ্রাম প্রচেষ্টা। সংগ্রাম-বিমুখ মানবাত্মাই প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারে না; অল্প লইয়া সে বদ্ধ থাকে, তাই যখন সেই অল্পটুকু কালের নিয়মে সরিয়া যায়—অসহ্য যন্ত্রণায় সে ভাঙ্গিয়া পড়ে, নিঃশক্তি ও নিঃসম্বল জীবনে সে কাল যাপন করে মৃতবৎ পাষাণের মতো। কিন্তু চলমান সংগ্রামী জীবন প্রকৃতির বৈরাগ্য ধর্মটি চরিত্রে প্রতিভাত করে বলিয়া একদিকে

আনন্দভরে সে যেমন ত্যাগ করিতে জানে, অপরদিকে নিত্য নব প্রকাশের আনন্দে সে অহরহঃ উৎসাহিত রহে। প্রকৃতি তাহাকে বদ্ধ করে না বরং মুক্তই করে, কেন না প্রকৃতির মতই নব-নব ত্যাগের মধ্য দিয়া নবনব সৃষ্টির মহোৎসবে সে অগ্রসর হইয়া যায়। কোনো কিছুতে আসক্ত রহে না বলিয়া যাহা যায় তাহার বিচ্ছেদে সে শূন্যগর্ভ হাহাকারে আকাশ ফাটায় না, বরং সেই বিচ্ছেদের প্রেরণায় নূতন আলোকে জীবনকে দেখে, জীবনেশ্বরের আনন্দ অনুভব করে।

'জড়দৈত্যের সাথে অনিবার চিরসংগ্রাম ঘোষণার' ইহাই দার্শনিক তাৎপর্য। রবীন্দ্র-প্রকৃতির ইহাই মূল কথা। এই মূল কথাটি মর্মে ধারণ করিয়া কবির পরবর্তী বিখ্যাত কাব্য 'বনবাণী' আমি পাঠ করিয়াছি।

বনবাণী

ইতিপূর্বে 'প্রকৃতি' নামক অধ্যায়ে 'বনবাণী' সম্পর্কে কিছু আলোচনা করিয়াছি, পাঠক দেখিয়া থাকিবেন। 'বনবাণী' প্রকৃতির বাণী। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিকে জানিতে হইলে এবং মানুষের সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধ অনুভব করিতে হইলে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি বিষয়ক অন্যান্য কবিতার সহিত 'বনবাণী' অবশ্যই পাঠ করিতে হয়। প্রেমকে বাদ দিয়া প্রকৃতি, কিংবা প্রকৃতিকে বাদ দিয়া মানুষ যেমন সম্পূর্ণ নহে, অথবা অন্যকথায়, প্রকৃতির রূপ ও আনন্দ বাদ দিয়া রবীন্দ্র প্রতিভার সম্যক উপলব্ধি যেমন অসম্ভব, 'বনবাণী' বাদ দিয়া রবীন্দ্রপ্রকৃতি ও রবীন্দ্রমানব তেমনি অপূর্ণ বলিয়া মনে করি। 'বনবাণী' প্রকৃতির বাণী, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহা মানুষেরও বাণী। কবিগুরুর কল্পনায় প্রকৃতি ছাড়া মানুষ নাই, মানুষ ছাড়া প্রকৃতি নাই। প্রভাতকুমার বলেন, "প্রকৃতি বন্ধ্যা পুরুষ ছাড়া : রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রকৃতির বর্ণনার মধ্যে মানুষ আছে—চিত্রে হোক, লিরিকে হোক, সর্বত্রই মানুষকে পাই"। [রবীন্দ্রজীবনী-১, পৃ. ২৪৩]

এই মানুষ কোথাও পূজারী, কোথাও প্রেমিক, কোথাও পথিক, আবার কোথাও বা সংগ্রামীর মনোভাব লইয়া প্রকৃতিতে আলিঙ্গিত ও সঙ্গত হইতে চাহিয়াছে। আত্মোপলব্ধির আনন্দাভিলাষে মানুষ প্রকৃতির বিচিত্ররূপে একক সেই সর্বজগদ্‌গত প্রেমকে আস্বাদন করিতে চাহিয়া ভাব হইতে ভাবে নিত্য চলমান থাকিয়াছে—প্রকৃতিও বিচিত্ররূপে, বিচিত্র রঙে, বিচিত্র বর্ণে কবিমনের বিচিত্র মনোভাবকে বিচিত্রভাবে আকর্ষণ করিয়া প্রেমোপলব্ধির পথে সহায়তা করিয়াছে। প্রকৃতি মানুষকে বদ্ধ করে নাই—বিচিত্রের পথ দিয়া একের পথে তাহাকে মুক্তি দিয়াছে; মানুষও প্রকৃতির বিশেষ কোনো রূপমোহে আবদ্ধ

বা আসক্ত হয় নাই—রূপ হইতে রূপান্তরে যাইতে যাইতে 'না-পাওয়া' সেই অরূপের ধ্যানে নিত্য উধাও হইয়াছে। বস্তুতঃ রবীন্দ্রকাব্যে মানুষ ও প্রকৃতির ইহাই সম্বন্ধ, ইহাই আত্মীয়তা। এই আত্মীয়তার অন্তর্গূঢ় আনন্দবাণী কাব্যের অন্তরে দর্শন এবং দর্শনের অন্তরে কাব্য হইয়া 'বনবাণী'তে অপরূপ রূপ লইয়াছে। বিশেষ করিয়া বনবাণীতে 'নটরাজের' যে চিত্রকল্পনা দেখিবেন, একাধারে তাহা কাব্যের সৌন্দর্যে ও দর্শনের গভীরত্বে অনন্যসাধারণ। রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই এই কল্পনা এবং সর্বোপরি, কল্পনার এহেন প্রকাশ, সম্ভব। বনবাণীর এই নটরাজের নৃত্যতাণ্ডবের রস ও তত্ত্ব উপলব্ধি করিলেই রবীন্দ্রনাথের কবি ও দার্শনিক এই দুই ব্যক্তিত্বের অভিন্নত্ব সম্পর্কে আর কাহারো কোনো সংশয় বা সন্দেহ থাকিবে না। কবি বিচিত্রের উপাসক, কিন্তু যিনি কবি তিনিই দার্শনিকরূপে একের সন্ধান করিতেছেন। নটরাজের কল্পনাটিকে বিশ্লেষণ করিলেই এই ভাবটির দর্শন হয়।

সৃষ্টির লীলাময় প্রাণেশ্বর হইতেছেন নটরাজ। বিচিত্র ঋতুর রঙ্গমঞ্চে নৃত্য করিতেছেন তিনি। এক এক নৃত্যে ফুটিয়া উঠিতেছে এক এক ঋতুর বর্ণসুষমা। পুরাতন হইতেছে গত, আসিতেছে নূতন। 'পুরাণ শীত পাতা ঝরা, তারে আবার নূতন করা'ই নটরাজের তাণ্ডবলীলা, ঋতুলীলা। এই ঋতুলীলার নিয়মিত নিত্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়া অহরহঃ বিচিত্র নূতনের হইতেছে আবির্ভাব। এক যাইতেছে আসিতেছে আর। যে যাইতেছে, তাহার জন্য নৈরাশ্যের হাহাকার করিব না, কেন না নূতনের মধ্যে ভিন্নরূপে সে যে আসিতেছে! যে আসিতেছে তাহাতেই আবার একান্তভাবে বদ্ধও হইয়া থাকিব না—কেন না, সেও যাইবে নূতন হইয়া ফিরিবার আনন্দে। বিচিত্র নূতন এমনি করিয়া বিশ্বব্যাপী অখণ্ড এক প্রাণরহস্যের দিতেছে ইঙ্গিত।

নটরাজের নৃত্যলীলায় প্রকাশিত হয় প্রত্যক্ষ রূপ, উন্মথিত হয় পরোক্ষ আনন্দ। প্রত্যক্ষ রূপের আছে বৈচিত্র্য, নানা ছন্দ, নানা সুর, নানা বর্ণ, নানা রঙ; পরোক্ষ আনন্দে আছে আত্মোপলব্ধি, নানাত্বের মধ্যে একের আনন্দাবির্ভাব। রূপলোক বহিরাকাশে, আনন্দলোক অন্তরাকাশে। নটরাজের দক্ষিণ চরণোত্তোলনে যেন রূপের আবির্ভাব, বামোত্তোলনে, রসের। "নটরাজের তাণ্ডবে", দার্শনিক বলিতেছেন,—"তাঁর এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হয়ে প্রকাশ পায়, তাঁর অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হতে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিতে পারলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়। ['নটরাজ পালার' ভূমিকা দ্রষ্টব্য]

'এই বিরাট নৃত্যচ্ছন্দে' যোগ দিবার কথা বহুদিন পূর্বে গীতাঞ্জলিতেও কবি গাহিয়াছিলেন

পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দেরে,
খসে যাবার ভেসে যাবার
ভাঙবারই আনন্দে রে। [৩৬]

নটরাজ পালাগানের 'উদ্বোধনে' কবি গাহিতেছেন :

নটরাজ, আমি তব
কবি-শিষ্য, নাটের অঙ্গনে তব মুক্তিমন্ত্র লবো।

'মুক্তিমন্ত্র' কী? নিত্য গতির মন্ত্রই তো মুক্তি মন্ত্র। কোথা হইতে কোথায় গতি? অপ্রকাশ হইতে প্রকাশে গতি, আবার প্রকাশ হইতে অপ্রকাশে যাইয়া নবতর প্রকাশে গতি। জগজ্জীবনে, প্রকৃতি জীবনে নিশ্চেষ্টতা কখনো সত্য নহে, নিত্য গতি, নিত্য প্রয়াস, নিত্য সমরায়োজন, নিত্য তাণ্ডবই সত্য। সুতরাং 'খসে যাবার ভেসে যাবার' আতঙ্ক মিথ্যা, আনন্দই সত্য। ভাসিতে না জানিলে আসিব কেমন করিয়া? আসিতে যখন পারিয়াছি নূতনেব আনন্দে ভাসিতে চাহি না কেন? নটরাজ, আমি তোমার শিষ্য, তোমার নৃত্যের রহস্যলীলা বুঝিয়াছি। বুঝিয়াছি—

তোমার তাণ্ডবতালে কর্মের বন্ধনগ্রন্থিগুলি
ছন্দবেগে স্পন্দমান পাকে পাকে সন্থ যাবে খুলি ;
সর্ব অমঙ্গল-সর্প হীনদর্প অবনম্রফণা
আন্দোলিবে শান্তলয়ে।

মানুষ যখন সাংসারিক মোহে আসক্ত রহে, কৃতকর্মের পুরাতন বন্ধনে বন্দী রহিতেই ভালোবাসে, অর্থাৎ গতি ধর্মের বিরুদ্ধাচরণই করিতে চাহে, নরীনৃত্যমাণ নটরাজের স্বভাবের সহিত তখন তাহার মোহান্ধ জড় স্বভাবের মিল হয় না বলিয়াই স্বাভাবিক ভাবেই যাহা যায়, যাওয়া উচিত—তাহাই অস্বাভাবিক বলিয়া সে হাহাকার করিয়া উঠে, ভাবে, অমঙ্গল-সর্প দংশন করিল দেহে, মনে, আত্মায়। কিন্তু যখন নটরাজের নৃত্যচ্ছন্দে সে যোগ দেয়—অর্থাৎ গতির পৃথিবীতে গতির সাধনা করে, আরো সহজ কথায়, নটরাজের শক্তির ক্ষেত্র এই প্রকৃতির সহিত যখন খাপ খাওয়াইয়া লইতে চায়, তখন বাহ্যদৃষ্টিতে যাহা মৃত্যু, যাহা অমঙ্গল—তাহাও জীবনের রসে অভিষিক্ত হইয়া, মঙ্গলের দিব্যতায় শুভ্রসুন্দর হইয়া দেখা দেয়। জীবন তখন সামঞ্জস্যের পুণ্যে পূর্ণের স্পর্শ লাভ করে। ইহাই 'জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দ'।

এই আনন্দের মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত কবি জীবন ও মৃত্যুকে, আসা ও যাওয়াকে একাধারে আধৃত করিয়া দেখিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টিতে তাই—নটরাজের নৃত্য, জগতের গতি,

যৌবনের সংগ্রাম, মৃত্যুর অমৃতাভিযান, নবীনের নিত্য প্রকাশ—এক অদ্বিতীয় জীবনেরই বিচিত্র স্ফূর্তি বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে। এই স্ফূর্তির উপলব্ধিই কবিগুরুর মুক্তি। প্রকৃতি এই মুক্তিবাণী নানা রূপ ও বর্ণবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া অহরহঃ কবিকে জানাইয়া দিতেছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক 'বনবাণী' হইতে এই মুক্তিবাণী আহরণ করিতে পারিবেন।

বলিয়াছি, 'বনবাণী' প্রকৃতির বাণী। বৃক্ষরাজ্যে, লতারাজ্যে, পুষ্পপুরে সংক্ষেপে অরণ্যের অন্তঃপুরে, শ্যামলের আবির্ভাবের জন্য জীর্ণ পুরাতন ও পাষাণ জড়দৈত্যের সহিত অহরহঃ যে মুক্তির সংগ্রাম চলিতেছে বিশ্বকবির লেখনীর মধ্য দিয়া প্রকৃতি তাহারি মর্মবাণী যেন প্রকাশ করিয়া গেছে। বাহ্যতঃ চলচ্ছক্তিবিহীন আরণ্যক বৃক্ষরাজি কী অমোঘ শক্তিরহস্যে অবিশ্রাম চলমান রহিয়াছে, প্রাণচঞ্চল বসন্তের নিত্য তৎপর সহচর তাহারা,—নিঃশব্দ সংগ্রামের দ্বারা ধরিত্রীকে মরুর অত্যাচার হইতে, জড়ত্বের আক্রমণ হইতে, অবিরাম রক্ষা করিয়া চলিতেছে। বনবাণী কাব্যে কবিগুরু এই সংগ্রামী বৃক্ষের, এই 'মৃত্তিকার বীর সন্তানের' বন্দনা গাহিয়াছেন :

মৃত্তিকার হে বীর সন্তান,
সংগ্রাম ঘোষিলে তুমি মৃত্তিকারে দিতে মুক্তিদান
মরুর দারুণ দুর্গ হতে ; যুদ্ধ চলে ফিরে ফিরে ;
সন্তরি সমুদ্র-উর্মি দুর্গম দ্বীপের শূন্য তীরে
শ্যামলের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিলে অদম্য নিষ্ঠায় ;
দুস্তর শৈলের বক্ষে প্রস্তরের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়
বিজয় আখ্যানলিপি লিখি দিলে পল্লব-অক্ষরে
ধূলিরে করিয়া মুগ্ধ ; চিহ্নহীন প্রান্তরে প্রান্তরে
ব্যাপিলে আপন পন্থা। [বৃক্ষ বন্দনা]

বাহ্যতঃ চলচ্ছক্তিবিহীন বৃক্ষই গতিদর্শনের যেন প্রত্যক্ষ মূর্তি। দর্শনশক্তি যাহার নাই, সেই মনে করিতে পারে যে, বৃক্ষ বুঝি নীরব নিস্তব্ধ হইয়া কর্মহীন অচল জীবন যাপন করিতেছে। কিন্তু বৃক্ষের মতো সত্যকার কর্মী কে, বীর কে, পুরুষ কে ? মরুর বন্ধন হইতে মুক্তি দেয় সে মৃত্তিকাকে। শ্যামলের সিংহাসন প্রতিষ্ঠায় অদম্য অন্তহীন তাহার নিষ্ঠা, মুহূর্তকাল সে নিশ্চেষ্ট নহে, বিকাশের আনন্দাবেগে অহরহঃ সে সংগ্রাম তৎপর। প্রেম-জীবনের আদর্শও তো এই। প্রেমজীবন সংগ্রামের জীবন, কিন্তু সে সংগ্রাম, মনে রাখিব, আস্ফালন নহে, বীরবিক্রমের অভিনয় নহে, বাহ্য বীরত্বের মোহান্ধ কোলাহল নহে, সে সংগ্রাম গতির সংগ্রাম, নিরাসক্তের মুক্তি সংগ্রাম, আত্মোপলব্ধির আনন্দ সংগ্রাম। বাহির হইতে ইহা দেখাইবার নয়, অন্তরের মধ্যেই ইহার কার্যকারিতা। বৃক্ষ যেমন সবার

গোপনে মৃত্তিকাকে মরু হইতে মুক্তি দিতেছে, প্রেম তেমনি অন্তরতঃ সচেষ্ট থাকিয়া জীবনকে আসক্তির বন্ধ্যাত্ব হইতে মুক্তির উর্বরতায় টানিতেছে।

বৃক্ষ সংগ্রামী, প্রকৃতিতেও আছে সংগ্রাম, বৃক্ষ-স্বভাবে ও প্রকৃতি স্বভাবে অমিল নাই, বৃক্ষ প্রকৃতির 'বীর সন্তান'। প্রেমে আছে সংগ্রাম, প্রেম ও প্রকৃতির স্বভাবে আছে সামঞ্জস্য, প্রেম ও প্রকৃতির তাই সখ্যতা, অখণ্ডদৃষ্টিতে একাত্মতা। প্রেমসাধক মানুষের মধ্যে আছে সংগ্রাম, তাই প্রকৃতির সহিত একপ্রাণতার আনন্দে সে জীবনজয়ী। সংগ্রাম যাহার নাই, তাহার প্রেম নাই, গতি নাই, সেই কারণে বিকাশ নাই, প্রতিষ্ঠা নাই, সুতরাং মুক্তি নাই ইহজীবনে। প্রেম জীবনের বাণীই হইতেছে প্রতিষ্ঠা, মুক্তি। কিন্তু মুক্তি কে লাভ করিবে? 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'। বলবিহীন সংগ্রামবিমুখ মানুষ প্রার্থনা করে আরামবাদী ভোগোন্মত্ত প্রেম; যাহা পায়, তাহা রস নহে, রসের বিকার। বিকার-গ্রস্ত মানুষের মুক্তি নাই, মুক্তির কামনাও নাই। প্রকৃতির সহিত এইখানে তাহার বিরোধিতা; এইখানে তাহার মৃত্যু।

বৃক্ষ সংগ্রামী বলিয়াই কবি তাহার রূপে দেখিলেন অমৃতরূপ, শান্তিরূপ, পৌরুষের প্রসন্ন রূপ। দেখিলেন নিস্তব্ধ গভীর বৃক্ষ 'বীর্যরে বাঁধিয়া ধৈর্যে' শক্তির শান্তিরূপ প্রদর্শন করিতেছে। কবি গাহিলেন :—

> হে নিস্তব্ধ হে মহাগম্ভীর,
> বীর্যেরে বাঁধিয়া ধৈর্যে শান্তিরূপ দেখালে শক্তির;
> তাই আসি তোমার আশ্রয়ে শান্তিদীক্ষা লভিবারে,
> শুনিতে মৌনের মহাবাণী; দুশ্চিন্তার গুরুভারে
> নত শীর্ষ বিলুণ্ঠিতে শ্যামসৌম্যচ্ছায়াতলে তব,—
> প্রাণের উদার রূপ, রসময় নিত্য নব নব,
> বিশ্বজয়ী বীররূপ, ধরণীর বাণীরূপ তার
> লভিতে আপন প্রাণে।

বৃক্ষের যে রূপ কবি দেখিয়াছেন বা কল্পনা করিয়াছেন, বলা বাহুল্য, প্রেমেরও সেই রূপ। রবীন্দ্রনাথের প্রেম, পাঠক অবশ্যই লক্ষ্য করিয়াছেন, ধর্মতঃ সংগ্রামী, কর্মতঃ সৃষ্ট্যুদ্যমী, মর্মতঃ শান্তিকামী। 'বীর্যেরে' তামসিক অপব্যয়ে সে লজ্জিত করে না, রাজসিক অপচয়ে করে না নিষ্ফল। ধৈর্যের সহিত প্রেম মিলন ঘটায় বীর্যের, এইজন্য অন্তরে অন্তহীন শক্তি-পৌরুষ থাকা সত্ত্বেও সে সত্ত্বগুণে শান্ত, সে গম্ভীর, সে নিস্তব্ধ। ধৃতবীর্য এই অটল প্রেম কোন্‌স্থলে সংগ্রাম করিতে হয়, কোন্‌স্থলে কর্মরত রহিতে হয়, কোন্‌স্থলে রহিতে হয় উদাসীন বৈরাগী, তাহা জানে। যথাস্থানে, যথাসময়ে, যথানিয়মে সে আপন কাজ করিয়া

চলে কিন্তু ঢাক ঢোল পিটাইয়া 'এই করিলাম' তাই করিলাম' বলিয়া আত্মপ্রচারে হয় না ব্যস্ত। বৃক্ষরূপে কবি প্রেমের এই গুণমহিমার ছবি দেখিয়াছেন বলিয়াই তাহার আশ্রয়ে শান্তি-দীক্ষা লইতে আসিয়াছেন, জীবনের বাণী লাভ করিয়াছেন তাহার আশ্রয়ে, 'মানুষের বন্ধু' জ্ঞানে তাহাকে অর্পণ করিয়াছেন 'প্রণামী'।

বৃক্ষের সহিত তথা প্রকৃতির সহিত কবির এই যোগ, বস্তুতঃ, প্রেমেরই যোগ। বনবাণীকে কেহ প্রেমের কাব্য বলিলে আমি অন্ততঃ আপত্তি করিতে পারিব না। পুরুষ প্রেমের বলিষ্ঠ প্রকাশ কি 'দেবদারু', 'শাল', 'নারিকেল', প্রভৃতি কবিতায় দেখি নাই? 'নীলমণিলতা', 'কুরচি,' 'মধুমঞ্জুরী' কি কবির প্রণয়িনী নহে? 'চামেলিবিতান' বা 'বৃক্ষ-রোপণের' আনন্দোদ্দীপ্ত গানগুলি কি অতলান্তিক প্রেমের সোহাগসুর বহণ করে না?

'বনবাণীর' একাধিক কবিতা লইয়া প্রকৃতি অধ্যায়ে আমি ইতিপূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। এ-স্থলে সেগুলির পুনরালোচনার আর প্রয়োজন দেখি না। বনবাণী প্রসঙ্গে প্রেম ও প্রকৃতি সম্পর্কে আমার যা বলার ছিল সংক্ষেপে তাহা বলাও হইয়াছে। বৃক্ষলতা, পুষ্পপত্রাদি তথা সমগ্র প্রকৃতির সহিত মানুষের কী সম্পর্ক, প্রেমের সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধ কী, প্রকৃতি অধ্যায়ে তা আলোচনা করিয়াছি, বর্তমান অধ্যায়েও কিছু কিছু নূতন করিয়া করা গেল। বৃক্ষের সহিত তথা প্রকৃতির সহিত রবীন্দ্রনাথের আবাল্যপ্রেম। এই প্রেমের চিত্র 'গল্পগুচ্ছের' একটি গল্পে বড় সুন্দর ভাবে ফুটিয়াছে। গল্পটিতে মানুষের সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধ বিষয়ে কবি যাহা লিখিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের বনবাণী ও প্রকৃতিবাণী বুঝিবার পক্ষে তাহা খুবই প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি।

গল্পটির নাম 'বলাই'। পাঠকের জ্ঞাতার্থে বলাই-এর বৃক্ষপ্রেমের একটু পরিচয় দিয়া বনবাণী-প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি।

> তার প্রকৃতিতে কেমন করে গাছপালার মূল সুরগুলোই হয়েছে প্রবল। ছেলেবেলা থেকেই চুপচাপ চেয়ে চেয়ে দেখাই তার অভ্যাস, নড়ে চড়ে বেড়ানো নয়। পুবদিকের আকাশে কালো মেঘ স্তরে স্তরে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ায়, ওর সমস্ত মনটাতে ভিজে হাওয়া যেন শ্রাবণ অরণ্যের গন্ধ নিয়ে ঘনিয়ে ওঠে; ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ে, ওর সমস্ত গা যেন শুনতে পায় সেই বৃষ্টির শব্দ। ছাদের উপর বিকেলবেলাকার রোদ্দুর পড়ে আসে, গা খুলে বেড়ায়; সমস্ত আকাশ থেকে যেন কী একটা সংগ্রহ করে নেয়। মাঘের শেষে আমের বোল ধরে, তার একটা নিবিড় আনন্দ জেগে ওঠে ওর রক্তের মধ্যে,

একটা কিসের অব্যক্ত স্মৃতিতে ; ফাল্গুনে পুষ্পিত শালবনের মতোই ওর অন্তর-প্রকৃতিটা চারদিকে বিস্তৃত হয়ে ওঠে, ভরে ওঠে, তাতে একটা ঘন রঙ লাগে। তখন ওর একলা বসে বসে আপন মনে কথা কইতে ইচ্ছা করে, যা কিছু গল্প শুনেছে সব নিয়ে জোড়াতাড়া দিয়ে ; অতি পুরানো বটের কোটরে বাসা বেঁধে আছে যে একজোড়া অতি পুরানো পাখি, বেঙ্গমা বেঙ্গমী, তাদের গল্প। ওই ড্যাবা-ড্যাবা চোখ মেলে সর্বদা-তাকিয়ে-থাকা ছেলেটা বেশি কথা কইতে পারে না। তাই ওকে মনে মনে অনেক বেশী ভাবতে হয়।

ওর ভাবে-ভোলা চোখটা কেবল যে উপরের দিকেই তা নয়, অনেক সময় দেখেছি, ও আমার বাগানে বেড়াচ্ছে মাটির দিকে কী খুঁজে খুঁজে। নতুন অঙ্কুরগুলো তাদের কোঁকড়ানো মাথাটুকু নিয়ে আলোতে ফুটে উঠ্‌ছে এই দেখতে তার ঔৎসুক্যের সীমা নেই। প্রতিদিন ঝুঁকে পড়ে পড়ে, তাদেরকে যেন জিজ্ঞাসা করে, তারপরে ? তারপরে ? তারপরে ? তারা ওর চির-অসমাপ্ত গল্প। সদ্য-গজিয়ে ওঠা কচি কচি পাতা, তাদের সঙ্গে ওর কী যে একটা রহস্যভাব তা ও কেমন করে প্রকাশ করবে ? তারাও ওকে কী একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার জন্য আঁকুপাঁকু করে। হয়তো বলে, 'তোমার নাম কী'। হয়তো বলে, 'তোমার মা কোথায় গেল'। বলাই মনে মনে উত্তর করে, 'আমার মা তো নেই'।

এই ছেলেটির আসল বয়স সেই কোটি বৎসর আগেকার দিনে, যেদিন সমুদ্রের গর্ভ থেকে নতুন জাগা পঙ্কস্তরের মধ্যে পৃথিবীর ভাবী অরণ্য আপনার জন্মের প্রথম ক্রন্দন উঠিয়েছে—যেদিন পশু নেই, জীবনের কলরব নেই, চারিদিকে পাথর আর পাঁক আর জল। কালের পথে সমস্ত জীবের অগ্রগামী গাছ, সূর্যের দিকে জোড় হাত তুলে বলেছে, 'আমি থাকব, আমি বাঁচবো, আমি চিরপথিক, মৃত্যুর পর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অন্তহীন প্রাণের বিকাশতীর্থে যাত্রা করব রৌদ্রে-বাদলে, দিনে-রাত্রে। গাছের সেই রব আজও উঠছে বনে বনে, পর্বতে প্রান্তরে, তাদেরই শাখায় পত্রে ধরণীর প্রাণ বলে উঠছে, 'আমি থাকব, আমি থাকব'। বিশ্বপ্রাণের মূকধাত্রী এই গাছ নিরবচ্ছিন্ন কাল ধরে দ্যুলোককে দোহন করে ; পৃথিবীর অমৃতভাণ্ডারের জন্যে তেজ, প্রাণের রস, প্রাণের লাবণ্য সঞ্চয় করে ; আর উৎকণ্ঠিত প্রাণের বাণীকে অহর্নিশি আকাশে উচ্ছ্বসিত করে তোলে, 'আমি থাকব'। সেই বিশ্বপ্রাণের বাণী কেমন এক রকম করে আপনার রক্তের মধ্যে শুনতে পেয়েছিল ওই বলাই। আমরা তাই নিয়ে খুব হেসেছিলুম।

নিছক সাংসারিকতার বস্তু নিয়ে বড়াই করি আমরা—বলাই-এর এই বৃক্ষের মারফৎ 'বিশ্বপ্রাণের বাণী শুনার' ব্যাপারটা লইয়া আমরাও যে হাসিব না, তা বলা যায় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পাঠকবর্গ অবশ্যই জানেন, বলাই-এর এই বৃক্ষবাণীই কবির 'মেসেজ্', কবির বিশ্ববাণী :

আমি থাকব
আমি বাঁচব,—
মৃত্যুর পর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে
অন্তহীন প্রাণের বিকাশতীর্থে
যাত্রা করব রৌদ্রে বাদলে
দিনে রাত্রে।

বনবাণী পর্যন্ত আমরা কবির 'অন্তহীন প্রাণের বিকাশতীর্থে যাত্রা করার' বাণীই তো শুনিয়া আসিতেছি। প্রাণের মধ্যে প্রেম ভর করিয়া আছে বলিয়া প্রাণ বৈরাগী, অল্পতে তাহার তৃপ্তি নাই—সে চিরপথিক। মৃত্যুর মধ্য দিয়া নব নব প্রাণের বিকাশ-তীর্থে সে চলিতেছে। বস্তুদৃষ্টিতে আমরা আসা-যাওয়া যাওয়া-আসা দুই পৃথক রূপ দেখিতেছি। কিন্তু ধীরভাবে দেখিবার চেষ্টা করিলেই বুঝা যায়, আসাও চলা, যাওয়াও চলা। যাইবার জন্য যখন আসি, তখন সেই 'আসা' চলা, আবার আসিবার জন্য যখন যাই, তখন সেই 'যাওয়া' চলা। বস্তুতঃ কোথাও ঠেক খাইবার, আটকাইয়া পড়িবার, আসক্ত হইবার জন্য আসা নয়, যাওয়া নয়—নিত্যকালের চলার বাণীই বিশ্ববাণী—বিশ্বপ্রাণের বাণী। চলার মধ্যে নিত্য বাঁচিয়া থাকার অর্থই হইতেছে বিশ্বপ্রাণের নিত্যযাত্রা। এই যাত্রা, এই চলা যেখানে শেষ হইয়াছে জগতে সেখানে থাকা নাই, বাঁচাও নাই।

আমি থাকব, আমি বাঁচব,—
আমি চিরপথিক।

থাকা ও চলা এই ভাব দুইটি বাহ্যতঃ পরস্পর বিরোধী বলিয়া মনে হইতে পারে। ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

বস্তুতঃ আমি থাকি কখন? কোন্ থাকাটা ঠিক ঠিক চলার বাণী বহন করে? 'পৃথিবীর অমৃত ভাণ্ডারের জন্য যখন তেজ, প্রাণের রস, প্রাণের লাবণ্য সঞ্চয় করি অর্থাৎ যখন মানবিকতার মাহাত্ম্যবিকাশে যত্নবান হই ধর্মে, কর্মে, ত্যাগে, সেবায়, তখনই থাকি, তখনই বাঁচি। 'আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া পলে পলে' ঘুরিতে থাকাটা থাকা নহে; 'যো বৈ ভূমা তৎসুখং' বলিয়া 'অন্তহীন প্রাণের বিকাশতীর্থে' চলার জন্য থাকাটাই থাকা।

'আমি থাকব'—এই অংশে প্রেম, অর্থাৎ দানের মাহাত্ম্য। 'Life is given to us; we earn it by giving it' (Stray Birds)—যত দান করি, তত থাকি। অন্ন দান করি, প্রাণ দান করি, বিদ্যা দান করি, জ্ঞান দান করি, মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাই নানাভাবে, এই থাকা, এই প্রেম।

'আমি চির পথিক'—এই অংশে বৈরাগ্য, অর্থাৎ যত থাকি, দানের দ্বারা যত আত্মবিকাশ ঘটাই, তাতেও তৃপ্তি হয় না, আরো তাই বিকাশ চাই, মৃত্যুর পর মৃত্যুর মধ্য দিয়া অহরহঃ চলিতে চাই, 'চাইতে চাই' (তাসের দেশ)—তাই বৈরাগ্য।

প্রেম ও বৈরাগ্য, থাকা ও চলা, এই দুইকে লইয়া সর্বজগদ্গত সেই ধ্রুব প্রেম। 'এ দুয়ের মাঝে' এই ধ্রুবই হইতেছে পরম 'মিল'। এই পরমকে পাইলেই গতির শেষ, দ্বন্দ্বের শেষ, চরম শান্তি। কিন্তু রবীন্দ্রদর্শনে পরমকে পূর্ণভাবে পাওয়ার কথা তো নাই—তাই দ্বন্দ্ব, তাই গতি, তাই বৈরাগ্যের টানে প্রাণ চিরপথিক :

অন্তহীন প্রাণের বিকাশতীর্থে
যাত্রা করব রৌদ্রে বাদলে
দিনে রাত্রে।

বালক 'বলাই' এর এই বৃক্ষ-বাণীই বনবাণীর মর্মবাণী। বনবাণীর তত্ত্বমর্ম নিম্নলিখিত এই পংক্তি কয়টিতে চমৎকারভাবে ধরা পড়িয়াছে :

প্রাণতীর্থে চলো, মৃত্যু করো জয় শ্রান্তিক্লান্তিহীন। [নারিকেল]

অন্তরের নিগূঢ় গভীরে
ফুল ফুটাবার ধ্যানে নিবিষ্ট রয়েছ উচ্চশিরে ;
চৌদিকের চঞ্চলতা পশে না সেথায়। [শাল]

যে জীবন
মরণতোরণদ্বার বারম্বার করি উত্তরণ
যাত্রা করে যুগে যুগে অনন্ত কালের তীর্থপথে
নব নব পান্থশালে বিচিত্র নূতন দেহরথে,
তাহারি বিজয়ধ্বজা উড়াইলে নিঃশঙ্ক গৌরবে
অজ্ঞাতের সম্মুখে দাঁড়ায়ে। [বৃক্ষ বন্দনা]

তোমারে করিবে বন্দী নিত্যকাল মৃত্তিকাশৃঙ্খলে
শক্তি আছে কার ?
ইচ্ছায় বন্ধন লও, সে বন্ধন ইন্দ্রজালবলে
কর অলংকার। [বসন্ত]

বনবাণীর এই পংক্তিগুলিতে কবির যে মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে, 'পরিশেষ' কাব্যে কবিগুরু সেই মনোভাবই নূতন ঢঙে ও রঙে চিত্রিত করিয়াছেন। কল্পনা করিলে মন্দ হয় না যে, পরিশেষে অর্থাৎ জীবনকাব্যের উপসংহারে কবিগুরু যেন স্পষ্ট করিয়াই আমাদের জানাইতেছেন: মৃত্যুকে জয় করিতে আসাই জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ। চলো প্রাণতীর্থে, মৃত্যু করো জয়। ফুলের মত ফুটাইয়া তোলো আপনার জীবন; নিবিষ্ট হও ফুল ফুটানোর ধ্যানে—বস্তুপৃথিবীর কোনো চাঞ্চল্যে বা চাতুর্যে হইয়ো না প্রভাবিত। আলস্য নহে, বিলাস নহে, বিশ্রাম নহে, অবিশ্রাম গতিই তোমার জীবন: গতিভরে মরণতোরণ-দ্বার হও পার, আসক্ত বদ্ধ রহিয়ো না কোথাও, বিশ্বাস করো এই সত্য—বন্দী তুমি হইবার নহ, মুক্ত তুমি চলমান জীবনে।

জীবনকাব্যের 'উপসংহারে' তত্ত্বভাব অত্যন্ত প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। 'পরিশেষ' কাব্যটিকে আমি রবীন্দ্র-জীবন-কাব্যের উপসংহার বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছি, কেন না তত্ত্বের দিক দিয়া পরিশেষ কাব্যই কবিগুরুর সর্বশেষ কথার ধারক ও বাহক বলিয়া আমার ধারণা হইয়াছে। পরিশেষের পরবর্তী কাব্যনিচয় রবীন্দ্রজীবনকাব্যের পরিশিষ্ট নামে অভিহিত করিলে বিশেষ অন্যায় করা হয় বলিয়া মনে করি না। এই 'পরিশিষ্ট' অংশে, অর্থাৎ 'পুনশ্চ' হইতে 'শেষলেখা' পর্যন্ত রচনায় রবীন্দ্রতত্ত্ব-ভাব মধ্যে মধ্যে কাব্যের আনন্দরূপের আড়ালে আত্মগোপন করিয়াছে বটে, কিন্তু সে আত্মগোপনতা একান্তভাবেই ক্ষণিক এবং সাময়িক বলা যায়। 'প্রান্তিক' হইতে 'শেষ-লেখা' রবীন্দ্র-জীবনদর্শনের ছন্দোবদ্ধ তত্ত্ববাক্য। যে-তত্ত্ব আমি সূচনা হইতেই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছি, যে তত্ত্বভাব এতদিন কাব্যের খাতিরে আভাসে-ইঙ্গিতে এবং আলংকারিক চারুত্বের আনন্দেই কবি প্রকাশ করিতেছিলেন, শেষ বয়সের রচনাবলীতে সেই তত্ত্বভাবই দার্শনিক দিব্যতার ঔজ্জ্বল্যে অনাড়ম্বর শ্রী ও শুভ্রতার রূপ ধারণ করিয়াছে।

পরিশেষ

পরিশেষ কাব্যে স্পষ্টতঃই বলা হইয়াছে যে, আমি, এই মানবাত্মা, অখণ্ডসত্তার আনন্দ-প্রকাশ। আমি অশেষ, আমি অনন্ত, আমি অজেয়, আমি মৃত্যুঞ্জয়। যে বিশেষ আমি টিতে আমি আছি বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহা অপূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু অপূর্ণ হইতেই তো আপন বৃহৎ সত্তার দর্শন মিলিয়াছে,—বুঝিয়াছি, আমি অখণ্ড; বুঝিয়াছি, আমি অখণ্ড ও সর্বজগদ্‌গত বলিয়াই থামায় সুখ নাই, চলায় সুখ, অল্পে সুখ নাই, ভূমায় সুখ। এই ভূমাশ্রয়ী সর্বত্রগামী 'বড়ো আমি'কে কে বাঁধিবে, কে মারিবে?

মহাকাল যাহাকে বাঁধে বা হনন করে, সে কি এই আমি? সে তো 'ছোট আমি'। শোকে ভয়ে তাহার মৃত্যু; লোভে ঈর্ষায় তাহার মৃত্যু; আলস্যে কার্পণ্যে তাহার মৃত্যু; ছোট আমির এই সমস্ত অজস্র মৃত্যুর মধ্য দিয়া অখণ্ড বড়ো আমিটি অমৃতের পথ ঠিক বাছিয়া লয়। গূঢ়ার্থ এই: ছোট আমির শোকভয়াদি হইতে ঊর্ধ্বে উঠার সাধনাই তো অখণ্ড বড়ো আমির সাধনা। মানুষের জীবনে এই সাধনাই তো মুক্তি। মুক্তি আর কাহাকে বলে?

সাধুসন্তদের কোন্ ধর্মসাধনায় চরম মুক্তি মেলে—মুক্তি অর্থে ঠিক কী বুঝায়—এসব লইয়া বৃথা তর্কে বা বাদবিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া লাভ নাই। পরিশেষের তত্ত্ব এই: অখণ্ড আমিকে বাক্যে, ব্যবহারে, ত্যাগে, সেবায়, মহত্ত্বে, সৌহার্দ্যে, প্রেমে, বৈরাগ্যে বিকশিত করার সাধনাই মুক্তি। এই মুক্তির সাধকদল যুগে যুগে আবির্ভূত হন মানবদেহেই। দৈববাণীর মত অনির্বচনীয় ধ্যানব্যঞ্জনায় মহিমময় তাঁহারা। তাঁহাদের দেখিয়াই স্পষ্ট উপলব্ধি হয়, মানবাত্মা সর্বযুগের ও সর্বজাতির; মানবাত্মা অখণ্ড এবং এই কারণে মৃত্যুঞ্জয়।

বনবাণী প্রকৃতিপ্রেমের কাব্য, পরিশেষ জীবনপ্রেমের কাব্য। কিন্তু পাঠক স্পষ্টই দেখিতে পাইবেন তত্ত্বতঃ এই দুই কাব্য এক সত্যেরই নির্দেশ দিতেছে। প্রকৃতি জীবনকে বদ্ধ করিতেছে না, বরং সৌন্দর্য, ত্যাগ ও আনন্দের শিক্ষায় জীবনকে দিতেছে মুক্তি; আবার মুক্ত জীবনের দৃষ্টির আলোকে প্রকৃতি রূপের সীমাতেই শুধু থাকিয়া যাইতেছে না, পরন্তু অরূপের অনির্বচনীয় সৌন্দর্যবিভায় ঝলমল করিয়া উঠিতেছে। প্রকৃতি জীবনকে বৃহৎ ধ্যানে টান দিতেছে, জীবন প্রকৃতিকে অরূপলোকে স্থান দিতেছে—অহরহঃ দান-প্রদানের মহান ভাবপ্রবাহে বিরাট হইতে ভাসিয়া আসা সর্বজগদ্গত যে অখণ্ড মন, তাহারি দৃষ্টিতে প্রকৃতি ও জীবন অখণ্ড সত্তা বলিয়া হইতেছে প্রতীয়মান। বনবাণী কাব্যে কবি প্রকৃতির বক্ষে প্রাণের যে লীলাপ্রকাশ লক্ষ্য করিয়াছেন, পরিশেষ কাব্যে জীবনের পটভূমিকায় সেই প্রাণের আনন্দলীলাই বিকশিত হইতে দেখিয়াছেন। পরিশেষের 'প্রণাম' নামক কবিতায় কবি বলিতেছেন যে, প্রকৃতির নব-নব রূপদর্শনে জীবনে যে প্রেরণা জাগিয়াছে, বিচিত্রের যে রূপোপলব্ধি হইয়াছে, 'বাঁশরি'তে তিনি তাহারি সুর সাধিয়া জীবনকৃত্য করিয়াছেন সমাপন:

ধরণীর অন্তঃপুরে
রবিরশ্মি নামে যবে, তৃণে তৃণে অঙ্কুরে অঙ্কুরে
যে নিঃশব্দ হুলুধ্বনি দূরে দূরে যায় বিস্তারিয়া
ধূসর যবনি-অন্তরালে, তারে দিনু উৎসারিয়া
এ বাঁশির রন্ধ্রে রন্ধ্রে; যে বিরাট গূঢ় অনুভবে
রজনীর অঙ্গুলিতে অক্ষমালা ফিরিছে নীরবে
আলোকবন্দনামন্ত্র জপে—আমার বাঁশিরে রাখি

আপন বক্ষের 'পরে, তারে আমি পেয়েছি একাকী
হৃদয়কম্পনে মম ; যে বন্দী গোপন গন্ধখানি
কিশোর কোরক মাঝে স্বপ্নস্বর্গে ফিরিছে সন্ধানি
পূজার নৈবেদ্যডালি, সংশয়িত তাহার বেদনা
সংগ্রহ করেছে গানে আমার বাঁশরি কলস্বনা। [প্রণাম]

অর্থাৎ, রূপের অন্তরালে যে অরূপরহস্যের আনন্দলীলা অবিরাম সংঘটিত হইতেছে, কবি তাহা গানে ও সুরে দিয়াছেন প্রকাশ করিয়া। তা' যেন হইল, কিন্তু তাহাতে লাভ হইয়াছে কী ? না, লাভ হইয়াছে এই, অরূপের এই রূপোপলব্ধি ও রূপপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কবিরও ঘটিয়াছে আত্মোপলব্ধি, মানসমুক্তি। প্রকৃতির বিচিত্র লীলাছন্দের তালে তাল রাখিয়া যত তিনি চলিয়াছেন, ততই তাঁহার বিচিত্রোপাসক চিত্তের বিপুল বিস্তার ঘটিয়া গেছে। এই বিস্তার, এই প্রকাশ, এই বন্ধনমুক্তিই রবীন্দ্রদর্শনের 'মহামুক্তি'। এই মুক্তির দৃষ্টিতে জীবাত্মা ও প্রকৃতি এক ও অদ্বিতীয় সত্তার দুইটি স্বতন্ত্র রূপ মাত্র। শক্তির উৎস এই প্রকৃতি, শক্তিকে উপলব্ধি করিয়া প্রেম গাহিবার ক্ষেত্র এই মানবপ্রাণ। প্রকৃতি শক্তি, মানব প্রেম। দুই মিলিয়া জীবনলীলা, সর্বজগদ্‌গত প্রেমাভিমুখী ভাব জীবনের, অর্থাৎ অখণ্ড আমি-জীবনের, অনন্ত লীলা।

এই অখণ্ড আমি-জীবনের উপলব্ধি 'আমি' নামক কবিতায় অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় অভিব্যক্ত হইয়াছে।

এই আমি যুগে যুগান্তরে
কত মূর্তি ধরে
কত নামে কত জন্ম কত মৃত্যু করে পারাপার
কত বারংবার।
ভূত ভবিষ্যৎ লয়ে যে-বিরাট অখণ্ড বিরাজে
সে মানব-মাঝে
নিভৃতে দেখিব আজি এ আমিরে,
সর্বত্রগামীরে। [আমি]

সর্বত্রগামী এই মৃত্যুঞ্জয় আমিদেব সর্বযুগের, সর্বদেশের, সর্বজাতির সর্ব-আমির মধ্যে আছেন বিরাজিত। ইনি শুদ্ধমাত্র কবিকল্পনা নহেন, অথবা দার্শনিক ধ্যানের অধিদেবতা নহেন। খণ্ড-আমির মধ্যে ইহার প্রকাশ যদি না হইত তবে ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবিশ্বাস করা অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হইত না। বস্তুতঃ যে অংশে খণ্ড-আমি সর্বের জন্য, বিশ্বের জন্য সাধনতৎপর, সেই অংশে খণ্ড-আমি কি অখণ্ড আমিরই প্রতিভূ নহে ? যাঁহাদের আমরা মহাত্মা বলি, মহামানব বলি, তাঁহাদের জীবনে ও চরিত্রে কি সর্বযুগীন বিশ্বভূমিন এই অখণ্ড-আমিত্ব লক্ষ্য করি না ? সকলের জন্য যিনি, সকল

জাতির যিনি সম্পদস্বরূপ, যিনি আত্মীয় ও আপনার জন, দেশ ও কাল যাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রকাশকে সীমার মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারে না—তাঁহার চরিত্রই তো সর্বব্যাপী অখণ্ড-আমির অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস দেয় জন্মাইয়া। খণ্ডজীবনে পরাভব আছে, লজ্জা আছে, ভয়ও আছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল ত্যাগব্রতী সদাব্রতী মহাত্মার দলও তো আছেন যাঁহাদের কার্যে, ধর্মে, স্বপ্নে ও জীবনে অসীমের জয় হয় ধ্বনিত।

যাঁহারা মানুষরূপে দৈববাণী অনির্বচনীয়
তাঁহাদের জেনেছি আত্মীয়।
কতবার পরাভব, কতবার কত লজ্জা ভয়,
তবু কণ্ঠে ধ্বনিয়াছে অসীমের জয়।
অসম্পূর্ণ সাধনায় ক্ষণে ক্ষণে ক্রন্দিত আত্মার
খুলে গেছে অবরুদ্ধ দ্বার।

লভিয়াছি জীবলোকে মানবজন্মের অধিকার
ধন্য এই সৌভাগ্য আমার।
যেথা যে-অমৃতধারা উৎসারিল যুগে যুগান্তরে
জ্ঞানে কর্মে ভাবে, জানি সে আমারি তরে।
পূর্ণের যে-কোনো ছবি মোর প্রাণে উঠেছে উজ্জ্বলি
জানি তাহা সকলের বলি। [বর্ষশেষ]

খণ্ড-জীবনের মধ্য দিয়া বিশ্বের সকলের জন্য যাহা প্রকাশিত হয়, তাহাই পূর্ণের আভাস আনিয়া দেয়। এই আভাস হইতেই অনুমান জন্মে, বিশ্বাস জন্মে যে, বৃহত্তম অখণ্ড সেই আনন্দ-আমিটি আমার মধ্যেও আছেন। তাঁহারি ইঙ্গিতে, তাঁহারি আকর্ষণে এই আমার খণ্ড-আমি বৃহতের সাধনায় নিত্যকাল ব্যাপৃত রহিয়াছে। অখণ্ড দৃষ্টিতে তিনিই আমি; খণ্ডদৃষ্টিতে আমি তাঁহার উপাসক, কায়েনমনসাবাচা তাঁহাকে, সেই আমার সর্বানুভূ অখণ্ড-আমিকে, চরিত্রে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছি। এই যে আমার সর্বানুভূ অখণ্ড-আমি—ইনি তো পরমমানব, শিবমানব; ইনিই জীবনদেবতা, প্রেমব্রহ্ম; ইনিই আত্মা, আত্মার আত্মীয়। মানব আপন জীবনে ইঁহাকেই পুনঃ পুনঃ চেষ্টার দ্বারা, অহরহঃ তপস্যার দ্বারা, প্রকাশ করিতে চাহিতেছে, অর্থাৎ খণ্ড-আমি ত্যাগের সাধনায় প্রেমের সাধনায়, পৌরুষের সাধনায়, মহত্বের সাধনায় মৃত্যুঞ্জয় এই সর্বত্রগামী আমির মাহাত্ম্যে প্রকাশিত হইতে চাহিতেছে। 'হওয়া' শেষ হয় নাই, তাই 'চলা', অর্থাৎ অখণ্ডের সমস্ত গুণ ও মাহাত্ম্য খণ্ডে প্রকাশিত হয় নাই, তাই অহরহঃ খণ্ড হইতে অন্য খণ্ডে, ভাব হইতে অন্য ভাবে, জন্ম হইতে অন্য জন্মে অবিশ্রাম গতাগতি চলিতেছে। এই চলাই আমির সাধনা, অনন্ত সাধনা।

খণ্ডজীবনে অখণ্ডকে পূর্ণভাবে কখনই পাওয়া সম্ভব নয়। খণ্ডজীবনে অসম্পূর্ণতা থাকেই, আত্মা তাই নানা দুঃখে, নানা দ্বন্দ্বে, নানা বিড়ম্বনায় কাঁদে; অনেক সময় খণ্ডের লজ্জাকর সংকীর্ণতাও আচ্ছন্ন করে, অন্ধকার করে অমল আত্মা। কিন্তু যখনই সম্মুখে দেখি অখণ্ডের মহিমাধারী অমর মহাত্মাদের, যখনই অখণ্ডের ভাবগৌরব ও ভাবসম্পদ লইয়া খণ্ডরূপে তাঁহারা ধরার দ্বারে আসেন, বাঁচার মন্ত্র দেন কানে,—তুচ্ছ যে নহি, এই সত্য জাগাইয়া যান অন্তরে—তখনই নূতন প্রেরণায় প্রভাসিত হয় চিত্ত, সান্ত্বনা জাগে হৃদয়ে, বুঝিতে পারি, মানবিকতার মাহাত্ম্য-তিলক আছে আমারও ললাটে; তখন বড়ই শ্রদ্ধা জাগে জীবনের অস্তিত্বে, প্রেম জাগে হৃদয়ের আনন্দে।

তার পর হতে
এ ভঙ্গুর পাত্রখানি প্রতিদিন উষার আলোতে
নানা বর্ণে আঁকি,
নানা চিত্ররেখা দিয়ে মাটি তার ঢাকি। [জলপাত্র]

খণ্ড-আমির জীবন যতই তুচ্ছ হউক, প্রেমসুন্দর সর্বসাধকদের জীবনপ্রেরণায় বোধের যখন উদ্বোধন হয়, তখন তুচ্ছ এই খণ্ডজীবনটিকেই নানা মহত্ত্বের গুণে চেষ্টা করি বিভূষিত করিতে। মৃত্যুহীন বহুতর সাধনার রঙে রঞ্জিত করি জীবনের ভঙ্গুর পাত্রখানি—প্রেম-চেতনার বহু চিত্র-রেখায় ঢাকিয়া দিই মাটির অর্থাৎ বস্তুগত খণ্ডজীবনের দ্বন্দ্ববেদনা; সৌন্দর্যের শতদলের মত প্রমুদিতে থাকি অন্তর্জীবন, খণ্ডের অন্তরে অখণ্ডের বিশ্বপ্রেরণা করি অনুভব।

পরিশেষের 'জলপাত্র' কবিতাটির কাব্যসৌন্দর্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়, কিন্তু তত্ত্বসৌন্দর্যও উপেক্ষণীয় নয়। মহাত্মাদের প্রেমপ্রেরণায় জীবনচেতনার রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া যায়, খণ্ডজীবনেই উদ্বোধিত হয় অখণ্ড আত্মার আনন্দ—এই বাণীই 'জলপাত্রের' বাণী। দোষত্রুটিপূর্ণ দৈনন্দিন আটপৌরে জীবনে, সমাজসংস্কারাচ্ছন্ন প্রাত্যহিক কুণ্ঠিত জীবনে মৃত্যুঞ্জয় আমি-সাধকদের আলো যখন পতিত হয়, তখন এমনি করিয়াই অবরুদ্ধ দ্বার যায় খুলিয়া।

হে দুয়ার, তুমি আছ মুক্ত অনুক্ষণ,
রুদ্ধ শুধু অন্ধের নয়ন।
অন্তরে কী আছে তাহা বোঝে না সে, তাই
প্রবেশিতে সংশয় সদাই। [দুয়ার]

প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্র বাসনা, ক্ষুদ্র সংশয়, তুচ্ছ চাতুর্য লইয়াই যাহারা ব্যতিব্যস্ত, বৃহত্তর জীবনের দ্বার রুদ্ধ থাকে তাহাদেরি কাছে। তাহারাই অখণ্ডজীবনের আলো দেখিতে পায় না, অখণ্ড-জীবন-সাধক মহাত্মাদের প্রকাশ তাহাদেরি নিকট হয় ব্যর্থ

মহাত্মারা আর কী? তাঁহারা তো মানবিক মাহাত্ম্যবোধের এক একটি ভাস্বর চেতনা, এক একটি প্রেরণাদায়িনী বিশাল 'আইডিয়া'। অনন্তজীবনের ইঙ্গিতের মত তাঁহারা জীবনদেবতার প্রত্যক্ষ প্রকাশ, অখণ্ডসুরের তাঁহারা অন্তহীন প্রাণমূর্ছনা, আনন্দভাবসংকল্পের অনির্বাণ আত্মশক্তি। এই আত্মশক্তি তাঁহাদের জীবনকাল হইতে সূর্যের ন্যায় দ্যুতি প্রকাশ করে বলিয়া জগৎকে তাঁহারা আলোকিত করেন, জীবনকে করেন মহিমময়। প্রাত্যহিক বন্দী জীবনে দুঃখ আছে, শোক আছে, লোভ আছে, অপূর্ণতা ও অতৃপ্তি আছে তবু ইহাদের সুর যখন জীবন দিয়া শুনা যায় তখন সান্ত্বনা লাভে বঞ্চিত হইতে হয় না। বস্তুতঃ খণ্ডজীবনে একটা দিক অবশ্যই আছে, যেখানে আমরা জীবনবিকাশের সুর শুনি, গভীরতম নৈরাশ্যের মধ্যেও আশার আলো দেখিতে পাই। মহাত্মারা এই আশার আলো দেখাইয়া জীবমানবকে সাহায্য করেন—তাঁহারা চক্ষুর চক্ষু হইয়া মানুষের দৃষ্টিশক্তি করিয়া দেন দ্বিগুণ, চতুর্গুণ,—জীবনের যে মুক্তদ্বার মানুষের জন্য নিত্যকাল অপেক্ষা করিয়া আছে তাহার পানে দৃষ্টি দেন ফিরাইয়া। এতৎসত্ত্বেও যাহারা আসক্তির গুপ্ত প্রেমে রহে আচ্ছন্ন—মহাত্মার বাণীর আলোকেও যাহাদের অন্তর্দৃষ্টি হয় না উন্মুক্ত —বৃহত্তর জীবনকে তাহারা জানিতে পারে না কোনোদিন। মোহের বন্ধ করা খাঁচাটিকে তাহারা জীবন মনে করে, ক্ষুদ্র লোভ, ক্ষুদ্র লিপ্সা, ক্ষুদ্র সুখ স্বাচ্ছন্দ্য লইয়াই তাহারা রহে প্রমত্ত। বিশ্ব হইতে নিজেদের গুটাইয়া লইয়া আপন স্বার্থবিবরে সংকীর্ণ সরীসৃপের মত টিকিয়া থাকাটাকেই তাহারা বাঁচিয়া থাকা বলিয়া মনে করে। ইহাই 'ছোট-আমিত্ব', ইহাই অহং-এর অনাচার। ইহা হইতে বৈরাগ্যই প্রেম, ইহা হইতে দূরে সরাই মুক্তি।

> আপনার কাছ হতে বহুদূরে পালাবার লাগি
> হে সুন্দর হে অলক্ষ্য, তোমার প্রসাদ আমি মাগি,
> তোমার আহ্বান বাণী। [মুক্তি]

পাঠক এই পংক্তিকয়টিকে পলাতক মনোবৃত্তির উদাহরণরূপে গ্রহণ করিতেছেন কি না আমি জানি না। রবীন্দ্রনাথের মুক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করিলে পলায়নীবৃত্তির কোনো ইঙ্গিতই পংক্তি কয়টির মধ্যে আছে বলিয়া বোধ হইবে না। 'আপনার কাছ হতে'— অর্থাৎ এই খণ্ড ক্ষুদ্র দোষত্রুটিবহুল বস্তু-আমির বন্ধন হইতে বহুদূরে, কি না ত্যাগের মহত্ত্বে, দুঃখের আনন্দে, শৌর্যের প্রকাশে, প্রেমের বৈরাগ্যে, আমি যাইতে চাহি। দার্শনিক বলিয়াছেন যে, 'যে ব্যক্তি আপনাকে ছাড়িয়া সংসারের মধ্যস্থলে নিজের শুভকার্য স্থাপন করে, সে স্থায়ী ভিত্তির উপরে নিজের মঙ্গল সংকল্প প্রতিষ্ঠা করে'। [চারিত্রপূজা] কবি বলিতেছেন, তাই হে সুন্দর, অহং হইতে বৃহত্তর জীবনের আদর্শে প্রকাশ যাহাতে পাইতে পারি সেই আশীর্বাদ করো আমাকে। এই যে মহতী বাণী, ইহা কি জীবন হইতে পলায়নের বাণী? ত্যাগের দ্বারা মহিমময় সুন্দর জীবনকে উচ্চতর ভোগের আদর্শে

দীক্ষিত করার ব্যঞ্জনা কি নাই ইহার মধ্যে? ব্যক্তিগত কামনার চরিতার্থতার দ্বারা জীবন ভোগই ভোগ, সেই ভোগ হইতে আনন্দভরে উত্তীর্ণ হইয়া বৃহত্তর জীবনলাভের সংকল্পে যে ভোগ নিহিত আছে, তাহা কি জীবনভোগ হইতে বহির্ভূত? 'মুক্তি পেতে হবে, মুক্তি দিতে হবে' (মানুষের ধর্ম, পৃ. ৭২) ইহাই তাঁহার লক্ষ্য বটে, কিন্তু তাঁহার মুক্তি-কল্পনায় মহত্তর জীবনভোগের যে ইঙ্গিত আছে, তাহা ধরিতে পারিলে আর তাঁহাকে 'এস্‌কেপিস্ট' বলিয়া ভ্রম হইবে না। সংকীর্ণ স্বার্থসুখ হইতে মুক্তি, প্রাত্যহিক জীবনের পতন-স্খলন হইতে মুক্তি, লোভের বা ক্ষোভের বিক্ষেপবেগ হইতে মুক্তি—ইহাই তো তাঁহার সাধনা, তাঁহার প্রার্থনা।

আমারে সাহস দাও, দাও শক্তি, হে চিরসুন্দর,
দাও স্বচ্ছ তৃপ্তির আকাশ, দাও মুক্তি নিরন্তর
প্রত্যহের ধূলিলিপ্ত চরণপতনপীড়া হতে,
দিয়ো না ডুলিতে মোরে তরঙ্গিত মুহূর্তের স্রোতে,
ক্ষোভের বিক্ষেপবেগে। [মুক্তি]

এই অপূর্ব প্রার্থনা জীবন হইতে পলাইবার প্রার্থনা নহে, জীবনকে নবতম মহত্ত্বের ঐশ্বর্যে উদ্দীপ্ত করিবার ধ্বনিই তো আস্বাদন করি এই প্রার্থনায়। লোভ কাম চরিতার্থতার মধ্যে আস্বাদন করি যে আনন্দ, লোভ বা কামকে দমন করিয়া ঠিক সেই আনন্দ না পাইতে পারি, কিন্তু যে আনন্দ পাই, তাহা লোভী বা কামীজনের কাছে অসম্ভব বা অবাস্তব বলিয়া মনে হইলেও সত্যসত্যই তাহা অসম্ভব বা অবাস্তব নহে। ঠিক এইরূপে ব্যক্তিগত সুখতৃপ্তির মধ্যে ভোগের যে বসন্তানন্দ আছে, বিশ্বগত মঙ্গলের অভিলাষে ব্যক্তিগত ত্যাগের কল্পনায় ঠিক সেই আনন্দ অবশ্যই নাই,—কিন্তু বিশ্বের জন্য, সকলের জন্য প্রাণ যাঁহার ব্যাকুল, তিনিই জানেন ব্যক্তিগত সুখপ্রেমের মোহই 'এস্‌কেপিজম্'—কেন না বিশ্ব হইতে, বৃহৎ হইতে নিজেকে গুটাইয়া লইয়া অন্ধ জৈবশক্তির বাসক-সজ্জাভিমুখে সেই তো হইতে চাহে পলাতক।

দার্শনিক বলিতেছেন :

'যিনি পরম আমি, যিনি সকলের আমি, সেই আমিকেই আমার বলে সকলের মধ্যে জানা যে পরিমাণে আমাদের জীবনে, আমাদের সমাজে উপলব্ধ হচ্ছে, সেই পরিমাণেই আমরা সত্য মানুষ হয়ে উঠছি। মানুষের রিপু মাঝখানে এসে সোহহম্ উপলব্ধিকে দুই ভাগ করে দেয়, একান্ত হয়ে ওঠে অহম্।' [মানুষের ধর্ম]

এই 'অহম্' হইতে মুক্তিই রবীন্দ্রনাথের মুক্তি। এই মুক্তিতেই মানবিকতার মাহাত্ম্য-ভোগ সম্ভব।

'অহংকারকে, ভোগাসক্তিকে উত্তীর্ণ হবে তার প্রেম, তবেই বিশ্বগত আত্মীয়তায় মানুষ হবে মহাত্মা। মানুষের একটা স্বভাবে আবরণ, অন্য স্বভাবে মুক্তি।' [তদেব]

স্বভাবকে স্বভাব দ্বারাই মুক্ত করিতে হইবে, 'আপনার কাছ হতে বহুদূরে' পলাইতে হইবে, সহজ স্বভাবকে টানিয়া তুলিতে হইবে সাধনস্বভাবের আনন্দে—ইহাই মাহাত্ম্য, ইহাই পুরুষার্থ, ইহাই মুক্তি। মহাত্মা যাঁহাদের বলি, 'যাঁহারা মানুষরূপে দৈববাণী অনির্বচনীয়'—তাঁহারা অহং হইতে, খণ্ড আমি হইতে পরম আমিতে অর্থাৎ বিশ্বজগদ্‌গত অখণ্ড আমি-বোধে, স্বভাবকে উচ্ছিন্ন করিয়া নহে, স্বভাবকে রূপান্তরিত করিয়াই, আনন্দে উত্তীর্ণ হন। সাধন স্বভাবের এই উপলব্ধি-তত্ত্বই রাবীন্দ্রিক সোঽহম্-তত্ত্ব, অখণ্ড আমি-তত্ত্ব, মুক্তিতত্ত্ব। ইহা ছাড়া স্বভাব-বহির্ভূত অন্য কোনো তত্ত্ব যদি থাকে, দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ তাহা কদাচ বিশ্বাস করিবেন না। যদি করিতেন, একটি পংক্তিও যদি তাহার স্বপক্ষে কোথাও লিখিয়া যাইতেন, তবে তাঁহার কবি ও দার্শনিকের অভিন্নত্ব প্রমাণে অবশ্যই আমরা অকৃতকার্য হইতাম। সুখের বিষয়, তিনি জীবনের কবি, জীবনেরি তিনি দার্শনিক। কবি হিসাবে জীবনের গান গাহিয়া দার্শনিক হিসাবে জীবনবহির্ভূত কোনো তত্ত্বসত্য তিনি যদি প্রচার করিতেন, তবে বর্তমান প্রবন্ধ লেখককে দ্বিধায় ও দ্বন্দ্বে অবশ্যই পড়িতে হইত। ধারণাতীত স্বভাব-বহির্ভূত অবাঙ্‌মনসগোচর কোনো মুক্তির ধ্যান তো তিনি করেনই নাই উপরন্তু এই ধ্যানের বিরুদ্ধে কখনও কখনও প্রতিবাদই তিনি করিয়াছেন। 'মানুষের ধর্ম' 'পারসনালিটি', 'সাধনা', 'রিলিজয়ন অব্ ম্যান্' প্রভৃতি গ্রন্থে আমার এই বিবৃতির বহু প্রামাণ্য মিলিবে; ইতিপূর্বে 'ব্রহ্ম' ও 'মানব' নামক অধ্যায় দুটিতে সেই সমস্ত গ্রন্থ হইতে একাধিক বচন আমি উদ্ধৃত করিয়াছি, পাঠক দেখিয়া থাকিবেন।

রবীন্দ্রনাথ মুক্তি চাহেন, কিন্তু এ মুক্তি মনোবিহীন নির্বেগ মুক্তি নহে। মনকে তুচ্ছ বৈষয়িকতা ও স্বার্থপরতার দৈন্য হইতে মুক্ত করিয়া নির্মুক্ত সেই নির্মল মনের আনন্দ আস্বাদনই তাঁহার মুক্তিবাদের উদ্দেশ্য। সুতরাং তাঁহার মুক্তিবাদ প্রচ্ছন্ন ভোগবাদ নামেও কথিত হইতে পারে। কবি মোহিতলাল যথার্থই বলিয়াছেন, "তাঁহার (রবীন্দ্রনাথের) কল্পনায় ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ এক অভিনব ভোগবাদের সমর্থন করিতে বাধ্য হইয়াছে। বৈরাগ্যসাধনের মুক্তি অপেক্ষা অন্যতর মুক্তির পন্থা এই বহির্জীবনের নাটমন্দিরে কবিকরধৃত বাণীদীপের আরতি-আলোকে সুপ্রকাশিত হইয়াছে" [জয়ন্তী উৎসর্গ]।

বস্তুতঃ ভোগের দ্বারা মুক্তি পাওয়ার সাহস এক রবীন্দ্র-প্রতিভাতেই পাওয়া গিয়াছে। ধরণীর কাছাকাছি থাকিয়া অভিনব এই ভোগবাদ তিনিই জীবমানবকে শিখাইতে চাহিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে এখন আর অবশ্য না বলিলেও চলে যে, এই ভোগবাদে ত্যাগের কথাই কিন্তু আসল। অহং-এর অনাচার ত্যাগ না করিলে এই ভোগে অধিকারই জন্মে না। উচ্চতর মনের আলোকে উচ্চতর জীবনের আনন্দ যদি দর্শন করিতে হয়, তবে মনের নিম্নাভিমুখী বৃত্তিগুলির উপর বৈরাগ্য আনিতেই হইবে, অর্থাৎ সন্ন্যাসধর্ম প্রবর্তিত 'বৈরাগ্য সাধনের মুক্তি অপেক্ষা' কবিমর্ম-আস্বাদিত নূতন বৈরাগ্যধর্মের 'অন্যতর মুক্তির

পন্থা' অনুসরণ করিতে হইবে,—সোজা কথায় ব্যক্তিমনের বা অহং-এর, অর্থাৎ খণ্ড-আমির সংকীর্ণতা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বিশ্বমনের বা আত্মার, অর্থাৎ অখণ্ড-আমির বিস্তৃত ভূমিকায় জাগিতেই হইবে জীবমানবকে। ব্যক্তি যখন বিশ্বে প্রবেশ করে, বিশ্বকে আপনার করিয়া লয়, বিশ্বের সুখদুঃখকে আপনার সুখদুঃখ বলিয়া অনুভব করে, তখন তাহার মন আর ব্যক্তিমন নহে, তাহা বিশ্বমন। এই বিশ্বমনের আনন্দ অপার। তাহার নিত্য জাগরণ নিত্যবিকাশের অনন্ত বেদনানন্দ তাহার চিত্তে। এইজন্য 'তিলে তিলে নৌতন' হয় তাহার জীবন।

এই আনন্দ, এই নিত্যবিকাশের বেদনা, এই 'তিলে তিলে নৌতন' হইয়া চলা, ইহাই তো রবীন্দ্রনাথের মুক্তিপথের বাণী। ইহার কথা কবিকে জিজ্ঞাসা করুন, ব্যঞ্জনাময় বহু কবিতায় ইহার সদুত্তর পাইবেন, দার্শনিককে জিজ্ঞাসা করুন, সহজ, সরল, স্পষ্ট ভাষায় ইহার সদুত্তর তিনি অবশ্যই দিবেন। কিন্তু ভারতীয় প্রাচীন তত্ত্বচিন্তার দ্বারা প্রচারিত ধারণাতীত কোনো মুক্তির কথা তিনি কদাচ বলিবেন না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার একাধিক রচনায় মুক্তিকে সমর্থন করিয়াছেন, আবার

শুধায়ো না······মুক্তি কারে কই,
আমি তো সাধক নই।

এ-কথাও গাহিয়াছেন। 'বৈরাগ্য সাধন করবো' একথাও তাঁহার কাব্যে, নাট্যে বহু স্থলে পাওয়া যায়, আবার 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়'—একথাও যে তাঁহারই তা' আজ কে না জানে? আপাতদৃষ্টিতে এইসমস্ত উক্তি পরস্পরবিরোধী মনে হইতে যে পারে না, তাহা নহে। অনেকে তাই অনুমানও করিয়াছেন, কবি হিসাবে তিনি বৈচিত্র্যের ও ভোগের উপাসক, তাই মুক্তি জানেন না, বৈরাগ্য মানেন না। কিন্তু দার্শনিক হিসাবে তিনি একের ও মুক্তির উপাসক, তাই মুক্তি বলেন, বৈরাগ্যে চলেন। অপূর্ব এই অনুমানের ফলে রবীন্দ্রনাথের কবি ও দার্শনিককে পরস্পরবিরোধী দুই পৃথক সত্তা ও ব্যক্তিত্বের প্রকাশ বলিয়া অনেকের মনে হইয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মন যিনি জানিয়াছেন, তাঁহার মুক্তি-দর্শন ও ভোগদর্শন সম্পর্কিত তথ্য ও তত্ত্ব যাঁহাদের জানা হইয়াছে, তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন, রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় ও কল্পনায় পরস্পরবিরোধিতা কিছুমাত্র নাই। অহং হইতে তিনি মুক্তি চাহেন, তাই মুক্তির কথা বলেন। মন হইতে, জীবন হইতে, নিস্তরঙ্গ নির্বেগ মুক্তিতে সমাধিস্থ হইতে তিনি চাহেন না, তাই :

শুধায়ো না মোরে তুমি মুক্তি কোথা, মুক্তি কারে কই
আমি তো সাধক নই, আমি গুরু নই।
আমি কবি, আছি
ধরণীর অতি কাছাকাছি
এ পারের খেয়ার ঘাটায়। [পান্থ]

এ পারের খেয়ার ঘাটায়' আছি আমি, থাকি আমি, ওপারের বা 'আনপারের' তত্ত্ব-কথা আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়ো না। যাহাতে আমার অধিকার নাই, তাহার কথা বলিতে যাইয়া প্রত্যক্ষভাবে কোনো প্রভুপাদ গুরু সাজিতে এবং পরোক্ষভাবে ভণ্ড প্রতারক হইতে আমি পারিব না।

'মুক্তির প্রতি অসময়ে অযথা লোভ করিয়া যেটুকু ফাঁকি দিতে যাইব, সেটুকু তো শোধ করিতেই হইবে, তাহার উপরে আবার ফাঁকির চেষ্টার জন্য দণ্ড আছে। বেশি তাড়াতাড়ি করিতে গেলেই বেশি বিলম্ব ঘটিয়া যায়।' [ততঃ কিম্, ধর্ম]

কিন্তু প্রশ্ন এই : ও-পারের কোনো কথা কি কবি কখনও কহেন নাই? তাঁহার এ-পারের কথায় কি ফুটিয়া ওঠে না ও-পারের ব্যঞ্জনা? অবশ্যই ফুটিয়া ওঠে এবং স্বীকার করা ভালো যে, ইহাই কবিগুরুর কাব্য-বৈশিষ্ট্য। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, এ-পারের রূপে ও-পারের জ্যোতিরাভাস যতটুকু ফুটে, ততটুকু কবি দেখিয়া থাকেন। তাঁহার ও-পারও এ পারেরই মহিমা। রূপ হইতে তিনি অরূপ দেখেন—কিন্তু রূপেরই তাহা মহিমময় অপরূপ রূপ। রূপকে পরিহার করিয়া মনোবিহীন কোনো অরূপ তাঁহার বাণী নহে, তত্ত্ব নহে। স্বর্গ তিনি চাহেন, কিন্তু পৃথিবীর চরিত্রেই আছে যে স্বর্গ, তাহার বিকাশ সাধনই তাঁহার অভিপ্রায়। দেবতাকে তিনি পূজা করেন, কিন্তু মানুষের মর্মস্থিত যে দেবতা মানুষেরই বাক্যে, ব্যবহারে, ত্যাগে, প্রেমে, ধৈর্যে, শৌর্যে প্রকাশিত হয়, সেই দেবতারই তিনি উপাসক। স্বর্গই তাঁহার কাম্য, দেবতাই তাঁহার উপাস্য—কিন্তু কর্মের দ্বারা, সাধনার দ্বারা দেবতা হইয়া মানুষ পৃথিবীকে করিবে স্বর্গগৃহ—এই কল্পনাই তাঁহার প্রেম-জীবনের প্রেরণা। এই জন্য অজস্র মৃত্যুর মধ্য দিয়া অমৃত হওয়ার অর্থাৎ যা আছি তাহার মধ্য দিয়া যা হইতে হইবে তাহার অভিমুখে চির চলার বাণী এত তাঁহাকে দোলা দেয়। তাঁহার জীবনদর্শনের ক্রমবিকাশের ধারাটির প্রতি গবেষককে অহরহঃ তাই দৃষ্টি দিতে হইবে। দেখিতে হইবে—ধরণীর প্রতিটি ধূলিকে ছুঁইয়া ছুঁইয়া পথিক চলিয়াছেন—কোথাও দুই পা লাফাইয়া—এতটুকু ফাঁক রাখিয়া মুক্তি আহরণের বিলাস তাঁহার নাই। অহং হইতে আত্মা পর্যন্ত দিগন্তব্যাপী বিশাল এই জীবনের পথ,—পথিককে এই পথ অতিক্রম করিতে হইবে। কোথাও মিলিবে কাঁটা, কোথাও পুষ্প, কোথাও মেঘাচ্ছন্ন কৃষ্ণাকাশ, কোথাও চন্দ্র-সুন্দর চৈত্ররাত্রি; কোথাও সর্প, কোথাও বিহঙ্গমা—কিন্তু অখণ্ড আমি-পথিকের নিকট ইহাদের কোনোটিই তো মিথ্যা নহে, কেন না ইহাদের সকলেরই রূপে আছে বৃহত্তর জীবনসত্যের কোনো আনন্দ-ইঙ্গিত। এই বৃহত্তর সত্যকে পাইতে হইলে সংসারের কোনোকিছুকে এড়াইবার তো উপায় নাই। সংসারকে, সংসারের সুখ-দুঃখ, পতন-স্খলনকে স্বীকার করিয়া কর্মের গতিবেগেই ইহাদের অতিক্রম করিতে হইবে।

'মৃত্যুকে প্রথম উত্তীর্ণ হইতে হইবে, তাহার পর অমৃত লাভ। সংসারের ভিতর

দিয়া এই মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হইতে হয়। কর্মের মধ্যে প্রবৃত্তিকে যথার্থভাবে নিযুক্ত করিয়া আগে সেই প্রবৃত্তিকে ও কর্মকে ক্ষয় করিয়া ফেলা, তারপর ব্রহ্মলাভের কথা—সংসারকে বলপূর্বক অস্বীকার করিয়া কেহ অমৃতের অধিকার পাইতে পারে না।' [ধর্ম]

বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের মুক্তিসাধনা সংসারকে অর্থাৎ 'এ-পারের খেয়ার ঘাট'কে অস্বীকার করিয়া, ত্যাগ করিয়া নয়,—পরন্তু জগৎপ্রকৃতির রূপে ও উন্নত মানুষের চরিত্রে ও-পারের যে ব্যঞ্জনা বিভাসিত হয়, সেই ব্যঞ্জনাকে বস্তুগতভাবে এ-পারের চরিত্রে প্রকাশ করার ধর্মসাধনাই তাঁহার মুক্তিসাধনা। এই মুক্তিসাধনার মর্মটুকু অধিগত করিতে পারিলেই বুঝা যায় তাঁহার তত্ত্বদর্শনে বাস্তববাদের অভাব নাই। পূর্বে বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি:—রবীন্দ্রনাথের ও-পারের স্বপ্নে কিম্বা মুক্তির তত্ত্বে 'মিস্‌টিসিজম্' নাই, 'এস্‌কেপিজ্‌ম্'ও নাই—যাহা আছে, তাহার পুরাতন সংজ্ঞা 'আইডিয়ালিজম্' এবং নূতন তাহার বাংলা পরিভাষা : 'বৃহত্তর বাস্তববাদ'।

বৃহত্তর বাস্তববাদের ব্যাখ্যা গ্রন্থের 'মানব' নামক অধ্যায়ে আমি লিপিবদ্ধ করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথের জীবনতত্ত্বকে 'বাস্তববাদ' নামে অভিহিত করায় বিস্তর তর্ক উঠিবে, আমি জানি। কতকটা সংকোচে, কতকটা ভয়ে ইহাকে 'বৃহত্তর' বিশেষণে তাই বিশেষিত করিতে হইতেছে। বিশেষ করিয়া আধুনিক যুগে—যখন জাতিতে জাতিতে এত সংঘর্ষ, মানুষে মানুষে এত পাপপ্রবঞ্চনা, তখন রবীন্দ্রনাথের সাধনস্বভাবের উচ্চতর আনন্দ কবিকপোলকল্পিত শূন্য আদর্শবাদ নামে অভিহিত হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তথাপি আমি সাহস হারাইব না। এ-কথা আমি অবশ্যই বিশ্বাস করিব যে, হৃদয়ের নিম্ন-স্তরের বৃত্তিগুলি যেমন বাস্তব, উচ্চতর বৃত্তিগুলিও তেমনি বাস্তব। রবীন্দ্রকাব্যে বা জীবন-দর্শনে উচ্চতর ভাবগুলির প্রকাশ আছে বলিয়াই তাহা অবাস্তব নহে, শুধুমাত্র কবি-কল্পনা নহে। সত্য বটে, রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর মধ্যে দেখেন অমৃত, মানুষের মধ্যে দেখেন জীবজীবনের ভাগবত মহিমা, কিন্তু এই দর্শনশক্তি যদি বাস্তবজীবনের রূঢ় অভিজ্ঞতা হইতেই আহৃত না হইত, যদি এই দর্শন কর্মবিহীন তত্ত্বজ্ঞানের নির্বিকার আনন্দবাদ হইতেই পাইত প্রাণ, এবং সর্বোপরি যদি এই দর্শনের মূলে বস্তুজীবনগত অভিজ্ঞতার ক্রমবিকাশের একটি ধারা না থাকিত, তবে তাহার রূপ হইতেই অরূপতত্ত্ব অথবা মৃত্যু হইতে অমৃত-তত্ত্বকে ধারণাতীত কোনো অবাস্তব কল্পকথা বলিলেও আপত্তি তুলিতাম না। পাঠকগণ অবশ্যই জানেন সংসারের বস্তুগত কোনো ক্ষয় বা ক্ষতি, পাপ বা প্রবঞ্চনার কাছে কবি যেমন কখনও বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহেন নাই, তাহাদের অস্তিত্বকে আকস্মিকভাবে অস্বীকারও তেমনি করেন নাই। প্রাচীনপন্থী দার্শনিকদের মত অহংকে আচম্বিতে মিথ্যা কহিয়া অকস্মাৎ উর্ধ্বগমনবৃত্তি রবীন্দ্রনাথে নাই। অহং-এ মৃত্যু আছে, অমৃতও আছে। মৃত্যুশোক ও মৃত্যুর অত্যাচার তিনি সহ্য করিয়াছেন, ভোগও করিয়াছেন—জীবনে যে ইহা সত্য, তাহা স্বীকার করিয়াছেন,— লক্ষ কোটি বিচিত্র মৃত্যুর

মধ্য দিয়া অমৃতে যাইবার বাসনাও করিয়াছেন। মৃত্যু হইতে অমৃত অভিমুখে মানসযাত্রার বিচিত্র অনুভূতিগুলিই তো তাঁহার কাব্যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। যদি দেখিতাম, অহংকে তিনি অস্বীকার করিতেছেন, বস্তুজগতের ক্ষয়ক্ষতি, ভাবনাবেদনার প্রতি উদাসীন রহিয়া 'কৌপিনবান' হইবার মন্ত্র জপিতেছেন, অমৃতের গান গাহিতে গাহিতে আচম্বিতেই সংসারের সীমা ছাড়াইয়া ধারণাতীতের দিব্যতায় লীন হইতে চাহিতেছেন—তবে তাঁহাকে জীবন-বহির্ভূত কোনো তত্ত্বযোগীর সমসারে বসাইয়া পুরাতন কোনো দর্শনশাখার অনুসারক বা উপাসক বলিতে দ্বিধা করিতাম না। আমি যে স্পষ্ট দেখিতেছি, রবীন্দ্রনাথ এই পৃথিবীর, এই জীবনের, এই মানুষ জাতির। দুঃখ ভুগিয়া, শোক সহিয়া, 'পাপেরে নানাছলে' দেখিয়া দেখিয়া বিচিত্র বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে করিতেই তিনি চলিয়াছেন—মননের দ্বারা সেই অভিজ্ঞতাগুলিকে আবার উচ্চতর জীবনবিকাশের প্রয়োজনে প্রয়োগ করিতেছেন—এইভাবে ধাপে ধাপে, ধীরে ধীরে, তুচ্ছতম জীবনবোধের সীমা হইতে উঠিতেছেন উচ্চতর জীবনবিজ্ঞানের অসীমানন্দে। সুদীর্ঘ জীবনযজ্ঞের বিচিত্র যে-কাব্যচিত্র নানা রেখায় তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার সমগ্রতার রূপে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই উপরিউক্ত কথার সত্যতা প্রমাণিত ও উপলব্ধ হইবে।

মনের উত্তুঙ্গ শিখরে উন্নীত হইয়া ক্রমশঃ সেই উন্নত মনের দিব্যোজ্জ্বল অনুভূতিগুলি নানা রচনায় রবীন্দ্রনাথ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিভায় মনের মর্যাদা বাড়িয়া গিয়াছে—বাস্তবজীবনের গৌরবও গিয়াছে বাড়িয়া। ধূলি হইতে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত মন যে যাইতে পারে, মোহ হইতে প্রেম পর্যন্ত মানুষ যে উন্নীত হইতে পারে, মানুষ হইতে পরম মানব পর্যন্ত জীবন যে অগ্রসর হইতে পারে—রবীন্দ্রনাথের কাব্যাবলীর সমগ্রতার রূপে তাহাই দিনের আলোর ন্যায় স্বচ্ছ ও বাস্তব হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। জানা গিয়াছে, মন যত বাড়ে, বাস্তববোধ ততই বাড়িতে থাকে। অরসিক মানুষই মনের নিম্নতম বৃত্তিগুলির আস্বাদনে তৃপ্তি পায়, এবং তৃপ্তি পায় বলিয়াই সেগুলিকে বাস্তবসত্য, জীবন-সত্য বলিয়া মনে করে; কিন্তু উচ্চতর বৃত্তির আলো তাহার বোধে যদি কখনো পৌঁছায়, তখন তাহার রুচি অবশ্যই যায় বদলাইয়া, তখন কাল যাহা বাস্তব বলিয়া সে বড়াই করিয়াছে, আজ তাহা লোষ্ট্রবৎ ত্যাগ করিয়া উচ্চতর ভিন্ন সত্যকেই বাস্তবজ্ঞানে করে বিশ্বাস।

আসল কথা মন লইয়াই কারবার। মন যাহাকে বলে 'সত্য', মানুষ তাহাকেই স্বীকার করে সত্য বলিয়া; মন যাহার প্রতি উদাসীন, মানুষ স্বীকার করে না তাহার অস্তিত্ব। ইন্দ্রিয়গুলি এই মনেরই চর, অনুচর। মনের যদি হয় নিচু জাত, ইন্দ্রিয়-গুলিও তখন ব্যবহার করে নিচু জাতের মতো। মনকে তখন তাহারা সেই সমস্ত বস্তু-সত্যেরই তথ্য জানায়, যেগুলি মন ধরিতে পারে, বুঝিতে পারে, পছন্দ করিতে পারে। যে-সমস্ত বস্তুসত্যের প্রতি মন উদাসীন—একটু রূঢ় ভাষায়, নির্বোধ ও পঙ্গু—সেই সমস্ত

সম্পর্কে অনুচর ইন্দ্রিয় দল থাকে অন্ধ, কবির ভাষায় তখন 'দুয়ার' থাকে রুদ্ধ। কিন্তু ইন্দ্রিয়গণও যে উচ্চতম অরূপচিত্র দেখিবার অধিকারী, রবীন্দ্রপ্রতিভায় তাহা কি জানা হয় নাই? ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ করিয়া রবীন্দ্রনাথ সত্যসন্ধান করেন নাই কিন্তু ইন্দ্রিয়দের জাতে তুলিয়া তাহাদেরই দ্বারা অরূপ সন্ধান করাইয়াছেন। মন ও ইন্দ্রিয়গণের এই দ্বিজত্ব প্রাপ্তির সংবাদ যাঁহারা রাখেন, আমি জানি, তাঁহাদের বাস্তববোধ উন্নততর ও প্রখরতর হইতে বাধ্য। নীচজাতীয় মনের অজ্ঞ পরিহাসে কখনও তাঁহারা বাস্তববোধকে নিম্নগামী করিতে পারেন না।

অবশ্য একথা আমি অস্বীকার করি না যে, মনের সাধনায় রবীন্দ্রনাথ যতদূর পর্যন্ত উন্নীত হইয়াছেন, আধুনিক জগতের পক্ষে ততদূর উন্নীত হওয়ার সময় এখনও আসে নাই। কিন্তু তাই বলিয়াই কি উচ্চতম মনের সূর্যপ্রকাশকে অবাস্তব কহিব? নিম্নগত চিত্তের প্রকাশই বাস্তব, উর্ধ্বগত চিত্তের লাবণ্য কি বাস্তব নহে? বাস্তব যদি নহে, তবে বস্তুজগতে তাহা ঘটে কি করিয়া? অতিবড় কৃপণ বলিয়া যাহার দুর্নাম শুনি, তাহাকেই কেন দেখি সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া ফকীর হইতে? মানুষরূপে পশু বলিয়া যাহাকে ঘৃণা করি, তাহাকেই কেন দেখি একটি পাখীর মরণে কাঁদিয়া মরিতে? জীবনে যে ভুলিয়াও একটি সত্যকথা বলে নাই বলিয়া জানি, কোর্টের কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া নিষ্পাপ কোনো শত্রুর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দিতে গিয়া কেন সে ডুকরাইয়া উঠে? শত্রুকে জড়াইয়া ধরিয়া সর্বসমক্ষে কেন সে ভিক্ষা করে মার্জনা? বাস্তবজগতে তা' হইলে তথাকথিত আদর্শও বুঝি কিছু কিছু ঘটিয়া যায়? আদর্শ বলিতেছি কাহাকে? যাহা মনে ধারণা করিতে পারি না, তাহাই কি অবাস্তব আদর্শ? অথবা যাহা আয়ত্তে আনিতে পারি নাই, যাহা স্বপ্নে আছে, আছে কল্পনায়, তাহাই আদর্শ? মহৎ আমি নহি, কিন্তু মহত্ত্ব আছে আমার স্বপ্নে, মহত্ত্ব তাই আদর্শ? প্রেমিক আমি নহি, কিন্তু প্রেম আছে আমার কল্পনায়, প্রেম তাই আদর্শ? কিন্তু জীবনের ক্রমবিকাশের আশীর্বাদে যে-মহত্ত্ব বা যে-প্রেম আপনি অর্জন করিয়াছেন, তাহা আমার নিকট আদর্শ হইলেও আপনার নিকট তাহা কি বাস্তব সত্য নহে? বলিতেছেন, যাহা প্রত্যক্ষ করেন, তাহাই বস্তু। কিন্তু কী আপনি প্রত্যক্ষ করেন? ইট কাঠ-ধুলা-মাটিই কি আপনি প্রত্যক্ষ করেন অর্থাৎ স্থূল ইন্দ্রিয় আপনাকে যাহা দেখায় তাহাই দেখেন, আর কিছুই দেখেন না? এ-কথায় কি আপনি বিশ্বাস করেন না যে, মন আপনাকে ইট-কাঠ দেখায় বলিয়াই আপনি ইট-কাঠ দেখেন, অন্য কোনো তত্ত্ব দেখাইলে আপনি সেই তত্ত্বই দেখিতেন? মনের দেখা অপেক্ষা চোখের দেখাকে যদি আপনি অধিকতর বাস্তব বলেন, তবে আমি মনের দেখাকে বৃহত্তর বাস্তব বলিব। মনকে আমি অবাস্তব বলি না—অথবা মনের কোনো একটি বিশেষ অংশকেই বাস্তব বলিয়া সত্য জানিয়া গেছি মনে করি না। মনের অখণ্ড রূপটি একান্তভাবেই জীবনগত এবং সেই হেতু উহা জীবনের পক্ষে সত্য ও বাস্তব।

নিম্নগত কামকামনা, লোভ ও চাতুর্য মন প্রত্যক্ষ করে—অতএব উহা বাস্তব; আবার উচ্চগত প্রেমবৈরাগ্য, সেবা ও মহত্ত্ব মন প্রত্যক্ষ করিতে পারে—অতএব উহাও বাস্তব, তবে তর্ক এড়াইবার জন্য বলা ভালো, বৃহত্তর বাস্তব। মহত্ত্ব বা প্রেম জীবনবহির্ভূত একটা তত্ত্বমাত্র যে নয়, এই সত্য চরিত্রের দ্বারা, জীবনের দ্বারা, প্রত্যক্ষভাবে, বস্তুগতভাবে যিনি প্রমাণ করিয়াছেন, তাহাকে দেখিয়াই তো বুঝা যায়—বাস্তবজীবন কতদূর পর্যন্ত উন্নীত হইতে পারে। মানুষের বোধজীবনে বাস্তবতার সংজ্ঞা তখন বদলাইতেই হয়। স্বীকার করিতে হয়, খাওয়া-পরা-নাওয়ার মতো ত্যাগ-প্রেম-তিতিক্ষাও জীবনগত বাস্তব সত্য: চোখের দেখার মতো মনের দেখাও বাস্তব সত্য। এই মানবিক সত্য তত্ত্বকে আমরা আদর্শবাদ বলি শুধু এইজন্য যে, উহা আমরা চরিত্রে প্রতিভাত করিয়া এখনও ঠিক মানুষ হইতে পারি নাই। রবীন্দ্রনাথ এইজন্য 'হওয়ার' উপর বিশেষ জোর দেন, আমরা যাহারা 'হই' নাই, তাহারা ঐ হওয়ার কথাকে আদর্শবাদ বলিয়া মনে করি। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে—মন হইতে 'নির্মন' হওয়া, নির্বিকার হওয়া, রাবীন্দ্রিক 'হওয়া' নয়—কেন না, জীবনে যদি অবাস্তব বলিয়া কিছু থাকে, তবে তাহাই রবীন্দ্রনাথের মতে অবাস্তব। রবীন্দ্রনাথের 'হওয়া' নির্মল হওয়া, সুন্দর হওয়া, মঙ্গল হওয়া। এ-'হওয়া' মনের বাইরের হওয়া নয়, ধারণাবহির্ভূত কোনো তত্ত্বও ইহা নহে।

আসল কথা, কর্মের দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা জীবনে যা' প্রতিভাত করা যায়, একাধিক মানুষ করিয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হয়, যা' মনের বাইরের ব্যাপার নহে বলিয়া ধারণা হয়,—পৃথিবীর চরিত্রে, মানুষের জীবনে যা হয়, হইয়াছে এবং হইবে বলিয়া বিশ্বাস জাগে, রবীন্দ্রশাস্ত্রে ও কাব্যদর্শনে তাহাই বাস্তব সত্যের মর্যাদা পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস এই, জীবনবহির্ভূত কোনো তত্ত্বমাত্র যাহা নহে, আজ যদি তাহা লক্ষ্যের বাহিরেও থাকে, তথাপি তাহা একদিন-না-একদিন বসন্তাগমনে পুষ্পবিকাশের মত মানবচরিত্রে প্রকাশ পাইবেই পাইবে, অর্থাৎ বাস্তব বলিয়াই একদা প্রকাশ পাইবে, অবাস্তব হইলে প্রকাশ পাইবার কোনো কথাই উঠিত না। মনুষ্যজীবনের অনাগত মাহাত্ম্যে এই যে অগাধ ও অনন্ত বিশ্বাস ইহাকে 'আইডিয়ালিজ্‌ম্' বলিয়া অভিহিত করিয়া সন্তুষ্ট হয়েন তো হউন, কিন্তু ইহা যে শুদ্ধমাত্র কবিকল্পিত শূন্য আদর্শবাদ অথবা কলামোহন রহস্যবাদ নহে, এই সহজ কথাটি বুঝাইবার জন্যই রাবীন্দ্রিক বিশ্বাসবাদের স্বরূপনির্ণয়ে—বৃহত্তর বাস্তব-বাদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছি।

রবীন্দ্রদর্শনে যে-ওপারের বাণী আছে, পূর্বেই বলিয়াছি, তাহা এ-পারেরই মহিমা। এ-পার ব্যতিরেকে ও-পার নিষ্ফল। এ-পারকে বাদ দিয়া ও-পারের বাণী বা তত্ত্ব প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক ধর্মদর্শনের দিক হইতে সত্য হইলেও রবীন্দ্রদর্শনে তাহা কার্যকরী নহে এবং সেইহেতু রবীন্দ্রবিচারে তাহা অবাস্তব অর্থাৎ তাহা জীবন-নিরপেক্ষ তত্ত্বসর্বস্ব নিষ্প্রেম বৈরাগ্য মাত্র। এই 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি' রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই চাহেন নাই।

'এ-পারের খেয়ার ঘাটায়' তিনি আছেন ও-পারেরই মহিমা বিকাশের জন্য অর্থাৎ মুক্তির জন্য। অন্তহীন প্রাণের বিকাশতীর্থে অহরহঃ প্রমুদিত রহিয়া আপন চরিত্রে প্রকাশ করিব অন্তর্নিহিত ও-পারের আলো—রবীন্দ্রসাধনার ধ্বনি তো ইহাই। এ-পারের মধ্যে ও-পারের যে আলোর ইঙ্গিত দেখা যায়, সেই আলোটিকে প্রত্যক্ষভাবে এ-পারে জ্বালাইয়া দিবার সাধনস্বভাবই তো আছে রবীন্দ্রনাথে। ও-পারের আলো আর কী? মানুষের অন্তর্নিহিত ঐ প্রেমসেবা-ত্যাগমহত্ত্বই তো ওপারের আলো। অহংকে যে যত ত্যাগ করিতে পারিয়াছে, তাহার জীবনে ওপারের আলো তত ফুটিয়াছে। এই অহংকে সাধনার দ্বারা ত্যাগ করিতে পারা যায়; কিন্তু ত্যাগ যদি নাও করি, প্রকৃতি ছাড়িয়া কথা কহিবে না, একদিন না একদিন দুঃখের মধ্য দিয়া, শোকের মধ্য দিয়া ঠিক ত্যাগ করাইয়া লইবে। এইভাবে ও-পারের আলো ফুটিবেই চরিত্রে—অতিবড় ভোগীরও চরিত্রে।

ইহাই রবীন্দ্রনাথের বাণী। জীবন দিয়া ইহার সত্য যখন উপলব্ধি করি, সহজস্বভাব অপেক্ষা সাধনস্বভাবে তখন আকৃষ্ট হয় মন। মানবিকতার মাহাত্ম্য বিকাশে হই যত্নবান। ত্যাগ করি, প্রেম দেখি। ইহা কি অবাস্তব কোনো কল্পদর্শন? ইহা তো স্বভাবদর্শন, মনোদর্শন। পুঁথিগত কোনো তত্ত্ববিদ্যার জটিল যুক্তি হইতে কি ইহার সমুৎপত্তি? আপন স্বভাবেরই সহজ অভিজ্ঞতার ধ্যানানন্দ হইতেই তো ইহার আবির্ভাব। বস্তুতঃ ইহাই তো জগৎ, ইহাই জীবন। যখনি ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, তখনি কাহারও না কাহারও চরিত্রের মধ্য দিয়া ইহা সূর্যের দীপ্তির ন্যায় প্রখর হইয়া উঠে। অতিবড় নীচ জীবনের মধ্যেও ইহার আভাস দেখিয়াছি। যখনি অনুতাপের গ্লানি উপস্থিত হয়, তখনি কোনো না কোনো মুহূর্তে বেদনার অশ্রুসৌন্দর্যে ইহা প্রত্যক্ষে প্রকাশমান হইয়া যায়।

জানি বিংশশতাব্দীর অর্ধসভ্য জগৎ ও মানুষের চরিত্রে ও-পারের ব্যঞ্জনা বড় বেশী প্রকাশমান হইতে পারে নাই। আমাদের বাস্তববোধ আজও তাই অত্যন্ত নিম্নস্তরে রহিয়া গেছে। জাগতিক জীবনে ইহাতে যে কি ক্ষতি হইতেছে, তাহা আমরা ধরিতেও পারি না—তাই তথাকথিত বাস্তববুদ্ধির চাতুর্যে ও অহমিকায় আমরা জয়োন্মত্ত। উচ্চতর জীবনবোধ অর্থাৎ প্রেমবোধ ও সৌন্দর্যবোধ, জীবনেরই যে একটি বৃহত্তর অংশ,—ইহার বোধ যে শূন্য কল্পনা নহে, পরন্তু তাহা জগৎগত বৃহৎ সত্য—এবং সর্বোপরি ইহলৌকিক জীবনকে আরো গভীরতররূপে ভোগ করিবার আনন্দ যে আছে ইহাতে—সেই কথাটা মানুষকে আজ বুঝাইয়া বলিতে হয়। যদি এমন হইত যে, 'সেই কথাটা' না বুঝিলে চাকুরী যাইবার সম্ভাবনা আছে কিংবা ব্যবসায়ে ক্ষতি হইবার আশঙ্কা আছে, অথবা লোকসমাজে হেয় বা হীন বলিয়া অবহেলিত হইবার ভয় আছে, তা' হইলে সৌন্দর্যবোধের বাস্তব অস্তিত্ব সম্পর্কে মানুষ অবশ্যই রাতারাতি সচেতন হইয়া উঠিত। বুদ্ধিমানদের জগতে বুদ্ধির অভাবই একটা বাস্তব অভাব, উচ্চজীবনের আনন্দবোধের অভাব যেন অভাবই

নহে, কেন না ইহার অস্তিত্ববোধে যাহাদের মনে কোনো সাড়াই মেলে না—লোকসমাজে তাহাদের প্রত্যক্ষভাবে যে কোনো ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় তাহা তো নয়ই, উপরন্তু অনেকে ইহার প্রতিকূলাচরণ করিয়াই লোকে লোকে সম্মানিত হইতেছে বলিয়া মনে হয়। এইরূপ অবস্থায় ইহাকে অবাস্তব কবিকল্পনা বলিয়া জীবন হইতে দূরে সরাইলে প্রাবীণ্যের 'পরম পাকা' বুদ্ধিরই প্রকাশ হয়—এইভাবে জীবনের অতিবড় মঙ্গলময় বাস্তব সত্যটিই অবাস্তব শূন্যবাদ রূপে বিবেচিত হইতে থাকে।

রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন :

'বুদ্ধি জিনিসটা অস্তিত্ব রক্ষার পক্ষে অপরিহার্য কিন্তু সৌন্দর্যবোধের অপূর্ণতা সত্ত্বেও সংসারে সিদ্ধিলাভের দৃষ্টান্ত অনেক আছে। সৌন্দর্যবোধের কোনো সাংঘাতিক তাগিদ নেই। এ সম্বন্ধে যথেচ্ছাচারের কোনো দণ্ডনীয় বাধা নেই। যুক্তি স্বীকারকারী বুদ্ধি মানুষের মনে যত সুনিশ্চিত হয়েছে, প্রাণের বিভাগে শাসনের অভাবে সৌন্দর্য স্বীকার-কারী রুচি তেমন পাকা হয়নি। তবু সমস্ত মানব সমাজে সৃষ্টির কাজে মানুষের যত প্রভূত শক্তির প্রয়োগ হচ্ছে এমন অল্প বিষয়েই। অথচ জীবন ধারণে এর প্রয়োজন নেই, এর প্রয়োজন আত্মিক। অর্থাৎ এর দ্বারা বাইরের জিনিসকে পাই নে, অন্তরের দিক থেকে দীপ্তিমান হই, পরিতৃপ্ত হই। এই পরিতৃপ্ত হওয়ার দ্বারা যাঁকে জানি তাঁকে বলি 'রসো বৈ সঃ।' [মানুষের ধর্ম]

'আত্মিক প্রয়োজনে' নিজেকে প্রস্তুত করার, অথবা 'অন্তরের দিক থেকে দীপ্তিমান' হওয়ার এই যে রসবোধ বা আনন্দবোধ, ইহা বাস্তব ব্যাপার নহে বলিয়া অনেকের ধারণা হইতে পারে। এই ধারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া কথা কাটাকাটি আমি করিব না, কিন্তু কেহ যদি এই ব্যাপারকে জীবন-বহির্ভূত অবাস্তব কবি-কল্পনা বলিয়া মনে করেন, তবে মানুষ নামে পরিচয় দিই বলিয়া অবশ্যই খুব লজ্জাবোধ করিব। জীবনে এই ব্যাপারের অবশ্যই প্রয়োজন আছে এবং জীবনকে নিত্য কর্মতৎপর রাখিতে হইলে অন্তরের দিক হইতে দীপ্তিমান হইতেই হয়। জগতে আজ পর্যন্ত শিল্প ও সভ্যতার যত উন্নতি হইয়াছে তাহা এই আন্তর দীপ্তির প্রসন্ন আশীর্বাদেই হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা যে 'ডায়নামিক লাইফ'-এর কথা বলেন এই দীপ্তিই তাহার প্রাণস্পন্দন। এই দীপ্তিমান হওয়ার দ্বারা অন্তরের মধ্যেই যে-উজ্জ্বল জীবনের আনন্দ আস্বাদন করি, সেই আনন্দ-প্রেরণাতেই বর্তমান প্রত্যক্ষ জীবনটিকে নানা মহৎ কর্মের নবীন অলংকারে করি সজ্জিত। অর্থাৎ, সমাজের মঙ্গলের জন্য স্বার্থ ত্যাগ করি, বরণ করি দুঃখ,—যত ত্যাগ করি, যত দুঃখ পাই ততই যেন নব নব মহিমার ভূষণে জীবন যায় ভূষিত হইয়া। ইহাতে নিজে অন্তহীন আনন্দ লাভ করি এবং যাহারা আমাকে দেখে, তাহারাও আনন্দ প্রেরণায় নবজীবন লাভ করে। ব্যক্তি জীবনে দুঃখ আছে, দারিদ্র্য আছে, দুষ্ট দুরভিসন্ধির দুর্বিনীত দুশ্চেষ্টা আছে, কিন্তু মঙ্গলময় এই আনন্দকর্ম ও প্রেরণাও তো আছে। আমি

জানি, এই দুই-ই বাস্তব। প্রথমোক্ত বাস্তবটিকে যদি বলেন অধিকতর বাস্তব, তবে শেষোক্ত বাস্তবটিকে বলিতে পারেন বৃহত্তর বাস্তব। এই বৃহত্তর বাস্তবের অধিদেবতা সেই তিনি—যিনি মনের মধ্যে থাকিয়া মনকে উজ্জ্বল করেন, হৃদয়ের মধ্যে থাকিয়া আনন্দ-প্রেম জানান, বুদ্ধির মধ্যে থাকিয়া কল্যাণের কমনীয়তার রূপ প্রদর্শন করেন। এই তিনি শুধু পরোক্ষ নহেন, তিনি প্রত্যক্ষও হইতে পারেন। অধিকতর বাস্তববোধের নিকট পরোক্ষ কিন্তু বৃহত্তর বাস্তববোধের নিকট তিনি প্রত্যক্ষ। মহৎকে দেখিয়া যখন আনন্দ প্রেরণা অনুভব করি তখন বৃহত্তর বাস্তববোধের প্রত্যক্ষমূর্তি দর্শন করিতেছি বলা যায়; অর্থাৎ রক্তমাংসে গড়া মানুষকে শুধু দেখিতেছি না, পরন্তু পরম মানবের প্রতিনিধিকে দেখিতেছি—বলিতে পারি। যখন অহং-এ এবং অহং-এর অতিকৃতিতে মানুষের আনন্দ তখন অধিকতর বাস্তবের স্তরে তাহার প্রতিষ্ঠা; যখন অহংকে উত্তীর্ণ হইবার সংগ্রাম সাধনায় তাহার আনন্দ, তখন বৃহত্তর বাস্তবের স্তরে তাহার অধিগতি। রবীন্দ্রনাথের অধিগতি এই বৃহত্তর বাস্তবের অভিমুখেই বটে—কিন্তু তাই বলিয়া তিনি অধিকতর বাস্তবকে কখনও এড়াইয়া যাইতে চাহেন নাই। একদিকে অহং ও অপরদিকে বিশ্ব এই দুইয়ের মধ্যবর্তী যে গতিময় বাস্তব জীবন, ইহারই উপাসক দার্শনিক শ্রীরবীন্দ্রনাথ। বলা বাহুল্য, কবির ধর্ম ঠিক ইহাই। 'আমার ধর্ম' নামক প্রবন্ধে কবি বলিতেছেন :

'যে স্বর্গকে দুঃখের ভিতর দিয়ে, মন্দের সংঘাত দিয়ে না জয় করতে পেরেছি, সে স্বর্গ তো জ্ঞানের স্বর্গ নয়—তাকে স্বর্গ বলে জানিই নে।......জীবের মধ্যে মানুষই প্রেমের ক্ষুরধারনিশিত দুর্গমপথে দুঃখকে, মৃত্যুকে স্বীকার করেছে। সে সাবিত্রীর মতো যমের হাত থেকে আপন সত্যকে ফিরিয়ে এনেছে। সে স্বর্গ থেকে মর্তলোকে ভূমিষ্ঠ হয়েছে, তবেই অমৃতলোককে আপনার করতে পেরেছে। ধর্মই মানুষকে এই দ্বন্দ্বের তুফান পার করিয়ে দিয়ে এই অদ্বৈতে, অমৃতে, আনন্দে, প্রেমে উত্তীর্ণ করিয়ে দেয়। যারা মনে করে, তুফানকে এড়িয়ে পালানোই মুক্তি, তারা পারে যাবে কি করে। সেই জন্যেই তো মানুষ প্রার্থনা করে—অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়। 'গময়' এই কথার মানে এই যে, পথ পেরিয়ে যেতে হবে, পথ এড়িয়ে যাবার জো নেই।' [সবুজ পত্র, আশ্বিন-কার্তিক, ১৩২৪]

এই 'পথ পেরিয়ে' যাওয়ার বাণী কি জীবন হইতে পলায়নের বাণী? অথবা ইহা কি জীবননিরপেক্ষ, কর্মনিরপেক্ষ কোনো নির্বিকার নির্বাণতত্ত্ব? জীবনে অহরহঃ কি আমরা 'পেরিয়ে যাওয়ার' বাস্তব উত্তেজনা অনুভব করিতেছি না? যা আছি, তাহাতেই কি খুশি আছি, যা হইব—তা কি আমাদের বৃহতের পথে টানিতেছে না?

বস্তুতঃ অধিকতর বাস্তবের আসক্তিতে যতক্ষণ বন্দী থাকি—রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'মৃত্যুর গুপ্ত প্রেমে' যতক্ষণ বদ্ধ রহি, 'বদ্ধ করা খাঁচাতেই' যতক্ষণ সুখ অনুভব করি, ততক্ষণ এই 'পেরিয়ে যাওয়ার' কথা অবাস্তব কবি-কল্পনার খেয়াল-বাণী বলিয়া মনে হইতেই

পারে। কিন্তু উচ্চতর জীবনবোধের আনন্দ যেই অনুভবে আসিয়া পৌছায়—বাস্তববোধের রূপই তখন বদলাইয়া যায়। তখন কাল যাহাকে বাস্তব বলিয়া বড়াই করিতেছিলাম, আজ তাহাই বিকারগ্রস্ত মস্তিষ্কের কুৎসিত প্রবৃত্তি বলিয়া জ্ঞান হইতে থাকে। রত্নাকরের নিকট বাল্মীকির প্রেমময় আনন্দজীবন অবাস্তব কবিকল্পনা বলিয়া বিবেচিত হইলেও বাল্মীকি জানেন রত্নাকর-জীবন ভাববিহীন অভাবগ্রস্ত মস্তিষ্কের বিকারগ্রস্ত বড়াই মাত্র।

বাল্মীকি-জীবন অর্থাৎ মহত্তর বাস্তবজীবন রত্নাকর জীবনের তুলনায় ত্যাগের জীবন হইলেও, বৃহত্তর দৃষ্টিতে ইহাও একপ্রকার উদার আনন্দভোগের বাস্তব জীবন। এই জীবনের ইশারা জগতের সর্বত্র আছে—সময় হইলেই ইহার প্রকাশ ঘটে। লক্ষ লক্ষ মৃত্যুর মধ্য দিয়া মহত্তর এই শাশ্বত জীবনই খণ্ড খণ্ড বহু সাময়িক জীবনে পায় প্রকাশ—

মরণের বীণাতারে উঠে জেগে
জীবনের গান ;
নিরন্তর ধাবমান
চঞ্চল মাধুরী।
ক্ষণে ক্ষণে উঠে স্ফুরি
শাশ্বতের দীপশিখা
উজ্জ্বলিয়া মুহূর্তের মরীচিকা।
অতল কান্নার স্রোত, মাতার করুণ স্নেহ রয়,
প্রিয়ের হৃদয় বিনিময়।
বিলোপের রঙ্গভূমে বীরের বিপুল বীর্যমদ
ধরণীর সৌন্দর্যসম্পদ। [ধাবমান]

'বলাকায়' এই সুর ইতঃপূর্বে ধ্বনিত হইয়াছে। বলাকার একটি কবিতায় কবি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, স্বাধীনতার সংগ্রামে শহীদ যে প্রাণ দেয়, বীর যে রক্ত দান করে —তাহা কি কখনও নিষ্ফল হয়? সন্তানের দুঃখে বা বিচ্ছেদে মা যে অশ্রু বর্ষণ করেন, ধরার ধূলায় তাহা কি কখনও হারা হয়? [বলাকা-৩৭]

পরিশেষের 'ধাবমান' নামক কবিতায় এই জিজ্ঞাসাই জীবন-বিশ্বাসে পরিণত হইয়াছে। বলা হইতেছে—ধরণীর সৌন্দর্য-সম্পদ তো কেবল মাত্র সূর্যচন্দ্রতারা অথবা অরণ্য পর্বত সাগর নহে,—মাতার করুণ স্নেহ কিংবা প্রিয়ের অমল প্রেম অথবা বীরের বিপুল বীর্যমদও ধরণীর সৌন্দর্য-সম্পদ। ইহলৌকিক এই প্রত্যক্ষগোচর জগৎ-জীবনকে এই সমস্ত গুণাবলীই তো অনন্ত সৌন্দর্য-মহিমায় মণ্ডিত করে। গতি বা চলা আর কী! এই সমস্ত গুণাবলীর নিত্য অনুশীলন অর্থাৎ এগুলিকে চরিত্রে প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ দিবার সাধন-তৎপরতাই তো গতি বা চলা। যত চলিতেছি—চরিত্র তত বৈচিত্র্যের মধ্যে নূতন ভাবে বিকশিত হইতেছে—ভোগ হইতে ত্যাগে, ত্যাগ হইতে বৃহত্তর কোনো

ভোগের আনন্দে, পুনর্বার সেই আনন্দ হইতে নূতনতর কোনো ত্যাগের মহিমায় অহরহঃ জীবন চলিতেছে। জীবনের যেন প্রতিজ্ঞা এই : কর্মে, প্রেমে, জ্ঞানে, পৌরুষে পূর্ণকে করিব প্রকাশ। আজ না পারি, কাল করিব ; এ জীবনে না পারি, আন-জীবনে করিব। এইভাবে জীবনে জীবনে, যুগে যুগে, লোকে লোকে পূর্ণকে, অখণ্ডকে প্রকাশ করিবার সাধনায় থাকিব যত্নবান।

জীবন অবশ্য পূর্ণকে পায় নাই। কিন্তু পায় নাই বলিয়াই তো তাহার চলার নাহি অন্ত। অন্তহীন চলা কি অবাস্তব কোনো স্বপ্নদর্শন ? আমি তো মনে করি জীবনের পক্ষে বাস্তব সত্য হইতেছে—'গতি' ; যেমন আদর্শ সত্য হইতেছে—'শান্তি', 'মুক্তি'। শান্তির জন্য ব্যাকুল হই, পাইলাম বলিয়া মনে করি—কিন্তু তাহার পরই তো দেখি যে, জীবন উধাও হইয়াছে নূতনতর কোনো ভাবের দ্বন্দ্বে, ভাবের প্রেরণায়। আসল কথা শান্তি হইতেছে মনোজীবন বহির্ভূত বৈদান্তিক আধ্যাত্মিকতা, —মন ত্যাগ না করিলে ইহার সাক্ষাৎকার অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথে 'শান্তির লালিত বাণী' যে নাই, তাহা নহে, তবে সে শান্তি নবতর কোনো জীবনগতির ভাবান্তর মাত্র। আসলে রবীন্দ্রনাথে দার্শনিক শান্তি নাই, আছে গতি, আছে দ্বন্দ্ব। তাঁহার অধ্যাত্মগীতির গ্রন্থগুলি অর্থাৎ গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, নৈবেদ্য প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থগুলির বাণীও শান্তি নহে, গতি। কবি যে যে গানে বা কবিতায় শান্তভাবের আনন্দ-ঝংকার তুলিয়াছেন তাহার মূর্ছনাতেও, যদি প্রাণ পাতিয়া ও মন পাতিয়া ধীরভাবে আর একবার শ্রবণ করেন, অবশ্যই বুঝিবেন, নূতন জীবনযাত্রার আনন্দোদ্বেগের ধ্বনি আছে। তাঁহার শান্তি-সংগীতগুলির ব্যঞ্জনা নূতনজীবনের নবোন্মেষ, পূর্ণকে পূর্ণভাবে পাইয়া যাওয়ার নির্বিকার সমাধিতত্ত্ব তাহাতে নাই।

কবি-সমালোচক শ্রীযুত প্রমথনাথ বিশী 'রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ' নামক তাঁহার নূতন একখানি গ্রন্থে সম্প্রতি লিখিয়াছেন 'সীমা ও অসীমের দ্বন্দ্বের লীলাই রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রধান আকর্ষণ, যদি কোথাও এ দুইয়ে সমন্বয় ঘটিয়া থাকে তবে তাহা উপরি লাভ'। [প্রস্তাবনা, পৃঃ ৩] কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্য বা দর্শন জীবনে কোথাও এই দুইয়ের সমন্বয় ঘটিয়াছে বলিয়া তো আমার জানা নাই। গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য প্রভৃতি গীতিগ্রন্থে কি এই দুইয়ের সমন্বয় ঘটিয়াছে ? বিশী মহাশয় যখন গীতাঞ্জলিকে কবির 'প্রতিভার মূল ধারা'র বাহক বলিয়া স্বীকার করেন নাই তখন অনুমান করা সম্ভবতঃ অসঙ্গত হইবে না যে, গীতাঞ্জলি, নৈবেদ্য প্রভৃতিতে সীমাসীমের সমন্বয় তিনি দেখিয়াছেন। এইজন্যই বোধ হয় ওগুলি রবীন্দ্র-কাব্য-শাখার 'উপশাখা' বলিয়া তাঁহার ধারণাও হইয়া গেছে। কিন্তু আরো একটু ধীরভাবে কবির অধ্যাত্মসংগীতগুলি পাঠ করিলে তিনি বুঝিবেন গীতাঞ্জলি, নৈবেদ্য প্রভৃতি গ্রন্থ রবীন্দ্র-জীবন-দর্শনের বহির্ভূত কোনো তত্ত্ব বহন করে না, তখন স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন : রবীন্দ্র-সাহিত্যে এবং রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই দুইয়ে সম্পূর্ণ মিলন ঘটিয়া ওঠে নাই

বলিয়াই একপ্রকার অশান্তি তাঁহার মধ্যে শেষ পর্যন্ত বিরাজমান ছিল, এই আত্মিক অশান্তিই তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁহার বীণাকে ঝংকৃত করিয়া রাখিয়াছিল।

বস্তুতঃ পূর্ণকে পাইয়া গেলেই শান্তি, অর্থাৎ পূর্ণতে আত্মসমর্পণ করিয়া বিশ্বকে সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হইতে পারিলেই শান্তি, নৈষ্ঠিকী শান্তি; কিন্তু পূর্ণ হইতে হইলে চাই গতি, অর্থাৎ পূর্ণের সত্যশিব গুণগুলি মনন দ্বারা গ্রহণ করিয়া চরিত্রে প্রতিভাত করিতে হইলে চাই অন্তহীন অবাধ গতি। শান্তিকামীর পক্ষে সংসার শূন্যাগার; গতিকামীর পক্ষে সংসার সাধনমন্দির। রবীন্দ্রনাথের গতির সংসার, সাধনার সংসার। সাধনার দ্বারা যতটুকু 'হওয়া' যায় রবীন্দ্রনাথের নিকট ততটুকুই সত্য, বাস্তব সত্য। বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথে 'পাওয়া' নয়, 'হওয়াই' সত্য। হইতে হইতে চলা, হইতে হইতে জ্বলা, হইতে হইতে হওয়ার কথা বিচিত্রসুরে বলা—ইহাই রবীন্দ্র-জীবনদর্শনের গতি, দ্বন্দ্ব বা অশান্তি। 'অশান্তি' কথাটি স্থূলভাবে গ্রহণ করিবেন না। গতিদর্শনের ইহাই প্রাণস্পন্দন, কাব্য-জীবনের ইহাই প্রেরণাদায়িনী শক্তি।

জীবন চলিতেছে, জগৎ চলিতেছে। চলিতেছে বলিয়াই বুঝিতে পারি, পূর্ণের আশ্বাস আছে তাহার চেতনায়। এই পূর্ণের আশ্বাসই প্রমাণ করে পূর্ণ হই নাই বটে, কিন্তু হইবার আগ্রহ তো আছে চরিত্রে। সত্যশিবসুন্দরের বিচিত্র রূপ ও গুণের আনন্দে চরিত্রকে তাই যত উদ্ভাসিত করিতে চাহি—ততই জীবনের বিস্তৃতি ঘটে। সহস্র মহত্ত্বের অনুশীলনে জীবনকে মহিমময় করি, অজস্র ত্যাগের আনন্দে জীবনকে উজ্জ্বলতর করি, অনন্ত প্রেমের মহিমায় জীবনকে গৌরবময় করি, তবু যে পূর্ণকে পূর্ণভাবে চরিত্রে বিকশিত করা গেল না বলিয়া মনে হয়—জীবনের ইহাই দ্বন্দ্ব, ইহাই গতি, ইহাই বেদনা, ইহাই অশান্তি। অশান্তি যেন অহরহঃ জানাইতে থাকে: এখনও হই নাই, এখনও হই নাই—তাই অশান্তির কথা সত্য নয়, গতির কথাই সত্য, তাই হওয়ার জন্য নূতন যাত্রা হয় সুরু। জীবনসাগরে উঠে তুফান, হয়তো বা ভাবনার ওঠে ঝড়, সীমাহীন সাগরের অতল অন্ধকার জাগায় সংশয় —তবু কর্ণধারকে স্মরণ করিয়া পাড়ি দিতে হয় অনন্ত সমুদ্র।

রবীন্দ্রনাথ বলেন: এ-ই তো বাস্তব জীবন। জীবন অপূর্ণ, ইহা সত্যই। কিন্তু অপূর্ণ যখন নিজেকে ফাঁকি দিয়া পূর্ণ বলিয়া বড়াই না করে, যখন নিজেকে অপূর্ণ জানিয়া পূর্ণ হওয়ার বেদনায় যাত্রা করে সুরু, তুচ্ছে বৈরাগ্য আনিয়া অগ্রসর হয় বৃহত্তর জীবনের আনন্দে, প্রাণবিকাশের শত তীর্থে শতরথে করে অভিযান—তখন সেই অপূর্ণ জীবনেই সে কি লাভ করে না মুক্তির আনন্দ? পলে পলে তাহার বিকাশ ঘটে, রূপ হইতে রূপান্তরে দ্বিতীয় জন্ম তাহার লাভ হয়—দ্বিজত্বের এই পরমানন্দ কি মুক্তি নহে?

অপূর্ণতা আপনার বেদনায়
পূর্ণের আশ্বাস যদি নাহি পায়
তবে রাত্রিদিন হেন

আপনার সাথে তার এত দ্বন্দ্ব কেন।
ক্ষুদ্র বীজ মৃত্তিকার সাথে যুঝি
অঙ্কুরি, উঠিতে চাহে আলোকের মাঝে মুক্তি খুঁজি'।
সে মুক্তি না যদি সত্য হয়
অন্ধ মূক দুঃখে তার হবে কি অনন্ত পরাজয়? [অপূর্ণ]

মৃত্তিকার বন্ধন হইতে 'আলোকের মাঝে' ক্ষুদ্র বীজের মুক্তি যেমন সত্য, অহং-এর বন্ধন হইতে অখণ্ডের আলোকে খণ্ড মানুষের মুক্তিও তেমনি সত্য। খণ্ড হিসাবে 'আমি' নানা লোভ, নানা পাপপ্রতারণা ও গুপ্ত কামনায় বন্দী থাকিতে পারে, কিন্তু অখণ্ডের অর্থাৎ পূর্ণের সেই সর্বজগদ্‌গত রূপের ধ্যান ও ধারণা যেই তাহার হৃদয়ে আসিয়া পৌঁছায়, আর তো সে তখন তুচ্ছ লোভে, তুচ্ছ ভয়ে বা শোকে লিপ্ত রহিতে পারে না। তখন যে তাহার মধ্যে 'নয় নয় এই বাণী…মুখরিয়া ওঠে'।

রুদ্রের ডম্বরু ধ্বনি বাজে
অসীম অম্বর-মাঝে—
'নয় নয় নয়'।
ওরে মন, ছাড়ো লোভ, ছাড়ো শোক, ছাড়ো ভয়,
সৃষ্টি নদী, ধারা তারি নিরন্ত প্রলয়। [ধাবমান]

'নিরন্ত প্রলয়'ই হইতেছে সৃষ্টির ধারা। প্রলয় নাই তো সৃষ্টিও নাই। নূতনের বিকাশ যদি চাই তবে পুরাতনের বিনাশে ভয় করিলে চলে না। মৃত্যুকে যে সহজভাবে গ্রহণ করে অমৃতে তো তাহারই অধিকার। মোহগ্রস্ত খণ্ড আমির অধিকতর বাস্তব বুদ্ধি এ কথার সত্যতা উপলব্ধি নাও করিতে পারে, কিন্তু অখণ্ড ভাবাশ্রয়ী আমি-জীবন ইহাকে বাস্তব সত্য বলিয়াই জানে। এইজন্য ইহাতেই তাহার আনন্দ। 'ভেসে যাবার', খসে যাবার আনন্দ'—এই অখণ্ড আমি-জীবনের আনন্দ।

কবি বলিতেছেন: অখণ্ড জীবনের আনন্দকে অনুভবে আনিতে পারিলেই খণ্ডজীবনের মোহ বা শোক আর সত্য বলিয়া মনে হয় না।

শোকের বুদ্‌বুদ্‌ তোর
অশোক সমুদ্রে যাবে ভেসে। [ধাবমান]

খণ্ড জীবনে অখণ্ডভাবের এই উপলব্ধিই মুক্তি। ইহার অভাবেই মানুষ শোকার্ত, মোহার্ত, পাপাসক্ত। মানুষ যতক্ষণ খণ্ডের উপাসক ততক্ষণই হারাইবার ভয়ে বা মোহে সে আন্দোলিত হয়। মনে করে, অবলম্বনটি হারাইয়া গেলে কত বেদনাই না তাহার বাজিবে—বুঝি বা বাঁচিবেই না সে ইহজীবনে। তাহার পর আঘাত যখন আসে তখন সে বুঝিতে পারে, যত ভয় সে করিয়াছে—ততটা ভয় করার ব্যাপার ইহা নহে। বরং এই

কথাই সত্য যে, অপরোক্ষভাবে এই সমস্ত আঘাত জীবনের গতি ও অভিজ্ঞতা বাড়াইয়াই দেয়। এইভাবে ভয় যায় ভাঙ্গিয়া—মোহ যায় বিদূরিত হইয়া।

'মৃত্যুঞ্জয়' নামক কবিতায় কবি উপরিলিখিত ভাবটি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন।

দূর হতে ভেবেছিনু মনে—
দুর্জয় নির্দয় তুমি, কাঁপে পৃথ্বী তোমার শাসনে।…
ভয়ে ভয়ে এসেছিনু দুরু দুরু বুকে
তোমার সম্মুখে।
তোমার ভ্রূকুটিভঙ্গে তরঙ্গিল আসন্ন উৎপাত,—
নামিল আঘাত।…
এইমাত্র? আর কিছু নয়?
যখন উদ্যত ছিল তোমার অশনি
তোমারে আমার চেয়ে বড়ো বলে নিয়েছিনু গণি।

কিন্তু আমি-র চেয়ে মৃত্যু কখনই বড়ো নয়। সহস্র মৃত্যুর মধ্য দিয়া অমৃতের সন্ধানে তাহার অভিযাত্রা। সে জানে, মৃত্যুকে ভয় করিলেই মৃত্যু, জয় করিলে নয়।

'আমি মৃত্যু চেয়ে বড়ো' এই শেষ কথা বলে'
যাব আমি চলে। [মৃত্যুঞ্জয়]

বলাই বাহুল্য, প্রথমোক্ত আমিটি অখণ্ড-আমি এবং শেষোক্ত আমিটি খণ্ড-আমি। খণ্ড-আমি যখন অখণ্ডকে অন্তরে উপলব্ধি করে, তখন সে হাসিতে হাসিতে চলিয়া যায়। অখণ্ডকে যে জানে না, খণ্ড-আমিটিকে কৃপণের ধনের মতো সে-ই কেবল জীয়াইয়া রাখিতে চায়—চলিয়া যাইতে তাহারই বড় ভয়। মৃত্যুঞ্জয় আমি আছে আমি-র অন্তরে, এ-কথা যে জানে, সে তো চিরপথিক। অন্তহীন গতির মধ্য দিয়া দেশে দেশে, কালে কালে, বিচিত্র বহু আমির অসংখ্য খণ্ড রূপে অহরহঃ সে সঞ্চারিত হইতে থাকে, অখণ্ড আমির সর্বভুবনগত মৃত্যুঞ্জয়ত্ব আনন্দভরে করে আস্বাদন।

'পরিশেষ' কাব্যে সর্বত্রগামী যে খণ্ড-আমির কথা বলা হইল, রবীন্দ্রকাব্যে, দর্শনে ও ধর্মদর্শনে তাহাই সর্বোচ্চতম আদর্শ; ধর্মশাস্ত্রে যদি ইহার অধিক কিছু থাকে, তবে পূর্বেই বলিয়াছি, যে তাহা রবীন্দ্রনাথের নহে। মননের দ্বারা এই সর্বত্রগামীকে ধরা যায়, কর্মের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা বাস্তবজীবনে ইহার জ্যোতিও প্রতিভাত করা অসম্ভব নহে। এই সর্বত্রগামী অখণ্ড-আমি ও সর্বজগদ্গত প্রেম যে একই সত্তার ভিন্ন নাম মাত্র—পাঠক তাহা অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছেন। বলা বাহুল্য, অখণ্ড এই সর্বজগদ্গত প্রেমই রবীন্দ্রজীবন ও কল্পনাকে বিচিত্রের পথে পথে ঘুরাইয়া একের মন্দির অভিমুখে

টানিয়াছে। 'কবিকাহিনী' হইতে 'পরিশেষ' পর্যন্ত প্রেমের এই নিত্যগতির আনন্দই নানা সুরে গুঞ্জরিত হইয়াছে কি না বলুন।

'পরিশেষ' কাব্যে কবি যে সত্যের অবতারণা করিয়াছেন—শেষ বয়সের রচনাবলীতে ঠিক তাহাই নূতন করিয়া ও স্পষ্ট করিয়া তিনি বলিয়াছেন। শেষ বয়সের রচনাগুলিকে আধুনিকেরা তত্ত্বসর্বস্ব রচনা বলিয়া উপেক্ষা করিতে চাহেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বের মধ্যে যে আমাদেরি এই পৃথিবী নূতনতর রূপে রূপময়ী হইয়া প্রকাশ পায়, তাহা কি আজও আমরা বুঝিব না? আবার একাধিক পণ্ডিতের রচনায় দেখিতেছি, কবি নাকি শেষ বয়সে পৃথিবীর বস্তুরূপ চিত্রণেই আত্মমগ্ন ছিলেন,—কিন্তু বস্তুরূপের অন্তরে বৃহত্তর বাস্তবের অর্থাৎ অরূপের আনন্দরূপের মহিমা কি আপনি লক্ষ্য করেন নাই? মাটির পৃথিবীর তিনি গান গাহিয়াছেন—কিন্তু মাটির পৃথিবীর রূপে ভাবের পৃথিবীকে অর্থাৎ সেই প্রেমাশ্রিত বৃহত্তর পৃথিবীকেই, তিনি প্রতিষ্ঠা দিতে তো চাহিয়াছেন। ইহা যদি তত্ত্ব হয় তো তত্ত্ব—তবে ইহা বস্তু-অবচ্ছিন্ন নিপ্রেম তত্ত্ব নহে। ইহাকে বাস্তব বলিতে চান তো বাস্তবই বলুন, তবে ইহা বৃহত্তর জীবন-স্বপ্নহীন জড়বৎ বস্তুবিহার নহে।

'পুনশ্চ' হইতে 'সানাই'

'পুনশ্চ' কাব্যের 'বাঁশি' নামক কবিতাটি পাঠ করিলেই এই কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। 'বাঁশি'তে বাস্তব জগতের দুঃখ-দারিদ্র্যের চিত্র নিপুণ রেখায় চিত্রিত হইয়াছে।

কিনু গোয়ালার গালি।
দোতলা বাড়ির
লোহার গরাদে দেওয়া একতলা ঘর
পথের ধারেই।
লোনা ধরা দেয়ালেতে মাঝে মাঝে ধসে গেছে বালি,
মাঝে মাঝে স্যাঁতাপড়া দাগ।
মার্কিন থানের মার্কা একখানা ছবি
সিদ্ধিদাতা গণেশের
দরজার 'পরে আঁটা।
আমি ছাড়া ঘরে থাকে আরেকটা জীব
এক ভাড়াতেই
সেটা টিকটিকি।

তফাত আমার সঙ্গে এই শুধু,
নেই তার অন্নের অভাব।

অন্নহীন এই দরিদ্র পৃথিবীর বর্ণনা তিনি তো করিবেনই, কেন না বস্তু-পৃথিবীকে একেবারে উপেক্ষা করিয়া তাঁহার কল্পনা তো কখনও চলিতে পারে না। শেষ বয়সেই তিনি এইরূপ বস্তুভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন তাহা ভাবিয়া কেন বিস্ময় প্রকাশ করিব? বস্তুঘন এই বর্ণনা যখন চরমে উঠিবে তখনও তো বিস্মিত হইব না :

বর্ষা ঘনঘোর।
ট্রামের খরচা বাড়ে,
মাঝে মাঝে মাইনেও কাটা যায়।
গলিটার কোণে কোণে
জমে ওঠে, পচে ওঠে
আমের খোসা ও আঁটি, কাঁঠালের ভূতি,
মাছের কানকা,
মড়া বেড়ালের ছানা,
ছাইপাঁশ আরো কত কী যে।
ছাতার অবস্থাখানা জরিমানা দেওয়া
মাইনের মতো,
বহু ছিদ্র তার।
আপিসের সাজ
গোপীকান্ত গোঁসাইয়ের মনটা যেমন,
সর্বদাই রসসিক্ত থাকে।
বাদলের কালো ছায়া
স্যাঁতসেঁতে ঘরটাতে ঢুকে
কলে-পড়া জন্তুর মতন
মূর্ছায় অসাড়।
দিন রাত মনে হয়, কোন্ আধমরা
জগতের সঙ্গে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে আছি॥

অন্নহীন নিঃস্ব জগতের বস্তুনিষ্ঠ এই বর্ণনা শেষ বয়সের রচনায় পাইতেছি বটে। কিন্তু সমালোচকদের ধীরভাবে বুঝিয়া লইতে হইবে যে, এই সমস্ত বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনার উদ্দেশ্য কিন্তু ভিন্নতর। কবির কথা এই : অন্নহীন বস্তুপৃথিবীতে দুঃখদারিদ্র্য সত্য, কিন্তু বৃহতের স্বপ্নও সত্য। মাঝে মাঝে তাহা দারিদ্র্য ভেদ করিয়া ওঠে জাগিয়া, যৌবনকে করিয়া যায় চঞ্চল। জীবনের পক্ষে ইহাও সত্য,—এইজন্য ইহাকে বাস্তব বলিতে আমি

দ্বিধা করি নাই। এই 'বাঁশি' কবিতার শেষের দিকে বলা হইতেছে নিঃসম্বল এই দরিদ্র জীবনেও নামে সুরের শান্তি। ইহা শুদ্ধ মাত্র কল্পনা নহে। বাস্তব জীবনে ইহা অবশ্যই সত্য। দুঃখ আছে, দারিদ্র্য আছে, আবার সুরের সম্মোহনে আনন্দস্বপ্নও আছে ইহজীবনে। তাই দরিদ্র হরিপদ কেরাণীও 'হঠাৎ সন্ধ্যায়' যখন বাঁশির সুর শোনে তাহার মনে হয়,

সমস্ত আকাশে বাজে
অনাদিকালের বিরহ বেদনা।
তখনি মুহূর্তে ধরা পড়ে
এ গলিটা ঘোর মিছে
দুর্বিষহ মাতালের প্রলাপের মতো॥

পঁচিশ টাকা বেতন পাওয়া কিংবা এঁদোপড়া দুর্গন্ধ ঘরে সরীসৃপের মত বাস করাই বাস্তব, বাঁশির সুরে হঠাৎ বিশ্বদুঃখ বিস্মৃত হওয়ার আনন্দ কি জীবনের পক্ষে কখনই বাস্তব নহে? বুদ্ধিমান পাঠক এই লইয়া যত খুশি তর্ক করিতে পারেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অতিবড় বাস্তবচিত্রেও অতি সূক্ষ্ম জীবনমহিমার বৃহত্তর বাস্তবটি থাকিবেই থাকিবে। আমার বিশ্বাস, এই কথাটি ধরিতে পারিলেই বুঝা যাইবে, কবির শেষ বয়সের রচনার সুরটি তাঁহার 'পূর্ববর্তী' কবিতার সুর হইতে বিভিন্ন বা বিপরীত তো নহেই, উপরন্তু তাহা পূর্ব সুরেরই স্পষ্টতর প্রসন্ন প্রকাশ।

ড. শ্রীসুবোধচন্দ্র বলিতেছেন: 'ইহাদের মধ্যে শেষ বয়সের রচনায় এমন একটি বিশিষ্ট সুর ধ্বনিত হইয়াছে যাহা পূর্ববর্তী কবিতার সুর হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শান্তির কবি, পরিপূর্ণতার কবি, রোমান্টিক কবি। শেষের দিককার কবিতাগুলি পড়িলে প্রথমে মনে হয় কবি যেন তাঁহার পূর্বকালের কাব্যের ধারা পরিত্যাগ করিয়া অপর এক নূতন ধারা আবিষ্কার করিতেছেন। এখন তিনি পরিপূর্ণ শান্তি ও মাধুর্যের ক্ষেত্র ছাড়িয়া আসিতে চাহিতেছেন নিছক বাস্তবের সংস্পর্শে, 'ছন্দভাঙা অসংগতির মাঝে'। [রবীন্দ্রনাথ, ১২শ পরিচ্ছেদ]

নিছক বাস্তবের কতকগুলি স্পষ্ট চিত্র কবি আঁকিয়াছেন দেখিয়া যদি কেহ তাঁহার পূর্ববর্তী কবিতার সুর হইতে পরবর্তী কবিতার সুর অনেকাংশে বিভিন্ন বলিয়া মনে করেন, তবে তাহা কাব্যসত্যের অপলাপ বলিয়াই গণ্য হইবে। 'সানাই' নামক কবিতায় 'ছন্দভাঙা' অসংগতির ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কয়েকটি চিত্র আছে বটে, কিন্তু সেই ছন্দভাঙা অজস্র অসংগতির মধ্যেও পরম সংগতিময় সানাই-সুরের ব্যঞ্জনা কি আমরা অনুভব করি নাই? সানাই-এর তাৎপর্য কি এই নয় যে, বস্তুজগতে নানা অসামঞ্জস্য, নানা অসংগতি আছে বটে, কিন্তু তবু কোথাও যেন সকলকে লইয়া অর্থাৎ বস্তুগত বিবিধ বৈচিত্র্যকে লইয়া অহরহঃ ধ্বনিত হয় একের আনন্দসুর? অধিকতর বস্তুবোধসম্পন্ন মানুষ বৃহত্তর সেই বাস্তবের আনন্দসুর শুনিতে পায় না বলিয়াই কি বিশ্বমধ্যে দেখে ছন্দভাঙা অসংগতি?

সমস্ত এ ছন্দভাঙ্গা অসংগতি-মাঝে
সানাই লাগায় তার সারঙের তান।
কী নিবিড় ঐক্যমন্ত্র করিছে সে দান
কোন্ উদ্‌ভ্রান্তের কাছে
বুঝিবার সময় কি আছে।
অরূপের মর্ম হতে সমুচ্ছ্বাসি
উৎসবের মধুচ্ছন্দ বিস্তারিছে বাঁশি।
সন্ধ্যাতারা-জ্বালা অন্ধকারে
অনন্তের বিরাট পরশ যথা অন্তর-মাঝারে,
তেমনি সুদূর স্বচ্ছ সুর
গভীর মধুর
অমর্ত্যলোকের কোন বাক্যের অতীত সত্যবাণী
অন্যমনা ধরণীর কানে দেয় আনি। [সানাই]

বস্তুতঃ কবির শেষ বয়সের কবিতাগুলিতে চল্‌তি জগতের চিত্র যত স্পষ্টভাবেই অঙ্কিত হউক না কেন, সমালোচক যদি রবীন্দ্রনাথের কাব্যমানসের স্বরূপটি যথার্থভাবে ধরিতে পারেন, তবে নিশ্চয়ই তিনি বলিবেন যে, কবির মর্ত্যলোকের বাস্তবচিত্রেও আছে—
'অমর্ত্যলোকের কোন্ বাক্যের অতীত সত্যবাণী।'

এই 'সত্যবাণীর' ইঙ্গিতটি ড. সুবোধচন্দ্র যে একেবারেই ধরিতে পারেন নাই, তাহা বলিব না,—কেন না তাহা বলিলে তাঁহার মত সুবিবেচক রসজ্ঞ সমালোচকের প্রতি অবিচারই করা হইবে। তাঁহার রচনার মধ্যে কিছু কিছু অসংগতি আছে বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রণিধানযোগ্য বহু কথাও তাঁহার বইখানিতে রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের রচনা সম্পর্কে অন্য যাহা কিছু তিনি বলুন না কেন, নিম্নলিখিত কথাগুলি আমরা অবশ্যই স্বীকার করিব :

"তুচ্ছ প্রাত্যহিক জীবন লইয়া রবীন্দ্রনাথ যে কাব্য সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার প্রধান গুণ এই যে, ইহার মধ্যে নিকটের প্রত্যক্ষতা ও সুদূরের স্বপ্নমায়ার সমন্বয় হইয়াছে। বর্তমান যুগের হিংসা, অবিচার ও অত্যাচার তাঁহার চিত্তকে পীড়িত করিয়াছে, কিন্তু ইহাকে তিনি দেখিয়াছেন মহাকালের নির্মুক্ত দৃষ্টি দিয়া। বিচিত্র সৃষ্টি লীলার অন্তরালে কবি এমন কিছু খুঁজিয়াছেন যাহা অপরিবর্তমান, বৈচিত্র্যের মধ্যে যাহা একক।"

[রবীন্দ্রনাথ, ১২শ পরিচ্ছেদ]

"শেষ বয়সে তিনি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য রাখিয়াছেন কালের অবিরাম গতি ও আকাশের

নিঃসীমতার উপরে। তিনি চলতি ছবির চিত্র আঁকিয়াছেন কিন্তু সেই চিত্রের পটভূমিকায় রহিয়াছে নক্ষত্রলোকের বিপুলতা।" [তদেব]

'কবিকাহিনী' হইতে 'পরিশেষ' পর্যন্ত আলোচনা করিয়া আমরা দেখাইয়া দিয়াছি যে, 'বৈচিত্র্যের মধ্যে যাহা একক' কবি তাহাকেই অহরহঃ খুঁজিয়াছেন। সেই 'একক' সত্তাটি যে প্রেম, অখণ্ড প্রেম, ইহাও আমরা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছি। 'নক্ষত্রলোকের বিপুলতা' বলিতে সুবোধবাবু যাহা বুঝাইতে চাহেন, তাহা সর্বজগদ্গত সেই প্রেমাভাস ছাড়া আর কিছু নহে। যা' বৃহৎ, যা' মহৎ, যা' সত্য, যা' শিবসুন্দরের আনন্দে ব্যঞ্জিত, তাহাই রবীন্দ্র-কাব্যমানসের প্রাণ ও প্রেরণা। জীবন হইতে এই প্রেরণা বহির্ভূত যে নহে, তাহাই বুঝাইবার জন্য ইহাকে 'বৃহত্তর বাস্তব' নামে অভিহিত করিয়া সাধারণ জীবনগত বোধ-সীমার আয়ত্তাধীনে ইহাকে আনা হইয়াছে। এই বৃহত্তর বাস্তব কবির পূর্ববর্তী রচনা-বলীতে ছিল—কিন্তু পরবর্তীকালে নিছক বাস্তব সংস্পর্শে আসিয়া অধিকতর বাস্তববাদী তিনি হইয়া গেছেন—এই মতবাদ যে আংশিকভাবে সত্য নহে, তাহাই এই প্রসঙ্গে আমার প্রতিপাদ্য।

শেষ বয়সের বিভিন্ন কাব্য হইতে কয়েকটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া দিলেই আমার বক্তব্য আরও স্পষ্ট হইয়া যাইবে।

'পসারিণী' কবিতাটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। হাটের শেষে কেনাবেচা শেষ করিয়া গৃহে ফিরিতেছিল পসারিণী। পথ চলায় ক্লান্ত হইয়াছে সে। বিশ্রামের জন্য সে তাই পথিমধ্যে একটি 'গাছের ছায়াতলে' আসিয়া বসিল। কবিতাংশে এইটুকু অধিকতর বাস্তব অর্থাৎ প্রত্যক্ষ সত্য। কিন্তু ইহার বড় সত্য কি নাই? আছে। কবি জানাইতেছেন লাভের জমানো কড়িগুলি ডালায় রাখিয়া নিরালা মাঠে একাকিনী সেই পসারিণী চারিদিকের মুক্ত প্রকৃতিরূপে মেলিল নয়ন। মুহূর্তের জন্য সে কেমন যেন আনমনা হইয়া গেল, ভুলিয়া গেল সেই হাট, হাটের কেনাবেচা, লাভের জমানো কড়ি।

নিরালা মাঠের মাঝে বসি
সাম্প্রতের আবরণ মন হতে গেল দ্রুত খসি।
কোথা হাট, কোথা ঘাট,
কোথা ঘর, কোথা বাট,
মুখর দিনের কলকথা,—
অনন্তের বাণী আনে
সর্বাঙ্গে সকল প্রাণে
বৈরাগ্যের স্তব্ধ ব্যাকুলতা। [পসারিণী, বিচিত্রিতা]

বস্তুগত মনের অন্তরে এই যে আচম্বিত 'বৈরাগ্যের স্তব্ধ ব্যাকুলতার' উদ্বোধন—ইহা শুধু একটি ভঙ্গী নহে, শুদ্ধমাত্র কবি-কল্পনা নহে, পরন্তু ইহা যে জীবনগত পরম সত্য ব্যাপার—এই কথাটি কবি নানা কবিতায় নানাভাবে আমাদের বুঝাইতে চাহিয়াছেন। কবিগুরুর গদ্যছন্দে লেখা কাব্যগুলির বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনায় ইহারি ইঙ্গিত মেলে। দুই একটি উদাহরণ দিতেছি। প্রথমে 'পুকুর ধারে' কবিতাটি দেখুন।—

ভাদ্রমাসে কানায় কানায় জল।
জলে গাছের গভীর ছায়া টল টল করছে
সবুজ রেশমের আভায়।
তীরে তীরে কলমিশাক আর হেলঞ্চ।
ঢালু পাড়িতে সুপারি গাছ ক'টা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।
এধারের ডাঙ্গায় করবী, সাদা রঙন, একটি শিউলি,
দুটি অযত্নের রজনীগন্ধায় ফুল ধরেছে গরিবের মতো।
বাঁখারি-বাঁধা মেহেদির বেড়া,
তার ওপারে কলা পেয়ারা নারকেলের বাগান;
আরো দূরে গাছপলার মধ্যে একটা কোঠাবাড়ির ছাদ,
উপর থেকে শাড়ি ঝুলছে।
মাথায় ভিজে চাদর জড়ানো, গা-খোলা মোটা মানুষটি
ছিপ ফেলে বসে আছে বাঁধা ঘাটের পৈঠাতে,
ঘণ্টার পর ঘণ্টা যায় কেটে। [পুকুর ধারে, পুনশ্চ]

চমৎকার পল্লীচিত্র। ভাস্করশিল্পীর মহিমা আছে এই বর্ণনায়। কিন্তু রবীন্দ্রমানস কি ইহাতেই স্থির থাকিতে পারে, তৃপ্ত হইতে পারে? অধিকতর সত্যচিত্রের প্রত্যক্ষ সৌন্দর্যখানি বৃহত্তরের আনন্দেই যদি ঝলমল করিয়া না উঠিল, রবীন্দ্র-শিল্পমানস কি তাহাতে আকৃষ্ট হইবে, প্রেরণা অনুভব করিবে?

চেয়ে দেখি আর মনে হয়,—
এ যেন আর কোনো একটা দিনের আবছায়া;
আধুনিকের বেড়ার ফাঁক দিয়ে
দূরকালের কার একটি ছবি নিয়ে এল মনে।
স্পর্শ তার করুণ, স্নিগ্ধ তার কণ্ঠ,
মুগ্ধ সরল তার কালো চোখের দৃষ্টি।

গদ্যছন্দে লেখা আর একটি সার্থক কবিতা 'বাসা'। বর্ণনাচাতুর্যে অভিনব। প্রলোভন হয় সমস্তটাই উদ্ধৃত করিয়া দিই। কবি বাসা বাঁধিয়াছেন 'ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে'। কবিতাটিতে বাস্তব চিত্রটি ফুটিয়াছে কিনা বলুন :

নদীর ধারে ধারে পায়ে চলার পথ
রাঙা মাটির উপর দিয়ে,
কুড়চির ফুল ঝরে তার ধুলোয় ;
বাতাবিলেবু-ফুলের গন্ধ
ঘনিয়ে ধরে বাতাসকে ;
জারুল পলাশ মাদারে চলেছে রেষারেষি ;
সজ্‌নে ফুলের ঝুরি দুলচে হাওয়ায়,
চামেলি লতিয়ে গেছে বেড়ার গায়ে গায়ে,
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।
... ...
নদীর উপরে বেঁধেচি একটি সাঁকো,
তার দুই পাশে কাঁচের টবে
জুঁই বেল রজনীগন্ধা শ্বেতকরবী।
গভীর জল মাঝে মাঝে,
নীচে দেখা যায় নুড়িগুলি।
সেইখানে ভাসে রাজহংস,
আর ঢালু তটে চরে বেড়ায়
আমার পাটল রঙের গাই গরুটি,
আর মিশোল রঙের বাছুর
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে। [বাসা, পুনশ্চ]

কবিতাটির মধ্যে সুন্দরতর আরো অনেক স্তবক আছে যা বর্ণনার চাতুর্যে বাস্তবের চেয়েও প্রখরতর বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ বাসা বাঁধিতেই যেন ইচ্ছা করে এই ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে। কবির উপর ঈর্ষা হয়—তিনি এমন বাসা পাইয়াছেন বলিয়া। কিন্তু না, কবি বলিতেছেন :

এ বাসা আমার হয়নি বাঁধা, হবেও না।
ময়ূরাক্ষী নদী দেখিও নি কোনোদিন।
ওর নামটা শুনিনে কান দিয়ে,
নামটা দেখি চোখের উপরে,

মনে হয় যেন ঘন নীল মায়ার অঞ্জন
লাগে চোখের পাতায়।

এই ময়ূরাক্ষী নদীকে আপনি অবশ্যই অবাস্তব কল্পনা বলিবেন না। বাস্তবের সৌন্দর্য ছানিয়াই ইহার উদ্ভব। কুড়চি ফুল কিংবা বাতাবি লেবুর গন্ধ, জুই বেলি রজনীগন্ধার আনন্দ কিংবা স্বচ্ছ গভীর জলে দৃশ্যমান ছোট ছোট নুড়িগুলি, রাজহংসদের জলে ভাসা কিংবা ঢালুতটে 'চরে বেড়ানো' পাটলরঙের গাই গোরু অথবা তাহার মিশোল রঙের চঞ্চল বাছুরটি—ইহাদের কোনুটি অবাস্তব? আমাদেরি পৃথিবীতে ইহাদের বাস, দুবেলা দুচোখ ভরিয়া দেখি ইহাদের। কিন্তু সকলকে মিলাইয়া কী এক অপূর্ব মায়া-রাজ্যই না হইয়াছে রচিত। যা' দেখিতেছি, তাহারও বড কিছু মনে মনে যেন পাইতেছি দেখিতে। রূপ-কথার স্বপ্ন সৌন্দর্য বিলসিত হইতেছে ইহার সমগ্রতার রূপে।

বস্তুকে ভাবের মহিমায় বৃহত্তর করিয়া তোলাই রবীন্দ্রমানসের বৈশিষ্ট্য। শেষ বয়সের রচনাবলীতে, বিশেষ করিয়া গদ্যছন্দে রচিত কবিতাবলীতে, এই বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ধরা পড়িয়াছে। রবীন্দ্রের গদ্যছন্দকে 'ভাবছন্দ' নামে অভিহিত করা হইয়াছে; গদ্যছন্দকে যিনি এই নামে অভিহিত করিয়াছেন, তিনি গদ্যছন্দের রূপধর্ম ও ভাবধর্মের মর্মকথাই শুধু যে উপলব্ধি করিয়াছেন তাহা নহে, রবীন্দ্রমানসও সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছেন বলিয়াই আমার ধারণা। বস্তুতঃ রবীন্দ্রমানসপারংগম না হইলে ব্যঞ্জনাময় এই তত্ত্বগর্ভ সুন্দর নামটির কল্পনা কাহারও মধ্যে উদিত হইতে পারে বলিয়া আমি মনে করি না। 'ভাবের রঙে' রঞ্জিত হইয়া ছন্দভাঙ্গা অসংগতিও রবীন্দ্রমানসে সুর-সংগতির অনুপম রূপলাবণ্য বিকীর্ণ করে, এই যে সত্য, ইহারি ইঙ্গিতধ্বনির 'মৃদু দোলন' আছে এই ছন্দে, এই 'ভাবছন্দে'। এই ছন্দের রূপগত ও ভাবগত বৈশিষ্ট্য নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি কয়টিতে চমৎকারভাবে ধরা পড়িয়াছে :

দিনে দিনে তোমাকে রাঙিয়েছি
আমার ভাবের রঙে।
আমার প্রাণের হাওয়া
বইয়ে দিয়েছি তোমার চারিদিকে
কখনো ঝড়ের বেগে
কখনো মৃদুমৃদু দোলনে।
আজ তুমি আপনাকে চিনেছ
আমার চেনা দিয়ে।
আমার অবাক চোখ লাগিয়েছে সোনার কাঠির ছোঁওয়া,
জাগিয়েছে আনন্দরূপ
তোমার আপন চৈতন্যে। [দ্বৈত, শ্যামলী]

বস্তুতে ভাবের রূপ অর্থাৎ বৃহত্তর রূপ দেখাই যাঁহার স্বভাব, গদ্যকে পদ্যের মহিমায় ললিতসুন্দর করিয়া জ্যাতিতে তোলা তাঁহার পক্ষেই সম্ভব। এই অভিমতটিকে অন্ধ রবীন্দ্র-ভক্তির নিদর্শন জ্ঞানে দূরে ঠেলিবেন না। মনে রাখিবেন, রবীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দ তাঁহার মনটির স্বরূপই প্রকাশ করিয়াছে। উচ্চতর জীবনবোধে ও রসবোধে উন্নীত না হইলে গদ্যছন্দ অর্থাৎ ভাবচ্ছন্দ সৃষ্টি করাই যায় না। ভাবচ্ছন্দ অন্তর্লীন ভাবজীবনের আনন্দোচ্ছলিত যৌবনতরঙ্গ। কোনো ছান্দসিক ইহার রহস্য উদ্‌ঘাটনে সমর্থ আছেন বলিয়া আমি মনে করি না, কেন না ইহা আক্ষরিক বিজ্ঞানবোধে কখনই ধরা পড়ে না—ইহার রহস্য উচ্চতম মনের অখণ্ড আনন্দসম্বিতেই গুহাহিত। যোগ্য ব্যক্তি ইহাকে রূপ দিতে পারেন বটে কিন্তু ঠিক কোন্ নিয়মে তাহা দিলেন সে কথা কখনই স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারেন না। এইজন্য অক্ষমের হাতে ইহার লাঞ্ছনা অবশ্যম্ভাবী।

গদ্যছন্দের কবিতাগুলিতে নিছক বাস্তবের কথা অনেকস্থলেই আছে বলিয়া আপনি মনে করিতে পারেন। কিন্তু মনে রাখিবেন—নিছক বাস্তব দ্বারা গদ্যছন্দ রসোত্তীর্ণই হইতে পারে না। রবীন্দ্রমানসই, অর্থাৎ স্থূলতর বস্তুরূপে যে মন বৃহত্তর বাস্তবের আনন্দমহিমা দেখিতে জানে সেই মনই, ভাবচ্ছন্দ রচনার অধিকারী।

ভাবচ্ছন্দ সৃষ্টির মূলে রবীন্দ্রনাথের মনের স্বরূপ কি ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে প্রসঙ্গতঃ সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করিলাম। ইহার অধিক বলিবার সুযোগ এখানে নাই। পৃথকভাবে ভিন্ন পুস্তকে এই ছন্দের রূপধর্ম ও ভাবধর্ম লইয়া গবেষণা করার ইচ্ছা রহিয়া গেল। বর্তমানে যাহা বলিতেছিলাম, তাহা এই: শেষ বয়সের রচনাবলীতে কবির মানসধর্ম আদৌ পরিবর্তিত হয় নাই। শেষ বয়সের যে-সমস্ত রচনায় দর্শনভাবানুযায়ী মনোমহিমা প্রকাশ পাইয়াছে, সেগুলির দ্বারা তো অতি সহজেই আমার প্রতিপাদ্য বিষয়কে স্পষ্টতর করা যাইবে। এমন বস্তুরূপ সম্পৃক্ত কোন্ কাব্য বা কবিতার কথা বলিবেন, বলুন, আমি দেখাইয়া দিব তাহারও মধ্যে রাবীন্দ্রিক মানস-মাহাত্ম্যের আনন্দলীলা।

আচ্ছা, 'ঘরছাড়া' কবিতাটি।

'সেঁজুতি' কাব্যের 'ঘরছাড়া' নামক কবিতায় 'গৃহসজ্জার' বাস্তব চিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপেই বর্ণিত হইয়াছে বটে :

জরাগ্রস্ত তক্তপোশ কালিমাখা শতরঞ্চ পাতা ;
আরামকেদারা ভাঙা হাতা ;
পাশের শোবার ঘরে
হেলে পড়া টিপয়ের 'পরে
পুরোনো আয়না দাগ ধরা ;
পোকাকাটা হিসাবের খাতা ভরা
কাঠের সিন্দুক একধারে।

দেয়ালে ঠেসান দেওয়া সারে সারে
বহু বৎসরের পাঁজি ;
কুলুঙ্গিতে অনাদৃত পূজার ফুলের জীর্ণ সাজি।
প্রদীপের স্তিমিত শিখায়
দেখা যায়
ছায়াতে জড়িত তারা
স্তম্ভিত রয়েছে অর্থহারা ॥ [ঘরছাড়া, সেঁজুতি]

গৃহস্থের সংসারচিত্র চমৎকারভাবে ফুটিয়াছে এই কয় পংক্তিতে। কিন্তু কবির উদ্দেশ্য তো এইটুকু বর্ণনা দিয়াই ক্ষান্ত হওয়া নহে। 'ক্ষমাহীন কর্তব্যের ডাকে' 'দূর হতে দূরে' চলিয়া যায় মানুষ, গৃহসজ্জাগুলি যতই তাহার আদরের হউক না কেন-পড়িয়া থাকে পশ্চাতে, এই কথাটিই তো 'ঘরছাড়া'র সুরে বড় বেশী করিয়া বাজিয়াছে। এই সংসার, এই সংসারের চিরাভ্যস্ত স্নেহপ্রেমের নিত্য নূতন আবেগ-ছবি, এই—

গলা ধরাধরি কথা
মেয়েদের ; ছুটি পাওয়া
ছেলেদের ধেয়ে যাওয়া
হৈ হৈ রবে ; হাটবারে ভোরবেলা,
বস্তা-বহা গোরুটাকে তাড়া দিয়ে ঠেলা ;
আঁকড়িয়া মহিষের গলা
ওপারে মাঠের পানে রাখাল ছেলের ভেসে-চলা।

সবি সত্য, কিন্তু ইহার সঙ্গে ইহাও সত্য :

পথিক চলিল একা
অচেতন অসংখ্যের মাঝে।
সাথে সাথে জনশূন্য পথ দিয়ে বাজে
রথের চাকার শব্দ হৃদয়বিহীন ব্যস্ত সুরে
দূর হতে দূরে ॥

এই 'দূর হতে দূরে' চলিয়া যাওয়ার সুরটি না ধরিলে রবীন্দ্র-চিত্রিত বাস্তব চিত্রের শিল্প-রসটুকু আস্বাদন করা যেমন সম্ভব নয় কবির জীবনদর্শন তেমনি সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধিও হয় না। সংসারের অতিবড় তুচ্ছ সুর শুনিয়াও আপনাকে নামিতে হইবে ভাবের অতলে, অতিবড় জড়ধর্মী বস্তুদৃশ্য দেখিয়াও চলিতে হইবে জীবনের চরমসত্যের অন্বেষণে। 'আকাশ প্রদীপে'র 'ঢাকিরা ঢাক বাজায়' কবিতাটি এবং 'নবজাতকের' 'ইস্‌টেশন' কবিতাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। 'আকাশপ্রদীপে'—

অনেক কালের শব্দ আসে ছড়ার ছন্দে মিলে
ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে।

এবং 'নবজাতকে'—

সকালবিকাল ইস্‌টেশনে আসি,
চেয়ে চেয়ে দেখতে ভালোবাসি।
চলচ্ছবির এই যে মূর্তিখানি
মনেতে দেয় আনি
নিত্য মেলার নিত্য ভোলার ভাষা
কেবল যাওয়া আসা।

এই উভয় চিত্রে ঢাকির ঢাক বাজানোর সুরে অনেক কালের শব্দ শোনা, কিংবা 'ইস্‌টেশনের' রূপে জীবনস্বরূপের তত্ত্বরূপ দেখা, সোজা কথায়, তুচ্ছ জড়বস্তুর রূপে ভাবরূপের এই যে মহিমা দর্শন—ইহাই রবীন্দ্রনাথের বস্তু-চিত্র চিত্রণের বৈশিষ্ট্য। কবির শেষ বয়সের যে কোনো বস্তুচিত্র আপনি দেখুন, অবশ্যই তাহার রেখায় রেখায় এই বৈশিষ্ট্যের আলোছায়া আপনি লক্ষ্য করিবেন। 'জন্মদিনের' 'ঐকতান', 'আরোগ্যের' 'ঘণ্টা বাজে দূরে', অথবা 'ওরা কাজ করে' প্রভৃতি কবিতায় উপর্যুক্ত অভিমতের সুস্পষ্ট প্রামাণ্য মিলিবে। 'ঐকতান' নামক কবিতায় চাষির কথা আসিয়াছে, আসিয়াছে তাঁতিদের কথা, জেলেদের কথা,—

চাষি খেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল,
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার,
তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।

কিন্তু ইহাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে পূর্ণভাবে কোনোদিন মিশিতে পারেন নাই বলিয়া কবি গভীর বেদনাও অনুভব করিয়াছেন।

অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।
মাঝে মাঝে গেছি আমি ওপাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে,
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।

কিন্তু ইহাই এই কবিতার মূলকথা নহে। মূলকথা হইল এই: জীবন দিয়া যাহা উপলব্ধি করি, তাহাই সত্য, তাহাই প্রকাশিতব্য।

জীবনে জীবনে যোগ করা
না হলে, কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পশরা।

কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।
এসো কবি, অখ্যাতজনের
নির্বাক মনের।
মর্মের বেদনা যত করিয়ো উদ্ধার—
প্রাণহীন এদেশেতে গানহীন যেথা চারিধার,
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি
রসে পূর্ণ করি দাও তুমি। [জন্মদিনে-১০]

—ইহা অধিকতর বাস্তবের সপক্ষে ওকালতী নহে। বৃহত্তর বাস্তবের আদর্শ আছে ইহার বাণীর ঝংকারে। সৌখীন 'প্রোলেটারিয়েন' কাব্যরচনার বিলাসিতা নহে, জীবনগত প্রেম ও সত্য সাধনার নিষ্ঠা ইহার বাণী। বস্তুতঃ প্রেম ও সত্য সাধনায় যাঁহার নিষ্ঠা, কর্মে ও কথায় যাঁহার সমতা, 'মূক' এবং 'নতশির স্তব্ধ' মানুষের চিত্তবিকাশে যাঁহার সাধনা, নগণ্যকে আত্মীয়জ্ঞানে বুকে লইতে এতটুকু যাঁহার দ্বিধা নাই, 'অখ্যাতজনের' ও 'নির্বাক মনের' অন্তর্লীন গভীর বেদনাকে ভাষা দিবার আনন্দসাধনায় যিনি জীবনযোগী, তাঁহাকেই তো কবি এই কবিতায় সাদর আহ্বান জানাইয়াছেন।

সাহিত্যের ঐকতান-সংগীতসভায়
একতারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায়—
মূক যারা দুঃখে সুখে,
নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে,
ওগো গুণী,
কাছে থেকে দূরে যারা, তাহাদের বাণী যেন শুনি।
তুমি থাকো তাহাদের জ্ঞাতি,
তোমার খ্যাতিতে তারা পায় যেন আপনারি খ্যাতি;
আমি বারংবার
তোমারে করিব নমস্কার॥ [তদেব]

মানুষ হিসাবে আজও যাহারা নগণ্য, 'ঐকতানে' বলা হইল কাব্যের স্বপ্নস্বর্গে স্থান হইবে তাহাদেরও; 'ঘণ্টা বাজে দূরে' কবিতায় বলা হইয়াছে যে, জীবনের চলতি পথে যে সমস্ত চিত্র চলচ্চিত্রের মত আমাদের চোখে মুহূর্তের জন্য ভাসিয়া ওঠে, শিল্পজীবনে সেই 'ক্ষণচর' সাধনার চিত্রগুলিও অনন্ত রসবোধ ও চেতনার বেদনা পারে জোগাইতে।

গঞ্জের টিনের চালাঘরে
গুড়ের কলস সারি সারি ;
চেটে যায় ঘ্রাণলুব্ধ পাড়ার কুকুর,
ভিড় করে মাছি।
রাস্তায় উপুড়মুখো গাড়ি
পাটের বোঝাই ভরা ;
একে একে বস্তা টেনে উচ্চস্বরে চলেছে ওজন
আড়তের আঙিনায়। [আরোগ্য-৪]

কি—

জেলেনৌকো এল ঘাটে,
ঝুড়ি কাঁখে জুটেছে মেছুনি ;
মাথার উপর ওড়ে চিল।
মহাজনি নৌকাগুলো ঢালুতটে বাঁধা পাশাপাশি।
মাল্লা বুনিতেছে জাল রৌদ্রে বসি চালের উপরে। [তদেব]

কি—

হেথা হোথা চরে গোরু শস্যশেষ বাজরার খেতে ;
তর্মুজের লতা হতে
ছাগল খেদায়ে রাখে কাঠি হাতে কৃষাণবালক।
কোথাও বা একা পল্লীনারী
শাকের সন্ধানে ফেরে ঝুড়ি নিয়ে কাঁখে। [তদেব]

কিংবা—

গোলকচাঁপার গাছ অনাদৃত কাদের বাগানে ;
তলায় আসন গাঁথা বৃদ্ধ মহানিম,
নিবিড় গম্ভীর তার আভিজাত্যছায়া।
রাত্রে সেথা বকের আশ্রয়।
ইঁদারায় টানা জল
কানা বেয়ে সারাদিন কুলু কুলু চলে
ভুট্টার ফসলে দিতে প্রাণ। [তদেব]

প্রভৃতি চিত্র এমনকিছু অসাধারণ নয়। পল্লীপথের দুপাশে ইহাদের দর্শন মেলে সকাল সন্ধ্যায়। যখন দেখিয়া যাই, তখন ইহাদের মূল্য কিছু দিই বলিয়া তো মনে হয় না। কিন্তু 'এই সব উপেক্ষিত ছবি' যখন দূর অতীতে বিগত হইয়া দূরত্বের জ্যোতি-সমভিব্যাহারে স্মৃতির দর্পণে ছায়া ফেলে, নূতনতর ইহাদের রূপ শিল্প-চেতনাকে তখন

প্রেরণান্বিতই করিয়া তুলে। ক্ষণচর চিত্রগুলিই তখন লাভ করে অনন্তের আনন্দাসন। পৃথিবী হইতে বিদায় লইবার যখন সময় আসে, যখন 'ঘণ্টা বাজে দূরে', তখনও ক্ষণচরের এই অনন্ত রূপের মহিমাটি অস্বীকার যেন করিতে পারি না।

পথে চলা এই দেখাশোনা
ছিল যাহা ক্ষণচর
চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশে,
চিত্তে আজ তাই জেগে ওঠে;
এই সব উপেক্ষিত ছবি
জীবনের সর্বশেষ বিচ্ছেদবেদনা
দূরের ঘণ্টার রবে এনে দেয় মনে॥ [তদেব]

প্রেমের দৃষ্টিতে, বহুবার বলিয়াছি, আসক্তির ভাব যেমন নাই, উপেক্ষার অন্ধতাও তেমনি নাই। প্রেমের দৃষ্টিতে বিশ্ব সুন্দর, পুষ্প সুন্দর, পাখী সুন্দর, ঘ্রাণলুব্ধ পাড়ার কুকুরটা সুন্দর, ভ্যান্‌ভেনে মাছিগুলো সুন্দর, 'আরতের আঙিনার ছবি' সুন্দর, 'মহাজনি নৌকার সার'ও সুন্দর; প্রেমের দৃষ্টিতে ক্ষণচর এই নিতান্ত নগণ্য ছবিগুলিও অনন্ত সুন্দরের শিল্পচ্ছবি। কবির শেষ বয়সের রচনাবলীতে এই শিল্পচ্ছবিই তো দেখিতেছি।

শেষ বয়সে কবি নিছক বাস্তবের সংস্পর্শে আসিয়াছেন বলিয়া যাঁহাদের ধারণা হইবে—তাঁহাদের এই কথাটি অবশ্যই স্মরণে রাখিতে হইবে যে, বাস্তবের রূপে কবি এই শিল্পচ্ছবি দেখিতেন বলিয়াই বাস্তবসংস্পর্শে আসা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে। শুদ্ধমাত্র নিছক বাস্তবের স্থূলতায় কবির মন কখনই আকৃষ্ট হয় নাই—যেমন শুধুমাত্র অবাস্তব তত্ত্বের বিশুষ্কতায় কবির প্রেমমানস কদাচ সাড়া দিতে পারে নাই। 'আরোগ্য' কাব্যের 'ওরা কাজ করে' কবিতাটি প্রথমদৃষ্টিতে বস্তু-কঠিন পৃথিবীর সাধারণ চিত্রকথা বলিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন—কিন্তু ওটিকে আমি কর্মীজীবনের শাশ্বত কীর্তি-মহিমার কালজয় আনন্দচ্ছবি ছাড়া অন্য কিছু ভাবিতে পারি নাই। সংসারে নীরবে যাহারা কাজ করিয়া যায়, পৃথিবীকে রক্ষা করে অভাব হইতে, অনটন হইতে—প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে সেই তাহারা দুঃখী হইতে পারে, দরিদ্র হইতে পারে, দীনাদপি দীন হইতে পারে, কিন্তু কবির দৃষ্টিতে যদি তাহারা মানবিকতার মাহাত্ম্যের কল্যাণমূর্তিরূপে প্রতিভাত না হইত তবে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, কবিকে তাহারা কিছুতেই আকৃষ্ট করিতে পারিত না। 'ওরা কাজ করে' শুদ্ধমাত্র বস্তুগত জগতের চলচ্চিত্র নয়,—জেলে, মাল্লা ও চাষিদের কথা উল্লেখ করিয়া আধুনিক বস্তুবিলাসী মনকে খুশি করিবার সাময়িক চেষ্টা নয়, বস্তুকঠিন শুষ্ক পৃথিবীর চিত্র অপেক্ষা অখ্যাতনামা কর্মীজীবনের অমর মহিমাই ইহাতে পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে।

ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল ;
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে। [আরোগ্য-১০]

কিন্তু এইটিই কি কবিতার সব ? নিরলস কর্মের মহিমায় উহাদের মৃত্যুঞ্জয় মহামূর্তিটি কি ফুটিয়া বাহির হয় নাই ?

ওরা কাজ করে
দেশে দেশান্তরে,
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের সমুদ্র নদীর ঘাটে ঘাটে,
পঞ্জাবে বোম্বাই-গুজরাটে।
গুরু গুরু গর্জন, গুন্ গুন্ স্বর
দিনরাত্রে গাঁথা পড়ি দিনযাত্রা করিছে মুখর।
দুঃখ সুখ দিবসরজনী
মন্ত্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি।
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ-'পরে
ওরা কাজ করে। [আরোগ্য-১০]

সম্রাটের সাম্রাজ্যগঠনের প্রমত্ত অহংকার বেশিদিনের নয়, কিন্তু বিশ্বকে বাঁচাইবার জন্য সবার আড়ালে কর্মীর নিরলস কর্মসাধনা চিরকালের। যুগে যুগে প্রবলপরাক্রান্ত মানুষ জাগে, সাম্রাজ্যের উত্থান হয়, বিজয়রথের চাকা ধূলিজাল উড়ায় ঊর্ধ্বে, বিজয়পতাকা উড়ে আকাশে —কিন্তু কতদিন এ-সব স্থায়ী হয় ?

রাজছত্র ভেঙ্গে পড়ে ; রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে,
জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তার ভোলে।

কিন্তু ওরা ?

ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল।···
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ-'পরে
ওরা কাজ করে॥

কবির শেষ বয়সের বস্তুধর্মী কবিতাবলীর মর্মকথা সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। রচনা-রীতি, ভাষা ও আঙ্গিকের বিচারে সম্পূর্ণ নূতন কবিতা শেষ বয়সের কাব্যাবলীতে আরো

অনেক আছে, কিন্তু মনোদর্শনের দিক হইতে কবির বস্তুধর্মী কবিতা সম্পর্কে আমার যাহা বলার ছিল তাহা বলা হইয়াছে বলিয়া প্রসঙ্গান্তরে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করিতেছি। ইতঃপূর্বে যে সমস্ত কবিতাংশ আমি উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছি এবং স্থানে স্থানে ব্যাখ্যা ও আলোচনা করিয়াছি, পাঠক মহোদয় সেইগুলির অন্তরস্থিত রাবীন্দ্রিকতা যদি অনুসরণ করিয়া থাকেন, তবে অবশ্যই বুঝিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী কবিতাবলীর বিরুদ্ধভাব সেগুলিতে নাই। শেষ বয়সের কোনো কোনো কবিতায় নারী ও নারীপ্রেম সম্বন্ধে কবির মনোভাবের মধ্যে উগ্র নূতনতা ও 'দুর্বার বিদ্রোহ' কেহ কেহ লক্ষ্য করিয়াছেন [ড সেনগুপ্তের 'রবীন্দ্রনাথ' দ্রষ্টব্য]। কিন্তু সেই নূতনতা ও বিদ্রোহিতার অন্তরালে রাবীন্দ্রিক মানস-মহিমার চিরন্তন রূপটি যে আছে, একটু তলাইয়া বুঝিলেই তাহা স্পষ্ট হইয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ 'সানাই' কাব্যের 'মুক্তপথে' কবিতাটি উল্লেখ করিতে পারি।

কবিতাটিতে 'জাত-খোয়ানো প্রিয়া'র কথা আছে। কবিতাটির শুরু এইরূপ :

> বাঁকাও ভুরু দ্বারে আগল দিয়া,
> চক্ষু করো রাঙা,
> ঐ আসে মোর জাত-খোয়ানো প্রিয়া
> ভদ্র-নিয়ম ভাঙা।

পংক্তি কয়টিতে প্রচ্ছন্ন পরিহাসটুকু আগে লক্ষ্য করুন। জাত নাই যাহার, ভদ্র-সমাজে, 'আচার-মানা ঘরে', তাহার স্থান নাই, কিন্তু আমি তাহাকে স্থান দিয়াছি আমার কাব্যের কুঞ্জকাননে। চক্ষু রাঙা করিয়া শাসন করিতে হয় করো, ভুরু কুঁচকাইয়া 'কালে কালে কি যে হইতেছে' বলিয়া স্মৃতিসংহিতার নিয়মগুলি কঠিনতর করিতে হয় করো, আমি না হয় স্মৃতিকণ্ঠ বাচস্পতিদের পাড়াটা আর মাড়াইব না—'বামুনপাড়ার রাস্তাটা' না হয় ভুলিয়াই যাইব, কিন্তু প্রেমের নির্দেশ তো ভুলিতে পারিব না। মুখে স্নো মাখিয়া বা পাউডার ঘসিয়া, চোখধাঁধানো চকচকে শাড়ি পরিয়া কিংবা মূল্যবান কিছু অলংকার অঙ্গে ধারণ করিয়া মুক্তপথে দর্শন দেয় নাই এই নীচজাতীয়া রমণী—কিন্তু রমণী বলিয়া তাহার কি স্বতন্ত্র সম্মান নাই পুরুষের কল্পনায়? মূল্যবান বেশভূষা নাই বলিয়া ভদ্র-সমাজ তাহার রমণীরূপের স্বাতন্ত্র্যকে মর্যাদা নাই বা দিল,—'বেশের আদর' করিতে গিয়া না-হয় উহারা 'রূপের আদর' করিতে ভুলিয়াই গেল কিন্তু তাই বলিয়া কবির কাব্যোপবনের দ্বার তো তাহার বিরুদ্ধে অবরুদ্ধ রহিতে পারে না।

> বেশের আদর করতে গিয়ে ওরা
> রূপের আদর ভোলে—

কবি কহিতেছেন :

আমার পাশে ও মোর মনোচোরা,
একলা এসো চলে।
হঠাৎ কখন এসেছ ঘর ফেলে
তুমি পথিক-বঁধু,
মাটির ভাঁড়ে কোথার থেকে পেলে
পদ্মবনের মধু।
ভালোবাসি ভাবের সহজ খেলা
এসেছ তাই শুনে—
মাটির পাত্রে নাইকো আমার হেলা
হাতের পরশগুণে।

এই 'জাত-খোয়ানো প্রিয়ার' কথা লইয়া আধুনিক সমালোচকদের উৎসাহের অবধি নাই। একজন সমালোচক ইহার মধ্যে কবির নূতন জীবনাদর্শই দেখিয়া ফেলিয়াছেন। কবিতাটির মধ্যে আধুনিকতার গন্ধ আছে বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন অনেকে। কবিতাটির মধ্যে নারীর কথা আছে, সেই নারী আবার জাত-খোয়ানো নারী, তাহাকে সম্বোধন করা হইয়াছে 'প্রিয়া' বলিয়া। ভাষার দিক দিয়াও কবিতাটি শুধু যে সহজ, সরল ও সর্বজনবোধ্য, তাহা নহে, স্বেচ্ছাকৃত কৃত্রিম গ্রাম্যতাদোষে দুষ্ট ও দুঃসাহসিকও বটে, এই সমস্ত কারণেই বোধ হয় সাধারণ অর্বাচীন পাঠকের কাছে শুধু নয়, পণ্ডিত পাঠকের কাছেও ইহার ব্যঞ্জনা অপেক্ষা বাচাই পাইয়াছে মর্যাদা। প্রেমের দৃষ্টিতে উপেক্ষার পাত্র বা পাত্রী যে কেহই নহে, প্রেমের অনন্ত আনন্দ-চেতনার নিকট সামাজিক কুসংস্কারের অন্ধতা যে মুহূর্তকাল মর্যাদা পাইতে পারে না—এ-কথা আমরা 'মুক্তপথে' আসিয়াও বুঝিতে পারি নাই! 'পরিশেষ' কাব্যে ঠিক এইভাবের একটি কবিতা, নাম 'জলপাত্র', ভিন্নতর আঙ্গিকে ও গাম্ভীর্যময় ভাষায় প্রকাশ পাইয়াছে। কৌতুকের বিষয় এই, সেটি লইয়া কোনো আধুনিক কবিকে বা পণ্ডিতকে মাতামাতি করিতে দেখি নাই। কবিতাটির ভাব এই :

নীচজাতীয়া একজন রমণীর দ্বারে আগত হইল তরুণ বৈরাগী প্রেমিক। 'তীব্র দ্বিপ্রহরে,···চাহিল তৃষ্ণার বারি। রমণী আপন নীচজাতির কথা স্মরণ করিয়া হইল সঙ্কুচিতা। কহিল :

প্রভু, তুমি পূজনীয়। আমার কী জাত,
জান তাহা হে জীবননাথ।
তবুও সবার দ্বার ঠেলে
কেন এলে

কোন্ দুখে
আমার সম্মুখে !

শুনিয়া তরুণ প্রেমিক কহিল :

হে মৃন্ময়ী,
পুণ্য যথা মৃত্তিকার এই বসুন্ধরা
শ্যামল কান্তিতে ভরা,
সেই মতো তুমি
লক্ষ্মীর আসন, তাঁর কমলচরণ আছ চুমি।
সুন্দরের কোনো জাত নাই
মুক্ত সে সদাই।

রবীন্দ্রকবিতাবলীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা এই 'জলপাত্রের' বাণী যা, 'মুক্তপথের' বাণী মর্মতঃ তাহাই—

সুন্দরের কোনো জাত নাই
মুক্ত সে সদাই।

তবে এ-কথা সত্য যে, মনের বন্ধন না ঘুচিলে 'মুক্তপথের' স্বভাবসৌন্দর্য উপলব্ধি করা অর্থাৎ 'শতদল পঙ্কজের' যে কোনো জাতি নাই,—এই শিল্পসত্যের আনন্দ আস্বাদন করা সহজ হয় না। 'ক্যামেলিয়া' কবিতায় ('পুনশ্চ' দ্রষ্টব্য) ভদ্রজাতীয়া কমলার মোহপথ হইতে মুক্ত হইয়া সাঁওতালী 'ক্যামেলিয়ার' মুক্তপথে অপূর্ব রূপমহিমার রসাস্বাদন যাঁহার সম্ভব হয়, প্রেমকেন্দ্রিক জীবনবোধের শিল্পচেতনার আনন্দরহস্য তিনিই উন্মোচন করিতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের প্রেমতত্ত্বের মর্মবাণী যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, জাত-খোয়ানা প্রিয়ার কথায় হঠাৎ তিনি চমকাইয়া উঠিবেন না—একটু ধীরভাবে দেখিলেই বুঝিবেন, 'জলপাত্রের' ধীরললিত প্রেমের ধ্বনি হইতে 'মুক্তপথের' সরলকান্ত প্রেমের ধ্বনি মর্মতঃ বিপরীত বা বিভিন্ন নহে। 'মুক্তপথের' ভাষায়, ভঙ্গীতে অথবা পরিবেশ রচনায় যতই ভিন্নতা প্রকাশ পাক না কেন, প্রেমের আদর্শ পূর্বের ন্যায় অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে।

ভালোবাসি ভাবের সহজ খেলা···
মাটির পাত্রে নাইকো আমার হেলা।
হাতের পরশগুণে।

প্রেমের দৃষ্টিতে কাব্যের উপেক্ষিতাও অপেক্ষিতার মর্যাদায় রহে মনোরমা। বিশ্বকে স্বীকার করে প্রেম, স্বীকার করে বিশ্বজনকে। পণ্ডিতগণ লক্ষ্য করিলেই বুঝিবেন, 'মুক্তপথে' কবিতার বাচ্যে আছে বিদ্রোহিতা, জাতিসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচ্ছন্ন পরিহাস—কিন্তু ব্যঞ্জনায় আছে রাবীন্দ্রিক প্রেমের মানবিক মাধুর্যমহিমা।

রবীন্দ্রকাব্যের এই ব্যঞ্জনামাহাত্ম্য লক্ষ্য করিয়াই একাধিক সুধী-রসিক কবিকে 'রোমান্টিক' নামে অভিহিত করিয়াছেন। যে যে গুণ থাকিলে 'রোমান্টিক' হওয়া সম্ভব —রবীন্দ্রনাথে সেই সেই গুণ পূর্ণমাত্রায় আছে, সন্দেহ নাই। কল্পনাপ্রতিভার অনন্যসাধারণ বিকাশে (An extra-ordinary development of imaginative sensibility —Herford), অতীত সুখস্মৃতির বেদনাময় আনন্দে (The calling of the Past—Abercrombie), রূপের সহিত অরূপের মিলন-সোহাগে (Addition of strangeness to beauty—Pater), অহং-এর মুক্তি-প্রবণতায় (Emancipation of the Ego —Brunetiere), বিস্ময়চেতনার নবোদ্বুদ্ধ ভাবাবেশে (Renaissance of Wonder—Watt-Dunton) রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাহিত্য সত্যই তো ঝলমল করিতেছে! আজ পর্যন্ত কবি তাই রোমান্টিক নামেই পরিচিত হইয়া আসিতেছেন- কেহ প্রতিবাদ করেন নাই। আমি যে ইহার প্রতিবাদ করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইতেছি তাহা নহে, কেন না আমি জানি, প্রেমকেন্দ্রিক চিত্ত রোমান্টিক তো হইতেই পারে, যেমন হইতে পারে রিয়ালিস্ট্ বা হিউম্যানিস্ট্, প্র্যাগ্‌ম্যাটিস্ট্, ট্র্যানসেন্‌ডেন্টালিস্ট্। রবীন্দ্রনাথের প্রেমতত্ত্ব যাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন—মানবিকতার মাহাত্ম্যবিকাশের সংকল্প ও কর্মবাদে যাঁহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন, কবিকে 'রোমান্টিক' বলিতে তাঁহারা অখুশি হইবেন না বটে, কিন্তু মনে মনে জানিবেন ইহাই কবিগুরুর পূর্ণ পরিচয় নহে। এই কথাটি কবি স্বয়ং 'রোমান্টিক' নামক একটি কবিতায় বলিতেও গিয়াছেন—কিন্তু কেহই সে-কথা কানে তোলেন নাই; বরং অনেকেই মনে করিয়াছেন, কবি নিজেও ঐ রোমান্টিক নাম মানিয়া লইয়াছেন ঐ কবিতায়।

সত্যই তো, কবি তো স্পষ্ট করিয়াই বলিতেছেন :

আমারে বলে যে ওরা রোমান্টিক।
সে কথা মানিয়া লই
রসতীর্থ-পথের পথিক।
মোর উত্তরীয়ে
রঙ্ লাগায়েছি, প্রিয়ে।
দুয়ার-বাহিরে তব আসি যবে
সুর করে ডাকি আমি ভোরের ভৈরবে।…
যে-কলালোকের কেন্দ্রে তোমারে বসাই
ধূলি-আবরণ তার সযত্নে খসাই
আমি নিজে সৃষ্টি করি তারে।…
জানি, তার অনেকটা মায়া,
অনেকটা ছায়া।

আমারে শুধাও যবে 'এরে কভু বলে বাস্তবিক' ?
আমি বলি, 'কখনো না, আমি রোমান্টিক'।
[রোমান্টিক, নবজাতক]

অন্যত্র, 'অনসূয়া' নামক আর একটি কবিতায় :

আমি জন্ম-রোমান্টিক,
আমি সেই পথের পথিক
যে-পথ দেখায়ে চলে দক্ষিণে বাতাসে,
পাখির ইশারা যায় যে পথের অলক্ষ্য আকাশে।
মৌমাছি যে পথ জানে
মাধবীর অদৃশ্য আহ্বানে।
এটা সত্য কিংবা সত্য ওটা
মোর কাছে মিথ্যা সে তর্কটা। [অনসূয়া, সানাই]

অতএব আর তো কোনো সন্দেহই রহিল না যে, কবি রোমান্টিক। ইংরেজী অলংকারশাস্ত্র হইতে যাঁহারা রোমান্টিক শব্দটি শিখিয়াছেন, তাঁহারা কিন্তু একবারও ভাবিয়া দেখিলেন না যে, বিশেষ ঐ নামরূপের দ্বারা রবীন্দ্রমানসের ও প্রতিভার কতটুকু পরিচয় স্পষ্ট হয়। বস্তুরূপে রবীন্দ্রনাথ 'অনেকটা মায়া' ও 'অনেকটা ছায়া' মেলিয়া দেন, চলমান চঞ্চল তাঁহার চিত্ত কল্পনা হইতে কল্পনা করে পরিক্রমা, অতীতের বসন্তস্মৃতির বেদনায় কিংবা অনাগতের অমৃতপ্রীতির কল্পনায় নিত্য উদ্বেজিত রহে তাঁহার প্রেম, অতএব তিনি যে রোমান্টিক, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নাই। কিন্তু আকাশচারী কল্পনা যেখানে শিববুদ্ধির সহায়ে বস্তুতে মূর্ত হইবার কর্মপন্থা আবিষ্কার করিয়াছে, দৈন্য, ব্যাধি ও কুশ্রীতার সহিত সংগ্রাম করিবার অভিপ্রায়ে চিত্ত যেখানে 'নির্মম কর্ম' করিবার নির্দেশ দিয়াছে আনন্দে,—বুদ্ধির দ্বারা হৃদয়কে ধী ও হ্রীযুক্ত করিয়া এবং হৃদয় দ্বারা বুদ্ধিকে শ্রীযুক্ত করিয়া মন যেখানে মানুষ গড়ার কর্মোদ্যত সংকল্পে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, সহজস্বভাবের মোহকে স্বীকার করিয়াও সাধনস্বভাবের ক্লেশবরণে হৃদয় যেখানে হইয়াছে আমৃত্যু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, শুধু কল্পনা নয়—কর্ম, শুধু হৃদয় নয়—মনীষা, শুধু কাব্য নয়—দর্শন, শুধু ভাবা নয়—হওয়া, যেখানে গুঞ্জরিত হইয়াছে আনন্দিত ছন্দরঙ্গে, পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে একত্র আলিঙ্গিত হইয়া জীবন ও জগতের ধর্মকে উন্নীত করিতে চাহিয়াছে বৃহত্তর মর্যাদায়, সেখানে সেই বৃহত্তর বাস্তব জগতে যিনি স্থাপন করিয়াছেন জীবনাশ্রম, ইংরেজীভাষাবিৎ পণ্ডিতবর্গ কী তাঁহার নাম দিবেন জানি না, আমি কিন্তু তাঁহাকে নিজে বুঝিবার জন্য প্রেমকেন্দ্রিক কবি কহিব এবং বাহিরে যাঁহারা ইহার মর্মার্থ না বুঝিবেন, তাঁহাদের নিকট 'বৃহত্তর বাস্তববাদী' বলিয়াই তাঁহার পরিচয় প্রদান করিব। এতদিন ধরিয়া আমরা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে কেবল 'রোমান্টিক' স্বপ্ন ও কল্পনা দেখিতেই অভ্যস্ত হইয়া আছি, রবীন্দ্রকল্পনায় যে 'প্র্যাগম্যাটিক্'

কর্মবাদএর স্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে—জীবন ও জগৎকে সুন্দরতর করিবার তত্ত্ব-নির্দেশ রহিয়াছে—একথা তো তলাইয়া বুঝি নাই। বস্তুজগতের রূপে অরূপ দেখার অর্থ তো শূন্য কল্পনাবাদ নয়, বস্তুজগতকে জাতে তুলিয়া তাহার সহিত উচ্চজাতির মতো ব্যবহার করাই তো এই তত্ত্বের তাৎপর্য। এটা আমরা বুঝি নাই—তাই রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়িয়াছি, ভাবের কথা বলিতে, কেহ বা বুঝিতেও শিখিয়াছি, কিন্তু উচ্চজাতির মানুষ হইতে শিখি নাই। মানুষ হওয়ার দুঃসাহসিক বাণী আছে রবীন্দ্রনাথের 'রোমান্টিক'এ—একথা আজ স্পষ্ট করিয়া আমাদের বুঝিতে হইবে।

'রোমান্টিক' নামক কবিতার শেষাংশটুকু আর একবার স্মরণ করুন। কবি কহিতেছেন : কাব্যে স্বপ্ন আঁকি বলিয়া কর্মে ফাঁকি দেওয়ার আদর্শ যে মানি, তাহা নহে। আমি জানি, বাস্তবজগতের ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে কর্মে, সেবায়, শুদ্ধমাত্র কাব্য-কথায় নহে।

যেথা ঐ বাস্তব জগৎ
সেখানে আনাগোনার পথ
আছে মোর চেনা।
সেথাকার দেনা
শোধ করি—সে নহে কথায় তাহা জানি
তাহার আহ্বান আমি মানি।
দৈন্য সেথা, ব্যাধি সেথা, সেথায় কুশ্রীতা,
সেথায় রমণী দস্যুভীতা—
সেথায় উত্তরী ফেলি পরি বর্ম ;
সেথায় নির্মম কর্ম ;
সেথা ত্যাগ, সেথা দুঃখ, সেথা ভেরি বাজুক 'মাভৈঃ' ;
সৌখীন বাস্তব যেন সেথা নাহি হই।

অর্থাৎ কাব্যে সুর ধরিব 'সৌখীন বাস্তবের', হইব রিয়ালিস্ট অথচ কর্মক্ষেত্রে রহিব অলসবিলাসী—হইব এস্‌কেপিস্ট, ইহা লজ্জাহীন পঙ্গুজীবন, ইহা জীবনই নহে। দস্যুভীতা রমণীকে উদ্ধার করিবার কালে মৃদুমন্দ কবিতার ছন্দ যেমন কাজের নয়, সুন্দরের রূপসৌন্দর্য কল্পনার মুহূর্তে বাস্তবের বড়াই তেমনি বীরত্বের পরিচায়ক নয়। ইহলৌকিক জীবনে কর্মকে এড়াইলে চলে না, আবার সুন্দরকে আপন দৈন্যদোষে ধূলিলিপ্ত করাও শোভা পায় না। জীবনের বৃহত্তর সত্য এই : সুন্দরকে কর্মের সহায়ে যতটা পারি বাস্তবে অর্থাৎ বাস্তবচরিত্রে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব, কর্মকে সুন্দরের আদর্শে যতটা পারি শুদ্ধ ও শিবধর্ম করিয়া তুলিব। জীবন হইতেছে কাব্য ও কর্মের, সুন্দর ও ভৈরবের সমন্বয়, ইহা

কেবলমাত্র কাব্য নয়, শুদ্ধমাত্র কর্মও নয়। কাব্যে গাহিয়াছি : রমণী সুন্দর, রমণী রমণীয়া, হইয়াছি রোমাণ্টিক ; কিন্তু দস্যুহস্তে সুন্দরের অপমান যখন সহ্য করি না, সুন্দরের মর্যাদা রক্ষায় যখন প্রকাশ করি ভৈরব বিক্রম, তখন রোমাণ্টিক কাব্যকল্পনা রিয়াল কর্মবাদে রূপান্তরিত হইয়া জীবনকে উন্নীত করে বৃহত্তর বাস্তব মাহাত্ম্যে। আকাশচারী ধ্যানকল্পনার উচ্চ আদর্শ সত্যই বটে, কিন্তু কর্মের দ্বারা তাহাকে জীবনে রূপ দিবার চেষ্টায় উচ্চতর সত্য করিয়া তোলাই রাবীন্দ্রিক রিয়ালিজ্‌ম্।

—'এরে কভু বলে বাস্তবিক' ?

আমি বলি, 'কখনো না, আমি রোমাণ্টিক'।

গূঢ়ার্থ এই : রোমাণ্টিক বলিতেছ বলো, নাহয় মানিয়াই লইলাম। কিন্তু বস্তুজগৎকে স্বর্গ করার যে স্বপ্ন আনিয়াছি, কর্মের দ্বারা তাহাকে সার্থক করো তো দেখি ; যদি করো দেখিবে, বৃহত্তর বাস্তববাদ আছে আমার কাব্য-কল্পনায়। প্রেমকেন্দ্রিক আমি কবি-দার্শনিক—

কঠিন মাটির 'পরে
প্রতি পদক্ষেপ যার
আপনারে জয় করে চলা। [রাত্রি: নবজাতক]

জীবনের এই আপনাকে 'জয় করে চলার'বাণী অর্থাৎ সাধনস্বভাবের দ্বারা বস্তুগত ক্ষয়-ক্ষতি ও শোকদুঃখগুলি উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চতম জীবনধর্মে উন্নীত হওয়ার বাণী—প্রেমের বাণী। চলার তত্ত্ব প্রসঙ্গে এই প্রেমের ব্যাখ্যা ইতঃপূর্বে বহুভাবে আমি করিয়াছি। বলিয়াছি, প্রেমের স্বভাব হইতেছে নিত্য চলা, নিত্য গতি। এই গতি, বলাই বাহুল্য, শুদ্ধমাত্র কল্পনার গতি নহে, কর্মেও গতি। কর্মকে স্বীকার করে এই প্রেম—এই জন্য ইহা 'এস্‌কেপিস্ট্‌' নহে, মানসবহির্ভূত কোনো তুরীয়তত্ত্বে যাইতে চাহে না এই প্রেম—এইজন্য প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা 'মিস্ট্‌ক'ও নহে। প্রেমকেন্দ্রিক কবি জগৎধর্মী ও জীবনধর্মী হইতে বাধ্য—জগৎ ও জীবন ছাড়িয়া তাঁহার সাধনা ও কল্পনা চলিতেই পারে না। বস্তুতঃ তাঁহার কল্পনা জগৎ ও জীবনকে সুন্দরতর করিবারই আনন্দ-কল্পনা। কল্পনাংশে তিনি রোমাণ্টিক—কখনও কখনও ট্রান্‌সেন্‌ডেন্‌ট্যালিস্ট্‌,—কর্মপরিকল্পনাংশে তিনি প্র্যাগ্‌মাটিস্ট্‌, কতক পরিমাণে রিয়ালিস্ট্‌। প্রেমকেন্দ্রিক কবি মর্মতঃ কবি, কিন্তু ধর্মতঃ দার্শনিক—কেন না মননশীল না হইলে কল্পনাকে কর্মে এবং কর্মকে উচ্চতর ধর্মে প্রকাশ দেওয়ার সাধনা অসম্ভব।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথার এখানে উল্লেখ প্রয়োজন। পাঠক বুঝিতেই পারিতেছেন 'প্রেমকেন্দ্রিক' কথাটি আমি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিতেছি। প্রেমের কবি ও

প্রেমকেন্দ্রিক কবি এক নহেন। প্রেমের কবি উচ্চতর জীবনধর্মের কর্মবাদী দার্শনিক নাও হইতে পারেন; প্রেমের কবির আবেগময় কল্পনা অনেকক্ষেত্রে 'রিয়াল' জগৎকে আইডিয়ালের দিকে লইয়া যাইতে চায় কিন্তু বিরোধী বাস্তবজগতের বাধা পাইয়া, আঘাত পাইয়া হয় 'এস্‌কেপিজম্'-এর মোহে পড়ে, নয় 'সিনিসিজম্'-এর মরুতে দিশেহারা হয়। যে সব ক্ষেত্রে প্রেমের কবিদল মননশীল দার্শনিক না হইয়াও শুদ্ধমাত্র প্রণয়িনীর প্রেমানন্দে আনন্দবাদী রহিয়া গেছেন, সেসব ক্ষেত্রে তাঁহাদের অদৃষ্ট খুবই ভাল বলিতে হইবে। সেসব ক্ষেত্রে কল্পনা করিতে হয় যে, প্রকৃতি তাঁহাদের কোনোরূপ বিরুদ্ধাচরণ করে নাই অথবা জগতের কোনো বিরোধী শক্তির সম্মুখীন হইয়া তাঁহাদের পরাজিত হইতে হয় নাই। বিরোধী শক্তির সম্মুখীন হইয়াও মননশীলতার দূরদর্শিতায় সর্বানুভূ প্রেমের মহিমা যিনি দর্শন করেন, প্রেমের দার্শনিক তিনি, তিনি প্রেমকেন্দ্রিক কবি। প্রেমকে প্রত্যক্ষ জীবনে ও চরিত্রে প্রতিভাত করার প্রয়াস তাঁহার সংকল্পে—এইজন্য একাধারে তিনি আশাবাদী ও কর্মবাদী। সংসারে যা' হয়, প্রকৃতিতে যা' ঘটে, সমস্তই স্বীকার করিয়া সংখ্যাতীত বিরোধী ঘটনা ও বিপর্যয়ের বাধা হইতে বৃহত্তর জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া যৌবনানন্দে অগ্রসর হওয়াই তাঁহার আদর্শ। সর্বত্র আছে প্রেম, ব্রহ্মস্বরূপ সেই অখণ্ড প্রেম—দুঃখে আছে প্রেম, মৃত্যুতে আছে প্রেম, পরাজয়ে আছে প্রেম, দুর্দৈবে আছে প্রেম, এইজন্য দুঃখ-শোকাদি হইতে জীবনের উদ্বোধনই ঘটে—শতশত মৃত্যুর মধ্য দিয়া জীবন ছুটিয়া চলে প্রেমামৃতের আনন্দ অন্বীক্ষায়। এই যে প্রেমামৃতের আদর্শ—ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া প্রেমকেন্দ্রিক কবি বাস্তবে রহেন, কল্পনায় চলেন। রিয়ালকে আইডিয়ালের দিকে লইয়া যান—অর্থাৎ রূপে অরূপ দেখেন, প্রিয়কে দেবতা করেন, মানুষে দেখেন মানবিকতার মহিমা। কিন্তু ইহাতেই কি প্রেমসাধনার চরিতার্থতা হইল? বস্তুতঃ প্রেমের শক্তি যদি আইডিয়ালকে রিয়ালের দিকে আকর্ষণ না করিল, তবে প্রেমের মহিমায় রিয়ালজগৎ সুন্দর হইবে কি প্রকারে? তাই কর্মবাদ, তাই সাধনস্বভাবের কথা, তাই ক্রমবিকাশের দর্শন।

প্রেমের আইডিয়াল রিয়ালজগতে ক্রমশঃ স্ফূর্তি পাক, অহং উত্তীর্ণ হ'ক আত্মার আনন্দে—ইহাই প্রেমকেন্দ্রিক কবির প্রার্থনা। প্রার্থনা পূর্ণ হইতেছে না, বাধা আসিতেছে বিস্তর—কিন্তু এই কারণেই তো সাধককে আরও উন্নত হইতে হইবে, বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করিয়া সাধনস্বভাবের আনন্দকে আরও উজ্জ্বল, আরও প্রখর করিতে হইবে।

নৈরাশ্যের নখর হতে
রক্ত-ঝরা আপনাকে আজ ছিন্ন করে আনো,
আশার মোহ-শিকড়গুলো উপড়ে দিয়ে যাও,
লালসাকে দলো পায়ের তলায়।

মৃত্যু তোরণ যখন হবে পার
পরাজয়ের গ্লানিভরে মাথা তোমার না হয় যেন নত।
[পয়লা আশ্বিন, পুনশ্চ]

—ইহা তো পলাতক কল্পনাবিলাসীর শ্রুতিসুখকর মধুবাণী নহে, প্রেমকেন্দ্রিক জীবনধর্মী কবির সাধনস্বভাবোচিত পৌরুষ বাণী। বাস্তবজীবনের কঠিন অভিজ্ঞতা হইতে ইহার আবির্ভাব—সুখশয্যায় শয়নলীলা-বিলাসিনী কল্পনা হইতে ইহার জন্ম নহে।

জীবনের রণক্ষেত্রে
দিকে দিকে জেগে উঠল সংগ্রামের সংঘাত
গুরু গুরু মেঘমন্দ্রে।
একতারা ফেলে দিয়ে
কখনো বা নিতে হল ভেরি।
খর মধ্যাহ্নের তাপে
ছুটতে হল
জয়পরাজয়ের আবর্তনের মধ্যে।
পায়ে বিঁধেছে কাঁটা,
ক্ষত-বক্ষে পড়েছে রক্তধারা। [শেষসপ্তক-৪৩]

কিন্তু এই দুর্যোগকে অতিক্রম করিতেই হয়, তা না হইলে মানবিকতার মাহাত্ম্য হয় না প্রকাশিত, বৃহৎ জীবন হয় না লাভ—সোজাকথায়, হয় না প্রেম। মননশীল প্রেমের অখণ্ড দৃষ্টিতে দুর্যোগকে দেখিতে জানিলেই বুঝা যায়, জীবন জাগরণের পক্ষে ইহার প্রয়োজন কত গভীর। তখন কি শুভ, কি অশুভ সমস্তকেই সহজ ঐশ্বর্যে গ্রহণ করার শিল্পবোধ জাগে জীবনে। শেষ বয়সে কবি পৃথিবীকে যে কথাগুলি বলিয়া প্রণতি জ্ঞাপন করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য :

শুভে-অশুভে স্থাপিত তোমার পাদপীঠে,
তোমার প্রচণ্ড সুন্দর মহিমার উদ্দেশে
আজ রেখে যাব আমার ক্ষতচিহ্নলাঞ্ছিত জীবনের প্রণতি।
বিরাট প্রাণের, বিরাট মৃত্যুর গুপ্তসঞ্চার
তোমার যে মাটির তলায়
তাকে আজ স্পর্শ করি, উপলব্ধি করি সর্ব দেহে মনে। [পত্রপুট-৩]

পৃথিবী অন্নপূর্ণা, পৃথিবী অন্নরিক্তা। পৃথিবীর এই সমগ্র রূপের মহিমাকে সহজভাবে গ্রহণ করিয়া জীবনযুদ্ধে অগ্রসর হইতে হয় মানুষকে। জীবনের পক্ষে পৃথিবীর ঐ দুই-রূপই সত্য—কেন না দুইএরই সাহায্যে জীবনের গতিশক্তির হয় উদ্বোধন। অন্নপূর্ণা দর্শনে

আনন্দ গাহিয়া চলিব—ইহা যেমন সত্য, অন্নরিক্তা দর্শনে সংগ্রাম সাধিয়া চলিব—ইহা তেমনি সত্য। মোটকথা চলিতেই হইবে।

যারা চলতে বেরিয়েছিল পথে
মৃত্যু পেরিয়ে আজো তারাই চলেছে ;
যারা বাস্তু ছিল আঁকড়িয়ে
তারা জীয়নমরা, তাদের নিঝুম বসতি
বোবা সমুদ্রের বালুর ডাঙায়।
তাদের জগৎ-জোড়া প্রেতস্থানে
অশুচি হাওয়ায়
কে তুলবে ঘর,
কে রইবে চোখ উল্‌টিয়ে কপালে,
কে জমাবে জঞ্জাল। [চিরযাত্রী, শ্যামলী]

বস্তুতঃ জীবনকে যাহারা পূর্ণভাবে পাইতে চায় গতি ছাড়া তাহাদের গতি নাই। গতির সত্যধর্মে যাহারা সত্যসত্যই দীক্ষিত হইতে চায়—প্রেম ছাড়া তাহাদের গতি নাই। প্রেমকে কেন্দ্র করিয়া প্রেমেরই বৈচিত্র্য দেখিতে দেখিতে প্রেমের ধ্রুবত্বে যাহারা জাগিতে চায়, তুচ্ছকে ত্যাগ করিয়া উচ্চে রতি ছাড়া কদাচ তাহাদের ভিন্ন গতি নাই। উচ্চে রতি, বলিয়াছি, বৈরাগ্যেরই নূতন নাম। প্রেমকেন্দ্রিক জীবনের ডায়নামিক শক্তি এই বৈরাগ্য। জীবনে এই বৈরাগ্যকে যাহারা পাইয়াছে তাহাদেরি 'চিরযাত্রা, অনাগত কালের দিকে'। অন্নপূর্ণা দর্শনে যাহারা ভাবে, বাসা বাঁধিয়া এখানে থাকিয়া যাইব চিরকাল, তাহারা মরে,—মৃত্যুর গুপ্তপ্রেম তাহাদের 'বোবা সমুদ্রের বালুর ডাঙায়' দেয় কবর। অন্নরিক্তা দর্শনে হাহাকার রবে যাহারা ফাটিয়া পড়ে নৈরাশ্যে, 'পাগলা জন্তুর মতো গোঁ গোঁ শব্দে' চিৎকারই সার হয় তাহাদের জীবনে। আসল কথা, আসক্তিতে নয়, নৈরাশ্যে নয়, বৈরাগ্যেই জাগে প্রেমের মহিমা। সহজভাবে দুঃখ-শোক ও ভাগ্যবিপর্যয়কে মানিয়া লইয়া দুঃখশোকাদি হইতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া—সেই অভিজ্ঞতাকে উচ্চতর জীবন-আহরণের কাজে লাগাইয়া সমাগত দুঃখ হইতে অনাগত আনন্দের পথে চলিতে জানাই মনুষ্যত্ব—জীবনকে ভোগ করিবার ইহাই রবীন্দ্র-প্রদর্শিত এক এবং অদ্বিতীয় পন্থা।

দুঃখ পৃথিবীতে আছেই—মৃত্যু পৃথিবীতে চিরকাল থাকিবে। ইহাদের এড়াইতে চাওয়ার মত অবাস্তব ব্যাপার আর দুটি নাই। দুঃখ বা মৃত্যুকে স্বীকার করিয়াও তাহা হইতে উত্তীর্ণ হওয়ার সাধনা যিনি করিতে জানেন, দুঃখের আনন্দে কিংবা মৃত্যুর অমৃতে তাঁহারই তো অধিকার। জীবনকে সাম্প্রতের ভূমিকায় যত ন্যস্ত করি, ততই আসক্তি

বাড়ে, ততই জীবন হইতে বৃহৎ জীবন বহু দূরে সরিয়া যায়—তখন ক্ষুদ্রাশ্রিত সেই খণ্ড-জীবনের দৃষ্টিতে দুঃখকে মনে হয় বড় দুঃসহ, মৃত্যুকে মনে হয় বড় অকরুণ। চিরন্তনের ভূমিকায় জীবনকে ন্যস্ত করার আনন্দ উপলব্ধি হইলেই অন্তরে প্রেমের দৃষ্টি খোলে—তখনই দুঃখও আনন্দ, মৃত্যুও অমৃত।

'প্রান্তিকের' গীতি-কবিতাগুলির সুরে জীবনকে এই চিরন্তনের ভূমিকায় ন্যস্ত করার আনন্দ-ঝংকার আমরা শুনিয়াছি :

হে জীবন, অস্তিত্বের সারথি আমার,
বহু রণক্ষেত্র তুমি করিয়াছ পার, আজি লয়ে যাও
মৃত্যুর সংগ্রামশেষে নবতর বিজয়যাত্রায়। [প্রান্তিক-৭]

অন্যত্র আর একটি কবিতায় কবি স্বীকার করিয়াছেন—পৃথিবী তাঁহাকে সুখ যেমন দিয়াছে, দুঃখও তেমনি দিয়াছে ; কিন্তু ক্ষোভের তো কোনো কারণ নাই—কেননা সুখ ও দুঃখ দুইই সত্য, দুই-এরই মূল্য আছে মর্ত্যের জীবন-চেতনায়।

কতকাল এই বসুন্ধরা
আতিথ্য দিয়েছে ; কভু আম্রমুকুলের গন্ধে ভরা
পেয়েছি আহ্বানবাণী ফাল্গুনের দাক্ষিণ্যে মধুর ;
অশোকের মঞ্জরী সে ইঙ্গিতে চেয়েছে মোর সুর,
দিয়েছি তা প্রীতিরসে ভরি ; কখনো বা ঝঞ্ঝাঘাতে
বৈশাখের, কণ্ঠ মোর রুধিয়াছে উত্তপ্ত ধূলাতে,
পক্ষ মোর করেছে অক্ষম। [১৪]

এবং জীবনে এ-সকলেরই প্রয়োজন ছিল। সুখ-দুঃখ, আতিথ্য-অনাদর, অপেক্ষা-উপেক্ষা কিছুই তো অসার্থক নহে এই জীবনে। কবি কহিতেছেন : 'সব নিয়ে ধন্য আমি', কেননা সবের মধ্য হইতেই লাভ করিয়াছি জীবনোত্তরণের বাণী :

সব নিয়ে ধন্য আমি
প্রাণের সম্মানে। এ পারের ক্লান্ত যাত্রা গেলে থামি
ক্ষণতরে পশ্চাতে ফিরিয়া মোর নম্র নমস্কারে
বন্দনা করিয়া যাব এ জন্মের অধিদেবতারে। [১৪]

শেষের দুই পংক্তিতে রাবীন্দ্রিক ভঙ্গীটুকু লক্ষ্য করিবার মতো। যাবার সময় আসিলেই চলিয়া যাইব—ক্ষোভ করিব না, লোভ করিব না, দুঃখ করিব না—'এ পারের যাত্রা' থামিয়া গেল বলিয়া আতঙ্কে উঠিব না শিহরিয়া। শুধু যে জীবন ভোগ করিলাম, যাঁহার আশীর্বাদে ভোগ করিলাম, 'ক্ষণতরে পশ্চাতে ফিরিয়া' স্বীকার করিব তাঁহাকে—নম্র নমস্কারে বন্দনা গাহিব তাঁহার। কিন্তু পশ্চাতে ক্ষণতরে ফিরিয়াছি বলিয়া 'পশ্চাতের

সহচর'গুলি অর্থাৎ ইহজীবনের 'অতৃপ্ত তৃষ্ণার যত ছায়ামূর্তি', স্মৃতিমূর্তিগুলি যদি পিছু ডাকে, যদি

পিছু হতে সম্মুখের পথ
বিস্তীর্ণ করিয়া দেয়, অস্তশিখরের দীর্ঘ ছায়া
নিরন্ত ধূসর পাণ্ডু বিদায়ের গোধূলি রচিয়া,

মোহবিহ্বল হইয়া মৃত্যুর অধিকারে হাত দিতে যাইব না। মৃত্যুর যাহা প্রাপ্য, তাহা তাহাকে দিতে চাহি বলিয়াই মৃত্যু হইতে অমৃতের আশা যে করিতে পারি জীবন-সাধকের এ কথা ভুলিলে চলে না। তাই—

পশ্চাতের সহচর, ছিন্ন করো স্বপ্নের বন্ধন ;
রেখেছ হরণ করি মরণের অধিকার হতে
বেদনার ধন যত, কামনার রঙিন ব্যর্থতা
মৃত্যুরে ফিরায়ে দাও। আজি মেঘমুক্ত শরতের
দূরে-চাওয়া আকাশেতে ভারমুক্ত চিরপথিকের
বাঁশিতে বেজেছে ধ্বনি, আমি তারি হব অনুগামী। [৫]

প্রান্তিকের এই কবিতাগুলিতে প্রসন্ন অনাসক্তির শিল্পরস আস্বাদন করিতে হয়। ত্যাগ করার আনন্দে নূতনতর ভোগের যে প্রসন্নতা, প্রান্তিকের একাধিক কবিতায় তাহার ছায়া পড়িয়াছে।

সবদেহমন হতে ছিন্ন হল অভ্যাসেব জাল,
নগ্ন চিত্ত মগ্ন হল সমস্তের মাঝে। মনে ভাবি
পুরানোর দুর্গদ্বারে মৃত্যু যেন খুলে দিল চাবি,
নূতন বাহিরি এল ; তুচ্ছতার জীর্ণ উত্তরীয়
ঘুচাল সে ; অস্তিত্বের পূর্ণ মূল্যে কী অভাবনীয়
প্রকাশিল তার স্পর্শে। রজনীর মৌন সুবিপুল
প্রভাতের গানে সে মিশায়ে দিল। [১৫]

অন্যত্র—

হে পূষন্, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল,
এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ,
দেখি তারে যে পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক। [৯]

আবার—

দূর যুগান্তর হতে
মহাকালযাত্রী মহাবাণী পুণ্য মুহূর্তেরে তব
শুভক্ষণে দিয়েছে সম্মান ; তোমার সম্মুখদিকে

আত্মার যাত্রার পন্থ গেছে চলি অনন্তের পানে—,
সেথা তুমি একা যাত্রী, অফুরন্ত এ মহাবিস্ময়। [১৩]

বলিতে পারেন, শান্তরসের ধ্বনি আছে এই গীতিকবিতায়। কিন্তু এই শান্তগীতাবলীর মর্মমূলে আছে গতির আনন্দ। রবীন্দ্রকাব্যে ও দর্শনে এই গতির আনন্দটুকু উপেক্ষার বিষয় নয়। আবার এই গতিই যে 'বৃহতে রতি' অর্থাৎ বৈরাগ্য একথাও পাঠক ইতঃপূর্বে জানিয়াছেন। বৈরাগ্য আছে কিন্তু বিশুষ্কতা নাই, প্রেম আছে কিন্তু আসক্তি নাই— এমন যে মনোভাব, ইহাকেই আমি বলিয়াছি প্রেমবৈরাগ্য। এই প্রেমবৈরাগ্য, বলা বাহুল্য, অহং হইতেই জাগে অর্থাৎ প্রথমে এই প্রেম অবতরণ করে পৃথিবীর মায়া-মোহের টানে, আসক্ত রহিয়াই পাইতে চাহে তৃপ্তি; তখন বৈরাগ্য আসিয়া তাহাকে সচেতন করে, আঘাতের মধ্য দিয়া, দুঃখের মধ্য দিয়া টান দেয় 'দূর হতে দূরে',—এত দূরে যে, জগতই বুঝি ভুলিতে হয়। তখন প্রেম তাহাকে নাড়া দেয় মৃদু কম্পনে। সচেতন বৈরাগ্য তখন নামিতে থাকে পৃথিবীর পথে। এইভাবে প্রেম কোমল করে বৈরাগ্যকে, বৈরাগ্য সংযত করে প্রেমকে। সংযত প্রেম অর্থাৎ বৈরাগ্য, এবং কোমল বৈরাগ্য অর্থাৎ প্রেম—না বলিলেও চলে যে, এক অদ্বৈত ধ্রুব শক্তিরই বিভিন্ন নাম মাত্র। প্রেমের অন্তরে যে এক প্রকার কোমল কান্ত অনাসক্তি অহরহঃ বিরাজ করে—ইহারই ইঙ্গিত দিবার জন্য বৈরাগ্য বা বৃহতে রতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা জানা না থাকিলে রবীন্দ্র-জীবনদর্শনের ভোগতত্ত্বটিকে সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা সহজ হয় না। রবীন্দ্রনাথ পূর্বেও বলিয়াছেন, শেষ বয়সেও বলিতেছেন যে, জীবনকে যথার্থভাবে ভোগ করিতে হইলে প্রেমের এই বৈরাগ্যটি চরিত্রে প্রতিভাত করা চাই-ই চাই :

যবে শান্ত নিরাসক্ত গিয়েছি তোমার নিমন্ত্রণে
তোমার অমরাবতী সুপ্রসন্ন সেই শুভক্ষণে
মুক্তদ্বার; বুভুক্ষুর লালসারে করে সে বঞ্চিত;
তাহার মাটির পাত্রে যে অমৃত রয়েছে সঞ্চিত
নহে তাহা দীন ভিক্ষু লালায়িত লোলুপের লাগি।
ইন্দ্রের ঐশ্বর্য নিয়ে, হে ধরিত্রী, আছ তুমি জাগি
ত্যাগীরে প্রত্যাশা করি, নির্লোভেরে সঁপিতে সম্মান,
দুর্গমের পথিকেরে আতিথ্য করিতে তব দান
বৈরাগ্যের শুভ্র সিংহাসনে। [জন্মদিন, সেঁজুতি]

ক্ষুব্ধ হইয়া, লুব্ধ হইয়া, অহং মোহে মুগ্ধ হইয়া ব্যক্তি-স্বার্থসাধনের তৎপরতা ও প্রবৃত্তি যে ভোগ নহে, তাহা নয়, তবে তাহা সংকীর্ণ ভোগ, সে ভোগে বিশ্বের কল্যাণ নাই;

উপরন্তু সে ভোগের শেষ আছে, আছে ক্লান্তি, সে ভোগের পথে বাধা দিবার জন্য যথাসময়ে স্বয়ং প্রকৃতিও রহেন দণ্ডায়মানা। বিশ্বের জন্য ত্যাগ করিয়া যে আনন্দ ভোগ, তাহার কিন্তু শেষ নাই, ক্লান্তি নাই—উপরন্তু অনন্ত মহিমা আছে সেই ভোগের আনন্দে। বৈরাগ্য-প্রজাত এই ভোগবাদের মূলতত্ত্ব হইতেছে প্রেম,—বস্তুতঃ ত্যাগীই সত্যকার প্রেমিক, পৃথিবী এই জয়মাল্য হস্তে ত্যাগীর প্রত্যাশা করে যুগে যুগে। এই ত্যাগীর কল্পনা শুদ্ধমাত্র কবিকল্পনা নহে। অতীতে বহু ত্যাগীকে পৃথিবী জয়মাল্য দানে করিয়াছে অমর; বর্তমানের এই 'একান্ত আত্মার দৃষ্টিছাড়া' যুগেও প্রেমসাধনায় ব্যাপৃত আছেন এমন সব খ্যাতনামা বা অখ্যাত ত্যাগী, যাঁহাদের সন্ধান লইলেই বুঝা যায় 'ত্যাগীর প্রত্যাশা' অবশ্যই শূন্য কল্পনা নহে। 'নবজাতক' নামক কাব্যে কবি তাই জগতকে আশ্বাস দিয়াছেন যে, 'আগামী প্রাতের শুকতারা সম নেপথ্যে আছেন' এমন সব ত্যাগী প্রেমিক, মানবিকতার মাহাত্ম্য উদ্বোধনের উদ্দেশ্যে যাঁহারা জাগরণের জোয়ার বহাইবেন জগতে।

যে জাগায় জাগে পূজার শঙ্খধ্বনি,
বনের ছায়ায় লাগায় পরশমণি,
যে জাগায় মোছে ধরার মনের কালি,
মুক্ত করে সে পূর্ণ মাধুরী-ডালি।
জাগে সুন্দর, জাগে নির্মল, জাগে আনন্দময়ী—
জাগে জড়ত্বজয়ী। [উদ্বোধন, নবজাতক]

একথা অবশ্য অসত্য নহে, যে, আজ 'সত্যনামিক পাতালে' 'গুপ্ত গুহার কালনাগিনীর দল' 'বিষনিঃশ্বাসে ফুঁসিছে অগ্নিকণা'। বর্বর ওই পশুশক্তি-প্রমত্ত কৃষ্ণযুগের অন্তর্বর্তী হইয়া মানুষ উচ্চতর জীবনের স্বর্ণমহিমায় আস্থা স্থাপন করিতে অবশ্যই আজ পারিতেছে না। বিজ্ঞান আজ মানুষের মঙ্গলে ব্যাপৃত না হইয়া মারণ-মন্ত্রই অহরহঃ জপ করিতেছে। 'আকাশে আকাশে বিরাট বিনাশে' বিজ্ঞান আজ 'বিভীষিকা' জাগাইতেছে (নবজাতক, পক্ষীমানব), পররাজ্যলুণ্ঠনবৃত্তি আজ ব্যাখ্যাত হইতেছে ধর্মের ও বীরত্বের পুণ্যনামে (বুদ্ধভক্তি), দুর্বলের উপর সবলের উৎপীড়ন, নারীর উপর পুরুষেব অত্যাচার, অসহায়ের উপর প্রবলের শাসনকৌশল দিনের আলোর মত উলঙ্গ মূর্তিতে পাইতেছে প্রকাশ—কিন্তু তথাপি মানুষকে ধীর প্রসন্ন সংযমে অনাগতের প্রতীক্ষায় জাগ্রত রহিতে হইবে। পশু-শক্তির প্রবল প্রতাপ যতই প্রকাশ পাক না কেন, একদিন না একদিন পরাজয় তাহার অবশ্যই হইবে।

ধরার বক্ষ চিরিয়া চলুক
বিজ্ঞানী হাড়গিলা,
রক্তসিক্ত লুব্ধ নখর
একদিন হবে ঢিলা।

ভীষণ যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত
পূর্ণ করিয়া শেষে
নূতন জীবন নূতন আলোকে
জাগিবে নূতন দেশে। [প্রায়শ্চিত্ত, নবজাতক]

কেননা—

বিপুল প্রতাপ থাক না যতই বাহির দিকে,
কেবল সেটা স্পর্ধাবলে রয় না টিকে।
দুর্বলতা, কুটিল হেসে
ফাটল ধরায় তলায় এসে—
হঠাৎ কখন দিগ্‌ব্যাপিনী কীর্তি যত
দর্পহারীর অট্টহাস্যে
যায় মিলিয়ে স্বপ্নমতো। [ভূমিকম্প]

অজস্র বিরোধী শক্তির মধ্যবর্তী হইয়াও তাই আশায় ও সাহসে সাধককে বাঁধিতে হইবে বুক ; বিশ্বাস করিতে হইবে যে, সুন্দর নামিবেন, নির্মল জাগিবেন, আনন্দময়ী অপরূপ রূপবিভায় আবির্ভূতা হইবেন পৃথিবীর মন্দিরে। অসুন্দরের মত্ত লীলার পাপপ্রভাব জীবনের উপর পতিত হইতেছে সত্য, কিন্তু ইহাই জীবনের একমাত্র সত্য নহে। অহং-এর অতিকৃতি যে আছে, তাহা অস্বীকার করিব না—কিন্তু আত্মার মহিমাকে উপহাস করিয়া জীবনকে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র করিতে পারিব না। কবি বলিতেছেন :

যাহা রুগ্‌ণ, যাহা ভগ্ন, যাহা মগ্ন পঙ্কস্তরতলে
আত্মপ্রবঞ্চনাছলে
তাহারে করি না অস্বীকার।
বলি, বার বার
পতন হয়েছে যাত্রাপথে,
ভগ্ন মনোরথে ;
বারে বারে পাপ
ললাটে লেপিয়া গেছে কলঙ্কের ছাপ ;
বার বার আত্মপরাভব কত
দিয়ে গেছে মেরুদণ্ড করি নত ;
কদর্যের আক্রমণ ফিরে ফিরে
দিগন্ত গ্লানিতে দিল ঘিরে।
[জয়ধ্বনি, নবজাতক]

কিন্তু সাম্প্রতের সীমা ছাড়াইয়া চিরন্তন জীবনের অসীমত্বে লক্ষ্য দিতে শিখিলে জীবনের খণ্ড ক্ষুদ্র সাময়িক ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্বেও আশাভঙ্গের উত্তেজনা জাগিবে না। কবির সুরে সুর মিলাইয়া তখন অবশ্যই বলিতে ইচ্ছা করিবে :

অপূর্ণ শক্তির এই বিকৃতির সহস্র লক্ষণ
দেখিয়াছি চারিদিকে সারাক্ষণ,
চিরন্তন মানবের মহিমারে তবু
উপহাস করি নাই কভু।
প্রত্যক্ষ দেখেছি যথা
দৃষ্টির সম্মুখে মোর হিমাদ্রিরাজের সমগ্রতা,
গুহাগহ্বরের যত ভাঙাচোরা রেখাগুলো তারে
পারে নি বিদ্রূপ করিবারে—
যত কিছু খণ্ড নিয়ে অখণ্ডেরে দেখেছি তেমনি,
জীবনের শেষবাক্যে আজি তারে দিব জয়ধ্বনি।

নবজাতকের এই 'জয়ধ্বনি' কবিতাটি একাধিক কারণে আমি উল্লেখযোগ্য কবিতা বলিয়া মনে করিয়াছি। কবিগুরুর মানসদর্শনের অভিপ্রায়ে এই গ্রন্থের সুরু হইতে শেষ পর্যন্ত যে তত্ত্বের আমি অনুসন্ধান করিয়া আসিতেছি, 'জয়ধ্বনি' কবিতাটিতে তাহাই স্পষ্টভাবে বিবৃত হইয়াছে। বলা হইয়াছে, অখণ্ড দৃষ্টিতে যখন জীবনকে দেখিতে পাইয়াছি, তখন আমার ভয় নাই, দুঃখ নাই, ক্ষোভ নাই। সাম্প্রতিক জীবনের পাপ, প্রবঞ্চনা, ক্ষয়, ক্ষতি স্বীকার করিয়াও আজ তাই জয়গান গাহিব চিরন্তন জীবনের। জীবনে স্খলন-পতন আছে, ক্ষয়-ক্ষতি আছে,—কিন্তু উচ্চতর আত্মবোধে উন্নীত হইবার ব্যাকুল সাধনাও কি নাই? ভাবের ঘোরে অহং-গত জীবনের কলঙ্ক ও পাপাচারকে অস্বীকার করিব না—

যাহা রুগ্‌ণ, যাহা ভগ্ন, যাহা মগ্ন পঙ্কস্তরতলে
আত্মপ্রবঞ্চনা ছলে
তাহারে করি না অস্বীকার।

কিন্তু ইহার সঙ্গে ইহাও কেন স্বীকার করিব না,—যে এই রুগ্ন ভগ্ন পঙ্কমগ্ন অহং-জীবন হইতেও উত্তীর্ণ হইবার প্রতিভা আছে জীবমানবের? অজস্র বিরোধী শক্তির মধ্য হইতেই আত্মশক্তি প্রকাশ করিবে জীবমানব, শতাব্দী-সঞ্চিত অসার আবর্জনা দুই হাতে ঠেলিয়া ফেলিয়া আপন জীবনে সে অর্জন করিতে চলিবে জ্যোতির ঐশ্বর্য,—দুঃখসহনের দ্বারা, বেদনাবহনের দ্বারা, ত্যাগবরণের দ্বারা, মৃত্যুবরণের দ্বারা সার্থক করিবে মানবের জন্ম, জীবনে দান করিবে চিরন্তন মহিমা। এই যে সত্য, ইহাকে অস্বীকার করিলে জীবন তো

মুহূর্তে স্তব্ধ হইয়া জড়বৎ পিণ্ডাকার হইয়া, চলৎশক্তিবিহীন মৃত বস্তুস্তূপ হইয়া, অবগুণ্ঠিত হইয়া, ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া সংসারকে অচিরাৎ শ্মশান করিয়া তুলিবে। 'কালান্তর' নামক প্রবন্ধের উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছেন, এইস্থলে তাহা বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন :

'মনুষ্যত্বের 'পরে বিশ্বাস কি ভাঙতে হবে—বর্বরতা দিয়েই কি চিরকাল ঠেকাতে হবে বর্বরতা? কিন্তু সেই নৈরাশ্যের মধ্যেই এই কথাও মনে আসে যে, দুর্গতি যতই উদ্ধতভাবে ভয়ংকর হয়ে উঠুক তবু তাকে মাথা তুলে বিচার করতে পারি, ঘোষণা করতে পারি তুমি অশ্রদ্ধেয়, অভিসম্পাত দিয়ে বলতে পারি 'বিনিপাত', বলবার জন্যে পণ করতে পারে প্রাণ এমন লোকও দুর্দিনের মধ্যে দেখা দেয়, এই তো সকল দুঃখের, সকল ভয়ের উপরের কথা। ·· ···যে দুঃখী, যে অবমানিত, সে যেদিন ন্যায়ের দোহাইকে অত্যাচারের সিংহগর্জনের উপরে তুলে আত্মবিস্মৃত প্রবলকে ধিক্কার দেবার ভরসা ও অধিকার সম্পূর্ণ হারাবে, সেই দিনই বুঝব এই যুগ আপন শ্রেষ্ঠ সম্পদে শেষকড়া পর্যন্ত দেউলে হল।'

কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, মানুষ কোনো যুগেই এই 'ভরসা' ও 'অধিকার' হারায় নাই, হারাইতে কখনই পারে না। ইহাই তো আশার কথা, সান্ত্বনার কথা। এই বাস্তব আশা ও সান্ত্বনা হইতেই তো বুঝিতে পারি, মানুষ মানুষই বটে,—উদ্ধত পশুত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া, সংগ্রাম করিয়া অহংগত সংকীর্ণ জীবনের বন্দিত্ব হইতে স্বাভাবিকভাবেই সে মুক্তি চাহে উচ্চতর জীবনের আনন্দে। এই মুক্তি হাতে হাতে সে পাইতে না পারে, মুক্তির পথে বাধাও আসিতে পারে বিস্তর, কিন্তু এই মুক্তির চাহিদা অবাস্তব কবিকল্পনামাত্র নহে। তাহা যদি হইত, তবে যুগে যুগে ত্যাগীর জন্ম, সংগ্রামীর জন্ম, তপস্বীর আবির্ভাব কিছুতেই সম্ভব হইত না। পৃথিবীর নিকট দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের বাণী এই যে, অর্ধসভ্য আধুনিক শতাব্দীর রক্তলোলুপ পশুপ্রকৃতিই সত্য নহে, এই 'শ্মশান-বিহার-বিলাসিনী ছিন্নমস্তা' পশুপ্রকৃতির 'কুৎসিত লীলার' অবসানে যুদ্ধবিজয়ী জীবমানব অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হইবে আপন মহিমায়—

রোগশয্যায়
আরোগ্য
জন্মদিনে

বীভৎস তাণ্ডবে
এ পাপযুগের অন্ত হবে,
মানব তপস্বীবেশে

চিতাভস্মশয্যাতলে এসে
নবসৃষ্টি-ধ্যানের আসনে
স্থান লবে নিরাসক্ত মনে। [জন্মদিনে-২১]

রবীন্দ্রনাথের এই 'নবসৃষ্টি-ধ্যানের আসনে নিরাসক্ত মনে স্থান' লওয়ার কল্পনা অবিশ্বাসী বস্তুবাদীর নিকট অবাস্তব শূন্য সান্ত্বনা বলিয়া উপেক্ষিত হইয়াছে। কবি যে ইহা জানিতেন না, তাহা নহে। একটি কবিতায় তাই তিনি বলিয়াছেন যে, রুগ্ন যদি বিকারের ঘোরে তাহার দেহলাবণ্য ও স্বাস্থ্যের কথা বিস্মৃত হইয়া রোগকেই একমাত্র সত্য, চরম সত্য, বলিয়া চিৎকার করিতে থাকে, তবে তাহার সহিত তর্ক করা বৃথা।

রুগ্ণ যদি রোগেরে চরম সত্য বলে,
তাহা নিয়ে স্পর্ধা করা লজ্জা বলে জানি—
তার চেয়ে বিনাবাক্যে আত্মহত্যা ভালো।
মানুষের কবিত্বই
হবে শেষে কলঙ্কভাজন
অসংস্কৃত যদৃচ্ছের পথে চলি।
মুখশ্রীর করিবে কি প্রতিবাদ
মুখোষের নির্লজ্জ নকলে॥ [রোগশয্যায়-২৪]

অর্থাৎ আজিকার এই রুগ্ন সভ্যতার শোষণবৃত্তি, রক্তলোলুপতা, ঈর্ষাদ্বেষহিংসা এবং প্রভুত্বলিপ্সা মানুষের জীবনে রোগের সাময়িক বিকারের মতই দর্শন দিয়াছে। সান্ত্বনার ও আশার কথা এই, কবি বলেন, এগুলি জীবনের শেষ কথা নহে। যুগে যুগে ধূমকেতুর মত মানুষের জীবনাকাশে এগুলি দেখা দিয়াছে বহুবার, আবার মিলাইয়াও গেছে অচিরাৎ। শাশ্বত সনাতন কল্যাণরূপ লইয়া নিত্যকাল যাহা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জীবনে বিরাজিত আছে তাহা প্রেম, প্রেমচৈতন্য। এই প্রেমচৈতন্যই মানুষকে শতসহস্র উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া গন্তব্যের দিকে টানিতেছে। মানুষের জীবনে গন্তব্য যখন মিলিয়া যাইবে, অর্থাৎ প্রেম যখন পূর্ণভাবে প্রকটিত হইবে জীবনে, তখন ধ্রুবসুন্দর সেই প্রেমশান্তির বিমল প্রসন্নতায় অচপল আনন্দের অধিকারী হইবে এই জীবন। রবীন্দ্রনাথ প্রেমময় এই চৈতন্যজীবনে বিশ্বাস করেন, এই জীবনের আহ্বান শুনেন অহরহঃ—বৈরাগ্যের বেগে এই জীবনের অভিমুখে ছুটিয়া চলেন কর্মে, ধর্মে, ধ্যানে, জ্ঞানে, তবে ধ্রুবসুন্দর অচপল এই প্রেমজীবন পূর্ণভাবে তিনি লাভ করেন নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, মনের দার্শনিকের পক্ষে ধ্রুবত্বের ইঙ্গিত পাওয়াই সম্ভব, ধ্রুবত্ব লাভ করিয়া পূর্ণ হওয়া সম্ভব নহে। এইজন্য রবীন্দ্রনাথে গন্তব্য অপেক্ষা গতিই পাইয়াছে মর্যাদা।

অন্তহীন গতির আনন্দে 'হওয়ার' পথে জীবন চলিয়াছে। এ-চলার বিরাম নাই। সাময়িকভাবে সংশয় নামে, ত্রুটি আসে, বিচ্যুতি জাগে, পথে পথে নানা বাধাবিপত্তি ও বিদ্রূপ দেয় হানা। কিন্তু ধ্রুবসুন্দর প্রেমচৈতন্যের আলোকে অখণ্ড জীবনের ইশারা চোখে পড়ে বলিয়া দুঃখে, শোকে বা তাপে নিরাশ হয় না মন,—অন্তহীন ধৈর্যে ও আশ্বাসে বুক বাঁধিয়া সে চলে,—বিশ্বাস রাখে এই সত্যে : 'আনন্দঅমৃতরূপে বিশ্বের প্রকাশ'।

জীবনের দুঃখে শোকে তাপে
ঋষির একটি বাণী চিত্তে মোর দিনে দিনে হয়েছে উজ্জ্বল
আনন্দঅমৃতরূপে বিশ্বের প্রকাশ।
ক্ষুদ্র যত বিরুদ্ধ প্রমাণে
মহানেরে খর্ব করা সহজ পটুতা।
অন্তহীন দেশ কালে পরিব্যাপ্ত সত্যের মহিমা
যে দেখে অখণ্ড রূপে
এ-জগতে জন্ম তার হয়েছে সার্থক॥ [রোগশয্যায়-২৫]

সত্যের মহিমাকে অখণ্ডরূপে দেখার তাৎপর্যটি হইতেছে এই যে, জীবনের সর্বত্র, সর্ব আবেগে, সর্বভাবে, সর্ববিষয়ে বিরাজিত আছে সেই পরম সত্য। অর্থাৎ দুঃখেও আছে সেই সত্য, সুখেও আছে সেই সত্য, সম্পদে আছে সেই সত্য; উত্থানে আছে সেই সত্যের আনন্দ, পতনে আছে সেই সত্যের কল্যাণরূপ। খণ্ডদৃষ্টিতে সত্যের এই বিচিত্ররূপ পরস্পর-বিরোধী বলিয়া মনে হইলেও অখণ্ডদৃষ্টিতে সমগ্রতার একটি ধ্রুবসুন্দর পূর্ণাঙ্গরূপ চোখে পড়ে। তখন কবির এই মহাবাণী 'দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে' [আরোগ্য] সহজেই উপলব্ধির সীমায় পৌঁছাইয়া যায়। জীবনের সত্য, বাস্তবিক, অত্যন্ত কঠিন। এই কঠিনকে বুদ্ধিদ্বারা নয়, চৈতন্যের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা আস্বাদন করিতে হয়। তা না হইলে খণ্ডদৃষ্টির অন্ধকারে মোহাচ্ছন্ন, মায়াচ্ছন্নই হইতে হয়। তখন খণ্ডকেই একমাত্র সত্য মনে করিয়া, সীমাবদ্ধ হইয়া, আতঙ্কিত হইয়া অবগুণ্ঠিত, লুণ্ঠিত হইয়া, নিষ্ফল হাহাকারে নির্জিত হইতে হয় মানুষকে।

যতবার ভয়ের মুখোস তার করেছি বিশ্বাস
ততবার হয়েছে অনর্থ পরাজয়।
এই হারজিত খেলা, জীবনের মিথ্যা এ কুহক
শিশুকাল হতে বিজড়িত পদে পদে এই বিভীষিকা,
দুঃখের পরিহাসে ভরা।
ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি—
মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে॥ [শেষ লেখা-১৪]

জীবনের পক্ষে ভয়টা আর কী? ওটা তো চলচ্ছবি মাত্র—এই ফুটিয়াছে জীবনের পরদায়, মুহূর্তে যাইবে মিলাইয়া। খণ্ডাশ্রয়ী ক্ষুদ্র মন এ-কথাটা বুঝে না। তাই ওটা যে চলচ্ছবি মাত্র, এখনি যে মিলাইয়া যাইবে, তাহা বুঝে না। মৃত্যু রচনা করিয়াছে এই চলচ্ছবি, এই নিপুণ শিল্প। আঁধারের মধ্য দিয়া, তমসাচ্ছন্ন খণ্ড ক্ষুদ্র মন লইয়া ইহা যখন দেখি, উঠি আঁতকাইয়া। কিন্তু অখণ্ড প্রেমচৈতন্যের জ্যোতির ভূমিকায় উপস্থাপিত করিয়া ইহাকে যখন দেখি, ছলনা ইহার পড়ে ধরা। তখন 'দুর্যোগের মায়ার আড়ালে' 'নিত্যের জ্যোতি' দেখিয়া 'আমি মৃত্যু চেয়ে বড়ো' বলিয়া আনন্দে গাহি,—অজস্র বাধা বিপত্তি ও বিরোধ সত্ত্বেও দুঃখের উপরে, ক্ষতির উপরে, মৃত্যুর উপরে লইয়া চলি জীবনকে —সুচির আশার আনন্দে চঞ্চলের সুর বাজাই 'গীতশূন্য অবসাদপুরে', গান গাহি :

ওরে আশাহারা

শুষ্কতার 'পরে আনো নিখিলের রসবন্যা-ধারা। [জন্মদিনে-২৬]

রবীন্দ্রনাথের আনন্দপ্রেমের রহস্য-তত্ত্বটি এইস্থলে সূর্যের আলোর ন্যায় স্পষ্ট হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি। পাঠক দেখিয়াছেন, 'সহস্র ব্যাঘাতমাঝে' জীবনের আনন্দতত্ত্বে কবি কোনোদিন সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই,—অন্নপূর্ণা প্রকৃতির আলিঙ্গনে অথবা অন্নরিক্তা প্রকৃতির আক্রমণে, সেই এক অখণ্ড জীবনসত্যের অনির্বাণ জ্যোতিই তিনি দর্শন করিয়াছেন। কিন্তু ইহার মূল কারণটি কী? কারণটি এই যে, কবিগুরু জীবন ও জগতের স্বরূপ বলিতে আনন্দপ্রেমকেই জানিয়াছেন। এই আনন্দপ্রেম হইতেই সৌন্দর্য, ইহা হইতেই মঙ্গল, ইহা হইতেই ধর্মকর্ম সব। তরুণ বয়স হইতে শেষ বয়স পর্যন্ত এই যে প্রেমে বিশ্বাস, ইহাই তাঁহার কাব্য দর্শন ও জীবন প্রেরণার মূল উৎস, 'ডায়নামিক ফোর্স'। জীবনে ও জগতে প্রেমবিরোধী ব্যাপার যে সংঘটিত হইতেছে না, তাহা নহে; কবি যে সেই সমস্ত বিরোধী ব্যাপারের প্রতি রোমান্টিক উন্মাদনায় উদাসীন, তাহাও নহে। তবে কবির বক্তব্য বিষয়টি সংক্ষেপে এই: আনন্দ হইতে এই প্রকৃতি, আনন্দই তাহার স্বভাব; আনন্দবিরোধী যে ব্যাপার প্রকৃতির মধ্যে সংঘটিত হয়, তাহা তাহার সত্য-স্বভাব নহে, তাহা মায়া-স্বভাব, বা ছলনা মাত্র। ছলনাকে যাহারা সত্য বলিয়া জানে, তাহারা মরে। জীবনসাধক ও শিল্পীকে অনায়াসে ইহা সহিতে হইবে—জানিতে হইবে, ইহা জীবনপ্রকৃতির বিচিত্র চলচ্ছবির মায়াজাল মাত্র।

এইস্থলে প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথের 'মায়াবাদ' সম্পর্কে কয়েকটি কথা আলোচনা করা দরকার। রবীন্দ্রনাথ 'মায়াবাদ' মানেন না, কিন্তু তাঁহার প্রেমতত্ত্বে ও প্রকৃতি-তত্ত্বে এক প্রকার বিশেষ মায়াবাদের ইঙ্গিত আমি লক্ষ্য করিয়াছি। বলা বাহুল্য, প্রেম-বিশ্বাসের

উদ্দীপ্ত আত্মা হইতেই রাবীন্দ্রিক এই মায়াবাদের সমুৎপত্তি। রবীন্দ্রপাঠক অবশ্যই জানেন, রবীন্দ্রনাথ বৈদান্তিক মায়াবাদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করিয়াছেন। জগৎ বা প্রকৃতিকে কোনো যুক্তিতেই তিনি মায়া বলিতে চাহেন নাই; কিন্তু জীবনের বিকৃতিকে, অহং-এর অতিকৃতিকে, মনুষ্যত্বের স্খলন-পতনকে প্রকৃতির ছলনা বা জীবনের মিথ্যা কুহক নামে অভিহিত করিয়া সহজ আনন্দে সেগুলি উত্তীর্ণ হইতে চাহিয়াছেন। জীবনে আনন্দ ও প্রেম-চৈতন্যই মূলতত্ত্ব—ইহার বিকৃতি মায়া ছাড়া আর কিছু নহে।

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে
হে ছলনাময়ী। [শেষ লেখা-১৫]

বিচিত্র ছলনা জালে, হে প্রকৃতি, তোমার সৃষ্টির পথ আকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছ: তোমার সৃষ্টির পথে পাপ রাখিয়াছ, প্রতারণা রাখিয়াছ, মোহ রাখিয়াছ, রাখিয়াছ জগ-জিগীষা, রাখিয়াছ জীব-জিঘাংসা। খণ্ডাশ্রয়ী সরল মানুষ এইগুলিকেই একমাত্র সত্য মনে করিয়া 'মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদে' পা দেয়, তাহার পর হাহাকার করিয়া মরে।

মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।

কিন্তু ইহাতেই কি জীবনের পরাজয় ঘটে? জীবন কি এই বন্ধ-দশা হইতে উত্তীর্ণ হয় না? মহৎ যে, পুরুষ যে, জীবনসাধক যে, সে এই প্রবঞ্চনার মায়াফাঁদ হইতেও লাভ করে উন্নততর জীবনবোধ—গোপনতম সেই জীবনবোধের উপলব্ধি হইতে সে প্রেমকে, সত্যকে লাভ করে।

সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।
কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে,
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে
আপন ভাণ্ডারে।
অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার॥

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে মায়া বলেন নাই, কিন্তু প্রকৃতি মায়ার দ্বারা মানুষকে পরীক্ষা করে, মায়ার ফাঁদ পাতিয়া রাখে ভুবনে-ভুবনে—একথা স্বীকার করিয়াছেন। প্রকৃতির ওই মায়াকে কাটাইতে হয়, নতুবা মুক্তি নাই ইহজীবনে। রবীন্দ্রনাথ, পূর্বেই বলিয়াছি, মনের সর্বোচ্চস্তরে উন্নীত হইয়াছিলেন—কিন্তু যোগীদের মত মন ত্যাগ করিয়া বিজ্ঞানচৈতন্যে তাঁহার গতি নাই। বৈদান্তিক বিজ্ঞানীরা মন ছাড়িয়া আরো ঊর্ধ্বলোকে সেই চতুর্থস্তরে

উঠিয়া যান বলিয়া সারা প্রকৃতিটাই তাঁহাদের নিকট মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হয়, প্রকৃতি আর তাঁহাদের টানিতে পারে না—প্রকৃতির রূপ হইতে রসাস্বাদনটাকেও আত্মোপলব্ধির পরিপন্থী বলিয়া তাঁহাদের ধারণা হয়। রবীন্দ্রনাথ রসে দেখিয়াছেন ঈশ্বর, মনোগত ঈশ্বরের রসময় স্বরূপ চিন্তনে তাঁহার আনন্দ। সংসারের তুচ্ছতম মনের কলুষস্পর্শে এই আনন্দের উপর যখন বিকৃতির কালো ছায়া নামে,- মনের উচ্চধামে আছেন বলিয়া এই বিকৃতি তাঁহার নিকট মায়া বা ছলনা বলিয়া ধারণা হয়। বলাই বাহুল্য, যে, রসময় রূপপ্রকৃতি তাঁহার নিকট সত্য—রস ও রূপের বিকৃতি তাঁহার নিকট প্রকৃতির ছলনা, মায়া। সংসারের আঘাত-সংঘাত, বিয়োগ-বেদনা, মৃত্যুভয় ও মৃত্যুশোক তিনি বুক পাতিয়া লইয়াছেন—মনের অধীনে আছেন বলিয়া সাময়িকভাবে চঞ্চলও হইয়াছেন, আবার উচ্চতম মনের অধিকারী বলিয়া বীরসাধকের ন্যায় তাহা মায়া জানিয়া প্রকৃতির উচ্চতর স্বভাবে—আনন্দ-অমৃত স্বভাবে, উন্নীত হইয়াছেন। এইভাবে তাঁহার মনোজীবন অহং হইতে বিশ্বগত, সর্বজগদ্‌গত বিস্তৃতি লাভের আনন্দোচ্ছ্বাস আস্বাদন করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের এই বিশেষ মায়াবাদ লইয়া কেহ কখনও আলোচনা করেন নাই কিন্তু তাঁহার ত্যাগবাদ, মুক্তিবাদ বা বৃহত্তর বাস্তববাদ বুঝিতে হইলে রাবীন্দ্রিক মায়াবাদের মর্মগত তাৎপর্য উপলব্ধি করিতেই হয়। তুচ্ছকে রবীন্দ্রনাথ যে অহরহঃ ত্যাগ করিতে বলেন, তাহার প্রধান কারণ এই মায়াবাদের প্রজ্ঞা। তাঁহার কথা এই : তুচ্ছতা প্রকৃতির ছলনা, অতএব উহা ত্যাগ করিতে হইবে। সংসারে থাকিয়াও সংসারের অতীতে থাকার যে বাণী তাঁহার রচনাবলীতে অহরহঃ ধ্বনিত হয় তাহার ব্যঞ্জনাও এই মনোধর্মী মায়াবাদ। প্রকৃতির ছলনা ও মায়ার সহিত অবিশ্রাম তিনি সংগ্রাম করিয়াছেন, এবং এই সংগ্রামই তাঁহার গতিবাদের প্রাণ-উৎস। প্রকৃতির রূপে তিনি আনন্দ-অমৃতের প্রকাশ দেখিয়াছেন —এই তাঁহার প্রেমবাদের ভিত্তিভূমি। প্রেমের বিচিত্র রূপানন্দের সুধারস তিনি আকণ্ঠ পান করিয়াছেন, কিন্তু নিম্নগত চিত্তের বিকৃতি যখনি দেখা দিয়াছে তখনি তিনি অনুভব করিয়াছেন বৈরাগ্যস্পর্শ, মৃত্যুস্পর্শ। এই মৃত্যু আনিয়া দিয়াছে নূতনতর জীবনবোধ— নিম্নগত চিত্ত-বিকৃতির শ্মশানভস্মের উপর তিনি রচনা করিতে চাহিয়াছেন অমৃতালয়। মৃত্যু হইতে এই যে অমৃতের স্বপ্ন, ইহারি আলোকে চিত্তের নিম্নগত বৃত্তিগুলি, বিকৃতিগুলি, প্রকৃতির মায়া বা ছলনা বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছে। মানুষ যাহা পার না হয়, তাহার স্বরূপ তো সম্যক্‌ভাবে বুঝিতে পারে না ; বিকৃতি বা অতিকৃতিগুলি যে প্রকৃতির সত্যস্বভাব নহে, তাহা অতিক্রম করিতে পারিলে তবেই তাহা বুঝা সহজ হয়। এই বিকৃতিগুলিকে অতিক্রম করার যে দ্বন্দ্ব-চাঞ্চল্য রবীন্দ্রনাথে আপনি দেখিয়াছেন, রাবীন্দ্রিক বৈরাগ্যে তাহাই প্রাণচেতনা। তুচ্ছ হইতে অব্যাহতি লইয়া বৃহতে রতির এই যে প্রবণতা, ইহাই তাঁহার মহামানববাদ বা মুক্তিবাদের লক্ষ্য। কিন্তু বলাই বাহুল্য, তাঁহার মুক্তি উচ্চতম মনের

মধ্যেই মুক্তি—নিষ্ক্রিয় জীবনের নির্বেদ যোগবিজ্ঞানে মুক্তি নহে। এইজন্য তাঁহার মুক্তি উচ্চতর মনোজীবনের আনন্দভোগের আয়োজনই বটে। এই তাঁহার উচ্চজীবনের ভোগবাদ। রবীন্দ্রনাথের বিশাল মনটির বিশ্লেষণকালে এই সমস্ত বিচিত্র 'বাদের' প্রতি গবেষকের দৃষ্টি দিতেই হয়। এই বিচিত্র 'বাদ' যে পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক—একথা এইস্থলে আর না বলিলেও চলে। এই বিচিত্র 'বাদে'র প্রধানতম লক্ষ্য হইতেছে সেই এক অদ্বিতীয় প্রেমচৈতন্যের উপলব্ধি। প্রেমচৈতন্যের উপলব্ধিপথে বিচিত্রের তিনি সম্মুখীন হইয়াছেন—যখন যে মনোভাব তাঁহার জাগিয়াছে, ছন্দে ধরিয়াছেন, কিন্তু বিশেষ কোনো মনোভাবই অশেষ সেই প্রেমকে পূর্ণভাবে পারে নাই জানাইতে,—তাই বিচিত্রের পথে পথে সেই একের জন্য তাঁহার দ্বন্দ্ব-ব্যাকুলতা সর্বদাই অন্তরে রহিয়া গেছে। এই যে প্রেমের জন্য, পূর্ণের জন্য ব্যাকুলতা—ইহাই তাঁহাকে অখণ্ড জীবনস্বপ্নে বিশ্বাসী করিয়া তুলিয়াছে। প্রেমচৈতন্যের দৃষ্টিতে জীবনের এই অখণ্ড রূপ ধরা পড়িয়াছে বলিয়াই সাময়িক খণ্ড-জীবনের আনন্দবিরোধী অপচেষ্টাকে উপেক্ষা না করিলেও সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই, বলিয়াছেন, তাহা 'দুর্যোগের মায়া' মাত্র—'মিথ্যা কুহক' মাত্র, 'বিচিত্র ছলনা' মাত্র। ঠিক এই কারণেই দুঃখকে তিনি ভয় করেন নাই, এবং ভয়কে 'মৃত্যুর নিপুণ শিল্প' ফাঁদ বলিয়া ভয়ের ঊর্ধ্বে জীবনকে তুলিতে পারিয়াছেন। রবীন্দ্রজীবনে, কাব্যে অথবা দর্শনে নৈরাশ্য বা নাস্তিক্যবাদ যে মর্যাদা বা মূল্য পাইতে পারে নাই তাহার প্রধান কারণ এই অখণ্ডজীবনবোধ, এই খণ্ডজীবনের বিকৃতিকে 'মিথ্যা কুহক' কহিয়া অখণ্ডজীবনে উত্তীর্ণ হইবার প্রেমচৈতন্য। বলা বাহুল্য, এই প্রেমের আশ্বাসেই—

> এই দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি—
> অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি
> এই মহামন্ত্রখানি,
> চরিতার্থ জীবনের বাণী।
> দিনে দিনে পেয়েছিনু সত্যের যা কিছু উপহার
> মধুরসে ক্ষয় নাই তার।
> তাই এই মন্ত্রবাণী মৃত্যুর শেষের প্রান্তে বাজে—
> সব ক্ষতি মিথ্যা করি অনন্তের আনন্দ বিরাজে।
> শেষ স্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরণীর
> বলে যাব, তোমার ধূলির
> তিলক পরেছি ভালে,
> দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে।

সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মুরতি,
এই জেনে এ ধূলায় রাখিনু প্রণতি। [আরোগ্য-১]

মনন ও সাধনের দ্বারা মনের উচ্চধামে উন্নীত হইলে পর জগতের রসরূপ ও আনন্দরূপ অবশ্যই চোখে ধরা পড়ে। ইহা অবাস্তব কল্প-ব্যাপার নহে। জীব-জীবনে বাস্তবভাবেই ইহা সম্ভব হইতে পারে, হইয়া থাকে। কিন্তু সবার আগে প্রেমচৈতন্যের সাধনা তো চাই। ইহা ব্যতিরেকে সবি তো ব্যর্থ। কেননা ইহাই জীবনের মৌলসত্য।

এ চৈতন্য বিরাজিত আকাশে আকাশে
আনন্দ অমৃতরূপে—
আজি প্রভাতের জাগরণে
এ বাণী উঠিল বাজি মর্মে মর্মে মোর,
এ বাণী গাঁথিয়া চলে সূর্য গ্রহতারা
অস্খলিত ছন্দসূত্র অনিঃশেষ সৃষ্টির উৎসবে। [রোগশয্যায়-২৮]

অন্যত্র—

পরমসুন্দর
আলোকের স্নানপুণ্য প্রাতে।
অসীম অরূপ
রূপে রূপে স্পর্শমণি
রসমূর্তি করিছে রচনা,
প্রতিদিন
চিরনূতনের অভিষেক
চিরপুরাতন বেদীতলে। [আরোগ্য-২]

আবার—

রূপনারানের কূলে
জেগে উঠিলাম,
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ,
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায়। [শেষ লেখা-১১]

জীবনের সাধক অজস্র আঘাতে ও অনন্ত বেদনার মধ্য দিয়াই আপন সত্যস্বরূপটি, প্রেমস্বরূপটি চিনিতে চিনিতে চলেন। 'দুঃখের তপস্যার' মধ্যে জীবনের আনন্দমহিমা করেন অনুভব। 'দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে' তাঁহার দ্বারে আসে, তবু তিনি থাকেন অটল ধৈর্যে সুগম্ভীর। একথা সত্য যে, প্রকৃতি সৃষ্টির পথে 'বিচিত্র ছলনা জাল' পাতিয়া রাখিয়াছে, 'কষ্টের বিকৃত ভানে' ও 'ত্রাসের বিকট ভঙ্গীতে' জীবমানব বিপর্যস্তও হইতেছে। কিন্তু আত্মস্বরূপ যাঁহার জানা হইয়াছে অর্থাৎ প্রেমকে যিনি জানিয়াছেন, তিনি অবশ্যই প্রকৃতির এই 'ছলনা'কে অনায়াসে সহিতে পারেন, উত্তীর্ণ হইতে পারেন। আজিকার বর্তমান শতাব্দীতে 'ত্রাসের বিকট ভঙ্গী যত' দিশি দিশি প্রভাসিত হইয়াছে, মানুষকে করিতেছে অহরহঃ আতঙ্কিত, কিন্তু এই যে দুর্যোগ, ইহা প্রকৃতির 'অন্ধকারে ছলনার ভূমিকা' ছাড়া আর কিছু নহে। ইহাকে উত্তীর্ণই হইবে মানুষ, কেননা মানুষের স্বরূপ প্রেম, যা'

> অমৃতের অর্থ দেয় তারে,
> মধুময় করে দেয় ধরণীর ধূলি,
> সর্বত্র বিছায়ে দেয় চিরমানবের সিংহাসন। [আরোগ্য-২]

অর্থাৎ জীবনের ক্ষয় ও ক্ষতি, শোক ও সন্দেহ, পাপ ও পরিতাপ প্রকৃত প্রস্তাবে সত্য নহে, সত্য হইতেছে প্রেম। এই প্রেমের প্রভাবেই মানুষ জীবনের এই সমস্ত সাময়িক দুর্যোগ উত্তীর্ণ হয়, দূরদর্শিতার জ্যোতিরাশীর্বাদে দর্শন করিতে পায় আনন্দময় অখণ্ড জীবনের মাহাত্ম্য। এই প্রেমই সাময়িক ক্ষতির কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া চিরন্তন মঙ্গলের মহিমা দর্শন করে, এইজন্য প্রেমের যিনি সাধক, তাঁহার নিকট খণ্ডজীবনের দুঃখই বলুন, অথবা অসাফল্যই বলুন, সমস্তই অখণ্ডজীবনের সৌন্দর্যে জ্যোতিঃস্নাত হইয়া নবীনরূপ, আনন্দরূপ ধারণ করে। শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত বলিয়া আসিতেছি, রবীন্দ্রমানসের 'গাইডিং ফোর্স' এই প্রেম। ইহার তত্ত্বই রবীন্দ্র-কাব্য-দর্শনের ঐক্যতত্ত্ব। নিখিলের বিচিত্র অনুভূতি তাঁহার রচনায় অদ্বিতীয় এই প্রেমের সুর-ঝংকারেই স্পন্দিত ও ব্যঞ্জিত হইয়াছে, একথা যদি পাঠক মানিয়া থাকেন, তবে তাঁহার পক্ষে রবীন্দ্রমানসের সুর ও স্বরূপ নির্ণয়ে কিংবা কবিদার্শনিকের অভিন্নত্ব অনুধাবনে অথবা রবীন্দ্ররচনাবলীর ঐক্যতত্ত্ব অনুসরণে বিশেষ ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে না। তখন অত্যন্ত সহজেই এই কথা উপলব্ধি করিবেন যে, তাঁহার কাব্যরচনাবলীর বাণী যা, দর্শনপ্রবন্ধাবলীর বাণী ঠিক তাই-ই। বাণী এই : দুঃখ আছে, বিকৃতি আছে, বিচ্যুতি আছে, আমির বিচিত্র এই সমস্ত আবরণে জীবনটা আছেই বটে নিত্য আচ্ছন্ন, কিন্তু সবার উপরে আছে 'চৈতন্যের শুভ্র জ্যোতি', 'সত্যের অমৃতরূপ'। এই সত্যের অমৃত রূপোপলব্ধির আশায় ও আনন্দে মানুষ যুগে যুগে বিশ্ববিধ বাধা সরাইতেছে, চলিতেছে, পড়িতেছে, উঠিতেছে, আবার চলিতেছে। ধ্রুবপ্রেমের দিকে, ঐ 'শুভ্র জ্যোতির' দিকে মন রাখিয়া ওঠা-পড়া, ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়া বাস্তবজীবনের

ধূলিলিপ্ত পথ হইতে বৃহত্তরের পথে চলিতেছে যে-মানুষ, সেই মানুষ ও তাহার পৃথিবীর কথাই নন্দিত, অভিনন্দিত হইয়াছে রবীন্দ্রকাব্যে।

পাঠক দেখিয়াছেন, রবীন্দ্রদর্শনেও এই সত্যই প্রচার করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে—মানুষের মায়া-স্বরূপ হইতেছে অহং, সত্যস্বরূপ হইতেছে বিশ্ব। তবে অহং-এর যে-অংশে বিশ্বের শক্তিবীজ আছে, সেই অংশে অহং বিশ্বই হইয়া উঠিতে চায় অর্থাৎ মায়াস্বরূপের কুহকাংশ ভেদ করিয়া ক্রমশঃ সেই চৈতন্যের মধ্যে 'হইয়া' উঠিতে চায়। কুহকাংশের বাধা, তাহার বন্ধন ও বিকৃতি, এই হইয়া ওঠার পথে অনেক বাদ সাধে। কিন্তু অবশেষে সত্যস্বরূপেরই জয় হয় অর্থাৎ 'দুর্যোগের মায়ার আড়ালে' সত্যস্বরূপের জ্যোতি দৃষ্ট হয় অবারিত আনন্দে। রবীন্দ্রপাঠকগণ জানেন—কবির শেষ-বয়সের রচনাবলীতে এই তত্ত্ববাণী ও তত্ত্ববিশ্বাস নানা ভাবে ও ভঙ্গীতে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

পণ্ডিত পাঠকবর্গের নিকট এ-কথা বলাই বাহুল্য, যে, কবির আপন জীবনেও এই দর্শনবাণী বিশেষভাবে সত্য, এবং সার্থক। একদিকে পৃথিবীর অজস্র বিরোধী শক্তি তাঁহার প্রেমবিশ্বাসকে নিষ্পিষ্ট করিতে চাহিয়াছে, অপর দিকে বৃদ্ধবয়সের রোগ, শোক, জরা তাঁহার দেহ ও মনের মধ্যে অহরহঃ প্রবেশপথ করিয়া লইয়াছে—তথাপি অখণ্ডজীবনের প্রেমচৈতন্যে অটল বিশ্বাস স্থাপন করিয়া একনিষ্ঠ সাধকের মত সত্যের জয়মহিমা তিনি কীর্তন করিয়াছেন। মানবিক মাহাত্ম্যের রূপচ্ছবি শুধু তাঁহার কাব্যে নয়, দর্শনে নয়, তাঁহার ব্যক্তি মানসে ও চরিত্রে কীভাবে ক্রমশঃ প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে—অবশ্যই তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। বলাই বাহুল্য, বাস্তবজীবনের এই স্বভাবলব্ধ সাধন-অনুভূতি হইতেই তিনি মানবজীবনের 'অহং' ও 'আত্মতত্ত্ব' আবিষ্কার করিয়াছেন। বেদ, বাইবেল, উপনিষদ্, ধম্মপদ এবং মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের সাধুসন্ত ও বাংলার বাউলসাধকবর্গের তত্ত্ববাণী হইতে তিনি বহু ভাবৈশ্বর্য আহরণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু একথা অস্বীকার করা চলে না যে, তাঁহার স্বভাবজীবন হইতে সমুৎসারিত তত্ত্বধর্ম ও বিশ্বাসের সহিত সেই সমস্ত তত্ত্ববাণী সহজ ভাবেই মিলিয়াছে বলিয়াই তাঁহার নিকট সেইগুলি গ্রহণযোগ্য হইয়াছে। আসলে 'তত্ত্ব' তিনি করিতে চাহেন নাই, 'জীবনই' করিতে চাহিয়াছেন এবং সেই জীবন-বাণীই ক্রমশঃ তত্ত্বের আকার ধারণ করিয়া নিটোল একটি সর্বানুভূ জীবনদেবের রূপ-মহিমা প্রদর্শন করিয়াছে। রবীন্দ্র-চৈতন্য ঠিক যথার্থভাবে গতানুগতিক ভারত-চৈতন্য নহে। রবীন্দ্রনাথ জীবন দিয়া, জীবনের বিশ্বাস দিয়া, জীবনের বহুবিধ বিচিত্র অভিজ্ঞতার দ্বারা যে চৈতন্যের ইশারা পাইয়াছেন, ভারত-চৈতন্যের সহিত তাহার কতক পরিমাণে সাদৃশ্য ও মিলন আছে বটে, কিন্তু তাহা কবির নিজস্ব আবিষ্কার। ভারতীয় চিন্তায় তিনি একটি নূতন জীবনধ্যান সংযোগ করিয়াছেন; জগৎকে স্বীকার করিয়া, অহংকে স্বীকার করিয়া, জীবনের শেষ দিন পর্যন্তও অহং-এর সর্ববিধ অতিকৃতি ও বিকৃতি বস্তুবাদীর মতই মানিয়া লইয়া, সহজভাবে সকলবিধ দুঃখশোক ও পাপতাপকে জানিয়া

লইয়া—সহজভাবেই আবার সেগুলি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ধাপে ধাপে সমুচ্চ জীবনলোকের দিগন্তব্যাপী জ্যোতিরঙ্গণে অভিযাত্রার যে সাধনবাণী রবীন্দ্রজীবনে প্রকাশ পাইয়াছে—রবীন্দ্রকাব্যে ও রবীন্দ্রদর্শনে তাহারই আনন্দ-স্ফূর্তি কি দেখি নাই ?

রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব এই : জীবন দিয়া তিনি যাহা না জানিয়াছেন তাহা তিনি কিছুতেই প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার অখণ্ড চৈতন্য জীবনগত বাস্তবসত্য, যেমন সত্য অহং-এর খণ্ডগত ক্ষুদ্রতা। যোগী তিনি নহেন—মন ছাড়াইয়া মনের অগোচর তত্ত্বে উঠার সাধনা তাঁহার নয়। মন দ্বারা এবং মনন দ্বারা যে চৈতন্যকে ধরা যায়, রবীন্দ্রনাথ তাহার কথাই কাব্যে কথায় ও দর্শনবাণীতে বিবৃত করিয়াছেন। এই চৈতন্যকে মন যদি ধরিতে না পারিত, তাহা হইলে এই চৈতন্যও রবীন্দ্রনাথের নিকট 'অবাস্তব তত্ত্ব' বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত। পূর্বেই বলিয়াছি, মনের উচ্চশিখরে উন্নীত হইয়া বিজ্ঞানধামের ঈষৎ জ্যোতি তিনি দেখিয়াছেন। এই জ্যোতি তাঁহাকে অহরহঃ টানিয়াছে ; মন তিনি কখনও ত্যাগ করেন নাই সত্য, কিন্তু মনের আবরণ উঠিয়া গেলে পূর্ণ সেই চৈতন্য-উৎসের যে সন্ধান মিলিবে, তাহা তিনি বিশ্বাস করিয়াছেন :

এই ঘন আবরণ উঠে গেলে
অবিচ্ছেদে দেখা দিবে
দেশহীন কালহীন আদি জ্যোতি,
শাশ্বত প্রকাশপারাবার,
সূর্য যেথা করে সন্ধ্যাস্নান,
যেথায় নক্ষত্র যত মহাকায় বুদ্‌বুদের মতো
উঠিতেছে ফুটিতেছে,
সেথায় নিশান্তে যাত্রী আমি,
চৈতন্য-সাগর-তীর্থপথে ॥ [রোগশয্যায়-২০]

রবীন্দ্রনাথের কথা এই, জগৎ ও জীবনের পক্ষে আমির আবরণ যেমন সত্য, আবরণ ভেদ করিয়া এই বস্তুজীবনেই চৈতন্যদর্শন তেমনি সত্য। 'সংসারের ক্ষুব্ধতার স্তব্ধ ঊর্ধ্বলোকে' মনোগত, কি না বাস্তব জীবনগত প্রশান্ত এই চৈতন্যের সাক্ষাৎকার অবশ্যই হইতে পারে। রবীন্দ্র-কল্পিত জ্যোতির্ময় 'পরমমানব' এই চৈতন্যের অধিকারী।

এ আমির আবরণ সহজে স্খলিত হয়ে যাক.
চৈতন্যের শুভ্র জ্যোতি
ভেদ করি কুহেলিকা
সত্যের অমৃতরূপ করুক প্রকাশ।
সর্বমানুষের মাঝে

এক চিরমানবের আনন্দকিরণ
চিত্তে মোর হোক বিকিরিত।
সংসারের ক্ষুব্ধতার স্তব্ধ ঊর্ধ্বলোকে
নিত্যের যে শান্তিরূপ তাই যেন দেখে যেতে পারি,
জীবনের জটিল যা বহু নিরর্থক,
মিথ্যার বাহন যাহা সমাজের কৃত্রিম মূল্যেই,
তাই নিয়ে কাঙালের অশান্ত জনতা
দূরে ঠেলে দিয়ে
এ জন্মের সত্য অর্থ স্পষ্ট চোখে জেনে যাই যেন
সীমা তার পেরোবার আগে। [আরোগ্য-৩৩]

সর্বদেশ ও সর্বযুগগত সেই 'এক চিরমানবের' চৈতন্যমহিমাই রবীন্দ্রকল্পিত ব্রহ্মমহিমা, প্রেম-মহিমা। এই প্রেমমহিমা উপলব্ধি করিতে হইলে খণ্ডের ক্ষুদ্রতা, সংসারের স্তব্ধতা, সভ্যতার অসভ্য বর্বরতা, ব্যক্তি-জীবনের লাভ-লালসার অভব্যতা সাধনবলে অতিক্রম করিতে হইবে। এই অতিক্রমের বাণীকে অবাস্তব বলিয়া 'পরম পাকার' চাতুর্য প্রকাশ করিলে চলিবে না। যে নিষ্ঠা, যে দৃঢ়তা ও যে হৃদয়বত্তা মানুষকে প্রেমের পথে, চিরমানবের পথে পরিচালিত করে, সকলের মধ্যে সেগুলি অহরহঃ দেখা দেয় না বলিয়া সেগুলি যে মিথ্যা বা অবাস্তব তাহা নহে। সংসারের চারিপাশে অন্ধকার নাচিতেছে, হৃদয়ের জৈব-বাসনায় নামিয়াছে অন্ধকার, পাপ অভিলাষের ঘৃণ্য সরীসৃপবৃত্তি চিত্তকে টান দিতেছে অমারাত্রির গুপ্ত প্রণয়ে, তথাপি সূর্য-স্নাত সুন্দর প্রভাত-মহিমার রজতশুভ্র দৈবরূপকে কিছুতে অবিশ্বাস করিব না—এই যে দৃঢ়তা ইহাই প্রেমপথের পাথেয়। ইহাই রবীন্দ্রমন্ত্র, ইহাই জীবনকে ও মানবজন্মকে কালে কালে মর্যাদা দান করে। ইহারই জ্যোতিরাশীর্বাদে কবি জানেন—

অমৃতের আমি অধিকারী
পরম আমির সাথে যুক্ত হতে পারি
বিচিত্র জগতে,
প্রবেশ লভিতে পারি আনন্দের পথে॥ [আরোগ্য-৩২]

'বিচিত্র জগতের' সহিত যুক্ত হইতে হইতেই কবি 'আনন্দের পথে' প্রবেশ লাভ করিয়াছেন। 'কবিকাহিনী' হইতে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত সকল কাব্যগ্রন্থেই এই কথার সাক্ষ্য মিলিবে। কবির জীবনে নানা বাধা, নানা বিপত্তি আসিয়াছে, কিন্তু আনন্দকে জানা আছে বলিয়া সেই সমস্ত বাধাবিপত্তিকে প্রকৃতির 'কুহক' বলিয়া, 'ছলনা' বলিয়া, অতিক্রম করিবার শক্তিও তাঁহার জাগিয়াছে। জগতের ও জীবনের বিচিত্র বিষয়ে কবি লিপ্ত হইয়াছেন সত্য কিন্তু অনন্তকাল ধরিয়া কোনো বিষয়েই লিপ্ত থাকা তাঁহার স্বভাব নহে।

এই স্বভাব হইতেই কবি জানিয়াছেন ত্যাগই জীবনের ধর্ম। ছাড়িতে যে জানে না, বাড়িতে সে পারেই না। বাড়িতে হইলে ছাড়িতেই হইবে। এই ছাড়ার বাণী তত্ত্ব-বৈরাগ্যের বাণী নহে, প্রেমবৈরাগ্যের বাণী। এই বৈরাগ্যের টানেই প্রেম বহির্গত হয় রূপ হইতে রূপে, দেশ হইতে দেশে, কাল হইতে কালে। প্রেমজীবনে ইহাই গতি।

একাধিক সমালোচক রবীন্দ্রনাথকে গতিধর্মের কবি কহিয়াছেন। কথাটা যে মিথ্যা নহে, রবীন্দ্রপাঠকমাত্রেই তাহা জানেন। বস্তুতঃ বিশেষ হইতে রবীন্দ্রনাথের প্রেম-মানস অশেষের অভিমুখে নিত্যই অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু এই অগ্রসরতা বা অগ্রগতি কেমন গতি? নিত্যপরিবর্তনশীল এই জড়জগতের মধ্যে অন্তহীন যে নশ্বরতা গ্রীক দার্শনিক হেরাক্লিটাস্ লক্ষ্য করিয়াছিলেন, এই নিত্য নশ্বরতার অন্তর্ভেদী নিত্য নূতন অভ্যুদয়ের প্রাণগতি কি এই গতি? হেরাক্লিটাস্ এই জগতের পৃষ্ঠে অন্তহীন পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এই মুহূর্তেই আমি যে বস্তুটিকে নিরীক্ষণ করিতেছি—নিরীক্ষণের দ্বারা সেই বস্তুটি সম্বন্ধে বিশেষ একটা ধারণা করিয়া লইতেছি—সেই বস্তুটি কালপ্রবাহে ভাসমান হইয়া পর-মুহূর্তেই যে অন্যরূপে প্রতিভাত হইয়া যাইতেছে তাহা কি আমি জানি? দৃষ্ট জগতের সম্বন্ধে আমি যে ধারণা করিতেছি, সে ধারণা পূর্ণ সত্য নহে। হেরাক্লিটাস্‌কে অনুসরণ করিয়া প্লেটো তাই বলিয়াছেন জগত সম্বন্ধে আমরা যে ধারণা পোষণ করি তাহা অর্ধ-সত্য, 'সেমি-রিয়াল'—কেননা জগতের প্রতিটি বস্তু অনাদ্যন্তকাল হইতে কেবলি রূপ হইতে ভিন্ন রূপে, নূতন রূপে গতি লইতেছে। ফরাসী দার্শনিক বার্গসঁর ধারণাও কতকটা এই ধরণের। তবে এই গতির মূলে বিশেষ কোনো প্রাণশক্তি ('ইলান ভাইটেল') আছে বর্তমান। বার্গসঁ এই 'প্রাণের' তত্ত্ব যুক্তি দ্বারা নয়, বোধির দ্বারা ধারণা করিয়াছেন। অবারিত প্রাণচাঞ্চল্যে জগত অহরহঃ ছুটিতেছে—ইহার নাই আদি, নাই অন্ত। কোথায় ছুটিতেছে? বার্গসঁতে তাহার উত্তর নাই। রবীন্দ্রনাথের গতি কি এই গতি—এই আদিহীন, অন্তহীন চাঞ্চল্য? এই কেন্দ্রহীন, স্থিতিহীন, লক্ষ্যহীন প্রাণপ্রবাহ? পূর্বেই একাধিকবার বুঝাইয়াছি, রবীন্দ্রনাথে যে গতি আছে তাহার অপর নাম হইতেছে বৃহতে রতি। বৃহৎ অর্থাৎ সকলের যে বড়, যাহার বড় আর কিছু নাই, সেই বৃহতের প্রতি, ব্রহ্মের প্রতি, তাঁহার আকর্ষণ। জার্মান দার্শনিক হেগেলের গতিবাদের সহিত এইস্থলে রবীন্দ্র গতিধর্মের কতকটা মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায়। হেগেলের গতি পূর্ণের ('পারফেক্ট্') অভিমুখে গতি—রবীন্দ্রনাথের গতি ব্রহ্মের অর্থাৎ প্রেম-ব্রহ্মের অভিসারে গতি। এই প্রেমকে যদি পূর্ণভাবে পাওয়া যাইত, গতির আর কোনো প্রয়োজন ছিল না। তাঁহাকে এখনও পূর্ণভাবে পাওয়া যায় নাই, তাই সাধনার, কি না গতির, অর্থাৎ তাঁহার প্রতি প্রাণ-রতির অবসান নাই। তিনিই কেন্দ্র, বিশ্ব-বৈপরীত্যের মূলে অখণ্ড সঙ্গতি ও সমন্বয়রূপে তিনি আছেন, তাঁহাকে পাওয়ার জন্য রবীন্দ্রভাষায়, সাধনার দ্বারা সেই প্রেম 'হওয়ার' জন্য জীবন ও জগৎ নিত্য গতিশীল, মানুষমন 'ডায়নামিক্'। এই যে 'ডায়নামিক্'

ধর্ম, এই যে সর্বজগদ্‌গত সামঞ্জস্যের আধার-অভিমুখী হৃদয়গতি—ইহা হেরাক্লিটাসের 'পরিবর্তন' নহে, বার্গসঁর 'প্রাণবেগ'ও নহে, হেগেলের 'পূর্ণাভিসার' বলিলে আপত্তি করি না বটে, তবে ইহার আরও সুন্দর ব্যাখ্যা ভারতীয় দর্শন হইতেই আমি পাইয়াছি। মানস সাধনার দ্বারা রবীন্দ্রনাথের এই গতিধর্ম কেন্দ্রাশ্রয়ী হইতে চাহিতেছে—বৃহতে বৃহৎ হইয়া মুক্তি চাহিতেছে ক্রমশঃ—ইহাকেই তাই 'ক্রমমুক্তিলাভ গতি' বলাই যুক্তিযুক্ত। শঙ্করাচার্য ইহাকে 'উত্তর-পথে গতি' নাম দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—যাঁহারা উপাসনার দ্বারা অর্থাৎ সাধনার দ্বারা জগতের কর্ম করেন, তাঁহারা ওই সাধনপ্রভাবে উত্তর পথে যান। "তথা চ যাগাদ্যনুষ্ঠায়িনামবে বিদ্যাসমাধি বিশেষাদুত্তরেণ পথা গমনম্"।

এই উত্তরপথ আমাদের শাস্ত্রে দেবযানপথ বা ক্রমমুক্তিস্থান বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই দেবযান পথের একটি সুচারু ব্যাখ্যা শাস্ত্রে আছে। শাস্ত্র বলেন—এই দেবযানগতি যাঁহাদের, তাঁহারা প্রথমে সৌরতেজে হন দীপ্যমান, অন্ধকার হইতে আলোকে আসেন তাঁহারা,—তাহার পর তাঁহারা প্রবেশ করেন সূর্যলোকে। [দুর্গাচরণের বেদান্ত দর্শন, পাদটীকা ; পৃ. ৮৯] সূর্য হইতে চলেন ব্রহ্মলোকে, ব্রহ্মলোকে ভোগান্তে আসে মুক্তি —হন ব্রহ্ম, 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি'। [মুণ্ড : ৩।২।৯]। এই যে ক্রমগতি, ইহার নাম বিভিন্ন অতিবাহিক পুরুষের সাহায্যে ক্রমমুক্তিস্থান লাভ। শঙ্করের উত্তরপথগতি ও দেবযানগতি একার্থবোধক। রবীন্দ্রনাথের গতি দেবযানগতি—অপূর্ণ হইতে পূর্ণে অগ্রগতি।

বলিতেছেন রবীন্দ্রনাথ :

'আমরা অপূর্ণ বলিয়াই সেই পূর্ণ স্বরূপকে আমাদের একান্তই চাই, আমরা অপূর্ণ বলিয়াই সেই সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মই আমাদের একমাত্র আনন্দ, একমাত্র মুক্তি। আমরা অপূর্ণ বলিয়াই আমরা অপূর্ণের পূজা করিব না, অপূর্ণের উপরে আমাদের অমর আত্মার, আমাদের অনন্ত জীবনের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিব না, আমরা এই অসৎ, এই অন্ধকার, এই মর্ত্যবিষয়পুঞ্জের মধ্যস্থলে শান্তোদান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা সাধনা করিতে থাকিব, যতদিন না বলিতে পারি—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।' [রচনাবলী-৯ম, পরিশিষ্ট]

দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের এই জীবনাদর্শই কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যাবলীতে ধীরে ধীরে, একটু একটু করিয়া, নানা ভাবের ও বেদনার মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন বলেন নাই, পূর্ণকে পাইয়া গিয়াছি, পূর্ণ হইয়া গিয়াছি। কবিও কহেন নাই, যাত্রা তাঁহার শেষ হইয়াছে। দার্শনিক ধ্যানের দ্বারা যাহা অনুভব করিয়াছেন

—কবি বস্তুগত জীবনের প্রতিটি আবেগ-বিহ্বলতার মধ্য দিয়াই তাহা পাইয়া পাইয়া ছুঁইয়া-ছুঁইয়া চলিয়াছেন। এই চলা বা গতি শুদ্ধমাত্র প্রাণচাপল্যে অন্ধ নহে, পরন্তু আত্মজ্ঞানে জ্যোতিষ্মান। জ্ঞান এই : কেন্দ্রে মিলিতে হইবে, 'হইতে' হইবে। হওয়ার জন্যই আসা, হওয়ার জন্যই যাওয়া। এই আসা-যাওয়ার বাণী—এই গতিধর্ম, শুধু 'বলাকা'তে নয়, শুধু কবির ভাগবত-সংগীতগুলিতে নয়, পরন্তু তাঁহার ছোট বড় সকল কবিতাতেই সূক্ষ্ম প্রাণ-স্পন্দনরূপে লীলায়িত রহিয়াছে। তত্ত্বজ্ঞরা দেখিয়াছেন—অতিবড় ক্ষুদ্র বিশেষের মধ্যেও কবিগুরু সমুচ্চ সামান্যকে দেখিয়া থাকেন; তাঁহাকে পাইতে ছোটেন, যাহা পান, তাহাকে প্রথম আবিষ্কারে গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু যখন জানেন ইহাও তাঁহার 'সেই' নহে, তখন 'ইহ বাহ্য' কহিয়া—'চাইনে' কহিয়া—রূপ হইতে রূপান্তরে অগ্রসর হন। মূর্তের মধ্যে অমূর্তের চারু অভিসার তিনি লক্ষ্য করেন, আবার অমূর্তকে মূর্তে আনিবার ব্যাকুলতা অনুভব করেন। এই কারণে তাঁহার তুলিকায় 'মূর্ত' দিব্যোজ্জ্বল শান্তরূপে প্রকাশ পাইয়া অমূর্ত অপ্রকাশের পথের—ওই দেবযান পথের,—অস্পষ্ট ইশারায় মনকে টানিয়া লইয়া চলে,—মানুষকে জানায় বিরাট সত্তার সহিত তাহার সম্বন্ধ, বিশ্বভুবনেশ্বরের সহিত তাহার আত্মীয়তা।

রবীন্দ্রকাব্যে বিশ্বভুবনেশ্বরের সহিত আত্মীয়তার বাণী আকস্মিকভাবে জাগিয়াছে, তাহা নহে। সুধী পাঠক জানেন, মানুষের পৃথিবীতে বস্তুগত জীবন যাপন করিতে করিতেই সকলের সহিত যুক্ত হইবার কল্পনা ও ধ্যান তিনি লাভ করিয়াছেন বহু অভিজ্ঞতার আনন্দে। সকলের সহিত মিলিত হইয়া আছে যে অখণ্ড 'সর্ব'—সেই সর্বের আভাস তিনি দর্শন করিয়াছেন সর্বত্র। এই কারণে সংসারের কিছুকেই তিনি উপেক্ষা দিতে চাহেন নাই —আবার খণ্ড লইয়া আসক্ত হইতেও পারেন নাই। আসক্তির পাপপথ যে তাঁহাকে টানে নাই, তাহা নহে, সেই টানার ছন্দ তাঁহার কাব্যকথায় যে ঝংকৃত হয় নাই তাহাও নহে। তবে কথা এই, কোনো টানেই আত্মসমর্পণ করিয়া বৃহৎ টানের পথ তিনি রুদ্ধ করেন নাই। এইজন্য পৃথিবীর পাপ-প্রলোভন, কামনাবাসনার টানের মধ্য দিয়াও তিনি বৃহৎ টানের আনন্দে

যায় যেন মোর সকল গভীর আশা
প্রভু, তোমার টানে…

বলিয়া অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন। রবীন্দ্রকল্পিত অহংতত্ত্ব ও আত্মদর্শনের গতি রহস্য তো ইহাই। এই রহস্য যিনি উপলব্ধি করিবেন, তিনি কবিগুরুর দার্শনিক ও কবিসত্তার মধ্যে অভেদ ব্যক্তিত্বের আনন্দই আস্বাদন করিবেন।

দীর্ঘ অধ্যায়টির এইবার উপসংহার প্রয়োজন। পাঠক মহাশয়ের ধৈর্যশক্তির আর পরীক্ষা করিব না। পূর্বে যাহা একাধিকবার বলিয়াছি, তাহার সারসংক্ষেপ প্রদানকল্পে শেষকথা উত্থাপন করিতেছি।

উপসংহার

বলিয়াছি—প্রেমই রবীন্দ্র-কাব্যদর্শনের মূলকথা। কবির কাব্যজীবনের মূলতত্ত্ব, ঐক্যতত্ত্ব। প্রেমের উন্মেষ, প্রেমের মোহ, প্রেমের সংশয়, প্রেমের বৈরাগ্য বা গতি, প্রেমের সমন্বয়বোধ, প্রেমের সর্বানুভূ অনুভূতি, প্রেমের সর্বজগদ্গত আনন্দ, কবির মনো-জীবনকে অবলম্বন করিয়া আশ্চর্য শিল্পসৌন্দর্যে উদ্বেজিত, উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রেম নামিয়াছে অহং-এ, প্রেম অভিসার করিয়াছে আত্মপথে। বস্তু-অহং ও ভাব-আত্মার মধ্যবর্তী এই পার্থিব জীবন প্রেমগতির সৌন্দর্যে হইয়াছে স্বপ্নসুন্দর, আনন্দোজ্জ্বল। পার্থিব-জীবনে দুঃখ-দৈন্য, অত্যাচার-অনাচার, শোকতাপবন্ধন, প্রেমের স্পর্শমণির ছোঁয়ায় হইয়া উঠিয়াছে স্বর্ণশিল্প, আভাস দিয়াছে রূপের অন্তরে অরূপের। চিত্ত তাই অরূপের আকর্ষণে আত্মপথের ঔদার্যে অগ্রসর হইবার পাইয়াছে পথ। গতি রহিয়াছে অব্যাহত।

প্রেম যখন অহং-এ অবতরণ করে, তখন প্রথম অবস্থায় অহং তাহাকে বন্দী করিতে চায় বিশেষ কোনো আকর্ষণে। বিশেষে-বন্দী প্রেমের নাম মোহ। এই মোহ চায় খণ্ড বিশেষে লিপ্ত রহিয়া নিত্যকাল সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাস করিতে। ইহাই প্রকৃতির মায়া, জীবনের কুহক, মৃত্যুর গুপ্ত প্রেম। ইহা বুঝিতে হয়, অতিক্রম করিতে হয়। মানুষ যে সহজেই ইহা অতিক্রম করিতে চায়, তাহা নহে। মোহের মাধুর্য তাহাকে টানিয়া রাখিতে চায় সংসারের বন্ধনে। কিন্তু যত অভিজ্ঞতা বাড়ে—জীবনবোধ যত জাগ্রত হয়, ততই সে বুঝিতে পারে 'নিরন্ত প্রলয়'ই প্রকৃতির লীলা। সৃষ্টির আনন্দ আছে বলিয়া ভাঙনের প্রয়োজন। নিত্য ভাঙনের অবারিত আনন্দাঘাতে অহং-এর খণ্ড-মোহ যায় চুরমার হইয়া। সংশয়ের বেদনায় তখন পূর্ণ হয় অন্তর। সংশয়ের প্রথম অবস্থায় জাগে নৈরাশ্য, নানা দ্বন্দ্বে, নানা সংগ্রামচেতনায় বিদ্রোহী হয় হৃদয়। তীব্র এক প্রকার অসহ্য বেদনায় চঞ্চল বিহ্বল হয় চিত্ত-প্রাণ। এই বেদনা কিন্তু প্রেমের পরিপন্থী নহে, প্রেমেরি ইহা উদ্বোধক। 'কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ' নামক বিখ্যাত কবিতাটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কবি স্বয়ং এইরূপ ইঙ্গিত দিয়াছেন।

'বাহিরে যাহার সার্থকতা, বাহিরে আসিবার পূর্বে সে তীব্র বেদনা অনুভব করে—বস্তুতঃ এই বেদনাই জানায় যে তাহাকে বাহিরে আসিতে হইবে—ইহাই গর্ভবেদনা ; এবং মৃত্যুবেদনারও নিঃসন্দেহ এই তাৎপর্য। আমাদের সমস্ত প্রবৃত্তিরই সার্থকতা বাহিরের জগতের সহিত মিলনে—যতক্ষণ পর্যন্ত সেই মিলন সম্পূর্ণ না হয়, আমাদের প্রবৃত্তিগুলি বহির্মুখী হইয়া না আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহারা আমাদের মধ্যে নানাপ্রকার পীড়ার সৃষ্টি করে—নিখিলের মধ্যে তাহারা বাহির হইয়া আসিলেই সকল পীড়ার অবসান হয়। অতএব আমরা যখন পীড়া অনুভব করি তখন আমরা যেন মনে না করি এই পীড়াই

চরম—ইহা মুক্তির বেদনা—একদিন যাহা বাহিরে আসিবার তাহা বাহিরে আসিবে এবং পীড়ার অবসান হইবে। 'কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে' কবিতাটির ভিতরকার তাৎপর্য আমার কাছে এইরূপ মনে হয়। সেইজন্য উহার নাম দিতেছি মুমুক্ষু।'

[কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত কবির পত্র]

সুতরাং বুঝা যাইতেছে, সংশয় বা সংশয় হইতে জাত তীব্র বেদনা মুক্তিপথের বাধক নহে। রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলিয়াছেন :

'সংশয়ের বেদনা তখনি জেগে ওঠে যখন গোপনভাবে ঈশ্বর আমাদের চৈতন্যের একটা দিকে স্পর্শ করেন। তখন সংসারের মধ্যে থেকেও সংসার আমাদের কান্না থামাতে পারে না। এবং তাঁর দিকে দুই বাহু প্রসারিত করেও অন্ধকারে তাঁর নাগাল পাইনে। তখন এইটে জানা আরম্ভ হয় যে, যা পেয়েছি তাতে কোনোমতেই আমার চলবে না এবং যা না হোলে আমার চলা অসম্ভব তা আমি কিছুতেই পাচ্ছি নে। এমন অসহ্য কষ্টের অবস্থা আর কিছুই নেই।

'যখন প্রসবের সময় আসন্ন তখন গর্ভের শিশুকে একদিকে নাড়ী সম্পূর্ণ ছাড়ছে না অন্য দিকে ভূমিষ্ঠ হবার বেগ তাকে আকর্ষণ করছে। মুক্তির সঙ্গে বন্ধনের টানাটানির তখনো কোনো মীমাংসা হয়নি। এই সময়ের বেদনাই জন্মদানের পূর্বসূচনা, এই বেদনার অভাবকেই চিকিৎসক ভয় করেন।

'যেদিন সংশয়ের ক্রন্দন আমাদের মধ্যে সত্য হয়ে ওঠে, সেদিন আমরা সম্প্রদায়ের মত, দর্শনের তর্ক ও শাস্ত্রের বাক্য নিয়ে আরাম পাইনে, সেদিন আমরা এক মুহূর্তেই বুঝতে পারি প্রেম ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নাই।' [সংশয়, শান্তিনিকেতন-১]

বস্তুতঃ সংশয় যেখানে প্রেমাভিমুখী, সত্যাসত্যের দ্বন্দ্ব-আন্দোলনে সেখানে সে সত্যকেই পরিশেষে লাভ করে। মোহ তাই সংশয়ের পথ বাহিয়া প্রেমরূপে ফুটিয়া ওঠে—ক্রমশঃ বৈরাগ্যে রূপান্তরিত হইয়া সর্বজগদ্‌গত হইবার ব্যাকুলতা করে অনুভব। রবীন্দ্রপ্রেমের গতিপথ তাই সংক্ষেপে এই : প্রথমে মোহ, পরে সংশয়, তাহার পর প্রেম ও বৈরাগ্য অর্থাৎ বৃহতে চিত্তরতি। রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রকাব্যাবলীর মধ্যে প্রেমের এই গতিপথ কি লক্ষ্য করেন নাই? কপিবুকযুগের কবিতাবলীতে মোহ, প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ কাব্যসম্ভারে দ্বন্দ্ব-সংশয়, তাহারও পরবর্তী কাব্যাবলীতে রূপ-প্রেম ও রূপে অরূপ দর্শন। এই অরূপদর্শনই তো উদ্বেজিত হইয়াছে দেবযানগতির আনন্দোচ্ছ্বাসে—পলে পলে জাগাইয়াছে নবজন্মের বিচিত্র আনন্দ। এই আনন্দেরই অপর নাম বৃহতে রতি। এই রতি যখন জাগে জগৎ তখন সুন্দর, মানুষ সুন্দর। তখন জীবনে ও প্রকৃতিতে যদি অসুন্দর বা অসঙ্গতিপূর্ণ কিছু দৃষ্ট হয়, তাহা অবশ্যই প্রকৃতির ছলনা, জীবনের কুহক—অতএব তাহা মিথ্যা, তাহা মায়া। কবিগুরুর শেষ বয়সের কবিতাবলীতে কি এই তত্ত্ব আমরা পাইয়াছি?

প্রেমের এই যে বিচিত্ররূপে চিত্ত সংক্রমণ—বিস্ময়ের কথা এই—কবির বালকবয়সের রচনা কবিকাহিনীতেই ইহার চিত্র চিত্রিত হইয়াছে। প্রেমের মোহ ও সংশয়, বৈরাগ্য, বিশ্বগত আনন্দ ও বৃহতে রতি কবিকাহিনীতে বিবৃত হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় লেখক প্রভাতকুমার যথার্থই বলিয়াছেন : 'কবিকাহিনীর বিষয় নির্বাচনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জীবনের অন্তর্নিহিত সত্য আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে। বালক রবীন্দ্রনাথ যখন কবিকাহিনী লিখিয়াছিলেন তখন হয়ত নিজেই জানিতেন না যে এই লেখার মধ্যে তাঁহার নিজের পরবর্তী জীবনের ছায়া পড়িয়াছে। ছেলেমানুষী হইলেও এ-বয়সের লেখায় বিশ্ব-প্রেমের কথাকে একেবারে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না।' [রবীন্দ্রজীবনী-১]

বস্তুতঃ কবিকাহিনী যেন কবির জীবনদর্শনের ভূমিকা, তাঁহার তত্ত্ববাণীর সার-সংক্ষেপ। কাহিনীর কবি বৃদ্ধবয়সে হিমালয়ের নিকট যাইয়া মানবপ্রেম ও বিশ্বপ্রেম সম্পর্কে যে ভাষণ দিয়াছেন, শিল্পবিচারে তাহার যতই দুর্বলতা ও ত্রুটি প্রকাশ পাক না কেন, তত্ত্ববিচারে তাহা প্রণিধানযোগ্য বটেই। 'যে বিশ্বপ্রেম বা বৃহতে রতি' কাহিনীতে দেখিয়াছি তাহাই কবির পরবর্তী জীবনের কাব্যাবলীতে বিচিত্র ভাবে, বিচিত্র ছন্দে, বিচিত্র ভঙ্গিতে উলসিত, বিলসিত হইয়া উঠিয়াছে।

প্রেম, বিশ্বপ্রেম, বৈরাগ্য বা বৃহতে রতি রবীন্দ্রকাব্যদর্শনের ঐক্যতত্ত্ব—আবার এই তত্ত্বই তাঁহার কাব্যরত্নাবলীর বৈচিত্র্যের কারণ। বৃহতে রতি বা প্রেমবৈরাগ্যের স্বভাবই এই : রূপে সে মুগ্ধ হয় বটে, কিন্তু যাহা সে দেখে, তাহাতেই সে দর্শন করে বৃহতের ইঙ্গিত অর্থাৎ রূপে সে বস্তুরূপ দেখে বটে, কিন্তু অরূপের, অনাগতের, রূপ না দেখিলে তাহার তৃপ্তি হয় না।

রূপে অরূপ দেখার প্রতিভায় মনের দৃষ্টিশক্তি বাড়ে—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকুলতাও বাড়িয়া যায়। সে কেমন? না, যাহা দেখিতেছি, বস্তুগতভাবে নাগালের মধ্যে যেন মনের মত করিয়া পাইতেছি না। কিছু না-দেখা, না-পাওয়া তাই থাকিয়া যায়। তাই মন হয় চঞ্চল, চলার গান জাগে অন্তরে।

এই চলার নাম অহং হইতে আত্মায় চলা, অধিকতর বাস্তব হইতে বৃহত্তর বাস্তবে চলা, প্রেয় হইতে শ্রেয়তে চলা, মৃত্যু হইতে অমৃতে চলা, প্রেম হইতে সর্বজগদ্‌গত প্রেমে চলা। এই চলার নামই আত্মবিকাশ। ইহাই রবীন্দ্রকল্পিত মুক্তি। অহং-এর মোহ হইতে আত্মায় গতি বা রতিই তো মুক্তি।

এই মুক্তি ইহলৌকিক জীবনের প্রত্যক্ষ মুক্তি। জীবনে ইহার প্রকাশ যুগে যুগে আমরা দেখিয়াছি। মহাপুরুষ ও মহাত্মাদের কর্মে, জ্ঞানে, বাক্যে, ব্যবহারে বাস্তব এই মুক্তির জ্যোতি হয় বিভাসিত। ইহাদের দেখিয়াই তো জীবমানব মুক্তিপথযাত্রী হইবার প্রেরণা লাভ করে।

এই মুক্তির বাণী কি? সীমার মধ্যে বদ্ধ রহিয়ো না। আসক্তিতে হইয়ো না মগ্ন। মোহের মধ্য দিয়া, দুঃখের মধ্য দিয়া, সংশয়ের মধ্য দিয়া চলো নবীন জীবনক্ষেত্রে। বাড়াইয়া চলো জীবজীবনের মর্যাদা। ধরিত্রীর বাস্তবজীবন মাহাত্ম্যপূর্ণ হউক তোমার জন্মের আশীর্বাদে।

এই মুক্তির সর্বোচ্চতম আদর্শ কি? অখণ্ড আমি অর্থাৎ সর্বজগদ্‌গত প্রেম। ইহাকে পাওয়া নয়, ইহা হইতে হইবে সাধনায়। এই হওয়াই 'চিরমানব' হওয়া, 'পরমমানব' হওয়া। কেমন করিয়া হইব? আমির মধ্যে বিশ্ব এবং বিশ্বের মধ্যে আমিকে দর্শন করিবার সাধনা-কল্যাণে হইব। আমির মধ্যে যখন বিশ্ব দেখি, তখন বিশ্ব আমি-ধর্মী। আমি যদি প্রেম, বিশ্বও প্রেম। আমি যদি সত্য, বিশ্বও সত্য। আমি যদি সুন্দর, বিশ্বও সুন্দর। আমিকে হইতে হইবে—বিশ্ব তাহইলে 'হইবে'।

আবার বিশ্বের মধ্যে যখন আমিকে দেখি, তখন সর্বত্রই আমি হই লীলায়িত। তুচ্ছ ধূলি হইতে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত কাহাকেও অনাত্মীয় ভাবি না। বিশ্বের সকলেই, সকল কিছুই, তখন আপনার। দুঃখ-শোক, ভাবনা-বেদনা, মান-অপমান, মৃত্যু-অমৃত সকল কিছুরই মধ্যেই আমিকে স্থির রাখিতে চাহি। বিশেষ কোনো খণ্ডবিষয়ে বা বিশেষে লিপ্ত থাকি না, খণ্ড-আমির মোহকে বিশ্ব-আমি জানে মায়া বলিয়া, জীবনের কুহক বলিয়া। এই মায়া বা কুহক কাটাইবার অস্ত্র হইতেছে বিশ্বজীবন-বোধ। ইহারি মহিমায় আমিকে সংসারের ও জীবনের সকল ঘটনাতেই নূতন রঙে, নূতন কর্মে রঞ্জিত করিয়া দেখি।

এই যে বিশ্বদর্শন, ইহাকে আপনি রবীন্দ্রনাথের মনোদর্শন বলিতে পারেন। মনের দ্বারা ইহার দর্শন অসম্ভব নহে। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথে মনোদর্শনই সত্য- ইহার উর্ধ্বে তাঁহার গতি নাই। তাহা যদি হইত, পূর্বেই বুঝাইয়াছি, তাঁহার গতি স্থির হইয়া যাইত, গতি শান্তিতে হইত রূপান্তরিত। গতিতত্ত্বে শান্তি সম্ভব নয়, অবাঙ্‌মনসগোচর মুক্তিতত্ত্বেই শান্তি সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের দর্শন, মনের দর্শন, গতির দর্শন, জগৎ দর্শন। রবীন্দ্রনাথে শান্তি নাই অর্থাৎ চরমকে পাইয়া যাওয়ার চিরস্থির মুক্তি নাই। মানুষের কবি রবীন্দ্রনাথ মানব-জীবনের বাস্তবসত্যটিই কাব্যে রূপ দিয়াছেন—দর্শনে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বাস্তব এই জীবনে তিনি দেখিয়াছেন নিত্য সন্ধান, নিত্য ত্যাগ, নিত্য ভোগ, নিত্য গতি।

অধরার প্রতিবিম্ব গতিভঙ্গে যায় এঁকে এঁকে,
গতিভঙ্গে যায় ঢেকে ঢেকে ॥ [জন্মদিনে-৯]

যে জগৎ চলে, রবীন্দ্রনাথ সেই জগৎকে জানেন, তাহারি কথা বলেন। জগতের পক্ষে থামাটাই অস্বাভাবিক, থামার কথা জগতের কথা নহে। মোহাসক্তিতে আছে থামা—জগৎ-ধর্মের ইহা বিপরীত। নির্বেদ মুক্তি-কল্পনায় আছে থামা—জগৎধর্মের ইহাও বিপরীত। রবীন্দ্রনাথ সত্যকার জগৎধর্মী, তিনি চলিতে চাহেন। স্বাভাবিক এই সহজ চলার গুণেই তিনি সত্যকার 'রিয়ালিস্ট্'।

বেদান্তবিচারে মন পর্যন্ত জগৎ—মনের অতীত জগৎ নাই। এইস্থলে একটি কথা বলিয়া রাখি—মানুষের এই মন জগৎ ছাড়া একপ্রকার জগদতীতকেও কল্পনা করিতে পারে, যেমন পারে রূপ হইতে অরূপের কল্পনা করিতে। এই জগদতীতও জগৎ, যেমন অরূপও একপ্রকার রূপ। মন যাহা বা যতদূর ধারণা করিতে পারে তাহা বা ততদূর অবশ্যই মনের অতীত ব্যাপার নহে। রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম মানেন এবং জানেন ব্রহ্মই সর্ব, ব্রহ্মই বিশ্ব, ব্রহ্মই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে—রবীন্দ্র-ব্রহ্ম মনের অতীত বস্তু নহেন। মন দ্বারা তিনি ব্রহ্ম আস্বাদন করেন বলিয়া নানা যুক্তি দ্বারা বুঝাইবার প্রচেষ্টায় একাধিক প্রবন্ধে তিনি প্রশ্নও করিয়াছেন, যে, ব্রহ্মকে অবাঙ্‌মনসগোচর বলিয়া ব্রহ্মবিদ্‌রা যে ধারণা করিয়া থাকেন সেই ধারণা কি মনের নহে? 'মানুষের ধর্ম' নামক গ্রন্থে এইরূপ বহু প্রশ্ন আপনি লক্ষ্য করিবেন। যোগদর্শনে যে চিত্তবৃত্তিনিরোধের কথা আছে রবীন্দ্রনাথ তাহা অবশ্যই জানেন। কিন্তু তাঁহার যুক্তি এই—চিত্তবৃত্তিনিরোধের ইচ্ছাটাও তো একটা মানসিক ব্যাপার—ইহা তো সেই মানসলোকের শ্রেয়োবাসনা, শুদ্ধাবাসনা। শুদ্ধাবাসনার সর্বোচ্চস্তরে উন্নীত হইতে হইলে যে সমস্ত মলিনা বাসনার দুর্বার প্রলোভন রোধ করিতে হয়, সেই সমস্ত প্রলোভন রোধের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের সমর্থন অতি অবশ্যই আছে, কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, চিত্তের সর্বকর্তৃত্বই তাহাতে লোপ পাইয়া গেল। রবীন্দ্রনাথের যুক্তি এই যে, চিত্তবৃত্তি রোধ করা হয় উচ্চতম আর এক চিদবস্থায় উন্নীত হইবার উদ্দেশ্যেই—তাহা না হইলে চিত্তবৃত্তিনিরোধের সংকল্প অর্থহীন হয়। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, বিরোধবিহীন নির্বিকল্প অবস্থা যাহাকে বলা হয়, তাও চিৎ ছাড়া নহে, পরন্তু চিৎ-প্রকৃতির উচ্চতম একটা শান্তাবস্থা মাত্র। এই শান্তাবস্থার ঊর্ধ্বেও অর্থাৎ 'নৈষ্ঠিকী শান্তির' পারেও যদি কোনো অবস্থা মানুষের অধিকারে আসে, তবে তাহাও চিৎ ভিন্ন হইবে না বলিয়া রবীন্দ্রনাথের ধারণা। বেদান্তবিচারে রবীন্দ্রনাথের এই তত্ত্ব যে একান্তভাবেই মনোধর্মী—পণ্ডিত পাঠক তাহা অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছেন। রবীন্দ্রনাথ যা বলেন, যা করেন, যা ভাবেন—সমস্তই মন ও চিত্তের প্রভাবে রঞ্জিত। এইজন্য তাঁহার ব্রহ্মদর্শন, মানবদর্শন এবং সর্বোপরি কাব্যদর্শন ঐ মনোদর্শনের ঐশ্বর্যই বিস্তার করে। ইহার পরের কথা যদি জানিতে চাহেন তবে মন ছাড়িয়া, চিত্তবৃত্তি-নিরোধ করিয়া যোগবিজ্ঞানে আপনাকে উত্তীর্ণ হইতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ মনোগত বিজ্ঞানের আলো দেখিয়াছেন—সেই আলোর সহস্র শিখার বিচিত্র রঙে রঞ্জিত করিয়াছেন ধ্যানের ভুবন। উচ্চধামগত মনের স্পর্শে ভুবন গ্রহণ করে নবতর রুচিপ্রবৃত্তির নূতন রূপ। দেখিয়া ভালো লাগে, মন ভুলিয়া যায়, মলিনা বাসনার ধূলিগুলি মন হইতে ঝরিয়া পড়ে। ইহলৌকিক সংসারী মন তখন নূতন জীবনধ্যান ধারণা করিতে থাকে। বলা বাহুল্য, এই ধারণা কিন্তু প্রবৃত্তি-বিরোধী নহে।

তবু যদি কেহ মনে করেন—রবীন্দ্রনাথ মনের অতীতে, অবাঙ্‌মনসগোচর তত্ত্বে, উপনীত হইয়াছেন, তবে তাঁহাকে 'মিস্‌টিক' বলুন, 'এস্‌কেপিস্ট্‌' বলুন—আপত্তি করিব না। কিন্তু আমি জানি, বড় আবেগভরে ভালোবাসেন তিনি এই বিশ্বভুবন, এই ভুবনপ্রকৃতি, এই মানব, এই মানবসমাজ। ভালোবাসেন বলিয়াই গানে, গন্ধে, ভাবে, মহত্ত্বধ্যানে তিনি ইহাদের উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতরই করিতে চাহেন। জগদতীতের যে ছবি রবীন্দ্রনাথে দেখেন তাহাও রূপময় সুন্দর জগৎ,—সুরে, ছন্দে, গানে গন্ধে তাহা পূর্ণ। মন দিয়া তাহার আস্বাদন অসম্ভব নহে। রবীন্দ্রনাথের অতীন্দ্রিয়তা বৃহত্তর ইন্দ্রিয়বোধেরই বিচিত্র আনন্দ। বস্তুতঃ জগদতীত বলুন, অতীন্দ্রিয়তা বলুন—মনের রূপ রস রঙ হইতে তাহা কখনও বিচ্ছিন্ন নহে। নির্বেদ নির্বিকারতত্ত্ব রবীন্দ্রদর্শনের কোথাও আপনি পাইবেন না।

আশ্চর্য রবীন্দ্রনাথের মন—ইহার দর্শন যেন সাগর দর্শন। সাগর দেখিয়াছি বলিয়া মনে করি—কিন্তু কে দেখিয়াছে সাগরের পূর্ণ রূপ? কে দেখিয়াছে এপারে দাঁড়াইয়া ওপারের অনন্ত কিনারা? সাগরের সঙ্কীর্ণ বেলাভূমে শান্তপদে বিচরণ করিয়াই আমরা ক্ষান্ত—কে পাড়ি দিয়াছে উন্মত্ত উত্তাল সাগর—স্পর্শ করিয়াছে অন্তহীন সুদূরের তটরেখা,—আস্বাদন করিয়াছে সুদূরের সৌন্দর্যসুধা?

যে মনকে আমরা সচরাচর তুচ্ছ বিষয়েই নিমগ্ন রহিতে দেখি, সেই মনই যে কত উচ্চে উঠিতে পারে, কত ধ্যানধারণা করিতে পারে, মনের বেড়া অতিক্রম না করিয়াই কত উজ্জ্বল আলোক-আনন্দ বহন করিতে পারে, সংক্ষেপতঃ মানুষের বাস্তব মনকে কত মর্যাদা, কত গৌরব দান করা যাইতে পারে—রবীন্দ্রনাথের আগে কয়জন আমরা জানিতাম? এই উজ্জ্বলতম বৃহৎ মনের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রকাব্য আর একবার নূতন করিয়া পাঠ করা দরকার।

·

নানা সময়ের প্রভাবে, নানা আবেগের বশবর্তী হইয়া, নানা রঙের নানা কথা রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু বৃহৎ মনের দৃষ্টিতে, রবীন্দ্রভাষায়—অখণ্ড প্রেমের আলোকে, আর একবার তাঁহার সেই খণ্ড খণ্ড বিচিত্র রচনাবলী একে একে যখন তারিখ মিলাইয়া পড়িয়া যাইব, নিশ্চয়ই দেখিব—কোনো এক অজ্ঞাত কারণেই একটির পর আর একটি রচনার যেন বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কবি যে একদা বলিয়াছেন—

'কোন্‌ গীতিকাব্যরচয়িতার কোন্‌ কবিতা ভাল, কোন্‌টা মাঝারি, তাহাই খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখানো সমালোচকের কাজ নহে। তাঁহার সমস্ত কাব্যের ভিতর দিয়া বিশ্ব কোন্‌ বাণীরূপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে তাহাই বুঝিবার যোগ্য। কবিকে উপলক্ষ করিয়া

বীণাপাণি বাণী, বিশ্বজগতের প্রকাশশক্তি আপনাকে কোন্ আকারে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাই দেখিবার বিষয়।'

—এ কথা বিশেষভাবেই প্রণিধানযোগ্য। অধ্যাপক শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী যথার্থই বলিয়াছেন: 'তাঁহার রচনাবলী শ্রেণী অনুযায়ী পর পর সাজাইয়া পড়িয়া গেলে একটি অখণ্ড ক্রমবিকাশের মহিমা আমাদিগকে স্তম্ভিত করিয়া দেয়। ...সহোদর ভায়ের মত একটি অপরটির হাত ধরিয়া ঠিক পথেই লইয়া গিয়াছে।' [জয়ন্তী উৎসর্গ]

শ্রীযুক্ত ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও রবীন্দ্র-কাব্যসাহিত্যকে এইভাবেই বিচার করিয়াছেন। 'Tagore—a Study' নামক ইংরেজী গ্রন্থের একস্থলে তিনি লিখিয়াছেন:

> "Tagore's works are an organic whole, they have an integrity which transcends the particular integrity of this piece and that."

বস্তুতঃ সমগ্রতার আলোকে রবীন্দ্ররচনাবলী পাঠ করিলে কবির খণ্ড খণ্ড বিচিত্র রচনাবলীর মধ্যে সেই এক ও অদ্বিতীয় জীবনদর্শনেরই তত্ত্বরস অনুভূত ও আস্বাদিত হইবে। দর্শনের বিচারে কবির একখানি কাব্য যেন অপর কাব্যের পরিপূরক; সমস্ত কাব্য মিলাইয়া একখানি বৃহৎ জীবনকাব্যই কবি যেন রচনা করিয়াছেন। সেই জীবনকাব্যের তত্ত্ব এক, প্রতিপাদ্য এক—সেই প্রেম, প্রেমবৈরাগ্য, সর্বজগদ্‌গত প্রেম। ইহাই রবীন্দ্রমনোদর্শনের আত্মা। ইহা না জানিলে, রবীন্দ্রকাব্যপাঠ বৃথাই হইবে।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একাধিক সমালোচক বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিয়াছেন। কেহ বা তাঁহার 'বিভিন্ন প্রকৃতির অসংখ্য সুরের আমদানি' দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন, কেহ বা তাঁহার 'ক্যাবুলাস্ ভ্যারাইটি' দেখিয়া বিস্ময়স্তব্ধ হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথে বৈচিত্র্য নাই এমন কথা আমি অবশ্য বলি না; কিন্তু বৈচিত্র্যের অন্তরে যে একক প্রাণতত্ত্ব নিহিত আছে এবং তাহাই যে রবীন্দ্র-কাব্যসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য তাহা ভুলিলে কবির জীবনদর্শনের তাৎপর্য গ্রহণ সম্ভব হয় বলিয়া আমি মনে করি না। কবির জীবনদর্শন না বুঝিয়া যাঁহারা খণ্ড খণ্ড ভাবে কবির কাব্য বিচার করিয়াছেন, তাঁহারা কাব্যের প্রতি তথা কবির প্রতি নিজেদের অজ্ঞাতসারেই কত যে অবিচার করিয়াছেন তাহা আমি তাঁহাদের কাহারো কাহারো কাব্যব্যাখ্যার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ইতঃপূর্বে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

বৈচিত্র্যের মধ্যে আছে জীবনগত খণ্ড-আনন্দের প্রেরণা। মানুষ স্বভাবতঃ খণ্ডাশ্রয়ী; বিচিত্র-নূতন খণ্ডাধারে প্রকাশ পায় বলিয়া স্থূলভাবে তাহা গ্রহণ করা সম্ভব হয়, এবং সেই কারণেই মানুষ তাহাকে চেনে, তাহাকে দেখে। নূতন হইতেছে প্রকৃতির খণ্ড রূপ কিন্তু কে না জানে, আজ যাহা নূতন, কাল তাহা পুরাতন? জীবন নূতনকে চায়, বৈচিত্র্যকে

চায়, খণ্ডকে নাগালের মধ্যে পায় বলিয়া খণ্ডাসক্তি প্রকাশ করে,—কিন্তু কে না অনুভব করিয়াছে যে, প্রকৃতির 'নিরন্ত প্রলয়' বহুবিধ নূতনের বিচিত্র খণ্ডরূপকে অহরহঃ প্রত্যাহার করিয়া লয়? নূতনের লয় আছে, বৈচিত্র্যের ক্ষয় আছে, কিন্তু সমগ্র বৈচিত্র্যকে লইয়া অখণ্ড যে নিত্যনবীন, সেই অখণ্ডের পরিবেশে বৈচিত্র্যের মৃত্যু নাই; কেননা তখন তা' স্থিতি ও গতির ধ্যানময় এক সঙ্গতি ও সম্মেলনের ক্ষেত্রে জাজ্বল্যমান রহিয়া কখনও স্মৃতিরূপে, কখনও প্রীতিরূপে, কখনও মোহরূপে, কখনও প্রেমরূপে 'তিলে তিলে নৌতন হোয়'।

বক্তব্যটি হয়তো স্পষ্ট হইল না। স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছি। বিশ্বপ্রকৃতির ঋতুলীলার সৌন্দর্যমহিমা একবার স্মরণ করুন। ষড়ঋতুর অখণ্ড পরিবেশে প্রত্যেক ঋতুই সুন্দর সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি শুধু গ্রীষ্ম চাই, অথবা গ্রীষ্মের পর বর্ষা আসিল দেখিয়া তাহার মেঘমেদুর অম্বরের রূপবৈচিত্র্যে মুগ্ধ হইয়া বলিতে থাকি, বর্ষাই সুন্দর, আর কোনো ঋতু নহে,—তবে দুইদিন গত হইলেই দেখা যাইবে সুন্দরী বর্ষাও চিত্তে বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছে। আপনি বলিবেন—এইজন্যই তো আপনি বৈচিত্র্য চাহেন। তা' হইলে এ কথাও আপনি সঙ্গে সঙ্গে বলুন, যে, বর্ষাকে আপনি উপেক্ষা দেন না বটে, কিন্তু তাহাকে চিরকাল আঁকড়াইয়া থাকিতেও চাহেন না। আসল কথা, বর্ষাবিশেষ আপনার নিকট বড় নহে, বড় হইতেছে অখণ্ড অশেষ রসজীবন। খণ্ড খণ্ড বহু নূতন বারে বারে এই রস-জীবনকে উদ্বেজিত করিতে পারে বলিয়াই ইহাদের মূল্য-মর্যাদা। আসলে অখণ্ডই সত্য; তা' না হইলে বিশেষ খণ্ডেই মানুষ চিরকাল আনন্দ পাইত। অখণ্ড বিশ্বপ্রকৃতির ছায়া-ছত্রতলে ষড়ঋতুর বিচিত্রলীলা যিনি দেখিয়াছেন বিশেষ কোনো ঋতুরূপে আসক্ত হইয়া ক্ষান্ত রহিতে তিনি পারেন না। তিনি জানেন, এক ঋতু একদিকে যেমন অন্য ঋতুর পথ কাড়িয়া লয়, অপর দিকে তেমনি অপর এক ঋতুর জন্য পথ কাটিয়া যায়। বুঝাইবার জন্য 'কাড়িয়া লওয়া' বা 'কাটিয়া যাওয়া'র কথা বলা হইল; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু অখণ্ড ঋতুমূর্তিরই এই বিচিত্ররূপ। এইজন্য একরূপে পাওয়া যায় অন্যের আভাস, অতীতের অন্তরে অনুভূত হয় অনাগতের ব্যঞ্জনা, বর্তমানের হৃদয়ে বাজিয়া উঠে অতীতের স্মৃতি ও ভবিষ্যতের আকর্ষণ। খণ্ডদৃষ্টিতে এক এক ঋতুর আবির্ভাব আছে, তিরোভাব আছে। কিন্তু অখণ্ড ঋতুমূর্তির পরিবেশে বিচিত্র এই ষড়ঋতুর লীলামাহাত্ম্য মৃত্যুহীন জীবনানন্দই প্রকটিত করে। ইহার জন্য প্রস্তুত মনই যথার্থ জীবনরসিক ও শিল্পবোদ্ধা। কিন্তু একটি লইয়া যাহারা ক্ষান্ত, তাহারা মোহগ্রস্ত, তাহারা আসক্ত। তাহারা রূপ হয়তো দর্শন করে, কিন্তু রূপে অরূপ দর্শন তাহাদের নিকট অবাস্তব বলিয়াই পরিগণিত হয়। রূপ বলিতে তাহারা যাহা বুঝে, তাহা খণ্ড-রূপ, অংশ-রূপ, তাহা বিশ্বরূপ, অর্থাৎ সত্যকার রূপই নহে। ঠিক এই কারণেই বলিতে পারি যে, জগৎজীবনে শুধু মোহ নয়, সংশয়, শুধু সংশয় নয়, প্রেম ও

বৈরাগ্য, শুধু প্রেম ও বৈরাগ্যের তত্ত্বগত ধ্যান নয়, পরন্তু সমগ্রকে লইয়া অখণ্ড যে মনোজীবন তাহারি দর্শনালোকে খণ্ডকে দেখিতে শিখিলে খণ্ডে অখণ্ড, মূর্তিতে অমূর্ত, রূপে অরূপতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইবে।

বলিতেছি, এক অখণ্ড প্রেমের কথাই নানা কাব্যে ও গানে কবিগুরু বর্ণন করিয়াছেন। অখণ্ডকে খণ্ডকাব্যে ধরা অসম্ভব—তাই বহুবিধ বিচিত্র খণ্ডের আভাসে তিনি অখণ্ডকে ধ্যানগত ও জীবনগত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মনের দ্বারা অখণ্ডকে 'ধরি ধরি' করিয়াছেন, সর্বত্র তাহাকে 'দেখি দেখি' করিয়াছেন, কিন্তু তাহাকে যে চরমভাবে পাওয়া হইয়াছে এ কথা কোনোদিন কোনোক্ষেত্রেই বলেন নাই। মন যত বড়ই হউক না কেন, ব্রহ্ম তো তাহাপেক্ষা বড়। মন ব্রহ্মের ইশারামাত্র পাইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মতে ব্রহ্ম হইয়া চরমলাভের আনন্দ পাইতে পারে না। মন যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ প্রকৃতি আছে, ইচ্ছা আছে, বাসনা আছে, গতি আছে। চতুর্থোপাসক ব্রহ্মযোগীরা বলেন যে, মন ত্যাগ না করিলে এসবের 'বালাই' ঘোচে না। রবীন্দ্রনাথ, বলাই বাহুল্য, এই স্তরের যোগী নহেন। তাহা যদি তিনি হইতেন, তা' হইলে কবি হওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভবই হইত না। তাঁহাকে যদি যোগী বলিতে হয়, বলা ভালো, তিনি মানসোপাসক ব্রহ্মযোগী। অর্থাৎ মনোগত ব্রহ্মের তিনি উপাসক ; এইজন্য তাঁহার ব্রহ্ম-কল্পনায় রূপ আছে, ব্যক্তিত্ব আছে, তাঁহার ব্রহ্ম কর্মে, ধর্মে, প্রেমে প্রকাশিত হন—তিনিই চিরমানব, পরমমানব। সমাজে, রাষ্ট্রে, ব্যক্তিত্বে ও চরিত্রে ইঁহারই প্রকাশ দেখা যায় যুগে যুগে। চক্ষু ইঁহাকে দেখিতে না পাইলেও মন ইঁহাকে দেখিতে পায়। মাতার স্নেহের স্বর্গীয়তায়, বীরের শৌর্য-সৌন্দর্যে, ত্যাগীর সর্বত্যাগের আনন্দে, প্রিয়ার প্রেমের কল্যাণ-প্রসন্নতায় মন ইঁহাকে অনুভব করে। ইঁহাকেই কর্মে, ধর্মে ও চরিত্রের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য মানুষের সাধনার নাই পরিসীমা।

দীর্ঘ জীবনের বিচিত্র কামনা ও সাধনার দ্বারা এই প্রেমব্রহ্ম বা 'পরমমানব'কে উপলব্ধি করিয়াছেন কবিগুরু। একদিনে ইহা সম্ভব হয় নাই, তাহা যদি হইত—এক কথাতেই তাঁহার বক্তব্য বুঝাইয়া দিয়া তিনি নিশ্চুপ রহিতেন। জীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতার মহিমায় তিনি এই 'মানবব্রহ্মকে' আস্বাদন করিয়াছেন। বিচিত্র কথা তাঁহাকে তো বলিতেই হইবে। কিন্তু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, বিচিত্রের অন্তরে সেই এক-কে অনুসন্ধান করাই তাঁহার অভিপ্রায়। বিচিত্র কাব্য তিনি রচনা করিয়াছেন সত্য—কিন্তু বিচিত্র কুসুমে গ্রথিত জীবনের অখণ্ড মাল্যখানির সৌন্দর্য দেখিতে শিখিলে দার্শনিক কবিমর্মের ঐক্যতত্ত্বটি, অর্থাৎ মানবজীবনে নিহিত ঐ প্রেমব্রহ্মের স্বরূপটি আবিষ্কৃত হইয়া পড়িবে।

ইহার আবিষ্কারে সাধারণ পাঠকও মানবমনের দিগন্তব্যাপী বিস্তৃতির আনন্দমহিমা উপলব্ধি করিবেন। ধূলিলিপ্ত এই খণ্ডক্ষুদ্রদোষত্রুটিবহুল মানবজীবনের জীর্ণ আসনটির উপর বসিয়াই উদারতম উজ্জ্বল মহাজীবনের সমগ্রতার মহিমা ও আনন্দ তিনি আস্বাদন করিবেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও দর্শনপাঠের এবং সর্বোপরি তাঁহার কাব্যদর্শনপ্রসাদাৎ মনোলোকের স্তর ও স্বরূপচিন্তনের ইহাই তো ফলশ্রুতি।

রবীন্দ্রনাথ পরস্পরবিরোধী বহুকথা বলিয়াছেন বলিয়া নানা লোককে নানা ভাবে অভিযোগ করিতে শুনিয়াছি। তিনি প্রেমের কথা বলিয়াছেন আবার বৈরাগ্যের জয়-গান গাহিয়াছেন; তিনি প্রকৃতিকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া মায়াবাদীদের বহুভাবে পরিহাস করিয়াছেন, আবার নিজেই বহুক্ষেত্রে প্রকৃতির মধ্যে 'ছলনা' ও 'মায়া' লক্ষ্য করিয়াছেন; ব্রহ্মের সরিক তিনি মানেন না বলিয়া একাধিক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, আবার দ্বৈতবাদের সমর্থনে নানা কথা তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি; স্থিতির কথা তাঁহার প্রাণের কথা বটে, কিন্তু গানের কথায় প্রকাশ তো পাইয়াছে গতি আর গতি। অসংলগ্নভাবে তাঁহার রচনাবলীর এদিক সেদিক, এটা সেটা পাঠ করিলে এই সমস্ত আপাতঃদৃষ্ট বিরোধী কথা প্রবল আকার ধারণ করিয়া পাঠকচিত্তে বিভীষিকার সৃষ্টি করিতে পারে—কিন্তু রবীন্দ্ররচনাবলী যিনি ধৈর্য সহকারে সুরু হইতে শেষ পর্যন্ত পাঠ করিবেন, প্রেমানুগত এক মহাজীবনকেই তিনি জানিবেন, জানিবেন কবিগুরু এক ছাড়া দুই জানেনই না। দার্শনিকের প্রেরণাদায়িনী অন্তরবাসিনী সেই মহতী প্রেমশক্তিই বহু হইয়া, বহুধাবিভক্ত বিচিত্র রূপ হইয়া, মানবজীবনের বিবিধ আবেগানুভূতির সহস্র প্রকার ভেদ হইয়া, তাঁহাকে জাগাইয়াছে, মাতাইয়াছে, রাঙাইয়াছে, চালাইয়াছে। একের দার্শনিক হইয়াও তাই তিনি বৈচিত্র্যের কবি। লক্ষণীয় বিষয় এই, কবি ও দার্শনিক পরস্পর পরস্পরের মধ্যে আশ্চর্য সঙ্গতি ও সমতা রক্ষা করিয়াছে তাঁহার প্রতিভায়। দার্শনিক কবিকে কখনও ছাড়ে নাই, কবি ভুলে নাই দার্শনিককে। বুঝাইবার জন্য এইভাবে কথাগুলি লিখিতেছি। আসলে, কবিগুরুর মধ্যে বাহ্যতঃ এই দুই ব্যক্তিত্ব এক ও অদ্বিতীয় প্রেমতত্ত্বেরই প্রকাশ। বেশ বিচার করিয়া দেখুন, দার্শনিক হিসাবে উত্তুঙ্গমনের শেষ রূপ পার হইলেই কবিত্বের বদলে যোগিত্বের সম্ভাবনা জাগিতে পারিত, কিন্তু, শেষধাপ অতিক্রম করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। বেদান্তের ভাষা অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে, বিজ্ঞানানুমুখী বিশাল তাঁহার মন 'চতুর্থের' যোগিত্বধর্ম অপেক্ষা 'তৃতীয়ের' কবিত্বকর্মেই অভিসার করিয়াছে। ফলে মনের রাজ্যেই তিনি বিহার করিয়াছেন, মনের কলুষকামনা-গুলি ছুঁইয়া ছুঁইয়া, ঝাড়িয়া মুছিয়া—মনের বিচিত্র আবেগানুভূতির তাৎপর্য উপলব্ধি করিয়া—বিচিত্রের ঐক্যধর্ম অনুভব করিয়া জগৎজীবনের পথনির্দেশের কাজে লাগিয়াছেন। অপর

পক্ষে কবি হিসাবে তিনি তথাকথিত অধিকতর বাস্তব জগতে অবতরণ করিয়া বস্তুজীবনাসক্ত আধুনিক কবিটিও তো হইতে পারিতেন। কিন্তু ধূলিতে নামিয়াও তাঁহার উচ্চসত্তার প্রভাব কাটে নাই। আসলে তাঁহার কবিতে আছেন দার্শনিক, দার্শনিকে আছেন কবি। বৈচিত্র্যে আছে এক অদ্বিতীয়, একে আছে বহুর বিচিত্রতা। এই বিচিত্রতায় আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। কিন্তু বাহ্যতঃ পরস্পর বিরোধী অজস্র বিচিত্র কথার ও ভাবের সাহায্যে কী অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্যে তিনি একের কথা, সেই প্রেমের কথা, প্রেমের ক্ষেত্র ওই প্রকৃতি ও মানবের কথা,—সকলকে লইয়া সেই বিশ্বজীবন ও বিশ্বপ্রকৃতির কথা কহিয়াছেন, ভাবিলে চমকিত হইতে হয়। তিনি সাংসারিক জীবনের ছবি আঁকিয়াছেন, কিন্তু তাহার মধ্যেও মহাসুন্দর সেই প্রেমভাবের বৈশিষ্ট্যটির স্পর্শপাত ঠিক আছে। তিনি চলমান বৈরাগ্যের কথা বলিয়াছেন, প্রকৃতির মায়া বা ছলনার কথা তুলিয়াছেন—কিন্তু তাহার মধ্যে জগৎকে সুন্দরতর করিবার প্রেমবোধটি ঠিক অক্ষুণ্ণ আছে। ধূলির উপর বসিয়া তিনি স্বর্গ রচনার জন্য প্রেম গাহিয়াছেন অর্থাৎ প্রেমাশ্রিত মনের আলোকে ধরার ধূলির অনন্ত ঐশ্বর্যের মহিমা দর্শন করিয়াছেন; আবার স্বর্গের উদয়াচলে কল্পনাভরে উদিত হইয়াও মর্তের ছায়াশীতল গৃহকোণ স্মরণ করিয়াছেন। মর্ত্যের মোহময় প্রেম স্বর্গের বৈরাগ্যস্বপ্নে শুদ্ধ হউক, 'প্রেম' হউক, স্বর্গের নিষ্প্রাণ বৈরাগ্য মর্তের প্রেমানন্দে স্নিগ্ধ হউক, 'প্রেম' হউক—ইহাই তাঁহার কল্পাদর্শ, জীবনাদর্শ, অর্থাৎ প্রেমাদর্শ। লক্ষ্য করিয়া দেখুন, এই আদর্শ 'কবিকাহিনী' হইতে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত সমস্ত কাব্যগ্রন্থের খণ্ডরচনাগুলিতে ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে কি না—এবং সর্বোপরি এই আদর্শ তাঁহার দার্শনিকজীবনের ধ্যান ও মনীষার মধ্যে ঐক্যতত্ত্বরূপে স্বীকৃত ও গৃহীত হইয়াছে কি না।

'সূচনায়' বলিয়াছি—কাব্যে রসই আসল বটে, কিন্তু যে তত্ত্বের উপর রস প্রতিষ্ঠা লাভ করে, সেই তত্ত্বের কথা রসোপলব্ধির প্রয়োজনেই প্রাসঙ্গিক। বোধবিস্তৃতিব বিজ্ঞান হইতেছে তত্ত্ব। রবীন্দ্রতত্ত্ব না জানিয়া অর্থাৎ সাধারণে যে বোধে স্বাভাবিকভাবে থাকে সেই বোধটুকুর সীমার মধ্যে থাকিয়াই যিনি রবীন্দ্রকাব্য আস্বাদন করিতে চাহিবেন, তিনি সর্বক্ষেত্রে সফল হইবেন এমন আশা করিতে পারি না; আপন স্বভাবগুণে যিনি উচ্চমনোধর্মী ও সুরসিক, তাঁহার পক্ষে নূতন করিয়া মনোদর্শনের তত্ত্ববাণী না জানিলেও চলে, কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, কাব্যপাঠে তত্ত্বের কোনো প্রয়োজন নাই। রবীন্দ্রনাথ কাব্য রচনায় যে জীবনতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা দিয়াছেন সেই জীবন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না হওয়া পর্যন্ত আমরা তাঁহাকে পদে পদে ভুল বুঝিব, ফলে তাঁহার কাব্যদর্শনে যে জীবনোন্মেষের বাণী আছে, তাহার কল্যাণ হইতে আমরা বঞ্চিতই রহিব।

শেষবয়সের রচনাবলীতে রবীন্দ্রনাথ তত্ত্ববস্তুকেই বিশেষ করিয়া প্রাধান্য দিয়াছেন। একটি মাত্র প্রবন্ধে সেই সমস্ত রচনার আলোচনা করিলে বহুপূর্বেই আমার বক্তব্য প্রমাণিত হইয়া যাইত। কিন্তু সংশয়ীর জন্য বিশেষ তথ্য ও প্রমাণ প্রয়োজন। সংশয়ীর দল তাঁহার মধ্য বয়সের রচনাবলীতে কাব্য দেখেন, তত্ত্ব না; শেষ বয়সের রচনায় তাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথকে দেখেন, কবি না। কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে কী জাতীয় তত্ত্ব আছে, তাহা বিশ্লেষণ করিবার পর তাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথের মন্দিরে যদি তাঁহারা একবার প্রবেশ করেন, বিস্মিত হইয়া দেখিবেন—কবি রবীন্দ্রনাথ এতদিন ধরিয়া যে বাণী ব্যঞ্জনাময় ইঙ্গিতে প্রকাশ করিতেছিলেন, তাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ শেষবয়সের রচনাবলীতে তাহাই অনাড়ম্বর স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার তত্ত্ব, আমি একাধিকবার বলিয়াছি যে, গতানুগতিক দর্শনের কোনো নীরস পুনরাবৃত্তি নহে। তাঁহার তত্ত্ব তাঁহার জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা হইতেই সমুৎসারিত। জীবন হইতেই তিনি জানিয়াছেন যে, অহং-এর বিকৃতি ও জগতের অতিকৃতি মায়া বা ছলনা বটে, কিন্তু অহং বা জগৎ মিথ্যা নহে, মায়া নহে। অহং হইতেই আত্মপ্রেমের উদ্ভব। এই আত্মপ্রেমের আনন্দই প্রেমদর্শনের প্রাথমিক অভিজ্ঞতা। এই আত্মপ্রেম প্রকাশ চাহে, বিশ্বে বিস্তার চাহে, মিলন চাহে, 'যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে' বলিয়া গাহিতে চাহে। ইহার বৈপরীত্যই মায়া, 'জীবনের মিথ্যা এ কুহক'। এই কুহক অতিক্রম করিতে হয়, না করিলে মৃত্যুরূপে, শোকরূপে, দুঃখরূপে প্রকৃতি তাহা করায়। প্রথমতঃ প্রকৃতিকে ইহার জন্য নিষ্ঠুরা বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু পরে বোধ বিস্তৃত হইলে বুঝা যায় প্রকৃতি মঙ্গলময়ী—দুঃখ-শোক-বিচ্ছেদ ও মৃত্যুর মধ্য দিয়া উত্তরণের বাণীই সে আনিয়া দিয়াছে জীবনে। তখন হৃদয় প্রসন্ন হয়, আত্মপ্রেম অভিসার করে বিশ্বপ্রেমের বন্ধুর পথে। এই যে বিশ্বাভিমুখী প্রেম, ইহার দৃষ্টিতে জগৎ সুন্দর। যথার্থ যা সুন্দর, খণ্ডরূপে তা তো আবদ্ধ নহে, পরন্তু অরূপ জ্যোতির ব্যঞ্জনা তাহাতে থাকিবেই থাকিবে। প্রেমিক প্রেমের আলোকে জগৎপ্রকৃতিকে দেখেন, তাই রূপে তাহার বিকশিত হয় অন্যতর বৃহৎ রূপ। ইহাতে প্রেমিকের বোধ ও হৃদয় উত্তরোত্তর যেমন বিস্তৃত হয়, যাহাকে দেখেন, তাহার মহিমাও তেমনি বর্ধিত হইতে থাকে। প্রেম এইরূপে জগৎজীবনের মহিমা ও সৌন্দর্য বাড়াইয়া চলে। মানুষ চলে পরমমানবের পথে। অতিবড় তুচ্ছও চলে উচ্চের আকর্ষণে। সহজস্বভাব চলে সাধনস্বভাবের আনন্দে। এ-চলা কখনও থামে না, জীবনের মহিমাও তাই অনন্ত বলিয়া মনে হয়। যোগীর 'বিজ্ঞান'দর্শনে শেষকথার উত্তর মিলিতে পারে কিন্তু কবির মনোদর্শনে 'শেষকথা' কে বলিবে? "কে তুমি?" এই প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞানোপাসক যোগী কহিবেন 'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্‌', কিন্তু প্রেমজীবনের অশেষযাত্রাপথে অভিযাত্রী কবি-দার্শনিক অবারিত গতিবেগে নিত্যকাল উধাও হইবেন। পশ্চিমসাগর তীরে নিস্তব্ধ

সন্ধ্যায় "কে তুমি" এই প্রশ্নবাণীটি উত্তরের প্রত্যাশায় দিগ্‌দিগন্ত ধ্বনিত প্রতিধ্বনি করিবে—চরম উত্তর কিন্তু আসিবে না।

বৎসর বৎসর চলে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিমসাগর তীরে
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি।
পেল না উত্তর। [শেষ লেখা-১৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

গল্প-সাহিত্য

"তাহার দৃষ্টি, তাহার হস্ত, তাহার মন সর্বদাই অচল হইয়া আছে ; এইজন্য সে এই নিত্য-সচলা প্রকৃতির মতো সর্বদাই নিশ্চিন্ত উদাসীন, অথচ সর্বদাই ক্রিয়াসক্ত। মানুষমাত্রেরই নিজের একটি স্বতন্ত্র অধিষ্ঠানভূমি আছে ; কিন্তু 'সে' এই অনন্ত নীলাম্বরবাহী বিশ্বপ্রবাহের একটি আনন্দোজ্জ্বল তরঙ্গ—ভূত ভবিষ্যতের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই-- সম্মুখাভিমুখে চলিয়া যাওয়াই তাহার একমাত্র কার্য।"

['অতিথি' ; গল্পগুচ্ছ, দ্বিতীয় খণ্ড]

দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বিতীয় অধ্যায়

গল্প-সাহিত্য

রবীন্দ্রনাথের কবিমানস সর্বজীবনগত, তাঁহার প্রেম সর্বজগদ্‌গত—এই তত্ত্বসত্যটুকু হৃদয়ে ধারণ করিলেই তাঁহার সৃষ্টিবৈচিত্র্যের অন্তর্নিহিত ঐক্যতত্ত্বটি স্পষ্ট ও সহজবোধ্য হইয়া যায়। মনের বন্ধন থাকিলে বিচিত্র সৃষ্টি যেমন সম্ভব নহে, প্রেমে বিশেষ কোন সংস্কার থাকিলে সর্বত্র অর্থাৎ সকল 'সামগ্রী'কেই 'সাহিত্য'রূপে দেখা তেমনি সম্ভব নহে। রবীন্দ্রনাথের মনে কোনো বন্ধন নাই,—নির্লিপ্তভাবে তিনি অহং-এ সঞ্চরণ করেন, নির্লিপ্তভাবে বিশ্বজীবনের আনন্দেও অভিযাত্রা করেন। তাঁহার গল্প ও উপন্যাস-সাহিত্য বিচার করিতে বসিয়া এই তত্ত্বটুকু স্মরণে রাখিলে তাঁহার খণ্ডরচনাবলীর অন্তর্নিহিত অখণ্ড তাৎপর্যটি অবশ্যই উপলব্ধ হইবে।

আলোচ্য অধ্যায়ে গল্প-সাহিত্যে প্রেমতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিবার প্রস্তাব আনিতেছি। প্রথম খণ্ডের অধ্যায়গুলিতে, বিশেষ করিয়া 'মানব' নামক অধ্যায়ে, প্রেমের যে নীতি ও আদর্শ অভিব্যক্ত হইয়াছে, গল্প ও উপন্যাসে তাহাই প্রকাশিত ও স্পষ্ট হইয়াছে কিনা আমরা দেখিব। গল্প ও উপন্যাসের মাধ্যমে অদ্বিতীয় এক প্রেমের যে বিচিত্র রূপ প্রকটিত হইয়াছে, তাহা অনুসরণ করিলে রবীন্দ্রনাথের মনোলোকের স্তর ও স্বরূপ সহজবোধ্য হইয়া যাইবে।

রবীন্দ্রনাথের গল্প ও উপন্যাসে, বলাই বাহুল্য, প্রেমই প্রতিপাদ্য—প্রেমই মুখ্য বিষয়। প্রেমের গতি কত দিকে, কত ভাবে, কত প্রকারে এবং কত আকারে—গল্পোপন্যাসে তাহাই বিচিত্র নৈপুণ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রেমের রূপচিত্রণে কবি বিবিধ পরিবেশ লইয়াছেন, বিচিত্র চিত্র-কল্পনায় মাতিয়াছেন, কিন্তু অধিকতর বাস্তববাদী চিত্তলোকে বৃহত্তর মানবিকতার মাহাত্ম্য অর্থাৎ প্রেমবোধের আনন্দ-বাণী সঞ্চারিত করিয়া দেওয়াই তাঁহার গল্প-সাহিত্যের মূল অভিপ্রায়। অনেকসময় রবীন্দ্র-গল্প-সাহিত্যকে অতিপ্রাকৃতের ধারক বলিয়া পাঠকের মনে যে না হইতে পারে, তাহা নহে। মনুষ্যত্বের উচ্চ আদর্শের যে কল্পচিত্র তাঁহার গল্পের কোনো কোনো চরিত্রে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা সাংসারিক বোধ

ও বুদ্ধির সহায়ে সকল ক্ষেত্রেই যে বুঝা সম্ভব, তাহা আমি বলি না। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথকেই অনুসরণ করিয়া বলি যে, "প্রকৃতিভেদে একের কাছে যাহা অতিপ্রাকৃত, অন্যের কাছে তাহা প্রাকৃত"। [প্রাচীন সাহিত্য, পৃ. ৬]। আমার ধারণা এই, বস্তু-প্রকৃতিই একমাত্র প্রাকৃত সত্য নহে, মনঃপ্রকৃতির অন্তর্লীন গোপন সত্যটিও প্রাকৃত সত্য-রূপে গৃহীত হইবার যোগ্য। রবীন্দ্র-গল্প-সাহিত্য বস্তুপ্রকৃতির হুবহু অনুকরণ নহে—মনঃ-প্রকৃতির অন্তর্গূঢ় গোপন সত্যটির নিপুণ বিশ্লেষণও বটে। শুধু রূপ নহে, রূপসমাজ নহে—অরূপসমাজের অনাগত রূপমহিমায় কবির মন নিত্য নিবিষ্ট রহে বলিয়াই মানুষচরিত্রে অনাগত মনুষ্যত্বের মহিমা দর্শনের দৃষ্টিপ্রতিভা তিনি লাভ করিয়াছেন।

তত্ত্বদর্শনের দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের গল্প-সাহিত্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—মানব, প্রকৃতি, প্রেম। শিল্পকলার দিক হইতে বিশ্লেষণ করিয়া ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলিকে চারিটি দিক হইতে দেখিয়াছেন [বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা]—প্রেম, সমাজ, প্রকৃতি ও অতিপ্রাকৃত। এই চারিটি দিক হইতে রবীন্দ্র-গল্পাবলী পর্যালোচনা করিলে শিল্পবিচারে যে সুফল ফলে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তত্ত্ববিচারে এই চারিটি দিক বাহ্যতঃ তিনটি এবং মূলতঃ একটি বস্তুরই বিচিত্র প্রকাশ। প্রেম, প্রকৃতি ও মানবের চিত্রই রবীন্দ্রগল্পে চিত্রিত হইয়াছে,—আবার এই তিন তত্ত্বের অন্তর ভেদ করিয়া ধ্রুব সেই এক প্রেমেরই বিচিত্র জ্যোতি হইয়াছে বিকীর্ণ। বস্তুতঃ প্রেম, প্রকৃতি ও মানব—এই তত্ত্বত্রয় বাহ্যতঃ পৃথক বলিয়া মনে হইলেও মর্মতঃ ইহারা সর্ব-জীবনগত এক অদ্বিতীয় প্রেম-মানসেরই 'প্রাণস্পন্দ'। দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ প্রেমজীবনকে দুই দিক দিয়া দেখিয়াছেন—অহংএর দিক দিয়া এবং আত্মার দিক দিয়া। গল্পোপন্যাসে এই দুই রূপের প্রকাশই আপনি দেখিবেন। একদিকে স্বার্থান্ধ, সংস্কারান্ধ ও অর্থলিপ্সু সমাজমানসের চিত্র দেখিবেন, অপরদিকে মানবিকতার মহিমাবোধের বৈরাগ্য-চিত্রও দেখিবেন। অহংমত্ত মানুষের চিত্রদর্শনে আপনার বিদ্রূপ জাগিবে, কৌতুক জাগিবে, আত্মদীপ্ত মানবের চিত্রদর্শনে বিস্ময় জাগিবে, বোধ করি লজ্জাও হইবে; কখনও কখনও অবাস্তব কিছু দেখিতেছেন বলিয়া ভ্রমও জাগিবে। মানব চরিত্র-চিত্রণের ন্যায় প্রেম-চিত্র-চিত্রণেও ওই একই তত্ত্ব লক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রেমচিত্রেও দেখি একদিকে যেমন অতৃপ্তোন্মত্ত কাম-কামনার জ্বালাময় অতিকৃতি, অপরদিকে তেমনি প্রশান্তোজ্জ্বল প্রেমবৈরাগ্যের আনন্দসুন্দর অভিব্যক্তি। প্রকৃতি সম্পর্কেও ওই কথা। প্রেম যেখানে প্রশান্ত, প্রকৃতি সেখানে প্রসন্ন। প্রেম যেমন, প্রকৃতি তেমন, মানুষও তেমন। অশান্ত প্রেমের অভ্যুদয়ে মানুষের চিত্ত যখন বিক্ষিপ্ত চঞ্চল, প্রকৃতিও তখন ঝঞ্ঝোন্মত্ত প্রলয়ংকরী। "অতিথি" ও "বলাই" গল্পে বর্ণিত প্রসন্ন প্রকৃতি এবং "একরাত্রি" ও "মহামায়া"য় বর্ণিত ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ মত্ত প্রকৃতির রূপরহস্য সম্বন্ধে সচেতন হইলেই প্রেমের সহিত

প্রকৃতির এবং প্রকৃতির সহিত মানবের অচ্ছেদ্য বন্ধনব্যাপারের গূঢ় তাৎপর্যটি উপলব্ধি করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে।

অহং-এর অস্তিত্বে রবীন্দ্রনাথের যদি বিশ্বাস না থাকিত, তবে কাব্য বা গল্পসাহিত্য-সৃষ্টিতে কখনও তাঁহার মন যাইত কিনা সন্দেহ! অহং-এর অতিকৃতিকে প্রশ্রয় দেওয়া তাঁহার ধর্ম নহে, কিন্তু গোঁড়া তাত্ত্বিকদের মত অহংকে উচ্ছিন্ন করাও তাঁহার তত্ত্ব নহে। তাহা যদি হইত, অথচ শিল্পরচনাও তিনি করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার মধ্যে ঐক্যতত্ত্ব আবিষ্কার করা শুধু দুঃসাধ্য নহে, অসাধ্যই হইত। কিন্তু কুত্রাপি তিনি আত্মপ্রতারণা করেন নাই; সহজ জীবনে যাহা সত্য, মনোজীবনে যাহা মঙ্গল ও সুন্দর, দর্শন ও শিল্প-সাহিত্যে তাহাই তিনি প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলেন: "বন্ধনকে স্বীকার ক'রে বন্ধনকে অতিক্রম করব—এই হচ্ছে প্রেমের কাজ।" [শান্তিনিকেতন-১] অহং-এর বন্ধনে তিনি অবতীর্ণ হইবেন—অহং-এর কামলিপ্সা, তাহার ঈর্ষা, জিগীষা, স্বার্থ, প্রতিহিংসা প্রভৃতি অতিকৃতির চিত্রগুলি অঙ্কনও করিবেন, তবে সর্বত্রই তিনি দেখাইবেন যে, এই অতিকৃতিই জীবন নহে: অতিকৃতি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যে-জীবন সহজ আনন্দের অভিমুখী, সেই জীবনবোধ ও জীবন-প্রকাশই মনুষ্যত্ব। কাব্য ও নাট্যের ন্যায় রবীন্দ্রনাথের গল্পে ও উপন্যাসে এই মনুষ্যত্ব প্রকাশের দ্বন্দ্ব অবশ্যই থাকিবে। নিম্নতল হইতে উচ্চতল পর্যন্ত সুপ্রসারিত মনোজীবনের নিপুণ বিশ্লেষণ মিলিবে রবীন্দ্রনাথের গল্পোপন্যাসে। মনের গহন গহ্বরে পুঞ্জীভূত আছে অহংময় যে অতৃপ্ত বাসনা—মানুষ সাধারণতঃ যে বাসনাগুলি মর্মলোকে প্রকাশ করিতে লজ্জা পায়, সেগুলিরও যেমন সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ মেলে কবিগুরুর গল্পোপন্যাসে, তেমনি মেলে সহজ অনুভবসিদ্ধ মহান মনোজীবনের সুচারু নৈপুণ্য। মানুষ ভুল করে বিস্তর, ভুল বোঝে বিস্তর, কিন্তু ভুলের মধ্য দিয়াই পায় জীবনসত্যকে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যমানসে মনোধর্মের তথা প্রেমধর্মের যে ক্রমবিকাশ দেখিবেন, নাট্যে, গল্পে ও উপন্যাসে যদি তাহারই আলোর প্রভাব না দেখেন, তবে ঐক্যতত্ত্বের থিয়োরীটি অবশ্যই ভিত্তিহীন ও স্বকপোলকল্পিত। আমি বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের মনোদর্শনে প্রেমই ঐক্যতত্ত্ব—প্রেমই প্রথমতম ও প্রধানতম জিজ্ঞাসা। প্রেম, কি না মনুষ্যত্ববোধের চরম আদর্শ। দৈনন্দিন গৃহজীবনেও আছে এই প্রেম, কেননা প্রেম যে সর্বজগদ্‌গত। অবশ্য গৃহজীবনের যে প্রেম, তাহার রূপ ভিন্ন, প্রকাশপদ্ধতি ভিন্ন। সর্বজীবনগত প্রেম গৃহ ও সমাজজীবনে কতটা বিকাশ লাভ করিতে পারে, কতটা আভাস দিতে পারে—বিকৃত হইয়া, অতিকৃত হইয়া মত্ততার কতটা মূঢ়তা প্রকাশ করিতে পারে—রবীন্দ্রনাথের গল্পে ও কল্পকথায় তাহারই নির্দেশ মেলে। ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের প্রেম দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের প্রেম হইতে কদাচ পৃথক নহে। অহংময় জীবন হইতে অর্থাৎ গৃহজীবন ও সমাজজীবন

হইতেই এই প্রেমের অভ্যুদয়। এই প্রেম "ভালোবাসার মোহ" রূপে জাগে—নানা মান, নানা অভিমান, নানা ক্ষোভ, নানা লোভ ও নানা নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া জীবনপথে হয় অগ্রসর। খণ্ডক্ষুদ্র কত ঘটনা, কত বিকৃতি, কত বিচ্যুতি তাহাকে ভোলায়, দোলায়, চালায়। কিন্তু এই বিকৃতি বা বিচ্যুতিগুলি মহান এক অখণ্ড জীবনসত্যের উদ্বোধনেই যে রহস্যময় ভাবে নিয়োজিত, জীবনোদ্বোধনের পরই তাহা বুঝিতে পারা সম্ভব। ঈর্ষায় ফাঁপিয়া, প্রতিহিংসায় কাঁপিয়া, বিভ্রান্তির ফাঁদে পা দিয়া, মোহে ও ছলনায় আন্দোলিত হইয়া রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা প্রায়শঃই উচ্চতর জীবনে উন্নীত হইয়া গেছে। যেখানে উন্নীত হয় নাই সেখানে তাহারা, কবি দেখাইয়াছেন, বাসনার বন্ধনে বন্দী হইয়া অহরহঃ হাহাকার করিয়াছে; ছাড়িতে পারে নাই বলিয়া বাড়িতে পারে নাই, মৃত্যুর অমৃতময় মূর্তির পরিবর্তে মৃত্যুময় ভীষণের মূর্তি দর্শন করিয়া পলে পলে না মরিয়া পারে নাই। গল্প-সাহিত্য সম্পর্কেও এই কথা প্রযোজ্য। আসল কথা, প্রেম-জীবন অর্থাৎ মোহোন্মুক্ত সহজ আনন্দজীবনই লক্ষ্য। ইহারই পথে যুগ যুগ ধরিয়া চলিয়াছে অখিল ভুবনের মানবযাত্রী—যে থামিয়াছে, সেই মরিয়াছে; যে চলিয়াছে, মৃত্যুর মধ্য দিয়া সেই লাভ করিয়াছে মৃত্যুহীন মহাপ্রাণ।

সমাজজীবনে কোন্ প্রেম অমৃতের পথে চলে এবং কোন্ প্রেম আসক্তির পঙ্কস্তূপে বন্দী রহিয়া হাহাকার করে নিত্যকাল—একাধিক গল্পে কবি নিপুণভাবে তাহা অঙ্কন করিয়াছেন। গাল্পিক রবীন্দ্রনাথেরও বক্তব্য এই যে, বাসনার অন্তহীন জৈবযন্ত্রণা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যে-মন নির্মল প্রশান্তির সাধনায় তৎপর, সেই মনই চলমান প্রেমের পায় সন্ধান।

'বোষ্টমী'

সংসারজীবনে এই প্রেম কতটুকু প্রকাশ পাইতে পারে, "বোষ্টমী" নামক গল্পে তাহার ইশারা আছে। বোষ্টমী জানিত, প্রেম সত্য, প্রেম নারায়ণ। এতটুকু মিথ্যা সে সহিতে পারে না। বোষ্টমী পৃথিবীতে দুটি মানুষকে সবচেয়ে ভালোবাসিয়াছিল, তাহার ছেলে এবং তাহার স্বামী। কিন্তু ইহার মধ্যে আসিয়া জুটিল গুরুঠাকুর—তাহার লাবণ্যসুন্দর অপরূপ রূপ লইয়া। বোষ্টমীর স্বামীপ্রেমে এতটুকু প্রতারণা ছিল না, কিন্তু সে জানিত না যে, গুরুঠাকুরকে সে যে ভক্তি করে, তাহার মূলে কোথায় যেন একটু একটু করিয়া কামনাই সঞ্চিত হইতেছিল। একদা গুরুর একটি বচনে ঠিক এমনিতর কামনার আভাস পাইয়া অকস্মাৎ তাহার আত্মসম্বিৎ ফিরিল, অন্তরের দিকে চাহিয়া সে বুঝিল গুরু-শিষ্যার সম্বন্ধের মধ্যে "গোপনে কোথায় একটা চুরি চলিতেছিল"। বোষ্টমীর পক্ষে ইহার পর সংসারে আর থাকা চলে না।

স্বামীকে সে যে প্রেম দিয়াছিল, গুরুঠাকুরকে দিয়াছিল যে ভক্তি পূজা, জানিয়া শুনিয়া তাহার মধ্যে কোনো ফাঁকি বা প্রতারণা আনা তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। প্রেমকে নির্দগ্ধকল্মষ রাখিবার জন্য প্রেমাস্পদকে ও তাহার গৃহসংসারকে ত্যাগ করিবার এই যে প্রেরণা, ইহা প্রেমেরই প্রেরণা। ইহার প্রেরণায় ভালোবাসার মোহ হইতে মুক্ত হইয়া বোষ্টমী বিশ্বজনকে ও বিশ্বপ্রকৃতিকে ভালোবাসিতে শিখিল। প্রেম শুদ্ধমাত্র ভোগ নহে, পরন্তু যোগও বটে; অর্থাৎ ব্যক্তিগত বাসনাজীবনের সুখভোগ মাত্র নহে, পরন্তু বিশ্বগত কল্যাণ-জীবনের সহিত সহজযোগের আনন্দও বটে। ভালোবাসার মোহজাত গুপ্তছলনা মানুষকে এই সহজ যোগের আনন্দ হইতে দূরে সরাইয়া রাখে। বোষ্টমী এই গুপ্তছলনা বা আত্মপ্রতারণার বন্ধন হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া বিশ্বের হইতে পারিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই গল্পে তাঁহার প্রেমতত্ত্বের রসমূর্তিটি বড় নিপুণভাবেই অঙ্কন করিয়াছেন।

বোষ্টমী যেমন স্বামীগৃহ ত্যাগ করিয়াই বাসনার গোপনতা হইতে মুক্তি পাইল, এমনিতর মুক্তি পাইবার প্রয়াস করিয়াছিল আর একটি মেয়ে, নাম অনিলা, "পয়লা নম্বর" গল্পে। বোষ্টমীর স্বামীর ন্যায় অনিলার স্বামী, নাম অদ্বৈত, খুব সরল ছিল না—তবে সেও ছিল একপ্রকার আত্মভোলা, ভাবে ভোলা মানুষ। দিনরাত বই পড়িয়া, বন্ধুদের সহিত নানাবিষয়িনী বিদ্যার আলোচনা ও তর্ক করিয়া সে দিন কাটাইত। পত্নীর সুখদুঃখের প্রতি তাহার দৃষ্টি ছিল না এতটুকু। কোথায় অনিলার মর্মবেদনা, কেমন করিয়া এবং কী কারণে তাহার জীবন উঠিতেছে দুর্বহ হইয়া—কোথা হইতে কোন্ রন্ধ্র-পথে প্রলোভনের উন্মত্ত বসন্তবাতাস প্রবেশ করিতেছে তাহার নিভৃত মন্দিরে—এ-সকল সংবাদ লইত না অদ্বৈত। আপন খেয়ালে তর্ক করিয়া, বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করিয়া, খাইয়া এবং তাহাদের খাওয়াইয়া, কোথা হইতে এত সব হইতেছে তাহা না ভাবিয়া—পত্নীকে এইসব কারণে অহরহঃ ব্যস্ত রাখিয়া, জীবন-যাপন করিত অদ্বৈত। এমন সময় ঐশ্বর্যের আড়ম্বর উড়াইয়া পয়লা নম্বর বাড়ীতে আসিল সিতাংশু মৌলী—একদৃষ্টেই সে অনিলার মনের দুঃখবেদনার খবর লইল জানিয়া। অনিলার ভাই সরোজ পরীক্ষায় পাস করিতে না পারিয়া যে আত্মহত্যা করিল, এ সংবাদ অদ্বৈত রাখিল না, কিন্তু সিতাংশু মৌলী রাখিল। সে সেই রাত্রে এই খবর পাইয়াই তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে গেল; পুলিশকে ঠাণ্ডা করিয়া নিজে শ্মশানে উপস্থিত হইল—মৃতদেহের সংকার করিয়া দিল। সেই রাত্রি অনিলার পক্ষে কত দুঃখের, কত শোকের রাত্রি, মূর্খ অদ্বৈত তাহা জানেই না। সে তখন "পূর্ণিমা ভোজের" জন্য ব্যস্ত। অদ্বৈতর কথাগুলি এই:

'পয়লা নম্বর'

> কাল আমার স্ত্রী তাঁর বাপের বাড়ী গিয়েছিলেন; আজ ফিরে এসে তাঁর ঘরে দরজা বন্ধ করলেন। তিনি জানেন, আজ রাত্রে আমাদের দ্বৈতদলের পূর্ণিমার ভোজ। তাই নিয়ে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করবার অভিপ্রায়ে দরজায় ঘা

দিলুম। প্রথমে সাড়া পাওয়া গেল না। ডাক দিলুম "অনু"। খানিক বাদে অনিলা এসে দরজা খুলে দিল।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "আজ রাত্রে রান্নার যোগাড় সব ঠিক আছে তো?"

সে কোনো জবাব না দিয়ে মাথা হেলিয়ে জানালে যে, আছে।

আমি বললুম, "তোমার হাতের তৈরী মাছের কচুরি আর বিলাতি আমড়ার চাট্‌নি ওদের খুব ভালো লাগে, সেটা ভুলো না"

এই বলে বাইরে এসেই দেখি কানাইলাল বসে আছে।

আমি বললুম, "কানাই, আজ তোমরা একটু সকাল সকাল এসো।"

কানাই আশ্চর্য হয়ে বললে, "সে কী কথা। আজ আমাদের সভা হবে না কি।"

আমি বললুম, "হবে বৈ-কি। সমস্ত তৈরী আছে—ম্যাক্সিম্‌ গর্কির নতুন গল্পের বই, বের্গসঁর উপর রাসেলের সমালোচনা, মাছের কচুরি, এমন কি আমড়ার চাট্‌নি পর্যন্ত।"

কানাই অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। খানিকবাদে বললে, "অদ্বৈতবাবু, আমি বলি, আজ থাক।"

অবশেষে প্রশ্ন করে জানতে পারলুম, আমার শ্যালক সরোজ কাল বিকেল বেলায় আত্মহত্যা করে মরেছে। পরীক্ষায় সে পাশ করতে পারেনি, তাই নিয়ে বিমাতার কাছ থেকে খুব গঞ্জনা পেয়েছিল—সইতে না পেরে গলায় চাদর বেঁধে মরেছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "তুমি কোথা থেকে শুনলে?"

সে বললে, "পয়লা নম্বর থেকে।"

এই "পয়লা নম্বর থেকে" গোপনে গোপনে একটি গূঢ় ব্যাপার ঘটিতেছিল। সিতাংশু অনিলাকে মিনতি ভরা আহ্বান জানাইয়া লিখিতেছিল বহু প্রণয়পত্র। সিতাংশু লিখিতেছিল :

> "বাইরে থেকে তোমার কিছুই জানি নে, কিন্তু অন্তরের দিক থেকে আমি দেখেছি তোমার বেদনা। এইখানে বড়ো কঠিন আমার পরীক্ষা। আমার এই পুরুষের বাহু নিশ্চেষ্ট থাকতে চায় না। ইচ্ছা করে, স্বর্গমর্ত্যের সমস্ত শাসন বিদীর্ণ করে তোমাকে তোমার জীবনের ব্যর্থতা থেকে উদ্ধার করে আনি।"

এ-ক্ষেত্রে কী করবে অনিলা? একদিকে স্বামীগৃহ তাহার পক্ষে প্রেমহীন, মর্মহীন কারাগার মাত্র—অপরদিকে সিতাংশুর গৃহ হইতে আসিতেছে প্রেমময় মুক্তি প্রলোভন। কোন্‌ পথে যাইবে অনিলা? আধুনিক কোনো লেখক হইলে অদ্বৈতর মর্মহীন, কর্তব্য-বিহীন, স্বার্থপর মূর্খ ঔদাসীন্যের প্রতিবাদে অনিলাকে সিতাংশুর বাহুপাশে পাঠাইয়া দেওয়াই

হয়তো সমীচীন মনে করিতেন। কিন্তু তাহাতে নারীজীবনে সাময়িক সুখবাসনার পরিতৃপ্তি হয়তো ঘটিত, কিন্তু অন্তর্গূঢ় বেদনাময় প্রেমজীবনের সমস্যা তাহাতে আরো জট পাকাইয়া যাইত। কেন? অনিলার সমস্যা যে কতকটা বোষ্টমীরই মত। বোষ্টমীর মত সেও স্বামীকে ভালোবাসিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই। তাহার স্বামী পুরোহিতের হাত হইতে তাহাকে পাইয়াছিল, কিন্তু তাহার বিধাতার হাত হইতে তাহাকে গ্রহণ করিবার মূল্য স্বামী কিছুই দেয় নাই। অযোগ্য এই স্বামীর কারাগার হইতে মুক্তি পাওয়ার স্বপ্ন চিত্তের মধ্যে জাগিতেই পারে, কিন্তু মনোধর্মের বন্ধন হইতে অনিলা মুক্তি পাইবে কেমন করিয়া? স্বামীকে ত্যাগ করা কঠিন নহে, কিন্তু নারীর ধর্মবন্ধন ও তাহার সংস্কার ত্যাগ করা অনিলার কর্ম নহে। অনিলা যদি স্বামীকে পাইত সত্যকার প্রিয়রূপে, তবে এ-সকল সমস্যা জাগিত না। বোষ্টমী স্বামীকে প্রিয়রূপেই পাইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার প্রিয়টি এমনি সরল যে, যে-গুরুটি তাহার স্ত্রীতেই লোভ দিয়াছে, তাহাকেই সে গভীর বিশ্বাসে ভক্তি করে। শুধু তাহাই নহে, গুরুতে তাহার নিজের মনও কেমন যেন, কোথায় যেন, কী আবেশে যেন লিপ্ত হইতেছে। এ-ক্ষেত্রে সংসারে থাকিলে শুধু স্বামী নয়, গুরুকেও ভিন্নভাবে ভজনা করিতে হয়—যাহা ধর্মবন্ধনে বন্দিনী নারীর পক্ষে সমস্যার সমাধান নহে, নূতনতর সমস্যার জটাজাল বিস্তারের আয়োজন মাত্র। স্বপ্নে নারী ইহা ছিন্ন করিতে হয়তো চাহে, কর্মে তাহা করিতে পারে না। বোষ্টমী তাই সংসার ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ দুইজনকেই ত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষা তথা স্বামী-প্রেমের গৌরব রক্ষা করিয়াছে—অনিলাও ঠিক বোষ্টমীর মতই সংসার ত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষা করিল। বিদায়কালে যে কটি কথা সে অদ্বৈতকে লিখিল, ঠিক সেই কটি কথাই পাঠাইল সিতাংশু নিকট :

"আমি চললুম, আমাকে খুঁজতে চেষ্টা কোরো না। করলেও খোঁজ পাবে না।"

অনিলা চলিয়া গেল—নারী জীবনের কোনো সার্থকতাই কি তাহার মধ্যে প্রকাশ পাইল না? স্বামীর কাছ হইতে সে কিছুই পায় নাই কিন্তু প্রলোভন ত্যাগের এই যে বীর্যবতী শক্তিটি স্বামী-ত্যাগের বিষদগ্ধ অভিমানের মধ্যেই জাগিয়া উঠিল, অদ্বৈতকুলকে তাহা কি কখনই নাড়া দিবে না?

অনিলা কোথায় গেল, লেখক কোনোরূপ ইঙ্গিত তাহার দেন নাই। সে যদি আত্মহত্যা না করিয়া থাকে, তবে তাহার মত মেয়ে কোথায় যাইতে পারে, "স্ত্রীর পত্র" নামক গল্পে তাহার কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। স্বামীগৃহে নানা অবিচার, নানা গঞ্জনা, নানা মর্মহীন ব্যবহার পাইয়া পাইয়া মনের মধ্যে শুকাইতেছিল মৃণাল। তুচ্ছ ইটকাঠের আড়ালটার মধ্যে তিলে তিলে সে মরিতেছিল—তাহার কবিমন

'স্ত্রীর পত্র'

মনে মনে শুনিত আকাশের আহ্বান, বাহিরের মুক্তি-ইশারা, কিন্তু সংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধ অন্দর-মহলে তাহাকে পড়িয়া রহিতে হইত বাধ্য হইয়া। কিন্তু ইহাও বুঝি তাহার পক্ষে অসহ্য হইত না যদি সে প্রাণের স্পর্শ পাইত বদ্ধ কারাকক্ষে। প্রাণ তো এখানে নাই-ই, উপরন্তু প্রাণকে বলি দিবার হীনতম বহু ষড়যন্ত্র সংঘটিত হইতেছিল এখানে। বিন্দু নাম্নী সহায়সর্বস্বহীনা একটা অনাথ মেয়ের প্রাণটাকে লইয়া নির্মম সমাজ যেরূপ ছিনিমিনি খেলিল, মৃণাল তাহা কোনোমতেই সহ্য করিতে পারিল না। পুরীতীর্থে আসিয়া সে স্থির করিল, সংসারে আর সে ফিরিবে না। স্বামীকে সে লিখিয়া দিল :

> আমি তীর্থে এসেছি।···আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরিব না। আমি বিন্দুকে দেখেছি। সংসারের মাঝখানে মেয়েমানুষের পরিচয়টা যে কী তা আমি পেয়েছি। আর আমার দরকার নেই।···
>
> তোমাদের গলিকে আমি আর ভয় করিনে। আমার সম্মুখে আজ নীল সমুদ্র, আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ।··
>
> তুমি ভাবছ আমি মরতে যাচ্ছি—ভয় নেই, অমন পুরোণো ঠাট্টা তোমাদের সঙ্গে আমি করব না। মীরাবাঈ-ও তো আমারই মত মেয়েমানুষ ছিল—তার শিকলও তো কম ভারী ছিল না, তাকে তো বাঁচবার জন্যে মরতে হয়নি। মীরাবাঈ তাঁর গানে বলেছিল, "ছাড়ুক বাপ, ছাড়ুক মা, ছাড়ুক যে যেখানে আছে, মীরা কিন্তু লেগেই রইল প্রভু—তাতে তার যা হবার তা হোক।" এই লেগে থাকাই তো বেঁচে থাকা। আমিও বাঁচব।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে—কোনো কোনো মহলে উঠিয়াছে। প্রশ্নটি এই : সমাজে মেয়েরা বা স্ত্রীরা নির্যাতিতা বা প্রলুব্ধা হইলে পর বোষ্টমী, অনিলা বা মৃণালের মত স্বামীগৃহ ত্যাগ করিবে, ইহাই কি জীবন-সমস্যার সমাধান? প্রশ্নটিকে আমি অশ্রদ্ধা করি না—কিন্তু এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে, প্রশ্নটি নিতান্তই সামাজিক, সাহিত্যিক নহে। বোষ্টমী, অনিলা বা মৃণালের সংসার ত্যাগ যদি সাহিত্যিক প্রয়োজনে ঘটিয়া থাকে —তবে তাহার জ্যোতি-প্রভাব পাঠককে অবশ্যই আন্দোলিত করিবে। সামাজিক ব্যক্তি হিসাবে পাঠকসাধারণের মনুষ্যত্ব পূর্ণভাবে বিকশিত যদি নাও হইয়া থাকে, সাহিত্যিক রসপ্রভাবে তাহাদের ভিন্ন ব্যক্তিত্ব অবশ্যই প্রমুদিত হয়। সামাজিক মানুষ হিসাবে আজও আমরা নিতান্তই অসম্পূর্ণ, অনেকক্ষেত্রে অপ্রমুদিত। ঘরে আমাদের কে বা কাহারা দুঃখে বেদনায় শুকাইয়া গেল, পাশের বাড়ীতে কে বা কাহারা দুর্গতির অতলতলে নামিয়া যাইতেছে, গ্রাম বা শহরের চারিপাশে কে বা কাহারা ঠগ হইতেছে, ধাপ্পাবাজ হইতেছে—পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙিয়া রস আহরণে আপন বুদ্ধির তারিফ

করিতেছে—আমরা দেখিয়াও দেখি না, অর্থাৎ আমাদের হৃদয় এতটুকু বেদনায় দুলিয়া উঠে না, রুখিয়া দাঁড়ায় না। হয়তো বা এমনও হইতে পারে, নানা প্রকার অন্যায় ও পাপের পঙ্কমধ্যে আমাদেরই কেহ কেহ লিপ্তই হইয়া আছি। সাহিত্যে যখন এই সকল পাপ বা অন্যায়ের চিত্র শিল্পোত্তীর্ণ বেদনায় ধ্রুবনক্ষত্রের মত জলজল করিয়া উঠে—তখন সেই নক্ষত্রালোকের বেদনাবহ্নির দর্পণে সমাজের ও সমাজ-মানসের যে দুর্গতি ও দুঃখগুলি নিজেদের মধ্যেই আছে, সেইগুলির বিরুদ্ধেই মনে মনে বিদ্রূপ হানি, শ্লেষ নিক্ষেপ করি। এমনভাবে করি, ভাবটা যেন এই—দোষগুলি আর পাঁচজনের, আমার বা আমাদের নহে। এইভাবে সামাজিক অহং-এর বাস্তবসত্তা হইতে সাহিত্যিক আত্মার শিল্পসত্তায় অর্থাৎ প্রেমসত্তায় আমাদের মানসরূপান্তর ঘটিতে থাকে। আমাদের ব্যক্তিসত্তাটি বস্তুসমাজের, কিন্তু বিশ্বসত্তাটি শিল্পসাহিত্যের। ব্যক্তি হইতে বিশ্বে, অহং হইতে আত্মায়, বস্তু হইতে রসে, সমাজ হইতে সাহিত্যে রূপান্তরের এই সত্যটি ধরিতে পারিলেই রবীন্দ্রনাথ, শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন, বিশ্বের সকল শ্রেষ্ঠ গাল্পিকদেরই, গল্পসাহিত্যের শ্লেষ ও বিদ্রূপাত্মক গল্পকথার তত্ত্ব-তাৎপর্য সহজেই উপলব্ধ হইবে। গল্পে কী ঘটানো হইয়াছে, সমাজে তাহা যথাযথভাবে ঘটে কিনা, জীবনসমস্যার তাহা সমাধান কিনা, শিল্পবিচারে তাহা বড় কথা নহে, তত্ত্ববিচারেও নহে। যাহা ঘটানো হইয়াছে, তাহা আমার মনের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া আমার বস্তুসত্তার মালিন্য মোচনে কতটা সাহায্য করিয়াছে, তত্ত্বব্যাপারে তাহাই বিচার্য। কিংবা অন্য কথায়, যাহা ঘটানো হইয়াছে, তাহা শিল্পের প্রয়োজনেই সংঘটিত হইয়া লেখকের বস্তুচিত্রটি অপূর্ব একটি রসরূপ গ্রহণ করিতে পারিয়াছে কিনা—তাহাই লক্ষণীয়।

বোধের বিস্তৃতি ঘটিলেই রসোপলব্ধি সম্ভব; হিতোপদেশে বোধ জাগে না, শিল্পের আনন্দ-আকর্ষণেই বোধ বিস্তৃত হয়। রবীন্দ্রনাথ যে পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ গাল্পিক, তাহার কারণ তাঁহার গল্পের প্রধান গুণ শিল্পোত্তীর্ণতা—অধিকাংশ গল্পেই যাহা ঘটিয়াছে তাহা ঠিকই ঘটিয়াছে বলিয়া বিনা দ্বিধায় মন মানিয়া লয়। ঠিক তো হইয়াছে, কিন্তু তবু কি মন প্রশ্ন করে না—অন্যরকম না হইয়া ঠিক এমনটিই বা হইল কেন? বোষ্টমী কি ঘরে থাকিতে পারিত না? কখনই না। স্বামীর প্রতি তাহার ভালোবাসা আছে, গুরুর রূপময় গৌরতারুণ্যের লঘু প্রভাবও আছে তাহার যৌবনে। দুয়ের দ্বন্দ্ব সংসার-জীবনে তাহাকে যে নিরানন্দ করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু দুজনকেই কি তৃপ্ত করা যাইত না? বোষ্টমীর মানসগঠন যে তেমনতর নহে। সে স্বামীকে প্রতারণা করিতে পারে না, গুরুকেও অভক্তি করিতে চাহে না। গৃহে থাকিলে ভক্তি নামিয়া আসিবে হীনতম বাসনায়, স্বামীপ্রেম রূপান্তরিত হইবে হীনতম ছলনায়। বোষ্টমীর প্রেমমানস ইহা সহ্যই করিতে পারে না। ইহাতে সুখ নাই। তবে কিসে সুখ? স্বামীর প্রতি তাহার প্রেমকে অমলিন রাখিতেই সুখ, গুরুকে চিরকাল ভক্তির দৃষ্টিতে দেখাতেই সুখ। ইহা কেমন করিয়া সম্ভব? গৃহত্যাগ করিয়া, সংসারে আর না ফিরিয়া, বৃহত্তের পথে মন

মেলিয়া। গৃহত্যাগই বোষ্টমী-প্রেমের মনস্তাত্ত্বিক পরিণতি। তাৎপর্য এই, বাসনার মোহ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া প্রেমের পথে চলাই জীবনসাধনা, তত্ত্ব-সাধনা।

অনিলার মধ্যে কি এই সাধনা ছিল? স্বামীকে হয়তো সে ভালোবাসিয়াছিল, কিন্তু স্বামীর বোধবিহীন ঔদাসীন্যে ও আত্মসুখমগ্নতায় স্বামীগৃহ তাহার পক্ষে মোহনীয় ছিল না। অপরদিকে সিতাংশুর যৌবনময় প্রেমপত্রাবলী তাহাকে প্রলুব্ধই করিতেছিল। পঁচিশখানি পত্র সে সিতাংশুর নিকট হইতে পাইয়াছে, একখানিরও উত্তর সে দেয় নাই বলিয়া অনেকেই তাহার মনঃশক্তি ও চিত্তসংযমের তারিফ করিবেন। "রেশমের লাল ফিতেয়" বাঁধিয়া পত্রগুলিকে দেরাজের মধ্যে তুলিয়া রাখার গোপন যত্নের মধ্যে সিতাংশুর প্রতি তাহার সহজ আকর্ষণই প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। এই সামান্য ঘটনাই তাহার অন্তর্দ্বন্দ্বকে দিনের আলোর মত স্পষ্ট করিয়াই প্রকাশ করিয়াছে। অদ্বৈতর পক্ষে অনিলার নারীত্বের মহিমা উপলব্ধি করাই যেন সম্ভব নহে—কিন্তু সিতাংশু কবে, কোথায় যেন চকিত দর্শনেই তাহার নারীজীবনের সুখদুঃখ গৌরব ও মহিমা স্বীকার করিয়াছে—এ ব্যাপার কারাবন্দিনী বিষাদিনী অনিলার জীবনে কম প্রলোভনের বিষয় নহে। সিতাংশুর পত্রগুলি হইতেই এই যেন সে প্রথম জানিল, সে নারী, পুরুষকে প্রেরণা দিবার, চেতনান্বিত করিবার সহজ প্রতিভা তাহার আছে। পত্রগুলি গোপনে গ্রহণ করিতে প্রথম প্রথম সংস্কারে যে তাহার বাঁধে নাই তাহা নহে,—প্রথম পত্রটি পাইয়াই সে ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই গঁদ দিয়া জুড়িয়া ছিন্নপত্রটিকেই আবার যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছিল। অনিলার গৃহত্যাগের ঘটনায় প্রথমে তাই মনে হয়, সিতাংশুর সহিত সে বুঝি গিয়া মিলিয়াছে; কিন্তু যখন জানা গেল, সে সিতাংশুকেও গ্রহণ করে নাই—অথচ গৃহত্যাগ করিয়াছে, তখন বুঝা সহজ যে, সিতাংশুর আকর্ষণ গোপনে অনিলার অন্তরে ক্রমশঃই উঠিতেছিল উন্মত্ত হইয়া—শক্তি সংযমের বাঁধ যাইতেছিল ভাঙিয়া—আর মুহূর্তকাল অপেক্ষা করিলে কী হইতে কী হইয়া যাইতে পারে, অর্থাৎ সিতাংশুর পৌরুষ-আহ্বানে সে উদাসিনী নাও থাকিতে পারে।

বুঝিলাম। কিন্তু অদ্বৈতর গৃহ যখন অনিলার ভালোই লাগিতেছে না, তখন যে পুরুষ তাহার নারী হৃদয়কে নাড়া দিয়াছে, তাহার কাছে কেনই বা সে যাইল না? অনিলার পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। অনিলা সে জাতির মেয়ে নহে। সে সমাজের, সমাজ-মানসের। "স্বামী" মানুষটার চেয়ে স্বামী—এই "আইডিয়ার" রূপের সহিত আলিঙ্গিত রহিয়া মুখ বুজিয়া স্বামীঘর করিয়া দিন শেষ করে, অনিলা তাহাদের দল হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। তাহার পক্ষে নিরুপমা ('দেনা-পাওনা') বা হৈমন্তীর ('হৈমন্তী') মত বেদনা-বিষাদে আত্মহত্যা করা সহজ কিন্তু লাবণ্যের ('শেষের কবিতা') মত সহজ আনন্দে এক হইতে অন্যে যাওয়া সহজ নহে, স্বাভাবিকও নহে। কিন্তু গৃহত্যাগ যেন কেমন-কেমন

ঠেকিতেছে—কেহ কেহ প্রশ্ন করিতেছেন। সাহিত্য যাঁহারা বুঝেন তাঁহারা অবশ্যই বলিবেন, গৃহত্যাগের ঘটনাটিই অনিলার অন্তর্লীন প্রণয়-প্রলোভন এবং নবোদ্গত বাসনোদ্বেগের বিরুদ্ধে সর্বশেষ সংগ্রাম ঘোষণা। বিষাদিনী বেদনাময়ী অনিলা মুখে বেশি কথা বলে নাই কিন্তু গৃহত্যাগের মধ্য দিয়া অজস্র সহস্র দুঃখবেদনা ও দ্বন্দ্ববাসনার কথা বলিয়া গিয়াছে। গৃহত্যাগের ঘটনাটিই গল্পটির সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ—রসের দিক দিয়াও বটে, তত্ত্বের দিক দিয়াও বটে। গৃহে থাকিলে অহরহঃ প্রলুব্ধ হইতে হয়—সে প্রলোভন ক্রমশঃই যেন দুর্বার হইয়া উঠিতেছে। এই দুর্বার প্রলোভনকে শান্তভাবে জয় করার জন্য যে মানস-শান্তি ও সান্ত্বনার প্রয়োজন, হায়রে স্বামীগৃহে তাহা নাই। অতএব "আমি চললুম" লিখিল অনিলা। এই যে চলা, ইহাই অনিলার বাঁচিয়া থাকা। ইহাই অহং-এর উপর আত্মার জয় ঘোষণা।

"স্ত্রীর পত্র" নামক গল্পে মৃণালের জীবনে কোনো সিতাংশুর আবির্ভাব ঘটে নাই। কিন্তু বিন্দু নামে একটি রূপহীনা বালিকা আসিয়া তাহার জীবনের গতি দিয়াছিল ফিরাইয়া। মৃণালের রূপ ছিল, গুণ ছিল, কবিত্ব-শক্তি ছিল। সংসার কেহই এসবের মূল্য বুঝিত না—এমনকি তাহার স্বামীও না। এতটুকু মেয়ে বিন্দু, বুঝি তাহার রূপ ছিল না বলিয়াই, মৃণালের রূপের সে মর্যাদা বুঝিয়াছিল, বড় আবেগভরেই সে ভালো-বাসিতে সুরু করিয়াছিল মৃণালকে। মৃণালের অভিমানী কবিমন বিন্দুর হৃদয়াবেগ ও ভালোবাসায় মুগ্ধ হইয়াছিল—কিছুটা পরিমাণে তৃপ্তও হইয়াছিল। সংসারে এই সহায়হীনা বিন্দুকে বুক দিয়া সে তাই আগলাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু গৃহসমাজ তাহাতে বাধা দিল। বিন্দু ভিখারিণীর চেয়েও অসহায়া, তাহার উপর সে কুৎসিতা—সুতরাং হৃদয় বলিয়া কোনো পদার্থ যে তাহার থাকিতে পারে, গৃহসমাজের বিজ্ঞজনের কেহই সে-কথা ভাবিল না—একটা পাগলের সহিত তাহার বিবাহ দিয়া সকলেই কর্তব্য সমাপন করিল। মনোদুঃখে বিন্দু আত্মহত্যা করিয়া মরিল—সকলের জ্বালা জুড়াইল, কিন্তু মৃণালের বুকে জ্বলিয়া উঠিল মর্মময়ী বেদনার বহ্নিশিখা। সেই শিখার আলোকে সে স্পষ্ট দেখিল—গৃহসমাজে হৃদয়ের কোনো মূল্য নাই—রূপসৌন্দর্যেরও মর্যাদা নাই। নারী এখানে কর্তব্যের ক্রীতদাসী মাত্র। এখানে রাঁধার পরে খাওয়ানো এবং খাওয়ানোর পরে রাঁধা ই জীবন। দিবারাত্রি একচাকাতেই বাঁধা এই বন্দীজীবন অসহ্য হইয়া উঠিল ক্রমশঃ। কবি মৃণালের পক্ষে অসার এই গৃহসমাজে পড়িয়া থাকাটাই মৃত্যু—ইহা হইতে মুক্তি লওয়াই জীবন। মৃণাল তাই গৃহত্যাগ করিল—বিন্দুর মত সেও আত্মহত্যা করিতে পারিত, কিন্তু সে কবি, জীবনকে ভালোবাসে, জীবনকে নূতন ভঙ্গীতে রচনা করিয়া নূতন এক আস্বাদের আয়োজনই তাহার কবিচিত্তের বন্ধনমুক্তি। মীরাবাঈকে আদর্শ করিয়া পথের টানে সে হইল বাহির। ইহাই তাহার পক্ষে সহজ: ইহাই সহজ সাধনা, বাঁচার সাধনা, জীবনপ্রেমের নূতনতর আনন্দ-সাধনা।

রবীন্দ্রকল্পিত প্রেমের স্বরূপ বিকাশে নারীর গৃহত্যাগের ঘটনা কতটা সাহায্য করিয়াছে—কয়েকটি গল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে তাহা স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিলাম। রবীন্দ্রনাথ কোথাও কোথাও গৃহত্যাগ অপেক্ষা আত্মহত্যাকেই প্রেমের বিশেষ বিশেষ রূপ বিকাশের উপায় স্বরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। বস্তুতঃ মৃত্যু রবীন্দ্রসাহিত্যের একটি অপরূপ চেতনবস্তু। ইহা কোথাও অমৃতের আনন্দ বিকীরণ করিয়াছে, কোথাও হলাহলে ভুবন প্লাবিত করিয়াছে। মৃত্যু কোন্ ক্ষেত্রে অমৃত অর্থাৎ প্রেম, এবং কোথায় অহং-এর উন্মত্ত হাহাকার—দুই একটি গল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে তাহা বুঝাইয়া দিতেছি।

"ঘাটের কথা" গল্পটি মনে করুন।

'ঘাটের কথা'

"গৌরতনু এক নবীন সন্ন্যাসী" আসিয়াছিল কুসুমদের গ্রামে। কুসুম তাঁহাকে ভক্তি করিত দেবতার মত। ভক্তির সেই আনন্দে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে, কুসুমেরই অজ্ঞাতে, সেই ভক্তি ভালোবাসার মোহের পথে যেন চলিতে চাহিল। একদা রাত্রিকালে স্বপ্নে সে সন্ন্যাসীকে স্বামীরূপে পাওয়ার কামনাটি প্রকট হইতে দেখিল। পূর্বে সে সহজভাবেই সন্ন্যাসীর নিকট আসিত—কিন্তু ভালোবাসার স্বপ্ন জাগার সঙ্গে সঙ্গে কেমনতর লজ্জা তাহাকে ঘেরিয়া ধরিল। সন্ন্যাসীর নিকট আর সে আসিতে পারিল না। কুসুমকে সন্ন্যাসী একদা ডাকিয়া পাঠাইলেন। অনেক চেষ্টায় সন্ন্যাসী কুসুমের মনের কথা জানিলেন। জানিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন—"তুমি আমার সকল কথাই পালন করিয়াছ; আর একটি কথা পালন করিতে হইবে। আমি আজই এখান হইতে চলিলাম, আমার সঙ্গে তোমার দেখা না হয়। আমাকে তোমায় ভুলিতে হইবে। বলো এই সাধনা করিবে?"

"প্রভু, তাহাই হইবে।"

"তবে আমি চলিলাম।"

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। তখন কুসুম মনে মনে কহিল, "তিনি আদেশ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে ভুলিতে হইবে।"

তাহার পর একদা নিঃশব্দে সে গঙ্গাগর্ভে আত্মবিসর্জন দিয়া সন্ন্যাসীকে ভুলিল; অর্থাৎ জীবনে যাহা সাধ্যাতীত, মৃত্যুর দ্বারা তাহা আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া বাঁচিল।

কুসুমের এই আত্মবিসর্জন অতৃপ্ত হৃদয়ের খেদজনিত দুর্বল হাহাকার নহে; ইহা শান্ত স্নিগ্ধসুন্দর, ইহা মর্মন্তুদ বেদনার মাধুর্যে অলৌকিক, ইহা অন্তর্গূঢ় প্রেমের সত্যটিকে রক্ষা করিতে পারিয়া আপনাতে আপনি প্রসন্ন। প্রেমাস্পদ আদেশ করিয়াছেন—তাঁহাকে ভুলিতে হইবে; সত্য করিয়াছি যে, ভুলিব। প্রেমের নিকট যে সত্য করিয়াছি তাহা রক্ষা করাই তো প্রেমজীবনের সাধনা। প্রেম যে আমার কত বড়, সত্যরক্ষার দ্বারাই তাহা

তো প্রমাণ করিতে হইবে। কিন্তু বাঁচিয়া থাকিতে তাহা রক্ষা করা যায় কেমন করিয়া? ক্ষণে ক্ষণে তাঁহাকে মনে পড়ে। অন্তরে বুঝি ঝড়ও উঠে। কামনার ধূলিও উড়ে আকাশে। যে সুন্দর আমার প্রাণের পবিত্র দেবতা, তাহাকেই স্পর্শ করে ধূলির মলিনতা। পূজারিণী হইয়া প্রেমের এই অমর্যাদা সহ্য হয় কেমন করিয়া?

তবে করণীয় কী? তাঁহাকে যখন প্রেম দিয়াছি, তখন স্মরণ করিয়া তাঁহাকে কলঙ্কিত না-করাই প্রেমের করণীয়। তাঁহাকে ভুলিতে হইবে, ভুলিতে হইবে, ভুলিতে হইবে—অথচ ভুলিতে পারিতেছি না, ভুলিতে পারিতেছি না—সত্যভ্রষ্ট হইয়া কলঙ্কিত করিতেছি প্রেমময় জীবনের মহিমা, জীবন থাকিতে মৃত্যুর এই নিত্য স্পর্শপাত জীবনকেই মৃত্যুময় করিয়া তুলিয়াছে। করণীয় কী? তাঁহাকে ভোলাই যখন একমাত্র করণীয়, ইহাই যখন প্রেমের আদেশ, তখন জীবনই মৃত্যু, মৃত্যুই জীবন। মৃত্যুময় জীবনের পরিবর্তে জীবনময় মৃত্যুবরণে কুসুম তাই গঙ্গাগর্ভে নিঃশব্দে প্রবেশ করিল। আর উঠিল না।

কিন্তু মৃত্যু ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে প্রেম কি ব্যক্ত হইতে পারিত না? হয়তো পারিত, কিন্তু কুসুমপ্রেম ব্যক্ত হইত না। জীবন থাকিতে কুসুম যদি সন্ন্যাসীর উপদেশ ভুলিত তবে কুসুমের প্রেমকে আমরা সাময়িক একটা মোহমাত্র ভাবিয়া লইতাম। মৃত্যু তাহার প্রেমের গভীরতাকে—তাহার অনির্বচনীয় যন্ত্রণার চন্দ্রশুভ্র মধুর মাহাত্ম্যটিকে —জ্যোৎস্নালোকে ধরিত্রীর মত স্পষ্ট অথচ রহস্যময় সৌন্দর্যে প্রকট করিয়া তুলিয়াছে। "ঘাটের কথায়" প্রেমব্যঞ্জনার যে মধুরতাটুকু আপনি অনুভব করিতেছেন— মৃত্যু ব্যতিরেকে তাহার আবির্ভাব অসম্ভব।

কুসুমের মৃত্যু প্রেমকে মর্যাদা দিয়াছে—এইজন্য তাহা মর্মন্তুদ, তাহা অবিস্মরণীয়। থাকিয়া থাকিয়া তাহা হৃদয়ে বাজিয়া উঠে। কুসুমের এই মর্মময়ী প্রেমস্মৃতির কাহিনীটি পাষাণের মুখ দিয়া ব্যক্ত করিয়া লেখক ইহার ব্যঞ্জনা আরো গূঢ় ও গভীরতর করিয়া তুলিয়াছেন। পাষাণে প্রাণ নাই, প্রেম নাই—কিন্তু পাষাণও ভুলে নাই অমর এই কুসুম-প্রেমের আত্মত্যাগ কাহিনী। সন্ন্যাসী কি এই পাষাণের মানবরূপ? ঘাটে ঘাটে সেও কি স্মরণ করিতেছে কুসুম-প্রেম?

আত্মহত্যার আর একটি কাহিনী লইয়া রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত গল্প বঙ্গসাহিত্যে উজ্জ্বল হইয়া আছে। গল্পটির নাম "কঙ্কাল"। কুসুমের আত্মহত্যা, পাঠক দেখিলেন, যেন আত্মহত্যাই নহে—ইহা আত্মত্যাগ, ইহার মধ্যে আছে প্রেমের মাহাত্ম্য ও সত্যরক্ষার অভিপ্রায়ে অভিনব চরিত্র-দৃঢ়তা। কঙ্কালে সে প্রেম সবলে আত্মতৃপ্তির পথে চলে ছুটিয়া, তৃপ্ত হইলে পায় সুখ, আশায় বাঁচিতে পারিলে ধারণ করে শান্তমূর্তি; কিন্তু আশাভঙ্গ হইলে উন্মাদের আক্রোশে পশুর রূপ করে ধারণ,

'কঙ্কাল'

নখদন্ত বাহির করিয়া হনন করে আপনার দেহমনের শান্তি, আক্রমণ করে প্রেমাস্পদের অস্তিত্ব।

কনকচাঁপা ভালোবাসিয়াছিল ডাঃ শশিশেখরকে। কনকের ছিল অসামান্য রূপ। তরুণসভা তাহার রূপের ধ্যান করিত গোপনে। কনক একবার অসুখে পড়িলে তাহার চিকিৎসা করিতে আসিয়া ডাঃ শশী তাহার রূপের মোহে পড়িল। কনকও ভালোবাসিল ডাক্তারকে। কনক বলিতেছে :

> "কালক্রমে আরো দুইচারিবার রোগ ও আরোগ্য হইবার পর দেখিলাম আমার···মানসসভায় পৃথিবীর কোটি কোটি পুরুষসংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস হইয়া ক্রমে একটিতে আসিয়া ঠেকিল, আমার পৃথিবী প্রায় জনশূন্য হইয়া আসিল। জগতে কেবল একটি ডাক্তার, একটি রোগী অবশিষ্ট রহিল।
>
> "আমি গোপনে সন্ধ্যাবেলায় একটি বাসন্তী রঙের কাপড় পরিতাম, ভালো করিয়া খোঁপা বাঁধিয়া মাথায় একগাছি বেল ফুলের মালা জড়াইতাম, একটি আয়না হাতে লইয়া বাগানে গিয়া বসিতাম।
>
> "কেন? আপনাকে দেখিয়া কি আর পরিতৃপ্তি হয় না? বাস্তবিকই হয় না। কেন না, আমি তো আপনি আপনাকে দেখিতাম না। আমি তখন ডাক্তার হইয়া আপনাকে দেখিতাম, মুগ্ধ হইতাম এবং ভালোবাসিতাম এবং আদর করিতাম অথচ প্রাণের ভিতর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস সন্ধ্যা বাতাসের মতো হু হু করিয়া উঠিত।"

ইহার পর গোপনে কনক শশীর ভালোবাসা মর্মে মর্মে যখন একটু একটু করিয়া ঘনীভূত হইতেছে—কনক শুনিল, ডাক্তারের বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছে। "এই বিবাহে ডাক্তার বারো হাজার টাকা পাইবেন।"

প্রেম-বুভুক্ষু অতৃপ্তা নারী বিক্রুষ্টা বিদ্রোহিনী হইয়া উঠিল। মর্মে জ্বলিল ঈর্ষাবিদ্বেষের আগুন, বাহ্যতঃ কনক আনন্দের হাসিই যেন হাসিল। কনক বলিতেছে :

> "আমার প্রফুল্লতা দেখিয়া ডাক্তার যে কেবল অপ্রতিভ হইলেন তাহা নহে, ভারি বিমর্ষ হইয়া গেলেন।
>
> "জিজ্ঞাসা করিলাম, বাজনা-বাদ্য কিছুই নাই যে।
>
> "শুনিয়া তিনি ঈষৎ একটু নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—বিবাহের ব্যাপারটা কি এতই আনন্দের।
>
> "শুনিয়া আমি হাসিয়া অস্থির হইয়া গেলাম। এমন কথাও তো কখনো শুনি নাই। আমি বলিলাম, সে হইবে না, বাজনা চাই, আলো চাই।
>
> "দাদাকে এমনি ব্যস্ত করিয়া তুলিলাম যে, দাদা তখনি রীতিমতো উৎসবের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

"অনেক রাত্রে লগ্ন। সন্ধ্যাবেলায় ডাক্তার ছাতের উপর বসিয়া দাদার সহিত দুই এক পাত্র মদ খাইতেছিলেন। দুজনেরই এই অভ্যাসটুকু ছিল। ক্রমে আকাশে চাঁদ উঠিল।

"আমি হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিলাম, ডাক্তার মশায় ভুলিয়া গেলেন নাকি। যাত্রার সময় যে হইয়াছে।

"এইখানে একটা সামান্য কথা বলা আবশ্যক। ইতিমধ্যে আমি গোপনে ডাক্তারখানায় গিয়া খানিকটা গুঁড়া সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম এবং সেই গুঁড়ার কিয়দংশ সুবিধামত অলক্ষিতে ডাক্তারের গ্লাসে মিশাইয়া দিয়াছিলাম।

"ডাক্তার একচুমুকে গ্লাসটি শেষ করিয়া কিঞ্চিৎ আর্দ্র গদগদ কণ্ঠে আমার মুখের দিকে মর্মান্তিক দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, তবে চলিলাম।

"বাঁশী বাজিতে লাগিল। আমি একটি বেনারসী পরিলাম; যতগুলি গহনা সিন্দুকে তোলা ছিল সবগুলি বাহির করিয়া পরিলাম; সিঁথিতে বড়ো করিয়া সিঁদুর দিলাম। আমার সেই বকুলতলায় বিছানা পাতিলাম।

"বড়ো সুন্দর রাত্রি। ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না। সুপ্ত জগতের ক্লান্তি হরণ করিয়া দক্ষিণা বাতাস বহিতেছে। জুঁই আর বেলফুলের গন্ধে সমস্ত বাগান আমোদ করিতেছে।

"বাঁশীর শব্দ যখন ক্রমে দূরে চলিয়া গেল, জ্যোৎস্না যখন অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল, এই তরুপল্লব, আকাশ এবং আজন্মকালের ঘর দুয়ার লইয়া পৃথিবী যখন আমার চারিদিক হইতে মায়ার মতো মিলাইয়া যাইতে লাগিল তখন আমি নেত্র নিমীলন করিয়া হাসিলাম।"

অতৃপ্ত প্রণয়ের এই হিংস্র কঠিন হাস্যের মধ্যে যে উপহাসের ব্যঞ্জনাটুকু রহিয়াছে—তাহাতে পাঠক শিহরিয়াই উঠুন অথবা সহানুভূতির বেদনাই অনুভব করুন, ইহা যে প্রেম-মোহের বিকৃতি ও অতিকৃতি মাত্র, তাহাতে সন্দেহ করা চলে না। প্রেমাস্পদকে হত্যার পর আত্মহত্যার এই চমৎকার পরিহাসের মধ্যে অহংমত্ত যে জীবনের জ্বালাময় ক্ষিপ্ততার ইঙ্গিত আছে, তাহা প্রণিধান করিলে গল্পটির "কঙ্কাল" নামের তাৎপর্যটি গ্রহণ করাই শুধু সহজ হয় না, রবীন্দ্র-প্রেমতত্ত্বের মূলকথাটিও সহজে উপলব্ধ হয়। সুন্দরী রমণীর "এত লালিত্য, এত লাবণ্য, যৌবনের এত কঠিন কোমল নিটোল পরিপূর্ণতা" থাকা সত্ত্বেও তাহার উন্মত্ত প্রেমবাসনার বীভৎস রূপটা কঙ্কালের মতই যেন প্রকট হইয়া উঠে। "ক্ষুধিত পাষাণে" বর্ণিত তৃষ্ণার্ত প্রস্তরখণ্ডগুলির মতো ইহাও ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত। সজীব মানুষ পাইলে ইহাও যেন লালায়িত পিশাচীর মতো খাইয়া ফেলিতে চায়। কনকচাঁপার মৃত্যুতে মহিমা নাই—অহংকেই তাহা প্রবল করিয়া দেখাইয়াছে; তাহার বাসনার উদ্বেল উদগ্রতা, তাহার অসহায় আর্তবুভুক্ষা ধৈর্যের ও মনুষ্যত্বের বেড়া ত্যাগ করিয়া আপনাকে হনন

করিয়াছে, প্রেমাস্পদকে মার্জনা করিতে চাহে নাই। এই যে প্রেমোন্মত্ততার আত্মবিস্মৃত উলঙ্গ ছবি, ইহার "বিবাহের বেশ কোথায়" ? "সেই নির্লজ্জ নিরাবরণ নিরাভরণ চিরবৃদ্ধ কঙ্কাল" পাঠকের নিকট ইহার নামে যে সাক্ষ্য দিয়াছে, রবীন্দ্র-প্রেমতত্ত্বের বিচারে, তাহা তো মিথ্যা বলিয়া মনেই হয় না। কনকচাঁপার অসহায় প্রেমে ব্যথিত হইয়াছি, তাহার যৌবনরূপে মুগ্ধ যে হই নাই তাহাও নহে, কিন্তু তাহার কঙ্কালরূপের বীভৎসতা যে অমাচ্ছন্ন কৃষ্ণচ্ছায়া বিস্তার করিয়াছে, তাহাতে তাহার রূপের অসামান্যতা ঢাকিয়া গেছে, বেদনার জ্বালাময় উদ্দীপ্তি নিভিয়া গেছে। কনক বাহ্যতঃ সুন্দর, মর্মতঃ কঙ্কাল ; বাহ্যতঃ হাস্যোপহাস, মর্মতঃ জ্বালাময় বেদনার বিভীষিকা ; তাহার প্রকৃতিতে বাহ্যতঃ প্রেমের বাঁশি বাজে, মর্মতঃ মোহবাসনা গুমরিয়া ওঠে ; তাহার মিলন রাত্রে বাহ্যতঃ জাগে পূর্ণজ্যোৎস্না, মর্মতঃ আন্দোলিত হয় অমাবস্যার অতলতা। অহংকে অতিক্রম করিবার সাধনা নাই কনক-চরিত্রে—তাহার মৃত্যু তাই কনকরূপের পরিবর্তে টানিয়া আনিল কঙ্কালরূপ। কুসুম অহংকে জয় করিয়াছে সহজ প্রসন্নতায়, তাহার মৃত্যু তাই মহিমময়। কুসুমের প্রেম পাষাণকেও গলাইয়া দেয়, কনকের প্রেম প্রেমিক হৃদয়কেও শঙ্কিত করে। প্রেমের এই প্রকারভেদের বিচিত্র চিত্র আছে রবীন্দ্রনাথের গল্প-সাহিত্যে।

রবীন্দ্রনাথের গল্প ও উপন্যাস-সাহিত্যে অদ্বিতীয় প্রেমেরই বিচিত্র গতি ও রূপের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। প্রেমের বিচিত্ররূপের মধ্যে তত্ত্বতঃ দুইটি রূপই প্রধান—অহংরূপ ও বিশ্বরূপ। কনকের প্রেম ও কুসুমের প্রেম অহং ও বিশ্বরূপই প্রকাশ করিয়াছে। কনক যদি হয় অধিকতর বাস্তব, কুসুম তবে বৃহত্তর বাস্তব। প্রেমজীবনে দুই বাস্তব রূপই প্রণিধানযোগ্য। সর্বজীবনগত প্রেমের দৃষ্টিতে এই দুই রূপই জীবনগত সত্য। দর্শনে, কাব্যে, নাট্যে রবীন্দ্রনাথ এই তত্ত্বসত্যই প্রকাশ করিয়াছেন—গল্পে এই তত্ত্বসত্যেরই শিল্প-রূপ দেখিতেছি। রবীন্দ্রপ্রেম যে বিশেষ কোনো দর্শনশাখার তত্ত্বসংস্কারে আচ্ছন্ন নহে, পরন্তু তাহা সর্বজগদ্‌গত ও সর্বজীবনগত, এ-কথা আমি ইতঃপূর্বে 'কাব্য-মানসে' স্পষ্ট করিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছি। গল্প ও উপন্যাসে এই সর্বজীবনগত প্রেমের কোনো না কোনো রূপ বিকীরিত হইয়াছে। এই কথাটি যাঁহারা বুঝিবেন, রবীন্দ্ররচনাবলীর অখণ্ড তাৎপর্য বা ঐক্যতত্ত্ব উপলব্ধির পথে তাঁহাদের অবশ্যই কোনো বাধা থাকিবে না।

রবীন্দ্রনাথের প্রেমবোধের মধ্যে কোনোরূপ সংস্কার নাই বলিয়া প্রেমচিত্রের বৈচিত্র্য-চিত্রণে বিশ্বসাহিত্যক্ষেত্রে তিনি দ্বিতীয়রহিত বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না। রবীন্দ্রপ্রেমের সর্বজীবনগত প্রকাশতত্ত্বটি ধারণার মধ্যে না আনিয়া যাঁহারা বিশেষ কোনো দৃষ্টিকোণ হইতে রবীন্দ্রপ্রেমকে বিচার করিতে যান, তাঁহারা ভুলই করেন। দার্শনিক

রাধাকৃষ্ণন প্রমুখ মনীষিবর্গ রবীন্দ্রপ্রেমের মধ্যে শুদ্ধমাত্র ভগবতধর্মিতা লক্ষ্য করিয়া একদেশদর্শিতারই পরিচয় দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রেম সর্বজগদ্‌গত স্পর্শানুভূ প্রেম না হইয়া যদি যৌনবোধবিহীন গতানুগতিক আধ্যাত্মিক প্রেমই মাত্র হইত, তবে তাহার পক্ষে মানবহৃদয়ের বিচিত্র হৃদয়াবেগ লইয়া সাহিত্যলীলা সম্ভবই হইত না। অবশ্য এ-কথা সত্য, পূর্ণপ্রেম অর্থাৎ মনুষ্যত্বের পূর্ণ আদর্শটির দিকে তাঁহার অহরহঃ দৃষ্টি ছিল বলিয়া ক্ষুব্ধক্ষুণ্ণ মানবসমাজের অহংমত্ত জীবনকেই তিনি চরম সত্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই। অমানুষ এই মানবসমাজেও মানুষের মত মানুষ আছে; নিজের ক্ষতি করিয়া প্রসন্নমনে তাহারা সরিয়া যায়; স্বার্থের সুখ অপেক্ষা পরার্থের আনন্দে তাহাদের জীবন থাকে সচেতন। মনঃসাধনার নিতান্ত নিম্নস্তরে থাকি বলিয়া ইহাদের আমরা পরিচিত জন মনে করি না; অনেকসময় ইহাদের পৃথিবীর মানুষ বলিতেও যেন দ্বিধা জন্মে। কিন্তু তাই বলিয়া ইহারা অসত্য নহে, অবাস্তব নহে। বাস্তব পৃথিবীতে পূর্ণ প্রেমের প্রকাশ সম্ভব না হইলেও পূর্ণের আভাস যাহাদের চরিত্র হইতে পাওয়া সম্ভব, তাহাদের মধ্যে অনেককেই রবীন্দ্রনাথের গল্পে চিত্রিত নায়ক নায়িকার মধ্যে দেখিয়াছি। রবীন্দ্রকল্পিত একাধিক গল্প-চরিত্রে সেই পূর্ণ, অর্থাৎ মানবিক মাহাত্ম্যবোধের আনন্দাভাসটি, কখনও ত্যাগের মধ্য দিয়া, কখনও বিচ্ছেদের মধ্য দিয়া, কখনও শান্ত সেবা ও দাক্ষিণ্যের মধ্য দিয়া, আত্ম-প্রকাশ করিয়া গেছে।

‘একটি সামান্য গ্রাম্য-বালিকার করুণ মুখচ্ছবি’ কেমন করিয়া এবং কী গুণে ‘এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করে’’ “পোস্টমাস্টার” নামক গল্পে তাহার ইঙ্গিত আছে; ছাত্রের পাছে অমঙ্গল হয়, পাছে তাহার উন্নতির পথে ঘটে অন্তরায়—এই ভয়ে দরিদ্র শিক্ষক কোন্ শক্তি বলে ছাত্রের সমস্ত অপরাধ মাথায় তুলিয়া লইলেন, মানসম্ভ্রম খোয়াইলেন, জীবন পর্যন্ত দিলেন—তবু ছাত্রের বিরুদ্ধে একটি কথাও জনসমক্ষে প্রকাশ করিলেন না, “মাষ্টার মশাই” নামক গল্পে তাহার সংকেত পাইয়াছি; পিতা হইয়াও পুত্র রচিত জাল উইলের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে কোন্ শক্তিতে এতটুকু দ্বিধা হয় না, অথচ সাক্ষ্য দিবার পরই পুত্রের দুঃখ-দুর্দশার কথা স্মরণ করিয়া কেন পিতা মূর্ছিত হইয়া পড়েন, “রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা”য় তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রেম হৃদয়-বিস্তৃতির আনন্দ-বিজ্ঞান—মনুষ্যত্ব বিকাশের ইহা সহজ ঘোষণা। ইহারি প্রভাবে রাইচরণ আপন সন্তানের মধ্যে তদীয় প্রভুর অপমৃত পুত্রটিকে খুঁজিয়া বাহির করে, অনন্ত ক্লেশ স্বীকার করিয়া পুত্রটিকে মানুষ করিয়া প্রভুর হাতে তুলিয়া দেয়—তাহার পর চোর অপবাদের দুরূহ লজ্জা ও অবমানের বোঝা শিরে লইয়া যাত্রা করে নিরুদ্দেশের পথে (“খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন”); আরাকানরাজ দীনের ছদ্মবেশে ইহারি প্রভাবে ধীবরের ঘরে ভৃত্যের কার্য করে, আবার প্রণয়িনীর

পোষ্ট মাষ্টার ও অন্যান্য গল্প

শাণিত ছুরিকার অগ্রভাগে অকুতোভয়ে বুক পাতিয়া পুলকের হাসি হাসিতে থাকে (দালিয়া); দুঃখ হউক, ক্ষতি হউক, প্রেম যেখানে সত্য, মৃত্যুভয়, বৈধব্যভয়, অর্থকষ্ট, —কিছুই সেখানে সত্য নয় ("চোরাইধন"); ব্রাহ্মণপুত্র হেমন্ত কায়স্থ কন্যা কুসুমকে কেন যে ত্যাগ করিল না, পিতা হরিহরের রোষদীপ্ত তিরস্কার সত্ত্বেও না, প্রেমের স্বরূপ বুঝিলে এ রহস্য আর জটিল ঠেকে না ("ত্যাগ"); প্রেমই "অপরাজিতা"র জয়মাল্য লাভের অধিকারী; অন্ধ অহংকার, অজ্ঞান অহমিকা, বিমূঢ় পাণ্ডিত্যাভিমান বস্তুজগতের ক্ষুদ্র বুদ্ধিকে মুগ্ধ করিতে পারে, কিন্তু সহজসুন্দর আনন্দ প্রেম বস্তুপৃথিবীর নিকট পরাজয়ের অপমান লাভ করিলেও হৃদয়জগতে পায় অপরাজিতার মাল্যমর্যাদা ("জয়-পরাজয়"); এই প্রেমেরি উপচীয়মান এক বিশেষ রূপলাবণ্য দেখিবেন "কাবুলিওয়ালা"র পিতৃহৃদয়ের স্নেহকারুণ্যে, উমার "খাতায়" লেখা নানা ট্যারাব্যাঁকা কথাকাকলির ছন্দো-ঝংকারে; "সুভার" জলকুমারী হইবার কল্পবাসনায়; শিমূলগাছটির প্রতি "বলাই"-এর মোহানুরাগে; "বোষ্টমীর" সংসার ত্যাগ করার আনন্দে; অনিলার প্রলোভন জয়ের সংগ্রামে ("পয়লা নম্বর"); মৃণালের মীরাবাঈ হইবার বৈরাগ্যে ("স্ত্রীর পত্র"); মেথরের প্রতি গিরীন্দ্রের নিষ্ফল সহানুভূতিতে ("সংস্কার"); শশিভূষণের মৌন মার্জনায় ("দান প্রতিদান")।

এক প্রেম রূপে রূপে বহু রূপে বহুধা বিচিত্র। সংসারে এই প্রেম যে সর্বত্র জয় লাভ করিয়া থাকে, তাহা নহে, জীবনে এই প্রেম যে লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত হয় না, তাহাও নহে। সাংসারিক বহুবিধ তুচ্ছতা, বহু লোভ, বহু ঈর্ষা মলিনায়িত করে প্রেমের মহিমা। "দেনা পাওনা"র হিসাবী বুদ্ধির মোহে মানুষ কতই না লজ্জাহীন মত্ততা প্রকাশ করে। কত "কল্যাণী" চিরকুমারীর জীবন যাপন করিয়া ভাবী স্বামীকুলের নিকট "অপরিচিতা"ই রহিয়া যায়; কত "হৈমন্তী" আত্মহত্যা করে স্বামী-সমাজের নিত্য নির্যাতনে; কত মোক্ষদা "স্বর্ণমৃগের" আশায় প্রাণপ্রিয়ের উপর করে উৎপীড়ন; কত ধর্মাত্মা বিনোদ-চন্দ্রের ছদ্মবেশে কুলকামিনীদের টানিয়া আনে অধর্মের পথে ("বিচারক"); কত গোবিন্দ পয়সা করার সাধনায় বালক চুণীদের উপর করে অন্যায় অত্যাচার—বলি দিতে চায় হৃদয়ের সহজ সত্যটিকে (চিত্রকর); কত পিশাচ যজ্ঞনাথ তাহার অর্থসম্পদাদি যক্ষের হস্তে ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইবার কুসংস্কারে লোমহর্ষক কত অমানুষিক উপায়ই না অবলম্বন করে ("সম্পত্তি সমর্পণ")।

খণ্ড ক্ষুদ্র বাস্তবজগতে প্রেমের আদর্শটি সহজ ও স্বাভাবিকভাবে সমাজমানসের মধ্য দিয়া কতটুকু প্রকাশ পাইতে পারে, কতভাবে বিড়ম্বিত হইয়া থাকে, অজস্র বিড়ম্বনা সত্ত্বেও কোথায় কী ভাবে প্রকাশের পথে অগ্রসর হইয়া যায়, অগ্রসর হইতে না পারিলে

কত ক্ষুদ্রতা, কত নীচতার মধ্যে আধৃত রহিয়া গ্রহণ করে সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ রূপ—রসের ও শিল্পের যাবতীয় মর্যাদা রক্ষা করিয়াই রবীন্দ্রনাথ গল্পোপন্যাসের মধ্যে তাহা আশ্চর্য নৈপুণ্যে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। অনেক ক্ষেত্রে নিতান্ত বাস্তববাদীর মতই সমাজের দোষ-ত্রুটি ও লোভকে চিত্রিত করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন। কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, প্রেমমানসের একটি প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ সামাজিক লোভের, স্বার্থের ও নীচতার উপর কোমলকান্ত একটি করুণ ছায়া ফেলিয়া সেগুলিকে বিশেষ এক রসরূপের আলোকে অপরূপ করিয়া তুলিয়াছে। লেখকের 'মন' সর্বদা ও সর্বথা উচ্চপথধর্মী প্রেমযাত্রী বলিয়া সমাজমানসের তুচ্ছতম বাস্তব হীনতার চিত্রগুলিও এমন ভঙ্গীতে তিনি আঁকিয়াছেন, যাহা দেখিবামাত্র রসাবিষ্ট প্রেমমানস সমাজহীনতার বন্ধনজাল ছিন্ন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। বক্তব্যটি স্পষ্ট করিবার জন্য "দেনা-পাওনা", "হৈমন্তী", "হালদার গোষ্ঠী", "স্বর্ণমৃগ", "অনধিকার প্রবেশ", "সুভা", "বিচারক" প্রভৃতি গল্পগুলির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছি।

'দেনা-পাওনা'

সমাজজীবনের অন্তরে লজ্জাহীন যে নীচতা আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে, "দেনা-পাওনায়" তাহার ছবি স্পষ্টভাবে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। বাংলার নববধূ নিরুপমার মর্মন্তুদ দুঃখ ও মৃত্যু এবং পিতা রামসুন্দরের দারিদ্র্য ও অর্থাভাবজনিত অসহায়তা এবং সর্বোপরি রায়বাহাদুর পরিবারের অর্থগৃধ্নুতা ও হৃদয়হীনতা বড় মর্মস্পর্শী ভাষাতেই লেখক বর্ণনা করিয়াছেন। গল্পে বর্ণিত মৃত্যু, দারিদ্র্য, নৈরাশ্য ও নীচতার অন্তরালে প্রেমমানসের যে বিদ্রূপ প্রবাহিত হইতেছে, তাহারই তরঙ্গ-ভঙ্গে আন্দোলিত হইতে হইতে পাঠকচিত্ত কি মনুষ্যত্ববোধের স্বর্গতটে গিয়া পৌঁছায় না? অসহায় রামসুন্দর এবং নিপীড়িত নিরুপমার জন্য পাঠকের হৃদয় কি অকথিত বেদনায় আন্দোলিয়া ওঠে না?

'হৈমন্তী'

লোকধর্মের চাপে হৃদয়ধর্ম কেমন করিয়া নিষ্পিষ্ট হইয়া যায়—"হৈমন্তী" নামক গল্পে কবি সুকৌশলে তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই গল্পে সমাজের গলদগুলি যেন চোখে আঙুল দিয়াই দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু গলদের বিরুদ্ধে রুক্ষ বিদ্রোহিতা প্রকাশ করিয়া কুত্রাপি শ্লেষোপহাসের রসটুকু মাটি করা হয় নাই। প্রেম নানাভাবেই নিষ্পিষ্ট হইতেছে, মনুষ্যত্ব ও সহজ সৌজন্যের বালাই নাই এই সমাজে। "দেনা-পাওনার" ন্যায় "হৈমন্তী" গল্পেও দেখানো হইয়াছে—অর্থ ই সামর্থ্য, অর্থ ই সব। লোকধর্মই আসল, সত্যধর্মের মূল্য নাই সমাজে। এই সমস্ত গল্পের মধ্য দিয়া কবি সমাজমানসে মনুষ্যত্ববোধের বেদনাটি সঞ্চারিত করিবার অপরোক্ষ চেষ্টা করিয়াছেন।

নির্যাতিতা নিরুপমা ও অশ্রুমতী হৈমন্তীর অসহায় জীবন দেখিয়া যে দুঃখ, যে বেদনা হৃদয়াবেগের যে জ্বালাময় অভিমান অনুভব করি, প্রেমবোধের তাহাই তো সূচনা।

"হালদার গোষ্ঠী" গল্পটি একটু জটিল। প্রেম ও সংস্কারের দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের ইতিকথায় মুখর এই কাহিনী। কাহিনীটিতে দেখানো হইয়াছে বাঙালী বনিয়াদী সমাজের পরিবার-গত সংস্কার বড়ই প্রবল। চিরাচরিতের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো বড়ই কঠিন। পুরাতন পন্থা, পুরাতন বিধিনিষেধ, পুরাতন রীতিনীতি মানিয়াই চলিতে হয়, উপায় নাই। বনোয়ারিলাল পরিবারগত সংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে গিয়া সর্বস্বান্ত হইল—লক্ষপতির পুত্র হইয়াও চাকুরীর সন্ধানে বাহির হইল। সংসারে কেইই, এমন কি স্ত্রীও তাহাকে আপন ভাবিল না, তাহার মানবতার মহত্ত্ববোধটি কুত্রাপি সম্মানিত হইল না।

'হালদার গোষ্ঠী'

কিন্তু কেন হইল না? বনোয়ারির মানবতার মহত্ত্বে অর্থাৎ দরিদ্র মধুকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার প্রয়াসে অহংবোধ ছিল প্রবল, নীলকণ্ঠের উপর ঈর্ষা ছিল অন্তহীন। এই ঈর্ষার প্রাবল্যেই সে তাহার প্রাণপ্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে একবার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিতেও উদ্যত হইল। পরে যখন এই অহংমত্ততা হইতে ত্রাণ পাইল, জমিদারীর বিষয়-ভোগে তাহার এতটুকু রুচি রহিল না। হেলায় সমস্ত ত্যাগ করিয়া বিষয়মুক্তির সহজ আবেগে চাকুরীর খোঁজে সে গেল চলিয়া।

বনোয়ারির হৃদয় মহৎ—প্রেম ছিল তাহার হৃদয়ে। কিন্তু তাহার এই প্রেমকে বুঝিবার বা মর্যাদা দিবার মানুষ ছিল না সমাজে। অপরপক্ষে বুদ্ধি দ্বারা প্রেমকে পরিচালিত করার শক্তি ছিল না বনোয়ারির। সাংসারিক বিষয় ও ব্যাপারগুলিকে সহজভাবে সে গ্রহণ করিত না। প্রেমের মধ্যে শুদ্ধমাত্র আবেগ রহিলে চলে না—প্রেমকে সহজ করিবার জন্য শেষ সাধনার অর্থাৎ প্রেমোচিত জ্ঞান ও কর্ম সাধনারও প্রয়োজন। বনোয়ারির মধ্যে এ সব ছিল না। হরিদাসের উপর প্রেম ছিল বলিয়া সে ঈর্ষার দায় হইতে রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু অহংমত্ত প্রভুত্ববোধের প্রাবল্যে সে প্রেমের মাধুর্যটিকে মোহনরূপে প্রকাশ করিতে পারিল না।

আমার রচনার এই ধারা অনুসরণ করিতে গিয়া যদি কেহ মনে করেন যে, রবীন্দ্রনাথের গল্প সাহিত্যে প্রেম সম্বন্ধে কেবল নীতি উপদেশই বুঝি আছে, তবে তিনি অবশ্যই ভুল করিবেন! প্রেমনীতি ও প্রেমতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে বসিয়াছি বলিয়া—তত্ত্বের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রগল্পাবলীর এই প্রেমরূপটির কথাই আমাকে বলিতে হইতেছে। রবীন্দ্রনাথের গল্প-সাহিত্যের সহিত যাঁহার মুখোমুখী পরিচয় আছে তিনিই জানেন, উপদেশ নহে, নীতি নহে, শিল্পরসই তাঁহার গল্প-সাহিত্যের প্রাণ। কবির এক একটি গল্প শিল্পবিচারে অমূল্য

সম্পদ। তবে প্রেম ও প্রেম-মানসই এই শিল্পরসের প্রথম ও প্রধান অবলম্বন বলিয়া তত্ত্ববিচারে প্রেমতত্ত্বের কথাই আসিয়া পড়িতেছে। আমার এই আলোচনায় রবীন্দ্র-রচনার ঐক্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছি—কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, কবির রচনাবলীর মধ্যে স্পষ্টতঃই বুঝি একই কথা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলা হইয়াছে। মর্মতঃ এক জীবনতত্ত্বের ও হৃদয়তত্ত্বের অর্থাৎ প্রেমতত্ত্বের কথা বলা হইলেও তাঁহার গল্প-সাহিত্য বিচিত্র চিত্তের চিত্রশালা। প্রেমের রূপ এক হইয়াও বিচিত্র; রবীন্দ্রনাথের গল্পে অদ্বিতীয় সেই প্রেমই বিচিত্ররূপে প্রকাশ পাইয়াছে। বিচিত্রের মধ্যে যাহা পাইবেন, যাহা দেখিবেন, তাহা হইতে অখণ্ড তাৎপর্যের মহিমাটি কিভাবে ধরিতে হইবে, আমি কেবলমাত্র তাহারই ইঙ্গিত দিতেছি। বলাই বোধহয় বাহুল্য, আমার এই আলোচনা রবীন্দ্র-গল্পসাহিত্যের শিল্প-বিচার নহে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে, নাট্যে, গল্পে, উপন্যাসে—সর্বত্র প্রেমই কথার কথা, সার কথা। অহং-এর বিকৃতির ফলে অথবা সমাজ সংস্কারের নিষ্পেষণে প্রেম যেখানে নিষ্পিষ্ট হইতেছে বলিয়া দেখানো হইয়াছে, সেখানেও লেখকের লেখার গুণে পাঠক-অন্তরে প্রেমবেদনার তরঙ্গই আন্দোলিত হয়। এই হিসাবে পরাজিত প্রেমও পাঠকের মনোমন্দিরে অপরাজেয় বিগ্রহরূপে বেদনার পূজা পাইতে থাকে। এই মানসপূজার ফল কী? পাঠকের হৃদয়-বিস্তৃতি, প্রেমজীবনের সত্যোপলব্ধি, মানবিক মাহাত্ম্যবোধের আনন্দানুরাগ। "হালদার গোষ্ঠী"তে বনোয়ারির স্থান হইল না, কিন্তু যে মুহূর্তে সে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া চাকুরীর সন্ধানে চলিয়া গেল, সেই মুহূর্তেই সে পাঠক অন্তরের প্রেমবেদনায় স্থায়ী একটি আসন করিয়া লইল। "স্বর্ণমৃগ" নামক গল্পের অসহায় নায়ক বৈদ্যনাথও সংসারে স্থান পায় নাই, কিন্তু রসিক পাঠকের প্রেমময় আনন্দ-মন্দিরে অক্লেশেই স্থান করিয়া লইয়াছে।

'স্বর্ণমৃগ'

"স্বর্ণমৃগ" নামক গল্পে নায়ক বৈদ্যনাথ অর্থোপার্জনে একপ্রকার উদাসীনই ছিল। অকাজের কাজ লইয়া সে দিবারাত্র রহিত ব্যাপৃত; ছড়ি চাঁচিতে, ছিপ বানাইতে, খেলনা প্রস্তুত করিতে সে ছিল পটু। তবে বলিয়া রাখা ভালো, এই পটুত্ব সে অর্থোপার্জনের কাজে খাটাইত না, ইহা ছিল তাহার খেয়াল, তাহার খেলা, তাহার আনন্দবিলাস। এদিকে স্ত্রী মোক্ষদাসুন্দরী স্বামীকে অর্থোপার্জনের কাজে নিয়োজিত করিবার অভিপ্রায়ে দিবারাত্র তিরস্কার করিতে শুরু করিল। তখন বৈদ্যনাথ কী অসহায় ভাবেই না স্বর্ণমৃগের পশ্চাতে ঘুরিল। রাতারাতি বড় মানুষ হইবার আশায় সে এক সন্ন্যাসীর আশ্রয় লইল, স্বর্ণপ্রাপ্তির আশায় মাটি খুঁড়িয়া হায়রান হইল—কিন্তু হায় স্বর্ণমৃগ, কল্পনার মায়ালোক হইতে বাস্তবে আবির্ভূত হইয়া মোক্ষদার তিরস্কার হইতে বৈদ্যনাথকে রক্ষা করিল না। নিষ্ফল হইয়া বৈদ্যনাথ যখন

মোক্ষদার কাছে ফিরিল—মোক্ষদা এতটুকু করুণা প্রদর্শন করিল না। সারারাত্রি গৃহের বাহিরে বসিয়া বসিয়া অসহায় বৈদ্যনাথ সংসার ত্যাগ করিয়া শেষে নিরুদ্দেশ হইয়া গেল।

বৈদ্যনাথ তাহার সন্তানদের বড়ই ভালোবাসিত। পূজার সময় ছেলেদের সে কাপড়-জামা কিনিয়া দিতে পারে নাই, কিন্তু খেলনা গড়িয়া সে শিশুসন্তানদের খুশি করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু সমাজ-সংসারে ইহার মূল্য বা মর্যাদা কতটুকু? তাহার ভালোমানুষী, তাহার পিতৃহৃদয়ের করুণ অসহায় স্নেহ, তাহার বালকোচিত হাস্যকর নির্বুদ্ধিতা—চতুর ও অর্থলোলুপ এই সংসারে সামান্য এতটুকু ঠাঁই দিবার পক্ষে তো সহায় হইল না। গল্পটির মর্মমূলে বাহ্যতঃ হাস্য ও উপহাস্যের ছদ্মবেশে করুণাসুন্দর যে মনের লীলা প্রকাশ পাইয়াছে, পাঠকচিত্তে তাহার স্পর্শমাত্রে হৃদয় আলোড়িয়া, আন্দোলিয়া ওঠে।

"অনধিকার প্রবেশ" নামক গল্পটির উপহাসটুকুর মধ্যে লেখকের প্রেমমানসের স্বরূপতত্ত্ব নিহিত আছে।

আমাদের ধর্মসংস্কারে ছুঁৎমার্গ একটি রোগবিশেষ। এই রোগ ছিল 'তীক্ষ্ণনাসা' জয়কালীর। সে বিগ্রহ পূজা করিত, মন্দির ও ঠাকুর লইয়া নিয়তই রহিত ব্যস্ত। মন্দিরের ত্রিসীমানায় কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিত না পাছে মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট হয়। লেখক বলিয়াছেন—এই দীর্ঘাকার কঠিন বিধবাটি বিধাতার কঠোর নিয়মদণ্ডের ন্যায় পল্লীর মস্তকের উপর উদ্যত ছিল। কেহ তাহাকে ভালোবাসিতে, অথবা অবহেলা করিতে সাহস করিত না। একদা তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র নলিন মাধবীতলায় আসিয়া কুসুমচুরির অপরাধে ধরা পড়িল, বিস্তর শাস্তি পাইল, তাহার পর গৃহমধ্যে বন্দী হইয়া সমস্ত দিন কাঁদিতে রহিল। মাধবীতলার পবিত্রতা নষ্ট করার অপরাধে ক্ষুধায় বালকটার অন্ন জুটিল না, তৃষ্ণায় জুটিল না একবিন্দু জল। কিন্তু বিধাতার বুঝি মন টলিল। জয়কালীর এই ধর্মান্ধ নিষ্ঠুরতার প্রতিবাদে বিধাতা বুঝি এক কাণ্ড করিয়া বসিলেন। দেখা গেল, সেইদিন "একটা অত্যন্ত মলিন শূকর" ঐ মাধবীতলায় আসিয়া আশ্রয় লইল। সুপবিত্র নন্দনভূমিতে অকস্মাৎ এই বীভৎস ব্যাপার ঘটিল দেখিয়া জয়কালী প্রথমে ক্ষুব্ধ হইল। কিন্তু তাহার আরাধ্য দেবতাকে ঐ অসহায় প্রাণীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াই কিছুতেই তাহাকে হিংসার কাছে সমর্পণ করিল না।

'অনধিকার প্রবেশ'

"এই সামান্য ঘটনায় নিখিলজগতের সর্বজীবের মহাদেবতা পরম প্রসন্ন হইলেন কিন্তু ক্ষুদ্রপল্লীর সমাজনামধারী অতিক্ষুদ্র দেবতাটি নিরতিশয় সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।"

লেখকের এই প্রেমকরুণ মন্তব্যের উপর ব্যাখ্যামূলক কোনো নীরস উক্তি অবশ্যই নিষ্প্রয়োজন।

প্রয়োজনবোধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কোনো কোনো গল্পে মন্তব্য করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু এ কাজটা প্রায়ই পাঠককে দিয়া করাইয়া লওয়া তাঁহার অভিপ্রায়। "বিচারক" নামক

বিখ্যাত গল্পটিতেও একটি শিল্পোচিত সুন্দর মন্তব্য আছে, কিন্তু "সুভা" নামক গল্পটির যে স্থলে ক্ষুদ্র একটি মন্তব্য থাকিলে পাঠক সাধারণের হৃদয়বেদনার শান্তি হইত—সে স্থলে ইচ্ছা করিয়াই তিনি নীরব রহিয়া গেছেন।

'সুভা'

মন্তব্য একপ্রকার প্রচারকার্য সন্দেহ নাই। কিন্তু শিল্পের প্রয়োজনে মন্তব্য শিল্প-সৌন্দর্যের মহিমাই বাড়াইয়া দেয়। মন্তব্য প্রয়োগের রুচি ও রীতিতত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত না হইলে অনেকক্ষেত্রে অরসিক মন্তব্য গল্প-শিল্পের রসটি অর্থাৎ আসল প্রাণশক্তিটিই মাটি করিয়া ফেলে। "সুভা" গল্পে বিবাহের পর অসহায় বোবা সুভাটার কী হইল—কিংবা, তাহার পিতামাতা তাহার সম্বন্ধে আর কী-ই বা করিতে পারিত—এ বিষয়ে লেখকের কিছু মন্তব্য থাকিলে সাধারণ পাঠক হয়ত খুশি হইতেন, কিন্তু গল্পটির সৌন্দর্য একেবারেই নষ্ট হইয়া যাইত।

মূক বালিকা সুভা বড় হইলে তাহার পিতামাতা কোনো প্রকারে তাহাকে পাত্রস্থ করিয়া সমাজের নিন্দাবাদ হইতে বাঁচিলেন। সুভার স্বামী কিছুদিনের মধ্যেই আর একটি বিবাহ করিয়া গৃহে ফিরিল। ইহার পর সুভার কী হইল? লেখক কোনোরূপ মন্তব্য না করিয়া নীরব রহিলেন।

বোবা মেয়েটাকে কি গৃহে এতটুকু জায়গা দেওয়া যাইত না? মেয়ে হইয়া জন্মিয়াছে বলিয়া হাত-পা বাঁধিয়া তাহাকে কি জলে বিসর্জন দিতে হইবে? সর্বশী ও পাঙ্গুলীর সহিত খেলা করিয়া, পুকুরপাড়ে প্রতাপের পাশে বসিয়া বসিয়া জলকুমারীর স্বপ্ন দেখিয়া, একাকিনী নির্জন নদীতীরে নাচিয়া নাচিয়া সেই যে বোবা মেয়েটা বাড়িয়া উঠিতেছিল, সমাজ কেন তাহার প্রতি নজর দিল, কেন তাহার বিবাহ দিতেই হইল? স্বামীগৃহে বিনা মাহিনায় দাসীবৃত্তি করিতে গেল সরলা সুভা; অহোরাত্র পরিশ্রম করিবে, সতীনের মুখ শুনিবে কিন্তু মুখে তাহার কথা থাকিবে না; মনে যৌবন কাঁদিবে, অথচ চোখের সামনে দেখিবে অন্য এক রমণীকে লইয়া স্বামী তাহার হাস্যবিলাসে রহিয়াছে আনন্দরত; বুক ফাটিবে, দেহ ভাঙিবে, মুখ তবু খুলিবে না কোনোদিন। অসহায়া এই বোবাটার উপর মানুষের কেন এই অভিশাপ? মেয়ে বলিয়া? বাঙালী সমাজের মেয়ে বলিয়া? লেখক এসকল প্রশ্নের কোনো জবাবই দেন নাই। এসকল প্রশ্ন পাঠকের চিত্তে সহজাবেগেই জাগিতেছে বলিয়া লেখক বলিবেন, তাঁহার গল্পটির অভিপ্রায় রসপ্রকাশের মধ্য দিয়াই পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে।

"বিচারক" নামক বিখ্যাত গল্পটি এইবার স্মরণ করুন।

'বিচারক' একজন পতিতার দুঃখময় কাহিনী। জীবনে অজস্র যন্ত্রণা এবং প্রভূত

প্রতারণায় প্রপীড়িত হইয়া একদা সে মরিবার জন্য শিশুপুত্রসহ একটি কূপমধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিল। কূপ হইতে লোকে তাহাকে ও তাহার ছেলেটাকে টানিয়া তুলিল, কিন্তু ছেলেটা তখন মারা গিয়াছে। শিশুহত্যার অপরাধে ধর্মজ্ঞানী প্রবীণ বিচারক তাহাকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন।

'বিচারক'

দিন গেল। একদা বিচারক মহোদয় জেলের মধ্যে মৃত্যুদণ্ড-দণ্ডিতা পাপীয়সীটার চিত্তের কোনো পরিবর্তন হইয়াছে কিনা দেখিতে গেলেন। বিচারক দেখিলেন—দণ্ডিতা নারী একজন সেপাই-এর সহিত কলহ জুড়িয়াছে। সেপাই তাহার স্বর্ণাঙ্গুরীয়টি কাড়িয়া লইয়াছে বলিয়া এই কলহ। দুইদিন পরেই যাহার মৃত্যু হইবে—সামান্য একটি অঙ্গুরীয়ের উপর এখনও তাহার এমনি আসক্তি দেখিয়া বিচারক মহাশয়ের অনাসক্ত হৃদয়টি ঘৃণায় ভরিয়া গেল। তিনি সেপাই-এর হাত হইতে অঙ্গুরীয়টি লইলেন।

কেহ জানিল না, শুদ্ধমাত্র বিচারক-মহোদয়ই জানিয়া রহিলেন যে, এই অঙ্গুরীয়টি যৌবনের কোনো এক মত্তসময়ে এই দণ্ডিতা নারীকেই তিনি প্রেমোপহার দিয়াছিলেন। বিগত দিনের সেই প্রেমেতিহাসের কিছু চিত্র এই গল্পে আছে। যৌবনের প্রভাতে এই দণ্ডিতা নারী ধর্মজ্ঞানী এই বিচারকের প্ররোচনাতেই সমাজ ও গৃহ ত্যাগ করিয়াছিল। আজ বিচারক তাহাকে কলঙ্কিতা জানিয়া ঘৃণা করিতেছেন, অপরাধিনী জানিয়া দান করিতেছেন মৃত্যুদণ্ড, কিন্তু অসহায়া, সর্বস্বহারা এই কলঙ্কিনী রমণী যৌবনের সেই প্রতারণাপূর্ণ পাপস্মৃতিকেই প্রেমের মর্যাদা দিয়াছে, অর্থাৎ মহার্ঘ সম্পদ জ্ঞানে তাহাকে হৃদয়ের মণি-মঞ্জুষায় আজিও সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে। মৃত্যু আসন্ন, তথাপি সে তাই অঙ্গুরীয়টি ছাড়িতে চাহে নাই।

> "মোহিত আংটি হইতে মুখ তুলিয়া একবার ক্ষীরোদার মুখের দিকে ভালো করিয়া চাহিলেন। চব্বিশ বৎসর পূর্বেকার আর একটি অশ্রুসজল প্রীতিসুকোমল সলজ্জশঙ্কিত মুখ মনে পড়িল: সে মুখের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে।
>
> "মোহিত আর একবার সোনার আংটির দিকে চাহিলেন এবং তাহার পরে যখন ধীরে ধীরে মুখ তুলিলেন তখন তাঁহার সম্মুখে কলঙ্কিনী পতিতা রমণী একটি ক্ষুদ্র স্বর্ণাঙ্গুরীয়কের উজ্জ্বল প্রভায় স্বর্ণময়ী দেবী প্রতিমার মতো উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।"

এই মন্তব্যের কি প্রয়োজন ছিল? অবশ্যই ছিল। শিল্পের সৌন্দর্যবিধানেই এই মন্তব্যের প্রয়োজন। বিচারকের পুণ্য বিচারে দণ্ডিতা রমণী আজ না হয় কাল মরিবে, জ্বালা তাহার যাইবে জুড়াইয়া। কিন্তু এই যে 'অশ্রুসজল' অক্ষয় প্রেম, পৃথিবী-সংসারে বাসা বাঁধিবার এতটুকু ঠাঁই কি পাইবে না? ধর্মাত্মার দল ইহাকে দণ্ড দিতে পারে, কিন্তু স্বর্ণময়ী দেবীপ্রতিমার মত নিষ্কলঙ্ক এই প্রেম চকিতে একবার উদ্ভাসিত হইয়া

ধর্মধ্বজীদের গোপন প্রতারণার অন্ধ কুয়াসা কি ভেদ করিবে না? অথবা এই কথাই কি সত্য যে, যে প্রেমের অমর্যাদা করিয়া আজ তুমি নিপ্প্রেম সাধু বিচারক সাজিয়াছ সেই প্রেমের তীক্ষ্ণ জ্যোতি ক্ষণতরে তোমার নিরুদ্ধ অতীতকে বিদীর্ণ করিয়া দিয়া অন্তরে যখন প্রবেশ করিল, আর তখন তোমার শান্তি নাই, স্বস্তি নাই—কৃতকর্মের অন্তহীন দুঃখদহনে প্রেমবহ্নি হইয়া তোমাকে জ্বলিতে হইবে। দণ্ড প্রেমমোহিতা পতিতার নহে, দণ্ড পাইয়া সে তো বাঁচিয়া গেল। দণ্ড প্রেমপ্রতারক ধর্মমোহিত এই বিচারক মোহিতচন্দ্রের—কেন না স্বর্ণাঙ্গুরীয়ের উজ্জ্বল প্রভায় স্বর্ণময়ী দেবীপ্রতিমার অক্ষয় মহিমা সে আজ লক্ষ্য করিয়া ফেলিয়াছে।

সমাজমানসের চিরাচরিত অন্ধ চিত্তদৈন্যের বহু বিচিত্র কাহিনী রবীন্দ্রনাথের গল্প-সাহিত্যে পাইয়াছি। রবীন্দ্রনাথ কবি বটেন, কবিত্বের কল্পনা ও স্বপ্ন তাঁহার গল্পোপন্যাসগুলিকে লোকায়ত সীমার অতীতে প্রায়শঃই টানিয়া লয় সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার গল্প-সাহিত্যে কল্পগভীর উন্নতচরিত্রেরই চিত্র কেবল যে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা নহে। বারংবার বলিয়াছি—রবীন্দ্রনাথের প্রেমগত মন জীবনের ও সমাজের সর্বত্র অনাসক্তভাবেই গতায়াত করে। বিশেষ কোনো চিত্তাবেগে বা তত্ত্বসংস্কারে তিনি লিপ্ত নহেন বলিয়াই সর্বজীবনগত বিশ্বকে দর্শন করা বা আস্বাদন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে। তাঁহার দর্শনের তত্ত্বটাও বলিয়াছি এই- প্রেমজীবনে অহংজীবন যেমন সত্য, বিশ্বজীবন তেমনি সত্য। রবীন্দ্রনাথের মানবচিত্রে তথা প্রেমের চিত্রে বিশ্বগত চিরন্তন মানব ও মানবসমাজ যেমন অঙ্কিত হইয়াছে, অহংগত মানব ও মানবসমাজও তেমনি অঙ্কিত হইয়াছে। বিবাহ করিয়াও কে বা কাহারা স্ত্রীর প্রতি যথাযথ কর্তব্য করিল না, না-করার ফলে স্ত্রীদের গোপন মনোজীবনে কীভাবে চাপল্য উৎসারিত হইল—"নষ্টনীড়", "স্ত্রীর পত্র" "পয়লা নম্বর", প্রভৃতি গল্পে তাহা ব্যাখ্যাত ও বিশ্লেষিত হইয়াছে; স্ত্রী থাকিতেও পুরুষ অন্য রমণীতে মন দিয়া কোন্ অন্তর্গূঢ় বেদনার সমস্যায় নিপতিত হইল, "নিশীথে" তাহার মর্মময়ী বর্ণনা আছে; স্ত্রীর অকৃত্রিম স্বামীভক্তির প্রতিদানে বিলাত-ফেরৎ স্বামীর দল স্ত্রীর প্রতি কী অপরূপ প্রেম প্রকাশ করিল "প্রায়শ্চিত্ত" ও "তপস্বিনী"তে তাহার নমুনা মেলে। মৃত্যুপথযাত্রী অসহায় স্বামীর সম্মুখে তরুণী পত্নীর হৃদয়হীন নিশ্চেষ্টতার মর্মস্পর্শী কাহিনী আছে "শেষের রাত্রি" নামক গল্পে। সমাজে যাহারা সাধু ও সত্যাচারী বলিয়া পরিচিত, লোকচক্ষের অন্তরালে তাহাদেরি জীবনে কৃত পাপ ও প্রতারণা সংঘটিত হইয়া থাকে, "বিচারকে" এবং কতক পরিমাণে "ভাইফোঁটা" গল্পে তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

'নিশীথে' ও অন্যান্য গল্প

সমাজমানসের নীচতার মর্মমূলে মানবিকতার আনন্দ সঞ্চার করাই রবীন্দ্র-গল্প-সাহিত্যের বিশেষত্ব। রবীন্দ্রচিত্রিত সমাজচিত্রের কলঙ্করেখাগুলি অনুধাবন করিতে করিতে রসোদ্বেজনার আনন্দপুলকেই চিত্তের রাজদ্বার খুলিয়া যায়; তুচ্ছ হইতে উচ্চমার্গে মনুষ্যত্বের মাহাত্ম্যবোধে হৃদয় বিপুল বেদনানন্দ অনুভব করে। রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে প্রশান্ত সেই প্রেমের অনুভাবটি ধ্রুবতারার মত অনির্বাণ রহে বলিয়াই তাঁহার দৃষ্টিতে ভালোমন্দ, তুচ্ছ উচ্চ সমস্তই একটি উচ্চতর জীবনের ইঙ্গিত হানিয়া যায়। অতি বড় তুচ্ছ স্বার্থপর হীন ঘটনার বিবৃতির অন্তর্দেশেও লক্ষ্য করিতে থাকি প্রাণসুন্দর একটি প্রেমমানসের স্বর্গচ্ছবি। ক্ষণে ক্ষণে অনুভব করি, যাহা আছি তাহা লইয়া সমাজে কোনোমতে চলিতেছি বটে, কিন্তু জীবনকে চালাইতে হইলে যাহা হইব—তাহারই জন্য উঠিতে হইবে, ছুটিতে হইবে, উদ্বুদ্ধ হইয়া বাঁচিতে হইবে। ভালো লাগাইয়া, মন মাতাইয়া, নবনব জীবন-কল্পনায় জাগ্রত করিয়া মানুষের বস্তুমানসকে রবীন্দ্রনাথ যে পথে টান দিয়াছেন, সে পথ এই প্রেমের পথ, মনুষ্যত্ব উদ্বোধনের আনন্দসুন্দর এই জীবনপথ। এই জীবনপথের প্রান্তে দাঁড়াইয়া আছে রাইচরণ, তাহার আপন পুত্রের মধ্যে প্রভুপুত্রের রূপরচনার সাধনা লইয়া; রামকানাই আছে প্রতারক পুত্রের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া; শৈলেন্দ্র আছে সম্পত্তির আসল উইলটি প্রত্যর্পণ করিয়া; কাবুলিওয়ালা আছে শিশুকন্যার স্মৃতিটি বক্ষে ধারণ করিয়া; মাস্টারমশাই আছে ছাত্রের মর্যাদা রক্ষায় সর্বস্বান্ত হইয়া; পোস্টমাস্টার আছে নগণ্য এক গ্রাম্যবালিকার ত্যাগদীপ্ত স্নেহস্মৃতির বেদনা বুকে ধরিয়া। প্রেমের আত্মপ্রকাশে এই সমস্ত চরিত্র বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। অধিকতর বাস্তবের দৃষ্টিতে ইহাদের নির্বোধ বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু জীবনের যে অংশে বৃহত্তর বাস্তবের মহিমা মানুষকে তুচ্ছ হইতে উচ্চে আকর্ষণ করে, সেই অংশে ইহাদের মূল্য ও মর্যাদা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। রবীন্দ্রদর্শনে মানব-এর যে কল্পচিত্র আপনি দেখিয়াছেন, তাহার যতটুকু প্রকাশ সমাজমানসে ও সমাজচিত্রে প্রকট হওয়া সম্ভব, এই সকল গল্প-নায়কের চরিত্রে তাহা ফুটিয়াছে।

বলিয়াছি, উচ্চজীবনের আদর্শে অর্থাৎ প্রেমের আদর্শের প্রতিই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি। কিন্তু তুচ্ছকেও তিনি চিত্র হিসাবে, দৃশ্য হিসাবে দেখিতে ভুলেন নাই, কেন না তুচ্ছও জীবন-বহির্ভূত ব্যাপার নহে। সর্বজীবনগত প্রেমের উপাসক দার্শনিক কবি রবীন্দ্রনাথের মন, তথা প্রেম ও প্রকৃতি, কতকটা "অতিথি" গল্পে বর্ণিত তারাপদর স্বভাবের মত। তারাপদ বন্ধনভীরু হরিণের মতও বটে, আবার সংগীতমুগ্ধ হইয়া বন্ধনের অন্তরস্থিত বিবিধ ব্যাপারগুলি দেখিবার অভিপ্রায়ে কৌতূহলীও বটে। সংসারের সহস্র 'তুচ্ছে' সে নামিয়া আসে, তুচ্ছের সৌন্দর্য ও সংগীতটুকু নিঃশেষে

'অতিথি'

পান করিয়া লয়; কিন্তু যখনি কোনো বিশেষ 'তুচ্ছ' বন্ধনের সীমায় তাহাকে টানিতে চাহে, সে উঠিয়া দাঁড়ায়—স্মিত সৌজন্যে বিদায় লইয়া যায় বন্ধনের মনোরমতা হইতে। সে ভালোবাসিয়াছে বিশ্বপ্রকৃতি, প্রকৃতির বিচিত্ররূপেই তাহার আনন্দ—এইজন্য বিশেষ কোনো একটি রূপের মোহবন্ধনে তাহাকে ধরিয়া রাখা সম্ভব নহে। প্রকৃতি তাহাকে নদী হইয়া সাঁতার দেওয়ায়, আকাশ হইয়া হাতছানি দেয়, মাঠ হইয়া ছোটাছুটি করায়, পাহাড় হইয়া গম্ভীর বিস্ময়ের স্বপ্ন দেখায়। তারাপদ নদীও চাহে, মাঠও চাহে, আকাশও দেখে, পাহাড়েও চড়ে। কিন্তু কোনোটিতেই লিপ্ত হইয়া থাকিতে পারে না। এক হইতে আরে ছুটিতে পাইলেই তাহার আনন্দ। প্রকৃতির এই লীলাচঞ্চল সহচরটিকে মানুষের সমাজ বাঁধিতে চাহিলে সে বন্ধন মানিবে কেন? বিচিত্রের কৌতূহলে সে নানাস্থানে, নানা ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা বেশিদিনের জন্য নহে। সে যাত্রাদলে ভিড়িয়াছে, সার্কাসপার্টিতে গিয়াছে, মেলার ভিড়ে মাতিয়াছে,—জেলের দলে চাষার দলে কামারের দলে—সকল দলেই ফিরিয়াছে, মন জয় করিয়াছে সকলের কিন্তু বিশেষ কারোর বন্ধনে বদ্ধ হয় নাই কখনও। প্রকৃতির মতই বিশাল তাহার মন। প্রকৃতি যেমন তুচ্ছ তৃণগুচ্ছেরও বটে, উচ্চতম বটবৃক্ষেরও বটে, ক্ষুদ্র এই পতঙ্গটিরও বটে, আবার স্বনামধন্য রুদ্রকল্প পুরুষসিংহেরও বটে, চরণতলার এই ধূলির কণাংশেরও বটে, আকাশের সীমান্ত-বিহারী শিরোভূষণের শেষাংশেরও বটে—তারাপদ তেমনি বিশ্বের সকলের, কিন্তু সীমাবদ্ধ কোনো বিশেষের নহে।

বিশেষের মধ্যে আছে খণ্ডের আনন্দ—খণ্ডগত মনোবাসনার উদ্দীপ্ত অভিব্যক্তি। এই বিশেষের প্রকৃতিচিত্রও রবীন্দ্রনাথের বহু গল্পে পাইয়াছি। "বলাই"-এর বিশেষ অনুরাগ ছিল বিশেষ একটি শিমুলগাছে—বলাই-এর প্রেমপ্রকৃতি তাই শিমুল-গাছটির মধ্যে দেখিতে পাইত স্নেহানুরাগের আনন্দরূপ। সুভার চোখে যে প্রকৃতি ধরা দিয়াছিল, সরলা শুভা-প্রীতির অনুরূপ ছিল তাহার রূপ। প্রকৃতির আরণ্যক পরিবেশের উদার স্বাধীনতার মধ্যে দামাল দালিয়াকে মানাইয়াছিল ভালো। বাসনোদ্বেল যৌবনপ্রকৃতির বন্ধনবিহীন মর্মোচ্ছ্বাস "একরাত্রির" জনশূন্য প্রলয়ান্ধকারের পটভূমিকায় বেশ ভালোভাবেই থাপ খাইয়াছে। "জীবিত ও মৃত" নামক গল্পে কাদম্বিনী শ্মশান হইতে ফিরিয়া আসিলে সকলেই যখন তাহাকে প্রেতাত্মা বলিয়া ধারণা করিল, তখন বাহিরে অবিরাম বৃষ্টি পড়িতেছিল। গভীর দুঃখে ও নৈরাশ্যে কাদম্বিনী পুকুরে ডুবিয়া মরিল। "সমস্ত রাত্রি বৃষ্টি পড়িতে লাগিল।" কাদম্বিনীর দুঃখসজল বিপুল মনো-বেদনার সহিত বর্ষামুখর এই প্রকৃতির অন্তর্গূঢ় সম্বন্ধটি লক্ষ্য করিবার মতো। "মহামায়া" গল্পে মহামায়া যখন রাজীবের সহিত গৃহত্যাগ করিল—তখন তাহাদের ভয়োদ্বেল হৃদয়ের কম্পিত হৃদ্‌স্পন্দনের সহিত ছন্দতাল যেন বজায় রাখিল উন্মত্ত প্রলয় ঝটিকার বিপুল আন্দোলন। "ঘরে যাহা কিছু ছিল, সমস্ত ফেলিয়া

'বলাই'

'মহামায়া'

রাজীব মহামায়াকে লইয়া সেই ঝড়ের মধ্যে বাহির হইল। এমন ঝড় যে দাঁড়ানো কঠিন—ঝড়ের বেগে কঙ্কর উড়িয়া আসিয়া ছিটাগুলির মতো গায়ে বিঁধিতে লাগিল। মাথার উপরে গাছ ভাঙিয়া পড়িবার ভয়ে, পথ ছাড়িয়া উভয়ে খোলামাঠ দিয়া চলিতে লাগিল। বায়ুর বেগ পশ্চাত হইতে আঘাত করিল। তখন ঝড়ে লোকালয় হইতে দুইটা মানুষকে ছিন্ন করিয়া প্রলয়ের দিকে উড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে।"

পূর্বেই বলিয়াছি—মন যেমন, প্রেম যেমন, প্রকৃতিও তেমন। রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় প্রেম, প্রকৃতি ও মন বা মানব স্বতন্ত্র হইয়াও একসূত্রে গ্রন্থিবদ্ধ। প্রেম ক্ষুব্ধ হইলে, মন ক্ষুব্ধ, "ক্ষুধিত পাষাণের" ন্যায় তখন তাহার প্রকৃতিও চপলোদ্বেল। বিক্ষুব্ধ প্রকৃতির বহু চিত্র রবীন্দ্রনাথ আঁকিয়াছেন, সমগ্র জীবনের অর্থাৎ সর্বজীবনগত প্রেমের উপাসক বলিয়া জীবনের কোনো স্তর বা অংশকে তিনি বাদ দিতে পারেন নাই। তবে তাঁহার কথা এই, প্রসন্ন প্রকৃতির আনন্দানুরাগ যদি জীবনে উপভোগ করিতে চাই, তবে মনকে বিশেষাবেগের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া বিশ্বগত প্রেমের মন্দিরে পূজারীর মত বসাইতেই হইবে। প্রেমাশ্রিত মনের আলোকে যে প্রকৃতি উদ্ভাসিত, তাহারই রূপে অরূপের অপ-রূপতা আছে। এই অরূপের অপরূপতার যে সন্ধান পাইয়াছে, "অতিথি" গল্পে বর্ণিত তারাপদর মত সে-ই রূপে রূপে প্রতিরূপে সহজ আনন্দেই অগ্রসর হইয়াছে, কোথাও কোনো বিশেষে আসক্ত হইয়া জীবনকে বদ্ধ করিতে চাহে নাই।

"অন্তরের মধ্যে সে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত এবং মুক্ত ছিল। সংসারে অনেক কুৎসিত কথা সে সর্বদা শুনিয়াছে এবং অনেক কদর্য দৃশ্য তাহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, কিন্তু তাহা তাহার মনের মধ্যে সঞ্চিত হইবার তিলমাত্র অবসর প্রাপ্ত হয় নাই। এ-ছেলেটির কিছুতেই খেয়াল ছিল না। অন্যান্য বন্ধনের ন্যায় কোনোপ্রকার অভ্যাস-বন্ধনও তাহার মনকে বাধ্য করিতে পারে নাই। সে এই সংসারের পঙ্কিল জলের উপর দিয়া শুভ্রপক্ষ রাজহংসের মতো সাঁতার দিয়া বেড়াইত। কৌতূহল বশতঃ যতবারই ডুব দিত, তাহার পাখা সিক্ত বা মলিন হইতে পারিত না।" [অতিথি, গল্পগুচ্ছ-২]

তৃতীয় অধ্যায়

উপন্যাস

"আমার স্বর্গেও রয়ে গেল রোম্যান্স, আমার মর্ত্যেও ঘটাব রোম্যান্স। যারা ওর একটা বাঁচাতে গিয়ে আর একটাকে দেউলে করে দেয় তাদেরই তুমি বল রোম্যাণ্টিক। আমি রোম্যান্সের পরমহংস। ভালোবাসার সত্যকে আমি একই শক্তিতে জলেস্থলে উপলব্ধি করব, আবার আকাশেও। নদীর চরে রইল আমার পাকা দখল, আবার মানসের দিকে যখন যাত্রা করব সেটা হবে আকাশের ফাঁকা রাস্তায়।"

[—যতীর প্রতি অমিত, শেষের কবিতা।]

"একটা কথা বলি শোনো। যতক্ষণ মনে করবে তোমার ধন কেউ কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ বুকের পাঁজর জ্বলবে আগুনে। পাবে না শান্তি। কিন্তু স্থির হয়ে বসে বলো দেখি একবার,—'দিলেম আমি। সকলের চেয়ে যা দুর্মূল্য তাই দিলেম তাঁকে যাঁকে সকলের চেয়ে ভালোবসি'—সব ভার যাবে এক মুহূর্তে নেমে। মন ভরে উঠবে আনন্দে।"

[—নীরজার প্রতি রমেন, মালঞ্চ]

তৃতীয় অধ্যায়

উপন্যাস

রবীন্দ্রনাথের মনোদর্শনে কবিগুরুর জীবনতত্ত্ব অর্থাৎ প্রেমতত্ত্ব যে ভাবে আমি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়াছি, সহৃদয় পাঠক যদি তাহা গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, তবে তাহার আলোকে রবীন্দ্ররচনাবলী আর একবার পাঠ করিলেই বুঝিবেন, সর্বজীবনগত অদ্বিতীয় প্রেমই কবির বিচিত্র রচনাবলীর মূল আশ্রয়। অখণ্ড তাৎপর্যের ব্যঞ্জনা এই প্রেমের মধ্যেই গুহাহিত।

লোকায়ত প্রেমজীবনে পরস্পর বিরোধিতা যে লক্ষিত হয় না, তাহা আমি বলি না। কিন্তু প্রশান্ত মন লইয়া একটু ধীরভাবে ধ্যান করিলেই বুঝা যায় মনোগত সকলপ্রকার বিরোধিতার মূলে প্রেমই আছে সমন্বয় ধর্মের আনন্দ লইয়া। আপাততঃদৃষ্টিতে অহং বিশ্বের বিরোধী বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে, কিন্তু আত্মপ্রেম প্রসারিত হইয়া ক্রমশঃ যখন বিশ্বপথে অভিসার করিতে চায়, তখনই বুঝা যায়, অহং ও বিশ্বের মধ্যে যতটা বিরোধিতা আছে বলিয়া মনে করি, ততটা নাই। অহং আপনার সীমার বন্ধনে বদ্ধ হইয়া থাকিলেই তাহা বিশ্বের বিরোধী। অহং আপনাকে উত্তীর্ণ হইবার সাধনায় জাগ্রত হইলেই তখন তাহা আর বিরোধী নহে—তাহা তখন বিশ্বানুগ প্রেমসত্তারই অমৃতাংশ। ঈর্ষা, দ্বেষ, স্বার্থ, যৌনকামনার অতৃপ্তি প্রভৃতি অহং-এর বিকারগুলি প্রেমের বিরোধী বলিয়াই মনে হয় বটে, কিন্তু কতক্ষণ বিরোধী? যতক্ষণ ঈর্ষাদি অতিকৃতিগুলি আপনাদের মধ্যেই কুণ্ডলী পাকাইয়া আস্ফালন করে, হাহাকার করে। প্রেমের প্রসন্ন প্রভাবে প্রভাবিত হইবামাত্র এই সকল অতিকৃতির রূপান্তর ঘটে; ইহারা তখন নিজেদের ছাড়াইয়া ঊর্ধ্বপথে হয় অগ্রসর। একথা অবশ্য বলাই বাহুল্য যে, ঈর্ষাদি বিকারগুলি যেখানে আপনকার সংকীর্ণ আবেগে বদ্ধই রহিয়া যায়, উঠিতে চাহে না, ছুটিতে চাহে না,—সেখানে তাহারা প্রেমের বিরোধিতাই করে,—বিরোধিতায় হয় মরে, নয় মারে। এই মরা ও মারার ঘটনায় পরিকীর্ণ মানুষের মনের ইতিহাস। মানুষই অভিজ্ঞতার দ্বারা শিখিয়াছে, অহং সত্য বটে, কিন্তু একমাত্র সত্য নহে। অহং হইতে উত্তীর্ণ হওয়ার সাধনাও জীবনগত তত্ত্বসত্য।

রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীতে অহংএর বিশ্বাভিসারের বাণীব্যঞ্জনাই নব নব বর্ণে, স্বর্ণে ছন্দে, গন্ধে, প্রভাসিত ও প্রমুদিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের মন অহং হইতে বিশ্ব পর্যন্ত প্রসারিত

বৃহৎ মন; এই মনের প্রেমদর্শন বিশেষ কোনো তত্ত্বশাখার সংস্কারদর্শন নহে। তাহা অসংখ্য বিশেষ হইতে অনন্ত অশেষের অভিযাত্রী মহাপ্রাণতার আনন্দদর্শন। অন্তহীন এই গতিপ্রাণতার পরমানন্দ হইতেছে প্রেম। এই প্রেমই রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বের প্রেম, কাব্যের প্রেম, নাট্যের প্রেম। এই প্রেম সমাজজীবনের বস্তুমানসে কতটুকু প্রকটিত হইতে পারে, গল্পে ও উপন্যাসে কবি তাহারই পরীক্ষা করিয়াছেন। আমার সুচিন্তিত অভিমত এই, কবির প্রেম, নাট্যকারের প্রেম, গাল্পিকের প্রেম ও ঔপন্যাসিকের প্রেম সর্বজীবনগত সেই দার্শনিক প্রেমজীবনেরই বিচিত্র বিভূতি। বিচিত্রের মধ্যে এক অর্থাৎ প্রেমই রবীন্দ্র প্রতিভার প্রেরণা; এই একের স্বরূপটি সুস্পষ্টভাবে জানিবার ও জানাইবার অভিপ্রায়েই "মনোদর্শনের" অবতারণা। ইহাতে দেখাইতেছি, রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বের প্রেমে ও শিল্পের প্রেমে পার্থক্য কিছু নাই। বর্তমান অধ্যায়ে কবির উপন্যাস সাহিত্যে প্রেমতত্ত্ব বিচার করিতেছি। ইহার আলোকে উপন্যাসে বর্ণিত প্রেমচিত্রাবলী পর্যালোচনা করিলেই দেখা যাইবে—এক প্রেমই বিভিন্ন অধিকারীর মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়াছে; অর্থাৎ কোথাও ধারণ করিয়াছে নিম্নতলস্থ মলিনা বাসনার প্রেয় রূপ অর্থাৎ অহং রূপ, কোথাও বা ধারণ করিয়াছে মনের উচ্চমার্গস্থ বিশুদ্ধা বাসনার শ্রেয় রূপ অর্থাৎ বিশ্বরূপ। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস, তাঁহার গল্প-সাহিত্যের ন্যায়, প্রেমদর্শনেরই লোকায়ত বাস্তব ব্যাখ্যা।

প্রেমের বিচিত্র রূপ, রীতি ও গতি বিকাশে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলি কতটা সহায়তা করিয়াছে তাহা বিচার করিতে হইলে 'চোখের বালি' হইতেই আলোচনা শুরু করা সমীচীন। 'কাব্যমানসে' রবীন্দ্রনাথের প্রেমের ক্রমবিকাশের চিত্র আলোচনায় আমি দেখাইয়াছি যে, বালক বয়সে রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দৃষ্টি তেমন পরিপুষ্টি লাভ করে নাই; নানা দ্বন্দ্ব, নানা সংশয় ও নানা মত্ততার মধ্যে ধীর স্থিরভাবে জীবনদর্শনের পূর্ণ মহিমোপলব্ধি বালক বয়সে সম্ভব নহে। চোখের বালি কবির অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সের রচনা। লোকায়ত জীবনের বাস্তব প্রেমমহিমার পূর্ণ স্বরূপ এবং তাহার সম্পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ—চোখের বালি এবং তাহার পরবর্তী উপন্যাসসমূহ হইতেই অন্বেষণ করা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, চোখের বালির পূর্বে যে দুইখানি উপন্যাস ('বউঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষি') কবি বালক বয়সে রচনা করিয়াছিলেন, সে দুখানির মধ্যে প্রেমতত্ত্বের কোনো ইঙ্গিতই পাওয়া যায় না। ড. নীহাররঞ্জন সত্যই বলিয়াছেন: "এই দুটি উপন্যাসেও রবীন্দ্রমানসের বিশেষ ধর্মটি কিছুতেই দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয়। এই অপরিণত বয়সেও ইতিহাসের অর্থহীন কল-কোলাহল এবং বাহ্য ঘটনাবৈচিত্র্যের পশ্চাতে তিনি স্নেহ-প্রেম-প্রীতিপূর্ণ উদার মুক্ত প্রাণের অখণ্ড শান্তির সন্ধান করিয়াছেন; এই উদার

মুক্তি ও শান্তিই তাঁহাকে ইতিহাসের ও সাধারণ মানব-সংসারের চঞ্চল কর্মপ্রবাহ হইতে দূরে টানিয়া লইয়া গিয়াছে।" [রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা, পৃ. ৪০৩]। অবশ্য বউঠাকুরাণীর হাট ও রাজর্ষি উপন্যাস হিসাবে যে খুব মূল্যবান, তাহা আমি বলি না। গ্রন্থদ্বয়ে, বিশেষ করিয়া বউঠাকুরাণীর হাটে অন্তর্দৃষ্টির অভাব প্রখরভাবেই প্রকট ; কিন্তু তথাপি এই দুই উপন্যাসে জীবনতত্ত্বের যে সত্য অস্ফুটভাবে প্রকাশিত হইয়াছে প্রেমদর্শনের ব্যাখ্যাব্যাপারে তাহা অনুপযোগী বলিয়া মনে করি না।

'বউঠাকুরাণীর হাট'

বউঠাকুরাণীর হাটে দেখি : প্রভুত্বশক্তির নির্দয় নিষ্পেষণে প্রেমজীবন নিষ্পিষ্ট হইয়া গেল। প্রতাপাদিত্যের নির্মম বিচারবুদ্ধি, তাহার প্রভুত্ব প্রীতি, তাহার অন্যায়োদ্ধত পরুষ অহংকার, তাহার জিঘাংসা ও জিগীষার মত্ততা, তাহার কূটনীতি-সর্বস্ব জড় কঠিন ব্যক্তিত্বের অসাড়তা—শেষ পর্যন্ত টিকিয়াই রহিল। রাজপুরীর আনন্দপ্রদীপগুলি একে একে নিভিয়া গেল, কিন্তু প্রতাপের তাহাতে কোনো পরিতাপের কারণ ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হইল না। প্রতাপ তাহার অন্যায় জেদ ও নিষ্ঠুর সংকীর্ণতা লইয়া স্থির ধীর ও অটল রহিল। তাহার মধ্যে মানুষটাকে একবারও দেখা গেল না। প্রতাপের মধ্যে কোথাও কোনক্ষণে যদি এতটুকু অনুতাপের আগুন দেখা যাইত, তবে তাহার মানুষটার আভাস পাইয়া সান্ত্বনা জাগিত, প্রেমের জয়ও সঙ্গে সঙ্গে সূচিত হইত। কিন্তু সংসারে এমন কোনো ঘটনা নাই যাহাতে পরুষ প্রতাপের মায়াবিহীন হৃদয়টাকে একবার নাড়া দিতে পারে।

বউঠাকুরাণীর হাটে একদিকে যেমন অহংমত্ত নিষ্ঠুর প্রতাপ আপন ইচ্ছা ও বিচার বুদ্ধিকেই একান্ত করিয়া দেখিয়া চারিপাশের বিশ্বকে হনন করিয়া চলিয়াছে, অপরদিকে তেমনি রুক্মিণী নাম্নী একজন কামাচ্ছন্না রমণীও কামনার চরিতার্থতার অভিপ্রায়ে লজ্জাহীন অজস্র অব্যাপারে বিজড়িত হইয়া দুলিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে।

প্রতাপ ও রুক্মিণী পৃথিবীসমাজের যেন অবাস্তব ও অসম্পূর্ণ চরিত্র। অবাস্তব কেন ? —তাহাদের প্রেমহীন অশোভনতার জন্য। অসম্পূর্ণ কেন ?—তাহাদের উলঙ্গ বাসনার অতিকৃতির জন্য। কিন্তু পৃথিবীসংসারে এমন অবাস্তব ও অপূর্ণ মানুষ যে নাই, তাহা কি জোর করিয়া বলিতে পারি ? সংসারে ইহারা কোথাও কোথাও আছে বলিয়াই প্রেমজীবন কি বিড়ম্বিত হইতেছে না ? মানবজন্মের গৌরবে কালিমা লিপ্ত হয় কিসের জন্য এবং কাহাদের জন্য ?

প্রতাপ ও রুক্মিণী—এই দুই চরিত্র দুই দিক দিয়া অহং প্রমত্ত। প্রতাপের উদ্যত জিগীষামোহ এবং রুক্মিণীর উদ্যত কামনা, হিংসা, রাজপুরীর অন্তর ও বাহিরকে অশান্ত করিয়া তুলিয়াছে। অহংমত্ততার মর্মহীন অনাচারে প্রেমজীবন—মানুষের সহজজীবন—

কীভাবে বিপর্যস্ত হইতে থাকে, তাহার চিত্র অঙ্কন করিয়া বালক কবি কোন্ সত্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন ?

রাজকার্য, রাজনীতি কি এমনি মনুষ্যত্ব বিরোধী নির্মম কঠিন কার্য ? যেখানে দয়া নাই, মায়া নাই, স্ত্রীর প্রতি মধুর কর্তব্য নাই, পুত্রকন্যার প্রতি স্নেহ নাই, জামাতার প্রতি সমাদর নাই, পিতৃব্যের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান নাই ? নিষ্ঠুর মরুভূকল্প এই রাজোদ্যানে তবু তো কতকগুলি কুসুম ফুটিয়াছিল। পাষাণ নির্মিত রাজহর্ম্যের মধ্যবর্তী হইয়া ফুটিয়াছিল বলিয়াই কি অকালে শুষ্ক হইয়া একে একে ঝরিয়া পড়িল ? ঝরিয়া গেল বলিয়াই কি রাজপুরীকে দূর হইতে শ্মশানকল্প বলিয়া মনে হইতেছে ?

যৌনবিকৃতির উলঙ্গ উন্মত্ততা কি ক্ষমা জানে না ? রুক্মিণীর সংস্পর্শে আসিয়া উদয়াদিত্যের মত নিষ্পাপ তরুণকে কি মরিতে হয়, সহিতেই হয়, অতীতের কৃতকর্মের বোঝা বহিতেই হয় ? রুক্মিণী যদি এতটুকু পরিমাণে মানবী হইতে পারিত, তবে হয়তো সংসারটা সুখের হইত। এত ষড়যন্ত্র, এত অন্যায়, এমনি হীন হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইতে পারিত না। অহংমত্ততার উদ্দামতা মানুষের মধ্যে কি এতটুকু রসের চিহ্নমাত্র রাখে না ? একে একে সকলেই মরিয়া গেল, সরিয়া গেল যুবরাজ উদয়াদিত্য, ঝরিয়া গেল তাহার প্রাণ-প্রিয়তমা সুরমা, মরিয়া গেলেন আনন্দসুন্দর কবিপ্রাণ রাজা বসন্ত রায়, পড়িয়া গেল রাজকুমারী বিভা, কিন্তু বিচিত্র কথা এই, প্রতাপ কূটনীতির কাঠিন্য লইয়া নিজেকে নিষ্কণ্টকই মনে করিতে লাগিল ; অধিকারলোলুপ রাজনৈতিক জগতে মানুষ কি এমনতর মনস্তত্ত্ববিরোধী পাথরগড়া নিষ্প্রেম চরিত্রই হইয়া থাকে ?

বউঠাকুরাণীর হাটে মৃত্যুর যে কয়টি দৃশ্য আছে, তাহাতে প্রেমই পরাজিত ও অবগুণ্ঠিত হইয়া গেছে। প্রেম পরাজিত হইলেই যে তাহার মহিমা চলিয়া গেল, তাহা নহে, কিন্তু বউঠাকুরাণীর হাটে প্রেম অবগুণ্ঠিতই হইল—তাহা হইতে বিশেষ কোনো মহিমাই যেন বিকীর্ণ হইল না। রাজর্ষিতে জয়সিংহের মৃত্যু মহিমময় মৃত্যু—তাহার মধ্যে গভীর একটি আদর্শ আছে। রাজা বসন্ত বা সুরমার মৃত্যুর মধ্যে কোনো মহিমা নাই—আদর্শ নাই। উদার নিশ্চেষ্টতার ততোধিক উদার অক্ষমতাই যেন তাহাদের মৃত্যুকে বরণ করিয়া জীবনকে ক্ষুন্ন ও বিড়ম্বিত করিয়াছে। রাজা বসন্তর মৃত্যু যেন অন্যায়কেই স্বীকার করিয়া জীবন্ত একটি জীবন লইয়া পলাইল—জয়সিংহের মৃত্যু অন্যায়ের প্রতিরোধে জীবনে নূতন জীবন আনয়ন করিল। রাজর্ষিতে কবি প্রেম ও মৃত্যু সম্পর্কে কতকটা যেন সচেতন হইয়াছেন, কিন্তু প্রেমের শক্তি সম্বন্ধে তিনি বউঠাকুরাণীর হাটে বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেন নাই। অথবা লেখককে সমর্থন করিবার জন্য এই কথাই বোধ হয় ভাবা সমীচীন, অহংপ্রমত্ত মানুষের নিকট প্রেম যে বিড়ম্বিতই হইয়া থাকে এই মোটা কথাটাই বালক লেখক তাঁহার বউঠাকুরাণীর হাটে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। "আপনারে

শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া" যে মানুষ "ঘুরে মরে পলে পলে"—তাহার নিকট তাহার নিজের স্বার্থ, প্রভুত্ব ও বুদ্ধিচেতনা ছাড়া আর কিছুই বুঝি সত্য নহে।

বউঠাকুরাণীর হাট হইতে রাজর্ষি অনেকাংশে ভালো উপন্যাস। ইহাতে কিছু প্রাণ আছে, ধ্যানও আছে, অন্তর্দ্বন্দ্ব বিকাশের কতক সাধনাও আছে, মানবিক মাহাত্ম্য-বোধের কিছু উন্মেষও আছে। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলিয়াছেন :

'রাজর্ষি'

Rajarshi attains a slightly greater distinctness both because of its historical background and of a clear grasp of the underlying conflict. But the history in the novel is thin and inpalpable to the extreme, and dissolves into nothingness when the stage has to be cleared for the presentation of the inner strife. Its colourful pageant has no appeal to the author and it is swallowed up in a great solitude where the soul has leisure to give itself up to profound self-introspection. Raghupati and the king, though very elementary types, have developed a faint degree of personality beyond any attained in Bou Thakuranir Hat." [Tagore Birthday Number, p. 123]

প্রেমতত্ত্বের দৃষ্টিতেও রাজর্ষি বউঠাকুরাণী হইতে উচ্চাঙ্গের রচনা। প্রেমের যে গতি ও শক্তির মহিমা কবির পরবর্তী রচনাবলীতে সম্যকভাবে প্রকটিত হইয়াছে, রাজর্ষিতে তাহার সূচনা আছে। বলিয়াছি, প্রতাপে প্রেমের কোনোই প্রভাব নাই—কিন্তু গোবিন্দে প্রেমই আসল, এইজন্য গোবিন্দমাণিক্য অনেকাংশে প্রতাপ হইতে জীবন্ত চরিত্র। সংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তিনি পরাজিত হইয়াও পরিণামে বিজয়ী। রঘুপতি চিরাচরিত হিংসা-সংস্কারের আদিম পূজারী—কিন্তু জয়সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার চরিত্রের রূপান্তর লক্ষণীয়। জয়সিংহের মৃত্যুতে রঘুপতির যে ভাবান্তর ঘটিল, প্রেম ও মনস্তত্ত্বের বিচারে তাহা সত্যও বটে, সুন্দরও বটে। গোবিন্দর সহিত রঘুপতির মিলন এবং রঘুপতির পৌরোহিত্য গ্রহণ প্রেমের মহিমাই উজ্জ্বল করিয়াছে। প্রেমের মধ্যে জন্মলাভ করিয়া অর্থাৎ মানবিকতার মাহাত্ম্যবোধ জাগ্রত হইবার পর রঘুপতি নবদৃষ্টি লাভ করিলেন; হিংসায় আচ্ছন্ন হইয়া যে ধ্রুবকে তিনি দেবীপ্রতিমার সম্মুখে বলি দিতে চাহিয়াছিলেন,—প্রেমাশ্রিত সহজ দৃষ্টিতে সেই ধ্রুবর মধ্যেই মৃত জয়সিংহের সন্ধান পাইয়া ধন্য হইলেন।

বউঠাকুরাণীর হাট ও রাজর্ষি রবীন্দ্রনাথের অপরিণত বয়সের রচনা। তথাপি রাজর্ষিতে পরবর্তী জীবনের প্রেমদার্শনিকটিকে খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব নহে। প্রেমই জীবনের সারবস্তু, প্রেমই মানুষকে সহজ ত্যাগের মধ্য দিয়া আগাইয়া দেয়, বাড়াইয়া দেয়—এ কথা রাজর্ষির লেখক কতক পরিমাণে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বউঠাকুরাণীতে প্রেম নিষ্ফল হইয়াছে। উদ্ধত প্রভুত্বধর্মের স্থূল শক্তিটাই প্রেমের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। বাস্তবসংসারে স্থূল দুইটা চর্মচক্ষু মেলিয়া বালকলেখক যাহা দেখিয়াছেন, বউঠাকুরাণীতে তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 'কাব্যমানসে' দেখাইয়াছি, এই সময় রবীন্দ্রনাথের মধ্যে রবীন্দ্রনাথত্ব পূর্ণভাবে জাগ্রত হয় নাই। সন্ধ্যাসঙ্গীত ও ছবি ও গানের মধ্যবর্তী সময়ে বউঠাকুরাণীর হাট লেখা। এই সময়ে জীবনের তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার বোধ গভীর হয় নাই। এই কারণে প্রেমের উপর উন্মত্ত পশুশক্তির আধিপত্যটাই তাঁহার চোখে পড়িয়াছে। রাজর্ষি, কড়ি ও কোমলের পরে লেখা। তখন জীবনের অল্পবিস্তর সাধারণ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া প্রেমের মহিমা কিয়ৎপরিমাণে তিনি অনুভব করিয়াছেন। প্রেম যে পরাজিত হইয়াও হয় না—পশুশক্তিকে একদিন না একদিন পরাজয় স্বীকার যে করিতেই হইবে—এই বিশ্বাস রাজর্ষির লেখকের অন্তরে সঞ্চারিত হইয়াছে। গোবিন্দমাণিক্য ভ্রাতার সহিত যুদ্ধ না করিয়া রাজ্য ছাড়িয়া দিলেন, ধ্রুবকে লইয়া বনে বনে ঘুরিলেন, আপাতঃদৃষ্টিতে ইহা প্রেমের পরাজয় বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও ইহাই মানবিকতার মহিমার উদ্বোধন। ইহারই শক্তি-আকর্ষণে উদ্ধত রঘুপতিকে নত হইতে হইয়াছে, গোবিন্দর জন্য প্রজাবর্গকে কাঁদিতে হইয়াছে,—প্রেমাশ্রুর আনন্দধারায় ত্রিপুরার পাপতাপ ধুইয়া মুছিয়া গেলে গোবিন্দকে পুনর্বার রাজসিংহাসনে সমারূঢ় হইতে হইয়াছে।

রাজর্ষি রচনার প্রায় ষোল বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ চোখের বালি লিখিয়াছেন। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি বিশেষভাবেই পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। চিত্রা-কল্পনা-নৈবেদ্য লিখিবার পর তিনি চোখের বালি রচনা করিয়াছেন

'চোখের বালি'

—ধ্রুব প্রেমের অনন্ত রূপদর্শনে তখন তিনি আশ্চর্য সার্থকতা লাভ করিয়াছেন; বুঝিয়াছেন—অহং কামনার জটাবন্ধনে প্রেম বহুকাল বদ্ধ থাকিতে পারে না—প্রকৃতির উদ্দেশ্যই তাহা নহে। বুঝিয়াছেন—মানুষ যখন সত্যকার প্রেম লাভ করে, তখন ধরিত্রীর কোনো তুচ্ছতা, কোনো ক্ষুদ্রতাই তাহাকে প্রভাবিত করিয়াও করিতে পারে না; বুঝিয়াছেন—প্রেমের বৈরাগ্যে মানুষ এমনতর মহত্ত্ব, এমনতর চরিত্রগরিমা প্রকাশ করিতে চায় বা করে,—অহং-এর নানা দ্বেষ, নানা লোভ, নানা ক্ষোভ ও ঈর্ষার ঘূর্ণাবর্তে বিঘূর্ণিত করে মানুষের মন। কিন্তু মানুষের জীবনে ইহাই শেষকথা নহে। একদিন না একদিন মানুষ তুচ্ছ এই কামনাময় পঙ্কিল প্রেম হইতে সূর্যসম্মুখে পঙ্কজের

ন্যায় বিকশিত হইয়া উঠে। আজ যদি না হয়, কাল হইবে; কাল না হইলে পরশ্ব হইবে প্রেমপ্রকৃতির ইহাই গতি, ইহাই ধর্ম।

একথা সত্য যে, লৌকিক জীবনে প্রেমের সর্বজগদ্‌গত রূপের প্রকাশ পূর্ণভাবে আমরা দেখিতে পাই না—অংশমাত্র দেখি। যতটুকু দেখি, ততটুকুর মাত্র বিচার করিতে, ব্যাখ্যা করিতে পারি। প্রেমের যে বৃহত্তর অংশ হৃদয়ের গোপন আনন্দ-বেদনার রহস্যে আচ্ছন্ন হইয়া আছে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, বিশেষ বিশেষ রূপই তাহার প্রকাশ পাইতে পারে,—তাহার বিশ্বরূপের মহিমা একখানি উপন্যাসে বা গল্পে প্রকাশ করা তো সম্ভব নহে। এই কারণে প্রেমের বিশ্বরূপ দর্শনের অভিলাষে একখানি মাত্র উপন্যাস নহে, রবীন্দ্রনাথের সকল উপন্যাসের মধ্য দিয়াই সেই এক প্রেমের বিচিত্র-গতিরূপের আনন্দ-ব্যঞ্জনা আস্বাদন করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথের গল্পের ন্যায় উপন্যাসসমূহেরও বিশেষত্ব হইতেছে প্রেমের বিচিত্র প্রকাশ : রবীন্দ্রনাথের সমগ্র উপন্যাসে প্রেম কী ভাবে, কত ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে —সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া সেই অদ্বিতীয় ধ্রুব-প্রেমের সন্ধান লইতে হইবে। এই প্রেম, পুনরুক্তি না করিলেও চলে যে, সমাজজীবনের স্বাভাবিক কামনা হইতে উদ্ভূত হইয়া সমাজের অনাগত বৃহৎ জীবন পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। প্রেমের এই অগ্রগতি আপন জীবন দিয়াই রবীন্দ্রনাথ ক্রমশঃ যে উপলব্ধি করিয়াছেন, পূর্ববর্তী অধ্যায়ে কাব্যমানসের ক্রমপরিণতির তত্ত্বানুধাবনে আমরা তাহা বুঝিয়া দেখিয়াছি। সর্বহৃদয়গত প্রেমের আনন্দোপলব্ধি লইয়াই তিনি উপন্যাস জগতে অবতরণ করিয়াছেন। 'চোখের বালি' উপন্যাসে এই উপলব্ধির সূচনা, 'মালঞ্চে' তাহার পরিসমাপ্তি।

চোখের বালি সম্বন্ধে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন : "ইহাতে যে প্রেম বর্ণিত হইয়াছে তাহা সমাজনীতির দিক হইতে বিগর্হিত—কিন্তু এই প্রেমের বিচারে কোনো নীতিকথার আড়ম্বর নাই, আছে কেবল ইহার ক্রমপরিণতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ। এই প্রেম বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে কোনো নৈতিক অনুশাসনে নয়, নিজের অন্তর্নিহিত শোভনতা-বোধ ও আত্মোপলব্ধির দ্বারা।" [বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা]

এখানে 'বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে' অর্থে বুঝিতে হইবে দেহবাসনা ও সম্ভোগের পথেই এই প্রেম বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে : কিন্তু বৈরাগ্যের আনন্দপথে এই প্রেম 'শোভনতাবোধ ও আত্মোপলব্ধির' দ্বারা ধীরে ধীরে অগ্রসরই হইয়া গেছে। রবীন্দ্রনাথ, বলাই বাহুল্য, লোকায়ত প্রেম অস্বীকার করেন নাই; বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে লোকায়ত প্রেমের আশানিরাশা, ক্ষোভ, লোভ প্রভৃতি কামনাবেগগুলি একটু রঙ চড়াইয়াই অঙ্কন করিয়াছেন। কিন্তু প্রেমের ব্যাপারে ইহাই তো প্রধান কথা নহে; সত্যকারের প্রেম পাশবিক প্রমত্ততাকে উত্তীর্ণ হইয়া স্বর্গীয় মহত্ব ও ত্যাগের মধ্যেই উদ্দীপ্ত হয়—এই

কথাই রবীন্দ্র-প্রেমদর্শনের কথার কথা, প্রধান কথা। চোখের বালি হইতে এই প্রেমদর্শন রবীন্দ্রনাথ সম্যক্‌ভাবেই উপলব্ধি করিয়াছেন। চোখের বালিতে দেখি—প্রথমে মায়ের ঈর্ষা বাহির হইতে আহ্বান করিয়া আনিল এক অপ্রত্যাশিত সমস্যা। পুত্রের দাম্পত্য-জীবনের নিরবচ্ছিন্ন মধুর প্রেমের অন্তরে প্রবেশ করিল রূপজ মোহ, কামজ সরীসৃপবৃত্তি। সরীসৃপের মতই এই মোহ-প্রেম দুলিয়া দুলিয়া, আঁকিয়া বাঁকিয়া অগ্রসর হইল দীর্ঘপথ, —যে পথ দিয়া গেল, বিষণ্ণ, বিষাক্ত করিল সেই পথের পরিবেশ। পথে দেখা দিল বন্ধুর প্রেমবৈরাগ্যের অনন্ত ঔদার্য—সংঘর্ষ বাধিল মহত্ত্বের সহিত মোহজ প্রেমের। পরিশেষে ত্যাগের অনন্ত ঔদার্যে মোহ 'প্রেমরূপে উঠিল ফলিয়া'। অহং মরিল, আত্মা আবির্ভূত হইল নবজীবনের নূতনতর প্রেমের তপস্যায়।

চোখের বালির গল্পাংশটি উদ্ধৃত না করিলেও চলে; তবু আলোচনার সুবিধার জন্য সারসংক্ষেপ প্রদান করিতেছি।

রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রকে অহরহঃ অঞ্চলতলে রাখিয়াই মানুষ করিয়াছিলেন। মহেন্দ্র বলিল —বিবাহ করিলে পাছে বউ আসিয়া মায়ের ঊর্ধ্বে স্থান লয়, তাই সে বিবাহ করিতে সম্মত নহে। কিন্তু বন্ধু বিহারীর বিবাহের জন্য আশাকে দেখিতে গিয়া অন্তরে তাহার বিবাহের বাসনা জাগিল। আশা মহেন্দ্রের কাকী অন্নপূর্ণার বোনঝি। অন্নপূর্ণার ইচ্ছা ছিল বিহারীর সহিতই তাহার বিবাহ হয়; কিন্তু মহেন্দ্র আশাকে দেখিয়াই ভুলিল। সে-ই তাহাকে বিবাহ করিল। বিহারী মর্মতঃ বেদনা পাইল, অন্নপূর্ণাকে সে কহিল: "আমাকে আর কখনও কাহারও সঙ্গে বিবাহের জন্য অনুরোধ করিয়ো না।"

বিবাহের পর মহেন্দ্র আশাকে লইয়া দিনরাত রহিল মাতিয়া। রাজলক্ষ্মীর জাগিল ঈর্ষা। তিনি মনে করিলেন—অন্নপূর্ণার প্ররোচনাতেই বুঝি মহেন্দ্র এইরূপ হইয়া যাইতেছে। অন্নপূর্ণাকে তিনি নানাভাবে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। শুধু তাহাই নহে, রাগ করিয়া তিনি তাঁহার জন্মভূমি বারাসতে গেলেন। মূর্খ মহেন্দ্র মাকে রাখিতে পর্যন্ত গেল না—গেল বিহারী। বারাসতে রাজলক্ষ্মী সদ্যবিধবা বিনোদিনীর সেবায় মুগ্ধ হইলেন। এই বিনোদিনীর সহিত মহেন্দ্রর বিবাহের কথা হইয়াছিল। মহেন্দ্র বিবাহে সম্মত না হওয়ায় রাজলক্ষ্মী বিহারীকেও অনুরোধ করিয়াছিলেন। বিনোদিনীর সেবা পাইয়া রাজলক্ষ্মীর মনে হইল—বিনোদিনী তাঁহার পুত্রবধূ হইলে কতই না সুখের হইত। জন্মভূমি হইতে তিনি যখন পুত্রগৃহে ফিরিলেন, বিনোদিনীকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন।

আশা বিনোদিনীকে আন্তরিকভাবেই ভালোবাসিলেন। বিনোদিনী মুখে খুব ভালবাসা দেখাইল বটে, কিন্তু মর্মে মর্মে আশার সুখৈশ্বর্যে জ্বলিতে লাগিল। সে ভাবিল, আশার আজ যে সুখ, যে ঐশ্বর্য, যে গৌরব সমস্ত তাহারই তো হইতে পারিত! গোপনে সে আশার সর্বনাশের পথ খুঁজিল। পথ পাওয়াও গেল। মহেন্দ্র নিজেকে যতই আদর্শবাদী একনিষ্ঠ প্রেমিকস্বামী বলিয়া মনে করুক না কেন, বিনোদিনীতে সে আসক্ত হইল;

বিনোদিনীও মহেন্দ্রকে প্রলুব্ধ করিবার অভিপ্রায়ে নানা লীলাকৌশল ও ছলনার জাল ফেলিয়া বসিল।

বন্ধু বিহারী ছিল মহেন্দ্রর যথার্থ বন্ধু। বন্ধুপত্নী আশাকে সে গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখিত; কোথায় যেন গভীর একটা বেদনাময় অসহায় স্নেহমমতাও সে অনুভব করিত আশার জন্য। এই জাতীয় স্নেহমমতার জাতি নির্ণয় করা সহজ নহে। ইহার বেদনা যত গভীর, চেতনা ততই গভীর। না-পাওয়ার বেদনা ইহার হৃদয়ে, কিন্তু ত্যাগদীপ্ত ভাবমহিমার আনন্দে কিছু যেন পাওয়ার চেতনা ইহার চরিত্রে। পার্থিব দিক দিয়া এ কিছুই চাহে না বলিলেই চলে, কিন্তু অপার্থিব কোনো ভাবের ভুবনে আপনাতে আপনি কিছু না কিছু পাথেয় সে রচনা করিয়া লয়। এই জাতীয় স্নেহমমতা যে দেয়—সেই জানে ইহার চরিত্রমহিমা; যাহাকে দেওয়া হয়, সে হয়তো জানিতেই পারে না ইহার উদ্দেশ, ইহার আনন্দ-বেদনার দিব্যতা।

আদর্শবাদী বিহারীর ছিল আশার উদ্দেশ্যে এইরূপ স্নেহমমতা। আশার কোনো-ক্ষেত্রে কোনোপ্রকার ক্ষতি হউক, সে তাই সহ্য করিতে পারিল না। মহেন্দ্র-বিনোদিনীর গোপন প্রণয়লীলা আশার জীবনে কত বড় সর্বনাশ ডাকিয়া আনিতেছে তাহা সে বুঝিল। সে সৎভাবে, বন্ধুভাবে মহেন্দ্র-বিনোদের এই অন্যায়াচরণে বাধা দিতে গিয়া অবমানিতই হইল।

এদিকে যত দিন গেল, বিনোদিনী মহেন্দ্রকে স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিল। মহেন্দ্রর উন্মত্ততা যত বাড়িল, বিনোদ ততই বুঝিল, মহেন্দ্র নির্ভরযোগ্য মানুষ নহে। দমদমে চড়ুইভাতি করিতে গিয়া বিনোদিনী বিহারীর নূতন রূপ দেখিল। গোপনে সে বিহারীকে পূজা দিতে শুরু করিল। কিন্তু একটি বিষয়ে অতি বড় বুদ্ধিমতী হইয়াও সে ভুল করিয়া বসিল। আশার প্রতি বিহারীর স্নেহমমতাটিকে অত্যন্ত স্থূলভাবে বুঝিয়া আশার উপর সে আরও ঈর্ষান্বিতা হইয়া উঠিল।

মহেন্দ্র রুগ্না মা, অসহায়া পত্নী ও বংশগত লোকমর্যাদা সমস্তই জলাঞ্জলি দিয়া বিনোদিনীর রূপপ্রমত্ততায় উঠিল মাতিয়া। বিহারীকে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিয়া রূঢ়ভাবে তাহাকে সরাইয়া দিল। বিনোদিনী মহেন্দ্রকে নানাভাবে নাচাইল বটে, কিন্তু ধরা দিল না কোথাও। বিহারীতেই রহিয়াছে তাহার মন—বিহারীকে লাভ করিবার অভিপ্রায়েই মহেন্দ্রকে সে রহিল ধরিয়া। ইহার পর একদা বিহারীকে সে গোপনে প্রেম নিবেদন করিল, বিহারী কিন্তু তাহাকে আমলই দিল না। সে পশ্চিমে চলিয়া গেল। বিনোদিনী তখন নূতন ছলনা সুরু করিল। মহেন্দ্রকেই সে যেন চায়, এই ভাব দেখাইয়া মহেন্দ্রকে লইয়া সে পশ্চিমে আসিল, বলা বাহুল্য, বিহারীর সন্ধানই তাহার অভিপ্রায়। ইতিমধ্যে বিহারী পশ্চিম হইতে ফিরিয়া কলিকাতায় গঙ্গার ধারে একটা বাড়ীতে চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া বসিয়াছে। বিনোদিনী ইহা জানিত না। পশ্চিমে এলাহাবাদে

যে বাড়ীতে বিহারী থাকিত, বিনোদিনী কৌশলে সেই বাড়ীতে আসিয়া মনে মনে বিহারীর সন্ধানে রহিল।

এদিকে রাজলক্ষ্মীর অসুখ উঠিয়াছে বাড়িয়া। বিহারীর ডাক পড়িয়াছে। বিহারী আসিয়া বিনোদ-মহেন্দ্রর পলায়ন সংবাদ শুনিল। মহেন্দ্রকে ফিরাইতেই হইবে, এই উদ্দেশ্য লইয়া বিহারী আসিল এলাহাবাদে। বিহারীর সহিত বিনোদিনীর এইখানে সাক্ষাৎ হইল। মহেন্দ্রর অনুপস্থিতিতে বিহারী-বিনোদের কথা হইতেছে, এমন সময় মহেন্দ্র আসিয়া ক্রোধে ঈর্ষায় উন্মত্ত হইয়া গেল। বিহারীকে, বিশেষ করিয়া বিনোদিনীকে সে নানাভাবে অপমান করিতে লাগিল। তখন যে বিহারী একদা বিনোদিনীর 'উদ্যত চুম্বন' ফিরাইয়া দিয়াছে—সেই রহস্যময় বৈরাগী বিহারীই মহেন্দ্রকে জানাইল যে বিনোদিনীকে সে বিবাহ করিবে। সুতরাং বিনোদিনীকে গালি দিবার অধিকার আর তাহার নাই। 'মহেন্দ্র বিস্ময়ে নিস্তব্ধ হইয়া গেল।' বুঝিল, ছায়ার পশ্চাতে এতদিন সে ঘুরিতেছিল। ভুল ভাঙ্গিল মহেন্দ্রর। সে তাহার পূর্বজীবনে আসিল ফিরিয়া। বিনোদিনীও হইল নূতন মানুষ।

চোখের বালির সর্বাপেক্ষা কঠিন অংশ এই বিহারীর বিবাহ প্রস্তাব এবং বিনোদিনীর আকস্মিক চিত্ত-পরিবর্তন। বিহারীর প্রেমের জন্য বিনোদিনী তো উন্মত্তই হইয়াছিল; কিন্তু বিহারী যখন সত্যসত্যই বিবাহের প্রস্তাব আনিল, বিনোদিনী তাহাতে সায় দিতে পারিল না। কিন্তু কেন?

বিহারীকে সে সত্যসত্যই ভালোবাসিয়াছিল। সেই বিহারী যখন ধরা দিতে চাহিতেছে, তখন বিনোদিনীর এই প্রত্যাখ্যান আপাতঃদৃষ্টিতে খুবই রহস্যময় বলিয়া মনে হইতে পারে। বিহারীর বিবাহ প্রস্তাবও কম রহস্যময় বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু প্রেমের বিচিত্র গতি ও ত্যাগের আনন্দতত্ত্ব বুঝিতে চাহিলে বিনোদ-বিহারীর এই আকস্মিক মানসলীলার তথাকথিত প্রহেলিকা খুবই সরল বলিয়া বোধ হইবে। বিহারী মহেন্দ্রকে ভালোবাসিত; মহেন্দ্র-পরিবারের সকলকে অতিবড় আপনার জন বলিয়া জানিত, সবারে উপরে আশার সম্পর্কে তাহার মন ছিল অভিনব এক স্বর্গশান্ত স্নেহমমতায় পূর্ণ। ইহার মধ্যে এতটুকু ফাঁকি ছিল না, কেন না ইহা সাময়িক মোহ নহে, ইহা প্রেম—অন্তরে ইহার ত্যাগময় কল্যাণকামিতা। এই প্রেম ভোগের মধ্যে আনন্দ পাইতে পারে, কিন্তু ত্যাগের মাহাত্ম্যেই ইহার সর্বাধিক আনন্দ। মহেন্দ্র যখন বিনোদিনীকে লইয়া পাগল হইতেছে, অথচ বিহারী জানে, বিনোদিনী মহেন্দ্রকে মোটেই চাহে না—আশার সর্বনাশ করার অভিপ্রায়েই মহেন্দ্রকে সে খেলাইতেছে মাত্র, তখন মহেন্দ্রর জন্য তো বটেই, রাজলক্ষ্মী ও অন্নপূর্ণার জন্য—এবং সবার উপরে আশার জন্য তাহার বৈরাগী হৃদয় ব্যথাতুর হইয়া নিষ্ফল বিলাপই করিতেছিল। বিনোদিনীর জন্য তাহার চিত্তে যে কোনোরূপ মাধুর্য-ভাব ছিল না, তাহা অবশ্য নহে; বিনোদিনীর সেই উদগ্র উন্মুখ চুম্বন সে ফিরাইয়া

দিয়াছিল বটে, কিন্তু যৌবনে তাহার রঙ ধরিয়াছিল, নেশাও কিছু লাগিয়াছিল। তবু কেন বিহারী বিনোদিনীকে এতদিন চাহে নাই? "তাহার কারণ এই, বিনোদিনী যে সৌন্দর্য-রসে বিহারীকে অভিসিক্ত করিয়া দিয়াছে। সংসারের মধ্যে বিনোদিনীর সহিত সেই সৌন্দর্যের উপযুক্ত কোনো সম্বন্ধ সে কল্পনা করিতে পারে না। পদ্মকে তুলিতে গেলে পঙ্ক উঠিয়া পড়ে। কী বলিয়া তাহাকে এমন কোথায় স্থাপন করিতে পারে, যেখানে সুন্দর বীভৎস হইয়া না উঠে। তাহা ছাড়া মহেন্দ্রর সহিত যদি কাড়াকাড়ি বাধিয়া যায়, তবে সমস্ত ব্যাপারটা এতই কুৎসিত আকার ধারণ করিবে যে, সে প্রস্তাবনা বিহারী মনের প্রান্তেও স্থান দিতে পারে না। তাই বিহারী নিভৃত গঙ্গাতীরে বিশ্বসংগীতের মাঝখানে তাহার মানসী প্রতিমাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপনার হৃদয়কে ধূপের মতো দগ্ধ করিতেছে। পাছে এমন কোনো সংবাদ পায়, যাহাতে তাহার সুখস্বপ্নজাল ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তাই সে চিঠি লিখিয়া বিনোদিনীর কোনো খবরও লয় না"। [চোখের বালি-৪৮]

এই বিহারী। এ যখন অন্নপূর্ণার মুখে বিনোদিনী ও মহেন্দ্রের পলায়ন সংবাদ শুনিল, বিনোদিনী সম্বন্ধে সে চকিতে বিরক্ত ও বিষাক্ত হইয়া গেল। সুখস্বপ্নের গোপন আনন্দ-মোহ চকিতে গেল মিলাইয়া। বিনোদিনীতে অন্ধভাবে আসক্ত মহেন্দ্রর চিত্রটি স্মরণ করিয়া 'দুঃখিনী আশার' ভাগ্য বিপর্যয়ে সে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সে মহেন্দ্রকে ফিরাইতে গেল। এলাহাবাদে বিনোদিনীকে তাহারি প্রেমপ্রার্থিনীরূপে জানিতে পারিয়া কথঞ্চিৎ স্বস্তি অনুভব করিল বটে, কিন্তু বিবাহ করার কোনো কথাই সে তখনও চিন্তা করে নাই। কিন্তু মহেন্দ্রকে বিনোদের পথ হইতে ফিরাইবার কোনো পথই সে যখন দেখিল না, তখন উন্মত্ত মহেন্দ্রর সম্মুখে বিনোদিনীকে বিবাহ করার প্রস্তাব আনিয়া মোহান্ধ মহেন্দ্রর সমস্ত মোহঘোর দিল ভাঙিয়া। বন্ধুর কার্য করিল বিহারী, সম্বিৎ ফিরিল মহেন্দ্রর।

তা যেন হইল কিন্তু বিনোদিনী তো বিহারীকে বন্ধনের মধ্যে পাইল, সে কেন বিবাহ করিতে চাহিল না? বিহারীর উদার মহত্বের মহিমা সে তো মর্মে মর্মে অনুভব করিল, বিহারীর মুখে একটু পরেই সে তো শুনিল যে, বিনোদিনীকে উদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যেই শুধু নহে, তাহাকে বিহারী ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে বলিয়াই বিবাহ করিতে চাহিতেছে, তবু কেন বিনোদিনী বিবাহ প্রস্তাব সমর্থন করিল না?

কথাটা ধীরভাবে বুঝিতে হইবে যে, বিহারীকে বিনোদিনী সত্যকার ভালোবাসা দিতে শুরু করিয়াছিল বলিয়াই বিবাহ করিতে চাহিল না। বিনোদিনী জানে, 'সে বিধবা, সে নিন্দিত'। বিহারী যদি বিনোদিনীকে বিবাহ করে, সমাজে বিহারী ধিকৃত হইবে, নিন্দিত হইবে। এত বড় পুরুষ যে বিহারী, হৃদয় যাহার এত বিশাল ও মহত্বপূর্ণ, নিন্দিত বিনোদিনীকেও হৃদয়ে স্থান দিতে যে দ্বিধা বোধ করে না—সেই যৌবনসুন্দর অতুলনীয়

পুরুষকে কেমন করিয়া বিনোদিনী সমাজের হীন সমালোচনার বিষয়বস্তু করিয়া তুলিবে? সমস্ত সমাজের কাছে সে বিহারীকে লাঞ্ছিত করিতে তাই চাহিল না। বিহারীর উপর তাহার সত্যকার প্রেম যদি না জাগিত, তবে তাহাকে লইয়া হয়তো কিছুদিন উন্মত্তা হইতে পারিত। যতদিন না বিহারী তাহার নিকট বিবাহ-প্রস্তাব করিয়াছে—প্রস্তাবের মধ্য দিয়া অভিনব প্রেম-মহত্ত্বের জ্যোতি বিকীরণ করিয়াছে, ততদিন অবশ্য বিনোদিনীর মধ্যে এই ত্যাগশান্ত প্রসন্ন প্রেমের উদ্বোধনই হয় নাই। কিন্তু নিতান্ত অপ্রত্যাশিত-ভাবে উন্মত্ত মহেন্দ্রর দুঃসহ অবমাননা হইতে যখনি বিহারী বিবাহের প্রস্তাব দ্বারা তাহাকে রক্ষা করিল, মুহূর্তে বিনোদিনীর অন্তর্দৃষ্টি গেল খুলিয়া। বিনোদিনী বুঝিল—এই বিবাহে তাহার আশা ও বাসনা চরিতার্থ হইতে পারে বটে, কিন্তু সুখ ও আনন্দ সে পাইবে না, কেন না তাহার মহান্ প্রেমাস্পদ যে পদে পদে লোকসমাজে নিন্দিত হইবেন, অবগুণ্ঠিত হইবেন, তাহা তো সহ্য হইবে না। এই যে প্রেমাস্পদের জন্য ত্যাগ, প্রসন্ন অনুরাগবোধ, ইহা বিনোদিনী পূর্বে যে কখনও আস্বাদন করিয়াছে তাহা নহে। যৌবনের অতৃপ্ত আশা-আকাজ্ক্ষা ও স্বার্থবুদ্ধির প্ররোচনায় অহং-এর প্রাবল্যকেই সে জীবন বলিয়া জানিতে ছিল। ইহার জন্য সে দুঃখ দিল অনেক, দুঃখ পাইলও অনেক। দুঃখের অগ্নিদাহনে শুদ্ধ নহে, শুষ্ক হইয়া, মৃতপ্রায় হইয়াই সে পড়িয়াছিল। সে বুঝিয়াছিল, ভোগের ইন্ধন জোগাইতে পারিলে মহেন্দ্রকে লইয়া কিছুকাল থাকা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে নিশ্চিতির স্বস্তি নাই, জিগীষারও তৃপ্তি তেমন নাই, অতএব শান্তি নাই। দুর্বল মহেন্দ্রকে লইয়া ভোগের পথে সে এইজন্যই পারে নাই নামিতে। তাহার মন এমন কিছু চাহিতেছিল যাহার উপর সে নির্ভর করিয়া তৃপ্ত হইতে পারে, প্রসন্ন হইতে পারে, নিশ্চিন্ত হইতে পারে। বিহারীকে সে চাহিতেছিল, কেন না তাহার ধারণা ছিল, বিহারীই তাহাকে নিশ্চিন্ত করিতে পারে; কিন্তু হায়, বিহারী বুঝি তাহাকে উপেক্ষাই করে। এই উপেক্ষার মানস-দাহনে তাহার জিগীষাবৃত্তি ভস্মীভূত হইতেছিল—এমন সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবেই সে জানিল, তাহার ঈপ্সিত দেবতা তাহাকে উপেক্ষা তো করেই না, তাহাকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে, অবমানের কবল হইতে তাহাকে রক্ষাই করিতে চায়। "বিনোদিনী চমকিয়া উঠিল—বুকের মধ্যে তাহার সমস্ত রক্ত তোলপাড় করিতে লাগিল।"

এই যে আকস্মিক অপ্রত্যাশিত হৃদয়ান্দোলন, ইহাই তাহাকে নবজীবনবোধের সাধন-পথে আনিল টানিয়া। অর্থাৎ বিহারীর উদার প্রেমস্বভাবের সুন্দর মহিমায় এইবার সে প্রেমের আনন্দ অনুভব করিল; বুঝিল ভালোবাসার জনকে সর্বতোভাবে রক্ষাই করিতে হয়, প্রেমাস্পদের কল্যাণকামনাই প্রেমের তপস্যা। কৌশলে, ছলনায়, কাঁদিয়া কাঁদিয়া অথবা সাধিয়া সাধিয়া যাহা পাই বা চাই—তাহাতে প্রেমাস্পদ ও প্রেম অপেক্ষা নিজের সম্ভোগসুখই প্রধান হইয়া দেখা দেয়। বিহারীর প্রেমৌদার্যে বিনোদিনী আজ তো শুধু অপমানের হাত হইতেই বাঁচিল না, আত্মোপলব্ধিও তাহার পক্ষে সম্ভব হইল। প্রেমিক

বিহারীকে ভোগের পথে টানিয়া, তাহাকে তাহার সুউচ্চ আসন হইতে নামাইয়া সে যে সুখী হইবে না, তাহা বুঝিল। বিবাহ প্রস্তাবের দ্বারা বিহারী তাহাকে যে তাহার যোগ্যা মনে করিয়াছে, ইহাই তাহার পুরস্কার। বিনোদিনী তাই বিবাহ-প্রস্তাবেই ধন্যা হইল। কহিল,

—এই আমার পুরস্কার হইয়াছে। এই যেটুকু স্বীকার করিলে, ইহার বেশি আর আমি কিছুই চাই না। পাইলেও তাহা থাকিবে না, ধর্ম কখনও তাহা সহ্য করিবেন না।

—কেন করিবেন না।

—ছি ছি, একথা মনে করিতে লজ্জা হয়।……বিধবাকে তুমি বিবাহ করিবে! তোমার ঔদার্যে সব সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু আমি যদি এ কাজ করি, তোমাকে সমাজে নষ্ট করি, তবে ইহজীবনে আমি আর মাথা তুলিতে পারিব না।

—কিন্তু…আমি তোমাকে ভালোবাসি।

—সেই ভালোবাসার অধিকারে আমি আজ একটি মাত্র স্পর্ধা প্রকাশ করিব।… পরজন্মে তোমাকে পাইবার জন্য আমি তপস্যা করিব—এ জন্মে আমার আর কিছু আশা নাই, প্রাপ্য নাই। আমি অনেক দুঃখ দিয়াছি, অনেক দুঃখ পাইয়াছি, আমার অনেক শিক্ষা হইয়াছে। সে যদি ভুলিতাম, তবে আমি তোমাকে হীন করিয়া আরও হীন হইতাম। কিন্তু তুমি উচ্চ আছ বলিয়াই আজ আমি আবার মাথা তুলিতে পারিয়াছি এ আশ্রয় আমি ভূমিসাৎ করিব না। [চোখের বালি-৫২]

বিনোদিনীর এই কথাগুলির মধ্যে তাহার চিত্ত-পরিবর্তনের কারণ তো ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই কথাগুলির মধ্যে প্রেমোদ্বোধনের নূতন যে সুর ধ্বনিত হইয়াছে—কোনো কোনো সমালোচক তাহা ধরিতেই চাহেন নাই। বিনোদিনীর এই চিত্ত-পরিবর্তনের মধ্যে কেহ কেহ ছলনা ও স্বার্থের তাড়না লক্ষ্য করিয়াছেন। ড. সুবোধচন্দ্র বলিয়াছেন : "এই উপন্যাসের শেষের দৃশ্যটা একটু অতি নাটকীয় হইয়া পড়িয়াছে; তাহাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করা যায় না। কবি বলিয়াছেন যে, বিনোদিনীর চিত্তে বিহারীর জন্য দুই প্রকারের আকাঙ্ক্ষা ছিল—নিঃস্বার্থ প্রেম ও আত্মরক্ষার স্বার্থবুদ্ধি। ইহাতে মৌলিক অসঙ্গতি আছে কিনা সেই প্রশ্ন নাই তুলিলাম, কিন্তু বিনোদিনীর যে চিত্র গ্রন্থের শেষে পাই, তাহাতে দেখি অবিমিশ্র শ্রদ্ধা ও ভক্তি; আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিবার কোন চিহ্ন নাই। বরং যখন বিহারীই তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল, তখন সে সবলে (না, প্রেমানত বিনতির আনন্দ বেদনায়?) এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল। তাহার সেই স্বার্থবুদ্ধি, সেই বিজিগীষা—কেমন করিয়া মুছিয়া গেল তাহার কোন পরিচয় পাওয়া গেল না। ইহা দেখিয়া মনে হয় যে বিনোদিনী সম্পর্কে ভুল শুধু বিহারীই করে নাই, কবিও করিয়াছেন।" [রবীন্দ্রনাথ, পৃ. ৩০৩]।

উদ্ধৃত মন্তব্যটি যথাযথ নয় বলিয়া আমার মনে হইয়াছে। ইতঃপূর্বে যাহা বলিয়াছি, তাহার মধ্যেই এই প্রকার মন্তব্যের উত্তর পাঠক পাইতে পারেন। বিহারীকে বিনোদিনী যখন উন্মত্তবৎ চাহিয়াছে—সেই উন্মত্ততার অন্ধ মুহূর্তে বিনোদিনী-বন্ধনে বিহারী যদি ধরা দিত, তবে হয়তো বিনোদিনীর বাসনার কতক সার্থকতা মিলিত, কিন্তু প্রেমের এই ত্যাগোপলব্ধির আনন্দ সে কখনই আস্বাদন করিত না। বিহারীর আত্মসংযম তাহার উদ্ধত জিগীষাবৃত্তির উদ্যত ফণাকে আনমিত করিয়াছে। তাহার বিক্ষিপ্ত ও মূঢ় চিত্তকে আত্মজিজ্ঞাসার পথে টানিয়াছে। বিহারীকে সে তখন আর সাধারণ মানুষ ভাবিতে পারে নাই, তাহাতে দেবত্ব আরোপ করিয়াছে, এলাহাবাদের শূন্য মন্দিরে তাহার উদ্দেশ্যে পুষ্পোপচার অর্পণ করিয়া তৃপ্ত হইতে চাহিয়াছে। ঠিক এই সন্ধিক্ষণে বিহারীর এলাহাবাদে আবির্ভাব, মহেন্দ্রর অবমানকর ব্যবহার—বিহারী কর্তৃক বিনোদিনীর সম্মান রক্ষা। যৌবনের চপল চঞ্চল মুহূর্তে বিনোদিনী বিহারীকে পায় নাই —পায় নাই বলিয়াই তাহার জিগীষু যৌবন তাহাকে ভুলে নাই—জয়ের অভিলাষে দিকে দিকে ছুটিয়া বেড়াইয়াছে। কিন্তু যে-পরিবেশের মধ্যে বিনোদিনী বিহারীকে পাইবার পথে আসিল, তাহাতে বিনোদিনীর ব্যক্তিত্ব প্রাধান্য পাইল না—বিহারীই নায়কত্বের অতুল গৌরবে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বিহারী যদি বিনোদিনীকে এখানেও উপেক্ষা করিত, ঘৃণার ভাব দেখাইত, বিনোদিনীর প্রেমোদ্বোধন সম্ভব হইত না; বিনোদিনী তা' হইলে পূর্ববৎ ঈর্ষাপরায়ণা ও বিজিগীষুই রহিয়া যাইত। কিন্তু বিহারী যে আসিল স্বপ্নময় মহিমা লইয়া, ত্যাগোদ্দীপ্ত প্রেম লইয়া, যৌবন-সুন্দর শ্রদ্ধা লইয়া। তাহার বিবাহ-প্রস্তাবে তো কোনো কাঙাল বৃত্তি ছিল না, দুর্বলতা ছিল না, মোহের মাদকতা ছিল না,—ছিল ক্ষমাসুন্দর উদ্যত পুরুষ-প্রেম, ছিল নারী ও নারীত্বকে মর্যাদা দিবার অটল, অচপল নিষ্ঠা, ছিল ধ্বংসোন্মুখ বন্ধু পরিবারকে সবলে টানিয়া তোলার সৎসাহস। পূর্ব হইতেই তো বিনোদিনী বিহারীকে প্রেম দিবার আবেগে উন্মুখ ছিল, আজ সেই প্রেম পূজা হইয়া দিল দেখা। বিনোদিনীর এই অন্তর-বিকাশের মুহূর্তগুলি ধীরভাবে না ধরিলে চোখের বালি পাঠ ব্যর্থ হইবে; শুধু তাহাই নহে, বিনোদিনী চরিত্র-চিত্রণের দ্বারা কবি প্রেমজীবনের যে গতি ও পরিণতির ব্যাখ্যা করিতে চাহিয়াছেন তাহা পাঠকমনকে স্পর্শই করিবে না। ফল কথা, বিহারীর প্রেমের দীপ হইতে বিনোদিনীর প্রেমের দীপটি জ্বলিয়াছে। মোহ প্রেমরূপে উঠিয়াছে ফলিয়া। আজ তাহার মধ্যে "আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিবার প্রবৃত্তির কোন চিহ্ন" থাকাই অবাস্তব এবং অস্বাভাবিক। যে নবজীবনের আলো আজ সে দেখিয়াছে, তাহাতে তাহার শান্তি মিলিয়াছে, নির্ভরতা মিলিয়াছে। আজ তাহার মধ্যে আর ঈর্ষা থাকিতে পারে না, থাকিতে পারে না বাসনার বিপুল বিদ্বেষ ও বিজিগীষা। নৌকার যখন নোঙর মিলিয়াছে, তখন আর কেন থাকিবে তরঙ্গে তরঙ্গে সহস্র আন্দোলনের অজস্র ফেনিলোচ্ছ্বাস?

কিন্তু নোতর মিলিল কোথায় ? বিহারীকে সে তো বিবাহই করিল না। সামাজিক বিচারে তাহাই মনে হয় বটে, কিন্তু মানসিক বিচারে বিনোদিনী পরম পাওয়াকেই যে পাইয়াছে। তুচ্ছাতিতুচ্ছ মনোবিকার হইতে মুক্তি পাইয়া বিহারীর প্রেমমহিমায়, উচ্চাতিউচ্চ বিমল কর্তব্যবাসনায় এইবার সে নবীন এক জীবনকে দেখিতে শিখিয়াছে।

বিহারীও বিবাহের প্রস্তাব করিয়া মহেন্দ্র পরিবারকেই শুধু বাঁচাইল না, বিনোদিনীকে বাঁচাইল, নিজেও বাঁচিল। দুঃসহ মানস-যন্ত্রণার গোপন বিহ্বলতার বন্ধন হইতে সে মুক্তি পাইল। বিনোদিনী যদি বিবাহে রাজী হইত, সামাজিক বহু লাঞ্ছনা হয়তো তাহার ভাগ্যে জুটিত, হয়তো ব্যক্তিজীবনে সুখ পাইত কি পাইত না, কিন্তু আনন্দ তাহার হৃদয় জুড়িয়া বিরাজ করিত অহরহঃ। সে জানিত কত বড় একটা মহান প্রেম-সমস্যার সমাধানের জন্য বন্ধন স্বীকারে সে নামিয়াছে। প্রেম যে বন্ধন স্বীকার করিয়াই বন্ধনকে উত্তীর্ণ হইতে চায়। প্রেমের চরিত্রই যে এই। পরবর্তী উপন্যাস 'নৌকাডুবি'তে প্রেম-চরিত্রের এই মাহাত্ম্যই ভিন্ন এক পরিবেশে অন্যতর রূপ ধারণ করিয়াছে। প্রেমতত্ত্ব বিচারে 'নৌকাডুবি'র আলোচনা অপরিহার্য।

'নৌকাডুবি'

নৌকাডুবিতে প্রেমের যে সত্যটি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইলেও মনোজীবনে তাহা স্বভাব-বিরোধী একটা কাল্পনিক ব্যাপার মাত্র নহে। দুইজন তরুণ-তরুণী একত্রে বহুদিন বাস করিল, অথচ সন্ন্যাসী না হইয়াও সন্ন্যাসীর মত সংযত নীতিজীবন করিল যাপন, ইহা প্রথমতঃ মনস্তত্ত্ব-বিরোধী অবাস্তব সত্য বলিয়া মনে হইতে পারে। রমেশ কমলাকে পরস্ত্রী বলিয়া জানিয়াছিল বলিয়াই সংযত ছিল—ঘটনাটিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়া সাত্ত্বিক প্রেম-বোধের নীতিপ্রচারও ইহার মধ্যে কেহ কেহ দেখিতে পারেন। যে-রমেশ কমলাকে দেবতার ধনের ন্যায় আগলাইয়াছে, মুহূর্তের জন্য মলিন হইতে দেয় নাই, কমলা সেই রমেশকে নিঃশব্দে ত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে পলাইল, সম্পূর্ণ একজন অপরিচিত মানুষকে তাহার স্বামী বলিয়া জানামাত্র মুহূর্তের মধ্যেই তাহাতে আত্মসমর্পণ করিল—এই ঘটনায় মন্ত্রধর্মের অলৌকিক প্রভাব এবং চিরাচরিত হিন্দু পাতিব্রত্যের অমোঘ শক্তি দেখিয়া কেহ বা ভক্তিতে গদগদ হইতে পারেন, কেহ বা রবীন্দ্রনাথকে গতানুগতিক সতীধর্মের নীতিব্যাখ্যাতা বলিয়া নাসিকা কুঞ্চন করিতে পারেন, কেহ বা আবার এই কাহিনীতে "বাস্তবানুভূতি ক্ষুণ্ন" হইয়াছে [রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা, পৃ. ৪১৬] মনে করিয়া ক্ষুব্ধ হইতেও পারেন।

উপন্যাসে, নাট্যে বা কাব্যে রবীন্দ্রনাথ যদি কোনো ধর্মের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তবে তাহা প্রেমধর্মের। প্রেমের বিচিত্র গতি, রীতি ও রূপের ব্যাখ্যাই তাঁহার উপন্যাসে প্রকাশিত হইয়াছে। নৌকাডুবিতে তিনি দেখাইয়াছেন, মানুষ যখন ভাবিতে পায় যে, তাহার প্রেম আপনাকে নিশ্চিন্তভাবে ন্যস্ত করিবার নির্ভরযোগ্য আধার পাইয়াছে, তখন সে অন্যত্র কোথাও কোনোভাবে বিচলিত হয় না—কোনো প্রলোভনের ফাঁদেই পা দিতে পারে না। ইহাই তাহার স্বভাব, তাহার চরিত্র। পত্নী থাকিতেও পুরুষ যখন অন্য নারীতে মন দেয়, তখন বুঝিতে হইবে স্বামী পত্নীর মধ্যে, অথবা পত্নী স্বামীর মধ্যে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য আনন্দ-আধার আর পাইতেছে না। কিন্তু এ-কথা বাস্তবসত্য যে, যতদিন তা' পাইতে থাকে, ততদিন কেহই তাহাদের টলাইতে পারে না। প্রেমের মধ্যে যে অহং আছে, বন্ধনের আনন্দ লাভের কামনা আছে, তাহা যখন কোথাও নিশ্চিন্ত নির্ভরতা লাভ করিয়া শান্ত থাকে, প্রসন্ন থাকে, তখনই মানুষের মন বৃহত্তর বাস্তব কর্মে, ধর্মে ও আদর্শে ধাবিত হইয়া রস পাইতে পারে। আদর্শকর্ম, ব্রত উদ্‌যাপন অথবা লৌকিক ও পারলৌকিক কর্তব্যধর্ম নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম ভাবে কতকপরিমাণে তখনই সম্পাদন করা সম্ভব, যখন অহং-মানস কোথাও কোনো না কোনো ভাবে চরিতার্থতার আস্বাদ পাইয়া, কিংবা 'পাইতেছি' এই কল্পানন্দে বিভোর হইয়া, শান্ত থাকে। তা' না হইলে এই অহং-ই কারণে অকারণে পশুর মত বাহির হইয়া, নখদন্ত বিস্তার করিয়া প্রেমের উচ্চতর বোধগুলিকে বিপর্যস্ত করে। প্রকৃতির নিয়মই এই। চোখের বালিতে বিনোদ-বিহারীর প্রেমমানসে ইহা স্পষ্ট হইয়াছে কিনা লক্ষ্য করিবেন। নৌকাডুবিতেও ইহার প্রকাশ লক্ষণীয়। গ্রন্থকার এই উপন্যাসে নিপুণভাবেই দেখাইয়াছেন যে, রমেশ প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়াছে হেমনলিনীকে, এবং হেমনলিনীও প্রতিদানে তাহাকে এমন প্রেম দিয়াছে যাহাতে চিত্ত পূর্ণ থাকে, হৃদয় অজস্র বসন্ত-স্বপ্নের যৌবনাবেগে জীবন্ত থাকে। এই প্রেমই, বলা বাহুল্য, তাহার মনুষ্যত্ব বিকাশে সহায়তা করিয়াছে। তর্ক উঠিতে পারে, রমেশ প্রথম অবস্থায় "হেমনলিনী সম্বন্ধে যে অনুচ্চারিত সত্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল", তাহার প্রভাবে অন্যত্র বিবাহ করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিল বটে, কিন্তু পরিশেষে অন্যত্র বিবাহ যে করিতে যায় নাই, তাহা তো নহে। আবার একথাও তো অসত্য নহে যে, কমলাকে যতদিন সে বিবাহিতা স্ত্রী বলিয়া জানিতেছিল, ততদিন তো তাহাকে—সেই "ভাবী প্রেয়সীকে—কল্যাণীকে, পূর্ণ মহীয়সী মূর্তিতে হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত" করিতেই চাহিয়াছিল? কথাটা অবশ্যই সত্য। হেমনলিনীতে তাহার প্রেম সঞ্চারিত হওয়া সত্ত্বেও পিতার আদেশের চাপে অন্যত্র বিবাহ করিতে না গিয়া সে পারে নাই—কিন্তু কেন যে "বিবাহকালে রমেশ ঠিকমতো মন্ত্র আবৃত্তি করিল না, শুভদৃষ্টির সময় চোখ বুজিয়া রহিল" তাহা অনুমান করা, এবং এই অনুমানের সাহায্যে তাহার চিত্ত-প্রকৃতির স্বরূপ জানা, খুব কঠিন নহে। ইহার পর সেই 'নৌকাডুবি'—সেই প্রলয়ংকর

প্রাকৃতিক দুর্যোগের সুযোগে জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে উপনীত হইয়া অভূতপূর্ব এক অভিজ্ঞতার আস্বাদন—নবজন্মের এক আকস্মিক চেতনার আলো-অন্ধকারে নববধূকে নূতন দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ। অভূতপূর্ব এই আবেশময় পরিবেশের মধ্যে—নবজন্মের রহস্যময় অস্ফুট আশাবিলাসের আনন্দ-উন্মেষে—"প্রত্যুষের শুকতারার" অস্তায়মান অন্ধকারের শেষ রশ্মিপাতে তরুণ রমেশ, নবীন রমেশ নববধূ বলিয়া যাহাকে জানিল—তাহার জন্য অননুভূত একপ্রকার আনন্দাকর্ষণ না জাগাই তো অস্বাভাবিক। তাহা যেন হইল—কিন্তু হঠাৎ তাহাকে দূরে আবার ঠেলিল কেন? ইহার উত্তরও খুব কঠিন নহে। সমাজে আসিয়া, পূর্বজীবনে সমাগত হইয়া, নববধূকে লইয়া সাধারণ গৃহস্থ তরুণের প্রেম নেশাতেই মগ্ন রহিতে পারিত। কিন্তু মোহ-মাধুর্য পূর্ণভাবে প্রমুদিত হইবার পূর্বেই আসিল মর্মান্তিক বাধা—সে জানিল, কমলা তাহার স্ত্রী নহে। মোহ-মাধুর্য সম্পূর্ণভাবে জাগ্রত হইবার পর একথা জানিলে রমেশ-কমলার কী হইত বলা শক্ত। কৌশলী লেখক এমনি এক সন্ধিক্ষণে রমেশের মোহবিকাশের পথে বাধা আনিয়াছেন, যাহাতে অস্বাভাবিক এই রোমান্স-কল্প কাহিনী স্বাভাবিক চিত্ত-চরিত্রের অপূর্ব আলেখ্য নির্মাণে আশ্চর্য সার্থকতা লাভ করিয়াছে। পরস্ত্রী কমলার কথা চিন্তা করিয়া রমেশ উদ্বিগ্নই হইয়া উঠিল—তাহার যৌবন-মোহ-কল্পনার আশাময় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেখিতে দেখিতে ঘুচিয়া গেল। ইহার মধ্যে চিরাচরিত হিন্দু সংস্কার যে খেলা করে নাই, তাহা বলি না। কিন্তু এই আমার স্থির বিশ্বাস, কমলার আশা পরিত্যক্ত হওয়ায় হেমের আশায় চিত্ত পুনর্বার পূর্ণ না হইলে এই সংস্কার রমেশের মধ্যে বড় বেশিদিন কার্যকরী হইতই না। কমলাতে যখন আশা ছিল, হেমের স্মৃতি তখন স্তিমিতপ্রায়; কমলাতে যখন আশা নাই, অর্থাৎ আশা করিতে নাই, তখন শূন্য মনকে স্বপ্নে ভরিতে পারে একমাত্র হেমের স্মৃতি। ঠিক এই মুহূর্তে 'হেমনলিনী সম্বন্ধে সেই অনুচ্চারিত সত্যে আবদ্ধ হইয়া পড়ার' গোপন কথা যতই মনে পড়ে, ততই কমলা হইতে রমেশ দূরে সরিবার কর্তব্যধর্মে হৃদয়বল লাভ করে। কমলা পরস্ত্রী বলিয়া তাহাকে গ্রহণ করা সমীচীন নহে,—এই যে মনুষ্যত্ববোধ, ইহার মূলে শুদ্ধমাত্র কর্তব্য-সচেতনতাই নাই। একেবারে নাই তাহা বলি না, কিন্তু কলিকাতায় হেমের সহিত পুনর্বার মিলিত হইয়া সেই "পরিচিত ঘর ও গৃহসজ্জাগুলি রমেশের উপর যত মন্ত্রজাল বিস্তার করিল" ততই এই মনুষ্যত্ববোধ তাহার মধ্যে প্রখর হইয়া উঠিল। হেমের সহিত রমেশের প্রেম যদি পরে আর না ঘটিত, কমলা ও রমেশের কাহিনী অবশ্যই ভিন্নরূপ গ্রহণ করিত। পাঠক লক্ষ্য করিবেন, রমেশ যতদিন হেমনলিনীর প্রেমে আশ্বাস পাইতেছিল, ততদিনই সে কমলাকে কোনক্রমেই স্ত্রী-ভাবে ভাবিতে চাহে নাই, পারেও নাই। ঘটনাক্রমে যখন তাহার মনে হইল, হেমনলিনীর প্রেমে তাহার আর কোনো আশা নাই অর্থাৎ প্রেমের নির্ভর যখন টলিতে সুরু করিল, তখনই

কমলাতে সে আশ্রয় চাহিল অর্থাৎ তাহাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিবার পক্ষে মনে মনে অজস্র যুক্তিজাল বিস্তার করিল। কমলার মর্যাদা রক্ষার ব্যাপারে রমেশ যে হৃদয়বল, ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়াছে তাহার মঙ্গল-কারণটি যে প্রেম, এটুকু বুঝিলেই রমেশের তথাকথিত অস্বাভাবিক সংযমবোধের বাস্তব মহিমাটি অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া যায়। অপর-পক্ষে কমলা যে রমেশকে ছাড়িয়া গেল—তাহার পর নলিনাক্ষকে দেখিবামাত্র গলিয়া গেল, ইহার কারণ যে মন্ত্র-সংস্কার বা পাতিব্রত্য-ধর্ম তাহা নহে। দাম্পত্য-প্রেমে যতটুকু মোহ থাকিলে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে মিলনবন্ধন সুদৃঢ় হয়, রমেশের ব্যবহারে কমলা যদি গোড়া হইতে সেই মোহের মাধুর্যটুকু আস্বাদ করিতে পাইত, তবে রমেশকে ত্যাগ করা তাহার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হইত না। কমলা রমেশের নিকট তাহা পায় নাই —অর্থাৎ চিত্তকে ন্যস্ত করিবার স্বস্তিময় কোনো আধার সে দেখে নাই রমেশের মধ্যে,—তাইতো মনে তাহার সুখ ছিল না, শান্তি ছিল না। ইহার পর সে যখন জানিল রমেশ তাহার স্বামী নহে, তখন তাহার চিত্ত-চাঞ্চল্য সহজেই অনুমান করা সম্ভব। নারী, বিশেষ করিয়া কমলার মত কুলকামিনী, অহরহঃ এই শান্তিহীন, স্বস্তিহীন, নির্ভরতা-বিহীন পরিবেশে থাকিতেই পারে না। তথাপি স্বীকার করিতে দ্বিধা নাই, কমলা রমেশের মধ্যে আগে হইতেই যদি স্বামিত্বের আনন্দ-মোহ দেখিতে পাইত, তবে পরবর্তী জীবনে তাহাকে পরপুরুষ জানিয়াও এক পা নড়িত না। ফলকথা, প্রেমের মধ্যে যে মোহ আছে, কবিগুরু সেই মোহকে কখনই অস্বীকার করেন নাই। একথা অবশ্য সত্য যে, এই মোহ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াই প্রেমের আনন্দ লাভ হয়, কিন্তু সংসারকে মিলন-বন্ধনে ধরিয়া রাখার পথে এই মোহ একান্তভাবেই অপরিহার্য। এই মোহেই স্বামী-স্ত্রী ধরা পড়ে, তাহার পর মোহ যখন প্রেমরূপে রূপান্তরিত হয়, তখন পরস্পর পরস্পরের জন্য কতই না ত্যাগ স্বীকার করে, কষ্ট স্বীকার করে। রবীন্দ্র-দর্শনে মোহই হইতেছে প্রেমের আদিম আশ্রয়। অহং-এর ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া প্রেম মোহ-মাধুর্যে মানুষকে বদ্ধ করে, তাহার পর মোহের বন্ধন ছাড়িয়া বৃহত্তর আনন্দের পথে হয় অগ্রসর। কিন্তু পূর্ব হইতেই প্রেম যেখানে মোহমুক্ত থাকিয়া বিশুদ্ধ কর্তব্য কর্মই কেবল করিতে থাকে, সেখানে অনাসক্ত যোগিত্বের আনন্দ- ভাব প্রকাশ পাইতে পারে বটে, কিন্তু হৃদয়ের টানে হৃদয়কে ধরা সম্ভব হয় না। কমলা রমেশের নিকট নানাভাবেই তো ঋণী, তবু সে যে রমেশের কাছ হইতে পলাইয়া বাঁচিল, তাহার কারণ ইহাই। অবশ্য পাতিব্রত্যের কোনো সংস্কারই কমলাকে নাড়া দেয় নাই তাহা বলি না; রমেশ তাহার স্বামী নহে জানিতে পারিয়া চিরাচরিত সংস্কার প্রভাবে সে যে লজ্জিত ও বিড়ম্বিত বোধ করে নাই —তাহাও নহে। কিন্তু মনস্তত্ত্বের বিচারে ইহা গৌণই বটে। মুখ্য হইতেছে প্রেমের মোহ-মাধুর্য। দাম্পত্য প্রেমের তথা সমাজগত জীবনপ্রেমের ইহাই মূলভিত্তি। নলিনাক্ষ দুই-একদিনের মধ্যেই কমলাকে ক্ষমা ও ঔদার্যের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন

বলিয়া কমলার মধ্যে নবজীবনের সূচনা দেখা দিয়াছে। নলিনাক্ষ যদি কমলাকে গ্রহণ না করিতেন, স্ত্রী বলিয়া স্বীকার ও বিশ্বাস না করিতেন, গোপনে "উপাসনাঘরে তাহাকে লইয়া গিয়া তাহার গলায় মালা না পরাইতেন" (পৃ. ৩৯২), তবে কী হইত বলা শক্ত, কিন্তু রমেশের নিকট কমলা যে আর ফিরিত না, সে কথা জোর করিয়াই বলা যায়। নলিনাক্ষ কমলার মন্ত্রপূত স্বামী ইহা জানামাত্র কমলা যে তাহাকে মনে মনে বরণ করিয়াছে—ইহার মধ্যে অবশ্য হিন্দুনারীর মন্ত্রসংস্কার কতকটা খেলা করিয়াছে কিন্তু এই খেলার ছন্দে রমেশের মোহবিহীন নির্বেগ কর্তব্যবোধ অপরোক্ষভাবে বিপুল প্রাণই তো সঞ্চার করিয়া দিয়াছে। হেমের স্বপ্ন নানা কারণে ভাঙিয়া যাওয়ায় রমেশ যখন কমলাকে পত্নীভাবে ভাবিতে সুরু করিয়াছে, তখন কিন্তু আর সময় ছিল না। অপর পক্ষে নলিনাক্ষ কমলাকে কমলা বলিয়া চেনামাত্র সহজভাবে গ্রহণ করিলেন। গোড়া হইতে নিপুণ লেখক নলিনাক্ষের যে উদার প্রেমধর্মপরিপূর্ণ ক্ষমাসুন্দর জীবনালেখ্য প্রকাশ করিয়াছেন, রহস্যময় প্রেমচেতনার করুণ অথচ গম্ভীর যে বেদনার ছন্দ তাঁহার বচনে ও বক্তৃতায় গুঞ্জরিত হইয়াছে, তাহাতে যথোচিত ক্ষমা ও মমতার দ্বারা কমলাকে গ্রহণ করাই তাঁহার পক্ষে বাস্তব ও স্বাভাবিক হইয়াছে। এই ক্ষমা ও ঔদার্যের মহিমায় কমলা প্রেমের স্বর্গভূমে উপনীত হইয়াছে। তাহার মনে হইয়াছে "জীবনের সমস্ত ভার চলিয়া গেছে"।

নলিনাক্ষ যদি শংকরপন্থী সন্ন্যাসী হইতেন, "কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ" বলিয়া মোহবিহীন নিত্যশুদ্ধবুদ্ধত্বের বক্তৃতা করিতেই যদি ভালবাসিতেন, কমলার ভাগ্যে স্বামীর ঘর অবশ্যই জুটিত না। বলাবাহুল্য, নলিনাক্ষ প্রেমিক, তাঁহার মোহ আছে অর্থাৎ বন্ধনকে স্বীকার করিতে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত নহেন, আবার তাঁহার বৈরাগ্যও আছে, অর্থাৎ বন্ধনকে উত্তীর্ণ হইবার শক্তি আছে বলিয়া দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধে তিনি উদাসীন নহেন। নলিনাক্ষের গৃহে কমলা তাই অচিরেই প্রকাশিত হইল পূজারতা আনন্দময়ী মহিমময়ী নারীরূপে।

পাইয়া হারানোর বেদনা ছিল নলিনাক্ষের চেতনায়। তাঁহার ঈশ্বরভক্তির মূলে ছিল এই বেদনার আনন্দ-চেতনা। যিনি দিয়াছেন, তিনিই লইয়াছেন—এই ধর্মভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে তাঁহার চরিত্র। এইজন্য বেদনা থাকা সত্ত্বেও তিনি শান্ত; তিনি প্রসন্ন। অর্থাৎ তাঁহার যেন দুঃখ নাই, কোনো দ্বন্দ্ব নাই। নলিনাক্ষ চরিত্র তেমন ফোটে নাই [বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ. ১২৬] বলিয়া যাঁহারা মন্তব্য করিয়াছেন, তাঁহারা ঠিকই বলিয়াছেন, কিন্তু এই জাতীয় চরিত্রগুলিকে দ্বন্দ্ব-বিপর্যস্ত সাধারণ চরিত্রের সহিত এক করিয়া দেখিলে চলে না। ইয়োরোপীয় গল্প-সাহিত্যের চরিত্রবিশ্লেষণের রীতি ও পদ্ধতির দ্বারা এইসকল চরিত্রের বিচার না করাই যুক্তিযুক্ত। নলিনাক্ষকে ভারতীয় জীবনাদর্শের মাপকাঠিতে বিচার করিলে বুঝা যাইবে তাঁহার বচন, বক্তৃতা ও নির্লিপ্ত স্বভাবের

প্রসন্নতার মধ্যেই তাঁহার চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য দীপ্যমান হইয়াছে। এইসব শান্ত সমাহিত চরিত্রই তাহাদের ধ্যানের ধনকে ফিরিয়া পাইবামাত্র প্রসন্ন মনে গ্রহণ করে, প্রশ্ন করে না, সংশয় আনে না। ইহাদের বাসনার জীবন বিক্ষিপ্ত নহে বলিয়া অনেক সময় উপন্যাস-মধ্যে ইহাদের রক্তহীন বিশেষত্ববর্জিত চরিত্র বলিয়াই ধারণা হইতে পারে। বস্তুতঃ ইহারা তাহা নহে। এইরূপ চরিত্র রবীন্দ্রনাথের একাধিক উপন্যাসে আমরা পাইয়াছি। প্রেম-চরিত্রের মহিমা ব্যাখ্যানে ইহাদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ফোটে না বলিয়াই ইহাদের চরিত্রব্যঞ্জনা সুগভীর; ফোটে না বলিয়াই বিশেষ এক ধ্যানের সৌন্দর্যে ইহারা ফুটিয়া উঠে।

শিল্প-বিচার মধ্যে মধ্যে আসিয়া পড়িতেছে—কিন্তু পূর্বে একাধিকবার আমি বলিয়াছি, শিল্প-ব্যাখ্যান আমার অভিপ্রায় নহে। কাব্যাদি শিল্পকলার তত্ত্ব-ব্যাখ্যানে শিল্প-বিচার কিছু না কিছু আসিয়াই পড়ে। পাঠক জানেন, শিল্প-বিচারই যাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য, নৌকাডুবির শিল্প-সৌন্দর্য সম্বন্ধে তাঁহারা নানাজনে নানা কথা বলিয়াছেন। নৌকাডুবির প্রথমাংশে কেহ কেহ সৌন্দর্য ও আর্টের পরাকাষ্ঠা লক্ষ্য করিয়াছেন বটে, কিন্তু শেষের দিকে তাহা আর দেখেন নাই বলিয়া গভীর মর্মপীড়া অনুভব করিয়াছেন। [ড. সুবোধচন্দ্রের রবীন্দ্রনাথ,]। প্রথমাংশে রমেশের অন্তর্দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান ড. সেনগুপ্ত যাহা করিয়াছেন অনেকেরই তাহা অবশ্য মনঃপূতই হইয়াছে; কিন্তু দ্বন্দ্বের পরিণতি তো দেখাইতে হইবে? ঘটনাবিপর্যয়ে রমেশকে হেমনলিনীর প্রেমের আশা ত্যাগ করিতে হইয়াছে বটে, কিন্তু হেমকে পাইবার বাসনা তাহার মধ্যে গভীর ভাবে ছিল বলিয়াই এত ত্যাগ, এত নিরভিমানতা, এত সহনশীলতা। তাহার পর হেম যখন দূরে গেল, কমলাও কাছে রহিল না, তখন "পালাই,—তোমার রমেশ" (পৃ. ৩৬৯) বলিয়া যোগেনের টেবিলে চিঠির টুকরাটুকু ফেলিয়া যাওয়া, এবং তৎপরে শেষবারের মত কমলার নিকট হইতে বিদায় লইয়া উদাসীনের মত সম্মুখপথে অগ্রসর হওয়া—পর্যন্ত না আসিলে গ্রন্থের সৌন্দর্য তথা রমেশ-চরিত্রের সম্পূর্ণাঙ্গ রূপ তো মর্মগোচরই হয় না। নলিনাক্ষের সহিত হেমনলিনীর বিবাহে যখন বাধা পড়িল, অন্নদাবাবু অবশ্য রমেশের সহিত হেমের বিবাহের কথা আবার চিন্তা করিলেন। হেম-রমেশের মিলনের কথা লইয়া লেখক যদি নূতন অধ্যায় সংযোজন করিতেন তবেই তাঁহার রচনার শেষাংশের সৌন্দর্য সম্পর্কে বাদানুবাদ শোভা পাইত। রমেশ চলিয়া গেল কমলার নিকট বিদায় লইয়া, কিন্তু তাহার পর কী হইল? কমলা ঘর পাইল, বড় সুখের কথা। কিন্তু রমেশ কি পথে পথেই শুধু ঘুরিবে? হেমনলিনীর সহিত তাহার মিলন কি সম্ভব হইতে পারে না? লেখক নিপুণ কৌশলে হেম-রমেশের মধ্যকার সমস্ত কুয়াশা কাটাইয়া দিয়াছেন; কিন্তু এসকল প্রশ্ন সম্বন্ধে নীরবই রহিয়া গেছেন। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিবেন—লেখকের এই নীরবতার অন্তর্ভেদ করিয়া আশাপূর্ণ বহু বার্তা প্রসন্ন হইয়া

আন্দোলিয়া উঠিয়াছে। হেমের সহিত কমলার সখীত্ব সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে—কমলাকে হেম মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিবে—এমন প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া অর্থাৎ কমলার সহিত একটি সূক্ষ্ম সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়াছে হেমনলিনী। রমেশ সম্বন্ধে যে সন্দেহ, যে সংশয় ছিল, তাহা নিশ্চয়ই আর নাই। ইহার পর ঘটনাটা কী দাঁড়াইবে তাহা ভাবিতে গেলে চিত্ত প্রসন্নই হইয়া উঠে; কিন্তু তথাপি রমেশের জন্য বিয়োগান্তক একপ্রকার বেদনার অনুভূতি অন্তরে আলোড়িত হইতে থাকে। বলাই বাহুল্য, এই অনুভূতির বেদনাবলেই পাঠক রমেশের সুখময় প্রেমজীবন প্রার্থনা না করিয়া পারে না। মর্মময় যে-প্রেমের মহিমায় রমেশ এত করিল, এত বহিল, এত সহিল, সেই প্রণয়-দুঃখী বৈরাগী রমেশের সুখের কথা চাপিয়া গিয়া লেখক শুধু আর্টের মর্যাদা ও সৌন্দর্য রক্ষাই করেন নাই—পাঠকের মুখ দিয়াছেন খুলিয়া, বেদনার অজস্র তরঙ্গে দোলাইয়া দিয়াছেন তাহার মন। পাঠক ভাবিতেছে—বাধার কুয়াশা তো কাটিল, এইবার হেম কি রমেশকে বরণ করিবে প্রিয় বলিয়া? এইবার হেম কি তাহার সুখজীবনের ইতিকথা কমলাকে জানাইবার সুযোগ পাইবে? দূরাগত পত্রের সাহায্যে ক্রমশঃ দুই সুখী দম্পতির মিলন কি মধুর ও সহজ হইবার পথে আসিবে না?

এ-সকল কথা অবশ্যই উপন্যাসে নাই—থাকিলে আর্টের হানিই হইত। কতটুকু থাকিলে উপন্যাসের আখ্যানভাগের পূর্ণতা হইল বলিয়া পাঠকের ধারণা হইত, অথচ তা' রাখিতে গেলে আর্টের সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের আনন্দটুকু ব্যাহত হইয়া যায়—কবিগুরু তাহা যেমন জানেন, পৃথিবীর খুব কম লেখকই তেমন জানেন বলিয়া আমরা মনে করি। গল্প সম্পূর্ণ করিতে হইবে অথচ আর্টের মর্যাদা রক্ষার তাগিদে তা' করা চলিবে না, এমন অবস্থায় দুই দিক বাঁচাইয়া সংকীর্ণ অথচ ক্ষুরধার পথে টাল সামলাইয়া চলা রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভাবানের পক্ষেই সম্ভব। সত্যিকার রসিক পাঠক অবশ্যই লক্ষ্য করিবেন, নৌকাডুবির শেষাংশে গল্পের বিচিত্র ধারাগুলি রবীন্দ্রনাথ এমন কৌশলে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন যাহাতে পাঠকচিত্তে মিলনান্তক একটি মধুর ভাবনা বেদনার পথ বাহিয়া পূর্ণতার পথে অভিসার করিতে থাকে। পাঠকচিত্তের এই বেদনাময় মধুর ভাবনাই আখ্যানভাগের অকথিত অংশগুলি আপনার আনন্দাবেগে রচনা করিয়া চলে: কেননা মানুষের মন সত্যকার প্রেমকে ব্যর্থ বা নিরর্থ ভাবিতে সম্মত নহে। হেম রমেশকে আজও ঘৃণা করিতেছে, এবং কমলা রমেশের মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্ব একেবারে বিস্মৃত হইয়াছে - মনোজীবনের ইহা তত্ত্ব-সত্য নহে। মনোজীবনের তত্ত্ব প্রেম—ইহা সংসারের নানা জটিলতায় ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, কিন্তু পরিণামে ইহার আনন্দ-মহিমার মঙ্গলমাধুর্য মিলনে হউক, বিচ্ছেদে হউক সূর্যোপম দীপ্তিতে প্রকাশ পাইবেই। যে মহৎ প্রেম মিলনের আনন্দ দিবার অভিপ্রায়ে বিচ্ছেদের ছদ্মবেশে মানুষের হৃদয়দ্বারে ঘুরিয়া ফেরে—নৌকাডুবিতে তাঁহার কল্পকাহিনী কয়েকজন নায়কনায়িকার চরিত্র ঘেরিয়া উদ্ভাসিয়া আলোড়িয়া উঠিয়াছে।

'গোরা'-উপন্যাসে এই মহৎ প্রেমই সনাতন বিধি-নিষেধের বন্ধনে বদ্ধ হইয়া বিপুল বিশ্ব হইতে নিজেকে গুটাইয়া রাখিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু বন্ধনের অতীতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করিবার সুযোগ পাইয়া মুক্তির আনন্দ-চেতনায় বিশ্বাভিসারে যাত্রা করিয়াছে।

প্রেম যখন কোনো একটি বিশেষ ধর্ম বা সংস্কারের মধ্য দিয়া প্রকাশ পায়, তখন তাহার উদার সর্বজগদ্‌গত কল্যাণ রূপটি মেঘাবৃত সূর্যের মতই অস্পষ্ট ও অপরিস্ফুট হইয়া থাকে।

গোরা

গোরার হৃদয়টি ছিল প্রেমের আবেগে নিত্য পরিপূর্ণ— কিন্তু হিন্দুধর্মের আচার-বিচার ও বিধি-নিষেধের জটাজালে আবদ্ধ রহিয়া যথোচিত প্রকাশ-পথ পাইতেছিল না। ভারতবর্ষের অজ্ঞ, মূঢ় ও অন্ত্যজদের প্রাণ ভরিয়াই ভালবাসিত গোরা, তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদেরই একজন হইতে চাহিত প্রেমের আবেগে, তাহাদের প্রতি সবলের অযথা অত্যাচার কখনই সে পারিত না সহ্য করিতে—তাহাদের জন্য সে সংগ্রাম করিয়াছে বীরবিক্রমে, জেলে প্রবেশ করিয়াছে হাস্যমুখে, পুলিশের উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছে ধৈর্যশান্ত প্রসন্ন সংযমে,—তবু যেন দেশের মানুষগুলির সহিত কোথায় সে মিলিয়াও মেলে নাই, কোথায় যেন তাহার পরুষ-কঠোর রুক্ষ বিভেদটি রহিয়াই গিয়াছে। ব্রহ্মণ্যধর্মের আবেগ-অন্ধ অভিজাত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য মানুষের পথে পূর্ণভাবে তাহাকে যাইতেই দেয় নাই; লছ্‌মি তাহাকে শিশুকাল হইতে মায়ের অধিক স্নেহে মানুষ করিয়াছে, তবু সে খৃষ্টান বলিয়া গোরা তাহার হাতে জলস্পর্শ পর্যন্ত করিত না। মা আনন্দময়ীকে সে যে প্রাণ ভরিয়াই ভালবাসিত, এ-কথা বলাই বাহুল্য; কিন্তু বিচিত্র কথা এই—তাঁহার হাত হইতেও অন্নগ্রহণ করিতে তাহার দ্বিধা হইত। গোরার হৃদয়ের দুর্মদ দুর্বার প্রেমাবেগ হিন্দুধর্মের সংকীর্ণ সংস্কারের খাতে প্রবাহিত হইতেছিল বলিয়া মানুষ হইতে কোথায় কীভাবে সে যে দূরে রহিয়াছে, দূরে সরিতেছে—তাহা বুঝিতেও কখনও চাহিত না।

প্রথম দর্শনেই সুচরিতাকে গোরার ভালো লাগিয়াছিল। গোরা জানিত না—এই ভালোলাগা ভালোবাসারই সূচনা। বীর্যদৃপ্ত বজ্রগম্ভীর ধর্মসাত্ত্বিক অশান্ত গোরা নারীর প্রতি পুরুষের আকর্ষণের মহিমা বুঝিত না—কিন্তু নারীর চরিত্র-মহিমার অমোঘ আকর্ষণ তাহাকে দোলাইতেছিল, ভোলাইতেছিল, বাক্যে, ব্যবহারে, স্বপ্নে ও চিন্তায় প্রবলবেগে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িতেছিল। কিন্তু আচম্বিতে গোরার মনে হইল, এই আকর্ষণ তাহার ধর্ম ও আদর্শেরই যেন বিরোধী। নবচেতনার এই ললিত বোধটিকে গোরা তাই হৃদয় হইতে সমূলে উৎপাটিতই করিতে চাহিল: নবপর্যায়ে সে নূতন রকমের নানা তপস্যা, নানা কৃচ্ছ্রসাধন শুরু করিল। তাহার ধারণা ছিল, সে ব্রাহ্মণ-তনয়, ব্রহ্মণ্যধর্মের নূতন ব্যাখ্যা আছে তাহার মর্মে। ব্রাহ্ম-কন্যা সুচরিতার আকর্ষণ যখনই তাহার মধ্যে আন্দোলনের আভাস আনিল, তখনই সে জেদ করিয়া, জোর করিয়া ব্রহ্মণ্যধর্মানুসারে ত্যাগময় নবজীবনের নূতন সাধনা করিল শুরু। তাহার ধারণা, প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইতে

হইলে ইতর মানুষ হইতে স্বতন্ত্র হইতেই হইবে, আত্মরক্ষা করিতেই হইবে। তা' না হইলে জাতিকে, দেশকে অধঃপতনের পঙ্কস্তূপ হইতে উদ্ধার করা কিছুতেই সম্ভবপর হইবে না।

মা আনন্দময়ী জাতিভেদ মানিতেন না, লছ্‌মির হাতে জল খাইতে দ্বিধা করিতেন না, ইহাতে গোরা মনে মনে কেমন যেন অস্বস্তিই বোধ করিত। সে আপন সংসারের মধ্যেই তাই একটি সংকীর্ণ সীমা রচনা করিয়া লইয়াছিল। এই সীমাটুকুর মধ্যেই অবস্থান করিয়া সে মনে করিত, সে সত্যকে লাভ করিয়াছে; ইহার দ্বারাই সে ভারতবর্ষের আত্মাকে আবিষ্কার করিবে। কিন্তু যেদিন সে জানিল সে হিন্দু নহে, ব্রাহ্মণ নহে,—পরন্তু অজ্ঞাত এক আইরিশ পিতার সন্তান—সিপাই মিউটিনির সময় তাহার গর্ভধারিণী তাহার জন্মগ্রহণের পরমুহূর্তেই ইহলীলা সংবরণ করিয়াছেন, সেইদিন আচম্বিতে তাহার চক্ষু খুলিয়া গেল। জাতিগত ধর্মসংস্কারের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে সে যে কতটুকু হইয়া পড়িয়াছিল—এইবারই সে প্রথম বুঝিতে পারিল। বুঝিতে পারিল—সে কোনো সম্প্রদায়ের নহে, সে ভারতবর্ষের। বুঝিতে পারিল—ভারতবর্ষের সকলেই তাহার আত্মীয়জন, সে শুদ্ধমাত্র হিন্দু নহে, ব্রাহ্মণ নহে, সে ভারতীয়, সে বিশ্বের সন্তান। এতদিন সে ধর্মগত ও জাতিগত নিষ্ঠাজ্ঞানের ও সংস্কারের তথাকথিত আলোর অন্ধকারে প্রেমের সর্বজগদ্‌গত মহামূর্তিটি দেখিতেই পাইতেছিল না। আজ সর্ববিধ বিধিনিষেধের বন্ধনজাল ছিন্ন হওয়াতে মুক্তির অবারিত আনন্দে প্রেমরূপ দর্শন করিল—দর্শন করিল সর্বজাতি, সর্বজীবন ও সর্বজগদ্‌গত প্রেমের মহারূপ। আনন্দময়ী কোন্ শক্তি বলে হিন্দুর মেয়ে হইয়াও বিদেশীয় বিজাতীয় এই গৌরমোহনকে আপন সন্তানজ্ঞানে লালন পালন করিয়াছেন, গোরা আজ বুঝিল; পরেশবাবু কোন্ শক্তির আনন্দমহিমায় সংসারের যাবতীয় ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করিয়া দ্বন্দ্ববিহীন মানসধামে সমাধিস্থ রহিতে চান, গোরা আজ বুঝিল; বিনয় পরেশবাবুর বাড়িতে কী দেখিয়াছে, কী পাইয়াছে, কোন্ জীবনের মহান জ্যোতির্দর্শনে প্রমুদিত হইয়াছে তাহার জীবন ও যৌবন; গোরা আজ বুঝিল। সুচরিতার চরিত্র-মহিমার কোন্ শক্তিপ্রভাবে গোরা মর্মে মর্মে অননুভূত এক নবীন জীবন আস্বাদন করিতেছিল, গোরা আজ বুঝিল। প্রেমের দৃষ্টিতে বিশ্বজীবন ও বিশ্বজগৎ যেমন নবীনরূপে প্রভাসিত হইল, সীমাময় এই পারিবারিক ক্ষেত্রেও আনন্দময়ী, পরেশবাবু, সুচরিতা ও বিনয়ও তেমনি অপরূপ জ্যোতি-সৌন্দর্যে পুলকিত হইয়া তাহাকে জাগাইল, তাহাকে মাতাইল। পরেশবাবুকে সে গুরু বলিয়া মানিল; আনন্দময়ীকে সত্যকার জননী বলিয়া জানিল; বিনয়কে বন্ধু বলিয়া বক্ষে টানিল; সুচরিতাকে প্রেয়সী বলিয়া পার্শ্বে আনিল।

প্রেম সীমাবদ্ধ নহে, সংস্কারবদ্ধ নহে, দলবদ্ধ নহে। সাম্প্রদায়িক ধর্মবোধের মধ্যে প্রেম নাই, আছে প্রেমের মত্ততা অর্থাৎ মোহ। তাই তাহাতে দলাদলি, হানাহানি, কানাকানি, বিরোধ ও বর্বরতা। মানুষকে আঘাত করিবার, মানুষের ধর্মমত লইয়া

রাগারাগি ও মাতামাতি করিবার যে দুর্বিনীত দুশ্চেষ্টা, প্রেমের আবির্ভাবে তা' অবশ্যই অন্তর্হিত হয়। পরেশ ও আনন্দময়ীর চরিত্রে ইহারই ইঙ্গিত আছে। দ্বন্দ্বময় চঞ্চল জীবনাবেগে একান্তভাবে আমরা অভ্যস্ত বলিয়া দ্বন্দ্ব-চপল অশান্ত চরিত্রগুলিকেই সত্য ও বাস্তব বলিয়া আমরা মনে করি; আনন্দময়ী ও পরেশ-জাতীয় চরিত্রগুলিকে তাই "অবাস্তব রক্তহীন জীব" [রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা পৃ. ৪২৩] বলিয়া উপেক্ষা করিতে আমাদের দ্বিধা জাগে না। জীবনের একটি স্বতন্ত্র স্তরে ইহারা যে কত বড় বাস্তব ও সত্য চরিত্র, কত বিপুল ব্যক্তিত্বের আনন্দচ্ছটায় ইহারা উজ্জ্বল ও প্রসন্ন, এ-কথা আমরা না বুঝিতে পারি, কিন্তু প্রেমে যাহার হৃদয়দ্বার খুলিয়া গেছে, লোকায়ত সাধারণ শিক্ষার সংকীর্ণ বিধিপদ্ধতির মোহবন্ধনগুলি যাহার মন হইতে একবার খসিয়াছে, সে একথা অবশ্যই বুঝিবে। গোরা সংস্কারমুক্ত হইয়া একথা বুঝিয়াছিল। অবশ্য যতদিন ইহা আমরা না বুঝি, অর্থাৎ প্রেমের দৃষ্টিতে যতদিন না মানুষ, মানুষের সমাজ ও ধর্মকে আমরা দেখিতে শিখি, ততদিন মানুষের পৃথিবীতে অবিশ্বাস্য নীচতা ও হীনতার আস্ফালনে যাহারা প্রবল, প্রখর ও মুখর বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, তাহাদেরই আমরা 'বাস্তব রক্তময় জীব' বলিব; কেননা ততদিন আমাদের বোধ, বিচার ও রুচি প্রচলিত বাস্তবজ্ঞানের এতটুকু বেড়াজাল পার হইতেই চাহিবে না। হারাণের দল হৃদয়ের যাবতীয় নীচতা প্রকাশে ও দীনতা প্রকাশে লজ্জাবোধ করে না—ইহা বাস্তব, ইহা বুঝিতে পারি। কৃষ্ণদয়ালের দল নিষ্ফল সন্ন্যাস-সাধনায় মত্ত রহিয়া পদে পদে নিজেদের বঞ্চিত করে—ইহাও বাস্তব, কেননা ইহা বুঝিতে পারি। হরিমোহিনীর দল সর্বস্বান্ত হইয়াও বালিতে বাঁধ বাঁধিবার আশাটুকু ছাড়ে না কিংবা বরদাসুন্দরীর দল ধর্মমোহের অন্ধ আবেগে অতি বড় শ্রদ্ধেয় প্রিয়জনকেও আঘাত করিতে দ্বিধা করে না—ইহাও বাস্তব, কেন না ইহার মধ্যে দুরধিগম্য কোনো রহস্য আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। শুধু আনন্দময়ী কী গুণে কেমন করিয়া নিত্য হাস্যময়ী ও সদাপ্রসন্না থাকেন, আমরা বুঝিতে পারি না; হিন্দুর মেয়ে হইয়া, সন্ন্যাসব্রতধারী স্বামীর স্ত্রী হইয়া, কোন্ সাহসে তিনি খৃষ্টানের সন্তান পালন করেন,—কোন্ আনন্দে আনন্দিতা হইয়া হিন্দুর জাতিভেদবোধ হৃদয় হইতে সহজ আবেগেই জলাঞ্জলি দেন, আমরা ধরিতে পারি না। আবার পরেশবাবুর শান্ত প্রসন্ন 'সুধীর' স্বভাবের প্রহেলিকা আমাদের অনেকের কাছেই নাকি 'দুরধিগম্য' ঠেকে। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তো পরেশবাবুকে 'আদর্শ-স্থানীয়' বলিয়া খানিকটা সম্মান দিতে চাহিয়াও 'পিঙ্গল ও রক্তহীন জীব' আখ্যায় উপেক্ষাই করিয়াছেন। তাঁহার অভিমত এই: "পরেশবাবুর আধ্যাত্মিক প্রভাব ম্যাথু আর্নল্ডের culture-এর মত অনেকটা শীর্ণ ও অভাবাত্মক প্রকৃতিবিশিষ্ট (negative)—ইহা ধ্যানকক্ষের নির্জনতায় নিজেকে পূর্ণতা ও পরিণতি দান করিতে পারে, কিন্তু সংসারের জনাকীর্ণ বিরোধ-মুখরিত পথ দিয়া অপরকে সার্থকতার দিকে লইয়া যাইবার মত শক্তি ইহার নাই।" [বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ. ১৪০-৪১]।

বলা বাহুল্য, শ্রীযুত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই অভিমতটি আমি গ্রহণ করিতে পারি নাই। পরেশবাবুর আধ্যাত্মিক প্রভাব 'অভাবাত্মক প্রকৃতি বিশিষ্ট' নহে। স্বভাবকে শক্ত, সুন্দর ও সংযত করিয়া বাস্তবজীবনেই মানবিকতার মাহাত্ম্যবোধের ও শক্তি-প্রকাশের মর্যাদা আছে পরেশবাবুর প্রাণময় পবিত্র আধ্যাত্মিকতায়। ড. বন্দ্যোপাধ্যায় স্বীকার করিয়াছেন, "পরেশবাবুকে ধর্মসমস্যার গ্রন্থিচ্ছেদনের উপযোগী করিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে।" কিন্তু গ্রন্থিচ্ছেদনের শক্তি পরেশবাবু কোথা হইতে পাইলেন—তাহার কোনো পরিচয় নাই বলিয়া ড. বন্দ্যোপাধ্যায় পরেশ-চরিত্রকে সাহিত্য-বিচারে আমল দিতে বোধকরি চাহেন নাই। ইংরেজী রীতিতে পরেশ-চরিত্র যদি অঙ্কন করা হইত, তবে নিশ্চয়ই তাহার এই আধ্যাত্মিকতার উৎস-সন্ধানে লেখক বহির্গত হইতেন। পরেশ-চরিত্রটি ভারতীয় রীতিতেই বুঝিতে যাওয়া সমীচীন। ধর্মসাধন ব্যাপারে আপনাতে-আপনি বিকশিত চরিত্র-মহিমার কথা ড. বন্দ্যোপাধ্যায় হয়তো বিশ্বাস করেন না; পরেশবাবু কোথা হইতে এমন শুভ্রশান্ত নির্লিপ্ত মন পাইলেন তাহার কোনো পরিচয় গ্রন্থমধ্যে না থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহার নির্লিপ্ত স্বভাবের ধৈর্য ও স্থৈর্য দর্শনে তাঁহার অন্তর্জীবনের স্বরূপ সন্ধান করা কি সত্যই কঠিন? পরেশবাবুর ধৈর্যশান্ত মধুর বচন ও ব্যবহার, তাঁহার বীরপ্রসন্ন স্নেহময় চরিত্র-গাম্ভীর্য, তাঁহার মানবিক মাহাত্ম্যপূর্ণ সদানন্দময় সুন্দর স্বভাব মনোজীবনের যে গোপন সাধনার ইঙ্গিত করে, ভারতীয় সংস্কৃতিবোধের নিকট তাহা প্রহেলিকা নহে, দুরধিগম্য নহে। বিক্ষুব্ধ এই দ্বন্দ্ব-বিহ্বল বাস্তব জগতে সহস্রের ভিড়ে না ভিড়িয়া, সহস্রের দ্বন্দ্বচাপল্যে হাতাহাতি লাঠালাঠি না করিয়া এই জাতীয় চরিত্রগুলি আপনার স্বভাবোচিত বিশ্বজগৎ নির্মাণ করিয়া লয়; দূর হইতে ইহাদের রক্তহীন বাস্তবতাবর্জিত নিষ্প্রাণ বলিয়া কাহারও কাহারও ধারণা হইতে পারে, কিন্তু একথা মনে না রাখিলে চলে না যে, তথাকথিত রক্তময় বাস্তব জীবজগতের প্রয়োজনেই ইঁহাদের আবির্ভাব। ভারতবর্ষ জানে, ইহারা আছে বলিয়াই দ্বন্দ্ব-বিরোধের শেষ সীমারেখাটুকু তবু দেখিতে পাই, জীবনের গহীন ধর্মাদর্শের দুর্গম দেবযান পথে অগ্রসর হইবার নির্দেশটুকু লাভ করি। বিচিত্র এই জগতে বিরোধ-সঙ্কুল দুরন্ত অন্ধ চরিত্রগুলিই একমাত্র সত্য ও বাস্তব নহে; বিরোধকে অক্লান্ত ধৈর্য-সাধনায় শান্তির পথে আনিবার অভিপ্রায়ে দুঃখ বরণ করিয়া যাঁহারা ধীর, ত্যাগ স্বীকার করিয়া যাঁহারা বিনম্র, মার্জনা দান করিয়া যাঁহারা প্রসন্ন—তাঁহারাও সত্য ও বাস্তব। ইঁহাদের জীবন-সাধনা লোকচক্ষুর অন্তরালে ঘটিতে পারে, কিন্তু সাধনার ফল যদি শান্ত সংযম ও ব্যবহারের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়া জগতের কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে, তবে তাহার বাস্তবতা সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া অযৌক্তিক। ধর্মসাধনা যদি বুঝিয়া থাকি এবং আধুনিক পাঠক যদি ইহাকে অবাস্তব একটা শূন্য সাধনা মনে করেন না বলিয়া সাহস দেন, তবেই বলি, এই সাধনায় মানসজীবন বহুক্ষেত্রে বহির্জগৎ অপেক্ষা অন্তর্জগতের আনন্দ হইতেই উন্মেষিত হইতে পারে। তাহার পর অন্তর্জীবনের সেই

উপলব্ধ আনন্দ-সত্যটি যখন বহির্জগতে বিক্ষুব্ধ ও বিড়ম্বিত হয়, তখনই তাহার শক্তি-পরীক্ষা সুরু হইয়া যায়। এই শক্তিপরীক্ষায় অবশ্য হাতাহাতি লাথালাথির সুযোগ নাই। থা' যদি থাকিত, তবে ইহাকে বাস্তব বলিয়া প্রমাণ করিতে এত কথা ব্যয় করিতে হইত না। দ্বন্দ্ব-জীবন যেভাবে আঘাত করে, ধর্মজীবন যদি ঠিক সেইভাবে আঘাত না করিয়া সংযত রহে, এবং সেই সংযত রহার ফলে যদি নানা দিকে নানা ভাবের প্রতিক্রিয়া উঠে চঞ্চল হইয়া, তবে বুঝিতে হইবে, ধর্মজীবন শক্তিপরীক্ষায় জয়ীই হইতেছে। তখন ধর্মজীবনের বাস্তব শক্তি স্বীকার করিতে হয়। এইভাবের বাস্তব হইতেছে পরেশ-চরিত্র। ইহা যত শান্ত, তত জীবন্ত; যত নির্লিপ্ত, তত শক্তিমান ও অপরাজেয়।

ড. বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার মূল্য স্বীকার করেন নাই। "অপরকে সার্থকতার পথে লইয়া যাইবার মত শক্তি ইহার নাই" বলিয়াই তাঁহার ধারণা। গোরা উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া ইহার ঠিক বিপরীত ধারণাই আমি পোষণ করিয়াছি। আমার মনে হইয়াছে, পরেশবাবুর আধ্যাত্মিকতা সংসারের সহস্র মালিন্যের আঘাতে-সংঘাতে আরও শক্তিমান ও ধৈর্যগম্ভীর হইয়া উঠিয়া গোপনে-গোপনে তাঁহাকেই যে শুধু মানবিক মাহাত্ম্যবোধের সমুচ্চ শিখরে উন্নীত করিয়াছে, তাহা নহে, একাধিক অমলিন চরিত্রকেও আপন শক্তি-প্রভাবে জীবনসাধনার সুন্দর 'সার্থকতার পথে' পরিচালিত করিয়াছে। তাঁহার আধ্যাত্মিকতার নীরব শক্তি সুচরিতার মত একটি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছে; বিনয়-ললিতার সুখমিলনে অকৃত্রিম আশীর্বাদ দান করিয়া দ্বন্দ্বাহত এই দুই তরুণজীবনকে অনন্ত সার্থকতার পথে পরিচালিত করিয়াছে; গোরার মত দ্বন্দ্ব-ক্লান্ত বিশাল চরিত্রের সম্মুখে প্রশান্ত হৃদয়-লোকের আলোকবর্তিকা সংস্থাপন করিয়া তাহার জীবনেও চরম চরিতার্থতা আনিয়া দিয়াছে। হারাণের দল যে হারিয়া ফিরিয়া গেল, তাহার কারণ কি এই অচপল ধীর ব্যক্তিত্বের অপরোক্ষ শক্তিপ্রভাব নহে? গোরা উপন্যাসখানি যে মিলনান্তক সুন্দর পরিবেশের আলোক-প্রভাবে পরিশেষে প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছে, তাহার মূলে কি পরেশ-চরিত্রের প্রভাব কিছু কম আছে বলিয়া রসিকেরা ধারণা করিতেছেন? সংসারের বিরোধ-মুখরিত পথে হারাণের দল তাঁহাকে না বুঝিতে পারে, পারিবারিক জীবনে স্ত্রীও তাঁহাকে নানাভাবে ভুল বুঝিতে পারেন, কিন্তু প্রাকৃতিক অমোঘ নিয়মে তাঁহার মূল্য অপরোক্ষভাবে বাড়িয়াই চলে। পরেশবাবুর ব্যক্তিত্ব ও জীবনাদর্শের রূপ ও শক্তি স্বতন্ত্র —গোরা উপন্যাসে ইহার স্বতন্ত্র ও বিশেষত্বপূর্ণ রূপটিই প্রকাশ পাইয়াছে; ইহাকে বুঝিতে হইলে স্বতন্ত্র রীতি নীতি ও পদ্ধতি প্রয়োগেই বুঝিতে হইবে। অন্যথায় তাঁহাকে 'খুব জীবন্ত বলিয়া' বোধ হইবে না।

গোরাতে সহজপ্রেমের দুইজন জীবন্ত সাধক হইলেন আনন্দময়ী ও পরেশবাবু। হিন্দুর কুলরমণী হইয়াও আনন্দময়ী বাৎসল্য স্নেহের আনন্দ মহিমায় জাতিভেদ ভুলিয়া প্রেমধর্মের সত্যটিকে উপলব্ধি করিয়াছেন : গোরার বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও বিনয়-ললিতার বিবাহে যোগদান করিয়া নীরবে আপনার জীবন্ত ব্যক্তিত্বের ও স্বতন্ত্র ধর্মবোধের পরিচয় দিয়াছেন। অপরদিকে পরেশবাবু ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইয়াও সমাজগত ধর্মের ঊর্ধ্বে দেখিয়াছেন মানব-ধর্মের মহিমা। সমাজের বজ্রকঠিন বিরোধিতার সম্মুখে ধীর স্থির থাকিয়া বিনয়-ললিতার বিবাহে আশীর্বাদ করিয়া সম্প্রদায়গত ধর্ম অপেক্ষা মানবহৃদয়গত প্রেমধর্মেরই জয় ঘোষণা করিয়াছেন। গোরা উপন্যাসে ইহা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সমাজ-জীবন ও ব্যক্তি-জীবনে প্রেম বিপর্যস্ত হয়, নিপীড়িত হয়, মসীকৃত হয়, ইহা যেমন সত্য ও বাস্তব,—দুই একটি অটল মহৎ চরিত্রের অচপল নিষ্ঠা ও সাধনায় প্রেম বাহ্যতঃ পরাজিত হইয়াও অন্তরতঃ জয়ের পথে চলিতে থাকে, ইহাও তেমনি সত্য ও বাস্তব। গোরার মধ্যে প্রেম ছিল, কিন্তু সংক্ষুব্ধ জনতার মধ্যে সেই প্রেম যেভাবে প্রকাশ পাইতেছিল, তাহা প্রেমের সত্য স্বরূপ নহে। গোরা-প্রেমের পূর্ণ প্রকাশের পথে তাই এমন আদর্শ চাই যাহাকে অবলম্বন করিয়া তা শক্তি পাইবে, শান্তি পাইবে। কথা উঠিতে পারে, পরেশ বা আনন্দময়ী তো আগেও ছিলেন, তখন কেন গোরা তাঁহাদের দ্বারা প্রবুদ্ধ হয় নাই ? প্রশ্নটি খুবই ছেলেমানুষি হইলেও এড়াইয়া যাওয়া উচিত মনে করি না। গোরা যতদিন সংকীর্ণ জাতিসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল, ততদিন পরেশ বা আনন্দময়ীর সত্য স্বরূপ উপলব্ধি করা তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। পূর্বেই বলিয়াছি, সংস্কারের সংকীর্ণ দৃষ্টির দ্বারা পরেশ বা আনন্দময়ীকে দেখিতে পাওয়া সম্ভব নহে। গোরার শক্তি ছিল অসাধারণ, তবু পিঞ্জরাবদ্ধ বলিষ্ঠ সিংহের মত সংস্কারের বেড়াজালে বন্দী হইয়া সে ফুঁসিতেছিল। যখনি সে জানিল, সে হিন্দু নহে, ব্রাহ্মণ নহে, তখনি মহাপ্লাবনের দুর্মদ তরঙ্গভঙ্গের মত প্রচণ্ড বিক্রমে সমগ্র বিশ্বে সে যেন ব্যাপ্ত হইয়া গেল। কিন্তু ইহাই শেষ কথা নহে। এই বিশ্বব্যাপ্ত বলিষ্ঠ মানসশক্তি শুদ্ধমাত্র ভাবলোক সৃষ্টি করিয়াই শান্ত থাকিতে পারে না। ইহার ব্যবহারিক রূপ চাই—সামাজিক প্রয়োগ চাই। যে শক্তিতে আনন্দময়ী বিজাতীয় গোরাকে বুকে ধরেন, কৃষ্ণদয়ালের সংসারবিমুখ অত্যদ্ভুত সন্ন্যাসাচরণেও ধৈর্য ধরেন,—যে শক্তিতে পরেশবাবু সুচরিতাকে আত্মজা অপেক্ষা অধিক স্নেহদানে সুখী রাখেন, বরদাসুন্দরীর অর্থহীন আঘাত-অবমানকে উপেক্ষা করেন—সেই শক্তির, মানসশক্তির তপস্যাই প্রেমের তপস্যা। এই তপস্যা গোরা-চরিত্রের অনুকূলই বটে, তবু তাহা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পাইতেছিল না। তাই তো গোরা কারণে অকারণে তর্ক করিয়াছে, আপনার চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব-শক্তির বিপুল প্রভাব অপরের উপর প্রয়োগ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছে, পুরাতন বিধিপদ্ধতির জটাজাল শিরে ধরিয়া রুদ্রদেবের মত অশান্ত পদবিক্ষেপে অহরহঃ ঘুরিয়া মরিয়াছে ; কিন্তু পরিশেষে চিত্ত যখন জাগিল, তখন পৃথিবীতে কাহার বা কাহাদের দিকে চাহিয়া সে সার্থকতার পথে অগ্রসর

হইল? গোরা কেন পরেশকে গুরু করিল? জীবন্ত গোরা 'রক্তহীন' এই 'দুরধিগম্য' জীবটির মধ্যে কী পাইল?

সর্বজাতি ও জীবনগত প্রেম ব্যবহারিক ও সামাজিক পরিবেশে কী মূর্তিতে প্রকাশ পাইতে পারে, পরেশবাবু ও আনন্দময়ীর চরিত্র-চিত্রে রবীন্দ্রনাথ তাহারই পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন। এই জাতীয় চরিত্রগুলি অহংমত্ত জীবের মত ছটফট করে না, হৈ-চৈ করে না, ঘাতে প্রতিঘাতে, আঘাতে সংঘাতে লোকচক্ষে আপনাদের উঁচাইয়া ধরিবার চেষ্টা করে না—কিন্তু দৃষ্টি যাহাদের আছে, তাহারা জানে—ইহাদের প্রসন্ন প্রেমের কল্যাণ-সাধনায় বিশ্বজীবন প্রভাবিত হয় বলিয়াই পৃথিবীতে শুধু মন্দ নয়, ভালোও কিছু থাকিয়া যায়। প্রেম এই ভালোর পথে পৃথিবীকে টানিতেছে। রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ এই প্রেমের সাধনায় আজও কর্মরত ও ধর্মতৎপর। কৃষ্ণদয়ালের সংকীর্ণ সন্ন্যাসসাধনা নহে, হরিমোহিনীর লজ্জাকর ছুঁৎমার্গ নহে, হারাণের মিথ্যাচারপূর্ণ অহং-সর্বস্বতা নহে, বরদাসুন্দরীর কুসংস্কারাচ্ছন্ন আভিজাত্যের ঘৃণ্য অন্ধতা নহে—ভারতবর্ষের আত্মা বিরাজ করিতেছে আনন্দময়ীর বিশ্বদর্শী মহান মাতৃপ্রেমে এবং পরেশবাবুর বলিষ্ঠ মানসশক্তির অচপল সংযমে। এই প্রেম বা সংযম বিরোধকে যে এড়াইয়া চলে, তাহা নহে, আপনকার ধৈর্য ও সততার মহিমায় বিরোধকে উহা উত্তীর্ণ হয়। গোরা প্রথমে ইহা বুঝে নাই, কিন্তু সংস্কারমুক্ত হইয়া ইহা বুঝিয়াছিল। নবজন্ম লাভ করিয়া গোরা তাই প্রথমেই পরেশবাবুর কাছে আসিল।

গোরা কহিল, "আজ মুক্তিলাভ করে প্রথমেই আপনার কাছে কেন এসেছি জানেন?"

পরেশ কহিলেন, "কেন?"

গোরা কহিল, "আপনার কাছেই এই মুক্তির মন্ত্র আছে—সেই জন্যই আপনি আজ কোনো সমাজেই স্থান পাননি। আমাকে আপনার শিষ্য করুন। আপনি আমাকে আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম, সকলেরই—যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে, কোনো ব্যক্তির কাছে কোনোদিন অবরুদ্ধ হয় না—যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।"

ইহার পর গোরা আনন্দময়ীর কাছে আসিল।

গোরা কহিল, "মা তুমিই আমার মা! যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসেছিলেন। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই—শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ!···মা এইবার তোমার লছমিয়াকে ডাক। তাকে বলো আমাকে জল এনে দিতে।"

বীর্যপ্রধান যে-প্রেম সম্প্রদায়গত একটা বিশেষ ধর্মের সীমার মধ্যে বন্দী রহিয়া ফুঁসিতেছিল, রুষিতেছিল, সত্যকার পথ না পাইয়া জাতিসংস্কারের পুনরুজ্জীবনেই অন্ধের ন্যায় নিয়োজিত হইতেছিল, আজ বিশেষ ধর্মের বেড়াজাল ভাঙিতে না ভাঙিতেই জীবন্ত

সেই মহান প্রেম মানবিক মাহাত্ম্যবোধের উদার আনন্দ প্রকাশে আচম্বিতে উদগ্র হইয়া উঠিল। ধর্মান্ধ সংস্কারের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষে ছিল বহু ধর্ম, বহু সমাজ বহু মত, বহু আস্ফালন; প্রেমাশ্রিত দৃষ্টিতে সেই সমস্তই একের মধ্যে আধৃত হইয়া আপনার হইয়া উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইল।

রবীন্দ্র-রচনায় এই প্রেমাশ্রিত দৃষ্টির মহিমাই সর্বত্র কীর্তিত হইয়াছে। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে বিশেষ এক মানস-পরিবেশে এই প্রেমদৃষ্টির অনুপম জ্যোতিই বিকীরিত হইয়াছে। নানা বাসনা ও বিভ্রান্তির পথ বাহিয়া দ্বন্দ্বাহত একটি নারীজীবন প্রকৃতি হইতেই প্রেম চিনিল, কহিল: "আর আমি ভয় করিনে—আপনাকেও না, আর কাউকেও না।"

'ঘরে-বাইরে'

দম্পতির প্রেমজীবনে আছে দুইটি দিক - এক শ্রদ্ধার দিক, ভক্তির দিক; অপর ভোগের দিক, মোহের দিক। দাম্পত্য প্রেমে মোহ তৃপ্ত হওয়া চাই-ই চাই। তা' না হইলে প্রেম প্রগাঢ় হয় না, জমাট বাঁধে না। প্রেম প্রগাঢ় হইলে ভক্তিতে তা' ক্রমশঃ যখন রূপান্তরিত হইতে থাকে, তখনই তাহার পক্ষে বাইরের প্রলোভনে লুব্ধ হওয়ার আর ভয় থাকে না। এইজন্য মোহ যেখানে পরিতৃপ্ত হয় নাই, সেখানে বুভুক্ষু চিত্ত ঘর হইতে বাহির হইলে, 'বিশ্বের মাঝখানে' অজস্র প্রলোভনের সম্মুখীন হইলে, সর্বথা অচঞ্চল নাও থাকিতে পারে।

ঘরের মধ্যে যে প্রেমকে মধুর ও একনিষ্ঠ বলিয়া মনে হইতেছে, বাহিরের বিচিত্র চরিত্রের ভিড়ের মধ্যেও প্রেমাস্পদের প্রতি সেই প্রেম যদি তেমনি মধুর ও একনিষ্ঠ থাকে, তবেই বাস্তব জীবন-পরীক্ষায় তাহার বিজয়লাভ সম্ভব হইতে পারে। ঘরের মধ্যে বন্দী প্রেমের মাধুর্যটুকুর অন্তরে অনেক ক্ষেত্রে ফাঁকি থাকিতে পারে, প্রতারণা থাকিতে পারে। এই "ঘর-গড়া ফাঁকির মধ্যে" প্রেমসত্যের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া সম্ভব নহে। নিখিলেশ তাই বিমলাকে কহিল:

—আমি চাই, বাইরের মধ্যে তুমি আমাকে পাও, আমি তোমাকে পাই। ওইখানে আমাদের দেনাপাওনা বাকি আছে।

—কেন, ঘরের মধ্যে পাওয়ার কমতি হল কোথায়?

—এখানে আমাকে দিয়ে তোমার চোখ-কান-মুখ সমস্ত মুড়ে রাখা হয়েছে—তুমি যে কাকে চাও তাও জান না, কাকে পেয়েছ তাও জান না।

—খুব জানি গো, খুব জানি।

—মনে করছ জানি, কিন্তু জান কিনা তাও জান না। আমার ইচ্ছে,…তুমি একবার বিশ্বের মাঝখানে এসে সমস্ত আপনি বুঝে নাও। এই ঘরগড়া ফাঁকির মধ্যে কেবলমাত্র ঘরকরণাটুকু করে যাওয়ার জন্যে তুমিও হওনি আমিও হইনি। সত্যের মধ্যে আমাদের পরিচয় যদি পাকা হয়, তবেই আমাদের ভালবাসা সার্থক হবে।

— পরিচয় তোমার হয়তো বাকি থাকতে পারে কিন্তু আমার কিছুই বাকি নেই।

—বেশ তো, আমারই যদি বাকি থাকে সেটুকু পূরণ করেই দাও না কেন ?

এই বাকিটুকু পূরণের ব্যাপারে নায়ক-নায়িকার মানস সংসারে যে জটিলতার জট পাকাইয়া উঠিল, বাস্তবসংসারে বিপদ ও বিপর্যয়ের স্থচনা দিল দেখা—'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে তাহাই গল্পাংশরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।

নিখিলেশ তাহার স্ত্রী বিমলাকে ঘর হইতে বাহিরে আসিবার সমস্ত স্থযোগই দিল। বাইরে আসার জন্য যে সকল শিক্ষার প্রয়োজন, সে সকল শিক্ষাই দিবার প্রয়াস পাইল। বিমলাকে মেমসাহেবের কাছে পড়াইল। কখনও কোনো ক্ষেত্রে কোনোরূপ জোরজবরদস্তি বিমলার উপর সে করিল না। আপন ইচ্ছার শক্তির দ্বারা বিমলার ইচ্ছাকে প্রভাবিত করিল না কখনও। সন্দীপের সহিত বিমলার যখন খুব মাথামাথি চলিল, তখনও বিমলাকে মুহূর্তের জন্য সংযত করিল না। অন্তরে অন্তরে সে দুঃখ যে পাইল না, তাহা নহে, কিন্তু স্ত্রীকে দুঃখ দিতে সে চাহিল না।

নিখিলের স্বভাবগত এই নির্বিকারত্বের স্থযোগ লইয়া সন্দীপ বিমলার চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিল। নিখিল নিজেই তো বিমলাকে বাহিরে আনিতে চাহিত,—স্থতরাং সন্দীপের পৌরুষদীপ্ত আকুল আহ্বানে ঘর হইতে বাহিরে আসার পথে বিমলার যেন কোনোই বাধা রহিল না। কিন্তু ইহাই প্রধান কথা নহে। বিমলার মধ্যে যে স্বভাব-প্রকৃতিটি ছিল, যে বুভুক্ষা ছিল, নিখিলের নির্বেগ নির্মল ভালবাসায় তাহা যে সত্যকারের তৃপ্তি পায় নাই—বিমলা নিজেই তাহা জানিত না। সন্দীপের অহং-প্রধান পৌরুষের প্রাণময় অগ্নিস্পর্শে বিমলার স্বভাবপ্রকৃতির তন্দ্রা ভাঙিল।

নিখিলেশকে বিমলা ভালোই বাসিত, প্রাণ ভরিয়াই ভালোবাসিত। কিন্তু স্বভাবের জাগরণে সে বুঝিল, নারী চাহে মানুষ, দেবতা নয়। নিখিলের মধ্যে মানুষ অপেক্ষা বাহ্যতঃ দেবতাই ছিল প্রবল। বিমলা তাহাকে পূজা দিয়াই প্রেমের তৃপ্তি অনুভব করিতেছিল। মানুষের দুরন্ত আকর্ষণের আনন্দাস্বাদ পাইবামাত্র দেবপূজা ছাড়িয়া মানুষে দিল মন, মানুষে লাগিল নেশা।

ভালো-মন্দের দ্বন্দ্ব স্থরু হইল তখন হইতে। [ঘরে-বাইরে, গ্রন্থ পরিচয় দ্রষ্টব্য, পৃ. ৩০১-২]। একদিকে দেববুদ্ধির টান অপর দিকে স্বভাবপ্রকৃতির আকর্ষণ—দুইয়ের মধ্যে সংকীর্ণ পথটুকু বাহিয়া বিমলা চলিল। ভুল হইল অনেক। বিমলা ভুলিতে বসিল

পারিবারিক ইতিকর্তব্য, স্বামীর প্রতি তাহার স্বাভাবিক যত্ন-সমাদর। সন্দীপের যৌবন-চপল বাগ্মিতার ও কামনাদীপ্ত পৌরুষের অমোঘ আকর্ষণে সে ঘর হইতে আসিতে চাহিল বাহিরের পথে।

নিখিলেশ এতটুকু বাধাপ্রদান করিল না। নিখিলের সম্মুখেই সন্দীপ 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রটি বদলাইয়া 'বন্দে প্রিয়াম্' বলিয়া উন্মাদ-নেশায় চিৎকার করিল, তথাপি নিখিল রহিল নীরব। সন্দীপের আচরণে সে ক্ষুব্ধ হইল, বিমলার আচরণে সে দুঃখ পাইল, কিন্তু স্বামি-মানুষটার যে স্বাভাবিক ক্রোধ ও প্রভুত্ববোধ তাহা তাহার মধ্যে বাহ্যতঃ প্রকাশ পাইল না।

পরের ঘরণী লইয়া সন্দীপের এই মাতামাতি এবং নিজের স্ত্রীর উপর পরিপূর্ণ ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও নিখিলের এই বাহ্য নির্লিপ্ততা ও নির্বিকারত্ব—সামাজিক দৃষ্টিতে অবশ্যই অযথা ও অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হওয়া সম্ভব। লোকদৃষ্টিতে অস্বাভাবিক যে দুইটি চরিত্রের মধ্যে থাকিয়া বিমলার জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে, সেই দুইটি চরিত্রের মূল উপাদান-সন্ধানে রত হইলেই কিন্তু বুঝা যায়—প্রেমজীবনের দুইটি দিক (মলিনা-বাসনা ও বিশুদ্ধা-বাসনা) স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিবার আনন্দই ঘরে-বাইরের কাহিনী রচনায় লেখককে প্রেরণা দিয়াছে। সম্ভবতঃ এই দিক দিয়া বিচার করিয়াই স্বর্গতঃ প্রমথ চৌধুরী মহাশয় গ্রন্থখানির মধ্যে রূপকত্ব লক্ষ্য করিয়াছেন। [গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য, পৃ. ৩০৪]। ঘরে-বাইরে উপন্যাসই বটে। তবে ইহার বিশেষত্ব হইতেছে এই যে, শিল্পবোধ ও দর্শনবোধ—অর্থাৎ গল্পরস ও রূপকতত্ত্ব—রসতত্ত্বের এই নয়নদ্বয় দ্বারা ঘরে-বাইরের সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করিতে হইবে। শুদ্ধমাত্র গল্প বলিলে নিখিলেশের ধৈর্য ও সংযমকে অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হইবে; 'ব্যবহারিক···বাস্তবতার সঙ্গে সম্বন্ধ' নাই বলিয়া নিখিলকে 'ছায়ামূর্তি' বলিয়া ভ্রমও হইবে। [রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা, পৃ. ৪৪৯]। সন্দীপের নির্লজ্জ উন্মাদ ব্যবহারও স্বাভাবিক বলিয়া ধারণা হইবে না। ঘরে-বাইরে উপন্যাসে গল্প ছাড়াইয়া প্রেমতত্ত্বের যে রূপকবাণী আছে তাহার সন্ধানে যাইতে না চাহিলে গল্পের সামগ্রিক সৌন্দর্য ধরা পড়িবে না।

আপাততঃ স্বীকার করা যাউক—নিখিল হইতেছে প্রেম-জীবনের বিশুদ্ধা-বাসনার মানবমূর্তি। এখানে নিখিল রূপক, এবং এই কারণে কেমন যেন তাহাকে ছায়ামূর্তি বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে—অধ্যাপক চন্দ্রনাথবাবুর সংযত প্রেমের প্রভাব আছে তাহার চরিত্রে। শুধু তাহাই নহে, সে বিমলা নাম্নী একজন মানবীর স্বামী। এখানে রূপকত্বের মেঘাবরণ ভেদ করিয়া তাহার মানবরূপ প্রকাশিত। এই মানবটি স্ত্রীকে গভীরভাবেই ভালবাসে। এই ভালবাসার আবেগে স্ত্রীকে যদি সে পদে পদে আগলাইত, মারিত ধরিত, আবার বুকে ধরিয়া সোহাগও করিত—তবে তাহার সম্বন্ধে আর কোনো গোলই বোধহয় থাকিত না অর্থাৎ তাহাকে সহজেই বুঝা যাইত। কিন্তু দেখা

গেল, অপরূপ এই মানুষটি ভালবাসে বলিয়াই ভালবাসার জনকে সকল বিষয়ে মুক্তি দিতে চায়; বাঁধিতে চাহে না, জোর ফলাইয়া স্বামিত্ব-স্থাপনে পৌরুষ প্রকাশ করে না। এ-বিষয়টি সাধারণ বিচারে একটু দুর্বোধ্যই ঠেকে।

ঘরে-বাইরে উপন্যাসে রস ও তত্ত্বের সমাবেশ ঘটিয়াছে। কোন্ তত্ত্বের? প্রেমতত্ত্বের। প্রেমের চরম আনন্দ কিসে? মুক্তিতে। বন্ধনকে স্বীকার করিয়াও তাহা ছাড়াইয়া উঠার সাধনায়, অর্থাৎ মুক্তির সাধনায় প্রেমের আনন্দ। এই আনন্দ, এই আনন্দ-স্বভাব নিখিলেশের। কিন্তু এই আনন্দ বা আনন্দ-স্বভাব কি সংসারজীবনে সত্য? 'সত্য' কথাটি স্থূলভাবে গ্রহণ করিলে বলিতে হইবে যে, সংসারজীবনে এই আনন্দ সত্য নয়। কিন্তু মনোজীবনে ইহা সত্য, বৃহত্তর সত্য। মন ইহা চায়, পায়ও; কিন্তু স্থূলসংসারে ইহাকে পাইয়াও পায় না। এইজন্য প্রেম মনের উচ্চ শিখরে একান্তভাবে সত্য ও উজ্জ্বল বলিয়া স্বীকৃত ও গৃহীত হইলেও সংসারের সীমায় তাহার প্রকাশ ঠিক মনের মতো নহে। নিখিল এই প্রেমকে চরিত্রে প্রকাশ করিতে গেছে। সামাজিক দৃষ্টিতে এখানে সে অবাস্তব; আলংকারিক ভাষায়, এখানে সে রূপক মাত্র। কিন্তু প্রেমের ব্যর্থতায় সে কি অন্তরে-অন্তরে বেদনা পায় নাই? দুঃসহ অভিমানের দুর্ভর বেদনায় সে কি বিনিদ্র রজনী যাপন করে নাই? নিখিল মুক্তিময় সর্বজয়ী প্রেমই চাহিয়াছে বটে, কিন্তু তবু সে রক্ত-মাংসের শরীরধারী পৃথিবীর মানুষ বলিয়া বাহিরের মত অন্তরে স্থির থাকিতে পারে না; এবং থাকিতে পারে না বলিয়াই বাস্তবজগতে সে আর 'ছায়ামূর্তি' বা রূপক থাকে না। মনের কথা যাহারা জানে তাহারা অবশ্যই জানে—আদর্শ সত্ত্বেও সে বেদনা পায়, চেতনা হারায়। এই হারানোর আশীর্বাদেই নিখিল রূপকের অস্পষ্টতা ছাড়াইয়া রূপজগতের স্পষ্টতায় নামিয়া আসে। চেতনার ঔদার্যে নিখিল রূপক, বেদনার প্রাখর্যে নিখিল রূপশিল্প।

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের স্বরূপও এই। চেতনাংশে প্রেম সর্বজগদ্‌গত, মুক্তিময়। জীবনে ইহা অনুভব করি, প্রকাশও করিতে যাই, কিন্তু কিছুতেই যেন কিছু হয় না। তাই বেদনা জাগে, জাগে বেদনার সপ্তরঙ্ বিচিত্র রঙ। তত্ত্ব সত্য বটে; তাহাই ধ্রুব, তাহাই গন্তব্য ও প্রাপ্তব্য। কিন্তু এখনও যে পাই নাই—তাই তো চাপল্য, তাই তো অহরহঃ অগ্রগতি। এই গতিলীলাই তো শিল্পের প্রাণস্পন্দন। তত্ত্বকে পাওয়া গেলে ইহার আর কোন প্রয়োজন ছিল না; প্রেম যদি সংসারে বিপর্যস্ত না হইত, তবে শিল্প-প্রকাশের প্রয়োজনবোধ জাগিত না।

গল্পে নামিয়া আসি। বলিতেছি, নিখিল যদি দেখিত বিমলা বাহিরে আসিয়াও অচঞ্চল প্রেমসাধনায় নিখিলকেই স্মরণ করিতেছে, বরণ করিতেছে, তবেই নিখিলের বেদনা থাকিত না—ক্ষোভ জাগিত না। প্রেমতত্ত্বের আদর্শের জয় ঘোষিত হইত; বেশ একটি উপদেশমূলক তাত্ত্বিক গল্প রচিত হইত। কিন্তু তাহা শিল্প হইত না—রস হইত না।

রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক বটেন কিন্তু কবিদার্শনিক। প্রেমই তাঁহার ধ্রুব সত্য ; এই সত্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই তিনি চলিয়াছেন। কিন্তু চলার পথে যে সকল অন্তরায় তাঁহাকে পীড়া দিয়াছে, পিছনে টানিয়াছে, মাটিতে ফেলিয়াছে—তাহাদের প্রতি উদাসীন থাকিয়া শুদ্ধমাত্র চেতনতত্ত্ব লইয়াই তিনি কারবার করেন নাই। নিখিল-চরিত্র এই দিক দিয়া কবির প্রেমমানসটি চমৎকারভাবেই ব্যক্ত করিয়াছে! কবির প্রেম চেতনাংশে বিশ্ব-জীবনগত, বেদনাংশে ব্যক্তিজীবনগত। একদিকে ইহা দেবপ্রকৃতি, অপরদিকে ইহা মানবস্বভাব। একদিকে ইহা তত্ত্বসত্য, অপরদিকে শিল্পসত্য ; একদিকে দর্শনের আত্মা—অপরদিকে কাব্যের প্রাণ। নিখিল-চরিত্রটি এই প্রেমতত্ত্বের দিক দিয়া বিচার করিলে সর্বতোভাবে তাহা আর ছায়ামূর্তি বলিয়া মনে হইবে না। ফল কথা, ব্যবহারিক জীবনে ক্ষমাশীল নির্বিকার রহা সত্ত্বেও মানসিক জীবনে মানুষের মতই নিখিলেশ যে বেদনা, ক্ষোভ ও অভিমান অনুভব করিতেছে, তাহাই তাহার বস্তুগত মানবিকতার পরম প্রামাণ্য।

নিখিলেশের মর্মময় গোপন বেদনা তাহাকে 'মানুষ'রূপেই প্রকাশ করিয়াছে। সংসারে যা ঘটে, তাহার তরঙ্গ তাহাকে আন্দোলিত করে, চঞ্চল করে, কিন্তু শান্ত ধৈর্যের সহায়তায় সে তাহা অতিক্রম করিতে চাহে—ইহাই তাহার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথের অভিমত এই—এই অতিক্রম করার শক্তি-সাধনাই মনুষ্যত্ব। এই মনুষ্যত্বের তত্ত্বটি বাদ দিয়া নিখিল-প্রেম বুঝা সম্ভব নহে।

পরবর্তী যুগে 'মহুয়া'-কাব্যে "দায়মোচন" নামক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ প্রেমের যে মর্ম প্রকাশ করিয়াছেন—নিখিল-চরিত্র সেই মর্মেরই অভিব্যক্তি। সন্দীপ হইতেছে 'ছবি ও গানে' প্রকাশিত "রাহুর প্রেম" কবিতার রাহু। একদিকে নিখিল, অপরদিকে সন্দীপ, মধ্যে বিমলা—অর্থাৎ একদিকে প্রেম, অপরদিকে মোহ, মধ্যে মানবপ্রকৃতি—এই তো ঘর ও বাহির, মধ্যবর্তী মানুষ আমরা ভালোমন্দের নিত্য দ্বন্দ্বে অহরহঃ সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছি।

এই সংগ্রামে জয় কাহার? প্রেমের, না মোহের? এই প্রশ্নের উত্তর কিছুমাত্র কঠিন নহে। অধিকতর বাস্তবদৃষ্টিতে অর্থাৎ সংসারজীবনের জ্ঞানদৃষ্টিতে মোহের জয় হইল বলিয়া ধারণা হইতে পারে, কিন্তু বৃহত্তর বাস্তবদৃষ্টিতে, সোজা কথায়, মনোজীবনের ধ্যানদৃষ্টিতে মোহের জয় কখনোই হইতে পারে না। জীবনে মোহের অবশ্য প্রয়োজন আছে—যতক্ষণ আছে, ততক্ষণই তাহার মূল্য। তাহার পরে আর নহে। চিত্ত যতক্ষণ ভোগলিপ্সু, অহং-প্রমত্ত, ততক্ষণ মোহ সুন্দর, মোহ সত্য ; কিন্তু জীবনের চলতিপথে অহং-এর প্রমত্ততা কোনো-না-কোনো কারণে মন্দীভূত হয়ই হয়। তখন মোহের মায়াজাল ছিন্ন হয়—প্রেম আবির্ভূত হয় বিজয়ীর মতো। এই যে তত্ত্ববিশ্বাস, রবীন্দ্র-সাহিত্যের ইহাই প্রাণশক্তি। মোহ হইতে জাগ্রত হইয়া প্রেমের পথে যাইতে হইবে, জীবনে

ঘোষিত হইবে প্রেমের জয়—ইহাই রবীন্দ্রনাথের মানস-জীবনের মূলকথা, কথার কথা। রবীন্দ্র-সাহিত্যে তাই মোহের জয় হইতে পারে না, প্রেমের জয় হইবেই হইবে। বিমলাকে তাই সন্দীপ-মোহের বাহির পথ হইতে নিখিল-প্রেমের মন্দিরলোকে পূজারিণীর মত বসিতেই হইবে।

মোহের আতিশয্য হইতে বিমলা নূতন প্রাণ পাইল, নবজীবনের উদ্বোধনে নূতন করিয়া সে প্রেমের পূজা করিল শুরু। তাহার জীবনে সন্দীপের অভ্যুদয় অসার্থক নহে। সন্দীপ হইতেই সে বহির্মুখী প্রাণোচ্ছ্বাসের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে; ইহা না হইলে সে প্রেমের মহিমা যথার্থভাবে উপলব্ধি করিত না। অপরপক্ষে এই সন্দীপের প্রভাবেই নিখিলেশও তাহার নির্লিপ্ত প্রেমের সাংসারিক ব্যর্থতা অনুভব করিতে শিখিয়াছে; বুঝিয়াছে—বিমলাকে সে ভালোবাসিয়াছে বটে, কিন্তু সেই ভালোবাসায় পার্থিব জীবনের আনন্দ অপূর্ণ ই রহিয়া গেছে। পার্থিব জীবনের প্রেমে, দম্পতির প্রেমজীবনের আনন্দে, উত্তপ্ত যৌবনমোহের আভাস কিছুটা থাকা চাই। এই যৌবনমোহ যদি নিখিলের চরিত্রে থাকিত, বিমলার জীবনপথে সন্দীপের প্রয়োজনই হইত না,—নিখিল-চরিত্রেই বিমলা সন্দীপ-মোহ অনুভব করিয়া পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠিত—অর্থাৎ যে বুভুক্ষা বিমলাকে সন্দীপের পথে টানিয়াছিল, তাহা নিখিল-চরিত্র দ্বারাই প্রশমিত হইতে পারিত।

বিমলা মানব-প্রকৃতির একটি বাস্তব চিত্র। প্রেম ও মোহ, ভালো ও মন্দের আকর্ষণ ও বিকর্ষণে তাহার উন্মেষ ও অভ্যুদয়। সন্দীপ এই প্রকৃতির প্রয়োজনেই আসিয়াছে, প্রয়োজন শেষ হইলেই গেছে চলিয়া। এইভাবে বিচার করিলে ঘরে-বাইরের অন্তর্নিহিত জীবনতত্ত্বটি ধরা পড়ে। এইভাবে বিচার করিলে বুঝা যায়, সন্দীপ কেন "রাজবেশের অন্তরালে খড়মাটিরাংতার শুষ্ক কঙ্কাল"। [বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ. ১৪৮]। মোহ আপাতঃ মধুর, অব্যর্থ তাহার আকর্ষণ, সন্দীপের মত অমোঘ তাহার শক্তির প্রভাব। কিন্তু পরিণাম তাহার রাজবেশের ঔজ্জ্বল্য নহে, খড়মাটিরাংতার দীনতাই তাহার পরিণাম। তাহা যদি না হয়, অর্থাৎ পরিণামেও যদি তাহার রাজবেশের অত্যুজ্জ্বল মহিমা প্রকাশ পায়, তবে বুঝিতে হইবে, তাহা মোহ নহে, তাহা অন্যতর কোনো মহান মানসবৃত্তি; প্রকৃতির যে প্রয়োজনে সন্দীপের অভ্যুদয়, সেই প্রয়োজন মিটাইতে প্রথমে রাজবেশ, পরে খড়মাটি-রাংতার কঙ্কাল প্রকাশই স্বাভাবিক সত্য এবং সঙ্গত। সন্দীপ যদি তাহার "দেশপ্রীতির আবরণে নির্লজ্জ ভোগলোলুপতার বীভৎস প্রকাশ" না করিত, "যদি সে নিখিলেশের যোগ্য-প্রতিদ্বন্দ্বী-পদবাচ্য হইতে পারিত, তবে বিমল সন্দীপের পথ হইতে না-ও ফিরিতে পারিত" —এইরূপ মন্তব্য কয়েকজন সমালোচকের রচনায় আমি দেখিয়াছি। [তদেব, পৃ. ১৪৮-৪৯] বলা বাহুল্য এইরূপ মন্তব্যের কোনো তাত্ত্বিক বা সাহিত্যিক মূল্য আছে বলিয়া আমি মনে করি নাই। পরের ঘরণীকে যৌবনমোহের নির্লজ্জ আতিশয্যে টান দিবার অভিরুচি ও প্রবণতা যাহার চরিত্রে প্রবল, টান দিবার পরক্ষণে সে সাত্ত্বিক হইয়া, ভোগলোলুপতার

উর্ধ্বে উঠিয়া নিখিলের মত চরিত্রধর্মের মহত্ত্ব রক্ষা করিবে, ইহা চিন্তার অতীত ব্যাপার। তবু যদি তর্কের খাতিরে বলিতে হয় যে, তাহাও অসম্ভব নয়, তবে গল্পের একটু হেরফের হইতে পারে, কিন্তু প্রেমব্যাখ্যার কোনো অসুবিধাই হয় না। নিখিলেশের প্রতিদ্বন্দ্বী-পদবাচ্য হইতে হইলে সন্দীপকে উন্নতমনা হইতে হইত; অর্থাৎ তখন এই মোহ-মোহন সন্দীপে চলিত না, প্রেমসুন্দর সন্দীপের প্রয়োজন হইত। মোহ প্রেমরূপে ফলিয়া উঠিলে বিমলা যদি তাহার পক্ষ অবলম্বন করিত, তবে প্রেমের জয়ই সূচিত হইত। এই প্রেমের জয়বার্তাই তো ঘরে-বাইরে উপন্যাসে ঘোষিত হইয়াছে। সন্দীপ 'মোহ' না হইয়া 'প্রেম' হইলে যা' হইত—নিখিলেশ তো তাহাই। বিমলা নিখিলে যে ফিরিয়াছে, তাহা তো প্রেমধর্মের দিক দিয়া সহজ ও স্বাভাবিকই হইয়াছে।

কিন্তু যা' বলিতেছি। অনেকেই ধারণা করিয়াছেন, নিখিলের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী নহে বলিয়াই সন্দীপের পরাজয় ঘটানো সম্ভব হইয়াছে। আমার তাহা মনে হয় নাই। সন্দীপের চরিত্রমধ্যেই তাহার পরাজয়ের বীজ রহিয়াছে। পরের ঘরণীর উপর তাহার লোভ ও মোহই তাহাকে জীবনাদর্শের কোনো সংকল্পে দৃঢ় ও অচপল রহিতে দেয় নাই। অবশ্য এই মোহ আছে বলিয়াই সাময়িকভাবে সে বিমলাকে টানিতে পারিয়াছে, আবার এই মোহই তাহাকে জীবনসংগ্রামে পরাজয়ের পথে টানিয়া আনিয়াছে। একথা অস্বীকার করি না যে, এই মোহকে প্রেমে রূপান্তরিত করার প্রবণতা বা সাধনা যদি সন্দীপ-চরিত্রে দেখা যাইত, তবে তাহার পরাজয় নাও ঘটিতে পারিত। কিন্তু সন্দীপে তাহা কোনোকালেই দেখা যায় নাই। সন্দীপ নিখিল নহে, নিখিলের প্রতিদ্বন্দ্বীও নহে—সন্দীপ, সন্দীপ-ই। তাহার মোহ-বৈশিষ্ট্য লইয়াই সে সাহিত্যাকাশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত জ্বলজ্বল করিতেছে। সন্দীপ-চরিত্রে এই মোহ নিপুণভাবেই লেখক চিত্রিত করিয়াছেন। বিমলাকে টান দিবার পূর্বে আরও দুইজন রমণীকে সে আকর্ষণ করিয়াছিল—সন্দীপের মুখ দিয়া একথা ব্যক্ত করিয়া সন্দীপ চরিত্রের অন্তর্গূঢ় বৈশিষ্ট্য লেখক তো প্রকাশই করিয়াছেন। তত্ত্বের বিচারে তো নয়ই, সাহিত্যের বিচারেও সন্দীপ নিখিলের প্রতিদ্বন্দ্বী-পদবাচ্য হইতেই পারে না। ড. বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন : "বৈধ প্রেমের উৎকর্ষ" দেখাইবার জন্যই "অবৈধ প্রেমকে" অর্থাৎ সন্দীপকে লেখক "হীনবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন।" [উপন্যাসের ধারা, পৃ. ১৪৯]। বৈধ প্রেম বা অবৈধ প্রেম সামাজিক ব্যাপার বলিয়া ইহার সংস্কার কিছু-না-কিছু চরিত্রে ও মনে থাকা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু নিখিলেশ কি বৈধ প্রেমের জোরেই বিমলাকে টানিয়া রাখিতে চাহিয়াছে? ঘর হইতে বাহিরে প্রেমকে মুক্তি দিয়া সে কি সমাজাতীত ধ্রুব প্রেমকে বুঝিতে ও খুঁজিতে চাহে নাই? এই খুঁজিতে চাওয়ার কল্পনাতেই কি প্রেম সম্বন্ধে তাহার উদার ধারণা প্রকট হয় না? ঘরে-বাইরে উপন্যাসে বৈধ প্রেম তাহার সামাজিক বৈধতার জন্যই মূল্যবান নহে,— তাহার ত্যাগ, তাহার সংযম, তাহার দায়মোচনের দীর্ঘশ্বাস, তাহার নৈরাশ্যনদী

কোমলাতিকোমল হৃদয়বেদনা, প্রভৃতি মানবিক মাহাত্ম্যের গুণেই তাহা শ্রদ্ধেয় ও মূল্যবান। অপরপক্ষে অবৈধ প্রেম তাহার সামাজিক অবৈধতার জন্যই হেয় হয় নাই; তাহার নির্লজ্জ ভোগলোলুপতার আতিশয্যেই হেয় হইয়াছে। ঘরে-বাইরে উপন্যাসে বৈধ ও অবৈধ প্রেমের প্রসঙ্গ না তুলিয়া প্রেম ও মোহের প্রসঙ্গ তোলাই যুক্তিসঙ্গত। প্রেম ও মোহের প্রসঙ্গ তুলিলে "মানদণ্ড নিরপেক্ষভাবে ধরা"র কথা আর উঠিবে না; তখন বুঝা যাইবে—প্রেম প্রেম-ই, মোহ মোহ-ই, যেমন নিখিল নিখিল-ই, সন্দীপ সন্দীপ ছাড়া আর কেহ নহে। "নিখিলেশের প্রেমের যথাযথ মূল্য" সন্দীপ যত না বোঝে, ততই তাহার চরিত্রবৈশিষ্ট্য সাহিত্যিক সৌন্দর্যে জ্বলজ্বল করিয়া উঠে।

আর একটি বিষয় উত্থাপন করিয়া বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করিব। পাঠক মহাশয় লক্ষ্য করিয়াছেন, নিখিল বিমলাকে বাহিরে আনিবার প্রস্তাব নিজেই করিয়াছে, কিন্তু বাহির-পথে আসিয়া সন্দীপের মোহে বিমলা যখন আকৃষ্ট হইয়াছে তখন নিখিল মর্মতঃ আর উদাসীন রহে নাই, গোপনে বেদনা পাইয়াছে, লুকাইয়া 'হতাশার দীর্ঘশ্বাস' ফেলিয়াছে। এই বিষয়টি অনেকের নিকট জটিল বলিয়া মনে হইয়াছে। আমি তাহা মনে করি নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, হতাশার এই দীর্ঘশ্বাস আছে বলিয়াই নিখিল মানুষ, নিখিল বোধগম্য। নিখিলমানুষটি কেমনতর? তাহার মর্মে আছে ধ্রুবসুন্দর প্রেম—সেখানে সে আদর্শবাদী। এই প্রেমের আদর্শ সে চরিত্রে প্রতিভাত করিতে চাহে—ব্যবহারিক জীবনে কতকটা প্রকাশও করে, কিন্তু মানুষ হিসাবে সে তো এখনও এই আদর্শকে পূর্ণভাবে লাভ করে নাই—তাই তো হতাশার দীর্ঘশ্বাস। এই দীর্ঘশ্বাস শিল্পকলার দিক হইতে যেমন সহজ ও শোভন, তত্ত্ববিচারের দিক হইতে তেমনি সত্য ও সঙ্গত। রবীন্দ্রদর্শন তো নির্বেগ জীবনবাদ নহে। জীবনে উচ্চতর ধর্মের কল্পনা আছে, কল্পনা অসার্থক হইলে দুঃখ আছে, দুঃখ রচনা করার প্রবণতাও আছে, আবার দুঃখকে স্বীকার করিয়া, সহ্য করিয়া, সংযত ও শক্ত রহার সাধনায় উচ্চ ধর্মে অগ্রসর হওয়ার শক্তিও আছে। নিখিলেশ প্রথম জীবনে আদর্শবাদী; তৎপরে সংসারজীবনে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতায় ক্রমশঃ হইয়াছে সহজবাদী। এইজন্য প্রেমাস্পদের উপর কোনো ক্ষেত্রেই সে জোর বা জুলুম করিতে চাহে না। সংসারজীবনে ইহার জন্য তাহাকে বেদনা সহিতে হইয়াছে বিস্তর, কিন্তু পরিশেষে তাহার প্রেমের সহজ-সাধনা সার্থকতা লাভ করিয়াছে। ড. বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য প্রেমের এই সার্থকতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইতে পারেন নাই। "শেষ পর্যন্ত বিমলার সহিত তাহার সম্বন্ধ সহজ ও স্বাভাবিক হইয়াছে কি না, তাহা অনিশ্চয়তায় আবৃত আছে" [উপন্যাসের ধারা, পৃ. ১৪৯] বলিয়া তিনি নিখিল-বিমলার প্রেমমিলন সম্বন্ধে খানিকটা সংশয়ই প্রকাশ করিয়াছেন। ঘরে-বাইরে উপন্যাসখানি আগা-গোড়া পাঠ করিবার পর পুনর্বার বিমলার প্রথমতম আত্মকথা অবহিত হইয়া পাঠ করিলে এ সংশয় অবশ্যই দূরীভূত হইবে। নিখিলের উপর বিমলার ভক্তি ছিল, ভালবাসা ছিল;

সে ভালবাসা সন্দীপের মোহে মন্দীভূতও হইল—কিন্তু নানা কারণে আবার সন্দীপের প্রতি বিমুখ হইয়া ঘরেও ফিরিল। এ-সময়ে নিখিলেশ বিমলাকে উপেক্ষা করিতে পারিত, দূরে ঠেলিতে পারিত; কিন্তু নিখিল-চরিত্রের স্বরূপ যাঁহারা বুঝেন, তাঁহারা জানেন—নিখিলের পক্ষে তাহা সহজ নহে, স্বাভাবিক নহে। নিখিলেশ সহজ প্রেমাবেগেই বিমলাকে গ্রহণ করিল। নিখিলের কথা তুলিতেছি :

"একটা কি খট্ করে উঠল—ফিরে তাকিয়ে দেখি, বিমলা দরজার কাছ থেকে ফিরে যাচ্ছে। বোধহয় দরজার পাশে এসে এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল—ঘরে ঢুকবে কি না ঢুকবে ভেবে পাচ্ছিল না, শেষে ফিরে যাচ্ছিল। আমি তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ডাকলুম, বিমল!

"সে থমকে দাঁড়ালো, তার পিঠ ছিল আমার দিকে। আমি তাকে হাতে ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে এলুম।

"ঘরে এসেই মেঝের উপর পড়ে মুখের উপর একটা বালিশ আঁকড়ে ধরে তার কান্না। আমি একটি কথা না বলে তার হাত ধরে মাথার কাছে বসে রইলুম।

"কান্নার বেগ থেমে গিয়ে উঠে বসতেই আমি তাকে আমার বুকের কাছে টেনে নেবার চেষ্টা করলুম। সে একটু জোর করে আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে হাঁটু গেড়ে আমার পায়ের উপর বার বার মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতে লাগল। আমি পা সরিয়ে নিতেই সে দুই হাত দিয়ে আমার পা জড়িয়ে ধরে গদ্ গদ্ স্বরে বললে, না না না, তোমার পা সরিয়ে নিয়ো না—আমাকে পূজা করতে দাও।" [পৃ. ১৮১-৮২]।

ইহার পরবর্তী অধ্যায়—শেষ অধ্যায় : বিমলার আত্মকথা। এই আত্মকথার প্রথমাংশ তুলিতেছি :

"চলো, চলো, এইবার বেরিয়ে পড়ো—সকল ভালবাসা যেখানে পূজার সমুদ্রে মিশেছে সেই সাগর-সঙ্গমে। সেই নির্মল নীলের অতলের মধ্যে সমস্ত পঙ্কের ভার মিলিয়ে যাবে। আর আমি ভয় করিনে—আপনাকেও না, আর কাউকেও না। আমি আগুনের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসেছি—যা পোড়বার তা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, যা বাকি আছে তার আর মরণ নেই। সেই আমি আপনাকে নিবেদন করে দিলুম তাঁর পায়ে যিনি আমার সকল অপরাধকে তাঁর গভীর বেদনার মধ্যে গ্রহণ করেছেন।" [পৃ. ২৮৩]

ইহার পর বিদ্রোহী প্রজাদের অত্যাচার দমন করিতে গিয়া নিখিলেশের "মাথায় বিষম চোট" লাগিল। এই 'চোট' লাগার ব্যাপারটি সাহিত্যের প্রয়োজনে তথা প্রেম-মিলনের প্রয়োজনে কতদূর সার্থক—একটু চিন্তা করিলেই বুঝা সম্ভব। 'চোট' লাগার কথাটি আগাইয়া দিয়া লেখক গল্পকাহিনী শেষ করিয়াছেন—কিন্তু ইহার পূর্বে সুকৌশলে নিখিল-বিমলার সহজ মিলনজাত প্রেমমানসের পরিচয়টি দিয়াছেন বলিয়া আহত নিখিলের শয্যাপার্শ্বে পূজারতা বিমলার সেবারতা সুন্দর মূর্তিটি অস্পষ্ট আর থাকিতেছে না। সেবার

মধ্য দিয়া এইবার উভয়ের প্রেম সংসারজীবনেও দৃঢ়ীভূত হইবে—ইহা অনুমান করা এখন আর কঠিন নহে। যিনি এত বড়, এত মহৎ, আমার দোষ সত্ত্বেও আমাকে মার্জনা করেন, গ্রহণ করেন,—যাঁহাকে দেখিয়া পূজার ভাব অনুভব করিয়াছি, যাঁহার মহিমায় আত্মদোষ লক্ষ্য করিবার দৃষ্টি জাগিয়াছে—তাঁহাকে আহত দেখিয়া সেবা যে করিব, সেবার দ্বারা আপনাকে নূতন করিয়া আবিষ্কার করিব, সহজ সম্বন্ধের নবাগত চেতনায় কাঁদিতে কাঁদিতে জাগরিত হইব, অগ্রসর হইব তুচ্ছ হইতে উচ্চের আনন্দ-পথে—ইহা অনুমান করা যদি কঠিন হয়, তবে ঘরে-বাইরে পাঠ অসার্থক হইবে।

"প্রেমের থালায় ভক্তির পূজা আরতির আলোর মতো—পূজা যে করে এবং যাকে পূজা করা হয়, দুইয়ের উপরেই সে আলো সমান হয়ে পড়ে। আমি আজ নিশ্চয় জেনেছি, স্ত্রীলোকের ভালবাসা পূজা করেই পূজিত হয়—নইলে সে ধিক, ধিক। আমাদের ভালবাসার প্রদীপ যখন জ্বলে তখন তার শিখা উপরের দিকে ওঠে, প্রদীপের পোড়া তেলই নিচের দিকে পড়তে পারে।" [পৃ. ১২]।

ঘরে-বাইরে আলোচনার শেষপ্রান্তে ইচ্ছা করিয়াই বিমলার প্রথমতম 'আত্মকথা'র একাংশ উদ্ধৃত করিলাম। পাঠক লক্ষ্য করিবেন—বিমলার শেষ আত্মকথার প্রথম দিকে যে অভিজ্ঞতা প্রকাশ পাইয়াছে—সেই অভিজ্ঞতার সুরই এখানে ঝংকৃত হইয়াছে। কথাগুলির বেদনায় ধ্রুবসুন্দর প্রেমজীবনের ভক্তিনত আনন্দই গুঞ্জরিত হইয়াছে।

প্রেম ধ্রুবসুন্দরই বটে। মোহের তাড়নায় প্রেমকে আমরা নানাভাবে নানা ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হইতেই দেখি, কিন্তু প্রেমের স্বভাব ধ্রুবসুন্দরই বটে। সংসারজীবনে অহং-এর মত্ততায় ইহা বিচলিত হয় সত্য, কিন্তু যত বিচলিত হয়, ততই উত্তীর্ণ হওয়ার বাসনা জাগরিত হইয়া থাকে। ধ্রুবসুন্দরের ধারণা মানুষের মধ্যে যদি না থাকিত, তবে অহং-এর কামনা-চরিতার্থতাতেই মানুষ তৃপ্ত হইত—ইহাকে উত্তীর্ণ হইবার বাসনাই তাহার জাগিত না। আবার অপর পক্ষে, প্রেমের পক্ষে যদি অহং-এর তাড়না না থাকিত, প্রেমকে বস্তু-রূপে অনুভব করাও সহজ হইত না। মানুষের মর্মে আছে ধ্রুবের ধারণা—কর্মে অহং-এর মধ্য দিয়া ক্রমশঃ সে অগ্রসর হয় ধ্রুবের পথে। ভাবময় ধ্রুবকে কর্মময় জীবনে প্রকাশ করাই মানবিক মাহাত্ম্য। ইহাই প্রেম। ইহার সাধনা শুদ্ধমাত্র ভাবসাধনা নহে, ভাবকে বস্তুতে অর্থাৎ জীবনের কর্মে ব্যবহারে রূপ দেওয়ার সাধনাও ইহার সাধনা। এই সাধনায় অহং-এর বাধা অপরিহার্য। এইজন্য প্রেমসাধনায় অহং অসত্য নহে। অহং-এর দ্বারা পরীক্ষিত হইয়াই প্রেম জীবনগোচর, বোধগোচর হইয়া থাকে। তা' যদি না হইত, তবে প্রেমকে জীবনবহির্ভূত একটা তত্ত্বমাত্র বলিতে কোনোই আপত্তি ছিল না। সুরুতে বিমলার প্রেম যে পূজাভাবে মগ্ন ছিল, তাহা অসত্য নহে—তবে সংসারজীবনে তাহাকে আংশিক সত্য বলিয়াই জানি, কেননা সংসারের অহং-মোহে তাহা পরীক্ষিতই হয় নাই। এই পরীক্ষার প্রয়োজন ছিল। পরীক্ষা-অন্তে সে আগুনের মধ্য দিয়া বাহিরে আসিয়া

ধ্রুবের আনন্দ আস্বাদন করিল। কহিল: "যা পোড়বার তা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, যা বাকি আছে তার আর মরণ নেই।"

'যা বাকি আছে', তা বলাই বাহুল্য, প্রেম। প্রকৃতির অর্থাৎ অহং-মোহের আগুনে পুড়িয়া নিষ্কলুষ হইয়াছে এই প্রেম। এইবার ইহা অমর, ইহা সত্য। এইবার ইহা শুদ্ধমাত্র ভাব নহে, রূপক নহে, জীবনে পরীক্ষিত হইয়াছে ইহার বাস্তব মহিমা। বিমলা-জীবনে ইহার মৃত্যু নাই।

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে ইহারই তত্ত্ব ভিন্ন এক শিল্পরীতি প্রয়োগে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। চতুরঙ্গে দেখানো হইয়াছে—রূপ ও রূপক, বস্তু ও তত্ত্ব, অহং ও বিশ্ব যে জীবনে সহজ ও স্বভাবানন্দে সামঞ্জসীকৃত হয় নাই, সে জীবনে পার্থিব সার্থকতা সম্ভব নহে। ফলকথা, জীবন হইতে পলায়ন করিয়া প্রেমের সাধনা সত্য নহে, সুন্দরও নহে। প্রেমজীবনে অহং-এর অন্ধ প্রাবল্য যেমন ব্যর্থ, বস্তু-অবচ্ছিন্ন আত্মার বিজন তপস্যাও তেমনি অসার্থক।

প্রেম যে শুদ্ধমাত্র রূপক নহে, পরন্তু রূপও বটে, – শুধু তত্ত্বমাত্র নহে, বস্তুজীবনে তাহার প্রকাশও চাই—রবীন্দ্রনাথের প্রেমদর্শনে এই সত্যটি নানাভাবে, নানা কথায় অভিব্যক্ত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রেম যেখানে সর্বজগদ্‌গত, সেখানে তা' রূপকই বটে, কিন্তু সর্বজগদ্‌গত প্রেমের কোনো-না-কোনো রূপবিভূতি জীবনে যদি স্পষ্ট প্রকাশিত না হয়, প্রেম যদি প্রতিভাত না হয় রূপক হইতে রূপের আনন্দে—তবে বাস্তব জীবনে প্রেম সত্য বলিয়াই স্বীকৃত হয় না। সুতরাং তা' তখন অসার্থকই রহিয়া যায়। জীবনের ধ্যানে রূপক অবশ্য মিথ্যা নয়; তা' যদি মিথ্যা হইত, তা' হইলে রূপের সীমাটুকুকেই ভূমাজ্ঞান করিয়া চিত্তধর্মকে তুচ্ছেই নিত্যকাল লিপ্ত রহিতে হইত।

'চতুরঙ্গ'

আবার অপরপক্ষে রূপকের অনির্বচনীয় মহিমা রূপকে যদি উজ্জ্বলতর ও মহত্তর না করিত, তবে রূপকবোধ শুধু কথার কথা, 'শূন্য কথা হইয়াই' থাকিত। রূপকবোধ রূপকে দেখাইবে, সঙ্গে সঙ্গে রূপের ভাবরূপটিও দেখাইবে—অর্থাৎ রূপকে উপেক্ষা করিবে না, অথচ রূপের সীমাটুকুর মধ্যেই মনকে ধরিয়া রাখিবে না—তবেই মনোজীবনে রূপকের সার্থকতা বুঝিব। রূপ চাহিব, কিন্তু রূপের মধ্যে রূপকের ব্যঞ্জনা অনুভব করিয়া রূপকেই মহত্তররূপে দেখিব অর্থাৎ চোখ দিয়া শুধু নয়, মন দিয়াও দেখিতে থাকিব, তবেই রূপে রূপ থাকিবে, রূপকও থাকিবে, সীমা থাকিবে, অসীমও থাকিবে। ইহাই রূপ ও রূপকের সমন্বয়সাধন। এই সমন্বয়ের যেখানে অভাব, অর্থাৎ রূপ ছাড়িয়া রূপকের তত্ত্বে কিংবা রূপক ছাড়িয়া রূপের মোহেই মানুষ যেখানে আবেগবিহ্বল, সেখানে তাহার

পার্থিবজীবন ব্যর্থ, জীবনের সর্ববিধ চেষ্টা বা ভাবস্বপ্ন সেখানে শূন্য, আকাশকুসুম মাত্র। চতুরঙ্গ উপন্যাসে এই সত্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে কিনা দেখা যাউক।

অ-ভক্ত শচীশ ঘটনাক্রমে ভক্তিরসের পথিক হইল, ক্রমশঃ ভক্তিরস হইতে উর্ধ্বে উঠিয়া তত্ত্ব-সর্বস্ব রূপকে-ই দিল মন। তাহার ধারণা হইল, অরূপকে পাইতে হইলে, অরূপ যে মুখে সাধকের দিকে নামিতেছেন, তাহার উল্টামুখে চলিবার সাধনা করিলে তবেই তাহাকে পাওয়া সম্ভব।

"যে মুখে তিনি আমার দিকে আসিতেছেন, আমি যদি ঠিক সেই মুখেই চলিতে থাকি তবে তাঁর কাছ থেকে কেবল সরিতে থাকিব, আমি ঠিক উল্টামুখে চলিলে তবেই তো মিলন হইবে।

"তিনি রূপ ভালবাসেন তাই কেবলই রূপের দিকে নামিয়া আসিতেছেন। আমরা তো শুধু রূপ লইয়া বাঁচি না, আমাদের তাই অরূপের দিকে ছুটিতে হয়। তিনি মুক্ত তাই তাঁর লীলা বন্ধনে, আমরা বদ্ধ সেইজন্য আমাদের আনন্দ মুক্তিতে। এ কথাটা বুঝি না বলিয়াই আমাদের যত দুঃখ।

"এতদিন আমি তাঁকে আপনার মতো করিয়া বানাইতে গিয়া কেবল ঠকিলাম। ওগো আমার প্রলয়, আপনাকে আমি তোমার মধ্যে চুরমার করিতে থাকিব—চিরকাল ধরিয়া। বন্ধন আমার নয় বলিয়াই কোন বন্ধনকে ধরিয়া রাখিতে পারি না—আর বন্ধন তোমারই বলিয়াই অনন্তকালে তুমি সৃষ্টির বাঁধন ছাড়াইতে পারিলে না। থাকো, তোমার রূপ লইয়া তুমি থাকো, আমি তোমার অরূপের মধ্যে ডুব মারিলাম।" [রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড, চতুরঙ্গ, পৃ ৪৮৬]।

শচীশ রূপ ত্যাগ করিয়া, দামিনীর আকর্ষণ ছিন্ন করিয়া, অরূপের সন্ধানে ফিরিল। জীবন হইতে পলাতক এই শচীশ প্রকৃতিকে জয় করিতে গিয়া যে উন্মাদনা প্রকাশ করিল তাহা সন্ন্যাসজীবনে সত্য ও সার্থক হইতে পারে, কিন্তু লোকজীবনে নহে। জগমোহনকে জীবন হইতে পলাতক অবশ্য বলা চলে না— কিন্তু আপন ভাবের ও বিশ্বাসের সীমার মধ্যে নিজেকে গুটাইয়া রাখিয়া উদার তাহার মহৎ জীবনটিকে নিখিলবিশ্বের বিরোধীই তিনি করিয়া তুলিলেন। জগমোহন ছিলেন নাস্তিক। "তিনি ঈশ্বরে অবিশ্বাস করিতেন বলিলে কম বলা হয়,—তিনি না-ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন।"…"গুরুজনকে ভক্তি করাটা তাঁর মতে একটা ঝুটা সংস্কার; ইহাতে মনকে গোলামিতে পাকা করিয়া দেয়।" "জগমোহন বলিতেন…আমরা নাস্তিক, সেই গুমরেই আমাদিগকে একেবারে নিষ্কলঙ্ক নির্মল হইতে হইবে। আমরা কিছুকে মানি না বলিয়াই আমাদের নিজেকে মানিবার জোর বেশি।" [পৃ. ৪৩১-৪৫] এই 'নিজেকে মানিবার' মায়ায় অহরহঃ বদ্ধ রহিয়া বস্তু-সংসারের যাবতীয় পাপ ও প্রতারণা হইতে জগমোহন দূরে রহিলেন সত্য, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার

করিতে গেলে দেখা যায়, সাধারণ বস্তুজীবন হইতে অজ্ঞাতসারেই পলায়ন করিয়া ভাবের পশ্চাতেই তিনি ঘুরিয়াছেন। তাহার ফল হইয়াছে এই, তাঁহার ভাবশিষ্য শচীশও চিরকাল ভাবের মরীচিকা-মোহেই ঘুরিয়াছে ; প্রথমে ভক্তিবিহীন নাস্তিক্য-ভাবে, তৎপরে ভক্তি-গদ্‌গদ আস্তিক্যভাবে,—তাহারও পরে আবার তত্ত্বসর্বস্ব অরূপ ভাবে অহরহঃ শচীশ ঘুরিয়াছে। সমন্বয়ধর্মী প্রেমজীবনে, বলাই বোধ করি বাহুল্য, এই তিন ভাবই অসার্থক। কেননা এই তিন ভাবই বস্তুস্পর্শ বিবর্জিত। অপরদিকে আর একটি চরিত্র আছে—দামিনী। তাহার আবার ভাবের যেন কোনো বালাই নাই—বস্তুই তাহার সব ; বস্তু-বাসনার প্রাবল্যে ভাবের বিরুদ্ধে তাহার প্রচণ্ড বিদ্রোহিতা। স্থূল বাসনাবেগের বিভ্রান্তিতে সে বিতাড়িত, ব্যর্থও হইল ; তবু বাসনাকে শান্ত করা তাহার পক্ষে সহজ হইল না। বুকে জাগিয়া রহিল বাসনার ব্যথা, শান্তি সম্ভব হইল না ইহজীবনে।

যাহা নয়, যাহা নাই, যাহা জীবনের ছলনায় অ-জীবনের মোহ মাত্র—তাহারই পশ্চাতে ঘুরিয়াছে তিনভাবে তিনটি চরিত্র : জগমোহন, শচীশ ও দামিনী। জীবন শুধু 'আইডিয়া' নয়, শুধু তত্ত্বমাত্র নয়, শুধু বস্তুবাসনার বিহ্বলতামাত্রও নয় জীবন হইতেছে সকলকে স্বীকার করিয়াই সকলকে ছাড়ার আনন্দ। এই আনন্দ প্রতিভাত হইয়াছে শ্রীবিলাসের জীবনেই। "প্রকৃতিকে মানিয়া প্রকৃতির উপরে উঠিতে পারাই" শ্রীবিলাসের জীবনাদর্শ।

"প্রকৃতির স্রোতের ভিতর দিয়াই আমাদিগকে জীবনতরী বাহিয়া চলিতে হইবে। আমাদের সমস্যা এ নয় যে, স্রোতটাকে কী করিয়া বাদ দিব ; সমস্যা এই যে, তরী কী হইলে ডুবিবে না, চলিবে। সেইজন্যই হালের দরকার।" [রবীন্দ্র-রচনাবলী-৭, পৃ. ৪৬৭]

প্রেমই আমাদের সেই হাল। রূপ ও রূপকের, বস্তু ও তত্ত্বের, সীমা ও অসীমের, মধুর ও মাধুর্যের তটদ্বয় দুপাশে রাখিয়া জীবনতরী ঠিকভাবে বাহিতে সুপটু এই প্রেমের হাল। শ্রীবিলাস-চরিত্রে ইহাই পরিশেষে ব্যঞ্জিত হইয়াছে। মৃত্যুকালে দামিনীও এই শ্রীবিলাসের প্রেম-মাহাত্ম্যেই সত্যকার জীবনোপলব্ধির আনন্দবেদনা বহন করিয়াছে। শ্রীবিলাসকে বুঝিলে চতুরঙ্গ উপন্যাসে বর্ণিত প্রেমের সহজ-তত্ত্বটি সত্যসত্যই সহজ হইয়া যায়।

শ্রীবিলাসই চতুরঙ্গ উপন্যাসের কথক। নিজেকে এবং নিজের চারপাশকে শ্রীবিলাস যেমন দেখিয়াছে, যেমন বুঝিয়াছে—তেমনই প্রকাশ করিয়াছে এই কাহিনীতে। চতুরঙ্গ বিচারে এই কথাটি মনে রাখিতে হয়। শ্রীবিলাসের যেটি মনে আছে, যে বিষয়টি মনে ধরিয়াছে, যা' তাহার জীবনকে ও ব্যক্তিত্বকে নাড়া দিয়াছে, সেই সেই বিষয়গুলি একত্র করিয়া সাজাইয়া রচনা করিতে গিয়া শ্রীবিলাস অজ্ঞাতসারেই নিজের ব্যক্তিত্ব, ধর্মমত ও জীবনতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া গেছে। জগমোহন, শচীশ, দামিনী—মধ্যে হরিমোহন, ননীবালা, পুরন্দর ও গুরুঠাকুর—ইহাদের সকলেরই এক একটি বিশেষ রূপবৈশিষ্ট্য

আছে সত্য—কিন্তু ইহাদের যা কিছু আমরা জানিতেছি, সমস্তই শ্রীবিলাসের স্মৃতি ও চেতনার মারফতে জানিতেছি বলিয়াই মানিতে হয়। চতুরঙ্গ উপন্যাস 'আংশিকত্বের লক্ষণাক্রান্ত' (fragmentary) বলিয়া যাঁহারা মন্তব্য করিয়াছেন, তাঁহারা এমন কিছু অন্যায় করেন নাই। তবে মনে রাখা ভালো, চতুরঙ্গের বিচিত্র চরিত্রচয়ের পূর্ণ বিবরণ দেওয়া লেখকের উদ্দেশ্যই নহে। এই উপন্যাসের শিল্পরীতি অনুসরণ করিলেই একথার সত্যতা উপলব্ধ হয়। দ্রষ্টা শ্রীবিলাসের জীবনপথে যাহারা আসিয়াছে, তাহাদের যেসব কথা ও কাহিনী পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে তাহার নিজের জীবনতত্ত্বটি স্পষ্ট করিয়া তুলে, মাত্র সেইগুলিই সে ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করিয়াছে: প্রত্যক্ষভাবে পরের কথা বলিতে বলিতে অপ্রত্যক্ষভাবে আত্মজীবন গড়িয়া তুলিয়াছে।

মানুষের জীবনই বস্তুতঃ এই। আমাদের স্মৃতিতে ধ্যানের মধ্যে যাহারা বিরাজ করিতেছে, তাহাদের কথা যখন আমরা বলি, তখন তাহাদের আংশিক মর্মকথা ও ধর্মকথার মধ্য দিয়া নিজেরাই তো পূর্ণভাবে প্রকাশ পাইতে থাকি। মানুষ চলমান বিচিত্র জীবনজগতের বিবিধ চিত্র ও চরিত্র দর্শন করে, কোনোটিতে আকৃষ্ট হয়, কোনোটিকে স্বীয় জীবনবাদের বিপরীত বলিয়া ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হয়। জীবন-জগতের এই চলচ্ছবি স্মৃতির 'ক্যানভাসে' যতটুকু অঙ্কিত হয়, যতটুকু বর্ণিত হইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়, ততটুকু অবশ্যই পূর্ণ নহে—কিন্তু এইসব অপূর্ণত্বের খণ্ড ক্ষুদ্র বিশেষত্ব লইয়াই ব্যক্তির মধ্যে পূর্ণ ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠে। শ্রীবিলাস এমনতর এক ব্যক্তিত্ব। জীবনজগতের বিচিত্র চরিত্র-চিত্র শ্রীবিলাস দুচোখ ভরিয়া দেখিয়াছে, বিবিধ চরিত্র হইতে বিচিত্র জীবন-চেতনা ও বেদনা অনুভব করিয়াছে, শক্তিমান ব্যক্তিত্বের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছে বারংবার—প্রভাব কাটাইয়া সহজস্বভাবে ফিরিতে চাহিয়াছে ধৈর্য-সংযমে—ফিরিয়া-ফিরিয়া, পড়িয়া-পড়িয়া, উঠিয়া-উঠিয়া পরিশেষে স্থির হইয়া বসিতে গিয়াছে স্বকীয় ব্যক্তিত্বের সত্যাসনে। সুখ পায় নাই, কিন্তু জীবন হইতে পলায়ন করে নাই বলিয়া আনন্দ পাইয়াছে। এই আনন্দই রবীন্দ্রদর্শনে, জীবনপ্রেম। শ্রীবিলাসের জীবনপ্রেমের বেদনাময় আনন্দসৃষ্টি এই স্মৃতিকথা, স্মৃতিকথার মধ্য দিয়া আত্মকথার এই আনন্দবাদ। বেদনার আনন্দে, অভিজ্ঞতার আনন্দে, চেতনার আনন্দে এমন কতকগুলি পরস্পরবিরোধী চরিত্রকথা শ্রীবিলাস এখানে ব্যক্ত করিতে বসিয়াছে, যেগুলি পরোক্ষভাবে তাহারই আত্মবিকাশের পথে নানাভাবে সহায়তা করিয়াছে।

শ্রীবিলাস নিজে চতুরঙ্গ-কাহিনী বর্ণনা করিতেছে বলিয়া সচেতনা সহকারে সর্বদাই সে সবার পশ্চাতে রহিয়া গেছে; কিন্তু রসিক পাঠক অবশ্যই বুঝিয়াছেন, চতুরঙ্গ বাহ্যত: চারি চরিত্রের ব্যাখ্যান হইলেও মূলতঃ তাহা শ্রীবিলাসের জীবনবিকাশের গুহ্যকাহিনী। বস্তুবিরোধী ধ্যান ও ধারণার বশবর্তী হইয়া কত বড় মহৎ জীবন সংসারের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হইয়া গেল, শ্রীবিলাস চোখ ভরিয়া, মন ভরিয়া তা' দর্শন করিয়াছে। এ দর্শন জীবন দর্শন:

ব্যর্থ জীবন দেখার মধ্য দিয়া সার্থক জীবন-কল্পনার মহিমা-দর্শন। আপাতঃদৃষ্টিতে শ্রীবিলাস জগমোহনের শিষ্য, শচীশের অনুচর, গুরুঠাকুরের ভক্ত, দামিনীর বাহ্য অবলম্বন। জীবনের চলতি-পথে নানাত্বের মধ্য দিয়া তাহাকে চলিতে হইয়াছে বটে, কিন্তু চলিতে-চলিতে, ঠেকিতে-ঠেকিতে সে শিক্ষা করিয়াছে জীবন-তত্ত্ব। লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, কোনো বিষয়ে বা কোনো তত্ত্ব-সাধনায় সে একান্তভাবে সর্বস্বহারা হইয়া ডুব দিতে চাহে নাই। এখানে সে শচীশ হইতে ভিন্ন। শচীশ যখন জগমোহনের শিষ্য, তখন সে জগ-মোহনের নাস্তিক্য দর্শনেরই বিশিষ্ট প্রচারক; আবার গুরুঠাকুরের সে যখন ভক্ত, তখন আস্তিক্যভাবের আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া দাস্যভাবে আকুল, আত্মহারা। দামিনী তাহাকে ভালবাসিল, বড় ব্যাকুলভাবেই ভালবাসিল; শচীশ দামিনীর প্রেমাকর্ষণ অনুভবও করিল, শ্রীবিলাসের উপর কিছু ঈর্ষাও তাহার জাগিল, কিন্তু না—জীবনে প্রকৃতির প্রভাব শচীশ স্বীকার করিবে না—সে প্রকৃতিজয়ে অন্তরে-বাহিরে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। দামিনী-শচীশের মিলন সম্ভব হইল না—বস্তুতঃ দামিনী ও শচীশ কখনও মিলিতেই পারে না। দামিনীর অন্তরে কামনার্ত বুভুক্ষা; শচীশের অন্তরে প্রকৃতিজয়ের প্রচেষ্টা, মনের অতীতে যাওয়ার তত্ত্ব সাধনা। দামিনীর ধারণা শচীশকে পাইলেই তাহার কামনার শান্তি—শচীশের ধারণা প্রকৃতিকে জয় করিয়া অতীন্দ্রিয়ে উন্নীত হইলেই জীবনের চরিতার্থতা। দামিনী রতি-পাগলিনী; শচীশ তত্ত্ব-পাগল, আইডিয়া-পাগল। দামিনী চায় দেহ-সুখ, গৃহ-সুখ; শচীশ চায় আত্মানন্দ, পথের আনন্দ। দামিনী কিছু উর্ধ্বে উঠিয়া—শচীশ কিছু নিম্নে নামিয়া—মধ্যপথে যদি মুখোমুখি দাঁড়াইত, শচীশ-দামিনীর মিলন অসম্ভব হইত না; দুই জীবন সংসারক্ষেত্রে সমন্বয়ের আনন্দমহিমায় তখন সার্থক হইতেও পারিত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহা তো হইল না,—শচীশ নামিল না; দামিনী উঠিতে চাহিয়াও পারিল না। মুখে সে 'গুরু গুরু', 'প্রভু প্রভু' করিল, কিন্তু অন্তরে পুড়িল ব্যর্থতার বহ্নি-দাহনে। পথের পাগলকে চাওয়াই তো জীবনের চরম ট্র্যাজেডী। পাওয়া হয় না, চাওয়াও যায় না ছাড়া, ঘর করিয়াও হয় না সুখ, 'বুকের ব্যথাই' হয় সার।

শ্রীবিলাসও পথে পথে ঘুরিয়াছে—তাই বলিয়া সে শচীশের মত ভাবের পাগল, পথের পাগল নহে। তাহার জীবনাদর্শ মধ্যগ পন্থাশ্রয়ী। ঘর হইতে বাহিরে সে বারংবার আসিয়াছে, ভাসিয়াছে অজস্র স্রোতে; তবু তীরের দিকে যে তাহার আকর্ষণ নাই তাহা নহে। পথে ঘুরিতে ঘুরিতে একদা সে দামিনীর সাক্ষাৎ পাইল; জানিল দামিনী শচীশকেই কামনা করে—শচীশের উপর তাহার গোপন এতটুকু ঈর্ষাও তাই জাগিয়া উঠিল বটে, কিন্তু দামিনীর জন্য সে যে একেবারে উন্মাদ হইল, তাহা কেহই বলিবে না। শচীশ দামিনীকে নানাভাবে পরিহার করিতে লাগিল, কিন্তু সকল ব্যাপার জানিয়া শুনিয়াও শ্রীবিলাস দামিনীর সঙ্গকে প্রকৃতির সঙ্গ বলিয়া উপেক্ষা করিল না,—পরিহার

করিল না—ভীত সন্ত্রস্ত হইল না। দামিনী শচীশের অন্তরে ঈর্ষা জাগাইবার জন্য শ্রীবিলাসের সহিত বড় মাখামাখি ভাব দেখাইল; শ্রীবিলাস তাহা বুঝিতেও পারিল—তবু দামিনীর সংসারগৃহের কোথাও দাঁড়াইবার স্থানটুকু মাত্র রহিল না।

শ্রীবিলাস তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিল। দামিনী নীড় চাহে, মানুষ চাহে—শচীশকে চাহিয়াছিল, পাইল না—অতৃপ্তির বহ্নিদাহনে দগ্ধীভূতই সে হইতেছিল; শ্রীবিলাসের প্রস্তাবে অমত সে তাই করিল না। কিন্তু তাহার বিস্ময় জাগিল এই ভাবিয়া—সব কিছু জানিয়া শুনিয়া শ্রীবিলাস কেন তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিতেছে!

শ্রীবিলাস লিখিতেছে:

"আমার মনের ভাব সম্বন্ধে দামিনী কোনরকমভাবে খবর পায় নাই সে কথা বিশ্বাস করি না। কিন্তু এতদিন সে খবরটা তার কাছে দরকারি খবর ছিল না—অন্ততঃ তার কোনরকম জবাব দেওয়া নিষ্প্রয়োজন ছিল। এতদিন পরে একটা জবাবের দাবি উঠিল।

"দামিনী চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। আমি বলিলাম দামিনী, আমি সংসারে অত্যন্ত সাধারণ মানুষদের মধ্যে একজন—এমন কি, তার চেয়েও কম; আমি তুচ্ছ। আমাকে বিবাহ করাও যা, না করাও তা, অতএব তোমার ভাবনা কিছুই নাই।

"দামিনীর চোখ ছলছল করিয়া আসিল। সে বলিল, তুমি যদি সাধারণ মানুষ হইতে তবে কিছুই ভাবিতাম না।

"আরও খানিকক্ষণ ভাবিয়া দামিনী আমাকে বলিল, তুমি তো আমাকে জান।

"আমি বলিলাম, তুমিও তো আমাকে জান।" [রবীন্দ্র-রচনাবলী-৭ পৃ. ৪৯১]

শ্রীবিলাস দামিনীকে পাইতেছিল না—কিন্তু তাহার জন্য গোপন একটি বেদনানুরাগ অনুভব করিতেছিল। বিবাহ-প্রস্তাবের মধ্য দিয়া দামিনী আজ জানিল—এই অনুরাগে হীন পুরুষোচিত সংশয় নাই, সন্দেহ নাই, দামিনীর অতীত মোহ-বাসনার বিড়ম্বনাকে হীন দৃষ্টিতে দেখার কাপুরুষতা নাই। দামিনী তাই শ্রীবিলাসকে সাধারণ পুরুষ হইতে অনেক উচ্চাসনে বসাইয়া দেখিতে শিখিল। দামিনীর মন শচীশেই ভরপুর বটে, শচীশকে পাইলেই সে চরিতার্থ হইত বলিয়া মনেও করে বটে, কিন্তু শ্রীবিলাসের এই মানবিক মহত্ত্ব তো উপেক্ষণীয় নহে। বিশেষ করিয়া শচীশকে যখন পাওয়াই যাইবে না—শ্রীবিলাসকেও মনে ধরিতেছে; তখন নীড় বাঁধিবার আনন্দাকর্ষণে সাড়া না দিয়া সে পারিল না। প্রমত্তা দামিনী শ্রীবিলাসের গৃহে প্রশান্ত রূপে দিল দেখা।

শ্রীবিলাসের বিবাহ প্রস্তাবটি কেমনতর? সকল কথা জানিয়া শুনিয়া ননীবালাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দ্বারা পূর্বে শচীশ যে মানবিক মহত্ত্বের ধীরতা প্রকাশ করিয়াছিল, শ্রীবিলাসের বিবাহ-প্রস্তাবে সেই মানবিক মহত্ত্বের ধীরতা আছে। ননীবালা শচীশকে

বিবাহ না করিয়া আত্মহত্যা করিল, কেননা ননীর চিত্ত তাহার স্বর্গত প্রেমাস্পদের প্রেমে ছিল পূর্ণ। ননীর আত্মহত্যা অমর প্রেমের বিজয়মহিমাই প্রকাশ করিয়াছে। ননীর আত্মহত্যা অমরত্বেরই অপর নাম, কেননা তাহা অতর্কিত রসানন্দের অভিনব একটি জ্যোতির্মণ্ডলই শুধু রচনা করে নাই,—সেই জ্যোতির্মণ্ডলে মণিরূপে প্রেমকে দীপ্যমান করিয়াছে দ্বাদশ সূর্যের রশ্মিগৌরবে। দামিনীর চিত্তে সান্ত্বনা ছিল না, নির্ভরতা ছিল না —অতৃপ্ত অহং-এর বুভুক্ষা তাই তাহাকে গৃহের বন্ধনে আনিল টানিয়া। কিন্তু বন্ধনে আসিয়া সে কি সুখ পাইল? শ্রীবিলাসের মহত্ত্ব, তাহার ধীরতা, তাহার প্রসন্ন স্বভাব তাহার প্রেমোপলব্ধির পথে সহায়ক হইল সত্য, কিন্তু 'বুকের ব্যথা' তো গেল না। একের জন্য যে মোহাসক্তি, অপরকে দিয়া তাহা প্রশমিত করার প্রচেষ্টায় বাহ্যতঃ জীবন আছে বলিয়া মনে হইলেও অন্তরতঃ তাহার মধ্যে লীলা করে 'মৃত্যুর গুপ্ত প্রেম'। 'শেষের কবিতায়' লাবণ্য যেমন অমিতকে সহজভাবেই ছাড়িতে পারিয়াছিল, পলাতক শচীশকে যদি দামিনী তেমনি সহজভাবে ছাড়িতে পারিত, তবে এই বন্ধন অবশ্যই সুখের হইত, চিত্তমুক্তির আনন্দ-পথের পাথেয় হইত। দামিনী-জীবনে তাহা হইল না। শ্রীবিলাসের যত্ন, তাহার স্বার্থত্যাগ, তাহার পরিশ্রম দামিনীকে অবশ্যই প্রভাবিত করিল, কিন্তু শচীশের সৃষ্টিছাড়া পাগল প্রত্যাখ্যানের নিদারুণ বেদনাঘাত তাহার হৃদয়জীবনকে ব্যথান্বিতই করিয়া রাখিল। শ্রীবিলাসের সদয়-শোভন কান্ত স্বভাবের সৌজন্যে বাহ্য জীবনে সে যত সুখী হইল, মনোজীবনে ততই সে ধিকৃত হইতে লাগিল। বিলাসবরণে স্থির হইবার প্রচেষ্টা--কিন্তু শচীশ-স্মরণে দুঃসহ বেদনার দয়াহীন অমিতব্যয়িতা—দোটানার এই দ্বন্দ্ব পড়িয়া দামিনীর মনোজীবন বিপুল বিষাদে রহিল ম্রিয়মাণ। বাহির হইতে দেখিলে শেষজীবনে দামিনী যেন শান্ত সংসারচারিণী, কিন্তু অন্তরে তাহার অশান্তির ছিল না পরিসীমা। শ্রীবিলাসের মানবিক মহত্ত্বে যতই তাহার প্রেমোপলব্ধি ঘটিল, ততই তাহার বুকের ব্যথা বৃদ্ধি পাইল।

সংসারজীবনে ইহাই তো মৃত্যু। শচীশকে ছাড়িবে না, ঘরও বাঁধিবে—এ-হেন অসামঞ্জস্য জীবন পারে না বহন করিতে। জীবন সামঞ্জস্য চায়, মীমাংসা চায়। শচীশকে না ছাড়িয়া ঘর বাঁধিতে যাওয়াই তো মৃত্যুর সূচনা। এই মৃত্যু শ্রীবিলাসের ত্যাগময় প্রেমের স্পর্শে আরও যন্ত্রণাপ্রদ হইল। কেননা প্রেমের মহত্ত্ব-শিক্ষায় ক্রমশঃ সে তখন বুঝিতে শিখিল—শ্রীবিলাসের মত মহৎ পুরুষের অঙ্কশায়িনী হইবার মত পুণ্যই যেন তাহার নাই। শচীশ তাহাকে যে ব্যথা দিয়াছে, ক্রমশঃ তাহার ধারণা হইল যে, সে ব্যথার স্পর্শমণি তাহাকে কতকটা সোনা করিয়া দেছে বলিয়াই এমন পুরুষকে পাইবার ভাগ্য সে করিয়াছে। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে সে কি শ্রীবিলাসের যোগ্য? সে তো হীনা, সে তো চঞ্চলা—সে তো সুন্দরকে অসুন্দর করিতেই গিয়াছিল। দামিনীর এই যে চিন্তা, পরবর্তীকালে ইহাই তাহাকে অতীতের অহংমত্ততার লজ্জাকর

স্মৃতির আগুনে পুড়াইয়া মারিল। পাঠক জানেন, দামিনী শ্রীবিলাসকে বুঝিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবিলাসকে যিনি পাওয়াইছেন, তাঁহাকেও পূজিয়াছে। এই বুঝার মধ্যেও যন্ত্রণা, পূজার মধ্যেও যন্ত্রণা। ইহাই তো মৃত্যু। দামিনীর মৃত্যু কি অতর্কিত ও অসংগত? তত্ত্বের দৃষ্টিতে মোটেই অসংগত নয়। কিন্তু শিল্পের দৃষ্টিতে? শিল্পদৃষ্টিতেও তাহা আকস্মিক বা অসংগত বলিয়া মনে করি নাই। মনে রাখিতে হইবে—শচীশকে সহজ ভাবে ছাড়িতে পারিলে দামিনীর বুকের ব্যথা থাকিত না, সহজজীবনে সে নামিতেও পারিত—স্বাভাবিকভাবে কোনো মৃত্যুই তখন জীবন মধ্যে প্রবেশপথ পাইতে পারিত না। অথবা ঘর না বাঁধিয়া সে যদি চোখের বালির বিনোদিনীর মত পথের আনন্দই স্বীকার করিত, শিল্পগত স্বাভাবিক মৃত্যুর কবল হইতে অবশ্যই সে রক্ষা পাইত। কিন্তু দামিনীর পক্ষে বিনোদিনীর মত পথের আনন্দ গ্রহণ করা কি স্বাভাবিক হইত? শচীশ বিহারীর মত দামিনীর বাসনামূলে প্রেমনির্ভরতার প্রশান্তি যদি দিতে পারিত, তবে সে শচীশকে না পাইয়াও পাওয়ার আনন্দ অনুভব করিতে পারিত, শ্রীবিলাসকে লইয়া ঘরের বন্ধনে অগ্রসরই হইত না। কিন্তু শচীশ বিহারী নহে, দামিনীজীবনে তাই নূতন পরীক্ষা শুরু হইয়াছে। বলাই বোধহয় বাহুল্য, বিহারীর প্রেমচিন্তনায় বিনোদিনী মর্মমূলে যে গৌরব ও সান্ত্বনা অনুভব করে, শচীশকে গুরু বলিয়া, প্রভু বলিয়া, দামিনী ঠিক সেই গৌরব ও সান্ত্বনা পায় না। এক্ষেত্রে অহং তাহার উপবাসীই থাকিয়া যায়। ঘর বাঁধিয়া অহং-এর উপবাস প্রশমনের প্রচেষ্টা দামিনীর মনোজীবনকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু ঘর-বাঁধাই কি দোষের? শেষের কবিতায় লাবণ্য অমিতকে ছাড়িয়া শোভনকে লইয়াই তো ঘর বাঁধিল। কিন্তু তাহার ঘর-বাঁধায় কেন মৃত্যু রহিল না? এ প্রশ্নের জবাব পূর্বেই দিয়াছি। মনে রাখা ভালো, লাবণ্য ও দামিনী একজাতীয় চরিত্র নহে। দামিনীর 'বিলাসবরণ' ও লাবণ্যের 'শোভনবরণ' এক ব্যাপারই নহে। লাবণ্যের অবচেতনায় ছিল শোভনপ্রেম—অমিত-আবেগের আনন্দধারায় উপেক্ষিত অথচ সঙ্গত সেই শোভনপ্রেমই বসন্ত-পুলকে কুসুমিত হইয়া উঠিয়াছে। অলংকার ছাড়িয়া স্পষ্ট বাস্তব ভাষায় বলিতে গেলে, অমিত রায় প্রেম জাগাইতে পারে, কিন্তু প্রেম লইয়া ঘর করা যে তাহার স্বভাব নহে—একথা লাবণ্য বুঝিয়াছিল। অমিতকে সে ভালবাসিয়াছিল সত্য, কিন্তু জোর করিয়া তাহাকে ধরিতে গেলে সুখ যে নাই, লাবণ্যেরও নাই, অমিতেরও নাই—একথা লাবণ্য মর্মে মর্মে বুঝিয়াছিল বলিয়াই নিত্যচপল বসন্তের মত অস্থির সেই অমিত-প্রেমকে ঘরে ধরিতে চাহে নাই,—স্বেচ্ছায় ছাড়িয়াছে, মুক্তি নিয়াছে, মুক্তি দিয়াছে। দামিনী শচীশের গৃহছাড়া পাগল স্বভাবটিকে পাগলিনীর মত কেবলিই আঁকড়াইতে গেছে—মন হইতে কিছুতেই ছাড়িতে পারে নাই। দামিনীর অন্তরে তাই দুঃসহ বেদনার বিদ্যুৎ বহ্নি; হৃদয়ে ছিল না কোনোপ্রকার শোভনা সান্ত্বনা—বিলাসবরণেও তাই বুকের ব্যথা গেল না। লাবণ্যের শোভনবরণে ছিল মুক্তির আনন্দাভিসার,

দামিনীর 'বিলাসবরণে' ছিল বন্ধনের সুখাভিলাষ। দামিনীর মৃত্যু তাই সত্য ও স্বাভাবিক : তত্ত্বের দিক হইতে সত্য, শিল্পের দিক হইতে স্বাভাবিক।

আর একটি বিষয় বাকি আছে। শেষ মুহূর্তে দামিনীজীবনে যে প্রেমোপলব্ধির প্রকাশ হইয়াছে, সে বিষয়টি আলোচনা করিয়া চতুরঙ্গের কথাপ্রসঙ্গ শেষ করিতে চাই। পাঠক জানেন, শ্রীবিলাসের গৃহে দামিনী সংসারকারিণীরূপে আসিয়া "অটল নির্ভর ও নিরানন্দ আশ্রয়" সুখ লাভ করিল, শ্রীবিলাসের শান্ত সুন্দর সুজন ব্যবহারে প্রেমের স্বরূপও কতকটা উপলব্ধি করিল, কিন্তু "আরামদায়ক শান্ত নিশ্চিন্ততার" অবসরে "বুকের মধ্যে যে একটা ব্যথা" বাড়িতেছিল, তাহার গোপন যন্ত্রণা মর্মে মর্মে তাহাকে বিষণ্ণ করিয়াও রাখিল। প্রেমের অস্ফুট উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ তাহার ধারণা হইল—এই ব্যথাই তাহার গোপন ঐশ্বর্য, তাহার পরশমণি; এই পরশমণির স্পর্শে সে শুদ্ধা হইয়াছে বলিয়াই শ্রীবিলাসের মত প্রেমিক মানুষের সে গ্রহণযোগ্যা হইয়াছে। কিন্তু হায়, এই ব্যথা প্রদানের দ্বারা যিনি তাহাকে শ্রীবিলাসের গ্রহণ-যোগ্যাই করিয়া দিয়াছেন—ব্যথার চেতনায় দামিনী যে অহরহঃ তাঁহারই পথে অজ্ঞাতে চলিয়াছে, আরামদায়ক শান্ত পরিবেশে আর যে তেমন লোভ লাগিতেছে না, একথা সে বুঝি জানিত না!

> "সেবারে গুহা হইতে ফিরিয়া আসার পর হইতে দামিনীর বুকের মধ্যে একটা ব্যথা হইয়াছিল, সেই ব্যথার কথা সে কাহাকেও বলে নাই। যখন বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিল তাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল : এই ব্যথা আমার গোপন ঐশ্বর্য, এ আমার পরশমণি। এই যৌতুক লইয়া তবে আমি তোমার কাছে আসিতে পারিয়াছি, নহিলে আমি কি তোমার যোগ্য?
>
> "ডাক্তাররা এই ব্যামোর একোজনা একোরকমের নামকরণ করিতে লাগিল। তাদের কারও প্রেস্‌ক্রিপশনের সঙ্গে কারও মিল হইল না। শেষকালে ভিজিট ও দাওয়াইখানার দেনার আগুনে আমার সঞ্চিত স্বর্ণটুকু ছাই করিয়া তারা লঙ্কাকাণ্ড সমাধা করিল এবং উত্তরকাণ্ডে মন্ত্রণা দিল হাওয়া বদল করিতে হইবে। তখন হাওয়া ছাড়া আমার আর বস্তু কিছুই বাকি ছিল না।
>
> "দামিনী বলিল, 'যেখান হইতে ব্যথা বহিয়া আনিয়াছি আমাকে সেই সমুদ্রের ধারে লইয়া যাও—সেখানে হাওয়ার অভাব নাই।' (পৃ. ৪৯৫-৯৬)"

'সেই সমুদ্রের ধারে' গেল দামিনী—কিন্তু শ্রীবিলাসের প্রেম-মহত্ত্ব ও মমত্বও সে ভুলিতে পারিল না। এই দোটানার দুঃখ দামিনীর মৃত্যুকালেও হইল প্রকাশ। শ্রীবিলাস তাহার আত্মকথা শেষ করিতেছে এই বলিয়া :

"যেদিন মাঘের পূর্ণিমা ফাল্গুনে পড়িল, জোয়ারের ভরা অশ্রুর বেদনায় সমস্ত সমুদ্র ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, সেদিন দামিনী আমার পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, সাধ মিটিল না, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই।"

'মাঘের পূর্ণিমা ফাল্গুনে পড়িল'—বাক্যটির ইঙ্গিত লক্ষণীয়। দামিনীর প্রেমোপলব্ধির ব্যঞ্জনা আছে এই বাক্যে। যেদিন পূর্ণিমা জাগা উচিত ছিল, সেদিন জাগে নাই, হায় 'সেদিন দেখেছ শুধু অমা'; আজ ফাল্গুনে বিগত দিনের সেই পূর্ণিমা জাগিয়াছে; দেখিতেছি, প্রেমজীবনের অমিত দিব্যতা। বুঝিতেছি জীবনের আদর্শ; বুঝিতেছি, তুমিই সত্য, তোমাকেই প্রয়োজন এই জীবনে। বুঝিতেছি অশোভন কামার্ততা নয়, বস্তুবর্জিত বৈরাগ্যও নয়; প্রেমকে অর্থাৎ তোমাকেই জীবনে জীবনে জন্মে জন্মে প্রয়োজন। অপরপক্ষে এ অর্থও সঙ্গত যে, সেদিনের পূর্ণিমা আজ পড়িল, বড় বিলম্ব হইল, সময় আর নাই। সাধ মিটিল না। জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই।

'তোমাকে পাই' কথাটির ব্যাখ্যা করিতেই হইল। ইহাতে দামিনীকে এবং সর্বোপরি তাহার প্রেমোপলব্ধির স্বরূপটিকে সহজভাবে বুঝার সুবিধা হইবে। ইহাকে 'চেষ্টাকৃত পুনর্গঠনক্রিয়া' বলিয়া উড়াইয়া দিতে হয় দিবেন কিন্তু সাহিত্যবিচারে, বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথের ন্যায় সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিকের ভাবধর্মী উপন্যাসবিচারে, শুধু বিশ্লেষণ-পন্থা নহে, সংশ্লেষণ-পন্থাও বিশেষ কার্যকরী। রবীন্দ্রনাথের রচনায় খণ্ড, ক্ষুদ্র, বহু তুচ্ছ কথা এমন ভঙ্গীতে এবং এমন পরিবেশে ব্যবহৃত হইয়াছে, যা' রসবোধের আনন্দ-ভাষায় অনুবাদ করিয়া লইলেই বুঝা যায়, তা' তুচ্ছ নহে, ক্ষুদ্র নহে—পরন্তু তাহাই রচনামর্মের প্রাণস্পন্দন। তুচ্ছ মনে করিয়া সেই কথাগুলি এড়াইয়া গেলে অনেক সময় মূলেই ভুল হইয়া যায়।

যা' বলিতেছি। দামিনী শ্রীবিলাসকে বুঝিয়াছে, শ্রদ্ধা দিয়াছে, ভালবাসা দিতেও শুরু করিয়াছে, এমন সময় দামিনীর মৃত্যু হইল। বলিয়াছি, মৃত্যুকালে সে যা' বলিয়া গেল, তাহাই তাহার প্রেমোপলব্ধির বেদনা। এই উপলব্ধির বেদনা অল্প কথায় ব্যক্ত হইয়াছে—কেননা মৃত্যুকালে বিস্তর কথা সঙ্গত নহে, সম্ভবও নহে,—আর যদি সম্ভবও হয়, কথক শ্রীবিলাসের পক্ষে তাহা বিবৃত করা শোভন নহে। শ্রীবিলাস নিজে এই কাহিনী বিবৃত করিতেছে, নিজের চরিত্রাদর্শের জয়ঢাক নিজে সে বাজাইতে পারে না—আত্মপ্রশংসার বিস্তৃত ব্যাখ্যা শ্রীবিলাসের কর্মও নহে। এইজন্য নিজের সম্পর্কে সে যাহা কিছু বলিয়াছে, তাহা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, অত্যন্ত সংযত। এই সংক্ষিপ্ত, সংযত কথাগুলি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিয়া না লইলে চতুরঙ্গের প্রেমতত্ত্ব সুস্পষ্ট হইতে পারে না।

শ্রীবিলাসের কথা ও চরিত্রের উপর এত জোর দিবার কারণ হইল এই, চতুরঙ্গের চারি চরিত্রের মধ্যে শ্রীবিলাসই রবীন্দ্র-কল্পিত জীবনবাদের ধারক ও বাহক। শ্রীবিলাসকে

সম্যক্ বুঝিলে রবীন্দ্রনাথের প্রেমবাদ ও জীবনতত্ত্ব সম্পর্কে আর কোনো অস্পষ্টতা থাকে না। রবীন্দ্রনাথের জীবনতত্ত্ব জগমোহনের বিদ্রোহী নাস্তিক্যে নাই, শচীশের তত্ত্বসর্বস্ব সন্ন্যাসেও নাই, দামিনীর যৌবনোন্মত্ত অহং-বাসনাতেও নাই, আছে এই শ্রীবিলাসের সমন্বয়ধর্মী সহজ হৃদয়মহত্ত্বে, আছে কর্মজগৎকে গ্রহণ করার সহজ আনন্দে, আছে বস্তু-পৃথিবীর ঊর্ধ্বে থাকার সহজ ঔদার্যে। দামিনী যে ঘর পাইল, সে কেবল শ্রীবিলাসেরই প্রেমের মহত্ত্বে। শচীশকে মনের মধ্যে পুষিয়া রাখিয়া ঘর করিতে আসায় দামিনী ভুল করিয়াছে, অমারাত্রি তাহার কাটিয়াও কাটে নাই, কিন্তু জীবনের সন্ধ্যাকালে সে যে নূতন আশা করিয়া গেল, সে কেবল শ্রীবিলাসেরই হৃদয়-জ্যোতির দিব্য মহিমায়। শ্রীবিলাস-চরিত্রে আনন্দগম্ভীর যে প্রেমের চিত্রটি ফুটিয়াছে, রবীন্দ্রদর্শনের প্রেমতত্ত্ব আলোচনায় তাহার মূল্য ও মর্যাদা তাই অপরিসীম। শ্রীবিলাস সুখাশ্রয়ী নহে, প্রেমাশ্রয়ী, আনন্দাশ্রয়ী। সুখ সে যে আশা করে নাই তাহা নহে, 'সুখ দাবি করিবার অধিকার' সে রাখে নাই। এইজন্য সুখ পাইলে সে সুখী বটে; কিন্তু না পাইলে ধৈর্য হারায় না, হাহাকারে আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করে না। কিন্তু প্রেম না পাইলে? প্রশ্নটি অতর্কিত-ভাবে মনের মধ্যে আগাইয়া আসে বটে, কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায়, প্রশ্নটি অবান্তর। প্রেমাশ্রয়ী প্রেম অবশ্যই পাইবে। সুখের আশায় যাহারা প্রেম চাহে, প্রেম না পাইলে তাহারাই হাহাকার করে। এই হাহাকার প্রেমের জন্য হাহাকার নহে, প্রেম হইতে যে সুখ সে আশা করিয়াছিল, সে সুখ মিলিল না বলিয়াই হাহাকার। সংসারে সুখাশ্রয়ীর সংখ্যাই অধিক—প্রেমাশ্রয়ী 'কোটিতে গোটিক হয়' এ কথা সত্য। সুখাশ্রয়িতাই বাস্তব, কিন্তু প্রেমাশ্রয়িতা অবাস্তব নহে। সুখাশ্রয়িতা যদি অধিকতর বাস্তব হয়, তবে প্রেমাশ্রয়িতা বৃহত্তর বাস্তব। সংসারে ইহাদেরও সন্ধান মেলে। ইহারা যে অবাস্তব নহে—সে কথা শচীশকুলের তত্ত্বসর্বস্ব রূপকোপাসনার সহিত শ্রীবিলাসবর্গের প্রেমোপাসনার তুলনা করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। ইহাদের প্রেম সুখের জন্য নহে, প্রেমেরই জন্য। এইজন্য সুখ না পাইলেও আনন্দে ইহারা বঞ্চিত নহে। ইহারা ঘোরতরভাবে গৃহী হইতে পারে না সত্য, কিন্তু ইহারা সন্ন্যাসীও নহে। সন্ন্যাসী নহে বলিয়া নারীকে ইহারা উপেক্ষা দেয় না; আবার পুরাদস্তুর গৃহী নহে বলিয়া নারীকে লইয়া শুদ্ধমাত্র গৃহকর্ম ও কামনার ক্রীড়নক করিয়াই রাখে না। প্রেমের সাধনায় নারীকে ইহারা সত্য করিয়া আবিষ্কার করে—মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠা দেয় সেই সত্য প্রতিমাকে। সুখাশ্রয়ীদের দামিনীদল বিদ্যুল্লেখার মত চকিতে উদিত হইয়া চকিতেই চলিয়া যায়, কিন্তু প্রেমাশ্রয়ীর প্রেমকল্পনায় দামিনীদল অচপল দামিনীতুল্য। দামিনীর দেহাবসানের পর প্রেমাশ্রয়ী শ্রীবিলাস সেই কথাই লিখিতেছে :

"আমি জানি, আমার কথা কেহ মানিবে না। শংকরাচার্যের মোহমুদ্গর কাহাকেও রেহাই করে না। মায়াময়মিদমখিলং ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু

শংকরাচার্য ছিলেন সন্ন্যাসী—কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ—এ সব কথা তিনি বলিয়াছিলেন, কিন্তু এর মানে বুঝেন নাই। আমি সন্ন্যাসী নই তাই আমি বেশ করিয়া জানি, দামিনী পদ্মের পাতায় শিশিরের ফোঁটা নয়।

"কিন্তু শুনিতে পাই গৃহীরাও এমন বৈরাগ্যের কথা বলে। তা হইবে তারা কেবলমাত্র গৃহী—তারা হারায় তাদের গৃহিণীকে। তাদের গৃহও মায়া বটে, তাদের গৃহিণীও তাই। ওসব যে হাতে গড়া জিনিস; ঝাঁট পড়িলেই পরিষ্কার হইয়া যায়।

"আমি তো গৃহী হইবার সময় পাইলাম না, আর সন্ন্যাসী হওয়া আমার ধাতে নাই, সেই আমার রক্ষা। তাই আমি যাকে কাছে পাইলাম সে গৃহিণী হইল না, সে মায়া হইল না; সে সত্য রহিল, সে শেষ পর্যন্ত দামিনী। কার সাধ্য তাকে ছায়া বলে।"

প্রেমের সাধক শ্রীবিলাসের জীবনে দামিনী তাই ছায়া নহে, পলাতকা নহে, প্রেমের নব নব বেদনার চেতনায় সে সমাগতা। বলিতে পারেন, শ্রীবিলাসের ইহা বিলাসমাত্র; কিন্তু ইহাই প্রেমের আনন্দ-বিলাস। নিরঞ্জন আইডিয়ার আনন্দে বিশ্রামবিহীন যাযাবরত্ব ইহা নহে, শুদ্ধমাত্র রূপকের পূজায় রূপকে পরিহারের পৌরুষবৃত্তিও ইহা নহে, ছায়াকেই কায়ারূপে পাওয়া গেল না বলিয়া শূন্যে মন মেলিয়া ক্ষুণ্ণ হইবার নির্বুদ্ধিতাও ইহা নহে—পরন্তু দুঃখের মধ্য দিয়া, ক্ষমার মধ্য দিয়া, স্থৈর্য ও ধীরতার মধ্য দিয়া বাস্তবজীবনকে সংযত চেতনায় প্রতিষ্ঠা দিবার সাধনাই এই প্রেমজীবনের আনন্দ-বিলাস, ইহাই শ্রী-বিলাস। শ্রীবিলাসের চরিত্রে এই শ্রী, হ্রী ও ধী-শক্তির আনন্দই বিলসিত হইয়াছে। এই আনন্দ, বলাই বাহুল্য, প্রকৃতিকে উপেক্ষা করে না, জোর-জুলুমও করে না—পরন্তু শান্ত সংযম ও ধৈর্য সহকারে প্রকৃতির স্বরূপে অবগাহন করিয়া সবার অগোচরে আপন প্রেমস্বরূপেই তাহাকে টানিয়া আনে। প্রেমের স্বভাবই তো এই। এই প্রেমেরই প্রভাবে প্রকৃতি ক্রমশঃ প্রেমরূপেই হয় রূপান্তরিত। তখন প্রেম ও প্রকৃতি দ্বৈত থাকিয়াও অদ্বৈত পুলকে একাত্ম ও একাঙ্গ হইয়া যায়। এই তত্ত্বই শ্রীবিলাসের জীবনে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহারই বলে সে জয় করিয়াছে চঞ্চলা দামিনীকে।

কিন্তু 'যোগাযোগে'র মধুসূদন-চরিত্রে এ হেন উদার জীবনতত্ত্বের কোনো বালাই-ই ছিল না; ধৈর্যসহকারে প্রকৃতিকে প্রেমরূপে প্রতিষ্ঠা দিবার স্বভাবই তাহার নহে। অহং-মত্ত অন্ধতা তাহার চরিত্রে- জোরজুলুমের আতিশয্য তাহার স্বভাবে। এহেন স্বভাব 'যোগের' অর্থাৎ মিলনের আনন্দ-আশায় 'অযোগে'র নৈরাশ্যই আনে টানিয়া। ফল হয় এই, প্রেম-জীবনে, বিশেষ করিয়া দাম্পত্যজীবনে, সমাগত হয় অজস্র সহস্র জটিলতা।

'যোগাযোগে' এই জটিলতার জটগুলি পাকাইয়া তুলিয়া নিপুণ শিল্পী পরোক্ষভাবে প্রেম-জীবনের ভিন্ন একটি নূতন রূপ চিত্রিত করিয়াছেন। 'অযোগ' কেন? এবং 'যোগ' কোথায়? —এই দুই প্রশ্নের সদুত্তর মিলিলে প্রেমজীবনের সেই নূতন রূপটি সহজ ও স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হইবে।

'যোগাযোগ'

যোগাযোগ মনস্তত্ত্বমূলক জটিল উপন্যাস। শিল্পের বিচারে, দাম্পত্যজীবনের অন্তর্বিরোধই এই উপন্যাসের প্রাণবস্তু। মধুসূদন প্রেম চাহে, কিন্তু প্রেমের উপরে প্রভুত্বকে স্থান না দিয়া পারে না। কুমুদিনী প্রেম চাহে, কিন্তু মনোগত কল্পপ্রেমের বস্তুপ্রকাশ দেখে নাই বলিয়া সংসারজীবনে অসুখীই রহিয়া যায়। মধুসূদনের প্রভুত্বগর্বের অহমিকাকে মানিয়া লইয়া কুমুদিনী যদি তাহার কামনা-কূপেই বন্দিনী রহিয়া সুখ পাইত, কিংবা অপরপক্ষে মধুসূদন যদি কুমুদিনীর স্বভাব-স্বরূপের বৈশিষ্ট্য বুঝিয়া শান্ত-সংযমে তাহার হৃদয়জয়ে অগ্রসর হইত—দাম্পত্যমিলন অসম্ভব হইত না। কিন্তু মধুর পক্ষে প্রভুত্বের মোহ ও কামনার ক্ষুধা সংযত রাখা যেমন অসম্ভব, কুমুদিনীর পক্ষে শুভ্র শুচিতার নির্মল সৌন্দর্য সহসা ত্যাগ করিয়া কামকামনার বন্দিত্বে বদ্ধ হওয়াও তেমনি অসম্ভব। ইহাই অযোগের রহস্য। মধুসূদনের মত দম্ভী পুরুষের পক্ষে এই রহস্যের তাৎপর্য বোঝা সহজ নহে। সে 'হীরা দিয়া হৃদয়' কিনিতে গেছে, কিনিতে পারে নাই বলিয়া ক্রোধান্ধ উন্মত্ততায় জন্তুর মত জোরজুলুম করিয়াছে। অপরপক্ষে কুমুদিনী কুমারীজীবনে যে প্রিয়দেবতার মূর্তি কল্পনা করিয়াছিল, সেই সদাপ্রসন্ন শুভ্র-সুন্দর কল্পমূর্তি মধুসূদনের রূপে বা ব্যবহারে সে দেখিল না; অন্তরের সেই প্রিয়দেবতাকে অন্তরেই সে পূজা করিল, বাহিরে রহিল ম্রিয়মানা, বিষাদিনী।

তবু মধুসূদনের সন্তানকে গর্ভে ধরিতে হইল। মধুসূদন তাহার চিত্ত জয় করে নাই, প্রেমের সাধনায় ধীরে ধীরে তাহাকে কাছে টানে নাই, মোহের বসন্ত-স্বপ্নে ভরে নাই তাহার যৌবন, মধুসূদনের বলদৃপ্ত কামার্ত সহবাসে কুমুদিনী নিজেকে তাই কলুষিতাই মনে করিল। মোহই প্রেমের সূচনা বটে, কিন্তু মধুসূদনের এই পাশবিক মোহ-বাসনা চিত্তজয়ের অনুকূল নহে বলিয়া প্রেমের মিলনপথে পর্বতপ্রমাণ বাধাই আনিয়া দিল; পাশবিক মোহ-যোগের অতর্কিত অনাচার মানসিক অসহযোগের বিষাদই বিস্তার করিল। কিন্তু তথাপি সংসারজীবনে ইহা ব্যর্থ নহে। মোহের মধ্যে যে অন্যায় পাশবিকতা বর্তমান, তাহার সংস্পর্শে প্রেম ক্ষুব্ধ হয়, রুষ্ট হয়: এইজন্যই জীবনে শান্তি থাকে না; চাঞ্চল্য থামে না। ইহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত মানুষকে করিতেই হয়। কিন্তু এই মোহেরই যে মুখটি প্রেমের দিকে গিয়াছে, যন্ত্রণাঘোরের কুজ্ঝটিকা কাটিলে, সেই মুখটি যখন সুস্পষ্ট

হয়, তখন দেখা যায়, সেই প্রেমাভিমুখী মোহই কোনো না-কোনো বিষয়ে চিত্তমধ্যে তৃপ্তি ও সুখদানের ছলনায় দম্পতিজীবনকে বন্ধনে টানিয়া আনে। মধুসূদনের সন্তানকে গর্ভে ধরিয়া কুমুদিনীর অন্তরে ঘৃণা ও বিতৃষ্ণার অন্ত ছিল না, কিন্তু সন্তানজন্মের পর বাৎসল্য-মোহের কান্ত-মাধুর্যে দুঃসহ সংসারজীবনকে সুসহ না ভাবিয়া তো পারিল না। আমার বলার কথা এই, মধুসূদনের পাশব কামনার আকস্মিক বলপ্রয়োগে কুমুদিনীর প্রেম ক্ষুব্ধ হইয়াছে সত্য, কিন্তু পরিণামে এই কামনা-মোহই সন্তানস্নেহের মায়া বিস্তার করিয়া তাহার বিষণ্ণ ভগ্ন হৃদয়কে ভিন্নতর এক বিশেষ শান্তিদানে আসক্ত করিল, তাহার আকাশ-বিহারী বিক্ষুব্ধ কল্পপ্রেমকে স্বামীগৃহের বাস্তবপ্রেমে আনিল টানিয়া। সন্তান যখন স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল—কুমুদিনীর ক্ষুব্ধ চিত্ত সেই শিশুসন্তানের মধ্যে অনমুভূত এক মাধুর্য অনুভব করিয়া প্রসন্নই হইল; সত্ত্বভাবাশ্রয়ী ব্যথিত তাহার উন্মনা প্রেম সন্তানের মধ্য দিয়া মাটির পৃথিবীর সহিত সম্বন্ধ অনুভব করিল। যে মোহের অত্যাচারে কুমুদিনী একদিন নিজেকে কলুষিতা মনে করিয়াছিল, সেই মোহের করুণাতেই বিনাশশীল এই গৃহভুবনে আবির্ভূত হইল অবিনাশ বালগোপাল।

ইহাই প্রেমযোগের সূত্র। এই পর্যন্ত জানাইয়া লেখক দীর্ঘ বত্রিশ বছরের ঘটনাবলীকে যবনিকার অন্তরালেই রাখিয়াছেন। তাহার পর শিশু অবিনাশ যখন বত্রিশ বৎসরের তরুণ যুবক তখন তাহার জন্মদিবসোপলক্ষে একটি উৎসবমুখর দিনের কথা উত্থাপন করিয়াছেন। অবিনাশ বংশের কুলতিলক, সকলের আদর ও প্রীতির পাত্র, ইহাকে ঘেরিয়া স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে অযোগের অভিশাপ-অন্তে যোগের আনন্দ লাভ করা সম্ভব কি না, রসিক পাঠকই তা' নানাভাবে ভাবিবেন; লেখক শুধু সেই ভাবনার পথটুকু ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিয়াছেন।

আসল কথা যা', বলিতেছি। কুমুদিনীর প্রেমস্বভাব মোহার্ত কামবিলাসে নহে, বালকহৃদয়ের সরল মাধুর্যেই উদ্দীপ্ত হয়, প্রসন্ন হয়। বালকের ভালবাসায় তাহার হৃদয় খোলে, নিজেকে সে খুঁজিয়া পায়। কিন্তু পুরুষের বিশেষ করিয়া মধুসূদনের মত অহংমত্ত দম্ভী পুরুষের ভালবাসায় তাহার চিত্ত অবগুণ্ঠিতই হইতে থাকে। এখানে বিপ্রদাসের সাত্ত্বিক স্বভাবের সহজ প্রভাব তাহার উপর বিশেষ কাজ করিয়াছে। কুমু-চরিত্রের এই বিশেষত্ব লক্ষণীয়। তাহার প্রেম-মানস এমনই যে, তাহার ভালবাসা যদি প্রার্থনা করিতে হয়, তবে বালক-চরিত্রের সহজ সারল্যে কামবিহীন আনন্দানুরাগের সাধনা করিতে হইবে, নিষ্পাপ আনন্দে কাছে টানিতে হইবে, ধীরে ধীরে অত্যন্ত সন্তর্পণে তাহার চিত্তজয়ে অপেক্ষা করিতে হইবে। মধুসূদনের স্বভাবে এ সকল গুণ আদপেই ছিল না; ঐশ্বর্যের অহংকারে সে অন্ধ; ঐশ্বর্যের শক্তিবলে সকল কিছুই অধিকার করা যায় বলিয়া তাহার ধারণা। চাটুয্যেবাড়ির কন্যাকে বিবাহ করার

মূলে তাহার ঐশ্বর্য-গর্বই ছিল প্রবল; ঐশ্বর্যের জাঁক দেখাইয়া কুমুদিনীকে সে স্তম্ভিত করিবে, জয় করিবে, ধারণা করিয়াছিল।

'যোগাযোগে' লক্ষণীয় বিষয় এই, মধুসূদন কুমুর রূপ ও আত্মমর্যাদাবোধের নিকট মর্মে মর্মে পরাজয় স্বীকার করিয়াছে; কিন্তু বহুকালের অর্জিত প্রভুত্ব-সংস্কার ত্যাগ করিতে পারে নাই। তবু সংসারে রূপের জয় হয়, রূপজ প্রেমের অশান্ত পিপাসায় পুরুষকেও বালক করিয়া আনে। মধুসূদনকে তাই মধ্যে মধ্যে কুমুর নিকট আসিয়া বিহ্বল বালক-প্রায় নতি স্বীকার করিতে হইল। লক্ষ্য করিবেন, মধুসূদন যেখানে প্রেমের আর্তি প্রকাশ করিয়া নত হইতেছে, সাধারণভাবে সহজ ব্যবহার করিতেছে, কুমুদিনী সেখানে তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারিতেছে না। মধুসূদনের ঐশ্বর্য কুমুকে আকর্ষণ করে নাই; তাহার উপর তাহার কুরূপ ও পরুষকঠোর রূঢ় ব্যবহার তাহাকে প্রেমের বিপরীত পথেই চালিত করিয়াছে। কিন্তু অহং-সর্বস্ব মধুসূদন যখন বালকের ন্যায় কুমুর কাছে লুটাইয়া পড়ে, কুমু দিশাহারা হইয়া যায়। তাহার স্বভাবের মধ্যে যে স্নেহকোমল সত্ত্বভাবের আবেগমাধুর্য বর্তমান, মধুর শান্ত ব্যবহারে তা' প্রভাবিত হইয়া সচকিয়া উঠে—অথচ তাহার অন্তরস্থ নারীমনটি মধুসূদনে সুখী নহে, শান্ত নহে। এইজন্য মধু যখন কুমুর সহিত সহজ ব্যবহার করিতে করিতে হঠাৎ আবার অহং-গর্বে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে, পোষা মিনিটার মত মিহিসুরে আওয়াজ করিতে করিতে হঠাৎ গর্জন করিয়া উঠে প্রভুত্বের কেশর ফুলাইয়া, কুমুদিনী যেন বাঁচিয়া যায়। কুমুদিনী মধুসূদনের পরুষকণ্ঠের রূঢ় স্বভাবকে ভয় করে না: ভয় করে তাহার বালকোপম সহজ স্বভাবের আকস্মিক সদয়তাকে।

কিন্তু মধুসূদন কুমুদিনীকে ভালোই বাসিয়াছিল। এত বড় যে প্রভুত্বধর্ম, তাহাও যেন কুমুদিনীর জন্য মধ্যে মধ্যে হারাইতে পারিলে সে বাঁচিত। কিন্তু তবুও সে কেন দাম্পত্য-জীবনে হইল ব্যর্থ? কারণ এই, মধুসূদনের ভোগলিপ্সু প্রণয়াকাঙ্ক্ষা আপনাকে লইয়াই ছিল প্রমত্ত। যে-প্রেম প্রকৃতির স্বরূপটি সংযত সাধনায় বুঝিয়া লইয়া প্রকৃতিমর্মে আপন প্রভাব বিস্তারে সচেতন হয়, সেই প্রেম মধুসূদনের ছিল না। এটা যে ছিল না, সে কথা বেচারা জানিতই না। এই প্রেমের অভাবেই অন্ধের মত তাহাকে কেবলি হাতড়াইতে হইয়াছে।

অপরপক্ষে কুমুদিনীও মধুসূদনের মর্মপ্রকৃতির স্বরূপ বুঝিয়া ক্রমশঃ তাহাকে আপন করার যত্ন লয় নাই। কুমু মুখ বুজিয়া সহ্য করিয়াছে অনেক, কিন্তু সেই সহ্যশক্তি যতই তাহার আত্মমর্যাদাবোধকে দীপ্যমান করিয়াছে, ততই দাম্পত্য-মিলনের পথটি অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে। আসল কথা, মধুসূদনের ব্যবহারে কুমুর যৌবনস্বপ্ন ও কল্পপ্রেম গোড়া হইতেই বিষাক্ত হইয়া গেছে বলিয়া প্রেমের দৃষ্টিতে মধুসূদনের অন্তর্গূঢ় অসহায়তাটুকু লক্ষ্য করিবার বোধই তাহার ছিল না। অধিকন্তু বাল্যকাল হইতেই দাদার চরিত্রপ্রভাবে রুচিসুন্দর যে সত্ত্বভাবের সে অধিকারিণী হইয়াছিল, তাহাতেই সে মাটির

পৃথিবী হইতে কল্পনার আকাশে করিত বিহার। এই কল্পনা আরও বেশি অন্তর্মুখী হইয়া গেল মধুসূদনের কুরূপে ও কর্কশ ব্যবহারে। মধু যদি কুমুর কল্পপ্রিয়ের মত রূপবান হইত, সাময়িকভাবে অন্ততঃ কুমুর আকাশবিহারী কল্পনা মাটির পৃথিবী স্পর্শ করিতে পারিত।

কিন্তু সাময়িকভাবে বলিতেছি কেন? রূপপ্রভাবের কথা বলিতেছি। রূপপ্রভাবে কুমু প্রথমটায় মধুতে হয়তো আকৃষ্ট হইত; কিন্তু কুমুকে যতদূর বুঝিয়াছি, এ আকর্ষণ তাহার বেশিদিন স্থায়ী হইত না। মধুসূদনের রূপ থাকিলেও কুমুর সহিত তাহার প্রেম সম্ভব নহে। রূপের আকর্ষণে কুমুদিনী হয়তো বাহ্যতঃ ধরা দিত, কিন্তু কামনার অনাচারে মর্মতঃ তাহাকে ফিরিতেই হইত; আর যদি ধরা দিতে দিতে ধরা দেওয়ার ব্যাপারে সে অভ্যস্ত হইয়া যাইত তবে তো কুমু-স্বভাবের মৃত্যুই ঘটিত। সে কুমু তো কুমুদিনীই নহে। রূপশক্তির প্রভাবে মধুসূদন যদি কুমুদিনীকে জয় করিত, তবে তো তাহার চরিত্রে বৈশিষ্ট্যই কিছু রহিত না!

বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছি, কুমু-জাতের মেয়েরা যতটা স্নেহবিহ্বলা, ততটা রতিবিহ্বলা নহে। আগে ইহাদের স্নেহ আকর্ষণ করিতে হয়, পরে সেই স্নেহকে সংযত সাধনায় প্রেমে টানিয়া আনার ধৈর্যটি হৃদয়ে ধরিতে হয়। ইহাদের প্রেয়সীত্বের মধ্যে জননীসুলভ যে শুভ্র ব্যক্তিত্বচ্ছটা বিচ্ছুরিত হয়, পৌরুষ-রূঢ় মূঢ় কামনার অন্ধ অমায় তা' আচ্ছাদিত করা অশোভনই বটে। কুমু-জাতীয়া মেয়েদের ব্যক্তিত্বের এই সূক্ষ্ম ধর্মটি ধরিতে না পারিলে দাম্পত্যজীবনে ইহাদের লইয়া সুখ নাই, স্বস্তি নাই।

মধুসূদন এ-সকল কথা বুঝে নাই—কুমুকে কুমু হইয়া বুঝিবার ধৈর্য বা শক্তি তাহার ছিলই না, তবু মধু তাহাকে চাহিয়াছিল, চাহিয়াছিল রূপে মুগ্ধ হইয়া, কামবাসনায় মর্মতঃ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া। কুমুর আগমনে মধুসূদনের অন্তরে বাসনাবেগ প্রবল হইয়া উঠিল; কিন্তু ইহার পূর্বে সে কোনো নারীতেই তেমন লিপ্ত ছিল না। এ কথা সত্য, শ্যামার সহিত পূর্বেও তাহার সামান্য কিছু মধুর সম্বন্ধ ছিল, কিন্তু তাহা যেন ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য নহে। কুমুদিনীকে দেখিয়া তাহার ভোগবৃত্তি উঠিল উদ্বেল হইয়া —অথচ কুমুদিনী তাহার ভোগবৃত্তি চরিতার্থ হইতে দিল না; এমন কি চোখের আড়াল পর্যন্ত হইয়া গেল। তখন মধুসূদনের সেই পুরুষ পিপাসা শ্যামাকে লইয়া মত্ত হইল। ইহা অস্বাভাবিক নহে, উপন্যাসে ইহা অপ্রাসঙ্গিকও নহে। বরং বলা ভালো যে, শ্যামার সহিত মধুসূদনের কামোন্মত্ততার চিত্র-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া কবিগুরু মধু-চরিত্রের অন্তর্গূঢ় স্বরূপটি সুস্পষ্টভাবেই প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন। কুমুকে মধুসূদন কী কারণে এবং কেন চাহিয়াছিল তাহার ইঙ্গিত মেলে কুৎসিৎ এই মনোবিকারের চিত্র-সৌন্দর্যে। কল্পনা করা যাক, কুমু মধুসূদনের কামনার টানেই বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে, এবং মধুর মনোবিকারগুলি সরল আনন্দে সহ্য করিয়া যাইতেছে। যদি এমন হইত, সাধারণ দাম্পত্যজীবনের

গতানুগতিক একখানি চিত্রালেখ্য হয়ত দেখিতাম। সামাজিক বৈধতার দোহাই দিয়া মধু-কুমুর মোহকে প্রেম বলিয়াই ভ্রম করিতাম; মধুকে বিকারগ্রস্ত না ভাবিয়া প্রেমিকরূপে ব্যাখ্যা করিতে একটুকু দ্বিধাও হয়ত অন্তরে জাগরিত হইত না; ফলে যে বিশেষ সত্যটির প্রকাশাবেগের আনন্দে যোগাযোগের অবতারণা তাহা অবশুই তখন অন্তর্হিত হইত। কুমু বশ্যতা স্বীকার করিলে যে ব্যাপারটি অন্ধকারের অন্তরালে সংঘটিত হইয়া মধু-চরিত্রের স্বরূপসন্ধানে অন্তরায় ঘটাইত, শ্যামার সান্নিধ্যে সেই ব্যাপারটি দিনের আলোয় প্রকাশ পাইতেছে বলিয়া মোহোন্মত্ততা যে প্রেম নয়, তাহা বুঝা সহজ হইয়াছে। তত্ত্বের দিক হইতে তো বটেই, শিল্পের দিক হইতেও মধু-শ্যামার প্রণয়চিত্রের প্রয়োজন ছিল। কর্মান্তরে ব্যাপৃত রহিয়া মধুসূদন ইতিপূর্বে যে কামনাকে অজ্ঞাতসারেই দমিত রাখিয়াছিল, বিবাহের পর সেই বাসনা যখন জাগিল, তখন ভোগের বস্তুকে আপনার বলিয়া জানিয়াও ভোগ করিতে না-পারার যে ক্ষিপ্ততা, মধুর পক্ষে তা' সংযত রাখা স্বাভাবিক নহে, সত্যও নহে। সাহিত্যিক ইহাকে লুকাইতে পারেন না। অপরপক্ষে তাত্ত্বিকও জানেন, প্রেমজীবনে যে রূঢ়তা জাগে, মূঢ়তা জাগে, অশান্তির অগ্ন্যুত্তাপে প্রেমজীবন যে দগ্ধীভূত হয় ঘরে ও বাহিরে, তাহা এই বিচারবিহীন কামবৃত্তির শান্তিহীন অমিতব্যয়িতায়। 'অযোগের' রহস্যোদ্ঘাটনে এ বিষয়টি তো ধীরভাবে বুঝিতেই হইবে। প্রাচীনপন্থী নীতিবাদের দোহাই দিয়া মধু-শ্যামার অবৈধ মিলন ব্যাপারে লেখককে যাঁহারা দায়ী করেন, লেখকের উদ্দেশ্য তাঁহারা বুঝিয়াছেন বলিয়া মনে করি না। মধুসূদন বাস্তব চরিত্র, এত বেশি বাস্তব, যে অনেক সময় ইহাকে বুঝিতে বিলম্বই হয়। বাস্তবজগতে, বলাই বোধ কবি বাহুল্য, অনেকক্ষেত্রে আমরা অতিবড় বাস্তবকেও বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আমাদের বাস্তববোধ আমাদের স্বভাব দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। আমরা মধুর মত অতটা অহংমত্ত নহি, তাই তাহাকে বাস্তব বলিয়া স্বীকার করিতে বাধা আসে। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ চিত্তসাধনার অনেকটা উচ্চস্তরে উঠিয়াছি, তাহাদের বিচারে অহংমত্ততা, কামার্ততা, অবাস্তব অমানুষিকতার লক্ষণ হইতে পারে; আবার চিত্তসাধনার সর্বোচ্চস্তরে যাঁহারা উঠিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের অভিজ্ঞ বৈষয়িক বিদ্যার বিপুল বিবেচনাকে বালকবৃন্দের অবাস্তব অহমিকা মনে করিয়া হাসিতেও পারেন। বস্তুতঃ আমরা নিজেরা মর্মতঃ যা' তাহাই বাস্তব—অন্য সব 'নরম্যাল' নহে, 'অ্যাব্‌নরম্যাল'। অহংমত্ত অন্ধ মধু-চরিত্রের যৌনবিকার 'অ্যাব্‌নরম্যাল' হইতে পারে, কিন্তু ইহা দানব নহে, মানবচরিত্রই বটে। ইহা রূপক নহে, 'রক্তকরবীর' রাজার মত জালের আড়াল হইতে শুদ্ধমাত্র হস্তপ্রসারণেই ইহার প্রেম-নিবেদন নহে। ইহার স্থূল জৈব দেহ সূর্যের আলোকে সুস্পষ্ট; ইহার ব্যবহারও স্পষ্ট, ইহার কামনাও কোথাও প্রচ্ছন্ন নহে, জটিল নহে। বাঙালীর অভিজাত সমাজে পূর্বে এমন চরিত্র বহু ছিল, এখনও আছে বহু সংসার আলো করিয়া। ইহাদের সমাজে ও অন্তঃপুরে ইহারা অতি বড় বাস্তব। ইহাদেরই একজন এই

মধুসূদন। ড. সুবোধচন্দ্র মধুসূদনকে 'রক্তকরবী'র রাজার সহিত তুলনা করিয়াছেন। এ তুলনা হাস্যকর; রবীন্দ্রনাট্যের কোনো রূপক চরিত্রের সহিত নিতান্ত বাস্তব এই উপন্যাসচরিত্রের তুলনা কেমন করিয়া মনে আসে, বুঝা শক্ত। তবু যদি কবির কোনো নাট্য-চরিত্রের সহিত মধুসূদনের তুলনা করিতেই হয়, তবে 'রাজা ও রাণী' নাটকের বিক্রমদেবের সহিত মধুসূদনের কতকটা তুলনা করা চলিতে পারে। কামনা চরিতার্থ না হওয়ায় রাজা বিক্রম রাষ্ট্র-জীবনে যে প্রমত্ততা দেখাইয়াছে, মধুসূদন তাহার পারিবারিক জীবনে সেই প্রমত্ততার প্রকারভেদ প্রকাশ করিয়াছে বলিলে নিতান্ত ভুল কথা বলা হয় না। মধুসূদন যেমন শ্যামার প্রণয়ে প্রমত্ত হইয়াছিল, বিক্রমও তেমনি ইলার রূপে মত্ত হওয়ার পথে নামিতেছিল; তবে ইলার মধ্যে কুমার-প্রেমের একনিষ্ঠতা দেখিয়া বিক্রমের চিত্তবৃত্তির রূপান্তর ঘটিয়াছে। কিন্তু শ্যামা ইলা নহে, শ্যামার জীবনে কোনো কুমারও ছিল না প্রেমরূপে, তাই শ্যামার সান্নিধ্যে মধুর প্রেমবিকাশ হয় নাই, মোহোন্মত্ততাই অবারিত অবসর পাইয়াছে।

তবে তো কুমুর সহিত মধুসূদনের অযোগই প্রবল হইতেছে। কুমু কি তবে শূন্যতার বেদনাবেগে ভাবের আকাশেই কেবল ঘুরিবে? সংসার করিবে না? যোগ কোথায়?

যোগ কুমুদিনীর জননীত্বে। জননী হইয়া সন্তানের আবেগে সংসারে ঝুঁকিয়া পড়ার প্রবণতা আছে কুমুর চরিত্রে। লেখক কৌশলে কুমুচরিত্রের এই দিকটি মতিলালকে সম্মুখে আনিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বালক মতিলালকে কাছে পাইলেই কুমুর সুপ্ত স্বরূপটি মাথা নাড়া দিয়া যেন উঠিয়া বসে। এই বালককে মধুসূদন দেখিতে পারিত না— কিন্তু যদি তাহাকে ভালবাসিয়া কাছে টানিত, পরোক্ষভাবে সে কুমুর হৃদয়ও খানিকটা জয় করিয়া লইতে পারিত।

আপন সন্তানকে মধু কাছে টানিবে—ইহা কল্পনা করা অন্যায় নহে। কুমুর স্নেহোচ্ছ্বাস সন্তানে। সেই সন্তানকে যে স্নেহ করে, কুমুর মন সহজেই তাহাতে বিলাস করে। আপন সন্তানকে স্নেহ দান করিয়া মধু পরোক্ষভাবে বৈরাগিণী কুমুকে সংসারপথে যে টান দিল, মধুসূদন নিজে একথা না জানিতে পারে, কিন্তু কুমু-জাতীয়া মেয়েদের মনস্তত্ত্ব যাঁহারা বুঝেন, তাঁহারা ইহা জানেন বলিয়া যোগের আনন্দ-সান্ত্বনায় এতটুকু অবিশ্বাস করেন না। বক্তব্য এই, সন্তানবাৎসল্যে মধুকে ক্রমশঃ ধূলির পৃথিবী হইতে ভাবের জগতে সংযত হইবার সুযোগ দিলে, এবং অপরপক্ষে কুমুকেও আত্মরতির সম্মোহ ছাড়াইয়া স্বপ্ন হইতে সন্তান-বাৎসল্যে মাটিতে নামিবার অবসর দিলে—মধ্যপথে ইহাদের দাম্পত্য-জীবন সুসহ যে হইতে পারে না, এমন নহে। আসল কথা, মধুকে স্থূলকামনার জৈবতা হইতে মুক্ত হইয়া মানুষ হইতে হইবে, কুমুকেও আত্মগত ভাব বেদনার স্বপ্নমোহ ত্যাগ করিয়া মানুষের পথে নামিতে হইবে, নতুবা প্রেমযোগের সম্ভাবনা নাই। অবিনাশের আবির্ভাব এই সম্ভাবনাকেই সার্থকতার পথে লইয়া যাওয়ার আভাস দিয়াছে।

এই অবিনাশ, কল্পনা করা যায়, মধু-কুমুর যোগসাধন করিল ; সে মধুকে টানিল মাটি হইতে মনুষ্যত্বে, কুমুকে টান দিল স্বর্গ হইতে মানবিকতার আবেগে।

এই অবিনাশের মধ্যে ঘোষালবংশ ও চট্টোপাধ্যায় বংশের দ্বন্দ্বও সম্ভবতঃ আর নাই। ঘোষাল পরিবারে তাহার পিতা, চট্টো-পরিবারে তাহার মাতা। অবিনাশ আসিয়া দুই বংশকে ভক্তির চোখে, শ্রদ্ধার চোখে দেখিতে দেখিতে বড় হইয়া উঠিল। তাহার পর বত্রিশ বৎসর গেল কাটিয়া। যোগাযোগ উপন্যাসের শুরু এই অবিনাশের জন্মদিনের একটি উৎসবানন্দ লইয়া। এই উৎসব যেন 'যোগের' উৎসব ; মিলনের উৎসব। ইহার মধ্যে স্নেহ-সৌন্দর্য, শান্তি ও প্রসন্নতা, ইহার মধ্যে নাই দ্বন্দ্ব, নাই প্রভুত্বের আস্ফালন, নাই জোরজুলুমের অন্ধ অহংকার। যেখানে দ্বন্দ্ব ও প্রভুত্ব, সেখানেই অযোগ, সেখানেই বিয়োগান্ত পরিণতির বিষণ্ণতা। জগত এই বিষণ্ণতার বিষেই জর্জরিত বটে, কিন্তু অনাগত উত্তর পুরুষবর্গের জীবন-সমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃত কি কোনোকালে উঠিবে না? অযোগই সত্য হইবে, যোগ নহে? 'যোগাযোগের' এই প্রশ্ন। যোগাযোগ উপন্যাসের সূচনাতেই কবি 'যোগের' ইসারা দিয়েছেন, তারপর 'অযোগের' আর্তকাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। 'যোগাযোগের' যোগোৎসবের শিল্প-ব্যঞ্জনা এবং অযোগব্যাপারের তত্ত্বব্যাখ্যান যথাযথ অনুসরণ করিলেই প্রেমধর্মের প্রকৃতি স্পষ্ট হইবে। অতঃপর আমরা 'শেষের কবিতায়' রবীন্দ্র-প্রেমদর্শনের যে পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে তাহা বুঝিয়া দেখিব।

'শেষের কবিতা' সম্বন্ধে দুই একস্থানে প্রসঙ্গতঃ দু-একটা কথা ইতিপূর্বে উত্থাপন করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথের প্রেমদর্শনের অনুপম ব্যাখ্যা এই শেষের কবিতা। শিল্প-বিচারে ইহার মূল্য ও মর্যাদা অসামান্য, কিন্তু রবীন্দ্র-কল্পিত প্রেমতত্ত্বের স্পষ্ট ও সংগত ব্যাখ্যা হিসাবেও এই গ্রন্থের একটি স্বতন্ত্র মূল্য ও মর্যাদা আমি দিতে চাই।

'শেষের কবিতা'

শেষের কবিতায় প্রধান চরিত্র অমিত ও লাবণ্য।

অমিত ছিল লাবণ্যের 'মিতা', লাবণ্য অমিতের 'বন্যা'। শিলঙের প্রাকৃত সৌন্দর্যের অবারিত উচ্ছ্বাসের মধ্যে তাহারা উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল—উভয়ে উভয়ের স্বরূপ করিয়াছিল উপলব্ধি। উভয়ের হৃদয় যোগের মায়ানন্দে সহায়তা করিয়াছিলেন যোগমায়া। বন্ধু-প্রেমের যোগ সার্থক হইল ; কিন্তু বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া চিরাচরিত গৃহ-প্রেমের পথে তাহারা আসিল না। অমিত কলিকাতায় ফিরিয়া বিবাহ করিল তাহার পূর্ব-প্রেম কেটি মিটারকে, আর লাবণ্য চলিয়া গেল উপেক্ষিত শোভন-প্রেমের সহিত মিলন-গ্রন্থি বাঁধিতে। অপরিবর্তনীয় মানসমূর্তির স্বপ্নসৌন্দর্যে মিতা-বন্যার

বন্ধু-প্রেম অক্ষয় হইয়া রহিল অমিত ও লাবণ্যের স্মৃতির বসন্ত-কুঞ্জে। শোভনলাল ছাত্রাবস্থা হইতেই লাবণ্যকে ধ্যানে ভালোবাসিয়াছিল। শোভনের ভালবাসা ছিল গভীর, কিন্তু ভালবাসাকে প্রকাশ করার যৌবন-সাহস তাহার ছিল না। শোভন লাবণ্যের পিতার নিকট পাঠ লইতে আসিত; লাইব্রেরী-ঘরে বসিয়া বসিয়া পাঠের সঙ্গে সঙ্গে লাবণ্যের ধ্যান করিত; কিন্তু মুখে কিছুই প্রকাশ করিত না। অপরপক্ষে লাবণ্যের চিত্তে তখনও প্রেম জাগে নাই; শুধু পাঠ, পাঠের অহংকার, এবং সর্বোপরি অহংকারের অন্ধতা লইয়াই সে ছিল আচ্ছন্ন। শোভনের এই ধ্যানময় গভীর প্রেমকে সত্যভাবে গ্রহণ করার শক্তি ছিল না তাহার। একদা শোভনকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিতেও তাহার লজ্জাবোধ বা বেদনাবোধ জাগিল না।

শোভন চলিয়া গেল; যাইবার সময় গোপনে রবীন্দ্র-লিখিত দুখানি কবিতার টুকরা সে রাখিয়া গেল লাবণ্যের উদ্দেশে। লাবণ্য তাহা যখন পাঠ করিল, অকথিত বেদনায় কাঁপিয়া উঠিল তাহার হৃদয়। শোভনলালকে সে কি তখন মনে মনে ফিরাইতে চাহিল?

ইহার পর পিতা দ্বিতীয়বার বিবাহ করায় অভিমানিতা লাবণ্য পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া শিলঙে আসিল যোগমায়ার কন্যা সুরমার গভর্নেস হইয়া। এইখানে একদা আচম্বিতে অমিতের সহিত তাহার পরিচয় ঘটিল। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই অমিতের সহিত তাহার মিলন হইল ঘনীভূত—অমিতের প্রেমচ্ছটায় সে নিজেকে নূতন করিয়া দেখিল। অমিতের প্রেমাবেগে সে প্রভাবিত হইল বটে, কিন্তু মনে কোথায় যেন আতঙ্ক রহিল জাগিয়া। অমিতের প্রেম যেন বন্ধনবিহীন আকাশবিহারী কবিতা-প্রেম, নীড় বাঁধিতে জানে না, শুধু স্বপ্ন দেখিয়াই ভাবোন্মাদ। যত দিন গেল, লাবণ্য বুঝিল, অমিত যতদিন তাহার মধ্যে কবিতা-স্বপ্নের আনন্দটি খুঁজিয়া পাইবে, ততদিনই লাবণ্যকে তাহার ভালো লাগিবে। স্বপ্ন টুটিয়া গেলে লাবণ্যকে লইয়া অমিতের এই অমিতোচ্ছ্বাস আর থাকিবে না।

লাবণ্য বুঝিল, অমিতকে সে প্রাণ ভরিয়াই ভালোবাসিয়াছে, কিন্তু অমিত বন্দী হইবার মানুষ নহে। অমিত লাবণ্যকে বিবাহ করার কথা বলিয়াছে, প্রেমোপহার স্বরূপ একটি অঙ্গুরীয় তাহাকে দিয়াছে—কিন্তু তথাপি লাবণ্য জানে, ঘরে থাকিবার, নীড় বাঁধিবার, ঘরকন্না করিয়া সুখী হইবার মানুষ অমিত নহে। স্বপ্ন ভাঙিয়া গেলে এই অমিতকে আর পাওয়া যাইবে না; তখন যে থাকিবে সেই গৃহস্থ-অমিত (অর্থাৎ মৃত অমিত) সত্যকার অমিত নহে। লাবণ্যর মধ্যে সাধারণ একটা নারীকেই মাত্র দেখিতে পাইবে বলিয়া সুখী হইবে না, লাবণ্যও তাহার পূর্বগৌরব হারাইয়া অন্তহীন মানসযন্ত্রণায় কাটাইবে কাল। অশান্তি ও অগৌরবের মধ্যে সেই মিলন বিয়োগান্তক বেদনা হইতেও ভয়াবহ।

লাবণ্যর মনের অবস্থা যখন এমনি, শিলঙে আসিল অমিতের বোন সিসিকে লইয়া অমিতের পূর্ব প্রণয়িনী কেটি মিটার। লাবণ্য জানিল, অমিত যৌবনের প্রভাতে কেটি-কেও দিয়াছিল একটি হীরক অঙ্গুরীয়; ভালোবাসিয়াছিল তাহাকে। লাবণ্যর

সম্মুখেই কেটি এ সকল কথা কহিল, কহিতে কহিতে কাঁদিল, কাঁদিতে কাঁদিতে লাবণ্যদের গৃহ হইতে গেল চলিয়া। মুখর অমিত মূক হইল এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায়।

ইহার পর আসিল বিচ্ছেদের পালা। লাবণ্য শান্তভাবেই অমিতকে কেটি-র সহিত মিলিতে বলিল। মুক্তার অঙ্গুরীয় দিল ফিরাইয়া। ঠিক এই সময়ে শোভনলাল লাবণ্যর সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়া পত্র লিখিল। এবার লাবণ্য শোভনকে উপেক্ষা করিতে চাহিল না।

কলিকাতায় ফিরিয়া গেল অমিত—বিবাহ করিল কেটি-কে। লাবণ্য চলিয়া গেল শোভনের সহিত—অমিতকে লিখিয়া গেল 'শেষের কবিতা'। শোভনের প্রেমের তপস্যা হইল সার্থক, কেটি-র বেদনার গোপন তপস্যাও আসিল সার্থকতার পথে।

কিন্তু মিতা-বন্যার প্রেম-সমস্যার কি সমাধান হইল ?

মিতা-বন্যার যে প্রেম, তাহা ধ্যানময় চলমান প্রেম, তাহা ঘরের নহে, পথের ; মাটির নহে, আকাশের। গৃহ-বন্ধনে সে প্রেম পদে পদে হয় ব্যাহত, হয় বিক্ষুব্ধ। ধ্যানের আকাশে নিত্য নবায়মান আনন্দগত এই প্রেম জীবনে আনে প্রেরণা, হৃদয়ে জাগায় অপূর্ব চেতনার জ্যোতিস্তরঙ্গ। সান্নিধ্যে এই প্রেম আপনকার স্বভাবই ফেলে হারাইয়া, তখন ইহার অরূপ অপরূপতার রহস্য রূপের সীমায় নামিয়া আসিয়া ধারণ করে স্থূল-ধর্মের রূঢ় সংকীর্ণতা, ব্যবহারের সীমায়, কর্ম ও কর্তব্যের সীমায় অহরহঃ হয় বিড়ম্বিত। মিতাকে মিতার জন্যই তাই ত্যাগ করিতে হয়, দূরে গিয়া সুরের মূর্তিতে অপরূপ হইয়া জাগিতে হয়।

লাবণ্য অমিতের প্রেমে জাগরিত হইয়া ক্রমেই বুঝিয়াছিল—নারীর প্রেম একটি নীড় খোঁজে। কিন্তু অমিতকে লইয়া নীড় বাঁধিতে গেলেই অমিতের এই আকাশবিহারী প্রেম-স্বভাব হইবে রূপান্তরিত। মিতার প্রেমের জন্য অমিতের লোভ তাই ছাড়িতে হইল, মুক্তি দিতে হইল, অমিতকে লইয়া ঘর বাঁধা চলিল না। শোভনলালের প্রেমের মধ্যে লাবণ্য যদি নির্ভরতা না অনুভব করিত এবং সর্বোপরি, তাহার বন্যা-মন মিতার প্রেমে উচ্ছ্বসিত না থাকিত, তবে হয়ত লাবণ্য সাধারণ মেয়ের মতই অমিতকে নীড়-পথে আনিবার জন্য জোর করিত, জেদ ধরিত। অমিতের অন্তরে সে ধ্যানের মূর্তি ধরিয়া নিত্য প্রেমের বিচিত্র রূপরশ্মি বিকীরণ করিতে চাহে বলিয়াই দূরে— বহুদূরে তাহাকে সরিতে হয়। কিন্তু এ তো গেল বন্যার হৃদয়রহস্য। বন্যার মধ্যে যে লাবণ্য আছে সে-ও কি বহিয়া যাইবে, নীড় বাঁধিতে চাহিবে না ? এইখানে শোভন-জীবনের সার্থকতা।

প্রশ্ন হইতে পারে, কেটি-কে লইয়া অমিত নীড় বাঁধিল, লাবণ্যকে লইয়া বাঁধিতে পারিত না ? অমিত লাবণ্যকে লইয়া নীড় বাঁধিবার কল্পনা যে করে নাই তাহা নহে, কিন্তু তা' কল্পনাই। এই কল্পনার আনন্দ-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়াই অমিত ভাবিয়াছিল, লাবণ্যকে পাইলে তাহার সুখস্বপ্নের বুঝি সীমা থাকিবে না। বস্তুতঃ লাবণ্য অমিতের ধ্যানের

প্রেম, চেতনার অভ্যুদয়, যৌবনের বসন্ত-বিহ্বলতা। তাহাকে লইয়া নীড় বাঁধার কথা চিন্তায় আসিলেই অমিতের মধ্যে 'মিতা' উঠে জাগিয়া, সহস্র কল্পনার আনন্দ-রঙে হৃদয় হয় অরুণিত, কবিত্বের রমণীয় রূপমূর্তির অপূর্বতা জাগে উদ্বেল যৌবনে। লাবণ্য ইহা বুঝিয়াছিল বলিয়াই অমিতের স্বপ্ন সে ভাঙিল না, অর্থাৎ দূরে গিয়া অমিতের অন্তরে চিরদিন বন্যারূপে জাগ্রত রহিল, মিতাকে দান করিল আকাশচারী যৌবন-প্রেম।

অমিত চরিত্রের দুইরূপ: অমিত ও মিতা। অমিত কেটি-র প্রেমে মানিল নীড়ের বন্ধন; মিতা বন্যার প্রেমে দেখিল আকাশের মুক্তি-স্বপ্ন। লাবণ্যর প্রেমের মহিমাতেই এটা সম্ভব হইল। অমিতকে লাবণ্য যদি প্রেমের মত প্রেম না দিত, মোহভরে নিশ্চয়ই তাহাকে বাঁধিতে চাহিত; এবং প্রথম অবস্থায় অমিত সেই বাঁধনে ধরা দিয়া সুখীই হইত। কিন্তু লাবণ্য জানে, অমিতকে ধরিতে চাহিলে, বাঁধিতে চাহিলে সুন্দর বিড়ম্বিত হইবে অর্থাৎ মিতা মর্মতঃ মরিতে বসিয়া পলে পলে অমিতকে মারিতে থাকিবে। লাবণ্য তাই অমিতকে ত্যাগ করিল। এই ত্যাগের মহিমা, প্রেমেরি মহিমা; অবশ্য লাবণ্য-চরিত্রে এই প্রেম-মহিমা শোভনলাল না থাকিলে নাও জাগিতে পারিত। শোভন তাহার একনিষ্ঠ প্রেমের অমোঘ তপস্যায় অদৃশ্য আকর্ষণে লাবণ্যকে টান দিয়াছে, লাবণ্য তাহার হৃদয়ভার অর্পণ করিবার আধার পাইয়া গেছে শোভনের প্রেমে, তাই বিলসিত হইয়াছে একদিকে বন্যার প্রেমের ত্যাগ, অপরদিকে লাবণ্যর ভালোবাসার প্রত্যাবর্তন।

শিল্পবিচারে নিখুঁত এবং সর্বাঙ্গসুন্দর এই শেষের কবিতা। পরিবেশ রচনার অত্যদ্ভুত চাতুর্য প্রদর্শন করিয়াছেন কবিগুরু। প্রেমের আনন্দদর্শনটি এই গল্পের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবেই প্রকাশিত হইয়াছে। প্রেম ঘরেরও বটে, পথেরও বটে। সমাজজীবনে এই দুইরূপের স্পষ্ট প্রকাশ আমরা দেখি না; হয় ঘরের, নয় পথের প্রেমে প্রমত্ত হইতেই দেখি মানুষকে। প্রেমের জীবনে মানুষ হয় রূঢ় রিয়ালিস্ট, নয় মূঢ় এস্‌কেপিস্ট। হয় তাহারা মধুসূদনের (যোগাযোগ) মত স্থূলদর্শী, নয় শচীশের (চতুরঙ্গ) মত সূক্ষ্ম ভাব-বিলাসী। রবীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শনে, প্রেমদর্শনে, তথা মনোদর্শনে এই দুই-ই মিথ্যার উপাসক, অতিচারের পোষক। বস্তুতঃ বস্তুকে অস্বীকার করিয়া নয়, ভাবকে ব্যাহত করিয়াও নয়—দুইকে স্বীকার করিয়া দুই পক্ষের মধ্যগ মিলনানুভূতিই রবীন্দ্র-শিল্পের তথা দর্শনের প্রাণস্পন্দন। অমিতকে যদি বাঁচিতে হয়, তবে নীড়কে স্বীকার করিতে হইবে, আকাশের সপ্তরঙের বর্ণচ্ছটায় নয়নও মেলিতে হইবে।

শেষের কবিতায় কবিগুরু নীড় ও আকাশের প্রেমকেই চিত্রিত করিয়াছেন। দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ প্রেম সম্বন্ধে যে মতবাদ প্রচার করিয়া থাকেন, ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ মিতা-বন্যার প্রেমকাহিনীর মধ্য দিয়া তাহাই স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। বিস্ময়ের কথা এই, এই

কাহিনী শিল্পহিসাবে আশ্চর্য নৈপুণ্যে রসোত্তীর্ণ হইয়াছে। অতি আধুনিক একটি পরিবেশের সীমার মধ্যে দার্শনিক কবির নীড়গত ও বিশ্বগত প্রেমের তত্ত্বটি বিস্ময়কর এক অমোঘ প্রতিভার স্পর্শে কাহিনীরূপে, চিত্ররূপে, কাব্যরূপে ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রেম গ্রন্থিকে অস্বীকার করে না, আবার মুক্তিকে স্বীকার না করিয়াও পারে না। অমিত ও লাবণ্যর মধ্যে মিতা-বন্যার কল্পনা আনিয়া কবি গ্রন্থিবদ্ধ প্রেমের বন্ধনহীন ধ্যানমূর্তির আনন্দটিকে সুস্পষ্ট করিয়াছেন। আপাতঃদৃষ্টিতে এবং সমাজদৃষ্টিতে শেষের কবিতাকে ট্র্যাজেডী বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও রবীন্দ্র-কল্পিত প্রেমের দৃষ্টিতে ইহাই মিলনের মিলন—সেরা মিলন। যে-মিলনে প্রেম মোহে নামিয়া আসে, স্তিমিত হয় যৌবনের বহ্নি, আসক্তি নামে তুচ্ছের প্রয়োজনে, সে মিলন, যথাযথভাবে প্রেমের মিলন নহে। যাহা চেতনার স্বপ্নে জাগ্রত রহিয়া বেদনার আনন্দে চিত্তকে শিহরিত করে, টান দেয় কল্প হইতে নূতনতর কল্পে, স্বপ্ন হইতে নূতনতর জীবন-স্বপ্নে, দান করে জীবনের মধ্যেই নবজীবনের আনন্দমুক্তি, তাহাই প্রেমের মিলন; কেননা তাহার মাহাত্ম্যেই জীবন চলিতে পায়, নূতন স্বপ্ন গাহিবার প্রেরণা পায়, ভাবের নূতন উদ্বেজনায় মুক্তির বিচিত্র ধামে গতায়াত করিবার চেতনা পায়।

বন্যা বাঁচিয়া রহিল মিতার মর্মমূলে—অমিতের কাছে লাবণ্যপ্রেমের ইহাই দানের সেরা দান। শোভন-প্রেমের নিশ্চিন্ত সৌহার্দ্যে লাবণ্য নীড় বাঁধিল, অর্থাৎ অপরপক্ষে সে অমিতের কাছে রহিতে পারিল সুরসঙ্গিনী আনন্দ-বন্যা। ইহারই স্বপ্নে অমিত তাহার মিতা-ত্ব রাখিল বাঁচাইয়া; নীড়ের বন্ধন স্বীকার করিয়াও পাখা মেলিল আকাশের মুক্তি-স্বপ্নে।

'দুই বোন'

প্রেমের জন্যই প্রেমাস্পদকে সহজভাবে ত্যাগ করার মঙ্গলইচ্ছা ও আনন্দ যেখানে প্রবল, দুঃখের দুর্দিনেও জীবন সেখানে সুসহ ও সুখ-সুন্দর থাকিতে পারে। ত্যাগ যেখানে সহজ নহে, দুঃসহ দুঃখের অনির্বাণ অগ্নি সেখানে মনোজীবনকে দগ্ধ করিতে থাকে, জীবনে আনয়ন করে ট্র্যাজেডীর বেদনা। দামিনী সহজভাবে শচীশকে ত্যাগ করিতে পারে নাই বলিয়া শ্রীবিলাসের মত স্বামী পাইয়াও এবং সুখী হইয়াও মানসযন্ত্রণার ও 'বুকের ব্যথার' আক্রমণ এড়াইতে পারে নাই। অপর-পক্ষে লাবণ্যর অমিত-ত্যাগের মধ্যে একটি সহজ-প্রসন্নতা ছিল বলিয়া আনন্দ-প্রেমের স্বরূপ চিনা তাহার পক্ষে কঠিন হয় নাই, মিথ্যা হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথের গল্পে ও উপন্যাসে প্রেমের এই সহজ রূপটি লক্ষ্য করিতেই হয়। প্রেমের জন্য প্রেমাস্পদকে ত্যাগ করার আনন্দ-তত্ত্ব ইতিপূর্বে একাধিকবার ব্যাখ্যা করিয়াছি।

রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে আরও দুই তিনখানি উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। প্রেমের তত্ত্বব্যাখ্যায় সেগুলিরও আলোচনা প্রাসঙ্গিক। তত্ত্বতঃ, বলাই বাহুল্য, সেগুলির, বিশেষ করিয়া 'দুই বোন' ও 'মালঞ্চে'র প্রতিপাদ্য হইতেছে প্রেমের মার্জনা। প্রেমের জন্যই প্রেমাস্পদকে সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা বা মার্জনা করিয়া দুঃখের মধ্যেও সুখী থাকার সাধনা—প্রেমের সাধনা।

'দুই বোনে' এই সত্যেরই শিল্পরূপ দেখিয়াছি। আনন্দময় কল্যাণ-প্রেম মর্ত্যজীবনের জটিল ঘটনাবলীর মধ্যে কতটা স্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পায়, শর্মিলার চরিত্র দ্বারা কবি তাহা বুঝাইয়াছেন। শর্মিলার সেবা, ভক্তি ও পাতিব্রত্য অনন্যসাধারণ। শর্মিলাকে কবি বলিয়াছেন, অসাধারণ চরিত্র। এই অসাধারণ চরিত্রের স্নেহচ্ছায়ায় শশাঙ্কর জীবন কর্মে, কর্তব্যে, সুখে, আনন্দে বেশ স্বচ্ছন্দগতিতেই প্রবাহিত হইয়াছে। ঊর্মিমালা এই সংসারে আসিয়া শশাঙ্কর বালকত্ব দিয়াছে বাড়াইয়া, যৌবনের চাঞ্চল্যকে দিয়াছে জাগাইয়া তথাপি শর্মিলার চিত্তে ঈর্ষা নাই, দ্বেষ নাই। গল্পের প্রয়োজনে, সমাজ-বুদ্ধির তুষ্টিসাধনে, লেখক ঊর্মিকে শর্মিলার সহোদরারূপে চিত্রিত করিয়া পরিবেশ রচনার জটিল বিষয়টা কতকটা সহজ করিয়া লইয়াছেন সত্য, কিন্তু শ্যালিকাকে লইয়া শশাঙ্ক যেভাবে মাতিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে শর্মিলার ঈর্ষা জাগিবারই কথা। কিন্তু ঈর্ষা জাগে নাই, যাহা জাগিয়াছে, যে বেদনা ও অস্বস্তি শর্মিলার অন্তরে ঘনাইয়া উঠিয়াছে—তাহা দমন করিবার শক্তি তাহার প্রেমের চরিত্রে যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। ইহার ফল হইয়াছে এই, শশাঙ্ক কোনো ক্ষেত্রে কোনোও ক্রমে শর্মিলার প্রতি বিরূপ হইতে তো পারেই নাই, উপরন্তু শর্মিলার ব্যক্তিত্বের নিকট সকল সময়েই মনে মনে শশাঙ্ককে নত হইতে হইয়াছে। ঊর্মিতে সে মুগ্ধ হইয়াছে, কিন্তু শর্মিকে সে দেবী বলিয়া পূজা না দিয়া পারে নাই। শশাঙ্কর চিত্তগতি এই স্থলে লক্ষ্য করিবার মত। শর্মিলার একখানা ফটো বহুদিন ধরিয়া আবাঁধা অবস্থায় পড়িয়াই ছিল, সহসা সে সেখানি বাঁধাইয়া আনিল, পূজা করিতে শুরু করিল আবেগানন্দে।

শর্মিলা যদি ঊর্মিকে ঈর্ষা করিত, শশাঙ্ককে সন্দেহ করিত, প্রেমের মার্জনার রূপটি ফুটিত না; তখন গল্পের গতি যে কেমনতর রূপ ধারণ করিত, 'মালঞ্চ' উপন্যাসে কবি তাহা দেখাইয়াছেন। শর্মিলার প্রেমের অনন্ত ক্ষমা ও ধৈর্য ঊর্মি-শশাঙ্কর মিলন-সত্তাকে প্রজাপতির চকিত চঞ্চলতার মত হাল্কা ও সাময়িক করিয়া তুলিয়াছে,—জটিল করিয়া তুলে নাই। এইজন্য 'দুই বোনে'র গল্পাংশ অত্যন্ত সরল, চরিত্রগুলি দিনের আলোর মত স্পষ্ট। পরিবেশ রচনার মধ্যেও কোনো জটিলতা নাই। বসন্তের সংগীতমুখর একটি সন্ধ্যার উন্মত্ত উৎসবের মত শশাঙ্কর যৌবনোদ্বেজনা দপ্ করিয়া জ্বলিয়াছে, আবার স্বাভাবিক কারণেই খপ্ করিয়া গেছে নিভিয়া। শর্মিলার ঈর্ষার ইন্ধনে এই উদ্বেজনা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া লঙ্কাকাণ্ডই হয়তো বাধাইতে পারিত কিন্তু সর্বংসহা বসুন্ধরার মত কল্যাণী

শর্মিলা গোপনেই সমস্ত দুঃখভার বহন করিয়াছে—বহিয়া বহিয়া নিতান্ত পরোক্ষভাবেই শশাঙ্কর শ্রদ্ধা করিয়াছে আকর্ষণ, উন্মত্ত তাহার অসংযত প্রণয়াবেগকে সংযত ধীরতার আনন্দে আনিয়াছে টানিয়া।

সংসারজীবনে অহংমত্ততা আছে, স্বভাবের সহিত স্বভাবের আকর্ষণে চকিত চাপল্যের বিদ্যুৎ-বহ্নিও আছে জীবনে, কিন্তু প্রেমকেন্দ্রের প্রাণশক্তি যেখানে অচপল, সেখানে শিল্পের প্রয়োজনে তো বটেই, তত্ত্বের প্রয়োজনেও বিয়োগান্ত পরিণতি ঘটিতে পারে না। এইজন্য দুই বোনে শর্মিলার মৃত্যু নাই, শর্মির প্রতিদ্বন্দ্বিনী হইয়া শর্মিরই সংসারে বাস করিবার শক্তি নাই ঊর্মিলার। স্বাভাবিক ও মানসিক কারণেই ঊর্মিকে তাই ডাক্তারী পড়িতে বিদেশে যাইতে হয়, শশাঙ্ককে ফিরিতে হয় শর্মিলার স্নেহচ্ছায়ায়।

কিন্তু প্রেম যেখানে চপল হইয়াছে, উন্মত্ত হইয়াছে—আপনার উন্মত্ত ঈর্ষা আপনার মধ্যে ধরিয়া রাখিতে না পারিয়া বেগে বাহির হইয়াছে বহির্বিশ্বে—সেখানেই দুঃখ, ক্ষোভ; সেখানেই অপরিসীম হৃদয়যন্ত্রণা। 'মালঞ্চের' নীরজা-চরিত্র এই সত্যেরই শিল্পরূপ।

'মালঞ্চ' উপন্যাসখানি কিছু জটিল। প্রেমের তীক্ষ্ণতা ও রহস্য বিশ্লেষণে কবি আশ্চর্য নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন এই উপন্যাসে। বাঙলাদেশের একাধিক প্রবীণ সমালোচক অবশ্য এই উপন্যাসের উপর সুবিচার করেন নাই। অনেকে বলিয়াছেন, ইহার চরিত্র-বিশ্লেষণ খণ্ডিত, অসমাপ্ত।

'মালঞ্চ' উপন্যাসের বিচার আমরা একটু বিস্তৃতভাবেই করিব।

ঈর্ষা, সংশয়, সন্দেহ প্রভৃতি অহং-এর বিকারগুলি জীবনকে যখন ছাইয়া ফেলে, জীবনে তখন সুখ থাকে না, আনন্দ থাকে না। মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধকে যতক্ষণ সহজ আনন্দে সহজভাবেই গ্রহণ করি, ততক্ষণ সেই সম্বন্ধ জীবনের কোনো একটা বিশেষ আবেগ বা ভাবনাকে ঘোরতর ভাবে প্রবল করিয়া তুলিবার অবসর পায় না। কিন্তু যখনই বিশেষ কোনো একটা সংকীর্ণ হৃদয়াবেগের দৃষ্টিতে সেই সম্বন্ধকে ঘুরাইয়া বাঁকাইয়া দেখিতে শুরু করি, জীবনের সুখই যে কেবল চলিয়া যায় তাহা নহে, যাহার জন্য ব্যাকুল হইয়া হাহাকার করিতেছি, তাহাকেও দূরে ঠেলিয়া দেওয়া হয়। মালঞ্চ উপন্যাসে বাহ্যতঃ এই তত্ত্ব-সত্যই প্রকটিত হইয়াছে। নীরজা যতদিন সহজ বিশ্বাসে স্বামীর প্রেমকে গ্রহণ করিয়াছে, স্বামী আদিত্যও ততদিন তাহাকে লইয়া নূতন জগৎ করিয়াছে রচনা। ইহাদের মধ্যে ছিল একটি মেয়ে, নাম সরলা। আদিত্যের সহিত এই সরলার সম্বন্ধ তখনও জটিল হইয়া দেখা দেয় নাই। কিন্তু নীরজা রোগে

'মালঞ্চ'

শয্যাশায়িনী হইবার পর হইতে মনও তাহার হইল রুগ্ন, অসুস্থ। আদিত্য ও সরলার সম্বন্ধকে পূর্বের মত সহজ ভাবে আর গ্রহণ করিতে পারিল না। বেদনা আসিল ঘনাইয়া, ঈর্ষা আসিল অবারিত দুর্মদ প্রাবল্যে। সুখ গেল, স্বস্তি গেল স্বামী-সোহাগিনী নীরজার। ক্রমে সে এমনি মরীয়া হইয়া উঠিল যে, আদিত্যকে তাহার সন্দেহের কথা প্রকাশ না করিয়া পারিল না। আদিত্যের মধ্যে যে ভাব ও যে কামনা নিহিত ছিল অহং-এর অবচেতনায়, সন্দেহের খোঁচায় সে বাহির হইয়া আসিল প্রমত্ত পশুর মত। তখন আদিত্যের সহজ ভাব গেল দূরে; নীরজার সন্দেহ কতকাংশে সত্য বলিয়াই পৌরুষের আত্মাভিমানে, লাগিল আঘাত, বাড়িল জেদ। আদিত্যের মনের ভাবটা যেন এই, প্রেমজীবনের বহু যোজন দূরে সরলাকে একপাশে সরাইয়া রাখিয়া নীরজাকেই আদিত্য প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিয়াছে, তবু ঈর্ষা, তবু সন্দেহ? এ হেন সন্দেহ যেন অসহ্য, অন্ততঃ আদিত্য-জাতীয় পুরুষের পক্ষে অসহ্য। একদিকে নীরজার ধৈর্যহীন ঈর্ষা ও সংশয়, অন্যদিকে আদিত্যের অতল মনের অবচেতনায় সরলাসক্তির পুনরুন্মেষ—এই দুই জৈবতত্ত্ব একত্র মিলিয়া সুখের মালঞ্চে আনিল দুঃখের দাবদাহ। নীরজা গৃহে, এবং আদিত্য বাহিরে ঘোরতর অশান্তির আগুনে পুড়িতে লাগিল। নীরজার মনে হইল সরলাকে না তাড়াইলে শান্তি নাই, আদিত্যের মনে হইল, সরলাকে না পাইলে নাই শান্তি। সরলাকে আদিত্য তাই বলিয়াই ফেলিল, "অন্তরে অন্তরে বুঝেছি তুমি নইলে আমার জগৎ হবে ব্যর্থ।"

সরলা আদিত্যকে গভীর ভাবেই ভালোবাসিত। কিন্তু সেই ভালোবাসায় মাদকতা ছিল না। নীরজার সন্দেহে আদিত্যের অন্তরে মত্ততা জাগিল বটে, কিন্তু সরলা আত্মসংযম করিল। নীরজার সহিত আদিত্যের বিবাহের ঢের আগেই সরলাদিত্যের মিলন সংঘটিত হইয়াছিল, কিন্তু এই মিলন ভাইবোনের—সরলার ভাষায়, "দুই ভাই-এর" মিলনের মত ছিল বলিয়া উভয়ের মধ্যে বিবাহের কথা উত্থাপিত হয় নাই। আদিত্য তাই সহজভাবেই নীরজাকে বিবাহ করিয়াছিল, এবং সহজভাবেই সরলা তাহা বাহ্যতঃ স্বীকার করিয়া লইয়াছিল বলিয়া আদিত্যের বিবাহিত জীবনে কোনো দ্বন্দ্ব বা দুঃখ আসিতে পারে নাই। গৃহজীবনের সুখ-মালঞ্চে আনন্দভরেই কাল কাটাইতেছিল আদিত্য, কোনোদিন সে তলাইয়া বুঝিতেও চাহে নাই, কেন সরলা অন্য কোথাও কাহাকেও বিবাহ করিতে চাহে না। নীরজার ঈর্ষায় মর্মতঃ বিদ্রোহী হইয়া আদিত্য যখন সরলার নিকট আসিল, মাত্র তখনই সে সরলার অতলান্তিক মর্মবেদনার পরিচয় পাইল। সরলা কহিল, "তোমরা পুরুষ মানুষ দুঃখের সঙ্গে লড়াই করো, মেয়েরা যুগে যুগে দুঃখ কেবল সহ্যই করে। চোখের জল আর ধৈর্য—এছাড়া আর তো কিছু সম্বল নেই তাদের।"

কিন্তু তাই বলিয়া রোগগ্রস্তা নীরজার নিকট হইতে সরলা কি আদিত্যকে ছিনাইয়া লইল? দীর্ঘ তেইশ বৎসর ধরিয়া সে মর্মের গোপন দুঃখ সহজভাবেই যেমন সহ্য করিয়াছে আজও তেমন সহ্য করিল: আদিত্যের নিকট হইতে সে সরিতে চাহিল। নীরজার জীবনাবসানে আদিত্যের জীবনের শূন্যতা সরলার দ্বারা পূর্ণ হইবে এই ভরসায় সরলারই অনুরোধে, আদিত্য মুমূর্ষু নীরজাকে সেবাশুশ্রূষা করিতে ফিরিল।

এদিকে রমেনের স্নেহপূর্ণ তত্ত্বোপদেশে নীরজার মনের ঈর্ষার বেদনাভার কিছু হালকা হইল। রমেন বলিয়াছিল, "বৌদি একটা কথা বলি শোনো। যতক্ষণ মনে করবে তোমার ধন কেউ কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ বুকের পাঁজর জ্বলবে আগুনে। পাবে না শান্তি। কিন্তু স্থির হয়ে বসে বলো দেখি একবার 'দিলেম আমি। সকলের চেয়ে যা দুর্মূল্য তাই দিলেম তাঁকে যাঁকে সকলের চেয়ে ভালোবাসি'—সব ভার যাবে এক মুহূর্তে নেমে। মন ভরে উঠবে আনন্দে।"

আদিত্য ফিরিতে নীরজা আদিত্যের পায়ে মাথা রাখিয়া মাপ চাহিল। সরলাকে ডাকিয়া হাত ধরিয়া বিছানায় বসাইল। গহনার বাক্স হইতে একটি মুক্তার মালা বাহির করিয়া সরলাকে পরাইয়া দিল।

উপন্যাসখানি যদি এইখানেই শেষ হইত—তবে এখানিকে রবীন্দ্রদর্শনের একখানি ভাষ্যরূপে গ্রহণ করিতে অনেকেই হয়ত আপত্তি করিতেন না। কোনো কোনো পণ্ডিত তখন নীরজার চরিত্রে অভিনব এক আধুনিক 'রেবেকা' বা 'আয়েষা'কে দেখিয়া সম্ভবতঃ পুলকিত হইতেও পারিতেন। কিন্তু তাহাতে যে তত্ত্বের চাপে আর্টের মৃত্যু ঘটিত তাহা বলাই বাহুল্য। রবীন্দ্রনাথ তত্ত্ব করেন, বৃহত্তর জীবনের প্রেমদিব্য উদার আদর্শও প্রচার করেন, কিন্তু আর্টকে হত্যা করিয়া নহে। শিল্পের স্বাভাবিকত্ব রবীন্দ্রনাথ কখনই বর্জন করেন না। উপন্যাসখানি তাই হঠাৎ শেষ হইতে পারে না। দেখা গেল, সরলা নীরজার দেওয়া মুক্তার হার গ্রহণ করিল না। 'অযোগ্য আমি দিদি, কেন আমাকে লজ্জা দিচ্ছ' বলিয়া সে হার ফিরাইয়া দিল। কহিল "ভাগ্য যে দান থেকে আমাকে বঞ্চনা করেছে, কাউকে বঞ্চনা করে সে আমি নেব না।"

ইহার পর সরলা স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়া জেলে গিয়া যেন মুক্তি পাইল। স্বামীকে একান্ত কাছে পাইয়া প্রগল্‌ভ হইয়া উঠিল নীরজা। সুখ-দুঃখের আশা-আনন্দের কত কথা তাহার মুখে আসিল। সরলাকে সে এইবার "আপন বোনের মত" বুকে টানিয়া লইবে এমন কথাও সে অপার আনন্দে প্রকাশ করিয়া গেল, কিন্তু যখনই খবর আসিল সরলা জেল হইতে মুক্তি পাইয়াছে, তখনি চকিতেই তাহার সকল আনন্দ গেল বিষাইয়া। "তাহলে তো আর দেরী নেই। আজই আসবে। নিশ্চয়ই ওকে আনবে আমার কাছে।" বলিতে বলিতে মূর্ছা গেল নীরজা। কিন্তু সংজ্ঞা

ফিরিতে সে মনে মনে আবার দৃঢ় হইবার চেষ্টা করিল। ভাবিল, মৃত্যুকালে ত্যাগ দেখাইয়া, মহত্ত্ব দেখাইয়া, ক্ষমা প্রকাশ করিয়া সে চলিয়া যাইবে। রমেনের তত্ত্বোপদেশ তাহার বুদ্ধি-জীবনকে খানিকটা যেন প্রশান্ত করিল। সে কহিল, "ঠাকুর-পো, কথা রাখব, কৃপণের মতো মরব না।" কিন্তু সরলা যেই তাহার কাছে আসিল, কোথায় ভাসিয়া গেল রমেনের তত্ত্বোপদেশ, কোথায় উড়িয়া গেল তাহার নিজের প্রতিশ্রুতি। অস্থির হইয়া বলিয়া উঠিল—"পারলুম না, পারলুম না, দিতে পারব না, পারব না। জায়গা হবে না তোর রাক্ষুসী, জায়গা হবে না। আমি থাকব, থাকব, থাকব।"

ইহার পর আর দুটি মাত্র ছোট ছোট প্যারাগ্রাফ লিখিয়া উপন্যাসখানি শেষ করিয়াছেন কবি। মনস্তত্ত্বের দিক হইতে, স্বাভাবিকতার দিক হইতে এই সমাপ্তি অনেকেরই মনঃপূত হয় নাই। ড. বন্দ্যোপাধ্যায় "কলাকৌশলের দিক দিয়া এই পরিচ্ছেদটিকে একটা ত্রুটি বলিয়া বিবেচনা" করিয়াছেন। [উপন্যাসের ধারা, পৃ. ১৭৮] সে বিষয়ে পরে বিশদভাবেই আলোচনা করিব, বর্তমানে আলোচ্য এই যে, নীরজার ত্যাগ-গত তত্ত্বজীবনের সম্যক্ পরাভবের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রেমদর্শনের তত্ত্ব কোথায় আছে ?

সেই কথাই আলোচনা করিতেছি।

একাধিকবার বলিয়াছি, কোনোরূপ তত্ত্বোপদেশ দেওয়া রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য নহে, উদ্দেশ্যও নহে, তথাপি তাহাতে তত্ত্ব থাকে—জীবন-তত্ত্ব, রবীন্দ্রকল্পিত প্রেমজীবনের আনন্দ-তত্ত্ব। মালঞ্চ উপন্যাসে সহজ জীবনযাপনের তত্ত্বকথা আছে—রমেনের মুখ দিয়া তাহা বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু তত্ত্বের চাপে গল্পাংশকে কোনোস্থলে যে নিষ্পিষ্ট করা হয় নাই পূর্বেই তাহা বলিয়াছি। গল্পের শেষটি যে একজন অনুপম ও অনন্যসাধারণ আর্টিষ্টের রচনা—একবার পড়িলেই তা' বুঝা যায়, কিন্তু ইহার তলে তলে রবীন্দ্র-প্রেমতত্ত্বের সত্য ও সংকল্প যে ফল্গুধারার ন্যায় প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, একটু ধীরভাবে লক্ষ্য করিলেই তা' দেখা সম্ভব হইবে।

সরলা মনে মনে আদিত্যকে ভলোবাসিয়াছে—কিন্তু আপন করিয়া পায় নাই। কিন্তু না পাওয়াকেই জীবনের সহিত খাপ খাওয়াইয়া সহজ ভাবেই ছিল সরলা। মালঞ্চে তাই ফুল ফুটিত বিস্তর। নীরজার প্রতি আদিত্যের ভালবাসা ছিল অক্ষুণ্ণ। কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না, ছিল না সংশয়। কিন্তু কোথা হইতে আসিল ঈর্ষা, ঈর্ষা আনিল অশান্তি, অশান্তি আনিল অসংযম, অসংযম জ্বালিল বিদ্রোহিতার বহ্নি—মালঞ্চ লাগিল শুখাইতে। মধ্যে রমেন আসিয়া তত্ত্বকথা কহিল। কিন্তু সহজ তো সহজ নহে। সরলার স্বভাবে ও অবস্থায় ইহা সহজ হইয়াছিল—তাই সে আদিত্যকে হারাইয়া অর্থাৎ নীরজার হাতে তুলিয়া দিয়াও, ছিল আনন্দে। কিন্তু নীরজার পক্ষে ইহা তত্ত্ব মাত্র, ইহা জীবন নহে।

বক্তব্য এই, যে জীবনে এই সহজ নাই, সেই জীবনেই এই ক্ষোভ, এই সংশয়, এই অশান্তি, এই নৈরাশ্য।

রবীন্দ্রনাথ এই ক্ষোভ, সংশয়, অশান্তি বা নৈরাশ্যকে কখনই অস্বীকার করেন নাই—ইহা হইতে উত্তীর্ণ হইতেই বলিয়াছেন। মানুষ যেখানে সহজভাবে ইহা উত্তীর্ণ হইয়াছে সেখানে সে প্রসন্ন জীবন লাভ করিয়াছে, যেখানে উত্তীর্ণ হয় নাই, সেখানে সে আসক্তির অন্ধতায় কেবলি হাতড়াইয়া ফিরিয়াছে। এই তত্ত্ব-সত্যটুকু প্রেমেরি সত্য। রবীন্দ্রনাথের গল্প ও উপন্যাসে এই সত্যই সর্বত্র মর্যাদা পাইয়াছে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে আদিত্য, তো কোনো উচ্চ জীবনের পরিচয় দিল না—তাহা হইতে প্রেমজীবনের কী তত্ত্বই বা প্রকটিত হইয়াছে? বিবাহিতা স্ত্রী জীবিতা থাকা সত্ত্বেও সে যে অন্য এক অবিবাহিতা রমণীর নিকট আত্মসমর্পণ করিল, ইহাই কি রবীন্দ্রকল্পিত প্রেমের লক্ষ্য? আদিত্যের মধ্যে এতটুকু "ধর্মবুদ্ধি" জাগিল না, ইহাই বা কোন্ আদর্শের ইঙ্গিত দিতেছে? রবীন্দ্রতত্ত্বের দিক দিয়া ইহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতেছি।

নীরজাকে বিবাহ করিয়াছিল আদিত্য কিন্তু তাহার অবচেতনায় ছিল সরলার প্রেম। নীরজার রূপ ছিল, গুণ ছিল, স্বামীর মনোমত কাজও সে করিতে পারিত, এইজন্য আদিত্য বিবাহিত জীবনে বাহ্যতঃ একনিষ্ঠ প্রেমিকের মতই সুখী ছিল। তাহার সুখী থাকার আরও একটি কারণ ছিল। সরলা নীরজাকে কোনোদিন ঈর্ষা করে নাই—মনের দুঃখ মনেই চাপিয়া রাখিয়াছিল—এইজন্য আদিত্যের পক্ষে বিবাহিত জীবনের সুখ ব্যাহত হইতে পারে নাই। অপরপক্ষে সরলার প্রতি আদিত্যের অবচেতন প্রেম সরলার অনসূয়া হৃদয়বৃত্তির সৌন্দর্যে ও মাধুর্যে মুগ্ধ হইয়া হৃদয়-গহনে স্তব্ধীভূত ছিল। তখন, বলাই বাহুল্য, প্রেম ছিল সৌহার্দ্যের এক নিশ্চিন্ত সরলাবগের অন্তরালে স্তিমিত হইয়া।

নীরজার রূপসৌন্দর্য ও প্রেমমাধুর্য এবং সরলার ঈর্ষাবিহীন সরলস্বভাবের বাহ্য প্রশান্তি ও প্রসন্নতা—আদিত্যের জীবনে একটানা সুখপ্রবাহনের পক্ষে বিশেষ সহায়ক ছিল—বহির্জগতের পরিবেশের সহিত অন্তর্জগতের আশা আকাঙ্ক্ষার বেশ সামঞ্জস্য ছিল বলিয়াই মালঞ্চে, তথা মনোমালঞ্চে, ফুল ফুটিত, গন্ধ বহিত। বেচারা আদিত্য এটা বোধহয় তলাইয়া বুঝিত না। নীরজার প্রতি তাহার ভালোবাসা যে কত ভঙ্গুর ও অকিঞ্চিৎকর সরলার উপর নীরজার ঈর্ষার খোঁচাতেই তাহা মুহূর্তেই জানিত হইয়া গেল। তখন সুখ গেল, স্বস্তি গেল—হৃদয়ের অতলে তলাইয়া থাকা গোপন সরলাসক্তিটা মাথা নাড়া দিয়া সাড়া দিয়া উঠিল। তখন নীরজারই শুধু কপাল ভাঙিল না, সরলার সংযম ও শান্তিরও অন্তরায় ঘটিল।

সমালোচকগণ আদিত্যের এই মানসিক পরিবর্তনটি আকস্মিক বলিয়া মনে করিয়া

মালঞ্চ উপন্যাসের দোষ ধরিয়াছেন। কেহ কেহ আদিত্যের মধ্যে "বিবেক বুদ্ধিহীন" কামুককে জাগিতে দেখিয়া রুষ্ট হইয়াছেন—তাহার মধ্যে "ধর্মবুদ্ধির কোন সংঘর্ষ" না দেখিয়া পীড়া অনুভব করিয়াছেন। [ডঃ সুবোধচন্দ্রের 'রবীন্দ্রনাথ' দ্রষ্টব্য। পৃ. ৩৩৬] কিন্তু কেহই একবার তলাইয়া দেখিতে চাহেন নাই যে, দ্বিচারী আদিত্যের মর্মোদ্ঘাটনের মাধ্যমে নিখিল মানবসাধারণের চিত্তবিপর্যয়ের রহস্যচিত্র কত সূক্ষ্মভাবেই না কবিগুরু অঙ্কন করিয়াছেন। মনে রাখিতে হইবে যে, সরলার আদিত্যপ্রেম প্রেমই বটে, কেননা দুঃখ সহিয়াও ইহা আনন্দকে জানে; কিন্তু আদিত্যের নীরজাপ্রেম প্রেমই নহে, ইহা সুখাশ্রয়ী মোহবিলাস, মালঞ্চবিলাস মাত্র; এবং সকলের চেয়ে বড় দুঃখ এই, বেচারা জানে না, যে ইহা প্রেম নহে। তাহার অহংকার এই, নীরজাকে সত্যকার প্রেমই সে দিয়াছে। সত্যকার প্রেম হইলে, বলাই বোধহয় বাহুল্য, ঈর্ষার বা সংশয়ের খোঁচায় সে এমনিতর উন্মত্ত হইয়া উঠিত না, সংযত হইত; সুখ তাহার হয়ত যাইত, কিন্তু আনন্দ যাইত না। অপর পক্ষে আদিত্যের সরলাপ্রেমও প্রেম নহে; তা যদি হইত, নীরজার রূপে ও প্রেমে সে কখনই সুখ পাইত না; আর যদিই বা পাইয়া ভুলই করিত, পুনর্বার সরলার দ্বারে ভিক্ষুকের মত আগত হইয়া তপস্যারত তাহার দুঃখী প্রেমকে নাড়া দিতে চাহিত না। আদিত্যের প্রেম শুদ্ধমাত্র আত্মপ্রেম, আত্মসুখাশ্রয়ী মোহতৃপ্তির স্বাচ্ছন্দ্যবিলাস যাহার অপর নাম। এই স্বাচ্ছন্দ্যবিলাস, এই আত্মপ্রেম সুবিধামত সুখ ও সুখের পরিবেশ পাইলে প্রেমের মত সুন্দর ও উদার বলিয়া প্রতীয়মান হয় মাত্র। আদিত্যকে যে নীরজা-প্রেমে প্রেমিক বলিয়া বোধ হইতেছিল—সুখের পরিবেশের মধ্যে নির্দ্বন্দ্ব জীবনটুকু যাপন করিয়া সে শান্ত ছিল বলিয়াই তা মনে হইতেছিল। কিন্তু তাহা যে কত মিথ্যা তাহা তাহার সরলাসক্তির অভ্যুদয়েই বুঝা সম্ভব। ইহাকে অনেকে যতটা আকস্মিক মনে করিয়াছেন, ততটা আকস্মিক ইহা নহে। রবীন্দ্রনাথ আভাসে ইঙ্গিতে এই জটিল বিষয়টি বুঝাইবার চেষ্টা যে করেন নাই, এমন নহে। একথা সত্য, চূড়ান্ত বিশ্লেষণের দ্বারা কবি এই জটিল বিষয়টি বুঝান নাই। এই কারণে আপাতঃদৃষ্টিতে ইহার বিশ্লেষণ অনেকাংশে খণ্ডিত ও অসমাপ্ত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু নিপুণ শিল্পী কাঠামোটা এমনভাবে সাজাইয়াছেন—ছোট ছোট বর্ণনা, ছোট ছোট ইতিকথা, ছোট ছোট কথোপকথনের মধ্যে এমন সব সূক্ষ্ম হৃদয়াবেগের ছাপ রাখিয়া দিয়াছেন—যে, তাহাতেই আদিত্যের মানসপরিবর্তনের রহস্যটি সহৃদয় পাঠকহৃদয়ে সহজবোধ্য ও সরল হইয়া যায়।

মানুষের সত্যকার প্রেম কোথায়, মানুষ তাহা সহজে বুঝে না। আঘাতে, সংঘাতে নানাভাবে ঠেকিয়া তবে প্রেম পরীক্ষিত হয়। সুখময় পরিবেশে সরল স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে প্রেমচর্চা বা প্রেমবিলাসের মধ্যে প্রেমিক যদি নিজেকে সত্যকার প্রেমসাধক মনে করে, তবে সে ভ্রান্ত। আদিত্য এমনিতর একটি ভ্রান্ত জীব। "রবীন্দ্রনাথ আদিত্যকে

একান্তভাবে বিবেকবুদ্ধিহীন কামুক করিয়াই সৃষ্টি করেন নাই"—এ কথা সত্য, কিন্তু মালঞ্চ-বিলাসী পরমসুখী আদিত্যের মর্মদেশে দ্বিচারিত্বের যে মোহাবেশ গোপন রাখিয়াছেন, তাহার তাৎপর্যটুকু ধরিতে পারিলেই আদিত্য-চরিত্রের শিল্প-সত্যটি স্পষ্ট হয়, সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রকল্পিত প্রেমতত্ত্বের বিষয়টুকুও হৃদয়ঙ্গম হয়। অহংমত্ত প্রেম অর্থাৎ আত্মসুখী ভোগী প্রেমের সুখভোগনাশের জন্য যে হাহাকার, তাহার মর্মকথা না বুঝার দরুণ আদিত্যের মানস পরিবর্তনটির শিল্পরসটুকু অনেকেই উপভোগ করিতে পারেন নাই। ড. সুবোধচন্দ্র তো আদিত্যের এই পরিবর্তনের জন্য রুষ্ট হইয়া স্বয়ং কবিকেই দায়ী করিয়া বসিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন : "আদিত্য রুগ্না স্ত্রীর সেবা করিতে প্রস্তুত হইয়াছে এই সর্তে যে তাহার মৃত্যুর পর সরলা সেই স্ত্রীর আসন গ্রহণ করিবে; এইরূপ প্রস্তাব ও সংকল্প বীভৎস। আদিত্যের অপরাধের জন্য কবির দায়িত্ব কতটুকু—ইহা বিচার্য। রবীন্দ্রনাথ আদিত্যকে একান্তভাবে বিবেকবুদ্ধিহীন কামুক করিয়া সৃষ্টি করেন নাই, কাজেই তাহার মনে এইরূপ চিন্তার উদ্রেক অতিশয় কুৎসিত হইয়াছে।" [রবীন্দ্রনাথ পৃ. ৩৩৬]। কুৎসিত হইয়াছে বলিতে ড. সুবোধবাবু সম্ভবতঃ শিল্পবিচারে অস্বভাবিক হইয়াছে—এই কথাই বলিতে চাহিয়াছেন। প্রেমতত্ত্বের দিক দিয়া আদিত্য-চরিত্র যেভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছি সেভাবে দেখিলেই বুঝা যাইবে আদিত্যের এইরূপ চিন্তা সমাজদৃষ্টিতে 'কুৎসিত' হইতে পারে, কিন্তু শিল্পদৃষ্টিতে অস্বাভাবিক হয় নাই। আদিত্যের অপরাধের জন্য কবির দায়িত্ব কতটুকু—মালঞ্চের রসিক পাঠকবর্গের ইহা বিচার্য নহে, সুখাসক্ত ভোগী মানুষের আত্মরত জটিল প্রেমের দায়িত্ব কতটকু তাহাই বিচার্য।

মালঞ্চ সম্পর্কে আর একটি বিষয় আলোচনা করিয়া বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করিব। রমেনের তত্ত্ব-শিক্ষায় নীরজা ভাবিতে ছিল, কৃপণের মত সে মরিবে না। হৃদয়ের ঔদার্য দেখাইয়া, ত্যাগ দেখাইয়া, ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া সে ইহজীবন হইতে বিদায় লইবে। কিন্তু লেখক দেখাইয়াছেন নীরজা তাহা পারিল না, বরং সরলাকে দেখিবামাত্র সে রুষিয়া ফুঁসিয়া উঠিল। তারপর 'থাকব, থাকব, থাকব,' বলিয়া উঠিল চেঁচাইয়া।

স্বভাব ও আদর্শের দ্বন্দ্ব-সংগ্রামে নীরজার চরিত্রে স্বভাবই জয়লাভ করিয়াছে শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত। ত্যাগ দেখাইয়া মরিতে পারিলে নীরজা চরিত্রে উচ্চতর প্রেমের সহজ সত্যটি ফুটিত সন্দেহ নাই। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, সহজ প্রেম শুধু কথার কথা নহে। নীরজার জীবনে ত্যাগময় সহজপ্রেম আদর্শ মাত্র, স্বভাবে তাহা সহজ হইবার অনুকূল পরিবেশ কখনও পায় নাই। স্বামীকে সে প্রাণ ভরিয়া ভালোবাসিয়াছে, স্বামীর ভালোবাসা পাইয়া এককালে সুতৃপ্তই হইয়াছে, আজ যখন সেই ভালোবাসা হারাইতে বসিয়াছে, যখন ঈর্ষাকাতর মন লইয়া দুঃসহ জীবনের অন্তহীন যন্ত্রণায় কালাতিপাত করিতেছে, তখন হঠাৎ সহজের তত্ত্বশিক্ষায় সে স্বভাব বদলাইয়া ফেলিবে, ইহা তত্ত্বগত সত্য নহে, শিল্পগত

সত্যও নহে। নীরজার মধ্যে যে সহজ হইবার প্রচেষ্টা দেখা গিয়াছে তাহাই তাহার দ্বন্দ্বাকুল হৃদয়যন্ত্রণার নিদর্শন। স্বামীকে সে যে ত্যাগ করিতে পারিল না ইহাই স্বাভাবিক, শিল্পবিচারে ইহাই সত্য, সঙ্গত এবং সুন্দর। এই না-পারার জীর্ণ পত্রের এক পৃষ্ঠায় যেমন ঈর্ষাকাতর হৃদয়ের দুঃসহ যন্ত্রণা প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, অপরপৃষ্ঠায় তেমনি একনিষ্ঠ স্বামিপ্রেমের অশ্রুসজল কারুণ্যাতিশয্যও প্রতিফলিত হইয়াছে। 'থাকব, থাকব, থাকব' বলিয়া অসহায়ভাবে যে ক্রন্দনোচ্ছ্বাস সে প্রকাশ করিয়াছে তাহার মধ্যে এই শিল্প-ব্যঞ্জনাটুকু গ্রহণ না করিলে মালঞ্চ পাঠ সার্থক হইতে পারে না।

ঈর্ষার জন্য নীরজা দারুণ শাস্তিই পাইয়া গেল। ক্ষমা করিতে পারিল না বলিয়া বোধহয় কৃপণের মতই তাহাকে ফিরিতে হইল। ঈর্ষা, ক্ষোভ ও সংশয়ের জন্য সে তো যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত করিল কিন্তু অকৃত্রিম স্বামিপ্রেমের জন্য সে যে নিদারুণ আত্মোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিল, আদিত্যজীবনে তাহা কি কোনো প্রতিক্রিয়া তুলিবে না? 'থাকব' বলিয়া নীরজা অবশ্য থাকিতে পারিল না, কিন্তু এই বলার মধ্য দিয়া যে ব্যাকুল প্রেমের যৌবনোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়া গেল, তাহা কি আদিত্যজীবনে সত্যসত্যই অসার্থক হইবে?

এ সকল প্রশ্নের উত্তর লেখক দেন নাই—শিল্পের দিক দিয়ে দেওয়াও সমীচীন নহে। কিন্তু সহৃদয় পাঠকের অন্তরে সহজভাবেই এসকল প্রশ্ন জাগরিত হইতে থাকে। মহৎ লেখকের উদ্দেশ্য শুধু কথা বলা নহে, পাঠককে দিয়া কথা বলানোও বটে। মালঞ্চের শেষ অধ্যায়ে যে শিল্পরস ও তত্ত্বরস আছে—পাঠককেই তাহা বিশ্লেষণ করিয়া লইতে হইবে। যিনি না লইবেন, মালঞ্চের সৌন্দর্য তাঁহার নিকট সম্পূর্ণভাবে উদ্‌ঘাটিত হইবে বলিয়া মনে করি না।

নীরজার মৃত্যুর পর আদিত্য সরলাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিবে, এইরূপ কথা ছিল। নীরজা চলিয়া যাইবার পর সরলাকে আদিত্য পাইয়াছে বা পাইতে পারিয়াছে কি না একবার ভাবিয়া দেখুন। যদি মনে করেন নীরজার মৃত্যুতে কি আদিত্য, কি সরলা—কাহারও মনে এতটুকু বেদনার প্রতিক্রিয়া জাগে নাই, তবে নিশ্চয়ই কল্পনা করিতে পারেন যে, আদিত্য সরলাকে পাইয়া সুখপ্রেমের মধুর মাদকতায় মাতিয়াছে। কিন্তু সরলা কি সেই জাতীয়া মেয়ে? উপরন্তু নীরজার ব্যাকুল ব্যথিত কান্নায় তাহার হৃদয়মধ্যে ত্যাগময় কোনো ভাবান্তর ঘটা কি এতই অসম্ভব? সরলাকে দেখিয়া কি সত্যসত্যই মনে হয় যে, নীরজার মৃত্যুর সুযোগ লইয়া এইবার সে আদিত্যের অঙ্কশায়িনী হইবে? যদি কল্পনা করেন যে, তাই সে হইয়াছে, অর্থাৎ সে আদিত্যের রূপ ও প্রেমসুখলুব্ধতায় ইন্ধন জুগাইতেই আসিয়াছে, তবে হয়ত আদিত্যজীবনে কোনোরূপ রূপান্তর ঘটা সম্ভব হইবে না। কিন্তু যদি এই-ই হয় যে, নীরজার মর্মভেদী কান্নায় অসহায় যে প্রেমের পরিবেশ রচিত হইয়া গিয়াছে তাহাতে স্বভাব-তপস্বিনী সরলার মনোজীবনে নূতনতর ভাবান্তর ঘটিয়াছে, রাত্রের দুঃস্বপ্নে সে নীরজাকে দেখিতেছে, স্বভাবকাতর হৃদয়ে ক্রন্দন করিতেছে

নিভৃতে, মালঞ্চের কুঞ্জে কুঞ্জে, তরুচ্ছায়ায় এবং পল্লবমর্মরে শ্রবণ করিতেছে 'থাকব' ধ্বনি, তবে এমনও হইতে পারে, আদিত্য সরলার মিলন সম্ভব হইবে না। আর সরলাকে আদিত্য যদি না পায়, তবে নিশ্চয়ই জানিবেন—আদিত্য-মর্মে নীরজাই ক্রমশঃ বেদনার মধ্যে আসন পাতিবে। যতদিন যাইবে, বিরহের দুঃখানলে জ্বলিতে জ্বলিতে আদিত্য চলিবে সুখপ্রেমের মোহ হইতে আনন্দপ্রেমের উদাসীন সাত্ত্বিকতায়, সেখানে সরলা যদিই বা থাকে তবে তাহার রূপ হইবে ভিন্ন, ধ্যান ভিন্ন, ব্যক্তিত্ব ভিন্ন, সম্বন্ধও সহজ আনন্দাবেগে মধুর হইলেও তাহার চরিত্র হইবে ভিন্ন। তখন মালঞ্চে অবশ্যই আবার ফুল ফুটিবে। সেই ফুল আদিত্য আনিবে স্মৃতিপূজায়; বোধকরি সরলাও অশ্রুতে সেই ফুল বিধৌত করিয়া আদিত্যের হাতে দিবে তুলিয়া, মনে মনে কহিবে, 'দিদি, থাকবে বলেছিলে, যেন রাখতে পারি।'

বানাইয়া এত সব লিখিলাম। আধুনিক সমালোচকগণ ক্ষুব্ধ হইবেন। নীরজার মৃত্যুর পর আদিত্য কি করিল, সরলা কি করিল, লেখক কিছুই বলেন নাই বলিয়া এতকথা বলিবার সুযোগ হইল। এ সব কথা নিছক মনগড়া বলিয়া আপনি যদি রুষ্ট হইয়া ভাবিতে থাকেন আদিত্যের মত মানুষ সরলার প্রেমমোহেই মত্ত রহিবে—প্রেমের দুঃখ-তপস্যায় কখনও অগ্রসর হইবে না, তা হইলে আপনার এই মনগড়া গল্পকথাকেই না হয় আমি মানিয়া লইব। বলিব, আদিত্য তাহা হইলে সুখমোহেই মত্ত রহিল; অহংদীপ্ত সুখপ্রেমের বন্ধন হইতে মুক্ত হইল না। সরলা বেচারাও এই বন্ধনে রহিল বন্দিনী।

মহান লেখক গল্পটি এমনস্থানে আনিয়া শেষ করিয়াছেন, যেস্থান হইতে বহির্গত হইয়াছে দুইটি পথ: এক আত্মসুখের বন্ধনের পথ, অপর আত্মানন্দের মুক্তির পথ। কোন্ পথে আদিত্য গেল বা যাইতে পারে,—এই লইয়াই প্রশ্ন। আমি না হয় নাই বলিলাম, কোন্ পথে গেল আদিত্য। আপনিই বলুন, যা বলিবেন, মানিয়া লইব। যদি বলেন, সে অহং এর পথে গেছে,—বলিব, বেশ বলিয়াছেন, বস্তুজীবনে ইহাই সত্য। নীরজার ঈর্ষাই তা হইলে বস্তুজীবনের বন্ধনের ফাঁদে আদিত্যকে চিরকাল বদ্ধ করিয়া গেল। আবার যদি বলেন, আত্মার পথেও সে গিয়া থাকিতে পারে,—বলিব অসম্ভব নহে। যে সরলার জন্য আদিত্য এত পাগল হইয়াছে, সেই সরলা নীরজার 'থাকব' ধ্বনির বেদনায় নবভাবে জাগ্রত হইয়া আদিত্য হইতে যদি সরিতে চাহিয়া থাকে, তবে এই একটি আঘাতেই আদিত্য উঠিবে জাগিয়া। তখন সে প্রেমজীবনের বৈরাগ্যে উন্নীতও হইতে পারে।

এতকথা বলিতে হইতেছে, কেননা মালঞ্চের লেখক এতকথাই আমাদের বলাইয়াছেন। নীরজা যদি স্পষ্টতঃ ত্যাগ দেখাইয়া মরিত, তা হইলে এতকথা বলার অবশ্য সুযোগ

হইত না। তখন নীরজাকে দেবী বলিয়া পূজা করিতে করিতে আদিত্য সরলাকে বুকে ধরিত, সরলাও কাঁদিতে কাঁদিতে নীরজাকে স্মরণ করিত, আদিত্যকে বরণ করিত। কিন্তু নীরজার এই ত্যাগ শিল্পোচিত হইত না। স্বভাবোচিত হইত না। রবীন্দ্ররচনায় আগে শিল্প, পরে শিল্প-সৌন্দর্যের অন্তরে তত্ত্বরস। স্বভাবকে স্বভাবের দ্বারা উত্তীর্ণ হওয়ার তত্ত্ব-ও রবীন্দ্রনাথের প্রেমতত্ত্ব। নীরজা তাহার স্বভাবের দ্বারা যন্ত্রণা সহিয়াছে, কিন্তু স্বভাবের মধ্য দিয়া উত্তীর্ণ হইতেও কি পারিয়াছে?

চট্ করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যাইবেন না। কেননা, এ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর মিলিবে আদিত্য-সরলার পরবর্তী জীবনের গতিরূপ নিরূপণ করিয়া।

মালঞ্চ উপন্যাসের তাই প্রশ্ন এই : আদিত্য সরলাকে লইয়া 'মৃত্যুর গুপ্ত প্রেমে' আছে, না অমৃতের আনন্দ সন্ধানে চলিয়াছে? নীরজার আবেগবিহ্বল 'থাকব'-ক্রন্দনের কারুণ্যে আন্দোলিত হইয়া সহৃদয় পাঠক আদিত্যকে আজ কোথায় ঠিক লইয়া যাইতে চান? সরলার প্রীতিপাশে, না নীরজার স্মৃতিমন্দিরে? মোহের সুখে, না দুঃখের প্রেমে?

স্বভাবকে আদর্শ পালনের দ্বারা নহে, স্বভাবকে স্বভাবের দ্বারাই নীরজা উত্তীর্ণ হইয়াছে কিনা—পাঠককে ধীরভাবে একবার ভাবিয়া দেখিতে হইবে। এই ভাবনার উপরই একদিকে যেমন নীরজার মৃত্যুর শিল্পমাধুর্যের সৌন্দর্য প্রকাশ পাইতেছে, অপরদিকে তেমনি উপযুক্ত তত্ত্বগত প্রশ্নাবলীর সদুত্তরও নির্ভর করিতেছে।

উপসংহার

উপসংহার

'রবীন্দ্রনাথের মনোদর্শন' সমাপ্ত হইল। রবীন্দ্রমানসের গতি, প্রকৃতি ও পরিণতির তত্ত্বদর্শন যথাসাধ্য স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করা হইল।

বলাই বাহুল্য, ইহা নিছক কাব্যালোচনা নহে, আবার যেন কাব্যালোচনাও বটে। ইহা যথার্থ ভাবে দর্শনতত্ত্বালোচনা নহে, আবার নহে যে, তাহাও বোধ করি জোর করিয়া কেহ বলিতেছেন না। কাব্য ও দর্শনের মধ্যবর্তী, সীমা ও অসীমের মধ্যবর্তী মনোজীবনের ইহা যেন নূতনতর একটি বোধবিজ্ঞান।

সুধিগণ অবশ্যই লক্ষ্য করিলেন, রবীন্দ্রনাথ কালিদাস বা কীট্‌সের মত নিরঞ্জন কাব্য-সৌন্দর্যেরই উপাসক নহেন, আবার শংকরাচার্য বা ব্র্যাড্‌লের মত নির্বিশেষ দর্শনতত্ত্বের ন্যায়ানুমোদিত জ্ঞানানুলোচনারও অভীপ্সু নহেন। তাঁহার কাব্যে আছে 'দেবযান গতির' অবারিত আনন্দ, তাঁহার দর্শনে আছে মানব-মনোবিকাশের কাব্যময় তত্ত্বোপদেশ। কাব্যে তিনি বহুবিধ বিশেষের মধ্য দিয়া অশেষের পথে ছুটিয়াছেন, দর্শনে তিনি নির্বিশেষ অশেষ হইতে বিশেষে অবতরণ করিয়া বিশেষকেই অশেষকল্প করিতে চাহিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই বিশেষটি হইতেছে 'মন'। এই মন ছোটে, ছোটে, কেবলি ছোটে, কিন্তু নিজের সীমা পার হইয়া মুহূর্তকাল থামিতে চাহে না। পারে যেন প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া আছেন দার্শনিক, চঞ্চল মনকে তিনি ছুটিতে দেন আপনার সীমার মধ্যেই, পারে দাঁড়াইয়া বিচিত্র মনের সমগ্রতার রূপৈশ্বর্য দর্শন করেন শুদ্ধ আনন্দে, কিন্তু পারটিকে ভাঙিয়া ফেলার অর্থাৎ সীমাকে নিশ্চিহ্ন করার কথায় দেন না মন। এইজন্য মন তাঁহার বিচিত্রের রূপমোহে একদিকে যেমন কাব্য করিতে পায়, অপরদিকে তেমনি সর্ববিধ গতি ও চাঞ্চল্যের অখণ্ড রূপটি দৃষ্টিগোচর হওয়ায় একের ইঙ্গিতও দর্শন করিতে থাকে। এ-হেন মনঃসাধনার তত্ত্ব-কথায় শুদ্ধমাত্র কাব্যের আলোচনা নহে, শুদ্ধমাত্র দর্শনের বিশুদ্ধ আলোচনাও নহে, পরন্তু কাব্যদর্শনের অখণ্ড তাৎপর্য-সন্ধানে সর্বগত জীবন-আলোচনাই যুক্তিযুক্ত।

মনের বিনাশ নহে, মনের পূর্ণবিকাশই রবীন্দ্রনাথের মুক্তি। প্রকাশই মুক্তি। মনো-বিনাশের যে সাধনতত্ত্ব, তাহা রবীন্দ্রনাথের নহে। তাই বলিয়া তিনি দার্শনিক নহেন, এ-কথার কোনোই অর্থ নাই। শাস্ত্র যাঁহারা জানেন, তাঁহারা অবশ্যই মনোমহিমার জয়গান গাহেন। ভারতীয় দর্শনে মনোবিনাশের তত্ত্ব যেমন আছে, মনোবিকাশের তত্ত্বও তেমনি

যথেষ্ট পরিমাণে আছে। সৃষ্টির আত্মাই তো 'মন'। ইহার 'দর্শন' মননসহকারে গ্রহণ করিতেই হয়। শাস্ত্র বলেন—মন-ই হইতেছে সকল প্রকার সৃষ্টির আদি উৎস। আদি কবির মন হইতে এই বিচিত্র বিশ্বের অভ্যুদয়—'রূপরসগন্ধস্পর্শবর্তী' পৃথিবীর আবির্ভাব। সৃষ্টির উপাদানস্বরূপ পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব বিশ্ববিধাতারই মনোবিভূতি। মনুগণ তাঁহারই 'মানসা জাতাঃ' (গীতা, ১০।৬)। বেদ, বেদান্ত উপনিষদে, গীতা ও পুরাণাদিতে মনের মাহাত্ম্য তাই নানাভাবে কীর্তিত হইয়াছে। সংকল্প বৃক্ষের ভূতাত্মক বীজ হইতেছে মন, 'মনো ভবতি ভূতাত্মবীজং সংকল্পশাখিনঃ' (যোগবাশিষ্ঠঃ, প্রঃ ৪১)। বিরাট পুরুষের আছে মন, শাস্ত্রে তাহাকে অভিহিত করা হইয়াছে 'সোম' বলিয়া। এই সোম দশাশ্ব, দশটি তাঁহার অশ্ব। সোম অর্থাৎ মন আবির্ভূত হইয়া সৃষ্টি অভিপ্রায়ে সংকল্প বিকল্প করেন। শাস্ত্রে এই সোম 'অগ্নীষোম' নামেও আছেন বিখ্যাত। 'স্মৃতাবেতাবগ্নীষোমাত্মকং জগৎ' (বায়ু, ৯৭ অঃ) এই অগ্নীষোম অর্থাৎ বিরাট পুরুষের মন সৃষ্টি করেন ব্রহ্মাকে। এই ব্রহ্মা 'প্রথমশরীরী' 'স বৈ পুরুষ উচ্যতে'। ব্রহ্মার মন হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ঋষিবৃন্দ 'মনসঃ পূর্বসৃষ্টা বৈ জাতা যৎ তেন মানসাঃ'। (মৎস্যপুরাণ, ৩য় অঃ)।

বৈশেষিক দর্শনে যে নয়টি তত্ত্বকে নিত্য পদার্থ বলিয়া মহর্ষি কণাদ স্বীকার করিয়াছেন, 'মন' তাহার মধ্যে একটি নিত্য তত্ত্ব। মন হইতে, অর্থাৎ ভিতর হইতে, সত্যকে অন্বেষণ করার শক্তি হইল মনন। এই মননের অর্থাৎ মনোদর্শনের শক্তি আছে বলিয়া বিশ্বের প্রায় সর্বদেশেই আদি মানবের নাম হইল মনু : অর্থাৎ ভারতে 'মনুঃ', ঈজিপ্টে 'মনেস' বা 'ম'না', ক্রিটে 'মিনোস্'; লিডিয়ায় 'মনেস্'; ফ্রিজিয়ায় 'মনিস'; জার্মাণীতে 'মন্উস্'। এই যে মনু অর্থাৎ এই যে মননশক্তিধারী সত্যান্বেষী মনোদার্শনিক, ইহারই অপত্যপরম্পরা হইতেছে 'মানব'। মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি হইতেছে মন—মন-ই হইতেছে দেহ-রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট; বিরাট পুরুষের মন যেমন দশাশ্ব, মানবের মনও তেমনি দশটি ইন্দ্রিয়াশ্বের রথে চড়িয়া পরিদর্শন করে রাজ্যদেশ। মনোময় জগতে মনই স্রষ্টা, মনই ঈশ্বর, মনই ব্রহ্মা। এই মনকে সত্যাচার দ্বারা শুদ্ধ করাই সাধনা (মনু, ৫।১০৯), মনের দ্বারা দর্শন করাই মনো-জগতে সত্যদর্শন (বৃঃ ৪।৪।১৯)। গীতায় শ্রীভগবান মনকে 'অষ্টধাপ্রকৃতি'র এক প্রকৃতি বলিয়া মনের মর্যাদা বাড়াইয়াছেন (৫।৪); পুরাণে মনই যে সৃষ্টিকার্যসমূহ সম্পাদন করে, সে কথা স্পষ্টাক্ষরে বলা হইয়াছে, 'মনঃ সৃষ্টিং' বিকুরুতে চোদ্যমানং সিসৃক্ষয়া' (মৎস্য, ৩য় অঃ)।

মনোদর্শন, মনের স্বরূপ দর্শন, তাই সহজ ব্যাপার নহে। সৃষ্টির জগতে, শিল্পের জগতে মনোনাশের তত্ত্ব সত্য নহে, অতএব গ্রাহ্যও নহে। সৃষ্টির ব্যাপারে মনই ব্রহ্ম অর্থাৎ মনই সত্য শিব ও সুন্দর। মনেতেই অহং, মনেতেই আত্মা। মন যদি বাস্তব সত্য বলিয়া গৃহীত হয়, তবে অহং যেমন বাস্তব, আত্মাও অর্থাৎ মনোগত আত্মাও, তেমনি বাস্তব। অহংএর মধ্যে মন বদ্ধ আছে বলিয়া অহংকেই বাস্তব বলিয়া বোধ হইতেছে—কিন্তু নিত্য

গতি যদি জীবনের পক্ষে সত্য বলিয়া স্বীকৃত হয়, তবে অহং হইতে আত্মায় অভিযাত্রার বাণী অবাস্তব কবিকল্পনা নহে। রবীন্দ্রনাথ যদি কোনো স্থলে মনোবিনাশের তত্ত্ব উত্থাপন করিতেন, তবে তাঁহাকে দার্শনিক হিসাবে কবি হইতে পৃথক সত্তাই শুধু ভাবিতাম না—বস্তুজীবন-নিরপেক্ষ তত্ত্বযোগী বলিয়া পৃথিবী হইতে দূরে ঠেলিতাম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সকল দিক হইতেই পৃথিবীর মানুষ, কাব্যসৃষ্টির দিক হইতে তো বটেই, দর্শন-চিন্তনার দিক হইতেও তিনি 'আমাদেরই লোক'। কথাগুলি ধীরভাবে অনুধাবন করিতে হইবে। ইহার তাৎপর্যও শান্তভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে। মনোবিনাশের কথা রবীন্দ্রনাথে কোথাও স্থান পায় নাই বলিয়া তাত্ত্বিকেরা তাঁহার দার্শনিকতার বিরুদ্ধে নানা তর্ক তুলিতে পারেন, তুলিয়াও থাকেন—কিন্তু জনমানসের তথা বিশ্বমানসের বিকাশতত্ত্ব উদ্ভাবনে রবীন্দ্রনাথ পৃথ্বীজীবনের যে কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তাহাও যখন অবাস্তব আদর্শবাদিতা বলিয়া উপেক্ষিত হইতে থাকে, তখন এই কথাটি না ভাবিয়াই পারি না, যে দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ নির্ণয়ে এখনও আমাদের বিলম্ব আছে।

কবিকে কি আমরা চিনিয়াছি? বিচিত্রের পূজারী এই কবি? কিন্তু দার্শনিকটি না থাকিলে কবির পক্ষে এত বিচিত্র সৃষ্টি যে সম্ভব হইত না, এ-কথা কি আমরা ভাবিয়া দেখিয়াছি? মনের অখণ্ড তত্ত্বের প্রতি দার্শনিকের যদি দৃষ্টি না থাকিত, তবে কোনো একটি বিশেষ বিষয়ে বা বস্তুতে অথবা নীতিতে কবির মন বন্দী হইতেও পারিত। মনের দ্বারা অখণ্ডকে তিনি পাইতে গেছেন, আভাস পাইয়াছেন, ইঙ্গিতে ধরিয়াছেন, কিন্তু মন দ্বারা অখণ্ডকে পূর্ণভাবে পাওয়া সম্ভব নহে বলিয়া যা' পাইয়াছেন, পাওয়ামাত্র তা' ত্যাগ করিয়াছেন; ত্যাগ করা মাত্র নূতন চাওয়ায় আবার মন ভরিয়াছেন। এইভাবে 'চাহিতে-চাহিতে—'ছাড়িতে-ছাড়িতে' নিত্য-ছোটার জীবনবেগে তিনি বিচিত্র সৃষ্টির আনন্দে মাতিয়াছেন। পূর্ণকে পাওয়া হয় নাই বটে; কিন্তু পূর্ণের টানে বিচিত্রকে দেখার সুযোগ ঘটিয়া গেছে। দার্শনিকটি বাদ দিয়া কবিকে কল্পনা করুন; দেখিবেন পূর্ণের টানটি আর থাকিতেছে না—কবিও তাই থামিয়া যাইতেছেন বিশেষ কোনো বন্ধনের মায়ানন্দে, বিচিত্রের গতিবেগ জীবন হইতে হইতেছে অন্তর্হিত।

রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তা ও দার্শনিকসত্তা এই দুই সত্তার কথা বুঝাইবার জন্যই পৃথক ভাবে বলা হইতেছে, কিন্তু টাকার এ-পিঠ এবং ও-পিঠের মত একই জীবনদেবতার ইহা দুই রূপ মাত্র। ইচ্ছা হয়, কবিকেই আপনি গ্রহণ করুন—কিন্তু দার্শনিকটি কবির সঙ্গে অবশ্যই থাকিবেন, অদ্বৈত দৃষ্টি লইয়া, রূপে অরূপদর্শনের আনন্দ লইয়া, পূর্ণসুন্দরের ধ্যানটি লইয়া। কবিকে বুঝিতে হইলে, কবির মধ্যে যিনি কবি, সেই দার্শনিকটিকে ভুলিলে চলিবে না। কবিজীবনের নিত্যগতির তত্ত্বরহস্য এবং কবির বিচিত্র কাব্যাবলীর অখণ্ড

তাৎপর্য সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে, দার্শনিকের স্বরূপচিন্তনে যত্নবান হইতেই হইবে।

রবীন্দ্রনাথ কবি, ইহা সর্বজনবিদিত। তিনি যে দার্শনিক, ইহাও ড. রাধাকৃষ্ণন, সুখ-সম্পৎ ভাণ্ডারী, শিবকৃষ্ণ দত্ত, ড. সুরেন্দ্রনাথ, পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, Sybil Baumer, Sisir Kumar Maitra, James H. Cousins, Dr. Mahendranath Sarkar, Emil Engelhardt, Feng Fei, Dr. Sushil Kumar Maitra, Evelyn Underhill প্রমুখ বিখ্যাত লেখকবৃন্দের রচনায় প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার কবির ও দার্শনিকের স্বরূপ সম্বন্ধে পণ্ডিত মহলে যে বহুকাল ধরিয়া নানাবিধ মতবিরোধ চলিতেছে, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, উভয় ব্যক্তিত্বের অখণ্ড তত্ত্বটি ধরিবার কোনো চেষ্টা আমরা করি নাই। মনোদর্শনে ও সাহিত্যমানসে রবীন্দ্রসাধনার অখণ্ড তত্ত্বটি ধরিবার চেষ্টা করা হইল। দেখানো হইল—বিচিত্রকে দর্শন করিতে করিতে কবি-মন অদ্বৈতকে যতটুকু ধারণ করিয়াছেন, দার্শনিকমন ততটুকু সত্যকেই স্বীকার করিয়াছেন, শ্রেয় ও সুন্দর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। অহং ও বিশ্বের তত্ত্ব, বিচিত্র ও একের তত্ত্ব, কবিদার্শনিকের তত্ত্ব—কবির ইহা গানের চেতনা, দার্শনিকের ইহা প্রাণের প্রেরণা।

'কবিকাহিনী' হইতে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত কবিকর্ম সমগ্রতার দিক হইতে একখানি বৃহৎ জীবনকাব্য—অখণ্ড অর্থাৎ সর্বজগদ্‌গত প্রেমের তত্ত্বই ইহার প্রতিপাদ্য। এই প্রেমেরই বস্তুগত প্রত্যক্ষরূপের বিশ্বচিত্র হইতেছে তাঁহার গল্প ও উপন্যাস-সাহিত্য। প্রেমের তত্ত্বই কবিদার্শনিকের জীবনতত্ত্ব। 'জীবন' অর্থে সংকীর্ণ কোনো সীমাবদ্ধ জীবন বুঝিলে চলিবে না—অহং হইতে আত্মা পর্যন্ত প্রসারিত বিশ্বজীবনকেই বুঝিতে হইবে। এই বিশ্ব-জীবনের প্রকাশ হইয়াছে কবির কাব্য-সাহিত্যে, জীবনসত্যের ব্যাখ্যা মিলিয়াছে দার্শনিকের তত্ত্বদর্শনে।

কবির কাব্যমানসের বিচিত্রাভিসারের মূলে যে একতত্ত্বের প্রেরণা আছে, তাহাই দার্শনিকের অদ্বৈত প্রেমতত্ত্ব, ইহা বলাই বাহুল্য। গ্রন্থমধ্যে মূলতঃ এই তত্ত্বব্যাখ্যাই করা হইয়াছে।

'মনোদর্শন' শেষ হইল। ইহার দ্বারা জনমানসের জাগরণ ঘটিলে মনঃসাধনা চরিতার্থ হইবে। বোধের জাগরণে রসের উদ্বেজন, রসের উদ্বেজনায় জীবনের উদ্বোধন, জীবনের উদ্বোধনে সর্বজীবনগত প্রেমের স্বরূপোপলব্ধি—অর্থাৎ যাহা ধ্রুব, যাহা শুভ, যাহা নির্মল, যাহা সুন্দর—বোধজীবনে ক্রমশঃ তাহারই সহজোপলব্ধি—ইহাই রবীন্দ্ররচনাবলী পাঠের ফলশ্রুতি। রবীন্দ্রনাথ এই উপলব্ধির পথেই অহরহঃ আমাদের আকর্ষণ করিয়াছেন। পণ্ডিত জহরলাল

নেহেরু যথার্থই বলিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথ হইতেছেন "as a beacon light to all of us, ever pointing to the finer and nobler aspects of life and never allowing us to fall into the ruts which kill individuals as well as nations." (*The Golden Book of Tagore.*) মনোজীবনের অনেক নিম্নস্তরে আছি বলিয়া আজও আমরা রবীন্দ্রনাথের মানসদর্শনে বা তাঁহার মর্মকথায় তেমন করিয়া কান দিতে পারি নাই—কিন্তু এমন একদিন অবশ্যই আসিবে, যেদিন প্রাণ ভরিয়া তাঁহার গানই যে শুনিব, তাহা নহে,—গানের মর্মকথা চরিত্রে প্রতিভাত করিয়া মনোজীবনের সর্বোচ্চ উদয়াচলে সূর্যের ন্যায় প্রকাশ পাইব। সেদিন সুদূর হইতে পারে, কিন্তু অবাস্তব কবিকল্পনা তাহা নহে। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সেল্‌মা লেগারফ্‌ যাহা বলিয়াছেন, আশান্বিত প্রসন্ন হৃদয়ে বারংবার তাহা আবৃত্তি করিয়া অনাগত সেই রবিকরোজ্জ্বল মঙ্গলময় প্রেম-প্রভাতের প্রতীক্ষায় সাধন-তৎপর আমরা রহিব :

> "When it shall dawn—that day so distant, so ardently longed for, when life has reached its goal, when the final harmony is attained and the old dream of Paradise has become a reality, then will the men of that time remember—the Indian Seer as one among those who, with invincible hope, uprooted the poison-plants of hatred, to sow in their stead the apples of Love and the roses of Peace".
>
> (*The Golden Book of Tagore*)

শব্দ-সূচী

[উদ্ধৃতি-চিহ্নাঙ্কিত শব্দগুলি কবিতার নাম এবং তারকা চিহ্নিত শব্দগুলি চরিত্রের নাম বুঝাইতেছে।

ভ্রম সংশোধন

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
প্রেমতত্ত্বের	প্রেমতত্ত্বের	৯	২৫
বুবিবার	বুঝিবার	১১	২২
অতুজ্জ্বল	অত্যুজ্জ্বল	১৬	৫
হ্বী	হ্রী	৫৪	৪
বলিম্নাছেন	বলিয়াছেন	৬৩	১৪
আপা	আপ্রা	৯৯	৫
অন্তরীক্ষং	অন্তরিক্ষং	৯৯	৫
বিষ্ণুর্জ্যোতি	বিষ্ণুজ্যোতি	৯৯	২৪
ব্রতং	,ক ব্রতং	১০০	৯
শ্রদ্ধাংস্থ	শ্রদ্ধাস্থ	১০০	৯
বিনিমীতে	বিমিমীতে	১০০	১৩
চন্দ্রমাঃ	চন্দ্রমা	১০০	১৩
মিসানো	মিমানো	১০০	১৪
প্রতিদ্বন্দিগজগর্জন	প্রতিদ্বন্দ্বিগজগর্জন	২৩৬	১
সুক্ষ্ম	সূক্ষ্ম	২৭৪	৪

ভূমার	ভূমার	২৯২	১
অতীন্দ্রির	অতীন্দ্রিয়	২৯১	২৫
আফালন	আস্ফালন	২৯৯	৩৫
বুঝিয়া	যুঝিয়া	৩৮৮	২৫
কিছু	বিন্দু	৩৮৮	২৯
পুনর্ণবঃ	পুনর্নবঃ	৩৮৯	১৯
তত	তত্র	৩৮৯	২৪
কৃচ্ছসাধন	কৃচ্ছ্রসাধন	৪১৫	১৬
এনো	আস	৪২১	১৭
তুলিতেছে	তুলিতেছ	৪২৪	২
জন্মে	কণ্ঠে	৪৩২	১০
মলয়-কুসুম	হৃদয়-কুসুম	৪৩৩	১২
তাহার	কাহার	৪৩৮	২৫
করে	করো	৪৪৪	১৬
উচ্ছিয়া	উচ্ছ্রিয়া	৪৫২	২০
চঞ্চলা	চঞ্চল	৪৫৩	১
নিঃশেষ	নিঃশেষে	৪৫৩	৬
মহিয়সী	মহীয়সী	৪৬৪	২০
করার	ঝরার	৪৭৬	২৫
এনেছি	এসেছি	৪৭৯	৯
নিশ্বাস	নিঃশ্বাস	৪৮৮	২০
পথিকের	পথিকেরে	৪৮৯	১০
বহ্ণ	বহন	৫২৬	৯
খণ্ড-আমি	অখণ্ড-আমি	৫৫১	২৫
কাদের	কাছের	৫৬৪	১৯
ভেরি	ভেরী	৫৭৫	১০
সন্ধিহান	সন্দিহান	৬৬৭	২৯